

আষাঢ়—১৩৫২

প্রথম খণ্ড	ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

কোকামুখ তীর্থ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এই্চ-ডি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত দামোদরপুর নামক স্থানে গুপ্তবংশীয় তিনজন সম্রাটের রাজত্বকালীন পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহার একখানিতে সম্রাট্ বুধগুপ্ত, তাঁহার অধীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি বা উত্তর বাংলা প্রদেশের উপরিক (শাসনকর্ত্তা) মহারাজ জয়দত্ত এবং জয়দত্ত কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোটিবর্ষ বিষয় বা দিনাজপুর অঞ্চলের আযুক্তক (শাসনকর্ত্তা) গণ্ডকের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। গণ্ডকের শাসনকালে নগরশ্রেষ্ঠী ঋভুপাল সার্থবাহ বসুমিত্র, প্রথমকুলিক বরদত্ত এবং প্রথম কায়স্থ বিপ্রপাল শাসনকার্য্যে বিষয়পতির সহায়ক ছিলেন। শ্রেষ্ঠী ঋভুপাল একদিন অধিষ্ঠানাধিকরণ অর্থাৎ নগরের শাসনসভায় নিম্নোদ্ধৃত আবেদন উপস্থিত করেন—"হিমবচ্ছিখরে কোকামুখস্বামিনঃ চত্বারঃ কুল্যবাপাঃ শ্বেতবরাহস্বামিনো পি সপ্তকুল্যবাপাঃ অস্মৎকলাশংসিনা পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে ডোঙ্গাগ্রামে পূর্ব্বং ময়া অপ্রদা অতিসৃষ্টকাঃ। তদহং তৎক্ষেত্রসামীপ্যভূমৌ তয়োরাত্ত কোকামুখস্বামিশ্বেতবরাহস্বামিনো নামলিঙ্গমেনং দেবকুলদ্বয়ম্ এতৎ কোষ্ঠিকাদ্বয়ঞ্চ কারয়িতুমিচ্ছামি। অর্হথ বাস্তুনা সহ কুল্যচাপান্ যথা—ক্রয়মর্য্যাদয়া ছাতুমিতি।" এই আবেদন পরীক্ষা করিয়া পুস্তপাল বিষ্ণুদত্ত, বিজয় নন্দী এবং স্থাণুনন্দী মত দিলেন যে, শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে তিনদীনার মূল্যের কয়েক কুল্যবাপ ভূমি বিক্রয় করা যাইতে পারে; কারণ সত্যই "অনেন হিমবচ্ছিখরে তয়োঃ কোকামুখস্বামিশ্বেতবরাহস্বামিনোঃ অপ্রদাঃ ক্ষেত্রকুল্যবাপা একাদশ দত্তকাঃ। তদর্থঞ্চ ইহ দেবকুল কোষ্ঠিকাকরণে যুক্তমেতদ্ বিজ্ঞাপিতং তৎ ক্ষেত্রসামীপ্যভূমৌ বাস্তু দাতুমিতি।" এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরে আমি তাম্রশাসনের কিঞ্চিৎ সংশোধিত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি। শাসনের ব্যাখ্যায় আমি পূর্ব্বে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন প্রমাণাবলীর সাহায্যে তদুপরি নবীন আলোকপাতের চেষ্টা করিব।

হিমবচ্ছিখর শব্দের অর্থ হিমালয় পর্ব্বতের চূড়া। কিন্ত

যে ডোঙ্গাগ্রামে পূর্ব্বে ভূমিদান করা হইয়াছিল এবং যে স্থলে নূতন ভূমি প্রার্থনা করা হইল, উহা দামোদরপুরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ কুমার-গুপ্তের সময়কালীন ১২৪ গুপ্তাব্দের দামোদরপুর শাসনেও ডোঙ্গাগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। আবার ২২৪ গুপ্তাব্দের দামোদরপুর শাসনে দেখিতে পাই, অযোধ্যা হইতে আগত কুলপুত্র অমৃতদেব কোটিবর্ষের তৎকালীন বিষয়পতি স্বয়ং-ভূদেবের শাসনকালে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, "অত্রারণ্যে ভগবতঃ শ্বেতবরাহস্বামিনো দেবকুলে খণ্ডস্ফুটিত প্রতিসংস্কারকরণায় বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তন গব্য ধূপপুষ্পপ্রাপণমধুপর্কদীপাদ্যুপযোগায চ অপ্রদাধর্ম্মেন তাম্রপট্টীকৃত্য ক্ষেত্রস্তোকং দাতুমিতি।" এই আবেদনের ফলে ভগবান্ শ্বেতবরাহস্বামীর উদ্দেশ্যে পাচ কুল্যবাপ ভূমি উৎসর্গ করা সম্ভব হয়। প্রদত্ত ভূমির অবস্থানপ্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দপাটক, লবঙ্গসিকা, সাট্টবনাশ্রম, পরস্পতিকা, জম্বূনদী এবং পুরণবৃন্দিকহরির উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, পুরণবৃন্দিকহরি দামোদর-পুরের চৌদ্দ মাইল উত্তরে অবস্থিত আধুনিক বৃন্দাকুড়ির সহিত অভিন্ন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে যে অঞ্চলে ভূমি অবস্থিত ছিল উহাকে অরণ্য বলা হইয়াছে। বুধগুপ্তের সময়কালীন ১৬৩ গুপ্তাব্দের দামোদরপুর শাসনে বায়িগ্রাম অর্থাৎ বগুড়া জেলার অন্তর্গত বৈগ্রাম বা বাইগ্রামের উল্লেখ আছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, দামোদরপুরের নিকটবর্ত্তী ডোঙ্গা-গ্রামটি যে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, উহারই নাম হিমবচ্ছিখর কিনা, অথবা হিমবচ্ছিখর বলিতে ঐ স্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী হিমালয় পর্ব্বতের কোন শৃঙ্গবিশেষ বুঝিতে হইবে কিনা। দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর সঙ্গত বোধহয়। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে, স্বীকার করিতে হয় যে, হিমালয় পর্ব্বতের গাত্রে কোন স্থানে কোকামুখ এবং শ্বেতবরাহ সংজ্ঞক দেবতাদ্বয়ের মন্দির অবস্থিত ছিল এবং দেবভক্ত ঋভুপাল ও অমৃতদেব উহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুরের দামোদরপুর অঞ্চলে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভূমি দান করিয়া-ছিলেন। এখন অপর প্রশ্ন এই যে, হিমালয়ের যে অংশে ঐ মন্দিরদ্বয় অবস্থিত ছিল, তাহা কোটিবর্ষ বিষয় বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল কিনা। কেহ কেহ সত্যই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক বাংলার উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চল প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থক কোনই প্রমাণ নাই। আসল কথা এই যে, এ পর্য্যন্ত কেহই হিমালয়ের অন্তর্গত কোকামুখ মন্দিরের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

মহাভারত ও পুরাণাদিতে কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্র নামক তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। কতকগুলি তীর্থস্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করাও কঠিন। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্রের অবস্থিতি নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইতে পারে।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কোকামুখ তীর্থপ্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের ২১৯তম এবং ১২৯তম অধ্যায়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এই পুরাণে হিমালয়ের পাদদেশস্থিত কোকানাম্নী নদী, উহার তটবর্ত্তী কোকামুখ সংজ্ঞক তীর্থক্ষেত্র এবং ঐতীর্থে বরাহরূপী বিষ্ণুর অবস্থিতির উল্লেখ আছে। যথা—"কোকেতি প্রথিতা লোকে শিশিরাদ্রিসমাশ্রিতা" (১১৯।১৭); "বরাহদংষ্ট্রাসংলগ্নাঃ পিতরঃ কনকোজ্জ্বলাঃ। কোকামুখে গতভয়াঃ কৃতা দেবেন বিষ্ণুনা॥" (১১৯।৩৯); "কোকা-পদীতি বিখ্যাতা গিরিরাজসমাশ্রিতা। তীর্থকোটি মহাপুণ্যা মন্দ্রপপরিপালিতা॥" (১১৯।১০৬); "এবং ময়োক্তঃ বরদস্তু বিষ্ণোঃ কোকামুখে দিব্যবরাহরূপম্" (১১৯।১১৬), ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, ব্রহ্মপুরাণ হইতে কোকানদী বা কোকামুখ তীর্থের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নহে। উহার জন্য আমাদিগকে পুরাণান্তরের আশ্রয় লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমি বরাহপুরাণের প্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

বরাহপুরাণের ১৪০তম অধ্যায়ের নাম কোকামুখ মাহাত্ম্য বর্ণন। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে ভগবান্ বরাহ পৃথিবীকে বলিতেছেন, "তব কোকামুখং নাম যন্ময়া পূর্ব্বভাষিতম্। বদরীতি চ বিখ্যাতং গিরিরাজশিলাতলম্॥ স্থানং লোহার্গলং নাম ম্লেচ্ছরাজসমাশ্রিতম্। ক্ষণঞ্চাপি ন মুঞ্চামি এতমেতন্ন সংশয়ঃ॥" (১৪০।৫) অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রধান ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে তিনটি মাত্র—প্রথম কোকামুখ, দ্বিতীয় বদরী এবং তৃতীয় লোহার্গল। ১৪১তম

অধ্যায়ের নাম বদরিকাশ্রম মাহাত্ম্য বর্ণন ; উহাতে উল্লিখিত হিমকূটশিলাতলস্থিত বদরীতীর্থের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে বদরিকাশ্রম ক্ষেত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মকুণ্ড, অগ্নিসত্যপদ, ইন্দ্রলোক, পঞ্চশিখ, চতুঃস্রোতঃ, বেদধার, দ্বাদশাদিত্যকুণ্ড, লোকপাল, পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী স্থলকুণ্ড, মেরুবর, মাপসোদ্ভেদ, পঞ্চশিরঃ, সোমাভিষেক, সোমগিরি, উর্ব্বশীকুণ্ড প্রভৃতি পবিত্র স্থানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরাণের ১৫১তম অধ্যায়ের নাম লোহার্গল মাহাত্ম্য বর্ণন। উহা বলা হইয়াছে—"ততঃ সিদ্ধবটেগত্বা ত্রিংশদ্ যোজনদূরতঃ। ম্লেচ্ছ মধ্যে বরারোহে হিমবন্তং সমাশ্রিতম্॥ তত্র লোহার্গলে ক্ষেত্রে নিবাসো বিহিতঃ শুভঃ। গুহ্যং পঞ্চদশায়ামং সমন্তাৎ পঞ্চ যোজনম্॥ * * * তত্র তিষ্ঠামাহং ভদ্রে উদীচীঃ ত্রিশমাশ্রিতঃ। হিরণ্যপ্রতিমাং কৃত্বা জাতরূপাং ন সংশয়ঃ॥" (১৫১।৭-১০) লোহার্গলের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ঐ ক্ষেত্রের অন্তর্গত অনেকগুলি পবিত্র স্থানের উল্লেখ দেখা যায় যথা—পঞ্চসরঃ, নারদকুণ্ড, বশিষ্ঠকুণ্ড, পঞ্চকুণ্ড (এ স্থলে হিমকূট বিনিঃসৃতা পঞ্চধারা পড়িয়াছে) সপ্তর্ষিকুণ্ড (এস্থলে হিমবৎ পর্ব্বস্থিত সপ্তধারা পড়িয়াছে), শরভঙ্গকুণ্ড ("তত্রধারাপতত্যেকা শরভঙ্গাশ্রিতা নদী") অগ্নিসরঃকুণ্ড, বৃহস্পতিকুণ্ড (এস্থলে হিমকূটসমাশ্রিতা ধারা পড়িয়াছে), বৈশ্বানরকুণ্ড ("ধারা ঠেকা পতত্যত্র দৃশ্যতে হিমসংক্ষয়াৎ"), কার্ত্তিকেয়কুণ্ড (এস্থলে হিমপর্ব্বত হইতে পঞ্চদশ ধারা পড়িয়াছে), উমাকুণ্ড, মহেশ্বরকুণ্ড (এস্থলে হিমবৎপর্ব্বত হইতে তিনটি ধারা পড়িয়াছে), ব্রহ্মকুণ্ড (এস্থলে হিমালয় হইতে চারিটি ধারা পড়িয়াছে), ইত্যাদি।

বরাহপুরাণের ১৪০তম অধ্যায়ে বরাহক্ষেত্র কোকামুখতীর্থের যে বিবরণ পাওয়া যায়, উহাতে ঐ ক্ষেত্রের অন্তর্গত বহু পবিত্র স্থানের উল্লেখ আছে। ইহাদের অনেকগুলির অবস্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"কোকায়াং মম মণ্ডলে।" কোকামুখের অন্তর্গত তীর্থস্থান :—১। জলবিন্দু ; ২। বিষ্ণুধারা ; ৩। কোকামুখাশ্রিত বিষ্ণুপদ ; ৪। বিষ্ণুসরঃ ; ৫। সোমতীর্থ—"যত্র পঞ্চশিলাভূমির্ব্বিষ্ণুনাম্নাতথাঙ্কিতা" ; ৬। তুঙ্গকূট ; ৭। অগ্নিসরঃ—"পঞ্চধারা পতন্ত্যত্র গিরিকুঞ্জ সমাশ্রিতাঃ" ; ৮। ব্রহ্মসরঃ ; ৯। ধেনুবট ; ১০। ধর্ম্মোদ্ভব —"গিরিকুঞ্জাৎ পতত্যেকা ধারা ভূমিতলে শুভা" ; ১১। কোটিবট ; ১২। পাপপ্রমোচন ; ১৩। যমব্যসনক ; ১৪। মাতঙ্গ—"স্রোতো বহতি তত্রৈব আশ্রিতং কৌশিকীং নদীম্" ; ১৫। বজ্রভব—"স্রোতো বহতি তত্রৈকমাশ্রিতং কৌশিকীং নদীম্" ; ১৬। কোকাশিলাতলস্থিত শক্ররুদ্র ; ১৭। দংষ্ট্রাঙ্কুর—"যত্র কোকা বিনিঃ সৃতাঃ" ; ১৭। বিষ্ণুতীর্থ—"ততঃ পর্ব্বতমস্যাত্ত্ব কোকায়াং পততিজলম্ ; ১৮। সর্ব্বকামিকা—"অস্তিরুদ্রবরং স্থানং সঙ্গমং কৌশিকীকোকয়োঃ। সর্ব্বকামিকেতি বিখ্যাতা শিলা তিষ্ঠতি চোত্তরে॥" ; ১৯। মৎস্যশিলা—"অস্তি মৎস্যশিলা নাম গুহ্যং কোকামুখে চরম্। ধারাঃ পতন্তি তিস্রো বৈ কৌশিকীমাশ্রিতা নদীম্॥" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত কোকামুখ তীর্থ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে—"পঞ্চযোজন বিস্তারং ক্ষেত্রং কোকামুখং মম", "তস্মিন্ কোকামুখে রম্যে তিষ্ঠামি দক্ষিণামুখঃ" "বরাহরূপমাদায় তিষ্ঠামি পুরুষাকৃতিঃ", "বামোন্নতমুখং কৃত্বা বামদংষ্ট্রা সমুন্নতম্", ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে দেখা যায়, কোকামুখতীর্থে কোকাকৌশিকী নাম্নী দুইটি নদী প্রবাহিত হইত এবং ঐ নদীদ্বয়ের পবিত্র সঙ্গম স্থলও তীর্থটির অন্তর্গত ছিল। ভারতবর্ষে কৌশিকী নামের একাধিক নদী আছে। কিন্তু বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী কৌশিকী বা কুশী নদী ব্যতীত অপর কোন কৌশিকীর সহিত বরাহক্ষেত্র এবং কোকা নদীর সংস্রব প্রমাণ করা সম্ভব নহে। এই কৌশিকী নদীর নেপালের অন্তর্গত অংশ সুন কোশী (সম্ভবতঃ স্বর্ণ কৌশিকী) নামে পরিচিত ; উহার কতিপয় উপনদী দুধকোশী, অরুণকোশী প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্র অধুনা বরাহছত্র নামে প্রসিদ্ধ। 'ছত্র' শব্দটী সংস্কৃত 'ক্ষেত্র' শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরিহরক্ষেত্র নাম হইতে পাটনার নিকটবর্ত্তী শোনপুরের মেলার নাম "হরিহর ছত্রের মেলা" হইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

দুঃখের বিষয়, নেপালের অন্তর্গত বরাহক্ষেত্র বা বরাহছত্র এবং কোকাসী নদী অধিকাংশ মানচিত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য মানচিত্রে সাধারণতঃ তীর্থাঞ্চলের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত ধনকুটা এবং পূর্ব্বদিকস্থিত বিজাপুরের উল্লেখ থাকে। E. Thomson কর্ত্তৃক সঙ্কলিত Gazetteer of Iadia (London, 1886) গ্রন্থে Varaha chatra স্থলে ভ্রমক্রমে Vardha chatra ছাপা

হইয়াছে এবং স্থানটির সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "Town in Nepal state; situated on the left bank of the San Kusi river, 124 miles east-south.east of Khatmandu. Lat. 26° 57', long 4'." শুপ্তপ্রেশ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে ভারতীয় তীর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে বরাহছত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ভগবান্ নারায়ণের তৃতীয় অবতার বরাহদেবের প্রতিমূর্ত্তি নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত ভূটান রাজ্যের নিকট ধবলাগিরিতে প্রতিষ্ঠিত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে প্রতি বৎসর মেলা হয়। কলিকাতা হইতে যোগবাণী (অর্থাৎ Jogbani, B & A Ry) ৩৩১ (রাণাঘাট ও লালগোলা ঘাট হইয়া) ৬/১০। তথা হইতে কুশী নদীর কিনারা দিয়া ২০ মাইল ধবলা গিরি-শৃঙ্গের পাদদেশ ও তথা হইতে ২০ মাইল বরাহদেবের মন্দির।" যদিও সুপরিচিত ভূটানি.রাজ্য এবং নেপালের অন্তর্গত বিখ্যাত ধবলাগিরি বরাহছত্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তাহা হইলেও উদ্ধৃত বিবরণে তীর্থটির অবস্থান মোটামুটি ঠিকই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একখানি পুরাতন গ্রন্থে বরাহছত্র এবং তৎসংলগ্ন কোকা নদীর উল্লেখ দেখা যায়। উহা An Account of the Kingdom of Nepaul (being the substance of observations made during a Mission to that country in the year 1793) by colonel Kirkpatrick, London, 1811. এই গ্রন্থের ৩২৪-২৫ পৃষ্ঠায় কাঠমণ্ডু হইতে বিজাপুরের পথ বর্ণণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ওধং ঘাট হইতে অরুণ এবং সোম কুশী নদীর সঙ্গমের দূরত্ব ৭ ঘড়ি; তথা হইতে অথরিয়া ঘাট (দ্বিতীয়) ৫ ঘড়ি; তথা হইতে তাম্বর, অর্থাৎ তাম্র ফেরী নামক স্থানে তাম্বর ও সেনেকুশীর সঙ্গম ২৬ ঘড়ি; তথা হইতে কোকাকোলা ১৮ ঘড়ি; তথা হইতে বরাহছত্র ২৮ ঘড়ি; তথা হইতে কুশীর তীরস্থিত ছত্রঘাট ৫ ঘড়ি; তথা হইতে বিজাপুর ১৬ ঘড়ি। গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত মানচিত্রটিতেও বরাহছত্র এবং কোকাকোলার উল্লেখ আছে। কোলা (সংস্কৃত কুল্যা) শব্দটির অর্থ ক্ষুদ্র নদী। কোকাকোলা নামের অর্থ কোকা নাম্নী ক্ষুদ্র নদী। এক ঘড়িতে সাড়ে বাইশ মিনিট। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ঘড়ি অনুসারে যে দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহার উপরে নির্ভর করা চলে না; কারণ পার্ব্বত্য পথে পথিকেরা সর্ব্বত্র সমবেগে চলিতে পারে না।

যাহা হউক, আমরা হিমালয়স্থিত প্রাচীন কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্র এবং তদন্তর্গত কোকা নদী খুঁজিয়া পাইলাম। এই স্থানের দূরত্ব দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্তর্গত দামোদরপুর অঞ্চল হইতে আকাশ পথেও প্রায় ১৫০ মাইল। সুতরাং উপযুক্ত প্রমাণাভাবে কোকামুখতীর্থ প্রাচীন কোটি বর্ষ বিষয়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে করা কঠিন। অবশ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু ইহা সমর্থক প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। উত্তর বিহারের অধিবাসিগণের নিকট বরাহছত্রের তীর্থ মর্য্যাটা অসীম। বাংলার উত্তরভাগে মোঙ্গোলীয় প্রভাব বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি যে উত্তর বিহারের অনুরূপ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং গুপ্তযুগের দিনাজপুর-বাসিগণ কোকামুখ বা বরাহক্ষেত্রে তীর্থ পর্য্যটনে যাইবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শ্রেষ্ঠী ঋভুপাল বরাহক্ষেত্রস্থিত দুইটি বরাহ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বদেশে বহু বিঘা জমি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূমির লভ্যাংশ নিয়মিতভাবে সুদূরবর্ত্তী মন্দিরে প্রেরণ করা অবশ্যই সুবিধাজনক ছিল না। তাই তিনি আরও ভূমি ক্রয় করিয়া স্বদেশে ঐ দুই দেবতার নামে দুইটি মন্দির এবং দুইটী প্রেষ্ঠিকা নির্ম্মাণ করিতে সচেষ্ট হন। এই মন্দিরদ্বয়কে নকল কোকামুখ এবং নকল শ্বেতবরাহের মন্দির বলা যাইতে পারে। নকল দেবতা হইতে পৃথক করিবার জন্যই তাম্রশাসনে বরাহক্ষেত্রস্থিত কোকামুখ ও শ্বেতবরাহ দেবতাকে "আদ্য" (অর্থাৎ, আসল) বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাম্রশাসন হইতে উদ্ধৃত দ্বিতীয়াংশে "হিমচচ্ছিখরে" এবং "ইহ" কথা দুইটি বিভিন্ন স্থান বোধক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা বুঝা যায়। ঋভুপালের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে অমৃতদেব শ্বেত-বরাহ দেবতার উদ্দেশ্যে তদীয় মন্দির সংস্কারাদির জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ঋভুপাল কর্ত্তৃক স্থাপিত পূর্ব্বোক্ত মন্দির, কোকামুখ ক্ষেত্রস্থিত আসল শ্বেতবরাহের মন্দির নহে। কারণ, অপর তাম্রশাসনের ন্যায় এই শাসনটিতে দেবতার প্রসঙ্গে হিমবচ্ছিখর শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

দক্ষিণ দিনাজপুর অঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া কেহ যদি ঋভুপালের স্থাপিত দেবকুলদ্বয় বা উহার ধ্বংসাবশেষ অধিকার করিতে সমর্থ হন, তিনি বাঙালী ঐতিহাসিকের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাণিকলালের প্রবেশ সহ স্বর্ণকার, অর্থাৎ contractor···তিনি এসেই—

"হুজুর মা বাপ, দাস মজুর মাত্র"—বলতে বলতে একেবারের হুজুরের চরণ স্পর্শ।

ডাক্তার চমকে উঠে। হরি হে, কর কি। তুমি আমার ছোটো কিসে? ওঠো, ওঠো, সব মানুষই আমার কাছে সমান। তায় শুনেছি তুমি স্বর্ণকার, বাড়ীতে আমাদের শান্তির কর্ণধার। ঠাকরুণদের মুখভার ঘোচাও, সত্যটা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নাই,—ওঠো ওঠো। একটু স্থির হয়ে শোনো। কি জানি এ কাজে কত টাকা ফেলেছ, শেষ অনিষ্ট ক'রে বসতো! তাই Noticeটা প্রচারের পূর্ব্বে ভাবলুম—duty হলেও, হিঁদুর ছেলে—ধর্ম্মও তো আছেন। সবদিক সামলাতে হয় যে। তায় আমরা প্রভুপাদের ফ্যাকড়া, ন্যাকড়া ঢাকা থাকতে হয়—তাতেই আনন্দ। কারুর কথায় অভিমান রাখি না। দিন কাটলেই হ'ল। হরি নিয়ে যেন থাকতে পারি, অপরাধ না ক'রে ফেলি। মানুষের ভুলচুক আছেই। সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকি। অবস্থা তো এই, পেটের দায়ে চাকরি। এখন কি করবে বল দিকি? একদিকে duty লোকের প্রাণ নিয়ে কথা। অন্যদিকে অন্যের অপকার। সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। বড় রকমের ক্ষতির ভয় আছে কি?"

Contractor—"হুজুর, একেবারে ফকির হ'য়ে যাবার কাজ করে' ফেলেছি। লোভে পাপ। সর্ব্বস্ব ফেলে, মায় গোয়ালের গরু, পরিবারের খাড়ু খুইয়ে—একচেটে contract নিয়ে ফেলেছি। সাত সাতটা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে পথের ভিখিরী হ'তে হবে। আপনি বাঁচাবার উপায় না করলে আঁচাবার উপায় আর থাকবে না।" (পা জড়িয়ে পড়া)।

"ছাড়ো ছাড়ো, আমরা কাকেও পা ছুঁতে দিই না, কড়া নিষেধ। তাই তো এমনটা ক'রে বসেছ! কই মাছ যে কলেরার বাহন,—জানতে না? সেই তো ওকে নিয়ে বেড়ায়,—জানতে না?"

"না হুজুর, মুখ্যু মানুষ। জানলে আর এমন মারাত্মক কাজ করি।"

"শ্বশুরের অবস্থা কেমন? নিবাস কোথা?"

"আজ্ঞে যশোরের নিকটেই। অবস্থা ভালোই ছিলো। ডাকাতের দৌরাত্মে দুটো ডালকুত্তো রাখতেন। এই লোভে পড়ে তিনশো টাকায় মুন্সীদের বেচে দিয়েছেন। নতুন বাজার এখন তাঁর একচেটে।"

"তাই তো ভাবালে যে। আমি আবার Cholera Expert আমার report একবার বেরুলে যে সর্বত্র ঘা পড়বে। (চিন্তাকুলভাবে) মাণিকলাল মাথায় কিছু আসে?"

মাণিকলাল। বিদেশী সাহেবরাও ও fishটির গুণের কথা জানে না, নইলে military majorরা এতক্ষণ হুলুস্থুল বাধাতো। এখনো এটুকু বাঁচোয়া আছে। ওদের দেশে ও বিষাক্ত black fish নেই বোধ হয়।"

বিনোদ। কিন্তু এদেশে বদ লোকের তো অভাব নেই। কে কখন কানে তুলবে তাতো জানি না, ভয় যে খেতাব কাঙালদের।

মাণিক। Medical Journal তো নভেল (Novel) নয়, কেই বা পড়ে। statesmanখানা নিতে হয় তাই নেয়, মোড়োক খোলে না শুনেছি—"

বিনোদ। তাও জানি। কিন্তু কাজটি যে বড় riskq তাই তো এ লোকটি দেখছি সত্যিই বিপন্ন - ওর দুকূল ডুবতে বসেছে। ঐ সঙ্গে আরো কত ডুববে তা কে জানে। (চিন্তাকুলভাবে) দেখো মাণিক, আমাদের বংশে ধর্মের চেয়ে বড় কিছু নেই। হরিকে না ভুললেই হ'ল। এখন যেমন চলছে চলুক, কি বলো?"

মাণিক। আমার মনে হয় Expert ভিন্ন এ আর কারুর মাথায় আসবে না,—

বিনোদ। আচ্ছা তুমি এখন যাও স্বর্ণকার। এসব কথা কেউ না শোনে—wifeও নয়। ওর মধ্যে উভয় পক্ষের life রইলো। দেখো—সেরটা যেন এক টাকার

ওপর না যায়। যাও, আমার জপের সময় হ'ল। মাণিকলাল আমার মন্ত্র শিষ্য। কথাবার্ত্তা যা যখন কইবার—ওঁর কাছেই কয়ো। আমার কাছে না ডাকলে এস না। বড় সঙ্গিন কাজ বুঝেছ ?

Contractor—আর বলতে হবে না প্রভু, বাপেও এত দয়া করেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। নিজের মৃত্যুবাণের পাত্তা অপরকে কি কেউ বলে হুজুর। আমি কৃতার্থ হলুম, দেবদর্শন ক'রে চললুম। আমিও হিন্দু-পূজা আমার যৎসামান্য হলেও গ্রহণ করতেই হবে দেবতা, আমার রক্ষক আর কেউ নেই।

বিনোদ কানে আঙুল দিয়ে উঠে পড়লেন। (সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত প্রণমে ক'রে মাণিকলালকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণকারও চলে গেল।)

বিনোদের ধুম্-জপ চল্‌তে লাগলো। প্রভুপাদের বংশ বিড়ি ধ্বংসে মন দিলেন। চিন্তাও চলতে লাগলো—

(১) স্বর্ণকার কাজ বাগাতে জানে। ইংরিজি পড়েছে কিনা! বিদ্যে শেখা আর কিসের জন্যে···কাজ হাসিলের জন্যে তো,—সত্য গোপনে sanat বানিয়ে দেয়।

(২) কইমাছ তো এলো বলে—কোটা হবে কিসে ? অস্ত্রের মধ্যে সেই ডগা ভাঙা স্প্যাচুলা খানাই ভরসা। কুটিয়ে আনতে বল্‌লেই হোতো, কিন্তু আগে থেকে লঙ্কা ভাগ তো আর চলে না। আবার বলে বসেছি অদ্বৈত বংশ। আচ্ছা—আসে আসুকই।

(৩) ও বাবা! এতো my dear মুড়ি নয়, আবার রাঁধা চাই, রান্নার কথায় যে কান্না আসে। মাণিক আবার 'সরকার' হয়ে মরেছে। তায় পরিচয় দিয়েছি—আমি প্রভুর বংশ। মাথা খেলে দেখছি। কোন্ দিন স্বর্ণকার এসে পড়তেও তো পারে—একটা antidote যে ভেবে রাখা চাই।

(৪) সরকারের চেয়ে বড় জাত কেউ আছে নাকি ? পাচক গুণবাচক হওয়াই তো দরকার। প্যারীচরণ সরকারের দৌলতেই তো চাকরি,—রঘুবংশের বিদ্যেতে তো ঘুঘু চরতো;—রামদুলালের কথা তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কটা শোনাবো! খোদ সরকারের গুণের কথা দশমুণ্ড না হলে কারো তুণ্ডে কুলুবে না, থাক—এইতেই হবে।

(৫) মাণিক রাঁধলেই হবে—খুব হবে—তুশোবার হবে—মিছে দুর্ভাবনায় দরকার নেই। রেঙ্গুণে আমার কোন মাসিমা রেঁধে দিতেন! মিছে সংস্কারের পিছে আত্মসংহার করব নাকি! যতো সব···

(জপে বাধা পড়লো। একটা চুপড়ি হাতে মাণিকের প্রবেশ।)

বিনোদ। Hallo, ওতে কি ?

মাণিক। আপনার চিত্ত-চিন্তামণি সাধনের ধন—Great grandfather of কই dynasty. দেখাতে পারলুম না—এক একটি আদ হাতের ওপর ছিল।

বিনোদ। (দমে গিয়ে) ছিল যে past tesne হে,—দেখাতে পারলুম না মানে ? গেলো কোথায় ?

মাণিক। (চুপড়ির চাপা খুলে) এই যে দেখুন না, একেবারে বৈষ্ণবী অস্ত্রে বানিয়ে অর্থাৎ কাটিয়ে কুটিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে এনেছি। আমরা ও বাঘা কই বাগাতে পারতুম না হুজুর।

বিনোদ। Bravo মাণিকলাল, আমি ভেবে মরছিলুম, আমাদের সম্বল তো ওই ডগা ভাঙা স্প্যাচুলাখানা।

মাণিক। রামো, ও লম্বুয়ে fish skinnish ছাড়া প্রাণ দেয় না। কায়দা করতে তিন রকম অস্ত্র দরকার হয়েছে।

বিনোদ। (উৎফুল্ল মুখে) You a spotless মাণিক, genuine jewel তারপর ?

মাণিক। সে হচ্ছে। আগে একটা ধরাণ দিকি।

(পকেট থেকে Gold Flakeএর একটা আভাঙা টিন্ বার করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিলে)

বিনোদ। এ কি, একদম Gold Flake যে! কোথায় পেলে ?

মাণিক। স্বর্ণকারের গদিতেই gold জন্মায়, আর আমাদের ভূমিষ্ঠ হন মেয়ে। তারাই gold দেখায়, অবশ্য বাড়ি বাঁধা দিয়ে সেটা দেখতে হয়।

বিনোদ। আর বলতে হবে না মাণিক—বিড়ি ছেড়ে Gold Flake সইবে তো!

মাণিক। থাক ও অলুক্ষুণে কথা। Gold এখন আমেরিকায় পাঁচ সিকেয় sold হচ্ছে। তারা সোনার কুড়ুল বানাচ্ছে—যুদ্ধের জড় মারবে। চালান্—খুব সইবে।

বিনোদ। এই যে, সব খবর রাখো দেখছি। হবে না! আমাদের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি স্বর্ণচন্দ্র I mean হেমচন্দ্র বলে গেছেন—

"......................নব অভ্যুদয়

পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়।"

মাণিক। আচ্ছা, আপনি এখন একটা 'হাসিতে হাসিতে' ধরাণ তো দেখি, আমার চক্ষু জুড়ুক। আপনাকে যে ও মর্য্যাদা হানিকর বিড়ি টানতে আর দেখতে পারি না স্যার! দিন ওগুলো ফেলেদি।

মাণিক বিড়িগুলো নিয়ে নিজের পকেটে—"চুলোয় যাক্" বলে ফেলে দিলে। বল্লে, caseটা আপনি আজ যে ভাবে conduct করলেন তাতে বড় বড় রক্তবীজ ভক্ত বনে যায়—গেছেও। ভেবেছিলুম কড়া সুর ভাঁজবেন, কিন্তু যা ভাজলেন তা বৈষ্ণব বিনয়কে হটিয়ে দিয়েছে। আমার চোখে জল এসেছিল মশাই।"

"ওহে কাজ নিতে হলে পূরবীই ব্যবস্থা। দীপকে দিল্ বিগড়ে দেওয়া হয়। তাতে শেষরক্ষা হয় না। সে ট্যাকসই হয় না।"

মাণিক পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে—"খুব কাজ হয়েছে মশাই—এই নিন (একতাড়া নোট) এটা advance, হপ্তায় হপ্তায় আসবে। বল্লে, "দেবতাকে তো ঘুষ দিতে পারব না। এখন থেকে সের করা সামান্য যেটা বাড়ানো হবে সেটা আমার নয়, দেবতার পূজোর জন্যে রইলো।" বললুম, "খবরদার এমন কথা তাঁর কানে না পৌঁছয়। তিনি ছোঁবেন না, সব বিগড়ে যাবে। মানুষ দেখলে তো, অদ্বৈতবংশ। মাইনে বাদ যদি কিছু অজ্ঞাতে এসে পড়ে—দেখেছি কিনা—নবদ্বীপে মোচ্ছবে পাঠিয়ে দেন। ওসব হবে না, করতে যেও না।"

শুনে যুধিষ্ঠির বল্লে, যাঁর ধর্ম্মে গড়া দেহ তিনি অন্যের ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারেন না। আমারো তো ছিটে ফোঁটা থাকতে পারে। আমাকে পতিত করবেন কেনো। আমার দেবতার জন্যে দেওয়া, দেবতা যা ইচ্ছা করতে পারেন। নবদ্বীপে মচ্ছবেই দিন বা বিন্দাবনের কচ্ছপকেই খাওয়ান।" —এর ওপর আমি আর কথা কইতে পারিনি ডাক্তারবাবু।"

বিনোদ। তুমি ঠিক করেছ। কারো ধর্ম্মে বা কোনো ধার্ম্মিকের প্রাণে আঘাত দিতে নেই। শোনোনি, বড় বড় মাতব্বররা এই বিপদে পড়ে কি দুর্ভাবনাই না ভোগ করছেন। লোকে ছাড়ে না, শেষ জ্বালাতন হয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজেদের শিক্ষিত মণ্ডলীর সম্মতিক্রমে ওই sloganই মঞ্জুর করে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। "যদি না দিয়ে ছাড়বে না তো গোপনে ধর্ম্মার্থে দাও, ধর্ম্ম ঢাক বাজিয়ে করতে নেই—শাস্ত্রে কোরাণে নিষেধ ইত্যাদি—যুধিষ্ঠির না কি নাম বললে, নিশ্চয়ই সে সাধুসঙ্ঘের সভ্য বা agent হবে। ওরা চারদিক ঘিরে ছড়িয়ে আছে। লোকের ধর্ম্মেকর্ম্মে সাহায্য করছে। টাকা আর যাবে কোথা, জগতের মাল জগতেই থাকবে। সকলেই তো ভাই কেউ না কেউ ভোগ করবে। কি high sloganই বেরিরে পড়েছে। শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি এসে গেছে।—আমাদের বিষ্ণু শর্ম্মার মাথায় ঢোকেনি—কলা তাঁরাও যথেষ্ট খেতেন কিন্তু স্কলার হতে পারেন নি—

এখন আমাদের যে বিপদে ফেললে মাণিক, I mean বন্দী করলে! ওকে আশ্রয় দেব কোথায়। বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে যে। লেপের মধ্যে চেপে শুলে safeএ থাকবে না কি।"

মাণিক—"না মশাই, ও মেয়েলি ফন্দি পচে গেছে—কাজ দেবে না। লাভে হতে এই শীতে ওস্তাদেরা লেপগুলো ছিঁড়ে ছড়িয়ে রেখে যাবে। দিন রাত তো আর চেপে শুয়ে কাটাবার জন্যে আসা নয়!"

"তাও তো বটে,—উপায়?"

"চলুন,—খাকি plus খাকির অন্তর দেওয়া দুটো হাফ্ প্যান্টের অর্ডার দিয়ে আসা যাক্। শীতটাও চেপে পড়েছে, কেউ সন্দেহ করবে না।"

বিনোদ। very wise suggestion কিন্তু মালের প্রবেশ পথ চাই তো?"

"সে বাড়িতে বসে বানিয়ে নেব।"

"Splendid—কোনো শিক্ষাই যে বাকি নেই? কিন্তু কত দিক সামলাবে? কই আছেন, হুলো আছেন, চুলো আছেন"—

"আপনার আশীর্ব্বাদে সে আমি সামলাতে পারব। আপনি কেবল"—

"বুঝেছি, মিলিটারি টেলারের সঙ্গে আলাপও আছে। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি, আজই চাই।" দু'পা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে—"ঝোল আর ঝাল দিয়ে—বুঝলে।" বেরিয়ে গেলেন।

মাণিক—পাকে মন দিলে। (ক্রমশঃ)

আধি-দৈবিক

'চন্দ্রহাস'

পুলিনবিহারী পালের নাম অল্প লোকেই জানে। অথচ তাঁহার মত প্রগাঢ় পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পুরুষ বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। দেশী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব তাঁহার এত ছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের নামের পিছনে ময়ূরপুচ্ছ রচনা করিতে পারিতেন। জ্ঞানমার্গের পাকা সড়কের কথা ছাড়িয়া দিই, সমস্ত গলিঘুঁজির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; অতিবড় গূঢ় বিদ্যার আলোচনা করিয়াও কেহ তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। কেবল একটি বিদ্যা তাঁহার ছিল না—ঘানিযন্ত্র হইতে কি করিয়া তৈল বাহির করিতে হয় তাহা তিনি শিখিতে পারেন নাই। এই জন্যই বোধ করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার খোঁজ রাখে না।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল; ভক্তিভরে তাঁহাকে পুলিনদা বলিয়া ডাকিতাম। বিপদে আপদে অর্থাৎ বিদ্যাঘটিত কোনও সঙ্কটে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতাম। কখনও নিরাশ করেন নাই, তাঁহার ভাস্বর বুদ্ধির প্রভায় মনের সমস্ত সংশয় ঘুচাইয়া দিয়াছেন। মানুষ হিসাবে তাঁহাকে হয়তো সহজ ও স্বাভাবিক বলা যায় না, সাধারণে তাঁহাকে খামখেয়ালী বলিবে। কিন্তু এমন পরিপূর্ণ রূপে আত্মস্থ, একান্তভাবে নিরভিমান মানুষ আর দেখি নাই। বিবাহাদি করেন নাই; পয়সার পিছনে দৌড়িবার মত মানসিক দীনতা যেমন তাঁহার ছিল না, পয়সার প্রয়োজনও তেমনি খুব কম ছিল। উচ্চ অঙ্গের দুই একটা ইংরেজী ও মার্কিন পত্রিকাতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু কিছু টাকা পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার অনাড়ম্বর একক জীবন চলিয়া যাইত।

বছর দুই পুলিনদাকে দেখি নাই; মাঝে মাঝে ডুব মারা তাঁহার অভ্যাস। একদিন খবর পাইলাম, তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বজবজ লাইনের একটি জনপদে বাস করিতেছেন এবং একাগ্রচিত্তে বাংলা ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করিতেছেন। বিস্মিত হইলাম না, কারণ অকস্মাৎ ডুব মারিয়া অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত স্থানে আবির্ভূত হওয়া পুলিনদার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য।

একদিন বৈকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। অনেকদিন তাঁহাকে দেখি নাই সেজন্যও বটে, তা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। কয়েক মাস হইতে একটা আধ্যাত্মিক সংশয় আমার মনকে পীড়া দিতেছিল; বোধ করি ত্রিশের কোঠা পার হইলে সকলেরই এইরূপ হয়। আধ্যাত্মিক সংশয়টি আর কিছুই নয়, সেই আদিম সংশয়—জন্মান্তর আছে কিনা, মরিবার পর আত্মা থাকে কিনা, ভূতপ্রেত আছে কিনা। প্রাচীন মুনি ঋষি অবতারগণের সহিত আধুনিক মুনি ঋষি ও চিন্তাবীরগণের এ বিষয়ে এত অধিক মতদ্বৈধ, যে মনটা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল। খাঁচায় ধরা পড়া ইঁদুরের মত আমার বুদ্ধি একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল কিন্তু কোনও দিকেই পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এইরূপ মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পুলিনদার খবর পাইয়া ভাবিলাম তাঁহার কাছেই যাই, এ সমস্যার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সন্তোষজনক সমাধান যদি কেহ দিতে পারে তো সে পুলিনদা।

তাঁহার আস্তানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ছোট ষ্টেশনের নিকটে প্রকাণ্ড এক তামাকের গুদামে তিনি বাস করিতেছেন। দ্বিতল বাড়ীর উপর তলায় তামাকের পাতার বস্তা ঠাসা আছে, নীচের তলায় দুটি ঘর লইয়া পুলিনদা থাকেন। উপর তলার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, অধিকাংশ সময়ই উপর তলাটা বন্ধ থাকে।

এই দুই বৎসরে পুলিনদার বয়স যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মাথাটি স্বভাবতই ডিম্বাকৃতি; লক্ষ্য করিলাম, ডিম্বের উপর হইতে চুল ঝরিয়া গিয়া শীর্ষস্থানটি বেশ চকচকে হইয়াছে; নাকের উপর একযোড়া চালশে'র চশমা বসিয়াছে। কিন্তু স্বভাব বিন্দুমাত্র বদলায় নাই; তেমনি মেঝেয় মাদুর পাতিয়া চারিদিকে পুঁথি কাগজপত্র ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চশমার উপর দিয়া দেখিয়া সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, 'এই যে এসেছ।' এবং এক টিপ নস্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সুরু করিয়া দিলেন।

বলিলেন,—'ভাখো, বাংলা ভাষাটা দিন দিন বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে—আর সে তেজ নেই, ধমক নেই, বড় বেশী বিনয়ী বড়বেশী মিহি হয়ে যাচ্ছে। ঐ যে আমাদের সাহিত্যে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি ঢুকেছিল এটা তারই ফল। এমন দিন ছিল যখন বাঙালী রেগে গেলে দু'চারটে গরম গরম কথা বলতে পারত, শব্দের তাল ঠুকে বাহবা স্ফোট করতে পারত; কিন্তু এখন বাঙালীকে জুতো পেটা করলেও তার মুখ দিয়ে গোঙানি আর কাৎরানি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ বেরুবে না। বেরুবে কোত্থেকে? ভাষায় সে হুঙ্কার, শব্দের সে দাপট থাকলে তো! বাঙালী জাতটাও তাই দিন দিন মিইয়ে যাচ্ছে মেদিয়ে যাচ্ছে। বাঙালীকে আবার চাঙ্গা করে

তুলতে হলে নতুন নতুন জোরালো শব্দ আমদানি করতে হবে—সংস্কৃত ইংরিজি ফারসী পুস্তকে যেখানে যত জবরদস্ত শব্দ আছে সব বাংলা ভাষার পেটের মধ্যে পুরে দিয়ে তাদের হজম করাতে হবে। ছাখো, বাংলা ভাষাটা অপভ্রংশের ভাষা। অপভ্রংশের দোষ এই যে সে শব্দকে মোলায়েম ক'রে ফেলে, সহজ ক'রে ফেলে। ও আর চলবে না। এখন থেকে ইয়া বড় বড় গোব্দা গোব্দা মৌলিক শব্দ ব্যবহার কর। নৈলে নিস্তার নেই।'

আমি ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম—'কিন্তু ক্রমাগত সাধু ভাষায় কথা বলা—'

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি পুঙ্গব।'

চমকিয়া বলিলাম—'সে কি?'

তিনি বলিলেন—'মানে ষাঁড়। আমার কথাটা ভাল করে বোঝো—'

অতঃপর দুই ঘণ্টা ধরিয়া বঙ্গবাণীর শিরাধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চারের প্রসঙ্গ চলিল; বাংলা ভাষা তথা বাঙালার যে নিদানকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং অচিরাৎ নাদব্রহ্মরূপী বিষ-বটিকা প্রয়োগ না করিলে রোগীর কোনও আশাই নাই একথা পুলিন্দা অত্যন্ত মজবুত ভাবে প্রমাণ করিয়া দিলেন। উদ্বিগ্নভাবে শ্রবণ করিলাম। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্নটি ভুলি নাই; তাই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি যখন আলো জ্বালিতে উঠিলেন, তখন আমি তাক্ বুঝিয়া আমার আধ্যাত্মিক সমস্যাটি পেশ করিয়া দিলাম।

পুলিন্দা আলো জ্বালিয়া আবার মাদুরে আসিয়া বসিলেন; নাকের মধ্যে ডবল টিপ নস্য গুঁজিয়া দিয়া সজলনেত্রে বলিলেন,—ভূত প্রেত আত্মা পরমাত্মা পরলোক জন্মান্তর অসিদ্ধ—কারণ প্রমাণাভাব।

এইভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া পুলিন্দা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন; ক্রমে প্রসঙ্গ জমিয়া উঠিল; আমিও মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সমস্ত যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ করিবার স্থান নাই; কিন্তু যুক্তির ধাপে ধাপে প্রমাণের সোপান রচনা করিয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধিকে যে স্থানে লইয়া উপনীত করিলেন সেখানে ভূতপ্রেত নাই জন্মান্তরও নাই। দেখা গেল আসলে ওগুলি বাসনা প্রণোদিত অলীক ভাবনা—**wishful thinking**! চার্ব্বাক হইতে বাট্রাণ্ড রাসেল পর্য্যন্ত সমস্ত মনীষীর উক্তি তাঁহার যুক্তিকে সমর্থন করিল—শরীরই সর্ব্বস্ব, মন বুদ্ধি-আত্মা সমস্তই দেহের বিকার মাত্র, সুতরাং শরীর নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?

রাত্রি অনেক হইয়া গেলেও আলোচনার শেষে মনে বেশ শান্তি অনুভব করিলাম; যাহোক তবু পাকা রকম একটা কিছু পাওয়া গেল। আত্মার দেহবিমুক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি নাই থাকে তবে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল। দু'নৌকায় পা দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার কোনও মানে হয় না।

আর একদিন আসিব বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি হঠাৎ মাথার উপর ভীষণ দুমদাম্ শব্দে চমকিয়া উঠিলাম; যেন উপরের গুদাম ঘরে অনেকগুলা পালোয়ান যৌথভাবে মল্লযুদ্ধ সুরু করিয়া দিয়াছে। উপরে কেহ থাকে না শুনিয়াছিলাম, তামাক পাতার আড়তে মানুষের থাকা সম্ভবও নয়; তবে এত রাত্রে কাহারা বন্ধ ঘরের মধ্যে এমন দুর্দ্দান্ত দুরন্তপনা আরম্ভ করিয়া দিল?

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম—'ও কী?'

পুলিন্দা নিশ্চিন্তভাবে নাকের চশমা খাপে পুরিতে পুরিতে বলিলেন—'ও কিছু নয়। এগারোটা বেজেছে তো! রোজ রাত্রে ঐ রকম হয়। ওপরে কয়েকটা ভূত আছে, তারাই এমন সময় দাপাদাপি করে।'

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। উপরে দাপাদাপি চলিতে লাগিল। বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উপরের ঘরে সত্যই যদি ভূতের পাল কুস্তি লড়িতেছে তবে এতক্ষণ ধরিয়া কী শুনিলাম?

পুলিন্দা বলিলেন—'ভয়ের কিছু নেই, ওরা কোনও অনিষ্ট করে না। দশ মিনিট পরে সব চুপচাপ হয়ে যাবে।'

আমি বলিয়া উঠিলাম,—'পুলিন্দা! সত্যিই ওরা ভূত? আপনি বিশ্বাস করেন?'

তিনি বলিলেন—'হাঁ, আমি খুব ভাল করে অনুসন্ধান করেছি, জ্যান্ত জীব হতে পারে না। ইঁদুর বেড়াল তামাকের ধার ঘেঁষে যাবে না, আর মানুষও নয়! সুতরাং ভূতই বটে।'

'কিন্তু—কিন্তু—এতক্ষণ ধরে এই যে আপনি প্রমাণ করলেন—'

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি ইন্দম—মানে হাঁদা। প্রমাণের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি? ভূত আছে এটা ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রমাণ করা যায় না, তাই ব'লে বিশ্বাস করব না? ঐ যারা ওপরে হুটোপাটি করছে ওরা কি প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে? জেনে রাখো, বুদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, রাত হয়েছে, আজ এস তাহলে—'

উপরে ভূতের নৃত্য চলিতে লাগিল। আমি চলিয়া আসিলাম।



'ডি-হাইড্রেসন'

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

আধুনিক যুদ্ধ সেরা বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। ধ্বংসলীলার তাণ্ডবনৃত্যের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক অতি উচ্চস্তরের সুর বাজাইতেছেন। বিজ্ঞানে কল্পনাতীত উন্নতি দৃষ্টে মানুষ বিস্ময়ে পুলকে নির্ব্বাক প্রায়! এই যে প্রচণ্ড গবেষণার ঢেউ উঠিয়াছে তাহার পেছনে আছেন রাসায়নিক, পদার্থবিদ্, ইন্‌জিনিয়ার প্রভৃতি ধুরন্ধরগণ। এস্থলে রসায়নে একটি দান সম্বন্ধে আমি সামান্য আলোচনা করিব।

বহুপূর্ব্ব হইতেই অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে এমন দিন আসবে যেদিন মানুষ একটি সামান্য বড়ি গলাধঃকরণ করিয়াই একদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিবে। সেদিন যেন খুবই নিকটবর্ত্তী। যুদ্ধক্ষেত্রে আহার্য্য সরবরাহ ব্যাপারে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে বিজ্ঞানীর বুদ্ধি এদিকে ধাবিত হয়। অল্প বাহনের সাহায্যে প্রচুর খাদ্য চলাচলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা ইহাই উঁহাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়। জার্ম্মেনীর ইউ-বোট আমেরিকার শত শত জাহাজ সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করার ফলে এ ভাবনা আমেরিকাবাসীকে বিশেষ করিয়া চিন্তিত করিয়া তুলে। এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে যাইয়া মার্কিন রাসায়নিক প্রথমেই জল-নিষ্কাশন দ্বারা উদ্ভিজ খাদ্যের অবয়ব ছোট করিতে চেষ্টা পান। উক্ত প্রণালীতে আলুকে অতি ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখা গিয়াছে, ঐ আলুর খাদ্যগুণের কোন অবনতি হয় নাই স্থায়িত্বের দিক দিয়া বরং উন্নতি হইয়াছে। এইরূপ তৈয়ারী আলুকে উঁহারা ডিহাইড্রেটেড্ (Dehydrated) পটাটু বলে। ডিহাইড্রেটেড, অর্থাৎ জলমুক্ত কফি, টমেটো, সুপ্, মাংস, ডিম ইত্যাদি বহু খাদ্যদ্রব্য টেবলেট বা চাকতির আকার পাইয়া মিত্রপক্ষের যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুনা যায়, ১৯৪৩ সনের ১৭ই মার্চ্চ যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ ষ্টেটিনাস, ওয়াসিংটনে একটি ভোজসভা আহ্বান করেন। মিত্রপক্ষের ৮০০ বিশিষ্ট ব্যক্তি সে ভোজে উপস্থিত ছিলেন এবং ভোজ্য দ্রব্য ছিল সবই ডিহাইড্রেটেড খাদ্য। যাঁহারা ভোজসভায় যোগ দিয়াছিলেন সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আমেরিকার ফেডারেল গবর্ণমেন্টগুলি ১৯৪২ সনে ১২০টী ডিহাইড্রেটেড খাদ্যকারখানা খুলিয়াছে এবং ঐ সনে ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড খাদ্য সরবরাহ করিয়াছে। ১৯৪৩ সনে কারখানার সংখ্যা ৮০০তে দাঁড়াইয়াছে এবং প্রস্তুতের পরিমাণ ৮০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ১০—৯০ ভাগ জল থাকে। ঐ জলভাগ হইতে উঁহাদের মুক্ত করিতে পারিলে হাজার হাজার টনের স্থান জাহাজের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৩ সনে দেখা গিয়াছিল যে শতকরা ৪০ ভাগ জাহাজের স্থান খাদ্যের দ্বারা ভর্ত্তি থাকিত, কাজেই অন্যান্য জিনিষের স্থান ইচ্ছামত পাওয়া যাইত না। খাদ্যের স্থান সঙ্কুচিত বলিয়া যুদ্ধের মাল মসলা ও সৈন্যসংখ্যা বেশী পাঠাইবার সুবিধা করার জন্য ডিহাইড্রেসন একটা বড় অবলম্বন।

যুক্তপ্রদেশের আর্মি কোয়ার্টার মাষ্টার কোর (Army Quarter Master Corp)এর লক্ষ্য এদিকে ধাবিত হইলে তাহারা প্রধান প্রধান চাপ উৎপাদক কোম্পানীগুলিকে সাহায্য করিতে আহ্বান করেন। দেখা গেল সকল চাপযন্ত্র সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেখানে যেটা দরকার সেখানে সেটাকে নিয়োগ করা হইল। আবার নূতন নূতন রসনিষ্কাশন যন্ত্র তৈয়ারী হইতে লাগিল। Army Quarter Master Corpএর তত্ত্বাবধানে যাবতীয় খাদ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত হইল, কোন্ খাদ্য শুষ্ক করা যায় নির্দ্ধারিত হইলে তাহারা যথাস্থানে প্রেরিত হইল—ফলে ভারে ভারে তৈয়ারী মাল উঁহাদের হাতে আসিতে লাগিল। খাদ্যসমষ্টিকে মোটামোটি দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১। চূর্ণ খাদ্য—যেমন চূর্ণ দুগ্ধ, চূর্ণ ডিম, চূর্ণ সুপ, শাকসব্জি ইত্যাদি। ২। টুকরা খাদ্য—যেমন শাকসব্জি, ফল, মাংস ইত্যাদি। ১৯৪৩ সনের মার্চ্চের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ কার্য্য তালিকা ঠিক হইয়া যায়, কিন্তু সমস্ত বিষয়েই গবেষণাগারে প্রথমতঃ ক্ষুদ্রাকৃতিতে পর্য্যালোচনা হয়।

আমেরিকাতে সর্ব্বপ্রথম যাহার মাথায় এ বিষয়টা আবির্ভূত হয় তাঁহার নাম ডোনেলী (Donnelly)। তাঁহার মতে তিনটী প্রধান ব্যবস্থার উপর জল নিষ্কাশন নির্ভর করে। ইহারা তাপ, চাপ এবং সময়। কতকগুলি খাদ্য হইতে জল দূরীকরণে তাপের প্রয়োজন হয়, কতকগুলি আবার ঠাণ্ডায় সুবিধা হয়। দেখা গিয়াছে, প্রত্যেকটী খাদ্যবস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গবেষণার বিষয়। চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েক শত পাউণ্ড হইতে কয়েক টন, পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। কোন কোন খাদ্যপ্রস্তুতে সময় বেশী লাগে, কোন কোন ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ে কাজ সমাধা হয়। মিঃ ডোনেলী বলেন যে কেবলমাত্র আয়তন খর্ব্ব করিলেই কাজ সম্পূর্ণ হয় না, দেখা দরকার যে প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যটী অখাদ্যে পরিণত না হয়। ইহা তৃপ্তিকর ও হজমী হওয়া দরকার। যাহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের গবেষণা দিনের পর দিন চলিয়াছে। প্রত্যেকটী বস্তুর জন্য নূতন নূতন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হইতেছে। জল, বায়ু উভয়ই নিষ্কাশন প্রয়োজন।

ডোনেলীর কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনার বিষয়। তিনি ১৯৩৬ সনে এ ব্যাপারে লিপ্ত হন। প্রথমতঃ তাঁহার কাজ ছিল খাদ্যসামগ্রী প্যাক্ করা। তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রত্যেক জিনিষের প্যাকিংএ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দরকার। একপ্রকার মাখন প্যাক করিতে যাহাতে তৈলটী ঠিক্ থাকে তাহা দেখিতে হয়, চূর্ণ দুগ্ধ প্যাক করিতে জলীয় বাষ্প হইতে এইটাকে রক্ষা করিতে হইবে। চূর্ণ কফিকে প্যাক্ করিতে

যাইয়া তাহার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। প্যাকেটটা শেষ হওয়া মাত্র ইহা ভীষণ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। প্রায় ১০ বৎসর ইহার পেছনে পরিশ্রম করিয়া তিনি ইহাকে আয়ত্তে আনেন। প্যাকিং ব্যাপার হইতে ক্রমে তিনি জল বায়ু নিষ্কাশনে মনোনিবেশ করেন। এজন্য অবসর সময়ে তাঁহাকে রীতিমত পড়াশুনা করিতে হইত। নিউ ইয়র্কের (New york) পাব্লিক লাইব্রেরীতে তাঁহাকে প্রায়ই নিমগ্ন দেখা যাইত। ১৯৩৫-১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত পাউণ্ডের পর পাউণ্ড কফি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার রচিত ১ পাউণ্ড চূর্ণ কফি প্রায় ১০ পেয়ালা অতিরিক্ত কফি তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে, ডোনালী এই ক্ষুদ্র প্যাকেটটী নিয়া প্রথমে নিউইয়র্কের একটি দোকানে যান, কিন্তু দোকানদার ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কারণ তাহার মতে মেয়েরা ইহা পছন্দ করিবে না। তখন তিনি তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি জমান খাদ্য রক্ষণ ষ্টোরে ইহা প্রেরণ করেন এবং দোকানের সম্মুখে একটি বোর্ডে "টাট্‌কা জমান কফি" বলিয়া লিখিয়া রাখেন। প্রথম দিন ১ পাউণ্ড বিক্রয় হয়, দ্বিতীয় দিনে ৫ পাউণ্ড, তৎপর রোজ ১০ পাউণ্ড করিয়া বিক্রয় হইতে থাকে। গ্রাহকগণ অতি আগ্রহের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ ইহা কিনিতে লাগিলেন, সঙ্গে বহু প্রশংসা পত্র আসিয়া জুটিল। একজন মহিলা ১ পাউণ্ড দ্বারা ৮০ পেয়ালা তৈয়ার করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। ইহাই হইল ডোনেলীর সর্ব্বপ্রথম প্রেরণা। ইহার পরে মিসেস্ ডোনেলীর জনৈক বন্ধু তাঁহাকে অন্যান্য ডি-হাইড্রেটেড খাদ্য তৈয়ার করিতে উৎসাহিত করিলেন। ডোনেলীর মনে ডিহাইড্রেসন ব্যাপারে এরূপ ঝোঁক চাপিয়া গেল যে তিনি অন্যান্য সমস্ত কাজ ফেলিয়া দিবারাত্রি ইহাতেই ডুবিয়া থাকিতেন। সকলেই দেখিত ডোনেলী হয় গবেষণাগারে নতুবা লাইব্রেরীতে। নিজের তৈয়ারী জিনিষ স্বামীস্ত্রীতে আস্বাদ করিতেন। ডোনেলী বলিতেন ঠিক্ হইয়াছে, স্ত্রী 'না' বলিয়া ফেরত পাঠাইতেন, ডোনেলীর কাজ বাড়িয়া যাইত। ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি জানিতে পারিলেন যে Auto ordinance Company, Wall street, New York, এ সমস্ত ব্যাপারের জন্য একটি গবেষণাগার খুলিবে। প্রায় ৪ মাস তিনি উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তাদের পেছন পেছন ছুটিলেন। অবশেষে তাঁহাদের সঙ্গে সর্ত্তে বদ্ধ হইয়া নিজের ইচ্ছামত লেবরেটরী খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অধীনে ১০ জন বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত হইল—ইহাদের মধ্যে রাসায়নিক, পদার্থবিদ্, জীবাণুবিদ্, ইন্‌জিনিয়ার ইত্যাদিও ছিলেন। কোম্পানী এদিকে সেলোফেন নামক অতি সুন্দর আবরণ-দ্বারা খাদ্য প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ডোনেলী জীবনে সফলকাম হইলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ধরিয়া আমেরিকাবাসী পৃথিবীর খাদ্য-বাজারে যুগান্তর সৃষ্টি করিবে।

ডিহাইড্রেসন দ্বারা আকার সঙ্কোচন কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে। গাজর—শতকরা ৬৫ ভাগ, বিট—শতকরা ৬৫ ভাগ, কফি—শতকরা ৮২ ভাগ, পিঁয়াজ—শতকরা ৬৫ ভাগ, মিষ্ট আলু শতকরা৬০ ভাগ, ডিম শতকরা ১৪ ভাগ, ইত্যাদি। বিষয়টীতে আমেরিকার টেক্সদাতাদের আর্থিক সুবিধা কতটুকু হইতে পারে তাহারও মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে নিম্নলিখিত সুবিধা দেখা যায়। পাত্র—৩৪৮৪০০ ডলার, শ্রমিক…১৩,৩০০ ডলার, দেশের মধ্যে যাতায়াত খরচ…৪২,৫০০ ডলার, সমুদ্রে যাতায়াত খরচ…২,৩১০,০০ ডলার ও ষ্টোরেজ (storage)—৩৯,৩০০ ডলার।

ক্ষুদ্রাকারে ডিহাইড্রেসন আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু তাহার এত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। শুঠী—শুষ্ক পাটপাতা, আম্‌সি, আমসত্ত্ব, শুঁট্‌কী মৎস্য ইত্যাদি এদেশের বহুপ্রচলিত জিনিষ। বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় পরিপুষ্ট হইলে উহারা কত সুন্দর ও মনোজ্ঞ হয় তাহার প্রমাণ এই রাসায়নিক নব অবদান। শুনিতেছি আমাদের দেশের দুই একজন বড় বৈজ্ঞানিক ডিহাইড্রেসনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য যুক্তরাজ্যে গিয়াছিলেন। আশাকরি আমাদের পুরাতন পাটপাতা এবার নূতন রূপ ধারণ করিবে।

সেই অলস-ধোঁয়া

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সেই নির্জ্জীব অলস ধোঁয়া…পল্লীর কোলে-কোলে যাহা জন্মায়…যাহা হইতে আগুন জ্বলিয়া ওঠে নাই কোনো দিন…যাহা রাত্রের আকাশে ধীরে ধীরে বিসর্পিত হইয়া তার আলো-বাতাসকে চিরদিন রুদ্ধ করিয়া তোলে। আজও সেই ধোঁয়া তার আকাশে জমাট বাঁধিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় জমিদারবাবুর কাছারীর বৈঠকে নায়েব মধুসূদন জোয়ার্দ্দার রায় দিলেন—পাঁচ টাকা জরিমানা·· আর কাল সকালে দিতে না পারিলে পেয়াদার লাঠি। হরিচরণ মালো তার অপরাধ খুঁজিয়া পাইতেছে না…সে ভাবিতেছে এই দিদিমণিকে সে কত কোলে-পিঠে

করিয়াছে…তার কপাল মন্দ যে তারই বিবাহে সে মাছের জোগাড় করিতে পারিল না, বিল খাল যে সবই শুকাইয়া উঠিয়াছে। সে যে মাছ দিতে পারে নাই তা' নয়…তবে দিবার কথা ছিল প্রায় তিন মণ…এতো পোনা মাছ যে সে এ তল্লাটে খুঁজিয়া পায় নাই।

জরিমানার টাকা হরিচরণ জোগাড় করিতে পারিল না। পরের দিন দুপুরেই গরীবদের পাড়ায় জমিদার বাড়ির পেয়াদাদের হুঙ্কার…হরিচরণের পিঠের চামড়ার ঘনত্ব তাদের লাঠির আঘাতে চৌচির…সে গোঙাইতেছে… বৃদ্ধা মঙ্গলা বেড়ার চিৎকার পাড়া কাঁপাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে।…পশ্চিমারদল রণে শেষে ভঙ্গ দিল। মঙ্গলা চিৎকার করিতে করিতে আসিতেছে—জমিদারের পোষা গুণ্ডারা মেরে ফেললে মালো ছেলেটাকে…কোথাও কি কেউ নেই? মঙ্গলার কাতর ধ্বনি পাড়ার জমাট বাধা নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিতে পারিতেছে না…ঘরে ঘরে সে শব্দ কিন্তু আঘাত করিল…কে জানে এ আঘাতের প্রতিঘাত হইবে কি-না?

হরিচরণ, তার স্ত্রী ও শিশুসন্তান আজ তিন দিন উপবাসী…ভয়ে কেহ তাদের একটা পোড়া মুড়ি দিয়াও সাহায্য করিতে পারিতেছে না। গরীবের দল গুমরাইয়া মরিতেছে।

হরিচরণের স্ত্রী পেটের দায়ে মরিয়া হইয়া বাহির হইয়াছে।…তার কোলে শিশু…মাথায় ঝুড়ি।…সোমত্ত স্ত্রীলোক ছেঁড়া শত গিঁটবাধা খাটো কাপড়খানিতে লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না।…মাঠে ঘুঁটে কুড়াইতে বাহির হইয়াছে…তাহা বেচিয়া চাল আনিয়া সে রাঁধিবে। …নহিলে সবাই যে মারা যায়।

বৃদ্ধ মনোহর সাঁই দাওয়ায় বসিয়া কাশিতেছিল…সে হাঁপের রোগী…সকালে তামাক টানিতে বসিলেই একটা দমকা কাশি আসে। মালোদের সোমত্ত বৌটিকে এমন ভাবে দৌড়িতে দেখিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল… পারিল না।…কাশির আবেগে হাত কাঁপিয়া কলিকাটা হুঁকা হইতে পড়িয়া গেল তার তাঁতের সুটিগুলার উপর। রমনা বেনে মুদিখানার দোকান হইতে মুচকি হাসিয়া উঁকি মারিল…একটা রসের টপ্পা গানের এক কলি গাহিয়া উঠিল। হরিচরণের স্ত্রী লজ্জায় চোখ ঢাকিয়া দ্রুত পলাইল মাঠের দিকে। মাঠের মাঝে মিঠে-পুকুরের বাগানে জমিদারের মেয়ে ও নূতন জামাই বেড়াইতেছিল। হরিচরণের স্ত্রীকে দেখিয়া মেয়েটি চিৎকার করিয়া ডাকিল—মালো বৌ…মালো বৌ…আয় না…আমরা পিকনিক করছি… খেয়ে যা' না। এইভাবে সম্মুখে বাধা পাইয়া হরিচরণের স্ত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল…পুনরায় দৌড়িল। · এবার দৌড়াইতেছে যে বাড়ির দিকে তাহা যেন সে বুঝিতে পারিতেছে না…সে দৌড়াইতেছে সামনে ধাক্কা খাইয়া বিপরীত পথে। তৃতীয় প্রহর…বৃদ্ধ রতন বেড়া লাঙলখানি কাঁধ হইতে নামাইয়াছে · তার স্ত্রী মঙ্গলা, স্বামীকে স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটিটি আগাইয়া দিতেছিল · হরিচরণের স্ত্রীকে সামনে দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া মঙ্গলা ডাকিল—কালিদাসী… কালিদাসী এদিকে আয়। হরিচরণের স্ত্রী কালিদাসী থমকিয়া দাঁড়াইল…সে আবার ছুটিবার উদ্যম করিতেছিল। …মঙ্গলা দৌড়াইয়া গিয়া তাহার নড়া চাপিয়া ধরিল বলিল—আয় বলছি নিয়ে যা…নিয়ে যা কাঁসিশুদ্ধ আমাদের ভাত ক'টা…তা'তে ফাঁসী-শূলী হয় হবে এই মঙ্গলা বেড়ার!

মঙ্গলার দুঃসাহসে গরীব শূদ্রের দল চমকিয়া উঠিল। · কে জানে এই চমকে বিদ্যুৎ আছে কি-না…অপমানের জমাট বাধা ধোঁয়ার বুক বাহিয়া অগ্নিপ্রবাহ দেখা দিবে কি-না? এই ফাটলধরা সমাজের মাথায় সে বজ্র হানিবে কি-না? · আর তার দহনে এই সব মুখোসধারী-ভীরু-পা-চাটার দল পুড়িয়া ছারখার হইবে কি-না? আর সেই আগুন ও রক্তে স্নান করিয়া আত্মসম্ভ্রমশীল নতুন মানুষের দল জাগিয়া উঠিবে কি-না?



উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বাহিয়া চলে বৃহত্তর পৃথিবীর বর্তনশীল দিনগুলি। তারপরে শোনা গেল বোমা পড়িয়াছে রেঙ্গুনে। তারপর একদিন চট্টগ্রামের আলো নিভিল। অজানা আশংকা এবং ভবিষ্যতের একটা অনিবার্য মৃত্যু তরঙ্গ যেন দিকে দিগন্তে তাহার সুনিশ্চিত আবির্ভাবের সংকেত জানাইল। পালাও —পালাও। উদীয়মান সূর্যের পাখা মেলিয়া জাপানী বোমারু আসিতেছে। আরাকানের পাহাড় হইতে তাহাদের কামানের গুরু গর্জন।

মুহূর্তে পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গেল। সহরে মিলিটারি আসিয়া বাঁধিয়াছে আস্তানা। বিমানধ্বংসী কামানগুলি ঢাকে, পাহাড়ের টিলায় মাথা উঁচু করিয়া শত্রুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর দিয়া বিমান ঘুরিতেছে চক্রাকারে। এ-আর পির সংখ্যা সতর্ক বাণী। স্লিট ট্রেঞ্চের সমারোহ। বাংলার ফ্রন্ট লাইন।

সমস্ত মানুষগুলির মুখ লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। আশা নাই, আনন্দ নাই, একটা আতংকের কালো ছায়া আসিয়া জড় করিয়াছে সকলের মুখে। যখন তখন তীব্র স্বরে কাঁদিয়া উঠে সাইরেন। ট্রেনে ষ্টিমারে আশ্রয় লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পালাইতেছে মানুষ। সময় নাই—সময় নাই। তাহারা আসিয়া পড়িল।

সারাটা রাত নেশা করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল গঞ্জালেস্। পেরিরা আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল।

—এখনো চুপ করে পড়ে আছো যে?

গঞ্জালেস্ পাশ ফিরিয়া বলিল, কী করতে হবে?

—প্রাণে বাঁচতে হলে এইবেলাই সরে পড়তে হবে। চাটি বাটি এবারে তোলো।

গঞ্জালেস্ যেন এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিল কথাটা। কেন, কী হয়েছে?

পেরিরা চটিয়া উঠিল: হয়েছে মাথা আর মুণ্ডু। আচ্ছা লোক যা তুমি। ওদিকে যে কী কাণ্ড ঘটছে খেয়াল নেই বুঝি? জাপানীরা যে এসে পড়ল।

—বেশ তো, আসুক না—

—আসুক না? বিস্ফারিত চোখে পেরিরা বলিল: ভেবেছ কী তুমি? ওরা কি তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসছে নাকি? বোমা দিয়ে সব পুড়িয়ে যে ছারখার করে দেবে। শোনোনি, বর্মা যে বেহাত হয়ে গেল। এখনো সময় আছে, চলো—কলকাতার দিকে সরে পড়ি।

—আর কাজ কারবার?

—কাজ কারবার? প্রাণে বাঁচলে ওসব ঢের হবে। এখন মানে মানে তো প্রাণ নিয়ে সরে পড়ো আগে।

—দ্যাৎ—দ্যাৎ! অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে গঞ্জালেস্ বলিল, এইভাবে তুমি আমার নেশাটা চটিয়ে দিলে! যে জাহান্নামে খুসি তুমি যেতে পারো, আমি এখান থেকে নড়ব না।

—মরবার বুদ্ধি হয়েছে, তাই না?

—তাতে তোমার কী? আমি মরলে তো আর তোমাকে চ্যাংদোলা করে কবর দিতে আসতে হবে না। যে চুলোয় হচ্ছে যাও, আমাকে খামকা জ্বালাতন কোরো না।

—বটে বটে। পেরিরা চটিয়া আগুন হইয়া গেল: ভালো কথা বললে মন্দ হয় কিনা। আচ্ছা, তুমি থাকো এখানে। বোমা খেয়ে যদি উড়ে না যাও তো—

—হুইস্কি খেয়ে তো ঢের উড়লাম, একবার বোমা খেয়েই দেখি না—গঞ্জালেস্ বোকার মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিল: একটা নতুন রকমের নেশার স্বাদ অন্তত পাওয়া যাবে। শুনেছি হুইস্কির চাইতে বোমার ঝাঁজটা অনেক বেশি, নয় কি?

—চুলোয় যাও। তোমার আত্মাটা শয়তানে একেবারেই খেয়ে ফেলেছে দেখছি—পাদরী সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এবং সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পেরিরা বাহির হইয়া গেল। এমন একটা পাঁড় মাতালের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া তর্ক করা নিছক সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিছন হইতে গঞ্জালেস্ ডাকিয়া বলিল, পারো তো যাওয়ার আগে বোতল তিনেক হুইস্কি বিদায়ের উপহার দিয়ে যেয়ো বন্ধু। আমার ত ঢের খেয়েছ, এখন—

পেরিরা জবাব দিল না, বাকীটা শুনিবার জন্যে দাঁড়াইলও না। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা নিজের যথাসর্বস্ব গুছাইয়া লইয়া সে কলিকাতার ট্রেণ ধরিল।

কিন্তু গঞ্জালেস্ও আর বেশিদিন নিজের নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিল না। বাহিরের অতি বাস্তব

পৃথিবীর স্পর্শ সেও অনুভব করিল একদিন। দোকানে গিয়া মদ পাওয়া গেল, না—চালান বন্ধ। প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া এক বোতল ধেনো সে সংগ্রহ করিল, তারপরে চলিল তাহার প্রিয়তমার সন্ধানে। কিন্তু সেখানে গিয়াও আজ তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। শুধু তাহার প্রিয়তমারই নয়, সমস্ত ঘরের দরজাই বন্ধ। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে যাহারা এই দূর বিদেশের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আসিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনটা সকলের চাইতে বেশি এবং এ ক্ষেত্রেও তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য। গঞ্জালেস্ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সব কিছু বিস্বাদ আর নিরর্থক হইয়া গেছে। আজ সে প্রথম অনুভব করিল যুদ্ধ আসিয়াছে—দিকে দিকে তাহার বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে। মাথার মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া খানিকটা আগুন জ্বলিয়া গেল। মদের বোতলটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটিয়া চলিল।

যুদ্ধ আসিয়াছে। সমস্ত শহরটা অন্ধকার। শুধু মাথার উপরে অনেকগুলি লাল নীল আলো মৃদু গর্জনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিমান।

গঞ্জালেস্ চলিতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা খাইল সে, একটা নেড়ী কুকুরের লেজ মাড়াইয়া দিল—কুকুরটা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া সমস্ত শহরটা যেন মাথায় করিয়া তুলিল। তীব্র আলোর জোয়ারে চারিদিক ভাসাইয়া দিয়া ছোটখাটো একটা লোহার ঝড়ের মতো মিলিটারী ট্রাক নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল—একটুর জন্যে চাপা পড়িল না গঞ্জালেস্।

চলিতে চলিতে কখন যে পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে সে নিজেও টের পাইলনা। যখন টের পাইল, তখন আর আগাইয়া আসিবার উপায় নাই। কালো অন্ধকারের টানা স্রোতের মতো সামনে কর্ণফুলী বহিয়া চলিয়াছে অবিশ্রাম কলচ্ছন্দে। হাওয়ায় তীরের নারিকেল বীথি মর্মরিত হইতেছে। অনেক দূরে ডকের একরাশ অস্পষ্ট আলো। জাহাজ নোঙর করিয়া আছে। গঞ্জালেস্ চুপ করিয়া নদীর ধারে বসিয়া রহিল।

সত্যিই যুদ্ধ দেখা দিয়াছে—যুদ্ধ প্রবেশ করিয়াছে রক্তে। কোনোদিক হইতেই তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সব কিছুতেই সে তাহার দাবী জানাইতেছে নিষ্ঠুর ভাবে, মর্মান্তিক ভাবে। নদীর বাতাসে অনেকদিন পরে যেন গঞ্জালেসের উত্তপ্ত মাথাটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল। মনে পড়িয়া গেল: গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সহরের পথে দুটি একটি করিয়া মড়া ছড়াইয়া থাকে আজকাল। শুধু মদ নয়, চাল-ডাল-আটা নুন-তেল সব কিছুই দিনের পর দিন হাওয়া হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। আজ একমাত্র যুদ্ধটাই সত্য এবং তাহার চাইতেও কঠিনতর সত্য যুদ্ধের নির্মম দাবী, অনিবার্য প্রয়োজন।

গঞ্জালেসের চেতনা নিজের মধ্যে নাড়া খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিন কোথায় ছিল, কিসের মধ্যে তলাইয়া ছিল সে? সে তো এমন ছিলনা। ডেভিড্ গঞ্জালেস্‌কে তাহার মধ্যে কে জাগাইয়া দিল? বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়িল ডি-সুজাকে, মনে পড়িল লিসিকে। ডি সুজা। গলায় দড়ি আঁটিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছিল—তাহার জিভটা দু হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আর লিসি? কোথায় সে? কোন্ সাতসমুদ্রের ওপারে সে চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে?

ঘাসের জমির সামান্য নীচেই কর্ণফুলীর কালো জল কলকল করিয়া বহিতেছে। মৃত্যুর প্রবহমান করাল ধারার মতো কালো। নারিকেল বীথি যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ওখানে বনের মাথায় খানিকটা রক্ত মাখাইয়া দিল কে? চাঁদ উঠিতেছে নাকি ওখানে? সমস্ত পৃথিবীটা যেন মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

অসহ্য তৃষ্ণায় যেন পুড়িয়া যাইতেছে গলাটা। গঞ্জালেস জলের কাছে নামিয়া গেল। আঁজলা আঁজলা করিয়া জল খাইতে সুরু করিল। কী ঠাণ্ডা জলটা—নেশা হয় না, জুড়াইয়া যায় শরীরটা।

হঠাৎ কান্নার মতো একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক আর্তনাদ উঠিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে সমস্ত শহরটাকে যেন চকিত করিয়া দিল। নদীর জল শিহরিয়া উঠিল। এখানে ওখানে যা দু একটা ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া অতল অন্ধকারে তাহারা নিবিয়া গেল। বনের প্রান্তে যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল চাঁদটা।

এর আগে আরো অনেকবার বাজিয়াছে, কিন্তু আজকের এই দীর্ঘায়ত অবিশ্রাম কান্নার মধ্যে কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন আছে। গঞ্জালেস্ ঘাসের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিল নিঃসাড় হইয়া। কতক্ষণ? এক মিনিট, দুই মিনিট, হয়তো বা পাঁচ মিনিট। তারপরেই শোনা গেল দূরের আকাশে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন। উপরের তারকা-খচিত পটভূমির নীচে লাল আলোক-বিন্দু দিয়া গড়া একটা তীরের ফলার মতো 'ভি' রচনা করিয়া শত্রু-বিমান উড়িয়া আসিতেছে।

সার্চ লাইটের তীব্র আলো আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল—পাহাড়ের টিলা হইতে গর্জন করিল অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট। অন্ধকারের শূন্যতায় আলোর ফুলঝুরি ছড়াইয়া দিয়া শেল্ ফাটিয়া পড়িল। বোঁ-ও-ও। মৌমাছির ঝাঁকটা বাজ পাখীর মতো ছোঁ দিয়া নীচে নামিল, আবার সার্চ লাইটের তীব্র আলো প্রলয়ের বিদ্যুৎ চমকের মতো উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল সমস্ত।

বুম্ বুম্—কট্-কট্-কট্—

বিদ্যুৎ চমক—মাথার উপরে আলোকের ফুলঝুরি। অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে। পেটের নীচে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে মাটিটা—যেন মুহূর্তে দু ফাঁক হইয়া গিয়া গোটা শহরটাকেই তলায় টানিয়া লইবে। কর্ণফুলীর জলে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল অনেকটা জুড়িয়া একটা শাদা ফেনার বিশাল ঘূর্ণি জলস্তম্ভের মতো দাঁড়াইয়া উঠিল। কট্ কট্ বুম্ বুম্। মাটিটা কি চড়্ চড়্ করিয়া ফাটিতেছে নাকি? হঠাৎ ডকের দিক হইতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিয়া সব কিছুকে যেন ডুবাইয়া দিল। একটা বিরাট আগুনের শিখা আকাশকে ছাড়াইয়া আরো উপরে লক্ লক্ করিয়া উড়িয়া গেল—গঞ্জালেসের চোখের সামনে নামিল মূর্ছার অন্ধকার।

টলিতে টলিতে সে বাড়ি ফিরিল—সে একটা নরকের মধ্য দিয়া। আগুন—রক্ত। ধ্বংসস্তূপ। এই জাপানী বোমা! হুইস্কির চাইতে কড়াই বটে, একটু বেশি পরিমাণেই কড়া। গঞ্জালেসের মতো পাঁড় মাতালেরও অতটা বরদাস্ত হইবে না।

একবার—দুইবার—তিনবার। শহরে আর মানুষ নাই। দোকানপাট প্রায় বন্ধ—খাবার মেলেনা। চাকরটা পালাইয়া বাঁচিয়াছে। শ্মশানের একটা প্রেতের মতো এভাবে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগেনা। গঞ্জালেস্ ভাবিল, এইবারে এখান হইতে সত্যিই সরিয়া পড়া দরকার।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? কলিকাতায়?

না, কলিকাতায় নয়। চোখের সামনে একটা অপরিণত তটরেখা ভাসিয়া উঠিতেছে। যেখানে পর্তুগীজদের ভাঙা গীর্জাটার তলা দিয়া খরস্রোতে নোনা গাঙের জল বহিয়া চলিয়াছে; বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা লোহার কামান আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনশো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখিতেছে; জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে গাঙের জল যেখানে জ্যোৎস্না রাত্রিতে থাকিয়া থম্থম্ করিতেছে আর তাহার উপর চিত্র-বিচিত্র ডানার ছায়া ফেলিয়া বুনো হাঁসের দল উড়িয়া চলিয়াছে—সেইখানে।

সে চর ইস্মাইল।

ক্রমশঃ

শিশু-চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিশুচিত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আগ্রহ দেখা যায় নাই। আনন্দের বিষয় সম্প্রতি এ বিষয়ে কিশোর আলেখ্য সম্মেলন ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন। এঁদের কর্ম্মী শ্রীমান্ ধীরেশ ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় শিশুচিত্র প্রদর্শনী সম্ভব হইয়াছে। এই শিশুচিত্র প্রদর্শনীর পৃষ্ঠপোষক হইলেন্ অনারেবল্ স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় কে-সি-আই-ই, সভাপতি অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইতিমধ্যে যে কয়েকটি প্রদর্শনী হইয়াছে, তাহাতে শিশুদের আগ্রহ দেখা গিয়াছে; শুধু কলিকাতা নহে, কলিকাতারও বাহির হইতেও প্রদর্শনীতে চিত্র আসিয়াছে।

ইউরোপে শিশুদের চিত্র সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখা যায়। এবিষয়ে তাহাদের সচিত্র পুস্তক পাওয়া যায়; সমগ্র ইউরোপের শিশুদের চিত্র সম্বন্ধে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ হয়। শিশুদের চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী করিয়া তাহাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম আমাদের দেশেও ঐরূপ বাৎসরিক প্রদর্শনী করিয়া ছেলেদের উৎসাহিত করা হউক। সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শনী করিতে খরচ পড়িবে ১০০০্ হাজার টাকা; পুরস্কার ও প্রদর্শনীর খরচ বাবদ এই টাকা লাগিবে। এই ব্যাপারে একটি সচিত্র ক্যাটালগ ছাপাইতে হইবে। প্রদর্শনীতে ছবি দিতে ছেলেদের কোনো ফি লাগিবে না; কিন্তু এই টাকা কলিকাতার স্কুলসমূহ দিবে। প্রত্যেকটি স্কুল ৫০্ টাকা করিয়া চাঁদা দিলে অনায়াসে এই টাকা উঠিয়া যাইতে পারে।

ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আমরা নানা বিষয়ে ভাবিয়া থাকি। চিত্রশিল্পও একটা বিষয়—আমাদের সেজন্য ভাবা উচিত। এ বিষয়ে অভিভাবক এবং বিদ্যালয় উভয়েরই দৈন্য আছে। কেহই তাহাদের ছবি আঁকিতে উৎসাহ দেন না। মনে করেন ছবি আঁকা শিখিয়া কি করিবে? আজকাল সঙ্গীত এবং অনেক স্থলে নৃত্য শিক্ষা দিবারও আগ্রহ দেখা যায়। সে রকম মেয়েদের চিত্র অবশ্য-শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। আলপনা, সূচিকর্ম্ম প্রভৃতি পারিবারিক কর্ম্মে ডিজাইনের প্রয়োজন হয়। চিত্রকর্ম্মে আগ্রহ থাকিলে এ সব কাজ সহজসাধ্য হইবে। অবসর সময়ে চিত্র বিনোদন করার জন্য চিত্র একটি অতি আবশ্যকীয় বিদ্যা।

শিশুরা যদি শৈশব হইতেই চিত্রে আগ্রহ দেখায় তবে ভবিষ্যতে আর্টিষ্ট হইতে তাহাদের সাহায্য করিবে। আজকাল আর্টিষ্টদের চাহিদা আছে। কমার্শিয়াল কাজে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হয়। আর্থিক কারণ ছাড়িয়া দিলেও মানসিক চর্চ্চার জন্য চিত্রের স্থান আছে।

শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে মন্টেসরি সিস্টেম, ডালটন প্ল্যান প্রভৃতি আছে। ইউরোপে শিশুশিক্ষায় চিত্র একটি বিশেষ অঙ্গ। ছবি সম্বন্ধে শিশুদের একটি স্বাভাবিক আগ্রহ আছে; আমরা তাহা জোর করিয়া নষ্ট করি। ছবির ন্যায় মাটীর কাজেও শিশুদের আগ্রহ দেখা যায়। শিশুরা মাটী লইয়া খেলা করিতে চায়। প্রতি বিদ্যালয়ে চিত্রের ন্যায় ক্লে মডেলিং শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

কয়েকদিন পরের কথা—

অমল লাইব্রেরীতে পড়িতেছিল—কেবল বই খুলিয়া বসিয়া থাকাই নয়, সত্যই পড়িতেছিল। অপর্ণার জন্য মন তার এখন আর প্রতীক্ষাচঞ্চল হয় না। সে জানে, অপর্ণা সকলের সম্মুখে তাহাকে না চিনিবার ভান করিলেও অন্তরীক্ষে সে তাহাকেই ঘনিষ্ঠভাবে চায় এবং সভ্যতার ও আভিজাত্যের মুখোস ত্যাগ করিয়া অসঙ্কোচেই কথাবার্ত্তা বলে। নিজেকে লুকাইবার এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও আগ্রহহীন করিয়া রাখিবার সচেষ্ট যত্ন এখন আর নাই।

সেদিন শুক্রবার। সন্ধ্যা হইতে দেরী নাই—লাইব্রেরী কক্ষের উন্মুক্ত জানালা দিয়া অদূরের মেঘ দেখা যায়। অপর্ণা চলিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময়ে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে যেন ডাকিয়াই গেল—

অমলও বাহির হইয়া আসিল। লিফ্‌টের গোড়ায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা বোধ হয় তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। অমল বলিল—নমস্কার, আজ এত তাড়াতাড়ি উঠ্‌লেন যে!

—আপনি পড়ুন, যতক্ষণ ইচ্ছা। আমার আর ধৈর্য্য নেই। কিন্তু আপনি যে পিছু পিছু উঠে এলেন।

—আপনি ডাক্‌লেন বলে!

—আমি ডেকেছি?

—ডাকেন নি, তা হ'লে?

—আপনি বুঝলেন কি ক'রে?

—আপনি যে ভাবে চেয়ে এলেন তাতেই মনে হ'ল আমাকে ডাক্‌ছেন, অবশ্য সেটা ভুলও হ'তে পারে। অসম্ভব নয়—

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে অমলের মুখখানা দেখিয়া লইয়া বলিল—না ভুল করেন নি—নীরব ভাষাও তা হ'লে মানুষে বুঝতে পারে, কেমন? বুঝলাম আপনি নীরব-ভাষা-বিদ।

—আপনিও ত নীরব-বচনবিদ তা হ'লে।

অপর্ণা বিনা ভূমিকাতেই বলিল—কাল, অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতেই ক্লাবের মিটিং হবে, আপনাকে সেই দিনই উপস্থিত চাই। অতএব আজ টাকা দু'টো দিন ত, আপনার নাম তুলে রাখবো, ওই মিটিংএই আপনাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেব, কেমন?

—ধন্যবাদ। অমল দ্বিধা করিতেছিল, পকেটে মাসের সম্বল মাত্র দুইটি টাকাও সামান্য কয়েক আনা পয়সা আছে—বাকী কয়েকদিন কি হইবে, কে জানে। অমল যন্ত্রচালিতের মত টাকা দুইটি তুলিয়া অপর্ণার হাতে দিয়া বলিল—পুনরায় ধন্যবাদ জানাই যে জীবনে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের মহার্ঘ সুযোগ আপনি দিয়েছেন, নইলে জীবনের একটা দিক খালি থেকে যেত?

—কেন? অকস্মাৎ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল কিসে?

—আপনাদের মত মহিলাদের বন্ধুত্বে?

—কেবলমাত্র এই!

—আর কি?

—আরও কত সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে, সে কল্পনাও কি ক'রতে পারেন না ছাই!

অপর্ণা চলিয়া যাইতেছিল, অমল ডাকিয়া বলিল—একটা বড় ভুল ক'রেছেন, আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা ত জানাননি, পৌঁছব কি ক'রে?

অপর্ণা ব্রীড়া ভঙ্গিসহকারে একটু বিলোল কটাক্ষে চাহিয়া বলিল—ডেজি নামটা আবিষ্কার ক'রলেন, আর ঠিকানাটা সংগ্রহ ক'রতে পারেন নি? আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়—

—আপনি আলোক দান ক'রলে উজ্জ্বল হতে পারে, বিনালোকে উজ্জ্বল হওয়াটা ত অসম্ভব ভাগ্য।

অপর্ণা বলিল—বিধাতা আর যেদিকেই আপনাকে বঞ্চিত করুন, অন্ততঃ ভাষায় বঞ্চিত করেন নি। আচ্ছা নমস্কার—আসি। কাল যাওয়া চাই—ঠিক সাতটায়। ভয় নেই আধ্যাত্মিকতত্ত্ব আলোচনা হবে না—

অপর্ণা চন্দনছন্দে অঞ্চল আন্দোলিত করিয়া, অনবদ্য সুন্দর একটা ছন্দের তরঙ্গ ও বক্তিতে সমস্ত দেহকে গতি

দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। পিঠের উপর শাড়ীর পাড়, নিবিড় পাদক্ষেপ চঞ্চল নিতম্বের নীচে ঘনকুঞ্চিত শাড়ীর ভাজ একসঙ্গে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে,—অমল মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে অপস্রিয়মান দেহটির সৌন্দর্য্যকে সুরাপাত্রের মত নিঃশেষে পান করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল,—আজ কয়েকদিন সে ত রঙীন শাড়ী পরিয়া আসে না, আটপৌরে মিলের শাড়ী পরিয়া আসে—কেন? কয়েকদিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া সে ব্যথিত হইল। হয়ত তাহার ব্যঙ্গেই সে আহত হইয়াছে—

অমল অত্যন্ত দ্রুতপায়ে অগ্রসর হইয়া একটু উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল,—মিস্ রায়।

অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আবার কি হ'ল? ঠিকানা ভুলে গেলেন বুঝি?

—না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে ক'রবেন না? বলুন, মনে ক'রবেন না।

অপর্ণা বলিল,—কি কথা? আচ্ছা ক'রবো না বলুন—

—আজ কয়েকদিন আপনি সাধারণ শাড়ী পরে আসেন কেন? রঙীন শাড়ী পরেন না কেন?

—রঙীন শাড়ী আমাকে মানায় না তাই। অপর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহা যে একান্তই কষ্ট-প্রকাশিত তাহা বুঝিতে অমলের দেরী হইল না। অপর্ণা একটু ব্যথিত ভাবেই মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

—যে বলেছে, সে হয় মিথ্যা কথা ব'লেছে না হয় ঠাট্টা ক'রেছে।

অপর্ণা প্রশান্ত আঁখি মেলিয়া বলিল,—আপনিই ত বলেছেন।

—না, আপনি ভুল বুঝেছেন। সে নীল শাড়ীর পটভূমিকে আজও আগ্রহে আপনাকে দেখ্‌তে চাই।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—না পরলে ক্ষতি কি? এতে কি খুব কুচ্ছিৎ দেখায়?

—না, তবে আমার অনুরোধ, আপনাকে সাম্‌নের হপ্তায় সেই শাড়ীখানা পরতেই হবে।

অপর্ণা বলিল,—তাই হবে, কিন্তু আপনার অনুরোধের এত মূল্য আপনি দেন কেন?

উত্তরের সময় না দিয়াই অপর্ণা চলিয়া গেল। অমল নিজের ব্যবহার, অতি নগ্ন প্রশ্ন ও অনুরোধের কথা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল, যেন একটু অশোভন আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মনে মনে সে এই অসংযমের জন্য অনুশোচনা করিল না, বরং মনে মনে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে বলিয়া খুসীই হইল।

(ক্রমশঃ)

কয়লার ব্যবহার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

আকস্মিক ঘটনার প্রভাব

কয়লার উপোৎপান্ত বস্তুর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানে আকস্মিক ঘটনার প্রভাব সম্বন্ধে দুইটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত রঙ এখন প্রাকৃতিক প্রায় সমস্ত রঞ্জন পদার্থকে অপসারিত করিয়া সেই স্থান দখল করিতেছে। আলকাতরা হইতে যে রঙ পাওয়া যাইতে পারে তাহা ১৮৫৭ সালে অষ্টাদশবর্ষীয় বালক পার্কিন (Perkin) আবিষ্কার করেন। তাহার পর নানা অনুসন্ধান চলিতে থাকিলেও বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ১৮৬৮ সালে গ্রেব্ (Graebe) ও লাইবারমান্ (Libermann) আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত অ্যানথ্রাসিন্ (anthracene) হইতে এ্যালিজারিন (alizarine) আবিষ্কার করেন। ইহাই ভারতের নীলের প্রধান শত্রু; প্রকারান্তরে ধ্বংসের সুরু বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আলকাতরা হইতে নীল প্রস্তুত প্রক্রিয়ার এক অধ্যায়ে ন্যাপ্‌থ্যালিন (naphthalene) কে থ্যালিক এ্যাসিড্ (phthalic acid) এ পরিণত করিতে হয়। ইহা কেবলমাত্র উত্তপ্ত সালফিউরিক এ্যাসিড-এর সাহায্যে সম্পন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই প্রণালীতে

বহু সময় লাগে। এত মন্থরভাবে কাজ চলিলে পরীক্ষাগারের উদ্দেশ্য সফল হইলেও বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহা কার্য্যকর নয়। সুতরাং কার্য্য দ্রুত করিবার জন্য বহু চেষ্টা চলিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল পাওয়া যায় না। গবেষণা কার্য্যের সরঞ্জামের সহিত সলফিউরিক এ্যাসিডের উত্তাপ পরিমাপের জন্য একটী যন্ত্র (thermometer) সংলগ্ন থাকিত। একদিন দৈবক্রমে ঐ তাপমান যন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহার পারদ সলফিউরিক এ্যাসিডের মধ্যে পড়ে। ফলে দেখা গেল, এতদিন যে কার্য্য সম্ভব হয় নাই, তাহা নিমেষে হইয়া গেল। সলফিউরিক এ্যাসিডের ক্রিয়া অত্যধিক শক্তিশালী ও দ্রুত হইয়া উঠিল এবং রঙ প্রস্তুতের মোট সময় হ্রাস পাইল। ইহাই প্রাকৃতিক নীলের ধ্বংসের কারণ।

স্যাকারিণ আবিষ্কার

এই প্রসঙ্গে আরও একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার জন্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের (John Hopkins University) কর্ম্মী ফলবার্গ (Fahlberg) গবেষণাগারে সমস্ত দিন গুরুপরিশ্রমের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায় নৈশ ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। একটুকরা রুটী মুখে দিয়া দেখিলেন যে উহা অত্যন্ত মিষ্ট স্বাদযুক্ত। রুটীতে পূর্ব্ব হইতেই এত চিনি দেওয়া হইল কেন—বলিয়া তিনি পত্নীর নিকট অনুযোগ করিলেন। গৃহিণী অবাক্; কেবল মৃদুভাবে সেই অভিযোগ অস্বীকার করিলেন। ফলবার্গ পুনরায় একটুকরা রুটী মুখে দিলেন, তাহার ফলও অনুরূপ হইল। তখন রুটী ভাঙ্গিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিলেন। স্বামীর স্পর্শিত রুটী যখন তাঁহার মুখে অত্যন্ত মিষ্ট লাগিল, ফলবার্গের মুখে প্রণয়িণী প্রদত্ত রুটীর কোনও স্বাদের পরিবর্ত্তন হইল না। তখন নিজের অঙ্গুলি মুখে দিয়া দেখিলেন, উহাই মিষ্টস্বাদযুক্ত। ফলবার্গ মহা বিস্ময়ে সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন। কি ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অলৌকিক ঘটনার যুগের অবসান হইয়াছে; সম্রাট মাইডাস্ (King Midas) বরলাভ করিয়াছিলেন, তিনি যাহা স্পর্শ করিবেন, তাহাই স্বর্ণে পরিণত হইবে। ফলবার্গের নিজের সম্পর্কে এরূপ কিছুই ত ঘটে নাই। ভারতবর্ষ হইলে, ফলবার্গ ভোজ্যবস্তু স্পর্শদ্বারা উহাতে মিষ্ট স্বাদ দানে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া যাবজ্জীবন সুখে কালাতিপাত করিতে পারিতেন। যাহাই হউক, তিনি কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সমস্তদিন ধরিয়া যে সকল দ্রব্যাদি নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহাই কেবল মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন সম্ভবতঃ চিনি স্পর্শ করিয়া থাকিবেন; তাহাও নহে। তাহা ছাড়া চিনি অপেক্ষা এই মিষ্টত্বের স্বাদ আরও তীব্র; সুতরাং ইহা কি!

অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে তিনি সারাদিনই আলকাতরা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন; তাহা ছাড়া আর কিছুই মনে আসিল না। তখন পরীক্ষাগারের মধ্যে কোথায় কি ঘটিয়াছে, ইহা লইয়া পরদিন গবেষণা চালাইলেন, দেখিলেন কোন সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে, মিষ্টস্বাদযুক্ত এক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে ইহাই স্যাকারিণ (saccharine); অনুরূপ পরিমাণ চিনির তুলনায় ইহা বহুগুণ মিষ্ট। ফলবার্গ প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া আজ স্যাকারিণ বাণিজ্যক্ষেত্রেও স্থান পাইয়াছে। ইহা চিনি অপেক্ষা মিষ্ট হইলেও, দেহের মধ্যে চিনির তাপ বা শক্তি উৎপাদনকারী গুণ স্যাকারিণে নাই। অনেক দেশে স্যাকারিণের আমদানী আইনের দ্বারা বন্ধ করা আছে।

বহুমূত্র-রোগীর পক্ষে চিনি অহিতকর; সুতরাং চিকিৎসকে উহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন। অথচ যাঁহারা সারাজীবন মিষ্টাস্বাদে অভ্যস্ত তাঁহাদের মিষ্ট একেবারে না হইলে চলে না; তখন স্যাকারিণের ব্যবস্থা দিয়া চিকিৎসক নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকেন।

ভারতে কয়লা ব্যবহারের সূত্রপাত

ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের কথা এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৯ সাল হইতে উৎখাত কয়লার হিসাব পাওয়া গেলেও কয়লা ব্যবহারের যে বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতীয় শিল্পের পরিচয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৭৫ হইতে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৮৭৫ সালেও ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে শতকরা ৭১ ভাগ কয়লা আমদানী করিতে হইত, ১৯০৪ সালে তাহা এক ভাগে দাঁড়ায়; ভারতীয় কয়লা সমস্ত ক্ষেত্র দখল করিয়া লয়। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে ভারতীয় কয়লার মহা-চাহিদা উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি নূতন খনি চালু হয়, পরে কিন্তু মন্দা পড়ায় ইহাদের কয়েকটী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ১৯০৮-৯ সালে কয়লা হইতে কিছু কিছু উপোৎপাদ্য বস্তু লাভ করিবার জন্য গিরিডিতে নূতন ব্যবস্থা হয় এবং প্রথম দফায় ১৮টী বদ্ধ চুল্লী (ovens) ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। ১৯১০ সালে আরও ১২টী চুল্লীর গঠনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার সাহায্যে আলকাতরা ও এ্যামোনিয়া উদ্ধার করা হইত। এই সময় ঐ দুই দফা চুল্লী হইতে বৎসরে ৪০,০০০ টন কোক ও ৩৬০ হইতে ৪০০ টন এ্যামোনিয়ম সলফেট পাওয়া যাইত এবং ক্রেতার অভাবে প্রায় সমস্ত সলফেটই জাপানে রপ্তানী করা হইত। ১৯১৪-১৫ সালে (বা তাহার কিছু পূর্ব্বে) ভারতীয় খনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োজিত হইতে থাকে। এই সময় ঝরিয়া রাণীগঞ্জ অঞ্চলে আন্দাজ ১২টী বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র ছিল; যুদ্ধের মধ্যে আরও দুইটী বৃদ্ধি পায়। কয়লা কাটা, খনি হইতে তোলা প্রভৃতি কাজের জন্য নানা প্রকার যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন হইতে থাকে।

রপ্তানীতে বাধা

প্রকৃতপক্ষে ১৯০০ সাল হইতে ভারতীয় কয়লার রপ্তানী আরম্ভ হয় এবং ১৯২০ সালে রেলের উপর কয়লা চলাচলের চাপ কমাইবার জন্য রপ্তানীর উপর বাধানিষেধ স্থাপিত হয়। খনি হিসাবে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট (rationing) করিয়া দিয়া পরীক্ষা চলিতে থাকে। ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান ছিল, তাহার উপর খনি হইতে উৎখাত কয়লার পরিমাণ দারুণ হ্রাস পাওয়ায়, ১৯২২ সালে বন্দরগুলিতে কয়লা লইয়া যাওয়ার উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয় এবং ১লা জানুয়ারী ১৯২৩ হইতে পূর্ব্ব আইন রদ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯২৩

সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারী উহা বড়লাটের অনুমোদন লাভ করে এবং ১লা জুলাই ১৯২৪ হইতে বলবৎ হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য খনির মজুরদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করা। ১৯২৬ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর কয়লার খনি নিয়ন্ত্রণ (Coal Mines Regulations) বিধিগুলি ১৯২৩ সালের আইনের ২৯ ধারা মতে সৃষ্টিলাভ করে এবং ১৩ই মে ১৯২৯ সালে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখের ইস্তাহারে মৃত্তিকাগর্ভে খনির মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের কাজ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হয়।

গুণবিভাগ সমিতি

১৯২৪ সালের ২০শে অক্টোবর ভারতীয় কয়লা সমিতি (Indian Coal Committee) ভারত সরকারের ইস্তাহারের বলে সৃষ্টিলাভ করে এবং ১৯২৫ মার্চ মাসে তাঁহাদের রিপোর্টে রপ্তানীর উৎসাহ ও ভারতীয় কয়লার গুণবিভাগ ও সর্ব্বসাকুল্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা উৎসাহদান প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে রেল কোম্পানী ও পোর্ট কমিশনার কয়লা চলাচল, মাশুল হ্রাস, মাল বোঝাই প্রভৃতি বিষয়ে সুব্যবস্থা করিলে কয়লা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা হইতে পারে। তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী কয়লা গুণ বিভাগ সমিতি (Coal Grading Board) ১৯২৫ সালের ৩১ সংখ্যক (Act XXXI of 1925) আইনে জন্মলাভ করে। রপ্তানীযোগ্য কয়লার গুণ বিভাগ * এবং তাহার সার্টিফিকেট দান করা ইহাদের প্রধান কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বোর্ড প্রদত্ত সার্টিফিকেট পাইলে তবে খনির মালিকরা পোর্ট ট্রাষ্ট ও রেল কোম্পানী প্রদত্ত সুবিধা লাভ করিবে।

* বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মান :

Low Volatile

Selected Grade...	Upto 13% ash and over 7,000 calories or 12,000 B. T. U.'s
Grade I	Upto 15% ash and over 6,500 Calories or 11,700 B. T. U.'s
Grade II	Upto 18% ash and over 6,000 calories or 10,800 B. T. U.'s
Grade III	All coals inferior to above

High Volatile

Selected Grade...Upto 11% ash ; over 6,800 calories or 12,240 B. T. U.'S and under 6% moisture.

Grade I...Upto 13% ash ; over 6,300 calories or 11,340 B. T. U.'s ; under 9% moisture.

Grade II...Upto 16% ash ; over 6,000 calories or 10,800 B. T. U.'s ; under 10% moisture.

Grade III...All coals inferior to above.

সেস্ (cess)

১৯২৯ সালের ৮ সংখ্যক আইন (Act VIII of 1929.) অনুযায়ী, লৌহ প্রভৃতি কারখানায় ব্যবহারের অনুপযোগী কোক (Soft coke, i.e. all coke which is unsuitable for metallurgical purposes) বাঙ্গালা বা বিহার হইতে নানা অঞ্চলে রেল কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতি টনের উপর দুই আনা করিয়া সেস্ (cess) বা শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। সেস্ (cess) কমিটীর কার্য্য পরিচালন ও কয়লার খনি সংক্রান্ত নানা উন্নতি বিধানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা দান করিবেন সেই সম্পর্কে এই শুল্ক ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

পুরাতন প্রসঙ্গ

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯২৯ সালে বা তাহারও পরে, যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে সে বিষয়ে ১৯২০ সালে রীজ (Mr. Treharne Rees) এক রিপোর্ট দাখিল করেন। তাহাতে সমস্ত কয়লার খনির সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কয়লার ব্যয় সংরক্ষণ ও খনির কাজে অপচয় নিবারণ খনির প্রয়োজনানুযায়ী মালগাড়ী সরবরাহ এবং উৎখাত প্রদেশ বাধ্যতামূলকভাবে বালুদ্বারা ভরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। ইহার জন্য তিনি প্রতি টন কয়লার উপর আট আনা হিসাবে শুল্ক আদায় করিবার সুপারিশ করেন এবং রেল কোম্পানী ভাড়ার সহিত এই শুল্ক আদায় করিয়া উপযুক্ত কমিটির বা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবার ব্যবস্থা দেন। পরে বালুদ্বারা খনির মধ্যে খালি স্থান ভর্ত্তি করিবার রীতি সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

অপচয়

ভারতের দুর্ভাগ্য সকল ব্যাপারেই প্রচুর অপচয় আছে। বড় বড় কমিশন আসিয়াছে, মহা মহা সুপারিশ বা নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে, কিন্তু ফল যে কি হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে, টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই। মিঃ নরম্যান ব্যারাক্লফ্ (Mr. Norman Barraclough) এককালে খনির কার্য্যের পরীক্ষক (Inspector of Mines) ছিলেন। তাহার মতে, যদি পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা হইত তাহা হইলে ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জ খনিসমূহে পুড়িয়া গিয়া এবং উপর হইতে ধ্বসিয়া পড়ায় যে পরিমাণ কয়লার ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দশভাগের এক ভাগের অধিক হইত না। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিবার লোক নাই। প্রথম প্রথম বৈদেশিক কোম্পানীতে কাজ করিয়াছে, তাহারা যথাসম্ভব দ্রুত লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিদেশী শাসন তাহাতে সাহায্যই করিয়াছে, খনিতে যে অপচয় হয় তাহাতে তাহার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ; উপরন্তু এ সকল অপচয়ের ফলে জাতির একটী বিরাট সম্পত্তি ও শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে গৌণতঃ তাহার যথেষ্ট লাভ আছে।

ভারতে কয়লার ব্যবহার

ভারতীয় কয়লার ব্যবহারের অনুপাত এইরূপ :

ব্যবহার	শতকরা	ব্যবহার	শতকরা
রেল	৩২	সামরিক জলযান	·৭
লৌহ শিল্প ও অপরাপর কারখানা	২১	পোর্ট ট্রাষ্ট	·৮
		চা-বাগান	১·০
কার্পাস শিল্প	৭·৫	কয়লার খনি ও অপচয়	১০·০
পাট শিল্প	৩·৫	অপরাপর কারখানা ও বেসরকারী ব্যবহার	১০·৯
জাহাজী কয়লা	৫·৫	দেশীয় জলযান	৩·০
ইট ও অন্যান্য মৃৎশিল্প	৩·২		
কাগজ শিল্প	·৯		

পৃথিবীতে কয়লার ব্যবহার

ইকেলের (**Edwin C. Eckel**) মতে পৃথিবীর উৎখাত কয়লা নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহৃত হয় :

নানা শিল্প কার্য্যে (**manufacturing purposes**) ...	৪৩%
গৃহাদি গরম রাখিতে (**heating buildings**) ...	২০ ,,
যান (**locomotive fuel**) ...	১৮ ,,
কোক (**coke**) ...	১২ ,,
জলযান (**steamer full**) ...	৬ ,,
আলোকের জন্য গ্যাস (**illuminating gas**) ...	১ ,,

রাজ-ঈশ্বর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কত রাজা রাজপুত্র গেল চলি' রাজত্ব করিয়া
কত দেশে—ইতিহাসে নাম তার রয়েছে ভরিয়া
পাতে-পাতে—ভালো মন্দ কেহ-বা মাঝারি—
পরিচয়-রক্ষীরূপে অক্ষরের সাক্ষী সারি সারি !
লক্ষ লক্ষ সৈন্যদল সমুদ্রের তরঙ্গের মত—
হয়-হস্তী-পদাতিক-অশ্বারোহী, সাধ্য শক্তি যত,
তত অস্ত্র জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ভরি যন্ত্রে-যানে,
কণ্ঠে-কণ্ঠে মৃত্যুনাম জপে যারা অন্তিম শয়ানে !
কত সন্ধি-অভিসন্ধি, কত যন্ত্র-ষড়যন্ত্র করি'
দিকে-দিকে দেয় হানা ধরণী শ্মশানে দিতে ভরি'।
—ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব কীর্ত্তি এসেছে গিয়েছে কালে-কালে
রাখিয়া বিচিত্র চিত্র জীবধাত্রী ধরিত্রীর ভালে।

কারও স্মৃতি রক্তে লেখা, কারও শুধু জলের অক্ষরে,
কারও বা মহতী কীর্ত্তি সমুৎকীর্ণ ধাতু ও প্রস্তরে—
চিহ্ন যার আঁকা আছে রাজ্যময় মৃত্তিকার বুকে ;
কারও নাম নিত্যখ্যাত—জীবন্ত যা মানবের মুখে।
কারও দান বেঁচে আছে বাঁচাইয়া প্রজার জীবন,
স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বত্যাগী কেহ-বা সন্ন্যাসে সঁপি' মন !

—কিন্তু কে শুনেছে, বলো, পিতৃসত্য পালনের লাগি'
পুত্র যায় বনবাসে, আপনি যেন-বা অংশভাগী
কবে কার বাক্যে তাঁর—যৌবনের আত্মহারা দিনে !
রক্ষিতে তাহারই মান কর্ত্তব্যের পুণ্যপথ চিনে' ;
যে বাক্য নিজের নহে, পালনে কি তার ছিল দায় ?
জগৎ বুঝিতে নারে এ সত্যের অর্থ যে কোথায় !

প্রজার সন্তোষতরে কে করেছে আত্মবিসর্জ্জন
নিজ হস্তে ছেদি মর্ম্ম—রক্তে যার সীতার তর্পণ !
অরণ্যের শাখামৃগ, বনবাসী অন্ত্যজ চণ্ডাল
কার মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মে দীপ্ত করে দেবত্বের ভাল ?
সর্ব্ব জীবে সমদৃষ্টি ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্মকথা
কে দেখা'ল আচরণে—অপূর্ব্ব সে আদর্শ-বারতা ?

পৃথ্বী জানে, "বীর্য্য কা'র ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে নিয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম ?"

—মানুষ দেবতা হয়ে দেবত্বেও করেছে মহৎ—
এ আদর্শ কে দেখা'ল, মুগ্ধ যাহে নিত্য ত্রিজগৎ ?
কোন্ রাজ-ইতিহাসে ইষ্টমন্ত্র ঈশ্বরের নাম
মানবের নিত্যসঙ্গী—হরেকৃষ্ণে গাঁথা হরেরাম !

নবতর পর্য্যায়ে নন্দলাল

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সেদিন হঠাৎ নন্দলালের সঙ্গে দেখা হ'ল। স্বর্গীয় মনীষী ডি এল রায় মহাশয়ের বর্ণনায় নন্দলালের সঙ্গে আমার যতটা পরিচয় ঘটেছিল তার চাইতে তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল বেশি। আমার প্রচুর আনন্দও জন্মেছিল সেই সঙ্গে; যাঁরা কীর্ত্তির মাঝে অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁরা নমস্ত নিশ্চয়ই; কিন্তু যিনি কিছুই না করে, কেবল বেঁচে থেকে করিব লক্ষ্যবস্তু হিসাবে রূপ ও রসের সঙ্গে অমরত্ব অর্জ্জন করেছেন, তিনি অধিকাংশ মানুষের একটা জীবন্ত বিজ্ঞাপন বলেই, তাঁকে আমরা তারিফ করি—বিদ্রূপ না করেও নমস্কার করি।

বলেছি, সেদিন হঠাৎ নন্দলালের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথাটা অসম্পূর্ণ-ভাবে বলা হয়েছে, কারণ, তাঁর সঙ্গে কেবল দেখাই হয় নাই, তাঁকে আরো বেশি করে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল—তিনি আমার নিকট-বর্ত্তী হ'য়ে খানিক্ বসেছিলেন।

কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা, নন্দলালের আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ বসার মতো ধন্যবাদার্হ ব্যাপার, কেবল দৈবচালিত ক্রিয়া, অর্থাৎ যোগা-যোগ, হ'তেই পারে না; মানুষের হাত তাতে ছিল, প্রায় ষোল-আনাই ছিল, এমন কথাই বলা চলে।

এই ওসমানপুরে নতুন এসেছি। কি কাজে এসেছি তা বল্‌ব না, কারণ, কাজটা সরকারের পক্ষে দরকারী, প্রজার পক্ষে আপত্তিজনক। কাজটা কি তা বল্‌লেই আচম্‌কা গাল. খেতে হবে—তবে সেটা খাদ্যশস্য-সম্বন্ধীয়, হিসাবের কূট কৌশল। আর, এ-কাজে না এসে জল নিকাশের পথ করে' দিতে কিংবা ঐ শ্রেণীর কি অন্য শ্রেণীর অন্য কোনো কাজে এলেও তা ঘটত যা ঘটেছে, অর্থাৎ নন্দলালের সঙ্গে আমার দেখা হতই—তিনি এসে বসতেনও; তার মানে এই যে, আমি যে কাজই করিনা কেন, অথবা কোন কাজ না করলেও, চা আমি খাবই।

এই চা খেতে খেতেই নন্দলালকে সেদিন দেখ্‌লাম—নন্দলাল, জনপ্রিয় নন্দলাল, আহূত হয়ে দেখা দিলেন আমার চায়ের মজ্‌লিশেই।

বারান্দায় একখানা বেঞ্চি এবং দু'খানা চেয়ার এবং ছোট্ট একটা টেবিল পেতে প্রথম দু'দিন চা খাওয়া একাই শুরু করে একাই শেষ কর্‌লাম, কিন্তু তৃতীয় দিনে অতিথির আবির্ভাব হ'ল। সাম্‌নের অদূরবর্ত্তী কাঁচা রাস্তায় খড়মের শব্দ করে' যেতে যেতে একটি ভদ্রলোক, খালি-গা আধা-বয়সী ব্যক্তি, হঠাৎ এদিকে তাকিয়ে, আমায় দেখেই বোধ হয়, থম্‌কে দাঁড়ালেন। অনুমান করি, তাঁর মনে হ'ল, এ আবার কে এলো দেখি। বেশিক্ষণ তিনি থম্‌কে থাক্‌লেন না, চল্‌তে শুরু কর্‌লেন, কিন্তু এবার যেদিকে সোজা চলেছিলেন সেদিকে নয়, বাঁক ঘুরে' আমার দিকে। ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে আমার সাম্‌নেই তিনি দাঁড়ালেন। এ অবস্থায় যা' বল্‌তেই হবে তাই বল্‌লাম; বল্‌লাম, আসুন…

—বেরিয়েছি এই সকালেই একবার পঞ্চাননের কাছে যাব বলে'। দেখ্‌ছেন ত' কাপড়ের ছিরি! পঞ্চানন হ'চ্ছে জনৈক রজকের নাম। আমার কাপড় কাচে। কাচে খারাপ, দাম নেয় বেশি, আর, সময় মতো দেয় না। এই ত্রৈরশপর্শ ঘুচিয়ে দিতে পারেন?—বলে' ভদ্রলোক সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপের ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

আমি তাঁর কথার ধরণে একটা হাসির কারণ পেয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লাম; বল্‌লাম, তা' পারিনে।

—সরকারী লোক সব পারে। আপনি বেসরকারী লোকের মতো কথা বল্‌ছেন। বলে তিনি আরো খানিকটা উঠে এসে বেঞ্চির ওপরেই বস্‌লেন।

আমি বল্‌লাম,—কিন্তু জনৈক রজকের ত্রুটি সংশোধন ত' সরকারী লোকের কাজের ভেতর নয়!

—হ'তে কতক্ষণ! আপনি কাপড় কাচাবেন না?

—তখন সেটা হবে আমার নিজের কাজ, সরকারী কাজ ত' তা'কে বলা যাবে না!

হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ভদ্রলোক জান্‌তে চাইলেন, আপ্‌নি কি সস্ত্রীকই এসেছেন?

—না।

—চা ইত্যাদি করে কে?

—চাকর আছে।

—জলচল নিশ্চয়ই?

—নিশ্চয়ই। আনাবো এক কাপ্?

—আনান্, খাই। পঞ্চানন মুলতুবী থাক্।

দু'জনাই হাস্‌লাম—

এবং আমি হরিপদকে ডেকে' চা করতে বল্‌লাম। পঞ্চাননকে মুলতুবী রেখে', দেশস্থ, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, ইত্যাদি অন্যান্য ত্র্যহস্পর্শের, অর্থাৎ অশুভ সংযোগের এবং সংস্পর্শের, নানান্ গল্প করতে করতে চা এল…ভদ্রলোক চা খেলেন এবং তারপর, আবার দেখা করবেন বলে' প্রতিশ্রুতির আনন্দ দিয়ে তিনি উঠ্‌লেন। নন্দলালের সঙ্গে গ্রহের যে-যোগে দেখা হ'বার কথা কপালে লেখা ছিল সেই গ্রহ এতদিনে প্রসন্ন হ'লেন…

ভদ্রলোক পরদিন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন, কর্‌লেন তিনি সুদ সমেত, অর্থাৎ একটি সঙ্গীকে নিয়ে এলেন…

প্রতিশ্রুতির আনন্দ এবং আমার প্রতি নিষ্ঠা একটা ব্যাপকতা লাভ করে' আমার চা-পানের প্রাত্যহিক এবং প্রাতঃকালীন সহচর যখন পাকা

চারজনে দাঁড়িয়ে গেল তখন হরিপদ আমাকে চা দিতে লাগ্‌ল' কাঁসার গ্লাসে···

তা' দিক্ ; ওদিকে আমার লাভও হ'ল কম নয় ; চা খেতে খেতেই আমার জ্ঞানসঞ্চয় হ'ল অনেক—জানা হ'য়ে গেল, এখানে কে বেজায় মাম্‌লাবাজ, কে নদীর এপার থেকে রোজ সন্ধ্যায় ওপারে যায়, গাঁজা টান্‌তে, এখানকার কোন্ জুয়াড়ি বর্ত্তমানে জেলে আছে, কার উঠ্‌তি এবং কার পড়্‌তি অবস্থা ; দুধের দর পূর্ব্বে অবিশ্বাস্যরকম সস্তা ছিল—ওপারে *কে একজন দীনবন্ধু স্বদেশীওয়ালা বক্তৃতা দিয়ে বলে গেলেন, ওরে নির্ব্বোধ, গরু পাল্‌বি তোরা, আধ দুধ খাবে ওরা !* দেড় পয়সায় এক সের ! ছোঃ ! দুধ তোরাও খা—আর দাম নে দু' আনা সের··· চড়াৎ করে দাম দেড় পয়সা থেকে দু' আনায় উঠে গেল, তার সঙ্গে মাছ তরকারীরও ; খবরের কাগজে যে খবর থাকে তার বারো আনা অতিরঞ্জিত, সাড়ে তিন আনা মিথ্যে, আধ আনা এমন যা সত্য বলে' মনে করা যেতে পারে···ইত্যাদি অনেক তথ্য সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল হ'লাম—কাঁসার গ্লাসে চা খাওয়ার অসুবিধাটা তেমনভাবে অনুভূতই হ'ল না।

যেদিন নন্দলালের সঙ্গে দেখা হবে, সেই শুভক্ষণ আস্‌বে, সেদিন অন্যান্য কথার পর বসন্ত বল্‌ছিলেন, ভারী আনন্দের কথা হে ; এখানকার নিরঞ্জন দত্ত বেশ বিখ্যাত হয়েছে।

এই কথার উত্তরে যোগেশ বললেন, এখানে বিখ্যাত হওয়ার কথা আর বলে' কাজ নাই। জ্বর এলে যে লেপ নিয়ে শোয় না সে-ও বিখ্যাত। অমর অধিকারী কবে মরে' ভূত হ'য়ে গেছে—সে কোন্ জন্মে পুরো পেট লুচি পোলাও খাওয়ার পর আঠারো গণ্ডা রসগোল্লা খেয়েছিল, তাইতেই সে এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে। নিরঞ্জন হঠাৎ বিখ্যাত হ'ল কিসে ?

—তোমাদের তল্লাস ঐ লেপ আর রসগোল্লা পর্য্যন্তই। তোমাদের কাছে অন্য কথা পাড়্‌তে ভয়ই হয়। বলে বসন্ত বিরক্তভাবে অন্য দিকে চেয়ে থাক্‌লেন···

নীরদ বল্‌লেন, রাগ করো না, বলো।

—বই লিখেছে একখানা ; উপন্যাস ; খুব ভালো হয়েছে। যাবতীয় কাগজে তার প্রশংসা ছাপা হয়েছে।

—তদ্বিরে সব হয়।—বলেই যোগেশ দাঁতে জিব্ কাটলেন।

—পড়েছেন ? আমি বল্‌লাম।

—পড়েছি। মুরারির ঠেঙে চেয়ে নিয়ে।—বসন্ত স্বীকার করলেন।

—কি নাম বইয়ের ?

—নামটা নতুন রকম ; "জন্ম তার কুটীরে"···

আমারই পাশ থেকে অপূর্ব্ব হঠাৎ তুমুল শব্দ করে' হেসে' উঠ্‌লেন আর তৎক্ষণাৎ বসন্ত গেলেন চটে ; বল্‌লেন, হঠাৎ চিঁহি শব্দে ডেকে' উঠ্‌লে যে ?

অপূর্ব্ব বল্‌লেন, ভেঁপোমি যতদূর কটু হ'তে পারে ঐ নামেই তা' হয়েছে। বুঝেছি ব্যাপার। নিরঞ্জনকে চিনি আমি—বিদ্যে খুব সামান্যই···

—বিদ্যের দরকার বেশি হয় না ; দেখার চোখ থাক্‌লেই লেখা যায়

—তা' যায় ; কারো কারো কালি কলমও লাগে না।

বসন্ত এবার খোঁটা খোঁচা একসঙ্গেই দিলেন—

বল্‌লেন, ঈর্ষায় তোমার বুক জ্বল্‌ছে তা' বুঝেছি। তুমিও ত কৃষিকর্ম্ম নিয়ে এক নাটক লিখেছিলে ; প্রতিভার সঙ্গে বলে বেড়া'তে কৃষকের দুঃখ এতেই ঘুচ্‌বে। সেই খাতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খোঁড় বোষ্টম তামাক বেচলো অনেক—কৃষকের দুঃখ তা'তেও ঘুচ্‌লো না···

—সাট্ আপ্।—বলে অপূর্ব্ব লাফিয়ে উঠ্‌তেই ব্যাপারে আমি তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ কর্‌লাম ; বল্‌লাম,—আপনারা আমায় ক্ষমা করুন দয়া করে' রাগারাগি করবেন না। খোসগল্পের আমোদ মাটি করার মতো পাপ আর নাই।—বলে' মানুষকে তুষ্ট করার মতো একটু মিষ্ট হাসি হাস্‌লাম···

অপূর্ব্ব বসে পড়্‌লেন--

আমি বসন্তকে বল্‌লাম, বইয়ের গল্পাংশটা একটু বলুন ত' শুনি।

—আপ্‌নি যখন শুন্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তখন বল্‌ব। এক অতি গরীব ছুতোরের মেয়ে—জন্ম তার কুটিরে ; নাম কম্‌লি। কম্‌লি খুব রূপবতী—অসামান্য রূপ। দশ বছরে তার বাপ তার বিয়ে দিল ; ঠিক এগার বছর বয়সে সে বিধবা হ'ল। তারপর, বছর পাঁচেক পরে··· বছর পাঁচেক পরে সে গৃহত্যাগ করলো এক পরম রূপবান্ বিদেশী শিল্পীর সঙ্গে···

নীরদ প্রশ্ন করলেন, খোট্টা ?

—না, বাঙালীই, তবে—

—যাক্, তারপর ?

—শিল্পী মনোময় সেন তাকে নিয়ে তুল্‌লো তার কলাভবনে—ছবির পর ছবি আঁক্‌তে লাগ্‌ল তাকেই নানা ভঙ্গীতে নানান্ পোজে নানান্ এ্যাংগেলে নানান্ সজ্জায় শুইয়ে, দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে···

অপূর্ব্ব গলার ভিতর অদ্ভুত একটা শব্দ করলেন, হুঁ হুঁ করে' সুর ভাঁজার মতো ; আমার মনে হ'ল, পরস্ত্রী কম্‌লিকে মডেল করে' মনোময়ের ছবি আঁকার পদ্ধতি আরো উদ্‌ঘাটিত করতে যেন তিনি ঐ অব্যক্ত শব্দের দ্বারা নিষেধই করলেন।

বাধার দরুণ একটুখানি থেমে বসন্ত বল্‌তে লাগলেন,—অত্যন্ত পুলকের সঙ্গে ক্যাম্বিসের গায়ে তুলি বুলাতে বুলাতে শিল্পীর হঠাৎ একদিন অভাবনীয় বিতৃষ্ণা এল—সে চায় আরো রূপ, আরো নবীনতা, আরো সরসতা, আরো তীব্রতা—শিল্পীর তুলি অচিরেই অবশ হয়ে গেল···

—এ কি সব বইয়ের ভাষা বল্‌ছেন ?

আমি কৌতূহল প্রকাশ কর্‌লাম।

বসন্ত বল্‌লেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার সাধ্যি কি যে অমন সব কথা মুখস্থ না করলে বল্‌তে পারি ! মনোময়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময় কম্‌লি যে কথাগুলো বলেছিল তা সত্যিই মনে রাখার মতো···

—গাল একেবারে ভরে উঠ্‌লো যে !—অপূর্ব্ব ঠাট্টা করলেন।

কিন্তু বসন্ত বোধ হয় মনে মনে শপথ করেছিলেন, আর রাগ্‌বেন না ;

তিনি বলতে লাগলেন,—তারপর কমল, তখন তার নাম কমলমালা দেবী, ঢুক্‌লো থিয়েটারে ; সেখানে তার বিচিত্র প্রেমাকাঙ্ক্ষীদের রকমারি কায়দা কি ! নিরঞ্জন যে এত ঢং আর কথার বাঁধুনি জানত' তা' তার বই না পড়্‌লে আমি বিশ্বাসই কর্‌তাম না—

যোগেশ বলে' উঠ্‌লেন—আমি এখনো কর্‌ছিনে ; যারা ইংরেজী বই ঘাঁটে…

আমি বললাম, পরে বলবেন সে-সব কথা ; গল্পটা শেষ হোক্‌।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। অরসিকে রস নিবেদন করা হ'চ্ছে বই ত নয় ! সংক্ষেপেই বলি।—বলে' বসন্ত সংক্ষেপে শেষ করতে হ'চ্ছে বলে' যেন দুঃখিত হয়েই আমার দিকে তাকা'লেন ; বললেন, তারপর সে ঢুক্‌ল' টকিতে—এক মুহূর্ত্তেই দাঁড়িয়ে গেল একটা দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রে। শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্‌ বলে না ! কিন্তু কমল শনৈঃ শনৈঃ নয়, একটি লম্ফে উঠে বস্‌লো একেবারে চূড়ায়…

—আর তার কনকাঞ্চলের এক মুড়ো ধরে' ঝুলে থাক্‌লেন প্রোডিউসার, আর-এক মুড়ো গলায় বেঁধে ম'লো—

বলে' অপূর্ব্ব থেমে থাক্‌লেন…

—কে ?—নীরদ জানতে চাইলেন।

—তা' জানিনে ; নিশ্চয়ই একজন মরেছে। নিরঞ্জনকে ত' কা'লও দেখেছি, আজ আকাশে…আজ ব'লেছি, চোখ। আর, বসন্ত ত' এখানেই বসে'…আরে, ও কে যায় ? নন্দলাল না ?

আমাকে চমৎকৃত করে' এক মুহূর্ত্তেই উল্‌টে গেল সব—বিখ্যাত নিরঞ্জন আর চূড়াবলম্বিনী নক্ষত্র কমলমালা দেবী যুগপৎ অন্তর্হিত হলেন—সবারই চোখ ছুটলো রাস্তার দিকে—আমারও…

—তা-ই ত', নন্দলালই ত' ! কখন্‌ এলে ? এস, এস।—বসন্ত পথবর্ত্তী ব্যক্তিকে সাদরে আহ্বান করলেন।

কিন্তু আমি দেখে বিস্মিত হ'লাম যে, যাঁকে দেখে এঁদের এত উৎসাহ তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার—খুব অবিচলিতভাবে আর আলস্যের সঙ্গেই তিনি এদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, অর্থাৎ আমরা কেউ ডেকেছি তা' লক্ষ্য করলেন…

আমার পার্শ্বস্থ অপূর্ব্ব খুব নিম্নস্বরে আমাকে জানা'লেন, ডি এল্‌ রায়ের নন্দলাল, সেই ভীষণ পণওয়ালা।

হাসি পেল, কিন্তু হাস্‌লাম না, উদ্‌গ্রীব হ'লাম।

নন্দলাল এসে পৌঁছলেন খুব ধীর গতিতে, এমন ধীর গতিতে যেন নেহাত্‌ অনিচ্ছায় সঙ্গে অনুগ্রহ করছেন, না এলেও ক্ষতি ছিল না।

নন্দলালকে বসিয়ে এঁরা প্রশ্নবৃষ্টি করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু তা' বৃষ্টিরই মত যেন মরুভূমির বালির উপর টপাটপ্‌ শুকিয়ে উঠে' বৃথা হ'তে লাগ্‌ল'—নন্দলাল একটি প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। কখন্‌ এলে, কেমন আছ, হা'লচা'ল কি রকম, দেশের অবস্থা কি, স্বাধীনতা কতদূর, ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এঁদের অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

নন্দলালকে লক্ষ্য করলাম—

আবিষ্কারক কবির কবিতায় চেহারার বর্ণনা কিংবা ইঙ্গিতও নাই। আমি তাঁর পণের বিভীষিকা বিস্মৃত হ'য়ে চেহারাটা লক্ষ্য করলাম। রং এমন যা' কখনো কখনো ফর্সা দেখায়, যথা, স্নানের পরই দুপুরের রোদের আভায় দাঁড়ালে, কিংবা যখন তোয়ালে দিয়ে খুব করে' মুখ ঘষে' বৈকালিক রোদের আভায় ভিতর নিজের মুখ আয়নায় দেখা যায় ; তা' ছাড়া নন্দলালের রং কালোই ; কপাল মসৃণ, রেখাঙ্কিত নয় ; নাক উঁচু নয়—ডগাটা একটু মোটা বলে' বেশি ঝক্‌ঝকে মনে হয় ; টিকি যেখানে রাখা হয় সেই স্থানটার চুলগুলি খাড়া খাড়া, অবশিষ্ট চুলের সাম্‌নের দিক্‌টা পাত্‌লা, পিছন দিক্‌টা ঘন ; কানের যে অংশ ঝুলে থাকে নন্দলালের সেটা ভারি পুরু ; শরীর এককালে স্বাস্থ্যবানের মতই ছিল, এখন অনেক টস্‌কে গেছে, বয়সের দরুণ বা দুর্ভাবনায়। পোষাক সাধারণ, পাঞ্জাবী ইত্যাদি—সেনাপতির পরিচ্ছদের মতো একটুও নয়।

কিন্তু আমাকে বিভ্রান্ত করল তাঁর চেহারা বা বেশ নয়, তাঁর কঠোর নিঃশঙ্কতা আর স্থির প্রসারিত দৃষ্টি। এতগুলি লোকের জীবসত্তা একেবারেই অনুভব না করে' নন্দলাল একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সম্মুখের দিকে…তারপরই আমার মনে হ'ল, নন্দলালের এ-দৃষ্টির অর্থাৎ আমাদের প্রতি অমনোযোগের কারণ ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা নয়—তিনি অন্তত্র অবস্থিত একটা-কিছুর প্রতি অবহিত হ'য়ে আছেন ; অনতিস্বচ্ছ আবরণের ওদিকে কি আছে তা' দেখ্‌তে সচেষ্ট হ'লে মানুষের দৃষ্টি যেমন ভৌতিক-ভাবে দুর্ব্বোধ্য আর তীক্ষ্ণ এবং কষ্টকরভাবে নির্নিমেষ হ'য়ে থাকে, নন্দলালের এখনকার এই দৃষ্টি ঠিক তেমনি…

নন্দলালের সাম্‌নে রয়েছে খানিকটা দূর্ব্বাবৃত পতিত স্থান, যাকে বলা চলে উঠান্‌ ; ঐ উঠানের এক প্রান্তে আছে দু'টি দুর্ব্বল খর্জ্জুর বৃক্ষ, অন্য প্রান্তে নিম্ববৃক্ষ একটি, তার পাশেই একটা বকফুলের গাছ, তার উত্তরে খড়ের পাগুই একটা, তার উত্তর হইতে দক্ষিণের খানিকটা স্থান আখের ক্ষেতে অন্ধকার, ক্ষেত ঘেঁষে ভাঙা বেড়ার অভ্যন্তরে কয়েকটি বেলফুলের ঝাড়…এ-সকলের মাথার উপর বিরাজ করছে দূরের একটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষ—এখন সূর্য্য ঐ বটবৃক্ষের আড়ালেই আছেন ; আর ঊর্দ্ধে দেখা যাচ্ছে আকাশ—

নন্দলালের দৃষ্টির পরিধি ঐ দৃশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক্‌তে বাধ্য ; এক সূর্য্যই নিত্য নূতন—তাঁর ঔজ্জ্বল্য আর সমারোহ লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিংবা তাঁর দৈনন্দিন আবির্ভাবের ভিতরেও প্রিয় বস্তুর নৈমিত্তিক আবর্ত্তনের যে আনন্দ-আবেদন আছে সে-বিষয়ে একাগ্রচিত্তে এবং গভীরভাবে চিন্তা করা কারো কারো পক্ষে সম্ভব ; কিন্তু তার দরুণ দৃষ্টি চক্রবালে বিলীন বা দূরতম কল্পিত একটা স্থানে বিদ্ধ হ'য়ে থাকার কথা নয় ত' ! নন্দলালের দৃষ্টি মাঝে মাঝে কেমন যেন অর্থহীনও মনে হ'চ্ছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মনে পড়ল' পূর্ণ চ্যাটার্জ্জির বিষয়ে একটা পরমাশ্চর্য্য কথা। একদা কাজ করতাম পূর্ণর সঙ্গে…এবং তারই সঙ্গে একদিন দেখতে গেলাম 'টকি' ; তখন বৈজ্ঞানিক ঐ ব্যাপারটা খুবই নূতন। দু'জনে বসে দেখ্‌তে লাগলাম এবং মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতে

লাগলাম পূর্ণর রকম—দেখা গেল, তার দৃষ্টি সম্মুখস্থ সব-কিছুকে অতিক্রম করে' যেন দৃষ্টির অতীত একটা বিন্দুতে নিমগ্ন হ'য়ে গেছে।

টকি দেখা শেষ হ'ল—

পথে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেমন দেখলে প্লে অথবা পালা?

পূর্ণ যেন চমকে উঠল; বল্ল,—কি বলছ? প্লে, পালা? কিছু দেখিনি।

—তবে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলে কি?

—আমি দেখছিলাম, ছায়াগুলো নড়্‌ছে আর কথা বল্‌ছে। অবাক্ হ'য়ে কেবল তা'-ই দেখছিলাম…

বুঝা গেল, পূর্ণ প্লট অভিনয় প্রভৃতি কিছুই লক্ষ্য করে নাই—দৃষ্টির অতীত স্থানেই তার মন আর চক্ষু বিচরণ করছিল পরম বিস্ময়ের ঘোর লেগে, আর, অচিন্তনীয় আবিষ্কারের তারিফ করে' করে'…ছায়া নড়ছে আর কথা বল্‌ছে—এটা কেমন করে' হ'ল!

নন্দলালের এই দৃষ্টির মূলে তেমনি অবাক্-ভাব কিছু আছে কি!

নন্দলাল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না দেখে এঁরা সবাই কিছু হতোদ্যম হয়েছিলেন; কিন্তু বসন্ত করলেন নন্দলালের এই আচরণের স্পষ্ট প্রতিবাদ; বল্লেন,—নন্দ, আমাদের সঙ্গে কথা কইছ না; নূতন একজন ভদ্রলোক, গাঁয়ের অতিথি তিনি, তাঁর কাছে তোমাকে ডেকে' আনলাম—তাঁর সঙ্গেও আলাপ করবার আগ্রহ নাই; এ কেমন আচরণ তোমার? অথচ তুমি দেশের এমন খাঁটি একটা মাতব্বর লোক যে গল্পেও তুমি অধিনায়কত্ব করবে এই আশাই আমরা করি।

নন্দলালের দৃষ্টি বিচলিত কিংবা তার প্রকারের ব্যতিক্রম হ'ল না, কিন্তু কথা তিনি বল্লেন; অপরিসীম খেদের সঙ্গে ম্লান কণ্ঠে বল্লেন,—কি দুর্গতি মানুষের!

অপূর্ব্ব বল্লেন,—চিরকাল লাগাই আছে…

কিন্তু আমি নন্দলালের জগদতীত দৃষ্টির অর্থ যেন উপলব্ধি করলাম; পূর্ণ চ্যাটার্জ্জির মতোই তিনি প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা ত্যাগ করে' ঘটনার মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন; কিংবা মূল একটা পেয়ে তারই দিকে চেয়ে বসে আছেন, আর মনে মনে অবিশ্রান্তভাবে বলছেন, এ কি দেখছি, এ কি ব্যাপার!…এই মুহূর্ত্তে সম্মুখস্থ উদ্ভিদ খর্জ্জুর বৃক্ষের মতো আমরাও অস্তিত্বহীন…

যোগেশ বল্লেন, খুলেই বলো না, বাপু, যদি কাউকে না বলার পণ তোমার সত্যিই না থাকে।

সবারই মুখে একটা হাসির ভঙ্গী দেখা দিল; নন্দলাল তা' দেখলেন না; বল্লেন,—রূপনগর থেকে এখন আসছি। সেখানকার বিনয়ভূষণ রায়ের মেয়ের বিয়ে কা'ল…

—বটে! দুর্গতি ত' তা' হ'লে আমাদের খুব পিছু নিয়েছে!—বলে' নীরদ হাসতে লাগলেন।

যোগেশ বল্লেন,—নেমন্তন্ন বাগিয়েছ কিনা তা'-ই বলো…

বলার সঙ্গে সঙ্গেই যা' ঘটল' তা' অপ্রত্যাশিত, এবং তা' নন্দলালের অভিনয় কি সত্যকারের মনোগত ভাবের অভিব্যক্তি তা' জানিনে…

নন্দলাল হঠাৎ তীরের মতো সোজা হ'য়ে তীরবেগে উঠে' দাঁড়ালেন—ভ্রূভঙ্গী করে' থাক্‌লেন, আর, রুখে রুখে তীব্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন, —তোমরা খুঁজছ নেমন্তন্ন, কিন্তু নন্দলাল তা' খোঁজে না—কস্মিনকালেও না—সে বেহায়া নয়, নির্ম্মমও নয়। বিনয় রায়ের ভাঙা চাল—ভাত ভিক্ষে জোটে না—মেয়ের বিয়ে দেবে—শাঁখা কেনার কড়ি নেই। এই নন্দলাল তাকে দিয়ে এল নগদ পাঁচটি টাকা—বুঝলেন, মহোদয়গণ, তহবিল থেকে নগদ পাঁচটি টাকা—ধারণা করতে পারেন!—ব'লে নন্দলাল লাফিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নাম্‌লেন; তারপর চলতে চলতে বলে গেলেন—নীরবে অভাবীর দুঃখ ঘুচানো, অর্থাৎ পরোপকার করাও, আমার একটা পণ। যত পারেন ঠাট্টা করুন, আর, কূপমণ্ডুকের মতো কুয়োর ভেতরেই লাফালাফি করুন।

আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম—

কথা উচ্চারণ করার একটা দিশে পাওয়ার পর অপূর্ব্ব এক সময় ধীরে ধীরে বল্লেন,—রূপনগর গাঁয়ে আমার শ্বশুর বাড়ী; বিনয়ভূষণ রায় নামে কোনো লোক সেখানে নাই…

কিন্তু নন্দলাল ততক্ষণে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন।

শতাব্দীর অভিশাপ

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্‌-এ

শতাব্দীর অভিশাপ স্তূপীকৃত হ'লো থরে থরে—
অনেক অনেকদিন ঘুরে গেছে কালের প্রহরে।
অতীতের ইতিহাস যেন আজ হারানো স্বপন—
আমরাও হ'য়ে গেছি মিশরের 'মমির' মতন!
কোথায় স্বপন আজ, দেহে মনে নেমেছে অসুখ—
দাসত্ব-জীবন-ক্লিষ্ট, নিভে গেছে জীবনের সুখ:
সোনার মৃগের আশে বৃথা ঘুরি আজো বারবার—
আমাদের আছে জানি মরণের শুধু অধিকার!
ত্রিশঙ্কু জীবন আর শুধু ব্যথা বেদনা সংশয়—
সংসার-সমর-যোদ্ধা—আমাদের এই পরিচয়!
আমরা মানুষ তবু—মানুষের নেই অধিকার;
দুবীর জীবন ঘিরে এলো নেমে মৃত্যুর আঁধার।

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

এই নাটকখানি রচনায় একটী ইংরেজী বই ও কয়েকটী "মেডিক্যাল জার্ণালের" সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরিচয়-লিপি

আব্দুল রেজা	...	জেল ফেরত আসামী
প্রতুল চৌধুরী	...	এমেচার কেমিষ্ট
জনার্দ্দন	...	প্রতুলের ভৃত্য
ডাঃ নিরঞ্জন গুপ্ত	...	বিখ্যাত সার্জ্জন
মল্লিকা বসু	...	ব্যারিষ্টার দ্বিজেন বসুর একমাত্র কন্যা
ডাঃ সুবোধ রায়	...	উদীয়মান সার্জ্জন
গিরীন পাত্র	...	অল ইণ্ডিয়া ষ্টীল কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী
খগেন দত্ত	...	ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর
রামটহল	...	কনষ্টেবল
লোকেন চাটুজ্জে	...	পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
দ্বিজেন বোস	...	ব্যারিষ্টার ও এম এল এ
কর্ণভূষণ ঘোষ	...	অল ইণ্ডিয়া ষ্টীল কর্পোরেশনের কেশিয়ার
শোভা সিং	...	ব্যাঙ্কের ভ্যান ড্রাইভার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রতুল চৌধুরীর বাড়ী। ঘরটা বসিবার ও পড়িবার এবং কিছু গবেষণা করিবার। পাশে একটী ছোট দরজা দেখা যাচ্ছে, তাতে লেখা আছে "Laboratory"। ঘরে কয়েকটা বড় বড় জানলা আছে। একটী জানলার কাছে ঈজেলে একটী প্রায় সমাপ্ত মল্লিকা বসুর অয়েল পেন্টিং। তার পাশে ছোট টেবিলে রং, পেন্সিল, ব্রাশ ইত্যাদি ছবি আঁকবার সরঞ্জাম। প্রতুল শুধু গায়, কালো ফুল প্যাণ্ট ও চোখে কালো চশমা পরে একটী টুলে বসে। তার নগ্ন গায়ের ওপর "আল্ট্রা ভায়োলেট রে" এসে পড়ছে। 'রে'র যন্ত্র পিছনের দেয়ালে ফিট করা। আব্দুল রেজা ঘড়ি ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সোফার ওপর প্রতুলের ড্রেসিং গাউন পড়ে আছে।

রেজা। পিঠ একেবারে লাল হয়ে গেছে স্তর।

প্রতুল। আরও পনেরো সেকেণ্ড।

রেজা। আচ্ছা—পাঁচ দশ, তেরো, পনেরো—

প্রতুল। (ঘুরে পাশটা আলোর দিকে দিয়ে) ঘড়িটা টিপে দাও।

রেজা। দিয়েছি।

প্রতুল। আবার টেপ। ষ্টার্ট—তিন মিনিট, বুঝলে ?

রেজা। (ঘড়ি টিপে) হ্যাঁ স্তর। এ একরকম সূর্য্যের আলো, না ?

প্রতুল। হ্যাঁ। আল্ট্রা ভায়োলেট্ রে।

রেজা। আজকে আমার একটু বচসা হয়ে গেছে—

প্রতুল। কার সঙ্গে ?

রেজা। আপনার চাকরের সঙ্গে।

প্রতুল। জনার্দ্দনের সঙ্গে ? কেন ?

রেজা। সে বলছিল—'নেহাৎ বেশী মাইনে পাই তাই আছি। আমাদের বাবু সাধারণ মানুষের মত ন'ন। খাওয়া, দাওয়া—

প্রতুল। (বিরক্ত ভাবে) জনার্দ্দনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে তুমি ভবিষ্যতে কোন দিন আলোচনা করবে না।

রেজা। তাতে আমি বললুম—"তোমার মাইনে পাওয়া নিয়ে দরকার। কর্ত্তা কি খান, কি করেন তাতে তোমার কি ?"

প্রতুল। আর কখনও ওর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক কোরো না। সে একটা সামান্য চাকর বই তো নয়। তুমি অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখেছিলে—

রেজা। হ্যাঁ স্তর। মিড্‌ল্ অবধি পড়েছিলুম, কিন্তু খারাপ সঙ্গে—

প্রতুল। যাক, সে সব কথা। জনার্দ্দনকে নাই দিও না।

রেজা। না স্তর। আপনার ওষুধ পত্তর, আলো—ঐ ঘরটা—

প্রতুল। ল্যাবরেটরী ?

রেজা। সে ঐ সম্বন্ধে আমায় একদিন প্রশ্ন করছিল।

প্রতুল। রেজা, তুমি আমার কাছে কেন আস সে কথা কি তাকে কোন দিন বলেছ ?

রেজা। না স্তর।

প্রতুল। তোমার আগেকার ইতিহাস—

রেজা। না স্তর, সে কি কখনও বলতে পারি। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল বটে—

প্রতুল। তুমি কি জবাব দিলে ?

রেজা। আমি বলেছি যে আগে এক সাহেবের চাকর ছিলুম। তিনি বিলেত চলে যেতে আপনার কাছে এসেছি। ভাবভঙ্গীতে মনে হয় সে আমার কথা বিশ্বাস করে নি।

প্রতুল। হুঁ।

রেজা। যদি সে শোনে যে আমি শ্রীঘর ফেরত—তবে ভবিষ্যতে আর অসৎ পথে যাব না।

প্রতুল। এবার তো ওপথ তোমার ছাড়া সম্ভবপর হবে।

রেজা। হ্যাঁ স্তর। আপনার সঙ্গে আজ্ঞা সাক্ষাৎ না করিয়ে দিলে

হয়ত' আরও অধঃপতন হ'ত। আপনি আমায় যা দেবেন তাতে আমি দেশে গিয়ে একটা ছোটখাটো দোকান করে ভদ্রভাবে বসবাস করব। আপনার কাছে চিরজীবন আমি ঋণী হয়ে থাকব।

প্রতুল। মোটেই না। তুমি আমার কাজ করবে আমি তার দরুণ টাকা দেব। এতে ঋণ কোথায়?

রেজা। (একটু পরে) যদি কিছু না মনে করেন স্তর, একটা কথা জিগেস করব?

প্রতুল। কি?

রেজা। কাজ কবে থেকে আরম্ভ হবে?

প্রতুল। আজ সন্ধ্যার পরে হয়ত' কিছুটা আরম্ভ করা যেতে পারে।

রেজা। যাঁদের আসবার কথা আছে, তাঁরা এলে।

প্রতুল। হ্যাঁ।

রেজা। ওঁরা কবে নাগাদ কাজটা—

প্রতুল। এই দিন কয়েকের মধ্যে। তোমার ভয় করছে না তো?

রেজা। না স্তর। পাঁচশো টাকা, বড় চারটিখানি কথা নয়। (একটু পরে) আচ্ছা স্তর, লাগবে না তো?

প্রতুল। না। ক্লোরোফর্ম করে—

রেজা। তবে আর কিসের ভয়।

প্রতুল। কিছু না। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার।

রেজা। (ঘড়ি টিপে) তিন মিনিট হয়ে গেছে স্তর।

প্রতুল। বেশ। আলোটা নিভিয়ে দাও।

রেজা আলো নিভিয়ে দিলে। প্রতুল উঠে ড্রেসিং গাউন পরলে

রেজা। আচ্ছা, স্তর গ্ল্যাণ্ড না কি ক'দিন বললেন তা বদলালে মানুষ বাঁচে।

প্রতুল। হ্যাঁ। বাঁচে।

রেজা। গ্ল্যাণ্ড দিয়ে কি হয়?

প্রতুল। জীবনীশক্তি। রেজা, তুমি ডাক্তার নও, এসব ঠিক বুঝতে পারবে না।

রেজা। ভারী শক্ত ব্যাপার, না?

জনার্দনের প্রবেশ

জনার্দন। হুজুর—

প্রতুল। কি জনার্দন—

জনার্দন। একজন ভদ্রলোক এসেছেন— কার্ড দিল

প্রতুল। (কার্ড দেখে) যাও, ওঁকে এইখানে নিয়ে এস। তারপর তোমার ছুটী। আজ আর কোনো দরকার হবে না।

জনার্দন। যিনি এসেছেন, তাঁর যদি কোনো—

প্রতুল। রেজা রইল।

জনার্দন। কিন্তু হুজুর এখনও ছ'টা বাজে নি, সবে পাঁচটা—

প্রতুল। (বিরক্ত ভাবে) তা হোক্। আজ একটু সকাল সকাল ছুটী দিলুম।

জনার্দন। আচ্ছা হুজুর।

জনার্দনের প্রস্থান

প্রতুল। ঐ গেলাসে যে জলটা আছে নিয়ে এস।

রেজা। দিচ্ছি স্তর।

জলের গেলাস এনে দিল

প্রতুল। (গেলাস নিয়ে) ঐ ষ্ট্রং আলোটা একবার জ্বেলে দাও।

রেজা। দিচ্ছি স্তর।

আলো জ্বাললে

প্রতুল আলোর সামনে জলের গেলাসটা ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে। পরে টেবিলের একটা দেরাজ খুলে একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা লাল ওষুধ মিশিয়ে পান করলে। শিশিটা আবার দেরাজে রেখে চাবী বন্ধ করে দিলে। ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত ঘরে ঢুকলো। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। প্রতুল এগিয়ে গিয়ে তাকে রিসীভ করলে।

প্রতুল। তার পর নিরঞ্জন, ভাল তো?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। (রেজাকে দেখিয়ে) উই ক্যাণ্ট টক বীফোর হিম্। —

প্রতুল। তোমার লাগেজ—

নিরঞ্জন। নীচে, সিঁড়ির কাছে—

প্রতুল। রেজা, ওপরে যে ঘরটা এঁর থাকবার জন্য ঠিক করে রেখেছি, সেইখানে এঁর জিনিসপত্তর সব রেখে এস।

নিরঞ্জন। খুব সামলে নিয়ে যেও। তিনটে স্যুটকেশ, একটা বেডিং—

রেজা। আচ্ছা স্তর।

প্রস্থান

নিরঞ্জন। কে বলবে যে তুমি আমার চেয়ে পনেরো বছরের বড়? পঁয়ত্রিশের একদিন বেশী দেখায় না। দিস ইজ এ মির‍্যাক্‌ল্। সাত বছর আগে যেমনটী তোমায় লাষ্ট দেখেছি, আজও ঠিক সেই রকমই আছ।

প্রতুল। থ্যাঙ্ক ইউ। বস। তোমাকেও তো ভালই দেখছি।

নিরঞ্জন। ষাটের ওধারে মানুষ যে রকম থাকতে পারে আমি সেই রকম আছি। স্বাস্থ্য এবং চেহারা দুইই সেই বয়সের ওজনে ভালই আছে। কিন্তু আশী বছরের কাছাকাছি গিয়ে পঁয়ত্রিশের শরীর, চেহারা—

প্রতুল। লাইক এ ড্রিঙ্ক।

নিরঞ্জন। ডোণ্ট মাইণ্ড। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই বয়সে এত লম্বা জার্নী ক্রম বম্বে টু ক্যালকাটা, ননষ্টপ।

প্রতুল। (একটা গেলাসে মদ ঢেলে) সোডা দেব?

নিরঞ্জন। খুব কম। একটা "পিক্-মী আপ" দরকার।

প্রতুল। (সামান্ত সোডা মিশিয়ে নিরঞ্জনকে মদের গেলাস দিয়ে) এই নাও।

নিরঞ্জন। (এক চুমুক খেয়ে) আঃ। তারপর, এই লোকটা যে ঘরে ছিল, সেই বুঝি তোমার নিউ ভিকটিম?

প্রতুল। ভিক্‌টিম্‌ বোলো না। পয়সা দিয়ে কাজ নিচ্ছি।

নিরঞ্জন। তা দিচ্ছ, কিন্তু এর ফলাফল—

প্রতুল। পয়সার জন্য লোকে খুনও করে থাকে।

নিরঞ্জন। কিন্তু আত্মহত্যা জেনে শুনে করে না।

প্রতুল। তাও করে।

নিরঞ্জন। স্পেসিমেন কিন্তু ভাল নয়। স্বাস্থ্যটা খারাপ—

প্রতুল। গ্রূপ দেখতে হবে। গ্রূপ মিলে গেলে একে দিয়েই কাজ চলবে। আগে পরীক্ষা করে ছাখো—

নিরঞ্জন। আজ আর হবে না। কাল সকালে—

প্রতুল। বেশ তো। তাড়াতাড়ি কিসের। আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এত কষ্ট করে এসেছ, এর জন্য যে আমি তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ—

নিরঞ্জন। সাত বছর পরে দেখা—

প্রতুল। আমি খুবই দুঃখিত যে ষ্টেশনে যেতে পারলুম না—

নিরঞ্জন। তুমি যে সূর্য্যের আলো কমে গেলে বাড়ী থেকে বেরোতে পার না, তা আমি জানি। আচ্ছা, এর কি কোন প্রতীকার নেই?

প্রতুল। বোধ হয় না। আমি তো যত কিছু নতুন এবং পুরানো বই পেয়েছি সব তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু নো গুড। কোন উপায়ই বার করতে পারি নি। এ ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে পড়ছে।

নিরঞ্জন। রেডিয়াম ওয়াটার খাওয়া ছাড়লে—

প্রতুল। ছাড়বার উপায় নেই। ছাট ইজ এসেন্‌শিয়াল। নইলে টিস্যুজ কাজ করবে না। এ অনেকটা এক্‌সটার্নাল ফোর্সের মত। আমায় দেখছ—

নিরঞ্জন। দেখছি! এবং যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। জগতে তুমি একটা অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করেছ—

প্রতুল। তোমার মত বন্ধু পেয়েছিলুম বলেই এই জীবন মরণের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে সাহস করেছিলুম—

নিরঞ্জন। যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ অমর হবার স্বপ্ন দেখেছে, কালের করাল গতিকে আটকে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে, স্বাস্থ্য, যৌবন সময়কে ঠেকিয়ে অটুট রাখবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়েছে। মর জগতে সশরীরে অমর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু বন্ধু, তুমিই প্রথম পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম চূর্ণ করে অমরত্বের পথে পা দিয়েছ। বৎসরের পর বৎসর ধরে তুমি নিজেকে পঁয়ত্রিশ বছরে আবদ্ধ রেখেছ—

প্রতুল। সবই তোমার জন্য সম্ভবপর হয়েছে—

নিরঞ্জন। চেষ্টা করলে তুমি বোধহয় মৃত্যুকেও ঠেকিয়ে রাখতে পার।

প্রতুল। হয়ত' পারি, কিন্তু বাধা বিঘ্নও অনেক আছে।

নিরঞ্জন। তোমার সেগুলিকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা আছে।

প্রতুল। আজ হতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই কার্য্যে প্রথম হাত দিই—সুদূর দিল্লীতে। তখনকার স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে। কালের করাল গতিকে আমি অগ্রাহ্য করেছি। আমার শরীর, স্বাস্থ্য, চেহারার ওপর তার কোন ছাপ সে আঁকতে পারে নি।

নিরঞ্জন। এবং আশা করি ভবিষ্যতেও পারবে না। ভগবান তোমার উদ্দেশ্য ও সাধনা সফল করুন। দেবতার অমরত্ব মর জগতে তুমি প্রথম লাভ করেছ। ঋষি দুর্লভ অমূল্য রত্ন তুমি অর্জ্জন করেছ।

প্রতুল। এখন অবধি ভাগ্য আমার ওপর সুপ্রসন্ন আছে।

নিরঞ্জন। আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমি আর থাকব না। বোধহয় এইবারই আমার শেষ। এর পর যখন সাত বছর পরে আবার আমাকে তোমার দরকার হবে, তখন হয়ত' আমি ইহজগতে থাকব না।

প্রতুল। আমার অত্যন্ত ক্ষতি হবে। সে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে কিনা কে জানে? তোমার ওপর আমার যা বিশ্বাস এবং নির্ভরতা, তোমার অবর্ত্তমানে সে রকম সুযোগ্য লোক কি আর পাওয়া যাবে?

নিরঞ্জন। যে নতুন ডাক্তারের কথা তুমি লিখেছিলে—

প্রতুল। ডাক্তার সুবোধ রায়। আমার সঙ্গে এখনও তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি—

নিরঞ্জন। যাক্‌, তার কথা পরে হবে। সে এলে দেখা যাবে পারবে কিনা? (একটু পরে) কোথায় করবে? এইখানে?

প্রতুল। না। একটু নিরিবিলি স্থানে। কোথাও দূরে, কোন বাগান বাড়ীতে—

নিরঞ্জন। তোমার নিজের কোন ল্যাবরেটরী নেই?

প্রতুল। (ল্যাবরেটরীর দরজার দিকে দেখিয়ে) ঐ ঘরটায় একটা ছোটখাটো ল্যাব করেছি, কিন্তু ওতে কাজ হবে না।

নিরঞ্জন। দেখতে হবে।

প্রতুল। নিশ্চয়ই দেখবে। তবে ওটা ঠিক ল্যাব নয়। ওষুধপত্তর কেনবার জন্য একটা ওজুহাত দরকার, তাই ওটা রেখেছি।

নিরঞ্জন। (প্রতুলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে) এখনও সব জিনিষ জোগাড় হয় নি? কেন, হাতে টাকা নেই?

প্রতুল। না। তবে শীঘ্রই যাতে আসে তার বন্দোবস্ত করেছি।

নিরঞ্জন। সেই আগেকার মত।

প্রতুল। হ্যাঁ। ঠিক সেই আগেকার মত।

নিরঞ্জন। লোকটা? (প্রতুল চুপ করে রইল) প্রতুল, আমি জিগ্যেস করছি লোকটার কি হবে?

প্রতুল। তাকে সরিয়ে ফেলা হবে।

নিরঞ্জন। বার বার—

প্রতুল। এছাড়া আর কোন পথ নেই। আমায় নিরাপদে থাকতে হবে তো। যদি সে বেঁচে থাকে, এবং কোনদিন সব কথা প্রকাশ করে ফেলে, তাহলে আমার সমূহ বিপদ।

নিরঞ্জন। লোকটা কে? যে ঘরে ছিল সে নয় তো?

প্রতুল। না। এ অল ইণ্ডিয়া ষ্টীল কর্পোরেশনে কাজ করে। সেখানকার একজন ক্যাশিয়ার।

নিরঞ্জন। তার জন্য আমি দুঃখিত।

প্রতুল। আমি কি সুখের জন্য এসব করি? বাধ্য হয়ে করতে হয়।

যাতে তাদের কোন কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করি। তারা জানতেও পারে না—

নিরঞ্জন। যে তারা সকল জ্বালার বাইরে চলে গেছে। (একটু থেমে) অন্যপথে কি টাকা জোগাড় করা যায় না?

প্রতুল। হয়ত' যায়, কিন্তু আমার এই সাধনা গবেষণার সঙ্গে টাকা রোজগার করা সম্ভবপর নয়। দু'চার বছর পরেই আমাকে স্থানান্তরিত হতে হয়।

নিরঞ্জন। তা বুঝি। এক জায়গায় বেশী দিন থাকলে লোকে দেখতে পাবে যে তোমার বয়স বাড়ে না, তুমি বদলাও না।

প্রতুল। আমার এই বৈজ্ঞানিক তপস্যার জন্য এ সবই প্রয়োজন। শেষ অবধি যদি অগ্রসর হতে পারি তবে জগত থেকে মৃত্যুকে বিদায় নিতে হবে।

নিরঞ্জন। কিন্তু তার পূর্ব্বে এতগুলি মৃত্যু—

প্রতুল। একটু বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়ে জিনিষটাকে দেখে বিচার কর।

নিরঞ্জন। এক এক সময় মনে হয় যা করছ তা সত্যই মহৎ আবার কখনও কখনও সন্দেহ হয় সমস্তই অপরাধ, পাপ। লোকগুলির জন্য দুঃখ হয়, মায়া হয়—

প্রতুল। চিকিৎসা শাস্ত্রে যত কিছু নতুন ওষুধ অথবা তথ্য আবিষ্কার হয়েছে তার পিছনে অনেকগুলি জীবন ত্যাগের ইতিহাস আছে। স্যাকরিফাইস কর এ নোব্‌ল কজ। আমি যে অমূল্য রত্ন জগৎকে দান করব তার তুলনায় এ কয়েকটা প্রাণের দাম কতটুকু?

নিরঞ্জন। তা ঠিক—তবে যদি দান হয়?

প্রতুল। কেন, তোমার কোন সন্দেহ আছে?

নিরঞ্জন। যদি সন্দেহ হয়ও, সে কথা তোমায় এখন জানাব না। তবে একটা কথা বলতে ইচ্ছা হয়—

প্রতুল। কি কথা?

নিরঞ্জন। একটা প্রাণ অমরত্ব লাভ করবে অনেকগুলি প্রাণকে বিনষ্ট করে।

প্রতুল। এখন তাই বটে। কিন্তু যদি আমি অমরত্ব লাভ করতে পারি, কিম্বা যদি আরও কিছুদিন সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে পারি, তবে চেষ্টা করব অন্য মনুষ্যের সাঁহায্য না নিয়ে এ কাজ সম্ভব কিনা সেই তথ্য আবিষ্কার করতে। কিন্তু যদি আমি যাই তবে এসারেন্সটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। আমি ছাড়া এ লাইনে আর কেউ এতদূর অগ্রসর হয়েছে বলে জানি না।

নিরঞ্জন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে তুমি যা বলছ তা উচিত এবং যথার্থ। (একটু পরে) তারপর এসব কাজকর্ম চুকে গেলে তুমি আবার এখান থেকে সরে পড়বে, কেমন?

প্রতুল। যেতেই হবে। মাসখানেকের মধ্যে—

নিরঞ্জন। সেই বোধ হয় আমাদের শেষ বিদায় হবে। যাক্, সে সব [illegible]

প্রতুল। বিশেষ কিছু নেই—

ল্যাবরেটরীর দরজার চাবী খুলতে খুলতে

অনেক জিনিষই করবার আছে, কিন্তু এখানে উপযুক্ত স্থান ও মেটিরিয়ালের অভাবে করে উঠতে পারছি না।

ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত উঠে ল্যাবের দিকে যাচ্ছে এমন সময় টাঙানো রাখা ছবিটার দিকে নজর পড়ল। এতক্ষণ সেটা দেখে নি, কারণ জানালার পাশে থাকবার জন্য তার ওপর আলো পড়ে নি। ছবিটার কাছে গিয়ে আলো জ্বাললে।

নিরঞ্জন। চমৎকার! এ কে?

প্রতুল। (চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে) অ্যাঁ! ওঃ, এই ছবিটার কথা বলছ? একটা মহিলা। নৈনীতালে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

নিরঞ্জন। বাঙ্গালী মনে হচ্ছে।

প্রতুল। হ্যাঁ। কলকাতায়ই থাকেন।

নিরঞ্জন। সেই জন্য কি তুমি এবার কলকাতায়—

প্রতুল। না, ঠিক সেইজন্য নয়। ডাক্তার সুবোধ রায়ের সঙ্গে তিনিই আলাপ করিয়ে দেবেন বলেছেন। তাই—

নিরঞ্জন। (ছবির দিকে চেয়ে) খুব ভাল হয়েছে। কত দিন পরে তুলি ধরেছ?

প্রতুল। বহুদিন পরে। পছন্দ হয়েছে?

নিরঞ্জন। সেই আগেকার মত রঙ ব্যবহার করেছ। দিল্লীতে আর্ট প্রদর্শনীতে তোমার অঙ্কন পদ্ধতি বিশেষ করে রঙের কাজ দেখে ধন্য ধন্য পড়ে গিছল, মনে আছে। সে আজ প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা।

প্রতুল। এ রঙ্‌ বাজারে পাওয়া যায় না। আমি নিজে তৈরী করি রঙ তৈরী করা হ'ল কেমিষ্ট্রির অঙ্গ।

নিরঞ্জন। বন্ধু, আমি তোমার সম্বন্ধে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে পড়ছি।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। এই ছবির মুখের ভাব দেখে।

প্রতুল। খারাপ হয়েছে?

নিরঞ্জন। না, ভাল হয়েছে, অপূর্ব্ব হয়েছে। কিন্তু মুখের ঐ হাসি চোখের ঐ নীরব ভাষা—কোথায় পেলে তার সন্ধান? তোমার মনে ও জিনিষ শুধু চোখে ধরা যায় না, হৃদয়ের অন্তরতম কোণে অনুভব করতে হয়।

প্রতুল। মানে?

নিরঞ্জন। অত্যন্ত সোজা। তুমি প্রেমে পড়েছ। সাধনা আর প্রেম এক সঙ্গে হয় না। বড় বড় জিতেন্দ্রিয় মুনি-ঋষিরাও নারীর প্রলোভনে পড়ে তপস্যাচ্যুত হয়েছেন।

প্রতুল। (হেসে) না, না, তুমি একেবারে ভুল বুঝেছ। ব্যাপারটা কি জান? আমি স্বাস্থ্য, যৌবন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় ধারা আটকে রেখেছি, কিন্তু মনটাকেও তো সেই রকম রাখতে হবে। তাই আমার দরকার একটা [illegible]—

নিরঞ্জন। (হেসে) ভাল!

প্রতুল। ঠাট্টা নয়। শরীরের ওপর মনের আধিপত্য কতখানি তা তো জান।

নিরঞ্জন। নিজের সঙ্গে বঞ্চনা কোরো না প্রতুল।

প্রতুল। আমি সত্য কথাই বলছি।

নিরঞ্জন। আমি এই ভয়ই চিরকাল করে আসছি। আশী বছরকে পঁয়ত্রিশে আবদ্ধ রাখতে গিয়ে কোন দিন মনটাকে সেই বয়সের চাঞ্চল্যে মাতিয়ে ফেলবে।

প্রতুল। বিশ্বাস কর, আমি প্রেমে পড়ি নি।

নিরঞ্জন। তোমার অঙ্কিত এই ছবিই তোমার মনের আসল পরিচয় দিচ্ছে। তুমি দু' নৌকায় পা দিয়েছ। পতন অনিবার্য্য। এখনও পথ বেছে নেবার সময় আছে, নইলে দুইই হারাবে।

প্রতুল। তুমি অনর্থক মন গড়া বিপদ সৃষ্টি করে ভয় পাচ্ছ।

নিরঞ্জন। নিজের জন্য নয় তোমার জন্য। প্রতুল, তুমি আমার বন্ধু। বাড়িয়ে বলছি না, আমার মতে তুমি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। সেই জন্য তোমার শত অপরাধ আমার মনুষ্যত্বকে আঘাত করলেও আমি নীরবে সর্ব্ব কাজে তোমায় সাহায্য করে এসেছি। আমি তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না। নারী পৃথিবীতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান, কিন্তু আবার সেই নারীই সবচেয়ে সর্ব্বনাশী। হেলেন, সীতা, পদ্মিনী, এদের কথা ভুলে যেও না। সাবধান বন্ধু, এখনও সময় আছে।

প্রতুল। জানি—

নিরঞ্জন। তোমার এই সাধনা, গবেষণা সব জলাঞ্জলি দিতে হতে পারে।

প্রতুল। না। তা অসম্ভব।

নিরঞ্জন। এতটা আত্মপ্রত্যয় ভাল নয়।

প্রতুল। এ শুধু আত্মপ্রত্যয় নয়, এ আমার জীবন। এতখানি এগিয়ে আজ যদি আমি বন্ধ করি, দেখতে দেখতে আমার শরীরে জরা আক্রমণ করবে এবং তার পর মরজগতের যা একমাত্র নিশ্চিত, সেই মৃত্যুর—

নিরঞ্জন। কয়েকদিনের সুখের জন্য হয় ত তুমি মৃত্যুবরণ করতেও পেছপাও হবে না।

প্রতুল। ভুল, বন্ধু ভুল। আমার সাধনা আর আমার জীবন একসূত্রে গাঁথা। যে মৃত্যুকে জয় করবার জন্য এত পাপ অর্জ্জন করেছি সে মৃত্যুকে অবাধে আলিঙ্গন করে আমি আত্মঘাতী, ধর্ম্মঘাতী হব না। তাহলে আমার অতীত ক্রাইমসের কোন জাষ্টিফিকেশনই থাকবে না।

নিরঞ্জন। শুনে সুখী হলুম। আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করছি। তুমি লোকচক্ষে সাধারণ মানুষ। শরীর, স্বাস্থ্য, যৌবন তোমার আছে। কিন্তু কোনটাই সত্যিকারের নয়। আজ যদি, ভগবান না করুন, আমাদের কাজে কোন ভুল হয়ে যায়, কাল তাহলে তুমি আর এ মানুষ থাকবে না অতএব তোমার ভালবাসার অধিকার নেই। একটী সরলা বালিকার তাতে সর্ব্বনাশ হবে।

প্রতুল। একথা আমার স্মরণ আছে এবং চিরদিন থাকবে।

(ক্রমশঃ)

ঝড়ে আর জলে

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ঝড়ে জলে বিজলীতে আর অন্ধকারে
লাগিয়াছে মারামারি বিষম হুঙ্কারে—
কেহ নাহি হারে আর কেহ নাহি জেতে।
এ ওয়ে জাপটি' ধরি' খালি যায় যেতে

দেখাতে আপন শক্তি। গাছে ডালে ডালে
চলে সেই মারামারি তালে ও বেতালে,
কভু কমে, কভু বাড়ে।
　　　　দুর্দ্দান্ত প্লাবন,
আজি এই বরষার গর্জ্জন, নর্ত্তন

আমারে চঞ্চল করে। বিনিদ্র নয়নে
মত্ত ক্ষুব্ধ প'ড়ে আছি শীতল শয়নে

কভু কম্পমান আর কভু হর্ষবান।
মনে হয়—আকাশ ও ধরণীর প্রাণ
আমারি প্রাণের মত উদ্বেল কাতর।
হোথা নীলাকাশ আছে মাথার উপর,
আর নীচে ধরাখানি—উভয়ের মাঝে
মেঘে-রচা চলে দ্বন্দ্ব দানবীর সাজে।
জলে আর প্রভঞ্জনে দুরন্ত, উদ্দাম,
অবারিত, ভয়ঙ্কর, ভীম, অবিরাম,—
তারি মাঝে তুচ্ছ আমি স্বল্প-পরিমাণ
কেঁপে উঠি, কেঁদে উঠি প্রমত্ত-পরাণ।
কত অসহায় মোরা কত ক্ষুদ্র দীন,
জানায় নিরত আজি এই বর্ষাদিন।

পথনির্দ্দেশ ও পরিণীতা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পথনির্দ্দেশ—নরনারীর সম্পর্কের অনাবিষ্কৃত শাখায় এবং বহু স্বল্পপরিচিত হৃদয়ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র নব নব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই সত্যের গভীর রসানুভূতিতে মণ্ডিত কলাসুন্দর বাণী-রূপই তাঁহার সাহিত্য।

যে সকল বিধিবিধান ও সংস্কারের মধ্য দিয়া আমাদের সামাজিক জীবনধারা প্রবাহিত, সেগুলিকে মানিয়া লইয়াই শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে নরনারীর জীবনের বৈচিত্র্য অবলম্বনে কথা-সাহিত্য রচিত হইত। যাহাকে সমাজের ভিত্তি বলিয়া মনে করা হইয়াছে…তাহার দৃঢ়তা, সারবত্তা বা সবলতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কেহ তুলিত না। চির প্রচলিত বাঁধা আদর্শের মানদণ্ডেই মানবচরিত্রের বিচার করা হইত। শরৎচন্দ্র সমাজের ও প্রচলিত নীতিধর্ম্মের ভিত্তি ধরিয়া টান দিয়া তাহার শক্তি, মূল্যবত্তা ও সত্যাধিকারের পরীক্ষা করিয়াছেন। তাই শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত বহু চরিত্র প্রচলিত সমাজধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ অসংযমের বিদ্রোহ নয়—নিমে দত্ত যেমন দত্তের বিদ্রোহ নয়। সংকীর্ণ সংস্কারান্ধ গতানুগতিক নীতিধর্ম্মের মধ্যে যে অসত্য, অসারতা ও ভ্রান্তিমোহ আত্মগোপন করিয়া আছে এই বিদ্রোহী চরিত্রগুলি সেগুলিকে সত্যের আলোকে নিরাবরণ করিয়া দেখাইয়াছে এবং তাহার স্থলে বিশ্বজনীন সত্যে সমুজ্জ্বল নীতিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। শরৎচন্দ্র রসশিল্পী, বলা বাহুল্য, ভ্রান্ত সংস্কারের বিলোপ সাধন এবং বিশ্বজনীন সত্যের প্রতিষ্ঠাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যব্রত নয়। শরৎচন্দ্র সমাজসংস্কারক নহেন। তিনি কেবল দেখাইয়াছেন—জনবলে বলীয়ান ভ্রান্তসংস্কার ও দেশজোড়া অসত্যের সহিত একেশ্বর সংগ্রাম করিতে গিয়া সত্যানুব্রতীর কি শোচনীয় পরিণাম হয়! হতভাগ্য সত্যানুব্রতীর প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর সহানুভূতিই সাহিত্যের রূপ ধরিয়াছে। ইহার পরোক্ষ ফল যাহাই হউক, শরৎচন্দ্রের মতে সাহিত্যে ইহার বেশী কিছু করিবার নাই।

অন্ধ গতানুগতিক সংস্কারের সহিত সত্যনিষ্ঠার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই শরৎচন্দ্রের বহু রচনার উপজীব্য। প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক বিধিবিধানের অতীত সার্ব্বজনীন নীতিধর্ম্মের ব্যাপার আমাদের কাছে অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের পক্ষে যেমন অনাবিষ্কৃত—তেমনি অপ্রত্যাশিত। শরৎচন্দ্র এই অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গের সহসা উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে চমকিত করিয়াছেন—এই অনাবিষ্কৃত অথবা উপেক্ষিত রাজ্যের কথা তুলিয়া আমাদের চিত্ত ও চিন্তাকে আলোড়িত করিয়াছেন। অপ্রত্যাশিতের চমক, অনাবিষ্কৃতের আবরণ উন্মোচন, বৈচিত্র্যের অবতারণা ও গূঢ় সত্যের উদ্বোধন আমাদের অস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ দিয়াছে। এই আনন্দ অবশ্য অবিমিশ্র নয়—কারণ, আমাদের চির-পোষিত চির-পূজিত আদর্শের অঙ্গে বারংবার আঘাতে আমাদের চিত্তকে বিচলিতও করিয়াছে। কিন্তু নবোদ্বোধিতমোর পক্ষে শরৎচন্দ্রের আবেগম যুক্তি পরম্পরা ও সরস রচনাভঙ্গী আমাদের ক্ষুব্ধ চিত্তকে শেষ পর্য্যন্ত প্রশা করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর রচনায় আমরা যে আনন্দ পাই তাহা সবটাই অনুভূতিমূলক (Emotional) নয়, কতকটা বুদ্ধিমূলক (Intelle ctual)। অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব ও অনাবিষ্কৃতের প্রকটনে ে আনন্দ পাই—তাহা অনেকটা হৃদয়-বিফারক অদ্ভুত রসের কাব্য পাঠে আনন্দ। ইহা রসানন্দ, ইহার সহিত রচনাভঙ্গীর অপূর্ব্বতার উপভোগে আনন্দ আছে, তাহাও রসানন্দ। আর সত্যের ক্রমোন্মেষের দ্বারা ে আনন্দ, তাহা বোধানন্দ।

শরৎচন্দ্রের পথনির্দ্দেশের কথাই ধরা যাক। নিরাশ্রয়া জননী সুলোচনা ও কন্যা হেমকে আশ্রয় দিল ব্রাহ্ম গুণীন্দ্র। গুণীন্দ্রে স্নেহ ভালবাসা দয়া ক্ষমা তিতিক্ষা—সর্ব্বোপরি সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বে মুগ্ধ হইয় হেম স্বভাবতই তাহার অনুরাগিণী হইল। গুণীন্দ্রের প্রথম যৌবনে স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় পাইল। হেম তাহার প্রতি করুণা ক্রমে স্নেহে, স্নে ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহা ঘটিল হৃদয় ধর্ম্মের নির্দ্দেশে ও আমন্ত্রণেই। প্রচলিত সমাজ বিধান তাহাদের মিলনে পরিপন্থী। এই সমাজ-বিধান জননী সুলোচনাকেই আশ্রয় করিয়া বাধা সৃষ্টি করিল। সুলোচনা উপলক্ষ মাত্র। সে অপরাধিনী নয়, প্রচলিত সমাজ ধর্ম্মেরই সে অন্ধ অনুসারিকা মাত্র। ফলে, জননী হইয়াও একমাত্র সন্ততি হেমের জীবনটা যে একেবারে ব্যর্থ ও অন্ধকারময় করিয়া দিল সংস্কারের সহিত প্রেমরূপী সত্যের দ্বন্দ্ব ও সত্যের শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়া শরৎচন্দ্র সত্যাসত্য-বিচারের 'পথ নির্দ্দেশ' করিয়াছেন। ইহা বেশি শরৎচন্দ্রের মত রসশিল্পীর আর কিছু করিবার নাই।

সুলোচনা তাহার কন্যা হেমকে বলিল—"বিয়ে না দিলে জাত যা যে রে।"

হেম বিনা বাধায় বলিল—গেলেই বা! আমরা দুটি মায়ে ঝিয়ে থাকব, দুঃখ ক'রে খাব, আমাদের জাত থাকলেই বা কি গেলেই বা কি! পৃথিবীতে আরো অনেক জাত আছে মেয়ের বিয়ে না দিলে তাদের জাত যায় না। আমরা না হয়, তাদের মত হ'য়ে থাকব।

তেরবছরের বাঙালী মেয়ে হেমের মুখে একথা অপ্রত্যাশিত! বলা বাহুল্য একথা শরৎচন্দ্রের নিজেরই কথা। ইহা যুগপৎ জাতিমোহের অন্তঃস্থ অসত্য ও তাহার অতীত বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি ইঙ্গিত। ইহা হেমের মুখের কথা মাত্র নয়। এই কথাগুলিতে যে সত্য নিহিত আছে হেম সেই সত্যেরই জীবনে অনুসরণ করিতে গিয়া পরম দুঃখ বরণ করিয়াছে।

হেম ব্রাহ্ম গুণেন্দ্রের পাতে বসিয়া খাইল। সুলোচনা অবাক হইয়

চাহিয়া রহিলেন। গুণীও তিরস্কার করিল। হেম উত্তর করিল, "তোমার পাতে ব'সে খেলে মা দুঃখ পান—না খেলে মার চেয়ে যিনি বড়, তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়।" এ কথাও শরৎচন্দ্রের। মা'র চেয়ে বড় সে ভগবান নয়, এখানে প্রেম অর্থাৎ সত্য।

সাধারণ হিন্দু পাঠকেরাও সুলোচনার মত অবাক হইবে, কিন্তু গুণীর মতই আমরাও এই অপ্রত্যাশিত সত্যের অবতারণায় আনন্দই পাই।

সুলোচনা হেমের কাছে গিয়া নবদ্বীপে থাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া হেমকে পত্র লিখিল। হেম উত্তরে লিখিল—'তুমি যে বাড়ীতে আছ—সে বাড়ীর হাওয়া লাগলেও সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারে। ওখান থেকে তোমার যদি পুণ্য সঞ্চয় না হয়, তবে বৈকুণ্ঠে গেলেও হবে না।'

গুণী আদর্শচরিত্রের যুবক। তাহার অনন্যসাধারণ মনুষ্যত্বের কাছে পুণ্যতীর্থের প্রভাবও নিষ্প্রভ। মনুষ্যত্বই যে পরম সাধনার বস্তু, শরৎচন্দ্র হেমের মুখ দিয়া সেই কথাই বলিয়াছিলেন। গুণীর সংসর্গ পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপ হইতেও বড়, একথা শুনিয়া সুলোচনা আরও বিস্মিত হইয়াছিল। এ দেশের হিন্দুপাঠকেরও সেই বিস্ময় জাগিয়াছিল। কিন্তু এই সুলোচনাই মৃত্যুর আগে সদ্যবিধবা হেমকে বলিতেছে—

"কথাটা কোনদিন ভুলিস না মা। ওসব মানুষের বুকের ব্যথা স্বয়ং ভগবানের বুকে গিয়ে বাজে। তার যা ধর্ম্ম, তোর ধর্ম্মও তাই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁর আদেশ, যাঁর আদেশে তোরা একদিনের দেখাতেই চিরকালের মত এক হ'য়ে গিয়েছিলি। যিনি অন্তর্য্যামী, তিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে ব'সে কথা ক'ন, তাঁকে অস্বীকার ক'রো না।" সুলোচনার কণ্ঠে সত্যের অনুভূতির এই অকুণ্ঠ প্রকাশ—আমাদিগকে চমকিত করে। কিন্তু ইহাই ত স্বাভাবিক। সুলোচনা যেমন শেষ পর্য্যন্ত সংস্কারমুক্ত সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—সাধারণ হিন্দুপাঠকও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের চিরপোষিত সংস্কারের অঙ্গে বারংবার আঘাত সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে জাতীয়সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। গুণীর মুখেও শরৎচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাও তাঁহার নিজেরই কথা। এসকল কথায় তিনি এই অসত্যনিষ্ঠ সমাজের ভিত্তি ধরিয়াই টান দিয়াছেন। গুণী বলিতেছে—"জাত আর ধর্ম্ম এক জিনিস নয়। একটা দেশাচার, লোকাচার, শুধুমাত্র ইহকালের বস্তু। কিন্তু অপরটা ইহকাল পরকাল দুই কালেরই বস্তু। কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম্ম মেনে চল্‌লেই যে জাত মেনে চলা হয়—তাও না। আবার জাত মেনে চল্‌লেই যে ধর্ম্ম মানা হয় তাও নয়।"

আবার আর একস্থলে গুণী বলিতেছে—"কর্ম্মফল যদি সত্য হয়। স্বামী-স্ত্রীর চির-সম্বন্ধটা কোনমতেই সত্য হ'তে পারে না। এ সংসারে কত পাষণ্ড স্বামীর সতীসাধ্বী স্ত্রী থাকে, স্বামীটা হয় ত ম'রে গরু হ'য়ে জন্মায়। এ তোমাদের শাস্ত্রের কথা। তুমি কি এই কামনা কর হেন সতীসাধ্বী স্ত্রী তার সারা জীবনের সুকর্ম্মের অন্তে সেই গরুর সঙ্গে গোয়ালে গিয়ে বাস করে?"

এসব জাবালির মুখের কথার মত। এ যুগের প্রাচীনপন্থীরা এগুলোকে "অইতান্ বুজিরিয়স্" বলিয়া বিস্ময় মুখ ফিরাইবেন।

এসব তত্ত্ব বিচারের কথা। শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে ইহাই চরম কথা নয়। সচেতন শিল্পী শরৎচন্দ্র বেশ বুঝিতেন, ইহাতেই তাঁহার সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না। তিনি যুক্তির পথে সত্যের বিজয় ঘোষণা করিয়া আপনার ক্ষুব্ধ চিত্তকে ব্যর্থ প্রবোধে আশ্বস্ত করেন নাই। রচনাটিকে রসোত্তীর্ণ করিবার জন্য হেমের চিত্তে দুর্জ্জয় অভিমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অভিমান হেমকে কঠোর আত্মনিগ্রহে প্রনোদিত করিয়াছে। এই আত্মনিগ্রহই অসত্য শাসনের উদ্দেশে দারুণ ধিক্কার। পথনির্দ্দেশ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে ইহাতেই। গুণীর সহিত হেমের শেষ পর্য্যন্ত মিলন ঘটিলে সত্য আশ্বস্ত হইত মাত্র, কিন্তু সত্য বিজয়ী হইয়াছে হেমের স্বয়ংকৃত আত্মনিগ্রহে ইচ্ছাকৃত ব্যবধানে ও বিচ্ছেদে, হেমের বুকের রক্তের জয়টীকা লাভ করিয়া। শরৎচন্দ্রের রসসৃষ্টির চিরন্তন টেক্‌নিক ইহাই।

অসত্য সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হেম গুণীন্দ্রকে ধরা দিল না—মাতৃ-আজ্ঞাও পালন করিল না—গুণীর অগাধ প্রেমের যথাযোগ্য প্রতিদান দিল না। ইহাতেও আমরা বিস্মিত হই। এই বিস্ময়ই ক্রমে বোধানন্দে পরে রসানন্দে পরিণত হয়।

হেম গুণীকে ভালবাসিয়াছিল—সুলোচনা তাহা জানিত। গুণী ত জানিতই। প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া গুণী ও সুলোচনা সমাজ-শাসনের তাড়নায় হেমকে অন্যত্র বিবাহ দিল। সে অল্পদিনের মধ্যে বিধবা হইল। হেম সংস্কারমুক্ত—গুণীও তাই—মৃত্যুশয্যায় সুলোচনা যে ইঙ্গিত করিয়া গেল তাহাতে মুমূর্ষুর কণ্ঠে সত্যেরই গভীরতম অভিব্যক্তি। কিন্তু হেমের দুর্জ্জয় অভিমান তাহাকে আত্মনিগ্রহে প্রণোদিত করিল। এখানে দারুণ অভিমানই অন্তরের সত্যকেও গ্রাস করিল। সে কঠোর বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্যে মন দিল। কিন্তু এ সমস্তও আত্মবঞ্চনা মাত্র। হেম এ সমস্তকে অসত্য বলিয়া জানিয়াও যেন সত্যের অবমাননার প্রতিশোধ দিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র কেবল বলিলেন—"যেমন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ জেলের মধ্যে বেষ্টনের পর বেষ্টন তুলিয়া তাহার বড় বড় কয়েদীগুলির পরিসর ছোট করিয়া আনিতে থাকে হেম যেন ঠিক তেমনি সতর্ক হইয়া তাহার হৃদয়বাসী কোন এক গভীর দুষ্কৃতকারীর চলাফেরার পথ সংকীর্ণ করিয়া আনিতে লাগিল।" বলা বাহুল্য, ইহা প্রেমরূপী সত্যেরই পথ। হেমের মত শরৎচন্দ্রও অভিমানভরে ইহাকে "গভীর দুষ্কৃতকারী" আখ্যা দিলেন।

শরৎচন্দ্র এই গল্পে দেখাইয়াছেন—দৈহিক সংযোগটাই প্রেমের পক্ষে বড় কথা নয়। হেম দৈহিক সংসর্গ এড়াইয়া গিয়াছে—কিন্তু গুণীর উপর যে অধিকার স্থাপন করিয়া সে কর্ত্রীত্ব করিয়াছে তাহা গভীর প্রেম ছাড়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল দৈহিক সম্পর্ক ঘটিয়াছিল তাহার সহিত; প্রেম সম্পর্ক ঘটে নাই বলিয়াই বিবাহটা মিথ্যা অভিনয় মাত্র। শরৎচন্দ্রের এই সকল গল্পে প্রধানতঃ মানুষের হৃদয়-লীলারই বৈচিত্র্য দেখানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বৈচিত্র্য সত্যের সহিত অসত্যের, সংস্কারের সহিত স্বাধীন চিন্তার সংগ্রাম হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের আলোকে আমরা একদিকে যেমন সহস্র লোকাচার দেশাচারের আবর্জ্জনার অন্তরালে বিশ্বজনীন সত্যকে

প্রতীকমাণ দেখিয়া পুলকিত হই—অন্যদিকে তেমনি মানবমনের গহনতম প্রদেশের সমস্তটুকু দেখিতে পাইয়া চমকিত হই। ইহার সঙ্গে রচনাভঙ্গীর কলা-কৌশলের রসানন্দ ও সত্যের পরমাত্মকে কর্পূরবাসিত করিয়াছে।

পরিণীতা—পরিণীতা শরৎচন্দ্রের একখানি মধ্যম শ্রেণীর বড় গল্প। একটি বৈচিত্র্যময় প্রেমলীলাই ইহার উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রভাব ইহাতে বিদ্যমান। পিতৃশাসনে অবস্থিত পিতৃসংসারে সুখে লালিত শিক্ষিত যুবকের পক্ষে প্রেম করা যত সহজ—প্রেমানু-গৃহীতাকে (?) বিবাহ করা তত সহজ নয়। প্রথম-যৌবনের আবেগে নির্বিচারে একজনকে ভালবাসিয়া শেষ পর্য্যন্ত মাতাপিতার অবাধ্য হইয়া—পিতার সুখশান্তিময় গৃহ ও সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া, তাহাকে বিবাহ করার সাহস ও তেজস্বিতা সাধারণ শিক্ষিত যুবকের থাকে না। ইহা সম্পূর্ণ স্বভাবসম্মত ব্যাপার।

তরুণ যুবক কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু সে স্বাধীন নয়, উপার্জ্জনক্ষম নয়, পিতার সম্পদের লোভ সে ত্যাগ করিতে পারে না। প্রেমের সঙ্গে পিতৃশাসনের দ্বন্দ্ব বাধে। ফলে দুদিনের Romance উবিয়া যায়, নয়ত একটা অনর্থ ঘটে। বাংলা কথাসাহিত্যে ইহা একটি সাধারণ উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পের আখ্যানবস্তু এইরূপ। গল্পের নায়ক শেখর একদিন দরিদ্রা অনাথা কন্যা ললিতার সঙ্গে মালা-বদল করিয়া তাহার ওষ্ঠাধরে প্রণয়ের মুদ্রাঙ্ক রোপণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু বিবাহ-সংকল্পের দৃঢ়তা তাহার মনে ক্রমে লোপ পাইল। "তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল—জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল, প্রিয়তমার বক্ষস্পন্দন নিজের বুক পাতিয়া সেইমাত্র প্রথম অনুভূতিসঞ্জাত প্রাপ্ত মোহ ছিল এবং প্রণয়ীরা যাহাকে অধরসুধা বলিয়াছেন তাহাই পান করিবার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ ও সাংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই, অর্থলোলুপ পিতার রুদ্রমূর্ত্তি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে নাই।"

ললিতাকে বিবাহ করা সম্ভব নয় মনে করিয়া শেখর অন্যত্র বিবাহের সম্মতি দিল। কিন্তু শেখরের পক্ষে যাহা লীলামাত্র, ললিতার বক্ষে তাহা শিলা। সে নারী—বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের নারী—সে শেখরের প্রণয়-বিলাসকে সাময়িক রসাবেশ বলিয়া উড়াইতে পারিল না। সে প্রণয়ের মুদ্রাঙ্ককেই পরিণয়ের মুদ্রাঙ্ক বলিয়া ধরিয়া লইয়া নৈরাশ্যের সহিতই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শেখরও তাহা যে বুঝিত না তাহা নয়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত—তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে। শেখর জানিত, একবার যাহা সে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছে—কোন মতেই সে তাহা ত্যাগ করিবে না।

শরৎচন্দ্র কিন্তু শেখরকে একেবারে অমানুষ করেন নাই—তিনি শেষ রক্ষা করিয়াছেন। শেখরের চরিত্রের মধ্যে মনুষ্যত্বের যথেষ্ট উপাদান না পাইয়া তিনি বাহিরের সহায়তা লইয়াছেন। শেখরের পণলুব্ধ পিতাকে সরাইয়াছেন, ব্রাহ্ম গুরুচরণকেও সরাইয়াছেন—গিরীনকে মহান ও উদার করিয়া তুলিয়াছেন এবং আর ললিতাকে করিয়াছেন একনিষ্ঠা প্রেম-ধর্ম্মানুরক্তা। ললিতার একনিষ্ঠ অনুরাগ শেখরকে বিজিত করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ললিতার প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। অরক্ষণীয়ার অতুলের চেয়ে শেখরের মনুষ্যত্বের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্ত্তন অধিকতর স্বাভাবিক ও বাস্তব-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের বহু গল্পেই দেখা যায়—যে সংসারে লক্ষ্মী আছেন—সে সংসারে গৃহলক্ষ্মীও আছেন। ভুবনেশ্বরী নবীন রায়ের সংসারে গৃহলক্ষ্মী। এইরূপ গৃহলক্ষ্মীর স্নেহচ্ছায়া পরিজনগণের মনুষ্যত্বসাধনার সহায়ক।

দত্তা পড়িয়া যাঁহারা মনে করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের বিদ্বেষ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি—তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের তরুণ যুবক গিরীনের কথা পড়িয়া ধারণার পরিবর্ত্তন করিবেন আশা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ ছিল না। ছিল বৃদ্ধ বিদ্বেষ।

এই গল্পে শরৎচন্দ্র অর্থ সম্বন্ধে একটু বেশি মুক্তহস্ত হইয়াছেন। যৌবনে শরৎচন্দ্রের চিত্তবলের তুলনায় বিত্তবলের অভাব ছিল। অর্থের অপ্রতুলতার ক্ষোভ তিনি তাঁহার রচিত সাহিত্যে প্রাণ ভরিয়া মিটাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের কল্পিত যুবকরা প্রায় সকলেই অর্থসম্বন্ধে উদাসীন ও মুক্তহস্ত। তাহাদের চিত্তবলের অভাব আছে কিন্তু বিত্তবলের অভাব নাই। সাহিত্যের রসসৃষ্টির প্রয়োজনের দিক হইতেও ইহার একটা ব্যাখ্যা দিতে পারা যায়।

অন্নবস্ত্রেরই যাহার অভাব—তাহার প্রেম করা শোভা পায় না—জঠরে যাহার ক্ষুধা—হৃদয়ে তাহার সুধা থাকিবার কথা নয়, তাহার প্রেমবিলাসের অবসরও নাই। বোধ হয় এই কথা ভাবিয়া শরৎচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রেমিক যুবকদের ধনিসন্তানই করিয়াছেন। আর একটি দিকে শরৎচন্দ্রের খর দৃষ্টি ছিল। 'সুবর্ণের' প্রতি আসক্তি ও 'সুবর্ণার' প্রতি অনুরাগ পরস্পর বিসংবাদী, ইহাও তিনি অনুভব করিতেন। তাই তাঁহার প্রেমিকরা ধনীর সন্তান—সেই সঙ্গে অর্থ সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ। অর্থের প্রতি মমতা প্রেমের ব্যাপারে রসাভাস ঘটায় বলিয়া তিনি নিস্পৃহতার সমাবেশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে প্রেমিকরা শুধু নিঃস্পৃহ নয়—মুক্তহস্ত—এমন কি সর্ব্বস্ব পণ করিতেও প্রস্তুত। অবশ্য এ গল্পটিতে বাস্তবতার ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। গল্পটিতে Romanceএর আধিক্যই বেশি।

পরিণীতায় শরৎচন্দ্র একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই চিত্রে একটি পরম সত্যেরও ইঙ্গিত আছে।

আন্নাকালীর পুতুলের বিয়ে। পাঁজি দেখিয়া বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির করা হইয়াছে। শেখরদাদা আন্নাকালীকে একটা মালা দিতে চাহিয়াছিল। ললিতার মারফতে সেই মালা সে পাঠাইল। ললিতা কৌতুকচ্ছলে সেই মালা পিছু দিক হইতে শেখরকে পরাইয়া দিল। শেখর এই মালা পরানো ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল না। সে অন্যমনস্কা ললিতার পিছন দিকে গিয়া ঐ মালা পিছন হইতে পরাইয়া দিল। ললিতা কাঁদিয়া বলিল—"আমার কেউ নেই ব'লেই তুমি এমন করে অপমান করছ।" শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল…"এমন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে। আজকাল বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছিলে ললিতা, আমি বিদেশে যাওয়ার আগে সেইটেই বন্ধ ক'রে দিলুম।" ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না—মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-

লে দুজনেই শুদ্ধ হইয়া ছিল। শুধু নীচে হইতে আন্নাকালীর মেয়ের পুতুলের) বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতেছিল। এই ত াটি বিবাহ !. শরৎচন্দ্র রসের ইঙ্গিতে বলিতে চাহিয়াছেন—শেখর ও লিতার প্রকৃত বিবাহ শুভ দিনে শুভ লগ্নে মাল্য-বিনিময়ে শঙ্খধ্বনির ধ্যেই হইয়া গেল। পুরোহিতের মন্ত্রপড়া অনুষ্ঠানটার মূল্য ইহার কাছে কিছুই নয়। হৃদয়ের বিনিময়ই প্রকৃত বিবাহ—লৌকিক অনুষ্ঠানটাই বিবাহ নয়। শেখর ইহা ভুলিয়া যাইতে পারে—ললিতা তাহা ভুলিতে পারে না। হিন্দু পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারে—হিন্দু নারী দুইবার বিবাহ করিতে পারে না। ললিতা তাই শেখরের আশা ত্যাগ করিয়াও অবিবাহিতাই ছিল।

অকারণ

শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

জাপানী বোমার ঠ্যালা-সামলাতে একদিন অতি ভোরে
চাবি দিয়ে ঘর-দোরে
কলকাতা ছেড়ে চলিয়া এসেছি নেহাতই শুকনো মুখে—
এঁদো পল্লীর ভ্যাজালশূন্য খাঁটি প্রকৃতির বুকে।
লাগিছে কেমন ? চাও তা জানিতে ? কঠিন সে কথা বলা ;
কবিতার ছলাকলা—
—প্রসাধন যত ফেলিয়া এসেছি সহরের বাড়ীটাতে,
সাজান যাইত যাতে
মনের গরিব কথাটাকে আজি আপন-ইচ্ছামত।
ঝুটা-গহনার জৌলুসে সে যে হোতো সুন্দর কত !
উপায় যখন নেই,
সরল মনের সহজ কথাটা বলে ফেলি সহজেই।
এখানে আসিয়া বুঝিয়াছি খাঁটি, ভুল নেই এক তিল,
প্রকৃতির সাথে মানব-মনের আগাগোড়া গরমিল।
হিসাবী মানুষ যাহা কিছু ভাবে, যাহা কিছু করে আর,
আছে পশ্চাতে তার
হিসাবের পাকা খতিয়ান্-খাতা ; পাইটুকু জমা তাতে,
খরচের কানা-কড়িটিও লেখা আছে খরচের পাতে।
প্রকৃতি-রাণীর রাজ্যটা জুড়ে দানছত্রের মেলা ;
সব কিছু যেন বেহিসেবী সেথা, সবি যেন হেলাফেলা।
নেই হেথা বিকিকিনি,
সব কিছু নিয়ে চলিতেছে যেন অকারণ ছিনিমিনি।
'বউ কথা কও'-পাখীটা সেদিন সারারাত্তির ধরে
ডেকে মরেছিল কারে !
কে যে তার বউ, কোথা বা সে থাকে, কেবা খোঁজ রাখে তার !
সাড়া দিলে কিনা, আদৌ শোনেনা, ডেকে মরে বার বার।
শুধু ডেকে মরা ডাকার নেশায়, সারারাত ডেকে যাওয়া ;
নেই কোনো দাবি-দাওয়া।

জমা-খরচের হিসাবের তরে রাখেনি একটি পাতা,
আগাগোড়া শুধু গান টুকে টুকে ভরেছে সবুজ-খাতা।
সেদিন বিকেলে সহসা কখন্ সারা দুপুরের পরে,
পচা-দুপুরের গেঁজে-ওঠা সুরা ভরপুর পান করে
ক্ষেপে উঠেছিল কালবৈশাখী, করেছিল ঢলাঢলি ;
কোথায় যে পড়ে টলি
কিছু ঠিক নেই, নেশার ঝোঁকেতে শুধু হুল্লোড় করা ;
যেখানে-সেখানে যার-তার গায়ে অকারণে টলে পড়া।
উৎসব-রাত্রি কালেভদ্রেতে আসে মানুষের ঘরে ;
কটা দিন চাপা পড়ে
ফুলের গন্ধে, গানে-উৎসবে হিসাবের খেরো-খাতা ;
পুরাতন মাথাব্যথা
ভুলে যায় তার গতানুগতিক অচল বনেদীয়ানা ;
বাসরের সাজ অঙ্গে চড়ায় বর্ব্বর মুখখানা।
তার পরে আসে আবার ফিরিয়া একঘেয়ে গোনা-দিন,
ভাত-কাপড়ের চিন্তার ভারে মন্থর গতিহীন।
ফুল ঝরে যায়, গন্ধ শুকায়, আলো নিভে যায় ধরে,
তেলে-নুনে আর চালে-ডালে ফের মুখখানা উঠে ভরে।
চলে আরবার কাজ-কারবার একঘেয়ে বিকিকিনি,
মুদির দোকানে হাল্-খাতা আসে বছরে একটা দিনই।
প্রকৃতিরাণীর বাসর-ঘরেতে চির-উৎসব-রাতি
ফুলের গন্ধে গানে-উৎসবে বারোমাসই উঠে মাতি।
বারোমাসই জ্বলে লক্ষ প্রদীপে জোনাকির রোস্নাই—
হিসাব-নিকাশ নাই।
লক্ষ ফুলের বাসর-শয্যা প্রতিদিনই হয় পাতা ;
প্রকৃতির হাল্‌খাতা
প্রতিদিনই আসে সাথে নিয়ে তার উচ্ছ্বল উল্লাস।
উৎসব গাব ফুলের গন্ধ লেগে আছে বারোমাস।

"যেতে নাহি দিব"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

মানব হৃদয়ের চিরন্তন আকূতি—"যেতে নাহি দিব"! এই আকূতি কোথাও স্ফুটবাক্ বেদনে অভিব্যক্ত, কোথাও বা অন্তরের অন্তস্তলে নিরব রোদনের কল্পধারায় তরঙ্গায়িত। হয়তো নিখিল বিশ্বের সৃজন দিনে স্রষ্টার হৃদয়ের যে আবেগ অখিল সৃষ্টিকে বাহিরে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দিনই বিধিকণ্ঠ ভেদ করিয়া সৃষ্টি-সহজাত সেই আবেগেই এই মর্ম্মান্তিক সুর ধ্বনিত হইয়াছিল—যেতে নাহি দিব। অথবা কবির কথাই সত্য। "ধরণীর প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ত তীর" আকুলিত করিয়া "এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্ত" ছাইয়া "সবচেয়ে পুরাতন" এই কথা—"সবচেয়ে গভীর" এই ক্রন্দন চিরকাল অনাহতরবে ধ্বনিত হইতেছে "যেতে নাহি দিব"। সত্যই ইহার আদি অন্ত নাই।

সাকল্পিতায় এই কবিতাটার তারিখ দেখিলাম ১২৯৯ সাল ১৪ই কার্ত্তিক। তাহা হইলে এই কবিতা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। "যেতে নাহি দিব" সোনার-তরীতে স্থান পাইয়াছিল। কি প্রাচীন—কি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই কবিতার দ্বিতীয় নাই। নাই। বৈষ্ণব কবির মর্ম্মমথিত অশ্রুধারার সঙ্গে ইহার তুলনা করিব না। অন্ধকারাচ্ছন্ন ত্রিযামা যামিনী বিগত-প্রায়। বিগত-চেতন বিশ্বে নবদ্বীপের নিরালা কুটীরে এই এখনো বিষ্ণুপ্রিয়া জাগিয়াছিলেন। প্রিয়তমের প্রসন্ন সোহাগে সুগভীর বিশ্বস্ততায়—নিশ্চিন্ত নির্ভরতার বাহু বেষ্টনে বন্দিনী তন্দ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন, হয়তো দণ্ডেক মাত্র! জাগিয়া দেখিলেন শয্যা শূন্য। আর্ত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—মা! শচীদেবী জাগিয়াই ছিলেন, স্বর শুনিয়াই বুঝিলেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বিস্রস্ত বেশ-বাসে বাহির হইয়া আসিলেন রাজপথে। সূচীভেদ্য অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া, নবদ্বীপের নৈশ নিস্তব্ধতাকে উন্মথিত করিয়া জননী হৃদয়ের আকুল হাহাকার আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল—

"হেদেরে নদীয়াবাসি কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরা চাঁদেরে ফিরাও॥"

বহুকাল পূর্ব্বের—অতীতের স্মরণাতীত বাসরের আরো একদিনের কাতর কণ্ঠ আজিও বাঙ্গালার বক্ষে বেদনা জাগায়। অক্রুরের রথ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতেছে, ধূল্যবলুণ্ঠিতা সর্ব্বহারা গোপীকার বিলাপধ্বনি রথচক্রের ঘর্ঘরে বিলীন হইয়া গেল!—সেই মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন আজিও বাঙ্গালার হৃদয়-যমুনায় প্রতিধ্বনিত হয়—

"উভ হাতে শবর বোলে।
রথ রাখ যমুনার কূলে॥"

কিন্তু সে পৃথক বস্তু।

হয়তো কবির জীবনে সত্যই এ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কবির প্রবাস যাত্রার দিনে তাঁহার চারি বৎসরের কন্যা হয়তো সত্যই তাঁহাকে বলিয়াছিল "যেতে নাহি দিব"। অথবা বিশ্রামরত কবি একদিন কোন্ অভিনব কল্পলোকে যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, লোক হইতে লোকান্তরের যাত্রী ধ্যানবিহ্বল কবিকে তাঁহার মানস দুহিতাই বলিয়াছিল "যেতে নাহি দিব"। সেই একদিনের মুহূর্ত্তোচ্চারিত একটি মাত্র কথাকে, অথবা সেই মানস-কন্যার ক্ষণিকের ইঙ্গিতকে কবি অনবদ্য শব্দে ছন্দে চিরন্তন রূপ দান করিয়া গিয়াছেন। তুচ্ছ ঘটনা, কেরাণী জাতির জীবনে নিত্যই এ ঘটনা ঘটে। কিন্তু মুহূর্ত্তকে মহাকালের বক্ষে চিহ্নিত করিতে পারে কয়জন?

কবি বলিতেছেন—

"দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী বেলা দ্বিপ্রহর।
মধ্যাহ্নের রৌদ্র ক্রমে হ'তেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লী পথে ধূলি উড়ে যায়—
মধ্যাহ্ন বাতাসে। স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে, যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম।
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।
গিয়াছে আশ্বিন। পূজার ছুটীর শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হ'য়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।
ঘরের গৃহিণী চক্ষু ছল ছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে। বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে। যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। * *
* * * *
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নত শিরে চক্ষু 'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি,
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন

কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হ'য়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখি পাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে, আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে। এত বেলা হ'য়ে যায়,
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়া প্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছ ঘেঁসে ঘেঁসে
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে
চুপি চাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো আসি", সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন,
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়"।
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল "যেতে আমি দিব না তোমায়"।
তবুও সময় হোলো শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হোলো।"

কবিতার এমন সহজ সুন্দর রূপ, এমন অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গী, অথচ, ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। ইহার সমগ্রতার যে সৌন্দর্য্য, বিশ্লেষণে তাহার ভগ্নাংশ লইয়া আশা মিটে না, তৃপ্তি হয় না। কবির অধিকাংশ কবিতার ব্যঞ্জনাই এমনই অপূর্ব্ব। বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিতাটী সম্পূর্ণ নূতন। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মনে হইতে পারে বাঙ্গালা কোন কোন কবিতা বা গীতি কবিতার সঙ্গে ইহার যেন কোথায় একটা আংশিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সামান্য অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে সহজেই সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে।

কবি রামবসু বলিয়াছেন—

"যখন হাসি হাসি সে আসি বলে
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁয়ো না"॥

চিত্রটী সুন্দর। কিন্তু আলোচ্য কবিতাটীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই।

শারদ নবমী প্রভাতে বাউলের একতারায় যেদিন ঝঙ্কৃত হয়—

"গিরি যায় হে লয়ে হর প্রাণ কন্যা গিরিজায়
পারতো রাখ প্রাণের ঈশানী
বাঁচে পাষাণী গিরি যা'য়—

অথবা ভিখারিণী আসিয়া গৃহদ্বারে যেদিন তান ধরে—"

"ওহে গিরিবর হে ভয়ে তনু কাঁপিছে আমায়।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধায়॥
বিছায়ে বাঘের ছাল
দ্বারে বসি মহাকাল
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ এ দেহে পাষাণ প্রাণ
এই হেতু এতক্ষণ হলো না বিদায়।"

বাঙ্গালার সেই বিজয়া দশমী দিনের সঙ্গে এই আশ্বিনের পূজার ছুটী-শেষের দিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য সুস্পষ্ট।

একদিন বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে ক্ষণ-বিচ্ছেদ-বিধুরা বঙ্গজননীর আকুল আকুতি ধ্বনিত হইয়াছিল—

"বলরাম তুমি নাকি— শ্রবণে শুনিনু এ কি
(আমার) পরাণ লইয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া মরি দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ।
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের পোয়ে বনেরে বিদায় দিয়ে
দৈবে মারিবে বুঝি মায়॥
কত জন্ম তপ করি আরাধিয়া হর গৌরী
তাহে পাইনু এ দুধ পাসরা।
কেমনে ধৈরয ধরে মা'য়ে কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ কোঙরা॥
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে ঘরে যাইতে পথ ভুলে
দুটি হাত মুখে দিয়ে কান্দে।
আউলাইয়া কটির ধরা দু' চরণে লাগে বেড়া
আপনা আপনি পড়ে ফান্দে॥
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
শুন তোমরা যতেক রাখাল।
বংশীবদনের বাণী কান্দি কহে নন্দরাণী
আজু রাখি যাওরে গোপাল॥"

চারিশত বৎসর পরে আর একজন বাঙ্গালী কবির কণ্ঠে ইহারই বিপরীত একটা সুর সম্পূর্ণ অভিনব ছন্দে উতরোল হইয়া উঠিল—

"চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা কণ্ঠস্বরে শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হলো না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটীর মত
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি
যেতে নাহি দিব। ম্লানমুখ অশ্রু আঁখি

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব।
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
যেতে নাহি দিব।' যতবার পরাজয়
ততবার কহে আমি ভালবাসি যারে
সে-কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে?
আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল
এমন সকল বাড়া এমন অকুল
এমন প্রবল বিশ্বে কিছু আছে আর।
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
যেতে নাহি দিব। তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটী নিশ্বাসে তার আদরের ধন,
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটী নয়ন,
ছিন্ন মূল তরু সম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে
সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির অধিকার লিপি। তাই স্ফীত বুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই" হেন গর্ব কথা
মৃত্যু হাসে বসি। মরণ পীড়িত সেই
চিরজীবি প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার। বিষণ্ণ নয়ন পরে
অশ্রু বাষ্প সম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির কম্পমান।
আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ কুয়াসা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,
অশ্রু বৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।"

কবি যখন বলিতেছেন—'অতি ক্ষুদ্র তৃণকেও বক্ষে বাঁধিয়া মাতা বসুমতী প্রাণপণে বলিতেছেন "যেতে নাহি দিব" যখন বলিতেছেন—বায়ু তরঙ্গাভিহত আয়ুক্ষীণ দীপমুখের নির্ব্বাপিত প্রায় শিখাকে আঁধারের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কে টানিতেছে—তখন তিনি মরণ পীড়িত চিরজীবি প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। তখন তিনি ভারতের ঋষি কণ্ঠোচ্চারিত বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

আজ কবি নাই। তাই তেরশত পঞ্চাশের কথাই বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক নরনারী যেদিন পল্লী জননীর স্নেহ-নীড় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাধ্য হইয়াছিল, সেই চলমান কঙ্কালের দল যেদিন মুষ্টি ভিক্ষার প্রত্যাশায়—এক অঞ্জলি ফ্যান লাভের লালসায় অজানা পথে বাহির হইয়াছিল—সেদিন কি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবার কেহ ছিল না—"যেতে নাহি দিব"। সেদিন কি মাতা বসুমতীর চির স্নেহাতুরা পল্লী জননীর কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই "যেতে নাহি দিব"? সেদিনও কি মেঠো সুরে অনন্তের বাঁশী বিশ্বের প্রান্তর মাঝে কাঁদিয়া ফিরিয়া ছিল? আর সেই ক্রন্দন শুনিয়া উদাসী, বসুন্ধরা বসিয়া ছিলেন এলো চুলে, দূরব্যাপী শস্য ক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে, একখানি রৌদ্র পীত হিরণ্য আঁচল বক্ষে টানি দিয়া? তাঁহার স্থির নয়ন যুগল কি দূর নীলাম্বরে মগ্ন ছিল? তাঁহার মুখে কোন বাণী ছিল না?

সেদিনের সেই কঙ্কালমালিনীর অশ্রুহীন নয়নের বহ্নিজ্বালা কি কোন ঋষি দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে নাই? তাঁহার মূক মুখের ভাষা কি কোন কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইবে না?

চারিখানি ফটোগ্রাফ্

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(১)

পাতা-ঝরঝর শাল:
একলা মাঠের বিজন হাওয়ায় বাজায় করতাল।

(২)

নীল দিগন্তে নিশান ওড়ায় সবুজ কলার বন:
কালো মেঘের কোলে আলো: রাজ্য ওটা কোন্?

(৩)

মাঠের পারে হিঙ্গুল-নদী নাচে এঁকেবেঁকে:
ঠিক যেন কার মেঘল চুলের একটী সীঁথির রেখা।

(৪)

উঁচুনীচু, উঁচুনীচু—
হাট পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে কালোমাটীর পথ দিয়েছে ছুট।
—আর ধ'রেছে পিছু
শিশুবনের একটানা সার যেন মজুর মিছিল করা উট।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

দ্বিতীয় প্রকরণ—বৃদ্ধসংযোগ

পঞ্চম অধ্যায়

মূল :—অতএব তিনটি বিদ্যা দণ্ডমূলক। দণ্ড বিনয়মূলক—প্রাণিগণের যোগক্ষেমাবহ।

সঙ্কেত :—বৃদ্ধসংযোগ—আন্বীক্ষিকী ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ বিদ্যাতে প্রবীণ (গঃ শাঃ) ; তাঁহাদিগের সহিত সংযোগ—শিক্ষাচার্য্য-সম্বন্ধ ; association with the aged (S H) ; aged না বলিয়া advanced (in age and learning) বলা উচিত।

অতএব (তস্মাৎ—মূল)—যেহেতু বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ে বিভক্ত লোক সুবিজ্ঞাত-প্রণীত দণ্ড-দ্বারা পালিত হইলে স্বধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবণ হইয়া থাকে, অতএব—(গঃ শাঃ)। তিনটি বিদ্যা—আন্বীক্ষিকী-ত্রয়ী-বার্ত্তা। দণ্ডমূল—দণ্ডাধীন-স্থিতিক। দণ্ড থাকিলে আন্বীক্ষিকী-ত্রয়ী-বার্ত্তা থাকে, নতুবা নহে ; are dependent for their well-being on the science of Government (S H) ; 'for their well-being'—এ অংশ কোথা হইতে পাওয়া গেল ? বিনয়—গণপতি শাস্ত্রীর মতে ইহার অর্থ 'শাস্ত্রবিজ্ঞান', শ্যাম শাস্ত্রীর মতে—discipline. বিনয় কি—তাহা কৌটিল্য স্বয়ং পরে বুঝাইবেন। যোগক্ষেমাবহ—যোগ-ক্ষেমের প্রাপক ; can procure safety and security of life (S H)—ইহা মূলানুগ নহে ; যোগ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ; ক্ষেম—প্রাপ্তের পরিরক্ষণ, acquisition of what was not previously attained and preservation of what is acquired.

মূল :—বিনয়—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। ক্রিয়া দ্রব্যকে বিনীত করে—অদ্রব্যকে নহে। শুশ্রূষা শ্রবণ গ্রহণ ধারণ-বিজ্ঞান ঊহাপোহ তত্ত্বাভিনিবেশ (গুণ)-বিশিষ্ট বুদ্ধিযুক্ত (জনকে) বিদ্যা বিনীত করে—অন্যকে নহে।

সঙ্কেত :—কৃতক (মূল)—কৃত্রিম—ক্রিয়া-দ্বারা উৎপাদিত। ক্রিয়া—অভিযোগরূপ ক্রিয়া (গঃ শাঃ) ; অভিযোগ—পুনঃপুনঃ অনুশীলন, অভ্যাস, application, কৃতক—artificial (S H) ; স্বাভাবিক—ক্রিয়া ব্যতীত বাসনাবশে সিদ্ধ (গঃ শাঃ) ; অকৃত্রিম ; natural (S H)। ক্রিয়া হি দ্রব্যং বিনয়তে নাদ্রব্যম্—একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন গণপতি শাস্ত্রী—সংস্কারের উপযোগী ক্রিয়া (শাণযন্ত্রে ঘর্ষণ-পালিশ করা ইত্যাদি) যেমন দ্রব্যকে (খনিজাত রত্নকে) বিনীত (অর্থাৎ সংস্কৃত—উজ্জ্বল) করে—পক্ষান্তরে অদ্রব্যকে (যে কোন প্রস্তরকে) সংস্কৃত করিতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যাভ্যাসরূপ ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ শুশ্রূষাদি-বুদ্ধিগুণ-সম্পন্ন জনকেই সংস্কৃত (বিনীত) করে—উক্ত গুণরহিত ব্যক্তিকে বিনীত করিতে পারে না (গঃ শাঃ)। Instruction can render only a docile being conformable to the rules of discipline, and not an undocile being (S H). Training disciplines a fit and proper person (object)—বলিলেই চুকিয়া যায়। হিতোপদেশে অনুরূপ বাক্য আছে—"নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎ ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ"। "ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি" (রঘু ৩।২৯)। "পাত্রবিশেষন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ" (মালতী-মাধব ১।৬)। "দ্রব্যং জিগীষুমধিগম্য জড়াত্মনোঽপি নেতুর্যশস্বিনি পদে নিয়তা প্রতিষ্ঠা। অদ্রব্যমেত্য তু বিশুদ্ধনয়োঽপি মন্ত্রী শীর্ণাশ্রয়ঃ পততি কূলজবৃক্ষবৃত্ত্যা" ।—। মুদ্রারাক্ষস ৭।১৪)। শুশ্রূষা—শ্রবণেচ্ছা ; obedience (S H) ; যাঁহাদের বচন শ্রবণের যোগ্য, তাহাদিগের বচন শ্রবণে ইচ্ছা (গঃ শাঃ) ; desire to. listen to শ্রবণ—আসেবা (গঃ শাঃ) ; hearing ; শ্রবণেচ্ছার পর শ্রবণ কর্ত্তব্য। গ্রহণ—শ্রুত বিষয়ের জ্ঞান (গঃ শাঃ) ; grasping (S H) ; অথবা—'গ্রহণ' অর্থে কণ্ঠস্থীকরণও হয়—memorising, ধারণ—গৃহীত বিষয়ের অবিস্মরণ (গঃ শাঃ) ; retentive memory (S H). বিজ্ঞান—ধারিত বিষয়সমূহে সাধ্য-সাধনাদি-স্বরূপ-বিবেক জ্ঞান (গঃ শাঃ) ; discrimination (S H) Determinate knowledge ঊহ—শব্দতঃ উক্ত না হইলেও হেতু দ্বারা অনুমান (গঃ শাঃ) ; conjecture, arguing—বলা চলে অপোহ—যুক্তি-বিহীনের পরিত্যাগ (গঃ শাঃ) ; শ্যাম শাস্ত্রী ঊহাপোহ—এক সঙ্গে—inference বলিয়াছেন। অপরের তর্ক নিরাসের নিমিত্ত কৃত বিপরীত তর্ক—অপোহ—ইহা ঊহের বিপরীত। ঊহাপোহ—full discussion ; consideration of the pros and cons (Apte). তত্ত্বাভিনিবেশ—বস্তুর যাথাত্ম্য-জ্ঞান (গঃ শাঃ) ; deliberation (S H) ; intentness, close application to truth—বলা উচিত।

মূল :—আর বিদ্যাসমূহের যথাযথভাবে আচার্য্য প্রামাণ্যানুসারে বিনয় ও নিয়ম (শিষ্যপক্ষে বিহিত)।

সঙ্কেত : যথাস্বম্ (মূল)—যথাযথভাবে ; strictly observed (S H) ; duly বলিলেই চলিত। আচার্য্যপ্রামাণ্যাৎ—যে বিদ্যার যিনি আচার্য্য বা উপদেষ্টা, সেই বিদ্যার অধ্যয়নকালে সেই আচার্য্য তত্তৎ বিদ্যার অধ্যেতা শিষ্যের প্রতি উপদেশদানে সমর্থ বলিয়া (গঃ শাঃ)

under the authority of specialist teachers (S H); যেহেতু আচার্য্য বিদ্যাদানে প্রমাণভূত (পূর্ণ সামর্থ্যযুক্ত) অতএব—। আচার্য্য বিদ্যার উপদেশে প্রমাণভূত (**authority**) বলিয়া তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন না করিয়া যথাযথ বিধি অনুসারে বিদ্যা-শিক্ষা ও তাহার আনুষঙ্গিক নিয়ম-পালন কর্ত্তব্য—ইহাই তাৎপর্য্য। বিনয়—শিক্ষা (গঃ শাঃ); **study**; অথবা বিদ্যা-গ্রহণকালীন নানারূপ আচার-পদ্ধতি (যথা, গুরুর আগমনে গাত্রোত্থান, অভিবাদন-প্রক্রিয়া ইত্যাদি)। নিয়ম—ব্রহ্মচর্য্যাদি, গুরু-পরিচর্য্যা-ব্রত ইত্যাদি (গঃ শাঃ); **precepts** (S H); **rules of conduct** (e. g. **celibacy**) **during the period of study**—বলা উচিত।

মূল :—কৃতচূড় (বালক) লিপি ও সংখ্যা (শাস্ত্রের) (যথা-শাস্ত্র নিয়মপূর্ব্বক) উপযোগ করিবে।

সঙ্কেত :—বৃত্তচৌলকর্ম্মা—চৌল = চৌড় (ড় = ল); যাহার চূড়াকরণ সংস্কার হইয়াছে এমন বালক। গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন—পঞ্চবর্ষ অথবা ত্রিবর্ষ। মনু বলিয়াছেন শ্রুতিবচনবশে চূড়া প্রথম অথবা তৃতীয় বর্ষ বয়সে কর্ত্তব্য। চূড়া (**tonsure**)—(S H). লিপি—অক্ষর-পরিচয়; **alphabet** (S H) সংখ্যান—গণিত; **arithmetic** (S H)। উপযুঞ্জীত—উপযোগ করিবে অর্থাৎ যথানিয়মে শিখিবে (গঃ শাঃ); **shall learn** (S H).

মূল :—কৃতপোনয়ন (বালক) শিষ্টগণের নিকট হইতে ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী (শিখিবে); অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে বার্ত্তা (শিখিবে); বক্তা ও প্রয়োক্তৃগণের নিকট হইতে দণ্ডনীতি (শিক্ষা করিবে)।

সঙ্কেত :—শিষ্ট—সম্যগরূপে তত্তৎ শাস্ত্র যাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন; ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে শিষ্টের লক্ষণ দিয়াছেন—যাঁহারা সদাচারী, বেদাধ্যায়ী ও সংস্কৃতভাষাভাষী—তাঁহারাই শিষ্ট। **Teachers of acknowledged authority** (S H); **men of highest erudition and culture** বলা যায়। অধ্যক্ষ—দ্বিতীয় অধিকরণে নানা শ্রেণীর অধ্যক্ষগণের কথা বলা যাইবে। বক্তৃপ্রয়োক্তৃভ্যঃ (মূল) —যাঁহারা বচনে ও প্রয়োগে কুশল তাঁহাদিগের নিকট হইতে (গঃ শাঃ); **under theoretical and practical politicians** (S H)।

মূল :—ব্রহ্মচর্য্য—ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত। ইহার পর গোদান ও দারকর্ম্ম।

সঙ্কেত :—আ ষোড়শাদ্ বর্ষাৎ—ষোড়শ বর্ষ ব্যাপিয়া (গঃ শাঃ)— ইঁহার মতে অভিবিধি অর্থে 'আ'র প্রয়োগ—মর্য্যাদা অর্থে নহে। তেন বিনা মর্য্যাদা (**exclusion**); তৎসহিতোঽভিবিধিঃ (**inclusion**); কিন্তু আমাদিগের মনে হয়—এ স্থলে 'আ'র অর্থ মর্য্যাদা। ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপিয়া। প্রচলিত চাণক্য-শ্লোকেও ইহার ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ'। শ্যামশাস্ত্রীও এই মতানুসারী— **till he becomes sixteen years old.** গোদান—ব্রহ্মচর্য্যাবসানে কেশান্ত-সংস্কার; **tonsure** (SH)। প্রাচীন যুগে দুইবার কেশ-সংস্কার করিতে হইত। চূড়াকরণের সময় মধ্যে মধ্যে কেশচ্ছেদন করিয়া চূড়া বাঁধা হইত। চূড়ার পর বিদ্যারম্ভ। অনন্তর উপনয়ন, বেদাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যান্তে গোদান—পূর্ণ মস্তক-মুণ্ডন। তারপর বিবাহ (দারকর্ম্ম)।

মূল :—ইহার (পক্ষে) বিনয় বৃদ্ধ্যর্থ বিদ্যা-বৃদ্ধ-সংযোগ নিত্য (কর্ত্তব্য); যেহেতু বিনয় তন্মূলক।

সঙ্কেত :—এই প্রকরণটির নাম বৃদ্ধসংযোগ; এই 'বৃদ্ধ' বলিতে যে বিদ্যা-বৃদ্ধই বুঝাইতেছে—এস্থলে কৌটিল্যের উক্তিই তাহার প্রমাণ। বিদ্যা-বৃদ্ধ-সংযোগ—বিদ্যাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয় বজায় রাখা; **keep company with aged professors of sciences** (SH); aged না বলিয়া—**specialists in sciences** বলিলেই ভাল হইত। বিনয়-বৃদ্ধির নিমিত্ত—**for maintaining efficient discipline** (SH); **for advancement of discipline**—বলা উচিত। বিনয়—শাস্ত্র-সংস্কার (গঃ শাঃ); শিক্ষা, সংস্কার, ইন্দ্রিয়জয়—এক কথায় **culture, discipline**—এ সকলই বিনয়ের অন্তর্গত। নিত্য—যার গ্রহণানন্তরও কর্ত্তব্য (গঃ শাঃ)— **invariably** (**keep company**) (SH); **compulsory, obligatory**, তন্মূলক—বিদ্যাবৃদ্ধ-সংযোগ-মূলক (গঃ শাঃ) **in whom has its firm root** (SH); শ্যামশাস্ত্রীর অভিপ্রায়—'তৎ' পদের অর্থ—বিদ্যাবৃদ্ধ—বিদ্যাবৃদ্ধ-সংযোগ নহে। কিন্তু তদপেক্ষায় অন্য অর্থটি ভাল।

মূল :—পূর্ব্ব অহর্ভাগে হস্তি অশ্ব রথ প্রহরণাদি বিদ্যাসমূহে বিনয় প্রাপ্ত হইবে। পরবর্ত্তী (অহর্ভাগ) ইতিহাস-শ্রবণে (যাপন করিবে)। পুরাণ, ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র—(ইহাই) ইতিহাস।

সঙ্কেত :—পূর্ব্ব অহর্ভাগ—পূর্ব্বাহ্ণ। বিনয়প্রাপ্ত হইবে—মূলে আছে—বিনয়ং গচ্ছেৎ—শিক্ষালাভ করিবে, **receive lessons in** (SH)। প্রহরণ-বিদ্যা—অস্ত্রবিদ্যা। পশ্চিম অহর্ভাগ—অপরাহ্ণ; তৃতীয় অহর্ভাগ (গঃ শাঃ); **afternoon** (SH)। পুরাণ—সৃষ্টি-প্রলয়-বংশ মন্বন্তর-বংশানুচরিত—এই পঞ্চ-বিবরণ-সমন্বিত বেদব্যাস-রচিত গ্রন্থ। অষ্টাদশ মহাপুরাণ—বিষ্ণু ইত্যাদি। অষ্টাদশ উপপুরাণ—কল্কি ইত্যাদি। ইতিবৃত্ত—রামায়ণমহাভারতাদি (গঃ শাঃ); **history**; অতীত ঘটনার বিবরণ; **past incidents.** আখ্যায়িকা—সত্য জীবনী—দিব্য-মানুষাদি-চরিত (গঃ শাঃ)—যথা বাণভট্টের হর্ষচরিত; শ্যামশাস্ত্রীর **tales** মূলানুগ নহে। উদাহরণ—ন্যায়োপন্যাসশাস্ত্র—মীমাংসাদি (গঃ শাঃ); কিন্তু আমাদিগের মনে হয়—এই শব্দটির ভাষান্তর শ্যামশাস্ত্রী সুন্দরভাবে করিয়াছেন—**illustrative stories**; দৃষ্টান্তমূলক আখ্যান। ধর্ম্মশাস্ত্র

মূল :—অবশিষ্ট অহোরাত্র ভাগে অপূর্ব্ব-গ্রহণ ও গৃহীত-পরিচয় করিবে। আর অগৃহীতের পুনঃ পুনঃ শ্রবণও (করিবে)।

সঙ্কেত :—শেষমহোরাত্রভাগম্—অহোরাত্রভাগের অবশিষ্ট অংশ ; **during the rest of the day and night (SH)**; গণপতি শাস্ত্রী পাঠ ধরিয়াছেন—শেষমহর্ভাগম্। 'শেষ' অর্থে বুঝিয়াছেন—মধ্যম ভাগ। পাঠান্তর—অহোরাত্রভাগ—ইহার অর্থ করিয়াছেন—অবশিষ্ট (মধ্যম) অহর্ভাগ ও নিদ্রাদি কার্য্যান্তরে প্রযুক্ত রাত্রিভাগের অবশিষ্ট অংশ। অপূর্ব্ব-গ্রহণ—যাহা পূর্ব্বে পঠিত, অভ্যস্ত ও আয়ত্ত হয় নাই—এরূপ নূতন বিদ্যা ; **receive new lessons (SH)**। গৃহীত-পরিচয়—গৃহীত (পঠিত ও আয়ত্তীকৃত) অংশের ধারণার্থ অনুশীলন—পুরাতন-পাঠাভ্যাস ; **revise old lessons (SH)**। অগৃহীতের—গণপতি শাস্ত্রীর অর্থ—ঈষৎ গৃহীত অংশের সম্যগ্‌রূপে মনঃপ্রবেশার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ—**hear over and again what has not been clearly understood (SH)**। অপূর্ব্ব ও অগৃহীতের মধ্যে পার্থক্য এই যে—অপূর্ব্ব তাহাই যাহা মোটেই পড়া হয় নাই—সম্পূর্ণ নূতন পড়া, আর অগৃহীত—যাহা পড়া হইলেও কণ্ঠস্থ হয় নাই বা (ভাল) বুঝা যায় নাই। আভীক্ষ্ণ্যশ্রবণ—আভীক্ষ্ণ্য—পুনঃ পুনঃ।

মূল :—যেহেতু শ্রুত হইতে প্রজ্ঞা জন্মে ; প্রজ্ঞা হইতে যোগ ; যোগ হইতে আত্মবত্তা—ইহাই বিদ্যার সামর্থ্য।

সঙ্কেত :—শ্রুত—শ্রবণ (গঃ শাঃ) **learning (SH)**, শাস্ত্রশ্রবণ। প্রজ্ঞা—ত্রৈকালিকী বুদ্ধি (গঃ শাঃ) ; **knowledge (SH) ; wisdom** বলা ভাল। যোগ—শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা (গঃ শাঃ) ; **steady application (SH)** ; একাগ্রতা—অর্থই ভাল। আত্মবত্তা—মনস্বিতা (গঃ শাঃ) ; **self-possessiou** ; আত্মস্থতা। বিদ্যাসামর্থ্য—বিদ্যাশক্তি-জনিত ফল। **Jolly** পাঠান্তর হইয়াছেন—যোগাদাত্মবিদ্যাসামর্থ্যম্—**From application comes the capacity for understanding the science of the Suprome Spirit, This reading is perhaps peraferble** ; ইহার অর্থ—যোগ (সমাধি) হইতে আত্ম-বিদ্যার সামর্থ্য জন্মে।

মূল :—বিদ্যা বিনীত রাজা—প্রজাগণের বিনয়ে রত (ও) সর্ব্বভূতহিতে রত (থাকিয়া) অনন্যা পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—বিদ্যা-বিনীত—বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ; **(well) educated and disciplined (SH)** ; বিদ্যা-দ্বারা বিনীত অর্থাৎ—সংস্কারযুক্ত—এ অর্থও করা চলে। বিনয়ে—শিক্ষায় ; **good government of (SH)**। অনন্যা—একনাথা (গঃ শাঃ) ; **unopposed (SH)** ; একচ্ছত্রা—অর্থই ভাল।

॥ ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে বৃদ্ধসংযোগ-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পানিহাটি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল

দু-দণ্ড বিশ্রাম করো হে শ্রান্ত পথিক, এই বটবৃক্ষ মূলে,
গৌরাঙ্গ পরশ পূত এই সেই মহাতীর্থ সুরধুনী কূলে।
সার্দ্ধ চারিশতবর্ষ একে একে নির্ব্বাপিত মহাকাল বুকে,
স্মৃতি তার বক্ষে ধরি' বৃদ্ধ বনস্পতি এই তোমার সম্মুখে।
পুরী হ'তে প্রত্যাগত মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ হেথা অবতরি'
এই বৃক্ষতলে বসি' পথশ্রান্তি বিনোদিলা, ঘাটে রাখি' তরী।

এই সেই গঙ্গাঘাট, জীর্ণ ভগ্ন দীর্ণ বুকে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
কালের অনন্ত স্রোত আনে তার ব্যথাহত ব্যর্থ অভিলাস :
"আর কি আসিবে ফিরে প্রাণের ঠাকুর মোর কোনো শুভক্ষণে,
শত জনমের আমি সাধনার অশ্রু দিয়া ধোয়াব চরণে ?"
শ্রীচৈতন্য রজঃ-পূত পানিহাটি ধন্য হ'ল প্রেমের বন্যায়,
সামান্য মৃত্তিকা নহে, ধূলি এর তীর্থরজঃ, স্বর্গ-মহিমায় !

হেথা হ'তে চলো সেই রাঘব পণ্ডিতগৃহে—মাধবীলতায়,
ঘিরিয়াছে আজিনাটি শতবাহু বিস্তারিয়া শ্যামল শোভায়।
বর্ষে বর্ষে বহু ভক্ত সঙ্গোপনে অশ্রু অর্ঘ্য করিছে বর্ষণ,
প্রেমানন্দে বৈষ্ণবের মেটেছে প্রাণের ক্ষুধা, অনন্ত-ক্রন্দন।

দণ্ড-মহোৎসবে আজো লক্ষ লক্ষ নরনারী মিলিছে শ্রদ্ধায়,
চক্ষুহীন মহা অন্ধ, তর্কে বস্তু নাহি মিলে বিশ্বাসে মিলায়।

শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালার একমাত্র প্রাণমন্ত্র পরম বৈভব,
গঙ্গাতীরে পানিহাটি অতীতের সাক্ষ্যরূপে বাড়ায় গৌরব।
যক্ষ সম বক্ষে করি বিরাজিছে গ্রন্থাগার গৌরাঙ্গ মন্দির,
বহু স্মৃতি বিজড়িত বহু যুগ পুঞ্জীভূত পূত অশ্রুনীর।

হের সন্ন্যাসীর কন্থা, এর চেয়ে পবিত্র কি মর্ত্ত্যে কিছু আছে ?
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শ্রীঅঙ্গের আবরণ হেথায় বিরাজে।
প্রভুর পাদুকা অংশ ভক্তের ভূতলে স্বর্গ, হেথা বিদ্যমান্‌।
সম্ভ্রমে নোয়াও শির, নয়ন মেলিয়া হের দিব্য অভিজ্ঞান।

পানিহাটি পরিক্রমা শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভ্রমণের সম বলে মানি,
কৃষ্ণ-প্রীতি উপজিলে ভক্তে নিজে ভগবান্‌ বুকে লন টানি।
ধন্য হ'ল তনু মন চৈতন্যপরশপূত প্রমি পানিহাটি
সাধ যায় বঙ্গদেশে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি আমি মাখি ধূলি মাটি।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

১২

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত মুসলমান নেতা, স্যর সৈয়দ আহম্মদ পেট্রিটিক এসোসিয়েশন নামক এক সভা স্থাপন পূর্ব্বক মুসলমানগণকে কংগ্রেস বর্জ্জন করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানগণ যে কংগ্রেসকে বর্জ্জন করেন নাই তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র তাঁহার সতীর্থ বদরুদ্দীন তায়েবজীকে এই অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা মীর হুমায়ুন শা ও য়ুরেশিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা মিষ্টার হোয়াইট এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এই সময়ে স্যর অকল্যাণ্ড কলভিনের ন্যায় য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেনামীতে পুস্তকাদি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং লর্ড ডাফরিণ প্রকাশ্য সভায় কংগ্রেসকে এক অজ্ঞাত ভূমিতে লম্ফপ্রদান করিতে উদ্যত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। হিউম ও ব্যারিষ্টার নর্টন কংগ্রেসের পক্ষ লইয়া প্রতিবাদ করিয়া পুস্তকাদি প্রচার করেন।

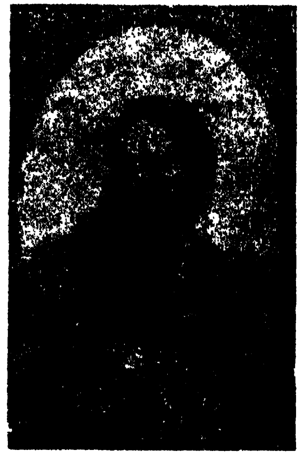


বদরুদ্দীন তায়েবজী

ইংলণ্ডে প্রচার কার্য্য

এই সময়ে উমেশচন্দ্র ডায়েবিটিস রোগে আক্রান্ত হন এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের ও বিশ্রামের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্রামসুখ উপভোগ ছিল না। তিনি মিষ্টার হিউম, মিঃ ডিগবী, মিঃ নর্টন প্রভৃতির সহযোগে ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডীয়দিগের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ওয়েলস্ট্রীটে ডাক্তার মন্ত্রের সহিত উমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে এক বহুতথ্যপূর্ণ চিন্তাগর্ভ মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, ভারত সম্বন্ধে সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ যখন বক্তৃতা করেন তখন সভাগৃহে প্রায় কেহই থাকেন না, ভারতবাসী রাজভক্ত, তাহাদিগকে কঠোর হস্তে শাসন করিবার প্রয়োজন নাই। বড়লাটের সভায় সরকারী ব্যতীত কয়েকজন বেসরকারী মনোনীত সদস্য আছেন তাঁহাদের কেহ কেহ ইংরাজীভাষাই জানেন না অথচ ইংরাজীতে সভার কার্য্য নির্বাহ করা হয়। কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে বলা হয়, 'তোমরা উপযুক্ত হও নাই', কিন্তু যদি জলে না যাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে কি করিয়া সন্তরণ শিক্ষা দেওয়া যায়? ব্রিটিশ জনসাধারণকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।



উমেশচন্দ্র



আর্ডলি নর্টন

উক্ত বৎসর ২১শে অগষ্ট নর্থ্যাম্পটন সহরে টাউনহলে একটি বিরাট সভা আহূত হয়, উহাতে পার্লিয়ামেন্টের সদস্য চার্লস ব্র্যাড্‌ল, দাদাভাই নৌরোজী ও উমেশচন্দ্র বক্তৃতা করেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদের দুঃখের প্রধান কারণ এই যে আমাদের দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট নাই। সপারিষদ সেক্রেটারী অব ষ্টেট ইংলণ্ড হইতে একপ্রকার ভারতশাসন করেন, কিন্তু অনেক সময়েই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পার্লিয়ামেন্টের বেসরকারী সদস্যরা অবগত আছেন তাহাও তিনি জানেন না। সেদিন কমন্স সভায় আমি ভারত সম্বন্ধে বিতর্ক শুনিতে গিয়াছিলাম। যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহারই উত্তরে আণ্ডার সেক্রেটারী বলেন "সরকারী ভাবে তাঁহারা কিছু জ্ঞাত নহেন।" মনে হয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদই সেক্রেটারী অব ষ্টেট রাখেন না। তাহার পর যে টুকু তথ্য তিনি ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়া দেন তাহারও সত্যতা পরীক্ষা করিবার তাঁহার কোন উপায় নাই। সরকারী তথ্যে সকল সময়ে সত্য উদ্ঘাটিত হয় না। বিচার বিভাগেও অনেক গলদ আছে। একজন আসামী মারাত্মকভাবে আঘাত করিবার জন্য অভিযুক্ত হয়। এসেসররা তাহাকে নির্দ্দোষ বলেন, বিচারক তাহাকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। সে হাইকোর্টে আপীল করায় বিচারপতি তাহাকে হত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ফাঁসীর আদেশ দেন। হাইকোর্টের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট ক্ষমা প্রদর্শন করা অনুচিত বিবেচনা করিলেন। তাহার পর যে এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রচলিত হইয়াছে উহাতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বহু পূর্ব্বে প্রাপ্ত দণ্ডাজ্ঞা তাহার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হইতে পারে, অর্থাৎ, মনে করুন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কেহ অপরের পকেট মারিয়াছে, আদালতে তাহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সে পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিল !!

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর ক্রয়ডনে ললনা-সমিতিতে ডাক্তার মত্রের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়, উহাতে ক্রয়ডনের নগরবাসী এবং ভারতের প্রতিনিধিরূপে তিনি একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। এই সময়ে ব্র্যাড্‌লর প্রস্তাবানুসারে ভারত-শাসন সম্বন্ধীয় যে আইন লর্ড ক্রস বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন তৎসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের সভায় যে বেসরকারী মনোনীত সদস্য লইবার ব্যবস্থা হয় তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। উচ্চ পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এমন সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে যাঁহাদের কেহ কেহ ইংরাজী ভাষা জানেন না এবং সভার কার্য্যে কোন অংশ লইতে অক্ষম। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কিরূপে কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। উত্তরে তিনি বলেন বড়লাট দয়া করিয়া আমাকে পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন সুতরাং সকল সময়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভোট দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। বড়লাটের ইঙ্গিত দেখিয়া তিনি প্রস্তাব সম্বন্ধে 'হাঁ' বা 'না' বলিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করেন! এরূপ বেসরকারী সদস্য বড়লাটের সভায় থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি?

চতুর্থ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য এণ্ড্‌ ইউল কোং'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান অংশীদার মিষ্টার জর্জ্জ ইউলের নাম প্রস্তাবিত হয় এবং ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্রকে তাঁহাকে সম্মত করাইবার ভার প্রদান করা



জর্জ্জ ইউল

হয়। উমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি ইউলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি সহানুভূতি ও শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার কথা শ্রবণ করেন এবং কংগ্রেস



স্যর উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার

সম্বন্ধীয় পুস্তিকাদি পড়িতে চাহেন। তাঁহার নিকট গত তিন বৎসরের কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণী ছিল, সেগুলি জর্জ্জ ইউলকে পাঠাইয়া দিলে, জর্জ্জ ইউল উমেশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর উমেশচন্দ্র এলাহাবাদে চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য মিষ্টার নর্টনের সহিত ভারতবর্ষে ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই প্রত্যাগমন

করেন। ইংলণ্ডে তিনি ভারতবর্ষের জন্য যে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা সকলেই কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবল সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতেন না, উচ্চপদস্থ ইংরাজগণের সহিত নির্জ্জনেও ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করত তাঁহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতেন। স্কীন প্রণীত স্যর উইলিয়ম উইলসন হণ্টারের জীবনচরিতে (৩৮৮ পৃষ্ঠা) মহামাননীয় স্যর রিচার্ড গার্থকে হণ্টার ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৮৮ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় উমেশচন্দ্র, ডিগবী প্রভৃতি কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের সহিত হণ্টার ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত ভারতবর্ষ প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র লাভের যোগ্য হয় নাই, তবে য়ুনিভারসিটী, বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারে।

দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের জন্য উমেশচন্দ্র সাধারণের নিকট হইতে প্রশংসা বা সংবর্দ্ধনা লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বরের 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্র পাঠে প্রতীত হয় যে ইংলণ্ডে বক্তৃতাদি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে তিনি শিশিরকুমার ঘোষকে পত্র লিখিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া ছিলেন যে যেন তাঁহার সংবর্দ্ধনা প্রভৃতি হাস্যাস্পদ অনুষ্ঠান করা না হয়। সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছিলেন এ বিষয়ে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও অনেক স্থলে ছোট ছোট দল তাঁহাকে অভিনন্দন লিপি দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল, এবং ডাকবিভাগের মধ্যবর্ত্তিতায় অসংখ্য পত্র ও কবিতা তাঁহার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মী আর্ডলি নর্টনকে উদ্দেশ করিয়া একজন কবিযশঃ প্রার্থী লিখিয়াছিলেন :

Welcome to Messrs. Eardley Norton and Womesh Chunder Bonnerjee, Bar-at-law

"All hail to you, my country's faithful friends,
From Britain's isle, on which our weal depends,
And where you worked so well for Bharat land,
That we can, sure, achieve a success grand.

You 've shown you are my country's trusty stays,
This wide extensive land rings with the praise
Of you, who served her in the time of need,
And proved yourselves her champions true indeed."

আর একজন লিখিয়াছিলেন :—

"Hail, meek and able Hindu mild !
Our peerless Norton, come !
Come back, Great England's worthy child !
Our Bonnerjee, come home !

A nation's gratitude and love
Await you in this place,
Naught can our thankfulness remove,
We are a grateful race.

Ye, India's sons, rejoice ! Arise,
To welcome Bonnerjee
And Norton, from that land where lies,
The home of all that's free !

With shouts of joy, come, let us meet
Our friends, returning here !
With cheerful looks, come, let us greet
The men we hold so dear !

Just England has begun to know
Our people's woes aright ;
These two did labour much to show
Things in their proper light.

May we receive more rights so just,
As righteous Ripon gave !
Our hopes in England's justice rest,
And in our Congress brave.

May He, the Wise Almighty Lord,
Show'r bliss upon these shores !
May He His help to us accord.
And aid us in our course !

Our end and aim is freedom true,
Our watch-word peace to all !
We wish each man should have his due !
We wish for no one's fall !"

এই সকল কবিতায় কবিত্ব না থাকিলেও উহাতে জনসাধারণের যে কৃতজ্ঞতা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা যে আন্তরিক ও অকৃত্রিম, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হয়। জর্জ্জ ইউল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদ হাই-কোর্টের খ্যাতনামা উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, যাঁহাকে উমেশচন্দ্রই কংগ্রেসে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক হন। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী চারুচন্দ্র মিত্র মহোদয় তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন কংগ্রেস যাহাতে এলাহাবাদে না হইতে পারে তজ্জন্য

চেষ্টা করিয়াছিলেন, খসরুবাগে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল কিন্তু তথায় অনুমতি দিয়া অনুমতি প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। অবশেষে



পণ্ডিত অযোধ্যানাথ

লাউদার কাস্‌লে অধিবেশন হয়। স্যর অকল্যাণ্ড এলাহাবাদে অনুপস্থিত ছিলেন।

জর্জ্জ ইউল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শেরিফ ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দেশীয় ও য়ুরোপীয়গণকে একই ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া উভয়



চারুচন্দ্র মিত্র

সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা পাইতেন। স্যর হেনরি কটন লিখিয়াছেন শেরিফ রূপে তিনি যে অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই তিনি কলিকাতার উন্নতিকল্পে ব্যয়ার্থ স্যর হেনরি কটনের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। স্যর হেনরি কটন (তখন লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার) ও স্যর হেনরি হ্যারিসন (কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার ম্যান) তখন ৩নং কিড্ স্ট্রীটে একই বাড়ীতে বাস করিতেন। স্যর হেনরি ও হ্যারিসন, ইউল ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সংবর্দ্ধিত করিবার জন্য তাঁহাদের গৃহে এক উৎসবের আয়োজন করেন। গৃহ দীপালোকে অপূর্ব্বভাবে সজ্জিত হইয়াছিল এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ তারিখে যে ভোজসভা হয় তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এ-ও-হিউম; (পরে বাঙ্গালার ছোট লাট) স্যর চার্লস এলিয়ট, ও মিস এলিয়ট, (পরে প্রিভি কৌন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্য) মিষ্টার আমীর আলী ও তাঁহার পত্নী, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জেমস পিলে, মিঃ ডেভিড ইউল, স্যর উইলিয়ম হণ্টার, কলিকাতা বারের নেতা ও কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি মিঃ ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী ও মিসেস বনার্জ্জী প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশহিতৈষী (এবং পরে কংগ্রেসের দুইবার প্রেসিডেণ্ট) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বম্বে সিভিলিয়ান মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিসেস ঠাকুর, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, টিপু সুলতানের প্রপৌত্র প্রিন্স ফেরোক শাহ, বণিক-সম্রাট রবার্ট ষ্টীল, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল চন্দ্রমুখী বসু, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট নবাব আমীর হোসেন, বাঙ্গালার চীফজষ্টিস স্যর কোমার পেথারাম, মান্দ্রাজের চীফজাষ্টিস স্যর চার্লস টার্ণার, কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফৌজদারী ব্যারিষ্টার মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ (দরিদ্রের পক্ষ লইয়া বিনা পারিশ্রমিকে যাঁহার ন্যায় কেহ কাজ করেন নাই) এবং মিসেস ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা লালমোহন (যিনি একবার ডেপ্টফোর্ড হইতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং একবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন) প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও পরে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ-এম-বসু ও তাঁহার পত্নী, প্রতিভাশালী পরিবারের সুযোগ্য বংশধর ও-সি-দত্ত, শিক্ষা বিভাগের পি-কে-রায় ও তাঁহার পত্নী, মুন্সিপালিটির সেক্রেটারী টার্নবুল, ও তাঁহার ভগিনী মিস টার্নবুল, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী ফাদার লাফোঁ, স্যর এডওয়ার্ড বাক, প্রবীণ সংবাদ পত্র সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, সুপণ্ডিত ও সুলেখক মিষ্টার এন-এন-ঘোষ প্রভৃতি।



স্যর হেনরী কটন

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উমেশচন্দ্র এবং মনোমোহন ঘোষও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভবনে য়ুরোপীয় ও দেশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রিত ও সম্মিলিত করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেন। (ক্রমশঃ)

উদয়াস্তের কাহিনী

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ন'টা বাজলে আর জ্ঞান থাকে না ঈশানবাবুর।

জানলা দিয়ে ষ্টেশনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন,—সিগনাল ডাউন হয়ে গেছে। চেঁচাতে শুরু করেন, একে তাকে ডাকেন। ওরে ও বিমু—উ কম—লা—আ। দে মা দে, একটু তেল দিয়ে যা শীগ্রি। সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেছে যে! ওরে ও বিমলা—আ। বিমলা কমলার পরিবর্ত্তে সাড়া দেয় তাদের মা কামিনী।—এ্যাতক্ষণ ছিলে কোথায় শুনি, কার ধানে মই দিচ্ছিলে? ঘি-মরিচ খেয়ে শানানো গলা যেন। স্ত্রীর কণ্ঠ-ঝঙ্কারে ব্যাহত হয়ে, বিমলা কমলার অপেক্ষা না করে তেকাটা থেকে তেলের বাটিটি নিয়ে কলের-ঘরে প্রবেশ করলেন ঈশানবাবু। যেতে যেতে নিম্নস্বরে স্বগত করলেন,—বসেছিলুম যেন আমি! বাজার করলে কে! গয়লা বাড়ী থেকে দুধ আনলে কে? কেরাসিন ফুরিয়েছে আগে বলবেন না, সব হুকুম ত' একসঙ্গে করা হবে ইদিকে! বসেছিলুম যেন আমি!

ওধারেও স্বগত চলেছে, গলা ফাটিয়ে, পাড়া মাতিয়ে।—এমন নিড়বিড়ে মানুষ হয়? সকাল থেকে কেবল এঘর আর ওঘর! কেনরে বাবা, দু'দণ্ড আগে মনে পড়ে না আফিসের কথা?

মেয়েরা দুজন লুকিয়ে হাসে বাপমায়ের বাক্য বিনিময়ে। মজা পায় যেন তারা। কামিনীর নজর পড়ে বিমলার দিকে।

মুখে আঁচল দিয়ে সে তখন আপন মনে হাসছে।—মরণ মেয়ের, হাসছে দেখ বেহায়ার মত! ফের যদি ঐ কুলোর মত দাঁত বের করে হেসেছিসত' পোড়াকাঠ মুখে পুরে দিয়েছি আমি। খেতে আসছে যে, জায়গা করবার জন্তে ক'টা চাকরাণী রেখেছে তোর বাপ?

নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিমলা। আসন এনে পাতে, পরিপূর্ণ জলের গেলাসটা বসিয়ে দেয় ঠক করে। কমলা চেয়ে থাকে নতদৃষ্টিতে, ভয়ে ভয়ে। তার চিবুকটা সজোরে তুলে বললে কামিনী,—বাবার পান সেজেছো, না তাও এই ঝিমাগীকে করতে হবে?

ক্ষীণকণ্ঠে বললে কমলা—হ্যাঁ সেজেছি।

জলের গেলাসটা সশব্দে মাটিতে বসাতেই একটু জল চলকে উপচে পড়েছে। জ্বলে গেল কামিনী।—তেজ দেখাবি অন্ত জায়গায়। পান থেকে চুণ খসিয়ে উগ্‌গার করবেন না, তেজ দেখ না মেয়ের। দাঁড়িয়ে মুখে লাথি মারি না যেন, তেজ ভেঙ্গে দিই না যেন পোড়ারমুখীর!

ঈশানবাবু ততক্ষণে স্নান সেরে চিরুণীর অভাবে হাত দিয়ে সিঁথি কাটতে কাটতে আসনে বসে ডাকছেন—কৈরে বিমু, ভাত আন মা। ট্রেন এসে গেল বোধহয়।

—ভাবনা ছিল না তা হ'লে। জানলায় ধারে দাঁড়িয়ে হাসতে বল' না, খুব পারবে'খন! বে' দিলে দু'ছেলের মা হত এক একটা। কথা বলতে বলতে ভাতের থালা বসিয়ে দেয় কামিনী। নিঃশব্দে মুখে গ্রাস তোলেন ঈশানবাবু। আহার নয়, গলাধঃকরণ কোন' প্রকারে। ট্রেনের দূরাগত সান্টিং শুনে ঢক ঢক করে গেলাসের জল নিঃশেষ করে কলতলায় ছোটেন। আনলায় জামাটা কাঁধে ফেলে কমলার হাত থেকে ন্তাকড়ায় জড়ানো পান ছোঁ মেরে নিয়ে জুতোয় পা গলিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান তিনি। দৌড়তে থাকেন প্রায়।

ট্রেন তখন ষ্টেশনে 'ইন' করেছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল কোলাহল শুরু করেছে। তাস খেলার সঙ্গী খুঁজে নিতে হবে। ওভার-ব্রিজের ওপর থেকে ডাক দেন ঈশানবাবু।—চৌধুরী, ফেলে যেওনা ভাই।

চৌধুরী ট্রেনের গার্ড। মুখে বাঁশী তুলে বাজাতে গিয়ে থেমে গেল সে। মুহূর্ত্ত কয়েক অপেক্ষার জন্ত চৌধুরী হয়ত বাড়ীর-সাজা পান পাবে গোটা দু'য়েক। এ-সব ব্যাপার পরিচিত তার। রিটায়ারের সময় হয়ে এসেছে, অভিজ্ঞতায় বুড়িয়ে গেছে সে। এক আধ মিনিট এদিক ওদিকের জন্ত চাকরী কেঁচে যায় অনেকের, করুণাপ্রবণ চৌধুরী তাই যথাসাধ্য সহানুভূতিশীল। প্রত্যক্ষে সব সময়ে ফল না পেলেও, পরলোককে বিশ্বাস করে সে। পরোপকার করে তাই, শক্তি ও সামর্থ্যের আয়ত্তে যা যতটুকু হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও এত কোলাহল হত' না বোধহয়।

শাড়ির আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললে কামিনী—চেঁচায় দেখ একবার! ছোঁড়ার পড়ার ঠ্যালায় কাক বসতে পায় না বাড়ীতে!

যার উদ্দেশ্তে বাক্যবাণ ছোঁড়া হয়, সে কিছুই শুনতে পায় না। মাথা আর উর্দ্ধ দেহ পড়ার সঙ্গে তাল রেখে দোলাতে দোলাতে সে পড়ছে—'ক'কে কেন্দ্র করিয়া 'খ' ব্যাসার্দ্ধ লইয়া—পড়ছে ঈশানবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচন্দ্র।

—দোহাই আমার রাসবেহারী ঘোষ, পড়া থামাবি কিনা বল্—বললে কামিনী।

থামবার উপায় নেই শ্যামচন্দ্রের। স্কুলের পূর্ণ মাষ্টারকে মনে করেই পড়ছে সে। ক্ষমাহীন পূর্ণ কোন' কথাই শুনবেন না, দুই আঙুলের মধ্যে পেনসিল চালিয়ে আঙুল দুটি এক করে দেবেন। কিংবা জুলফির চুল খানিকটা উপড়ে নেবার চেষ্টা করবেন। ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে। তারপর? আর ভাবতে পারে না শ্যামচন্দ্র। পড়াও থামাতে পারে না তাই। কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছে। পূর্ণ মাষ্টার উদ্ধত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে। বলছেন—শ্যেমো, তুই বল্। জননীর কথা অমান্ত করে তাই পড়ে শ্যামচন্দ্র। অধিকতর বেগে, দুলে দুলে পড়ে। বিশ্বজগৎ ভুলে যায় যেন।

মধ্যম পুত্র শঙ্কর। অক্ষর পরিচয় শেষ করে 'কথামালা' ধরেছে। মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'। পড়ার চেয়ে ছবি দেখতে ভালবাসে সে। মনে মনে ভাবে, ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত কাকটিকে পায়রার মত দেখতে অনেকটা। রাজবাড়ীর খাঁচায় বহুপ্রকার পায়রা দেখেছে সে। তাদেরই একটির মত।

ছবিদর্শন-মগ্ন শঙ্কর চমকে উঠল'। শংকা বই তুলে খেতে ব'স্। গম্ভীর কণ্ঠস্বর কামিনীর। বিনা প্রতিবাদে বই না তুলেই উঠে পড়ল শঙ্কর। মা রান্নাঘরে ঢুকলে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল দাদাকে, দাদা, আয় খাবি আয়। দশটা যে বেজে গেল! দেখ্‌না কলের জল চলে গেছে। দাদা তখনও পড়ছে। দু'হাত বইয়ের ওপর চেপে জ্যামিতির কোণগুলো মনে করতে চেষ্টা করছে সে। মেলাচ্ছে মনে মনে।

কনিষ্ঠা কন্যা নবজাত। সেই সকালে কখন একটু মাই খেয়েছে, ক্ষুধা মেটেনি, তৃপ্ত হয়নি সে। রুক্ষবক্ষ কামিনীর স্তনাগ্র কেটে দেয় খুকু, দাগ বসিয়ে দেয় দাঁতের। কচি কচি, সুতীক্ষ্ণ দাঁত। দালানের একপাশে পড়ে চিঁ চিঁ করে কাঁদছে। অশক্ত কণ্ঠের টানা টানা কান্না। বুকে তার চাপড় দিয়ে, সাদরে কোলে তুলে দোল দিয়েও থামাতে পারে না কমলা। চিনির কৌট' থেকে মধ্যে মধ্যে আঙুলে করে তুলে নেয়, সকলের অলক্ষ্যে মুখে দিয়ে দেয় তার। ক্ষণিকের জন্য চিঁ চিঁ থামে। মুখ চোকাতে থাকে খুকু। আস্বাদ তরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় পূর্ব্ববৎ। বোধহয় বুঝতে পারে সে, ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে তাকে।

তরকারীর কড়া নামিয়ে ছুটে এল' কামিনী। কমলার কোল থেকে খুকুকে ছিনিয়ে নিয়ে বললে চিবিয়ে চিবিয়ে,—থাক্ ঢের হয়েছে, অনেক ডগ্‌পার করেছো। চিনি গিলিয়ে কিরমি করে ছাড়বে মেয়েটার? তার চেয়ে জানলায় দাঁড়াওগে দিদির মত, যদি কোন' ছোঁড়া দেখতে পাওয়া যায়!

লজ্জায় অধোবদন হয় কমলা। ধীরে ধীরে সে-স্থান ত্যাগ করে ঘরে গিয়ে বসে। মা'র কথায় দুঃখ হয় তার, কান্না আসে যেন। মার পদশব্দ পেয়ে বাসি-বিছানা তুলতে লেগে যায়। কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মোছে।—জানালাটা বন্ধ করে দে না দিদি। তোর জন্যে আমি যে বকুনি খাই। ফুঁপিয়ে কান্নার ভাঙ্গা গলায় বললে কমলা।

অনিচ্ছায় জানলা বন্ধ করে আলমারীর মাথা থেকে একখানা বই নিয়ে বসল বিমলা। ভারী ওজনের মোটা উপন্যাস। মনে নেই কত অবধি পড়া হয়েছিল, কোণ-মোড়া পাতাটা খুঁজতে থাকে তাই। খেতে বসে ভাত না পেয়ে নিরাশ হয়ে ডাকে শঙ্কর—ওমা ভাত দা—ও মা!

কথা বলতে পারে না কামিনী। স্তন্যপান করে ঘুমিয়েছে খুকু। ঘরে শুইয়ে এসে বললে কামিনী—মরণদশা ছেলের, দেখছিস্ না খুকীকে ঘুম পাড়াচ্ছি!

বিরক্ত হয় শঙ্কর।—ডাকলে কেন তা'হলে?

—ডাকলুম বেশ করেছি, বসে থাকবি। গুণধর দাদাটি গেলেন কোথায় আবার! ডাক্ সে ছোঁড়াকে। পঞ্চাশবার হাত এঁটো করতে পারবো না আমি। রান্নাঘর থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল কামিনীর।

ভাইয়েদের জলের গেলাস দিয়ে কমলা নীরবে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। হাতের কাছে কোন' কাজ না পেয়ে বাবার খাওয়া এঁটো থালাটা তুলে নামিয়ে দিয়ে এল' উঠোনে। ন্যাতা বুলিয়ে দিল' জায়গাটায়। একটু কাঁদলেই মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে তার, চোখ দুটো ফুলে ওঠে যেন। প্রতিবাদ করতে পারে না কিছুর। সাহস হয় না, মুখ ফোটে না তাই।

হঠাৎ এক সময়ে মা'র ঘরের ভাঙ্গা আয়নাটায় নিজের মুখখানা চোখে পড়ে যায়। চোখে আবার জলধারা নামে। চুরি করা শব্দহীন কান্না। ঘরের দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়। পাছে কারও চোখ পড়ে তাই।

কেবল দুপুরে বাড়ীটি নীরব হয় কিঞ্চিৎ—ছেলেরা স্কুলে চলে যাওয়ার পর। আহার সেরে কামিনীর নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস। উঠবে সেই সূর্য্যাস্তের কিছু আগে। লাইব্রেরীর মোটা উপন্যাস খানকয়েক পাশে নিয়ে শোয় বিমলা। বাঁধানো মাসিক পত্রিকাও আনায় মধ্যে মধ্যে। এক আধখানা উপন্যাসে কিছু হয় না তার। সাড়ে তিনশো পাতার উপন্যাস একখানা শেষ করতে কতক্ষণই বা লাগে! বড় জোর দু'ঘণ্টা। চরিত্র ও প্রকৃতির বর্ণনা বাদ দিয়ে কথোপকথন পড়া শুধু। মার ভয়ে বই লুকিয়ে রাখে সে। তোষকের তলায়, আলমারীর মাথায়, আরও অনেক জায়গায়, যার সন্ধান অন্য কারও জানা নেই। হাতে বই দেখলে রক্ষা নেই আর। বই কেড়ে নিয়ে বলবে কামিনী—পোড়াকাঠ দিয়ে গেলে দেব' চোখ দুটো, পড়ার সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দেব।

বয়সের অনুপাতে কমলা এখনও ছেলেমানুষ।

পুতুল নিয়ে খেলতে বসে সে। কাঠ ও কাচের সন্তানদের নিদ্রার ব্যাঘাত করে জামা কাপড় ছাড়ায়, আহার করায়। ছড়া কেটে ঘুম পাড়ায় অবশেষে। ছেলে ভুলানো ছড়া। ষ্টেশন মাষ্টারের ব্যারাক বাড়ীর কাছেই। ষ্টেশন মাষ্টারের পৌত্রীর জাপানী ছেলের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলেছে কমলার মেয়ের। আয়োজন চলেছে, পাকা কথা হয়ে গেছে। তবে জাপানী ছেলেটির একটি পা খসে গেছে। যুদ্ধ না মিটলে সারাবার উপায় নেই।

ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে চোরের মত এঘর ওঘর করে। সাহস করে ডাকতে পারে না—মা খাবার দাও। কামিনী যে ঘুমোচ্ছে! দিদিরা দেবে তার উপায় নাই। ভাঁড়ারের চাবি কামিনীর মাথার বালিসের তলায়। অনন্যোপায় হয়ে ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মত ঝগড়া করে শঙ্কর দিদিদের সঙ্গে। আচমকা পেছন থেকে বই কেড়ে নিয়ে পালায় বিমলার হাত থেকে। বহু অনুরোধেও যখন বই পাওয়া যায় না বিমলা বলে,—এই নে পয়সা। পয়সার লোভে বই দিতে আসে শঙ্কর। খপ করে হাতটা তার ধরে বাড়ীর পেছনে পুকুর ধারে নিয়ে গিয়ে ঘা কতক বসিয়ে দেয় কমলা। কমলার পুতুল খেলায় বাধা দিলে কেঁদে ফেলে সে। চোখের জল বরদাস্ত করতে পারে না শঙ্কর, মায়া হয় তার।

জ্যামিতির পড়া এত করে তৈরী করেও রেহাই পায়নি শ্যামচন্দ্র। বসতে বলবার আগেই বসেছিল বলে সাজা দিয়েছিলেন পূর্ণমাষ্টার। পুরা একটি ঘণ্টা বেঞ্চীর ওপর দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। মনটা তাই ভাল

নেই তার। বাড়ীতে ফিরেই বইগুলো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে চিৎকার করে ডাকল' সে,…এ্যাই বড়দি, খাবার দাও শীগ্রি।

বিমলা ও কমলা চমকে উঠল' তার ডাকে। মা যে ঘুমোচ্ছে!

আহ্বানে উত্তর না পেয়ে পুনরায় ডাকল শ্যামচন্দ্র—খাবার দাও না বড়দি, খিদে পায় না বুঝি?

ঘুম ভেঙ্গে গেছে কামিনীর।—শ্যেমো—ও—ও! ইদিকে আয় আগে। শুয়ে শুয়েই ডাকল কামিনী। দীপ্ত কণ্ঠস্বর।

মার কণ্ঠস্বর শুনে চেতনা হল' শ্যামচন্দ্রের। সভয়ে সাড়া দিল—যাচ্ছি মা এক্ষুণি। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে সে। অন্যায় কি করেছে সে! ক্ষুধা পেলে বলবে না? পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করে তার। ভয়ে ভয়ে দাঁড়ায় গিয়ে মা'র ঘরের দরজায়।

—চেঁচাচ্ছিস যে বড়? জিজ্ঞেস করল কামিনী।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললে শ্যাম—খিদে পেয়েছে যে, খিদে পেলেও বলব' না! চেঁচালুম কোথায়?

আর আছে কোথায়। উঠে বসল' কামিনী। হাতের কাছে হাত পাখাটা পেয়ে রাগের মাথায় বসিয়ে দিল পায়ে, হাতে ও পাছায়। বাধা না দিয়ে বিকৃত মুখে দাঁড়িয়ে রইল শ্যাম। চোখের কোল দু'টো সজল হয়ে উঠল শুধু।

…তেজ দেখাতে এসেছ' তুমি, লেখাপড়া শিখে মাথা কিনছো আমার? নজরছাড়া হ, দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললে কামিনী।

আহত স্থানে হাত বুলোতে বুলোতে বেরিয়ে গেল শ্যাম। হাত পায়ের লম্বা লম্বা দাগগুলো নজরে পড়তেই যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে উঠল যেন। কাল স্কুলে যাবে কি করে! দাগ দেখলে ছেলেরাই বা কি বলবে! নিজের পড়ার টেবিলে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে শ্যাম। ডুগরে ডুগরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, লজ্জায়, ক্ষোভে ও অপমানে। কমলা চুপি চুপি এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—আয় তেল লাগিয়ে দি, বড্ড লেগেছে, নারে?

সক্রোধে কমলার হাতখানা সরিয়ে দেয় শ্যাম। তার চোখে জলধারা দেখে কমলারও চোখ ফেটে জল গড়ায়। ভয় হয় তার। জ্বর আসে যদি শ্যামের! দাগগুলো বিষিয়ে যায় যদি! নিষেধ সত্বেও তেল লাগাতে থাকে সে। বলে…ছিঃ, শ্যাম, অবাধ্য হতে নেই ভাই। বারণ করলে শুনবে নাত' তুমি। দেখি আর কোথায় লেগেছে। লজ্জা করে শ্যামের, প্যান্টের দড়ি খুলতে। বলে,—না আর লাগেনি কোথাও, ছাড়'।

হেসে ফেলল' কমলা।—ছিঃ, লক্ষীটি দেখি ভাই। তেল না লাগালে ব্যথা হবে যে! বসে পড়তে পারবে না শেষকালে।

ছেলেকে মেরে ক্ষণিকের জন্য মনটা একটু উতলা হয়েছিল। এক গেলাস জল আর দুটো পান মুখে ফেলে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে আবার। শঙ্কর ঝিনুক টিপে ঘামাচি মেরে দিচ্ছে পিঠের। চোখ বুজে পড়ে আছে কামিনী।

খাবার দেওয়ার সময় একখানা পরোটা বেশী পায় শ্যাম। প্রহারের ক্ষতিপূরণস্বরূপ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর ঈশানবাবু ফেরেন। সাতটা দশের ব্যাণ্ডেল লোকালে। চোখ বুজে মাথাটা কালির পটে ঠেকিয়ে সযত্নে জামা খুলতে খুলতে ডাকলেন,…কৈ রে গেলি কোথায়? ধীরে ধীরে জামাটি খুলে আলনায় টাঙিয়ে দিলেন। এখনও পুরা সপ্তাহটা চালাতে হবে, সবেমাত্র পাট ভেঙ্গেছেন। ফতুয়ার পকেট থেকে বিঁড়ির বাক্সটা বের করে বিঁড়ির মুখে ফুঁ দিয়ে ধরাতে গেলেন সেটা। রান্নাঘরে উনুনের পাশে গিয়ে বললেন—আগুন তুলে দাও'গো একটু।

রন্ধনরত কামিনী চোখ ফেরাল না। ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে টিপে দেখছিল র‍্যাশনের চাল কতদূরে আর। খুকীর ফুড এনেছো? জিজ্ঞেস করল হঠাৎ।

—এনেছি গো এনেছি, আরও একটা জিনিষ এনেছি। মিঠে হেসে বললেন ঈশানবাবু। সাঁড়াশী দিয়ে কয়লার টুকরো একটা তুলে ধরল' কামিনী। বিঁড়িটি ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে উবু হয়ে বসলেন এক-পাশে।—কি এনেছো বলবার নাম নেই বিঁড়ির ধোঁয়া খাওয়াতে বসলে! শংকার ইজের এনেছো? ছোঁড়াটা ন্যাংটো হয়ে থাকবে এবার।

ঈশানবাবু স্বগত করলেন কিছুক্ষণ পরে,—বলব' তবে কি এনেছি?

—দেখ' একবার? বলবে নাত' ঢঙ দেখাতে বসলে? কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কামিনীর মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল।

এদিক ওদিক চেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করলেন, ঈশানবাবু—সে এখন দেখবার নয়, ঘরে গিয়ে দেখাব'। মাইরী চমৎকার মানাবে তোমায়, হলপ করে বলতে পারি আমি।

মুখখানা ঘুরিয়ে নিল কামিনী। মুখে তার মৃদুহাসির হঠাৎ-ছিটে। উঠে পড়লেন ঈশানবাবু।

বিমলা ব্যগ্র হয়ে ঘোরাফেরা করে। হাতে তার একখানা স্বরলিপির বই। তার 'উদয়ের পথের গান একখানা।—চাঁদেরও হাসি বাঁধ ভে—ঙ্গে—চে। গুণ গুণ করে গাইছে সে, ঘোরাফেরা করছে এঘরে ওঘরে। রাস্তার দিকের জানালায় এসে দাঁড়াচ্ছে মধ্যে মধ্যে। পদশব্দ শুনলেই বুকটা কেমন করে উঠে যেন। 'শঙ্কর' বলে ডেকে ফেলে একেকবার। ধীর চাপা কণ্ঠস্বর।

শঙ্করকে পাঠিয়েছে সে বন্ধু তুষারকণার—বাড়ী। বই আনতে পাঠিয়েছে। তুষারের দাদা চাচ্ছু যদি বই:দের একখানা। একটি পাতায় লিখে দেয় যদি দু'চার লাইন। বহুদিন চিঠি পায়নি বিমলা। আজ আসব' কাল আসব' বলে আসেওনি অনেকদিন। অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে ভাইকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে তাই।

শঙ্কর ফিরে আসে বই নিয়ে। কলতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল' বিমলা,—হ্যাঁরে কি বললেন?

—একশো তিন। সব লেখা আছে তাতে। আজকে বোধহয় আস-বেন চাচ্ছুদা। ক্লাবের ফের্তা ঘুরে যাবেন বলেছেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল' শঙ্কর। ছুটে এসেছে, হাঁফাচ্ছে তাই।

আঁচল খুলে একটা আনি ভায়ের হাতে গুঁজে দেয় বিমলা। সহাস্তে বলে—ঘুঘুনী কিনে খাবি, কাউকেও বলিসনি যেন। লক্ষ্মী ছেলে শঙ্কর।

শেষ কথাগুলো প্রাণ-খোলা নয়। বুঝতে পারে শঙ্কর। মনে পড়ে যায় তার—আজই দুপুরে পুকুর পাড়ের ব্যাপার। সেও এই বই-সংক্রান্ত। আচমকা কেড়ে নিয়েছিল পেছন থেকে। মার খেয়েছিল সেইজন্ত। দু'জনে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। একজন ঘুঘনীর; অন্তজন মনের মানুষ আসছে বলে।

* * *

রাত্রি গভীর হয়।

সকলের খাওয়া শেষ হলে নিজে খেতে বসে কামিনী। আহারান্তে এঁটো থালাটা উঠোনে নামিয়ে দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। তারপর মুখে পান আর দোকতা পুরে দরজায় খিল দেয়। ঈশানবাবু বিঁড়িতে শেষ টান দিয়ে উঠে বসেন বিছানায়। একেবারে নিজের শয্যায়। একথা সেকথার পর বালিশের তলা থেকে বের করলেন বেগুনীরঙের কাগজের পুরিয়া একটা—নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন কামিনীকে। অপেল পাথরের টাব। দু'কানে পরিয়ে দিলেন। মধ্যে মধ্যে মন পাওয়ার জন্ত এ-ধরণের উপহার কামিনীকে দিতে হয় একেকটা। মায়ের হুকুম এগারোটা না বাজলে উঠতে পাবে না বই ছেড়ে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে শ্যামচন্দ্র পড়ে। সম্রাট চণ্ডাশোকের রাজ্যশাসন, ধর্মপ্রচারের রীতি।

পুকুরপাড়ের জানালায় দাঁড়িয়ে বিমলা গল্প করে চাচুর সঙ্গে। ফিস ফিস শব্দে কথা বলে। বহুদিনের জমানো কথা। মায়ের ঘরের দরজায় খিল পড়ার শব্দ শুনে কমলা উঠে পড়ে বিছানা থেকে। ভায়ের কাছে এসে বলে—শ্যাম, শুবি আয়। খিল বন্ধ করেছে মা।

গভীরতম রাত্রি। পৃথিবীর বাতাস গুমোট বেঁধেছে যেন। গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না। বিছানাটা ভিজে যায় কামিনীর। ছটফট করে গরমে। ঈশানবাবুকে বসে বসে হাওয়া করতে হয়। ভাঙ্গা হাত পাখাটার শব্দ হয় খড় খড় করে। ঈশানবাবু বলেন,—উঃফ্, বাড়ী বটে একটা! তেমনি তার ছেলেপিলে!

—কেন, কি হল? জিজ্ঞেস করল' কামিনী।

—এই সকালে পাখাটা গোটা দেখে গেছ্লুম। এরই মধ্যে ভেঙ্গেছে? সক্রোধে বললেন ঈশানবাবু। চুপ করে রইল কামিনী। পাখা ভাঙ্গার ইতিহাস জানা আছে যে তার। লেখা আছে শ্যামচন্দ্রের দেহে—পায়ে, হাতে ও পাছায়।

মধ্যরাত্রেও নীরবতা ভঙ্গ হয় বাড়ীটির। বাড়ীর বেড়ালটা উঠোনের এঁটো থালাগুলো চেটে রান্নাঘরের দিকে এগোয়। সে-গুড়ে বালি। জানালা বন্ধ করে চাবি দেওয়া ঘরে। চাবি আছে কামিনীর কাছে। মাথার বালিসের তলায়। বেড়ালটা নেমে আসে উঠোনে, এঁটো বাসনের স্তূপ। গোঁফ চাটাই সার হয় তার। পিঁপড়ে কেঁদে যায় সেখানে।

ভিখারী

শ্রীরামেন্দু দত্ত

বিকার-বিহীন ভোলানাথ সম
ভিখারী চলিয়া যায়!
মোর দ্বার হ'তে গিয়া থামে মোর
"পড়শীর" দরজায়।
মোর ছোট মেয়ে দু'মুঠো "আঁকড়ী"
চাল দিতে গিয়ে বলে :-
"বাবা, কি কাইন্ আতপ রয়েছে
ওর থলিটার তলে!"
মনে মনে ভাবি, ধনী বণিকের
দ্বার হ'তে ও যে এসে
আমার মতন দিন—মজুরের
দুয়ারে দাঁড়ালো শেষে—
ওর তাহে কোনো নাহি ভ্রূক্ষেপ
কেবা কোন্ চাল দিল—
মুঠি মুঠি তণ্ডুলে ওর
ঝুলিটি ভরিয়া নিল!
এক দ্বার হ'তে আন্ দ্বারে যায়,
লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে—
জীবনের শেষ প্রান্তে এসেছে,
আসেনি শেষের ঘাটে!
উদাস বিভোল "বোম্-ভোলানাথে"
উহার মাঝারে দেখি;
ধূলায় ধূসর নন্দ-কিশোর-ও
সাথে ফিরিতেছে, এ কি!

* * * * *

কবে আমরাও হ'ব অবিকার ওই ভিখারীর মত,
হাসিমুখে ল'ব ঝুলিতে ভরিয়া ভালো ও মন্দ যত!
দ্বন্দ্ব র'বে না মন্দ—ভালোর, অন্ধকারে ও আলোর,
যতই দ্বন্দ্ব থাকুক্ লাগিয়া সাদায় এবং কালোয়!
"কণ্ট্রোল্-সপ"-এ বণ্টন করে যখন যেমনই চাল,
সিদ্ধ হউক্, বদ্ধ হউক্, বুট্ কি ড়াহের ডাল,
হোক্ না কালোর মুখোস লাগানো পথের বিজলী বাতি
জ্যো'স্না—নিশীথে "সাইরেন্" শুনে অথবা কাঁপুক ছাতি,
আমাদের কবে কিবা—আসে—যাবে ওই ভিখারীর মত
প্রভু ভগবান্ কর বরদান সেইটুকু অন্ততঃ!

রক্তহীনতার দেশীয় চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

মানুষ ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ক্ষীণজীবী হইতেছে, যৌবনেই বার্দ্ধক্যের সকল রেখা তাহার মধ্যে দেখা দিতেছে, কর্ম্মশক্তি দিন দিনই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ফলে মানুষের স্বাভাবিক যে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা তাহার হ্রাস হইতেছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই ইহার কারণ। আগেকার লোক যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল তাহার কারণ তখন লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পাইত এবং যাহা খাইত তাহার মধ্যে দেহ ও মনের পুষ্টিবর্দ্ধক সামগ্রী থাকিত ও তাহা ভেজালশূন্য ছিল। আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। এখন যাহা খাওয়া যায় তাহা ভেজালে পূর্ণ এবং সকল দ্রব্যই অখাদ্য বা কুখাদ্য। ফলে একটা কোন অসুখ হইলেই দেহ একেবারে ভাজিয়া পড়ে, কর্ম্ম করিবার শক্তি লোপ পায়। সাধারণত দেখা যায় যে কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে পর বা কোন শক্ত অসুখের পর দেহ ফ্যাকাশে হইয়া যায় অর্থাৎ শরীরে রক্তহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগেরও দেখা যায় একটা সন্তানের জননী হইলেই দেহের স্বাভাবিক লাবণ্যের পরিবর্ত্তে শরীর ফ্যাকাসে হইয়া যায়। শরীরের রক্তহীনতার জন্য অনেকে অনেক প্রকার ঔষধ ও পথ্য খাইয়া থাকেন। কিন্তু দেশের যেরূপ আর্থিক অন্ন-চিন্তা-চমৎকারা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সকলের পক্ষে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নহে।

আমাদের দেশে এমন বহু তরুগুল্ম-লতাপাতা রহিয়াছে যাহার গুণাগুণ জানা থাকিলে বহু রোগের চিকিৎসা অনেকে নিজেরাই করিয়া রোগমুক্ত হইতে পারেন। আজ যে গাছটীর কথা বলিব এই গাছটী রক্তহীনতার অমোঘ ঔষধ বলা যাইতে পারে। এই গাছটীর নাম "কুলেখাড়া'। সংস্কৃতে ইহাকে কোকিলাক্ষ বলে। ল্যাটিন নাম **Ruellia Longifolia.** এই গাছটী আমাদের দেশের জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার পাতাগুলি বৃন্তহীন, লম্বা, সরু ও শাখার গ্রন্থি হইতে জোড়া জোড়া বাহির হইয়াছে এবং গ্রন্থি সংলগ্নে কাঁটা আছে। ইহার ফুল নীলবর্ণের, কখনও কখনও গোলাপী বর্ণের হয়। বীজ ক্ষুদ্র রক্তাভ, মুখে রাখিলে পিচ্ছিল ও চট্‌চটে লাগে। ইহার বীজকে হিন্দীতে তাল-মাখানা বলে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কুলেখাড়ার বহু রোগনাশিনী শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। যেমন অশ্মরী রোগে, বাতরক্তে, শোথে, অনিদ্রা ইত্যাদিতে বহু প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু রক্তহীনতায় ইহার গুণের কথায় তেমন কিছু উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে রক্তহীনতায় এই গাছটী প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। সাধারণের উপকারে আসিতে পারে বলিয়া আজ এই গাছটীর কথা এইখানে উল্লেখ করিতেছি।

যকৃত বিকৃতি ও বিবৃদ্ধিতে কুলেখাড়ার পাতার রস খাইতে দিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৫ দিন সেবনের পরেই যকৃতের বিকৃতি ও বিবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। মদ্যপানের পর যকৃতের বিকৃতি ঘটিয়াছে, এমন স্থলেও ইহা প্রয়োগ করিয়া সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দিলে কুলেখাড়া পাতার রস সকালে ও বিকালে খাইলে এক সপ্তাহেই শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা দেখা যায় ও একমাস সেবনেই রক্তহীনতা দূরীভূত হয়—ইহা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। প্রসূতিকে নিয়মিত একমাস কাল কুলেখাড়ার পাতার রস সকালে ও বিকালে খাইতে দিলে দেহের লাবণ্য বর্দ্ধিত হয় ও নূতন রক্ত দেখা দেয়। শোথ রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী।

বহুদিন কোন শক্ত রোগ ভোগের পর কুলেখাড়া পাতার রস সকালে ও বিকালে কিছুদিন সেবন করিলে পর রক্তহীনতা লোপ পায় এবং দেহ ও মনে কর্ম্ম করিবার শক্তি দেখা দেয়।

সাধারণতঃ কুলেখাড়া পাতার রসের মাত্রা—২ তোলা। অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে পর বা কোন কঠিন রোগে ভুগিলে পর নবায়স লৌহ বা নবায়স মণ্ডুর অথবা মকরধ্বজের সহিত কুলেখাড়া পাতার রস ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে অতি সত্বর উপকার দেখা যায়।

ইহার পাতা খাইতে কোনরূপ বিকট আস্বাদ লাগে না। অন্যান্য শাকের ন্যায় ইহার পাতা শাকের মত ভাজিয়া বা ঝোল করিয়া খাওয়া চলে। রক্তহীনতার রোগীরা ইহার পাতা অনায়াসেই শাকের মত রান্না করিয়া খাইলে আহার ও ঔষধ দুইয়ের কাজ করিবে। কুলেখাড়া ব্যবহার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ইহাতে সত্বর শরীরে নূতন রক্তকণিকা দেখা দেয়, দাস্ত ও মূত্র বেশ স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকে, যকৃতের দোষ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়—শরীরে বল পাওয়া যায়, যাহার ফলে নূতন কর্ম্ম করিবার শক্তির প্রেরণা পাওয়া যায় এবং রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মে। ইহা শিশু, বৃদ্ধ, যুবা সকলকেই খাওয়ান চলে।

হাস্নুহানা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা

হাস্নুহানা, হাসি-কান্না, উঠ্‌লো ফুটে মন-বিতানে
সান্ধ্য বাসে, হুস্নু হাসে, ব্যথার সুরে প্রভাত পানে।
দরদী সে হাস্নুবানা, গন্ধ বিলায় সাঁঝ-পিয়ারে
বিহান বেলায়, কা'র সে হেলায়, পড়্‌লো ঝরে নিজেই হা রে!

মন-গহিনে এমি হাসি, খেয়াল-খেলা সাজ ক'রে,
বিরহী রবের একতারাতে, সুর ধরে যে আঁখি ঝরে!
অশ্রুমুখী—হাসির ছিটি, ফুরায় হাসি অশ্রু-কণা।
মন-সেতারে, রিমি ঝিমি, হাস্নুহানা—হাস্নুহানা!

দুনিয়ার-অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

উডহেড কমিশনের রিপোর্ট

কাগজে-কলমে বাংলার সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এই ১৯৪৫ সালের জুন মাসেও ১৯৪৩ সালের ক্ষুধাতুর বাংলার মর্ম্মভেদী হাহাকারের মূর্চ্ছনা একেবারে শেষ হয় নাই। দুর্ভিক্ষ শুধু লক্ষ লক্ষ অসহায় হতভাগ্য নরনারীর জীবন দক্ষিণা লইয়াই খুসী হয় নাই, তাহার পিছনে আসিয়াছে দেশব্যাপী ব্যাধি, আর প্রচণ্ড সমাজ বিপ্লব। স্বাস্থ্যের হীনতা বা আর্থিক নিঃস্বতাই বাংলাকে দুর্ভিক্ষের একমাত্র দান নয়, এই সুতীব্র অন্নাভাব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে বাংলার হাজার বছরের সমাজ-শৃঙ্খলা ; ক্ষুধাতুর নরনারী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে পথে, একমুঠো ভাতের বিনিময়ে নারী বিক্রয় করিয়াছে তাহার সম্ভ্রম,তাহার সর্ব্বস্ব ; পুরুষ বরণ করিয়া লইয়াছে চরম আত্ম-অসম্মান, ভুলিয়া গিয়াছে তাহার মনুষ্যত্ব। দীনতার লাঞ্ছনায় শুভ্রসুন্দর জীবনের পটভূমিকায় গড়িয়া উঠিয়াছে হীনতার অভ্রভেদী কলঙ্ক সৌধ।

অসংখ্য লোকক্ষয়কারী এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের পশ্চাতে যে বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ছিল না একথা প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রকৃত ঘটনার সহিত পরিচিত সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহ ছাড়াও শ্বেতস্বার্থপোষক ষ্টেটসম্যানের মত কাগজ পর্য্যন্ত এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ বিশ্লেষণ সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে বলিয়াছেন, **"As we have often observed, India has been lucky that her man-made famine has so far remained uncomplicated by any failure of the monsoon"*** অবশ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে যে ঘূর্ণিবাত্যা সংঘটিত হয়, তাহার ফলে ধান্যাদি শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিপুল বিপর্য্যয়ের তুলনায় তাহা এত নগণ্য যে এই ঘূর্ণিবাত্যাকে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণগুলির অন্যতম ধরা যায় না। বলিতে গেলে যুদ্ধকালীন পণ্যাদি সরবরাহের অব্যবস্থা ও ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের লজ্জাস্কর-অকর্ম্মণ্যতাই এই সর্ব্বনাশের মূল কারণ। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বার্ত্তা-সমূহ নানাভাবে দেশে দেশে প্রচারিত হইবার ফলে এদেশের শাসক-সম্প্রদায়ের অবিমৃষ্যকারিতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দও শেষ অবধি কতকটা সচেতন হন এবং বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের চাপে বাংলায় এই দুর্ভিক্ষের কারণ ও আনুসঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি চালাইবার জন্য ভারতসরকার একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। এই কমিশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার জন উডহেড এবং তাঁহার নামানুসারেই কমিশনের নাম হইয়াছে উডহেড কমিশন। উডহেড কমিশনের সদস্যরূপে স্যার জনকে সাহায্য করেন মিষ্টার রামমূর্ত্তি, মিষ্টার আফজল হোসেন, ডাক্তার মণিলাল নানাভাতি এবং ডাক্তার এ্যাক্রয়েড। কমিশন দুর্ভিক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট ও পরিচিত বহু ব্যক্তির সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করেন এবং এই সম্পর্কে অনেক পুঁথিপত্র পাঠ করেন।

সম্প্রতি এই দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে দুর্ভিক্ষের কারণাদি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাতে কোথাও কোথাও সদস্যগণের চিন্তাশীলতা ও সত্যানুবর্ত্তিতার পরিচয় থাকিলেও মোটের উপর দুর্ভিক্ষের পরিণাম হিসাবে যে সকল ক্ষতির কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উডহেড কমিশন বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষে নাকি মোটের উপর ১৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং উহার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দশ লক্ষ মরিয়াছে ১৯৪৩ সালের প্রকৃত দুর্ভিক্ষে এবং ৫ লক্ষ লোক মরিয়াছে ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারী ও স্বাস্থ্যহীনতার চাপে। সকলকেই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ দুর্ভিক্ষের কারণাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইয়াছেন এবং তাঁহাদের রিপোর্টে দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা দেখানো হইয়াছে প্রায় ৩৫ লক্ষ। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মতামতের ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব আছে বলিয়া প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা কথা বলেন। দুর্ভিক্ষের মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত গ্রহণ-যোগ্য সন্দেহ নাই। কলিকাতার মত সমৃদ্ধ সহরে, যেখানে অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আর সরকারী শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, যেখানে চাকুরীজীবী আর ব্যবসায়ীদের ভিড়, ভারতের যে বৃহত্তম সহরে প্রাসাদপুঞ্জের বৈদ্যুতিক আলোর ধারায় সঙ্গে দরিদ্রের প্রাণ বাঁচিবার মত উদ্বৃত্ত খাদ্য স্বভাবতঃই পথে নামিয়া আসিয়াছে, সেখানে নিরন্ন নর-নারীর যে মৃত্যুমিছিল চলিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসারের বিবৃতিতেই দেখা যায়, সাধারণ সময়ের সাপ্তাহিক ছয় শতের কম মৃত্যুর স্থানে দুর্ভিক্ষের সময় কয়েকটী সপ্তাহে নিম্নোক্ত সংখ্যক নরনারী:কলিকাতার রাজপথে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে :—

সপ্তাহ	শেষের তারিখ		মৃত্যু সংখ্যা
১১ই	সেপ্টেম্বর,	১৯৪৩	১২৯২
১৮ই	সেপ্টেম্বর,	১৯৪৩	১৩১৯
২৫শে	সেপ্টেম্বর,	১৯৪৩	১৪৯২
২ রা	অক্টোবর,	১৯৪৩	১৬৩৬
৯ই	অক্টোবর,	১৯৪৩	১৯৬৭
১৬ই	অক্টোবর,	১৯৪৩	২১৫৪
২৩শে	অক্টোবর,	১৯৪৩	২১৫৫

* ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

ভারতসচিব মিষ্টার আমেরি তাঁহার ইস্তাহারে পার্লামেণ্টে বাংলার দুর্ভিক্ষে মৃতের যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, উডহেড কমিশনের রিপোর্টের এই সংখ্যাও অনেকটা তাহার সহিত এবং বাংলাসরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। মিষ্টার আমেরি বলিয়াছিলেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষে মারা গিয়াছে মোট ৬ লক্ষ ১৪ হাজার লোক এবং জনস্বাস্থ্যবিভাগ বলিয়াছিলেন ১৯৪৩ সালে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ও ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ৪ লক্ষ ২২ হাজার,অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ১১ লক্ষ এবং ১৯৪৪ সালের বাকী ছয়মাসের সংখ্যা এই অনুপাতে হিসাব করিলে তাঁহাদের সংখ্যাও প্রায় ১৫ লক্ষেই গিয়া পৌঁছায়। প্রকৃত নিরন্ন-মৃত্যু সংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯৪৩ সালের ১৪ই অক্টোবর ভারতসচিব পার্লামেণ্টে সমগ্র বাংলাপ্রদেশের এই ভাবে মৃত্যুর যে সাপ্তাহিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন, প্রকৃতপক্ষে ১৬ই অক্টোবরে সমাপ্ত সপ্তাহে একমাত্র কলিকাতায় নিরন্ন মৃত্যু সংখ্যা তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। এই দুর্ভিক্ষের পরই বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ও কলেরার কবলে নিপতিত হইয়াছিল। একমাত্র ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয় বাংলার প্রায় ২ কোটি নরনারী এবং স্বাস্থ্যহীনতার জন্য এই সকল রোগে যে লক্ষ লক্ষ নিরুপায় হতভাগ্য মৃত্যুবরণে বাধ্য হয় তাহাদের জীবনদানও দুর্ভিক্ষের অনিবার্য্য মাশুলরূপে হিসাব করা উচিত।

আগেই বলা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের পরিণাম সম্বন্ধে সঠিক সাংবাদাদি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও উডহেড কমিশন দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় চাহিদা বৃদ্ধির সহিত পণ্যযোগানের অসামঞ্জস্য ঘটা স্বাভাবিক এবং বাংলাদেশেও ১৯৪৩ সালের প্রথম হইতেই খাদ্য কম পড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলার যে খাদ্য কম পড়ে তাহা এই প্রদেশবাসীর তিন সপ্তাহের উপযোগী। অসাধু ব্যবসাদারদের কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার যদি স্বল্প পরিমাণ খাদ্য সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে খাদ্যাভাব হয়তো ঘটিত, কিন্তু ৩০।৩৫ লক্ষ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ ঘটিবার কারণ থাকিত না। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসা বন্ধ, মেদিনীপুরের ঝড়ে ১৯৪২ সালের শস্যউৎপাদন ব্যাহত, ব্রহ্মপ্রত্যাগত ও সামরিক বিভাগের চাহিদাবৃদ্ধি—সবই সত্য কথা, কিন্তু এইজন্য আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইলে দেশবাসীকে মরিতে যে হইত না ইহা সবার চেয়ে বড় সত্য। উডহেড কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯৪৩ সালের প্রথম হইতেই বাংলার বিভিন্ন জেলার সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাগণ জেলার খাদ্যাভাব সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাংলাসরকার বা ভারতসরকার তাঁহাদের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া এই প্রদেশের চরম দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজনীতির সহিত সকল সম্পর্কশূন্য এই দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টির কলঙ্কে শাসনযন্ত্রকে কলঙ্কিত হইতে দেখিয়া কলিকাতায় ষ্টেটসম্যান পত্রিকা বারবার ভারতসরকার ও বাংলাসরকারকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিতে সচেষ্ট হন। কলিকাতায় তখন দুঃস্থদের ভিড় শুরু হইয়াছে, ৪ঠা আগষ্টের "State of a City শিরোনামায় তাঁহারা বলেন—Already Calcutta for a variety of reasons has been reduced this summer to a Parlous plight. Misfortunes of nature are added to conspicuous administrative inefficiency—and the later has not been confined only to her scandalowsly incompetent corporation. Her ministers and permanent officials are also blameworthy for multifarious forms of inaptitude, as well as the government of India, whose lack of foresight and bewildering shifts of policy over the food problem have heavily contributed to the present ills."...এবং ইহার চেয়ে তীব্রভাবে তাঁহারা আর চারদিন পরে অর্থাৎ ৮ই আগষ্ট—বাংলার দুর্গতি সম্পর্কে ভারতসরকারের নিরুৎসাহজনক মনোভাবকে আক্রমণ করিয়া "Plight of a province প্রবন্ধে বলেন—The condition of Bengal is now conspicuously bad as to call for heroic remedies. New Delhi must, bessir itself, must think less on terms of N. W. India's easier condition and take due cognizance of bitter realities in the war-threatened eastern areas, where what may fairly now be called famine prevails.

শুধু এদেশে নয় বাংলার শোচনীয় খাদ্যাবস্থার সংবাদ বিদেশে এমন কি বিলাতে বহুপূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিল। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে 'টাইমস' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং তাহার প্রথমেই লিখিত হয়—"The Government of India is embarking on a policy which will prodnce a famine and cost many thousands of lives, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব সতর্কবাণী সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় নাই এবং দুর্ভিক্ষ কমিশনও দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে কর্ত্তৃপক্ষ সত্যকার দুর্ভিক্ষ শুরু হইবার দীর্ঘকাল পরে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশে খাদ্য কম পড়িয়াছিল মাত্র তিন সপ্তাহের, সরকারী পরিচালনানীতি বা বণ্টন ব্যবস্থা ভাল হইলে তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা এখন যাহা বলিতেছেন, দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ভারতে আসিয়া বিশ্বভ্রমণকারী মার্কিন সেনেটর দলের অন্যতম রাফল ব্রুষ্টার সেই কথা বলিয়াছিলেন। ব্রুষ্টারও বলেন যে, ব্রহ্মের চাউল যদি শতকরা ১০ ভাগও হয়, তাহা হইলে ১০ ভাগ চাউল না থাকার জন্য একজন লোকের মৃত্যুরও কোন যুক্তি থাকতে পারে না ; কিন্তু বলিতে গেলে অযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের দুর্নীতির জন্যই আতঙ্কগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও স্বচ্ছল জনসাধারণ বাজারের খাদ্যশস্য ঘরে তুলিয়া স্বল্প পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বাজার হইতে অদৃশ্য করিয়া দিয়াছিল। সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা ও অস্থিরমতিত্ব, দায়িত্বশীল

ব্যক্তিদের সাবধান বাণী, জনসাধারণের আতঙ্ক প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া এই দুর্দ্দিনে ব্যবসাদারগণ নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করিবার দিকে অমানুষিক লোভ দেখাইয়াছেন এবং ফলে কালাবাজারের দৌরাত্ম্যে খাত্তাদি খোলা বাজার হইতে উপিয়া গিয়া গোপনে যে মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, তাহা স্পর্শ করা দুঃস্থ জনগণের সাধ্যাতীত হইয়াছিল বলিয়া নিরন্ন নরনারীর সম্বল হইয়াছিল ভিক্ষা এবং যখন ভিক্ষাও জুটিল না, তখন নিরুপায় মৃত্যুবরণ। দুর্ভিক্ষ কমিশন মৃতের সংখ্যায় সম্ভবতঃ ভুল করিয়াছেন, কিন্তু ভুল করিয়াও অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এইভাবে মৃত ১৫ লক্ষ লোকের জীবনের বিনিময়ে দুর্ভিক্ষকালীন ব্যবসায়ীবৃন্দ লাভ করিয়াছে প্রায় দেড়শত কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি নরবলি দিয়া তাহারা হিসাবে এক হাজার টাকা পকেটস্থ করিয়াছেন। সরকার তাঁহাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য দ্বারা সমস্ত ভালমন্দই চোখ বুঁজিয়া অস্বীকার করিয়া যাইতেছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর করিতে এত বিলম্ব করিয়াছিলেন যাহাতে অনেকের মনে হইয়াছিল যে এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁহাদের হয়তো কোন উদ্দেশ্য আছে। যদিও শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়া তাঁহারা দুর্ভিক্ষ বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি প্রথম দিকে তাঁহাদের নিদারুণ অকর্ম্মণ্যতার জন্যই অবস্থা প্রতীকারের অতীত হইয়া পড়ে। দুর্ভিক্ষ প্রকাশ হইবার পরও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এমন এক লজ্জাকর ব্যাপার ঘটে যাহার সহিত বাংলা সরকারের সম্পর্ক না থাকিলেও তাঁহাদের সংযোগ অনুমান করিয়া বহুলোক ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরিষদের জনৈক জাতীয়তাবাদী সদস্য দেশবাসীর অসহায়তার কথা উল্লেখ করিয়া সরকারী সাহায্যের দাবী জানাইলে ইউরোপীয় দলের একজন সদস্য অতি অভদ্রভাবে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—তোমাদের বন্ধু তোজোর কাছে যাও। ১৯৪২ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার পর হইতে ভারতবাসীর জাপানী-প্রীতি সম্বন্ধে মিথ্যা অনেক কিছু অনুমান করিয়া সরকার এদেশের নেতৃবৃন্দকে ও জনসাধারণকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন; সেই জাপানী-প্রীতির নজীর দেখাইয়া এই শ্বেতাঙ্গ সদস্য বিদ্রূপ করিলে অনেকের মনে হয়—বুঝি এদেশের লোকের জাপানীদের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সরকার তাহাদের দুঃখের দিনে সাহায্য করিতে উৎসাহ দেখাইতেছেন না। অবশ্য এই শ্বেতাঙ্গপ্রবরের উক্তি কোনক্রমেই শ্বেতাঙ্গজাতির উক্তি নয় এবং বাংলা সরকারের স্কন্ধেও ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ার জন্য এত বড় কলঙ্ক চাপান সমীচীন নয়। সুখের কথা, ১৯৪৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রিকায় ষ্টেটসম্যান সম্পাদক এই দুর্ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং একজন শ্বেতাঙ্গের ব্যক্তিগত কটুক্তির জন্য সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত না করিবার আবেদন জানান। তিনি বলেন—"A member of the European group in Bengal Assembly did interrupt an Indian member of the House in a recent debate with the words "Go to Tojo, your pal." The interrupter was as distressed as any member of it at the discourtesy, nor it is right or accurate to imply that Europeans as a class, or olive street Europeans are indifferent to the terrible sufferings they see."

সরকার বাংলায় ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ধান চাষের জমি কমিয়া যায় এবং ফলে শস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। এইভাবে প্রায় ৯ লক্ষ একর ধানচাষের জমি পাট চাষের জমিতে রূপান্তরিত করিবার যে ব্যবসায়িক যুক্তিই থাক, ব্রহ্মদেশ হাতছাড়া হইয়া যাইবার পর এইভাবে ধান্যউৎপাদন কমাইবার ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের অযোগ্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অন্যদিক হইতে তৎকালীন গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট যত ভাল কাজই করিয়া থাকুন, দুর্ভিক্ষের মূলে যে তাঁহার বিচারবোধ এবং চিন্তাশীলতার অভাব ঘটিয়াছিল একথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ যখন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তখন খাদ্যদ্রব্য চলাচলের উপর খেয়াল ও খুসীমত বিধিনিষেধ আরোপ এবং প্রত্যাহার করিয়া তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ জনসাধারণকে কেবলমাত্র উদ্‌ভ্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছেন এবং সেই জন্যই বাজারের স্বল্পপরিমাণ খাদ্যশস্য বাজার হইতে বণিক ও ধনিকের ঘরে কার্য্যতঃ পচিবার জন্য গুদামজাত হইয়া অসংখ্য বিত্তহীন নরনারীর অনশনে মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার উপর অন্তর্দ্দেশীয় মুদ্রাস্ফীতিও দুর্ভিক্ষের সম্প্রসারণে নিঃসন্দেহে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি দুর্ভিক্ষের মূল কারণের সহিত সংযুক্ত করিতে দুর্ভিক্ষ কমিশন ইতস্ততঃ করিয়াছেন এবং ফলে তাহাদের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বাংলার এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এবং বাংলার গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট যে অস্থিরমতিত্ব এবং ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন এবং সময় ও সুবিধা থাকিতেও উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইতে বাংলায় খাদ্যশস্য আনিয়া অথবা বাংলাকে অতিথি অভ্যাগতদের ভরণপোষণের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিতে লজ্জাকর কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৮৭৩—৭৪ সালে বাংলায় সত্যকার বড় একটি দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়, কিন্তু তৎকালীন গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্প্ল অসীম সহানুভূতির সহিত খাদ্যনীতি পরিচালনা করিয়া সেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করেন এবং ইহাতে বলিতে গেলে কোন লোককেই অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে হয় নাই। দুর্ভিক্ষ কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যদি সার রিচার্ড টেম্প্ল বা লর্ড নর্থব্রুকের সহিত সার জন হার্বার্ট ও লর্ড লিনলিথগোর কঠোর তুলনামূলক সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে আমরা সত্যই আনন্দিত হইতাম। মোটের উপর সমগ্র দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টটিতে সরকারী ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ এড়াইয়া যাইবার যে চেষ্টা আছে তাহা যে কোন অবধানী পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে। তাঁহারা ভারতসরকার বা বাংলাসরকারকে দুর্ভিক্ষের জন্য কতকটা দায়ী করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বেশীভাগ দায়িত্ব

কালাবাজারের আশ্রয় গ্রহণের উপর ; অথচ একথা সকলেই জানেন যে প্রবলপ্রতাপ সরকার বাহাদুরের নজর থাকিলে উৎপাদন বা শস্য যোগানের দিক হইতেও যেমন উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল তেমনি ব্যবসাদারদের চোরাবাজারী দৌরাত্ম্য বন্ধ হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। ভারতসরকার বা বাংলাসরকার—"ডিনায়েল পলিসি" প্রবর্ত্তন করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত বঙ্গবাসীর নিদারুণক্ষতি সাধন করিয়াছেন ; সুন্দরবন ও পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে এই নীতি অনুসারে নৌকাদি অপসারিত হওয়ায় মাছের ব্যবসা ও মৎস্যভোজনে ক্ষুন্নিবৃত্তির সুযোগ নষ্ট হইয়াছে ; ভারত হইতে ইরাক, ইরাণ, সিংহল প্রভৃতি দেশে খাদ্য রপ্তানী হইয়াছে অথচ বাংলার লোক দলে দলে মরিয়াছে অনাহারে। পাঞ্জাবের গম ১১ টাকা ৪ আনা দরে কিনিয়া সরকার বাংলায় সেই গম বেচিয়াছেন ১৭ টাকা মণ দরে এবং যে কল্যাণকর উদ্দেশ্যই তাঁহাদের থাক, মোটের উপর শেষ পর্য্যন্ত এইভাবে লাভের ব্যবসা চালাইয়া তাঁহারা জনসাধারণের দুর্গতি করিয়াছেন বৃদ্ধি, অথচ উডহেড কমিশনের রিপোর্টে এই সকল কার্য্যের তেমন কোন কঠোর সমালোচনা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ কমিশনের এই রিপোর্টটিতে সরকারের গুণকীর্ত্তনের অব্যাহত সুর ধ্বনিত হয় নাই সত্য এবং বলিতে গেলে সাহসের সহিত সরকারী কার্য্যের কিছু কিছু সমালোচনাও করা হইয়াছে; কিন্তু ৩০।৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য যাহাদের ভুয়ো সম্মানবোধ, অদূরদর্শিতা এবং অযোগ্যতা দায়ী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বনের উল্লেখযোগ্য কোন নির্দ্দেশ এই রিপোর্টে দেখিতে পাই নাই বলিয়া এবং দুর্ভিক্ষের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত না হওয়ায় অনেক তথ্যথাকা সত্ত্বেও আমরা এই রিপোর্টটিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

ভারতের সাম্প্রতিক বস্ত্রাভাব

মণিপুরের যুদ্ধের মাত্র কয়েক মাস ছাড়া প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সংঘাতে ভারতকে বেশিদিন বিপন্ন হইতে হয় নাই এবং আপাত-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিপজ্জনক এলাকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ হইলেও এই দেশের বেসামরিক অধিবাসীগণ আধুনিক সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ দক্ষিণা হইবার সৌভাগ্য হইতে ভাগ্যক্রমে রেহাই পাইয়াছে। কিন্তু ভারতের মধ্যে যুদ্ধ না চলিলেও বিগত ছয় বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষকে যুদ্ধের যে মাশুল যোগাইতে হইতেছে তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে এবং বর্ত্তমান মহাসমরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ চাপে ভারতের আর্থিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন দুর্দ্দশার শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই চাপ এমনি মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে যে, কৃষিজীবী ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কারী দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং শিল্পজীবনের দিক হইতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্থক নিদর্শন বস্ত্রশিল্প এদেশবাসীর সম্ভ্রমরক্ষার মোটামুটি কোন ব্যবস্থাও করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অন্ন ও বস্ত্র যদি প্রয়োজনমত পাওয়া যায়, অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিবিধ প্রয়োজনীয় পণ্যোৎপাদনের উৎসাহ তবু স্ফুরিতেই যদি সারাদিন যায় তাহা হইলে শিল্প সংগঠন সম্পর্কে মনের ইচ্ছা মনে থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কাপড়ের দিক হইতে ভারতবর্ষ অনেকটা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এবং মুষ্টিমেয় সহরবাসী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের বাদ দিলে এদেশের অধিকাংশ লোকই এখনও আধুনিক সুসভ্য জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে না। মোটের উপর ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যে বৎসর বিশেষ সামরিক প্রয়োজনে এক গজও বস্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই, সেই বৎসর ভারতের মিল ও তাঁতগুলিতে উৎপন্ন কাপড়েই এদেশের শতকরা ৯০ ভাগের বেশী অভাব মিটিয়াছিল। উক্ত বৎসর ভারতে কাপড়ের কলসমূহে ৪ শত কোটি গজ এবং তাঁতে দেড় শত কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং ৭০ কোটি গজ কাপড় জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হয়। এই ৬ শত ২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ২০ কোটি গজ কাপড় সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী নির্ভরশীল দেশে রপ্তানী করিয়া ভারতে উদ্বৃত্ত থাকে পুরো ৬ শত কোটি গজ এবং ইহাই কিঞ্চিদধিক ৩৭ কোটি নরনারীর লজ্জানিবারণ করে। পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহের তুলনায় অবশ্য এইভাবে কমবেশী মাথাপিছু ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে, কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলিয়া এবং বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের আমলে তাহার আর্থিক অবস্থা ক্রমে হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া এই সামান্য পরিমাণ কাপড়েই ভারতবাসীর মোটামুটি চলিয়া গিয়াছিল।

তারপর ১৯৩৯ সালের শেষদিকে যুদ্ধ বাঁধে এবং স্বভাবতঃ নিদ্রিত ভারত সরকার অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া ভারতের সামরিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ১৯৪১ সালের শেষে জাপান যুদ্ধে নামিলে এদেশের সমরায়োজন আরও আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠে এবং ক্রমে সামরিক স্বার্থ সাধারণ স্বার্থ অপেক্ষা অনেক উপরে স্থান পাইবার ফলে অন্যান্য নানা পণ্যসামগ্রীর মত বেসামরিক দেশবাসীর জন্য বস্ত্রের যোগানও ক্রমেই কমিতে থাকে। যুদ্ধকালে সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠায় আমদানী-রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইবার জন্যও ১৯৩৮-৩৯ সালের ৭০ কোটি গজ বস্ত্র আমদানী ১৯৪২-৪৩ সালে শূন্যে আসিয়া পৌঁছায়। এই বৎসর ভারতের বস্ত্র উৎপাদন যুদ্ধের আগেকার সমান হইলেও এই ৫ শত ৫০ কোটি গজ কাপড় দেশবাসীর অভাব মিটাইবার পক্ষে একান্ত অপ্রচুর হইয়া উঠে ; কারণ, ইহার মধ্যে ১ শত ১০ কোটি গজ বস্ত্র সামরিক বিভাগ গ্রহণ করেন এবং মধ্যপ্রাচ্য, (ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি দেশসমেত) ও সিংহলে ভারতকে পাঠাইতে হয় প্রায় ৭০ কোটি গজ কাপড়। এদিকে ভারতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মহার বেশী হওয়ায় এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধ কোটি লোক বৃদ্ধি হইতেছে। এই সব নানা কারণে ১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে ৬ শত কোটি গজ কাপড়ে ভারতবাসীর কায়ক্লেশে চলিয়াছিল, ১৯৪২-৪৩ সালে সেখানে ৩ শত ৭০ কোটি গজ কাপড়ে বর্দ্ধিত সংখ্যক ভারতবাসীর

যতই দিন গিয়াছে ভারতের বস্ত্রাভাব হ্রাস না পাইয়া ক্রমেই তত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

কাপড়ের দিক হইতে ভারতের দুরবস্থা যে বর্ত্তমানে চরমে উঠিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্ত্রের জোগান ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অবনতি ভারত সরকারকে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বস্ত্র বরাদ্দ করিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে এবং জোড়াতালি দেওয়া এই বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা সকল প্রদেশের পক্ষে স্যায়সঙ্গত হয় নাই বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে অধিকাংশ স্থান হইতেই প্রতিবাদ আসিয়াছে বিস্তর। ইহার উপর সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, বরাদ্দ ব্যবস্থানুযায়ী সরবরাহকৃত কাপড় যে চোরাবাজারের কোন অন্ধকার পথ দিয়া জনসাধারণের আয়ত্ত ও দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তাহা দেশবাসী অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না; দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার কথা ধরিলে দেখা যায় যে, বাংলায় নাকি মাথাপিছু ১০ গজ হিসাবে বস্ত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ইহার উপর মারাত্মক অভাব লক্ষ্য করিয়া অনুগ্রহ হিসাবে ভারতসরকার বাংলাকে আরও কিছু কাপড় প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা কেবলমাত্র আজ নয়, সুদীর্ঘদিন যাবৎ বাংলার খোলাবাজারে মিলের নির্দ্ধারিত মূল্যের কাপড় মোটেই পাওয়া যাইতেছে না এবং জনসাধারণকে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই সরকারী বরাদ্দ ও বণ্টনের ভুয়ো সমতাসাধনের বাকচাতুরী শুনিয়া ভবিষ্যতে প্রয়োজন মিটাইবার স্বপ্ন দেখিতে হইতেছে। কাপড় চালচিনির মত রেশনিং হইলে তবু কাপড় পাওয়া যাইবে এমনি একটি আশা বাংলার নরনারীকে কতকটা আশান্বিত করিতেছে সত্য, কিন্তু রেশনিং ব্যবস্থার আংশিকতা শেষ পর্য্যন্ত এই প্রদেশের সত্যকার অভাব নিরশনে কতখানি সক্ষম হইবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে এখনও কিছুই বলা যাইতেছে না। কাপড়ের মারাত্মক অনটন লোকের সম্ভ্রম এখনই যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিলে শুধু সম্মান নয় কাজকর্ম্ম নষ্ট হইয়া দেশে সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলারও যে সৃষ্টি হইতে পারে এমন ধারণাও আজকাল অনেকের মনেই জাগিয়াছে।

অথচ এই সুতীব্র সমস্যার সমাধান হইবে কি উপায়ে, তাহা এখনও কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইয়োরোপে যদিও যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, তথাপি সেখানকার শিল্পাদি পুনর্গঠিত হইয়া এদেশে কাপড় আমদানীর আশা এখনই করা যায় না; পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জাপানী যুদ্ধের অবস্থা যেরূপ তাহাতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিতে এখনও কিছু সময় লাগিবে বলিয়া কাপড়ের উপর হইতে সামরিক চাহিদা অবিলম্বে কমিবার বিশেষ ভরসা নাই; এ সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রকৃত সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি লইয়া বস্ত্রবরাদ্দ ও বস্ত্র-বণ্টনের ব্যবস্থা করেন এবং ভাল ব্যবহারের দ্বারা দেশবাসীর সহযোগিতা আদায় করিতে পারেন তবেই সমস্যার জটিলতা কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে! ভারতে বর্ত্তমানে কাপড়ের উৎপাদন নানা কারণে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং এখনও কয়লার অভাবে নানাস্থানে মিলগুলির কার্য্যপরিচালনায় যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিতেছে। বাংলার এই সুতীব্র বস্ত্রসঙ্কটের দিনেও সম্প্রতি কয়লার অভাবে ঢাকেশ্বরী ১নং ও ২নং কলসমেত বাংলার তিনটি কাপড়ের কলে কাজ বন্ধ ছিল। তাছাড়া গত জানুয়ারী মাস হইতে আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলির কার্য্যপরিচালনায় কয়লার অভাব একটি প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সামরিক বিভাগের ও চীন, সিংহল, জাপমুক্ত ব্রহ্ম প্রভৃতি নির্ভরশীল প্রতিবেশী দেশসমূহের চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে, এখন আমদানীর সম্ভাবনা যতই সুদূরপরাহত হইবে ততই আমাদের হতাশ হইবার কথা। এ সম্পর্কে যাহারা খোঁজ খবর রাখেন তাঁহারা এ পর্য্যন্ত আশার কথা শুনাইতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে ভারতের কাপড় উৎপাদন এখন সাড়ে পাঁচ শত কোটি গজ হইতে পাঁচ শত কোটি গজে নামিয়া আসিয়াছে এবং সামরিক প্রয়োজনে ও বিদেশে রপ্তানীতে কাপড় লাগিতেছে যথাক্রমে ১ শত কোটি গজ ও ৬০ কোটি গজ, অর্থাৎ বৎসরে বেসামরিক ভারতবাসীর ব্যবহারের জন্য মাত্র ৩ শত ২০ কোটি গজ আন্দাজ কাপড় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এখন ৪০ কোটির কিছু বেশী, ইহার মধ্যে বিদেশীর দল আছে, আশ্রয়প্রার্থী আছে, বনেদী ধনী সম্প্রদায় ও যুদ্ধের ফাঁপা বাজারে দুপয়সার মুখ দেখা স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গ আছেন; কাজেই কর্ত্তৃপক্ষের সুনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে মোটামুটি মাথাপিছু ৮ গজ হারের কাপড় কোটি কোটি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নরনারীর অভাব মিটাইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের আয়ত্তের মধ্যেই যে নামিয়া আসিবে না, ইহা তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা। কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনা নীতিতে শৈথিল্যের জন্য চাহিদা ও জোগানের প্রভূত অনামঞ্জস্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে চোরাবাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ, যুদ্ধের মাশুল যোগাইতে নিঃস্বতার রিক্তপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন অসংখ্য লোকের সম্ভ্রমমূল্যে তাহাদের তহবিল হইয়া উঠিতেছে ভারি, অথচ শাসন করিবার মালিক এদেশের সরকার সমস্ত চোখে দেখিয়াও কোন এক অজ্ঞাত স্বার্থে দেশবাসীর তীব্র প্রয়োজন উপেক্ষা করিতেছেন। গত বৎসর ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী সার হেনরি ফ্রেঞ্চ যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি এক প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রিটেনে বেসামরিক দেশবাসীকে রণাঙ্গনের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিভাগের সৈন্য (**Forces on the front line**) মনে করা হয় এবং তাহাদের উপর যুদ্ধরত সৈন্যদলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনমরণ নির্ভর করে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে নিষ্কৃতি দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অন্য বিষয়ে ভারতসরকার ব্রিটিশসরকারের আস্থাভাজন হইবার কঠোর সাধনায় নিয়োজিত থাকিলেও এই বিশেষ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নরূপ এবং এই পার্থক্যের চরম প্রমাণ তেরশো পঞ্চাশী মহামন্বন্তরের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুর নরনারীর নিরুপায় অপমৃত্যু ও ১৩৫১-৫২ সালের এই ঐতিহাসিক বস্ত্রসঙ্কট।

৪।৬।৪৫

সাময়িকী

নোবেল প্রাইজ—

১৯৪৫ সালে একজন চীনা রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ডাঃ চাউ-হাউ-ফু নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভের পর চীনে ফিরিয়া ১০ বৎসর পেকিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর মাত্র। ১৯৪৩ সালে তিনি পুনরায় বিলাত যান ও গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন চীনদেশীয় লোক নোবেল প্রাইজ পান নাই। বর্ত্তমানে ডাঃ ফু অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় একটি গ্রামে এক ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতেছেন। বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার সময় সম্পূর্ণ অর্থহীন অবস্থায় তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন ও বন্ধুগণের দান লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। গত বৎসর হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন পান না। একটিমাত্র ঘরে স্ত্রী ও ৬টি সন্তান লইয়া চুংকিং হইতে বহু দূরে তাঁহাকে এখন বাস করিতে হইতেছে। নোবেল প্রাইজের মূল্য ২০ হাজার মার্কিণ ডলার হওয়া উচিত—কিন্তু চীনের বর্ত্তমান বাট্টার দামে তিনি মাত্র ৭০০ মার্কিণ ডলার পাইবেন ও অতি কষ্টে এক বৎসর তাহাতে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। চীন দেশে বর্ত্তমানে যে দারুণ আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য তথায় সকলকেই কষ্ট পাইতে হইতেছে। অধ্যাপক ফু তাঁহার বেতনে বঞ্চিত হইয়াই এই কষ্টে পড়িয়াছেন।

পার্লামেন্টের সদস্যগণের পত্র—

মিঃ উইলিয়ম ডিবি, মিঃডি-এন-প্রিট, মিঃ জনহিন্ড প্রভৃতি বৃটীশ পার্লামেন্টের ১৫জন সদস্য প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নিকট এক পত্র লিখিয়া ভারতের দাবীর কথা জানাইয়াছেন—ঐ পত্রে বলা হইয়াছে, "কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ পর পর ১৩ বার পরাজিত হইয়াছে; ইহাতে দেখা যায় যে ভারতের জনগণ বৃটীশের বর্ত্তমান শাসন নীতির সমর্থন করেন না। অচিরেই তাহার পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির মত নেতাদের মুক্তিদান করা না হইলে ভারতে অপর কেহ নূতন শাসন নীতি প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিয়া কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর মত লোকের উপদেশ অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। ভারতকে স্বাধীনতা না দিলে জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে না।" মিঃ চার্চ্চিল কি তাঁহার দেশবাসী ১৫জন নেতার এই সকল কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করিবেন?

প্যালেষ্টাইন ও ভারতবর্ষ—

যুদ্ধের সমাপ্তির পর বিজয় উৎসবের দিন প্যালেষ্টাইনের হাই-কমিশনার লর্ড গর্ট সকল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক বন্দীদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই করা হয় নাই। চার্চ্চিল আমেরী কোম্পানী বোধহয় এখন সজাগ নাই।

রাজবন্দী শরৎচন্দ্র—

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বহুদিন যাবৎ জ্বর ও তৎসহ বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছেন এবং তাঁহার অবস্থা উদ্বেগের কারণ হইয়াছে বলিয়া কর্পোরেশন তাঁহার আশু মুক্তির জন্য গভর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।" গত ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর শরৎ বসুকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য দেশের সকল দলের খ্যাতনামা নেতারা, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারগণ ও নানা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাঁহার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যহানির কথা বিবেচনা করিয়া কি তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যায় না?

মার্কিণ ও ভারতবর্ষ—

ডাক্তার জেরোম ডেভিস ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। তিনি ১৪ই মে তারিখে নিউইয়র্কে এক জনসভায় বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সভ্যতায় অনেক দান করিয়াছে; কাজেই তাহার নিকট মার্কিণের ঋণও কম নহে। অথচ ভারতের জনগণের বার্ষিক আয় মাথা পিছু মাত্র ৬৫ টাকা। ভারতে হাজার জন শিশুর মধ্যে ১৬৭ জন এক বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের দুর্দ্দিনে সকলের তাহাকে সাহায্য করা উচিত।" ভারতের দুর্ভিক্ষ সাহায্যে আমেরিকায় ১২ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তৎসম্পর্কে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বস্তি অঞ্চলের উন্নতি—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসির চেষ্টায় কলিকাতার বস্তিগুলির স্বাস্থ্য, আলো ও জল সরবরাহ, পয়প্রণালী ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতির জন্য একটি আইনের খসড়া তৈয়ার করা হইয়াছে। উক্ত আইন দ্বারা যে কোন বস্তির মালিককে উন্নতিমূলক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিতে পারিবেন। বস্তি অধিবাসীদের বসবাস ব্যবস্থার পুনর্গঠন, বস্তি অঞ্চলের আবর্জ্জনা পরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর উচ্ছেদ এবং তাহার স্থলে স্বাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ উক্ত আইনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। আইনের খসড়া শীঘ্রই জনমত সংগ্রহের জন্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হইবে।

খাদি ও গ্রাম্য শিল্প—

ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে জনৈক পত্র-লেখকের প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী খাদি সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—খাদিই একমাত্র ব্যাপক কুটীর শিল্প। আমি ইহাকে সূর্য্য ও অন্যান্য শিল্পকে তাহার গ্রহপুঞ্জের মত মনে করি। বর্ত্তমানে আপনারা যদি হাতে তৈয়ারী কাগজ, উদুখলে ভাঙ্গা চাল, ঘানির তেল, মৌচাকের মধু, তালের গুড়, মৃত পশুর চামড়ার দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ে মন দেন, তবেই যথেষ্ট হয়। কৃষিও গ্রাম শিল্প, সুতরাং খাদ্যশস্য, ফল ও তজ্জাত দ্রব্য এবং গ্রাম্যশিল্প বিবেচিত হইতে পারে। অর্থাৎ গ্রাম যেখানে আত্মনির্ভরশীল, সহর সেখানে গ্রামের উপর নির্ভরশীল হইবে।

স্বদেশী গ্রহণ—

গত ৩০শে বৈশাখ কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্সিয়াল মিউজিয়ামের দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উপলক্ষে এক জনসভায় খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসী সকলকে স্বদেশী গ্রহণের সঙ্কল্প করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যুদ্ধের পর বহু বিদেশী দ্রব্য এদেশে চালাইবার চেষ্টা করা হইবে, সে সময়ে তাহার প্রতিরোধ করিতে হইলে আমাদের স্বদেশীব্রত গ্রহণ ছাড়া অন্য পথ নাই। এ বিষয়ে আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিব না।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান—

সাপ্রু কমিটীর প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানে মোট ১৬০ জন সদস্য লওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থ এইরূপ আসন সংখ্যা পাইবে—হিন্দু ৫১, মুসলমান ৫১, তপশীলী সম্প্রদায় ২০, শিখ ৮, ভারতীয় খৃষ্টান ৭, এংলো ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয়ন ১, পার্শী ১, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিশেষ স্বার্থ ১৬ ও অনুন্নত সম্প্রদায় ৩। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানে যাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য না থাকে, সেইজন্যই হিন্দু ও মুসলমানকে সমান সংখ্যক আসন দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ডাঃ এম-আর-জয়াকর ও শিখ সদস্যদের প্রভাবেই সাপ্রু কমিটী পাকিস্থানের প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন—

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৪৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে মিশনের মোট আয় ছিল ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় ছিল মোট ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। ৬৫টি মঠ ও ১১টি সাধারণ কেন্দ্র হইতে মিশনের কাজ পরিচালনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ও উত্তর ত্রিবাঙ্কুরে দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য কার্য্য করা হইয়াছে। বোম্বাই ও ভুবনেশ্বরে

বন্যা সাহায্য কার্য্য করা হইয়াছে। মিশনের শিক্ষা বিস্তার কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি কলেজ (ছাত্রগণের বাসস্থান সমেত), ৩টি বিদ্যালয় (ছাত্রদের বাসস্থান সমেত), ২৫টি হাই স্কুল, ১১টি মধ্য ইংরাজী স্কুল ও ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিশনের কর্ম্মীরা চালাইয়া থাকেন। ২টি শিল্প বিদ্যালয়ে ৬৬৯ জন ছাত্র শিক্ষা লইয়াছে। মিশনের অধীনে ৩৩টি ছাত্রাবাস, ১৬টি নৈশ বিদ্যালয় ও ৪টি কারিগরী বিদ্যালয় আছে। ২৪ পরগণা রহড়ায় সম্প্রতি একটি বালকাশ্রম খোলা হইয়াছে। কাশী সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগ ও অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকদের বিভাগ, কলিকাতা ও টাকীর মাতৃমঙ্গল আশ্রম, পুরীর বিধবা আশ্রম, মাদ্রাজের সারদা বিদ্যালয়, কলিকাতার নিবেদিতা স্কুল প্রভৃতি হইতে মিশনের কর্ম্মীরা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিয়া থাকেন। এখনও ভারতের বাহিরে ১৭টি কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করা হইতেছে। সারা জগৎব্যাপী মিশনের কার্য্য সকলের আদর লাভ করিয়া থাকে। মিশন যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে পারে, সে বিষয়ে সকল ধনী দাতার অবহিত থাকা প্রয়োজন। মিশন বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। সেই গৌরব বৃদ্ধির জন্য সকলের সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত।

যশোহর জিলা শিক্ষক সম্মেলন—

গত ২৯শে এপ্রিল যশোহর জিলা শিক্ষক সম্মিলনীর দশম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির অভিভাষণে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুণ উল্লেখপূর্ব্বক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সমুন্নতিকল্পে কতিপয় অত্যাবশ্যক ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করেন। (১) শিক্ষক ও ছাত্রে ব্যবধান দূরীকরণ ও নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা। ভারতের নিজস্ব গুরুশিষ্য সম্পর্ক সর্ব্বতোভাবে অব্যাহত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। (২) শিক্ষক নিয়োগের সময় শিক্ষকের উদারস্বভাব, পরোপকারসাধনে প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ—সচ্চরিত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য; কেবল, পরীক্ষার সাফল্য প্রকৃত শিক্ষকতার প্রমাণ কিছুতেই হইতে পারে না। (৩) শিক্ষকদের চিরন্তন ছাত্রাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানস্পৃহা বাঞ্ছনীয়; আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষক নিত্যনূতন বিদ্যার্জ্জনে বীতস্পৃহ। (৪) ছাত্রদের চিন্তাশক্তির সমধিক বর্ধনের প্রতি শিক্ষকদের প্রখর দৃষ্টি থাকা দরকার, কেবল গ্রন্থপাঠ বিষয়ে নহে। (৫) প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে বিশিষ্ট গ্রন্থাগার স্থাপন অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগার ব্যতীত শিক্ষক ও ছাত্রদের সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টিপ্রসারণ বা বিষয়বিশেষে সমধিক অন্তর্দ্দৃষ্টি একান্ত অসম্ভব। (৬) ভারতীয় নারীরা বৈদিক সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষায় সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন; নারীশিক্ষা এদেশের অস্থিমজ্জাগত। নারীদের শিক্ষার সর্ব্ববিধ সুযোগ বিধান একান্ত প্রয়োজন। (৭) আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষাবিভাগের লোকদের অনেক সময় সমাদর হয় না। শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষকদের স্থানই সর্ব্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। পরিশেষে ডক্টর চৌধুরী বলেন—যদিও আমাদের দেশের শিক্ষকদের অবস্থা সর্ব্ব দিক হইতেই অতি শোচনীয় সন্দেহ নাই, তৎসত্ত্বেও শিক্ষকেরাই যে জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ; তজ্জন্য সকল দুঃখদৈন্যের মধ্যেও হতাশ না হইয়া তাঁহাদেরই এ মহৎ ব্রত পালনে যথাসাধ্য তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য।

ভারত ও যুদ্ধের ব্যয়—

যুদ্ধের জন্য প্রতি বৎসর যুদ্ধ ব্যয় বাবদ ৫ শত কোটি টাকা করিয়া ঋণের বোঝা ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর চাপান হইতেছে বলিয়া সকলে মনে করেন। সে জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, মানু সুবেদার, হোসেন ইমান, পি-এন-সাপ্রু, এম-এ-আয়েঙ্গার, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, টি-টি কৃষ্ণমাচারী, শ্রীপ্রকাশ, এন-এম-যোশী, সত্যনারায়ণ সিংহ ও সর্দ্দার শান্ত সিং এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ভারতের পক্ষ হইতে যে ঋণ করা হইতেছে, তাহার হিসাব পরীক্ষার জন্য পরিষদদ্বয়ের বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্যের উপর ভার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের পক্ষ হইতে ঋণের পরিমাণ স্থির করার ভার বেসরকারী লোকদের স্থির করিতে দিলে ভারত গভর্ণমেণ্টও পরে কতকটা দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে পারিবেন।

মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ আবদার রহমন সিদ্দিকী সম্প্রতি মধ্যপ্রাচী ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মিশর,

প্যালেষ্টাইন, ইরাক ও ট্রান্স-জোর্ডিনাতে বৃটীশ সর্ব্বেসর্ব্বা। সিরিয়া ও লেবাননে ফ্রান্সের অপেক্ষা বৃটীশের আধিপত্য অধিক। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বৃটীশের তাঁবে যে আরব রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, আবার সে বিষয়ে কাজ চলিতেছে। ওদিকে রাশিয়া তুরস্কের কিয়দংশ লইয়া তুরস্ক সোভিয়েট রাজ্য গঠন করিয়া তাহা বলকানের মধ্যে রাখিবার চেষ্টায় আছে। ঐ অঞ্চলে মোটের উপর শ্বেত-সাম্রাজ্য গঠনের ব্যবস্থা চলিতেছে। নিকটপ্রাচী ও মধ্যপ্রাচীর লোক ভারত সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না। ঐ সকল দেশে ভারত কথা প্রচারের কোন ব্যবস্থা নাই।" মিঃ সিদ্দিকীর এই উক্তির পর ভারতের মুসলমান নেতাদের কি এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত নহে ?

বাঙ্গালা ও অষ্ট্রেলিয়া—

কলিকাতার খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈন ভারতীয় বণিক প্রতিনিধি দলের সহিত অষ্ট্রেলিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—"বাঙ্গালার গভর্ণর বাঙ্গালা দেশে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করায় সে সংবাদ অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচারিত হইলে সেখানকার লোক বলিয়াছে—একজন লোক ৬ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের শাসন করিবে—ইহা সত্যই বিস্ময়জনক ব্যাপার। অষ্ট্রেলিয়ার লোক ভারতের প্রকৃত অবস্থার কথা জানে না। সে জন্য ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচারক প্রেরণ করা উচিত। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা ভারতবাসীদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চায়। সেখানে কালা-আদমীর স্থান নাই—নূতন অধিবাসী হিসাবে এখনও তাহারা শুধু শ্বেতকায়দিগকে স্থান দিতে প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডার—

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ঘোষণা করিয়াছেন যে গত মে মাসে স্মৃতি ভাণ্ডারে দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ভাণ্ডারে ৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা ছিল—এখন উহা ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমিতি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আগামী ২২শে শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যুর দিন; আশা করি, তাহার পূর্ব্বেই ঐ ভাণ্ডারে ২৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে।

ঢাকার কাপড়ের কল বন্ধ—

গত ৩১শে মে হইতে কয়লার অভাবে ঢাকার তিনটি কাপড়ের কলে কাজ বন্ধ হইয়াছে। ঐ ৩টি কলে প্রত্যহ ২৪ হাজার খানা ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইত। মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকু ও ২ হাজার ৮শত ৮০টি তাঁত বন্ধ হইয়া গেল। ১১ হাজার শ্রমিক ৩টি কলে কাজ করিত। ভাওয়ালের জঙ্গল হইতে কাঠ আনাইয়া কয়েক মাস কাপড়ের কলগুলি চালু রাখা হইয়াছিল—এখন আর তাহাও পাওয়া যায় না। ৩টি কলের নাম—ঢাকেশ্বরী ১নং ও ২নং এবং চিত্তরঞ্জন কটন মিল।

চীনে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন—

চীনের কুওমিংটন গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী কমিটীর প্রধান মন্ত্রী মার্শাল চিয়াং কাইসেক পদত্যাগ করিয়াছেন ও মিঃ টি-ভি-সুং তাঁহার স্থানে নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। মার্শাল চিয়াং ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৩৯ হইতে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন। চীন দেশকে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিঃ সুং আমেরিকা হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া দুর্গত চীনকে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার সহিত মিঃ সুংএর রুশিয়া প্রীতির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে ?

বৃটেনে মন্ত্রিসভায় ভাঙ্গন—

বিলাতে পার্লামেণ্টে শ্রমিক দলের চাপে গত ২৩শে মে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ৭ই মে মিঃ চেম্বারলেন পদত্যাগ করিলে ১০ই মে মিঃ চার্চ্চিল প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। ১৫ই জুন পার্লামেণ্টের আয়ু শেষ হইবে ও সাধারণ নির্ব্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। ইতিমধ্যে মিঃ চার্চ্চিলই দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা—

৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় ই-আই-রেলের হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে বেগমপুর ও মণিরামপুর ষ্টেশনের মধ্যে মণিরামপুরের নিকট হাওড়া হইতে মাত্র ১৭ মাইল দূরে হাওড়া হইতে সাহারাণপুরগামী ৮৩নং আপ পার্শ্বেল একসপ্রেস ট্রেণ এক মালগাড়ীর পিছনে গিয়া

ধাক্কা মারায় ১৩জন নিহত ও ৭৩জন আহত হইয়াছে। ১২জন ঘটনাস্থলেই মারা যায় ও ১জন হাসপাতালে যাইবার পথে মারা গিয়াছে। আহতদের মধ্যে ৪০জনের আঘাত বেশী ছিল। নিহতদের মধ্যে কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য অন্যতম। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র (দেওঘর মিউনিসিপালিটির কমিশনার) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তিনি আহত হইয়াছেন। ই, আই, রেলে যত অধিকসংখ্যক *দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, অন্য কোন রেলে তত দেখা যায় না। এই সকল দুর্ঘটনা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার জন্য কি* কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না?

বাঙ্গালায় বস্ত্রসঙ্কট—

বাঙ্গালার বস্ত্রসঙ্কট সম্বন্ধে এখন প্রতিদিন নানা স্থানে সভা ও আলোচনাদি হইতেছে। তাহাতে জানা যায় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ২৫শে মার্চ্চ হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ৮৬ হাজার গাঁট মিলজাত বস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে যে ১৫ হাজার গাঁট বস্ত্র গভর্ণমেণ্ট আটক করিয়াছেন, তাহাও গভর্ণমেণ্টের হেপাজতেই আছে। কিন্তু প্রশ্ন—এই পরিমাণ বস্ত্র কোথায় রহিয়াছে ও তাহা দ্বারা কি করা হইতেছে? অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ সমুদয় বস্ত্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনার্থ ছাড়িয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের নিকট এখন অন্ততঃ ৯০ হাজার গাঁট বস্ত্র আছে। অথচ প্রায় প্রতিদিন বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এখন ঐ বস্ত্র গুদামে পড়িয়া থাকিতে দিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা অত্যন্ত নিন্দার বিষয় হইবে।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস—

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য তেওতার জমীদার কুমারশঙ্কর রায় মহাশয় পরলোকগমন করায় পূর্ব্ববঙ্গ অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে ঢাকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস (হিন্দু মহাসভা) সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঢাকা মুড়াপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৈমনসিংহ অষ্টাগ্রিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পরাজিত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন।

ভারত মার্কিণ বাণিজ্য—

আমেরিকার ওয়াশিংটন হইতে খবর আসিয়াছে যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে যে পরিমাণ বেসামরিক মাল আসিত, গত ৩ বৎসর তাহার ১০গুণ বেসামরিক মাল মার্কিণ হইতে এ দেশে পাঠান হইয়াছে। গ্রেটবৃটেন হইতে ভারতে যে সকল মাল আসিত এখন তাহার অর্দ্ধেক মাল আসিতেছে। *বৃটেনের কারখানাগুলি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকায় মাল প্রস্তুত করিতে* পারে না। এই সংবাদ ভারতীয় শিল্পপতিগণের নিকট কি ভাবে গৃহীত হইবে, তাহার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিবে।

বাঙ্গালাদেশে যক্ষ্মা—

বাঙ্গালাদেশে যক্ষ্মার প্রকোপ দিন দিন যেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। যাদবপুরে যে যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে তাহাতে মাত্র ৩শত রোগী রাখা যায় ও কার্সিয়াংএর হাসপাতালে ৪৫ জন রোগী রাখা চলে। সে জন্য যাদবপুরে নূতন ৪৫ বিঘা জমি লইয়া আরও ২ শত রোগী রাখার আয়োজন চলিতেছে—সেজন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ আর-পি-সাহা আড়াই লক্ষ টাকা, মৈমনসিংহের মহারাজ কুমারগণ ১ লক্ষ টাকা ও এটর্ণী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সম্প্রতি ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। যাদবপুর হাসপাতালের পরিচালকগণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দেশের ধনীরা মুক্ত হস্তে অর্থ দান করিবেন।

চালের দাম—

কলিকাতা ও সহরতলীর রেশন অঞ্চলে যখন চালের মণ ১৬ টাকা ৪ আনা, তখন মফঃস্বলে ৫ টাকারও কম মূল্যে একমণ ধান বিক্রীত হইতেছে। ১৬ টাকা মণ দিয়াও সহরাঞ্চলের লোক ভাল চাল পায় না—অধিকাংশ সময় এখনও পর্য্যন্ত অখাদ্য চাউল দেওয়া হইতেছে। সহর ও মফঃস্বলে চালের দামের এই পার্থক্যের জন্য কাহারা লাভবান হইতেছে? গরীব লোককে ভাতে বঞ্চিত

করিয়া কি ধনী ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা লাভ করিতে দেওয়া হইতেছে ?

মিঃ আসফ আলি—

পাঞ্জাব গুরুদাসপুর জেলে সাংঘাতিক পীড়িত হওয়ায় গত ২৭শে মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মিঃ আসফ আলি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্ম তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার দেহের ওজন ছিল ১২৬ পাউণ্ড, এখন তাহা ৯৮ পাউণ্ড হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও জাতি—

২৭শে মে তারিখে মেজর লংডেন মহাবালেশ্বরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনার সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিকট বলিয়াছেন—"যে সমস্ত হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্ম স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবী করিতে পারে না।" মুসলমান সমাজের সকল নেতার এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ইউরোপে কম্যুনিষ্ট প্রাবল্য—

মিসেস্ ক্লেয়ার বুথ নিটস খ্যাতনামা মার্কিণ রাজনীতিক ও লেখক। তিনি সম্প্রতি ইউরোপ ঘুরিয়া গিয়াছেন। তিনি নিউইয়র্কে ফিরিয়া গিয়া গত ৩০শে মে জানাইয়াছেন ভারতবর্ষের লোক সোভিয়েটের সাহায্যের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতের অধিকাংশ লোক সোভিয়েট নীতি সমর্থন করে ও তাহার পক্ষপাতী। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই এখন সোভিয়েট প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। গ্রীস ও ইটালীতে শীঘ্রই সোভিয়েট নীতি অনুসৃত হইবে। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে এখনই কম্যুনিষ্টরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। চীনেও কম্যুনিষ্ট দল প্রবল। এমন কি মাঞ্চুরিয়া, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে কম্যুনিষ্টরা সংখ্যায় কম নহে। জগৎ কোন দিকে চলিতেছে ?

চীনে কাপড় রপ্তানী—

চুংকিংএর এক সংবাদপত্রে প্রকাশ—সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে ৫ হাজার টন কাপড় চীনে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সময়ে ভারতের লোক বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইতেছে সে সময়ে এ দেশ হইতে চীনে বস্ত্রপ্রেরণ কেহই সমর্থন করিতে পারে না। সংবাদটি বিশ্বাস না করারও কোন কারণ নাই। কি ভাবে গোপনে চীনে পূর্ব্বে বস্ত্র প্রেরণ করা হইতেছিল তাহা প্রকাশিত হওয়ার পর সকলেই এ সংবাদে মর্ম্মাহত হইবেন। পরাধীন জাতির এই সকল গ্লানি সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

ব্রহ্মদেশের অবস্থা—

ব্রহ্মদেশ যখন জাপানের অধিকারে ছিল, তখন বৃটেন ব্রহ্মবাসীদের স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষায় উৎসাহ দান করিয়াছিল। কিন্তু জাপানী বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা দান করা দূরে থাক, তাহাদের যুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তী শাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। জাপানীদের সময়ে তাহারা যে সকল অস্ত্র পাইয়াছিল, তাহা এখন বৃটীশের হাতে ফিরাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেক ব্রহ্মবাসী তাহাতে বাধা দিতেছে, ফলে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইতেছে। ব্রহ্মদেশে যে সকল মার্কিণ সৈন্য আছে, তাহারা শুধু দর্শক হইয়া আছে। ব্রহ্মদেশের সকল স্থান এখনও জাপানীমুক্ত হয় নাই। কাজেই সেখানকার অবস্থা এখনও সঙ্গীন বলা যায়।

বিলাতে ভারতীয় প্রার্থী—

মিঃ রজনী পামী দত্ত গ্রেট বৃটেনে কম্যুনিষ্ট দলের একজন নেতা; তিনি এবার পার্লামেণ্টের সাহায্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি বার্ম্মিংহামে ভারতসচিব মিঃ আমেরীর সহিত ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীর কথা সকলকে জ্ঞাপন করাই মিঃ দত্তের এই ভোটযুদ্ধে নামার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আশা করেন যে শ্রমিক দল তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী খাড়া করিবেন না। তিনি এবারকার নির্ব্বাচনে একমাত্র ভারতীয় প্রার্থী।

সতীশচন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

গত ১৫ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে বসুমতীর স্বর্গত স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসনগ্রহণ করেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, মৃণালকান্তি বসু প্রভৃতি সতীশচন্দ্রের বিভিন্ন গুণের কথা

বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সতীশচন্দ্রের দানের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

ডি-ভ্যালেরা ও মিঃ চার্চ্চিল—

যুদ্ধ জয় উপলক্ষে বেতার বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল ডি-ভ্যালারাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন—"ডি-ভ্যালেরার কার্য্যের দরুণ আয়র্লণ্ড আক্রমণ করার প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল। কেবলমাত্র অপরিসীম বৃটীশ ধৈর্য্যের জন্যই তাহা হয় নাই।" মিঃ ডি-ভ্যালেরাও মিঃ চার্চ্চিলের উত্তর দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—"আয়র্লণ্ডকে আক্রমণ করিলে বিশ্ব ইতিহাসের আর একটা অধ্যায় রক্তস্নাত হইত। আয়র্লণ্ড একক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে, সীমাহীন দুঃখদারিদ্র্য বরণ করিয়াছে।" কথাগুলি মিঃ চার্চ্চিলকে অবশ্যই বিব্রত করিবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও যক্ষ্মা চিকিৎসা—

সকলেই জানেন যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার পক্ষ হইতে কলিকাতার মধ্যেই পাতিপুকুরে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতিতে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে। আজ বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পাতিপুকুরের হাসপাতালে বহু দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে উক্ত হাসপাতালের প্রসার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না। এজন্য বাঙ্গালা দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সাহায্য কলিকাতা ১৭০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমরভূষণ রায় মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

সচ্চিদানন্দ সমাধি মন্দির—

গত ২৭শে মে তারিখে বর্দ্ধমান জেলার আমোদপুরে যাইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বামী ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সমাধি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে পৌরহিত্য করিয়া আসিয়াছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বসাধারণের উপাসনার জন্য একটি মন্দির এবং পীড়িত সন্ন্যাসীদিগের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হইবে। উৎসবে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বামী প্রেমানন্দ গিরি প্রভৃতি কলিকাতা হইতে এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীকুমার মিত্র, প্রভাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি বর্দ্ধমান হইতে যাইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ দরিদ্রের দুঃখে দরদী ছিলেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেন—কাজেই তাঁহার সমাধি মন্দির হইতে যাহাতে উক্ত উভয় প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সকলের নিকট বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছেন। স্বামীজি যে সেবার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, স্বামীজির সকল শিষ্যকে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

যুদ্ধ শেষ হয় নাই—

২০শে মে আয়র্লণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডি-ভ্যালেরা ঘোষণা করিয়াছেন যে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে অপেক্ষা করিতে হইবে। যুদ্ধ সবেমাত্র দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রবেশ করিতেছে। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে জাতিই টিকিয়া থাকিতে চাহিবে, তাহাকে দেশরক্ষার ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে।

পরলোকে রামগোপাল মুখোপাধ্যায়—

গত ২৬শে মে শনিবার কলিকাতা খিদিরপুর বাকুলিয়া হাউসের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মেসার্স জি-ডি-ব্যানার্জি এণ্ড কোং লিঃএর অন্যতম ডিরেক্টার ছিলেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। সুদূর বদরিকাশ্রমে তিনি যাত্রীনিবাস করিয়া দেন ও দ্বারকা তীর্থে জলাভাব দূর করার ব্যবস্থা করেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে তিনি পিতার নামে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধনী হইয়াও বিলাসী ছিলেন না।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা জার্ম্মানীর প্রতিকূল হইয়া উঠিবার পর হইতেই সে মিত্রশক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হয়; বৃটেন্ ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নিকট সে নানাভাবে আবেদন জানায়—বলশেভিক বন্যা রোধ করিয়া ইউরোপকে বাঁচাও।

মধ্যপথে জার্ম্মানীর সহিত মীমাংসা করিবার জন্য মিত্রপক্ষীয় শিবিরের কেহ কেহ যে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিণ জনমত জার্ম্মানীর সম্পূর্ণ পরাজয় চাহিয়াছে; তাহাদের দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া চার্চ্চিল, ইডেন্ প্রভৃতি বৃটিশ রাজনীতিকরাও জার্ম্মানীর সহিত আপোষ করিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব ইহার কারণ নয়—তাঁহাদের আশঙ্কা এই ছিল যে, স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে জার্ম্মানী যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে আবার সে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে।

কূটনৈতিক সংগ্রাম

ইউরোপে ট্যাঙ্ক ও কামানের সঙ্ঘর্ষ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে বলা চলে না। বরং প্রকৃত যুদ্ধ এখন আরম্ভ হইয়াছে। ক্লসউইৎসের বিখ্যাত উক্তি—**War is the continuation of politics by other means.** অর্থাৎ অন্য উপায়ে রাজনীতির অনুসরণই যুদ্ধ। সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ চলিবার সময় যুদ্ধের এই রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট থাকে না—তখন সকলের অখণ্ড মনোযোগ শত্রুর প্রতি নিবদ্ধ। সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ শেষ হইবার পরই যুদ্ধের রাজনৈতিক দিকটা বড় হইয়া ওঠে। নাৎসী জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর স্বভাবতঃ ইউরোপে এখন কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। মিত্রপক্ষের শিবিরে যাহারা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এক নয়। কেবল ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের সামরিক পরাজয়ের প্রয়োজনীয়তাই তাহাদের সকলের নিকট সমান। এই প্রয়োজন মিটিবার পর এখন পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলি মাথা উঁচু করিয়াছে।

খাস জার্ম্মানীতে দেখা যাইতেছে—নাৎসী রাষ্ট্রের সামরিক পরাজয়ের পরও সেখানে নাৎসীবাদ বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ডোয়েনিৎসকে দিয়া তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চলের শাসনকার্য্য চালাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এখন ঝুনা নাৎসীরা বৃটিশের নিকট অত্যন্ত সুব্যবহার পাইতেছে। যে সব অত্যাচারী নাৎসী যুদ্ধাপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের শাস্তি বিধান সম্পর্কে দীর্ঘসূত্রতাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সর্ব্বোপরি, বৃটিশ বন্দিশিবিরে লক্ষ লক্ষ আন্কোরা নাৎসী জিয়ানো আছে। রুশিয়ার যুদ্ধের বন্দীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই "ফ্রি জার্ম্মাণ কমিটী" গঠিত হয়। কিন্তু বৃটেনে জার্ম্মান বন্দীরা পুরাপুরি নাৎসী রহিয়া গিয়াছে। মনে করা অন্যায় নয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের বন্দী নাৎসী সেনাবাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়া নাৎসীবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চায়। কিন্তু জার্ম্মাণ জনসাধারণের সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই। বরং নাৎসী প্রভাবমুক্ত জার্ম্মান জনসাধারণকে স্বপ্রতিষ্ঠ করাই তাহার নীতি। জার্ম্মানীর সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের নাৎসী প্রভাবমুক্ত জনসাধারণ সোভিয়েটের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে—এই আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদীরা জার্ম্মানীর অন্য দিকে নাৎসীদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। রুশিয়ার জার্ম্মান বন্দীদিগকে সংশোধন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়াও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বন্দী সম্পর্কে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার কারণ—সোভিয়েটের প্রভাবাধীন জার্ম্মান বন্দীদের বিরুদ্ধে তাঁহারা তাঁহাদের শিবিরের বন্দীদিগকে ব্যবহার করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন। এখন সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। এখন সোভিয়েট রুশিয়ার অধিকৃত জার্ম্মাণ অঞ্চলের বিরুদ্ধে ছোট বড় সব নাৎসীকে প্রয়োগ করিবার সুকৌশলী আয়োজন দেখা যাইতেছে।

পোল্যাণ্ডের সমস্যা

পোল্যাণ্ডের সমস্যা আবার নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। ইয়াণ্টায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, পোল্যাণ্ডের বাহিরের ও পোল্যাণ্ডের ভিতরের বিশিষ্ট লোকদিগকে পোলিস্ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ গভর্ণমেণ্ট আরও প্রসারিত করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা লইয়া মতবিরোধ ঘটে। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট প্রসারিত করা ইয়াণ্টার সিদ্ধান্ত; সে তাহাই করিতে চায়। অন্য পক্ষে বলা হইতেছে যে, পোলিস্ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে নূতন করিয়া গড়া ইয়াণ্টার সিদ্ধান্ত।

এই বিতর্কের সময়ে লণ্ডনের পিজরাপোল্ হইতে স্বয়ম্ভু পোলিস্ নেতারা আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে যে, ১৬ জন পোলিস্ নেতাকে সোভিয়েট রুশিয়া গুম্ করিয়াছে। ওয়াশিংটনে মঃ মলোটভকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি স্পষ্ট বলেন যে, লালফৌজের সামরিক তৎপরতায় বাধা দিবার অপরাধে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাতে মিঃ ইডেন ও ষ্টেটিনিয়াস্ পোল্যাণ্ড সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এই সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ জানিতে চান। ইহার পর মার্শাল ষ্ট্যালিন্ জানাইয়া দিয়াছেন যে, ধৃত ১৬ জন সামরিক তৎপরতায় বাধা দিয়া অপরাধ করিয়াছে। তাহাদের সহিত পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই; আলোচনা করিবার জন্য তাহাদিগকে কেহ আমন্ত্রণও করে নাই।

প্রকৃত কথা এই—লণ্ডনের প্রতিক্রিয়াপন্থী পোল্‌দিগকে—অন্ততঃ

আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আবার নূতনভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ১৬ জন পোল্ উপলক্ষ মাত্র। তবে, ইহাও ঠিক যে, সোভিয়েট রুশিয়া একটুও দমিবে না। শেষ পর্য্যন্ত সে পোল্যাণ্ডের জনমতের নিকট আবেদন জানাইতে বলিবে। এই আবেদনের ফল নিশ্চয়ই তাহার অনুকূল হইবে।

ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গ

যুগোশ্লেভিয়ার টিটোকে মিত্রশক্তি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রগতিপন্থীদের প্রভুত্বাধীন যুগোশ্লেভিয়াকে তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া উঠিতে দিতে পারেন না।

আড্রিয়াতিকের তীরে ত্রিয়েস্ত বন্দর লাভ করিলে যুগোশ্লেভিয়ার বিশেষ সুবিধা হয়। ইহার কারণ ডালমেসিয়ান উপকূল পার্ব্বত্য; সেখানে ভাল বন্দর নাই। অবশ্য মার্শাল্ টিটো জোর করিয়া ত্রিয়েস্ত অধিকার করিতে চান নাই; তিনি বলিয়াছিলেন—যুগোশ্লাভ সৈন্ত ত্রিয়েস্তকে শত্রুর কবলমুক্ত করিয়াছে; কাজেই শান্তিবৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিয়েস্ত যুগোশ্লোভিয়ার হাতে থাকুক। ইহাতে মার্শাল আলেকজাণ্ডার উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক "যুদ্ধংদেহী" বাণী প্রদান করিয়াছিলেন। মিঃ চার্চ্চিলও কৌশলে গরম গরম কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় যে, ত্রিয়েস্ত যুগোশ্লেভিয়ার হাতে থাকায় যদি আপত্তির কারণ থাকে, তাহা হইলে বৃটিশ সৈন্তের অধিকারভুক্ত উহা থাকে কেমন করিয়া? এই অঞ্চলে বৃটেনের কোন্ নৈতিক অধিকার আছে?

অথচ, ত্রিয়েস্তে যুগোশ্লেভিয়ার দাবীই সঙ্গত। রোম্যান সাম্রাজ্যের আমলে ত্রিয়েস্ত ইতালীর ছিল। তাহার পর কিছু দিন ত্রিয়েস্ত স্বাধীন ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভেনিস্ এই বন্দরটি অধিকার করে। ইহার পর প্রায় দুই শত বৎসর ত্রিয়েস্ত ও ভেনিসের মধ্যে বিরোধ চলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রিয়েস্ত অষ্ট্রিয়ার হাতে যায়। তদবধি—কেবল নেপোলিওঁর আমলে ১৭ বৎসর ছাড়া—ত্রিয়েস্ত অষ্ট্রিয়ারই ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন্ ইতালীকে এই মর্ম্মে গোপন প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে যুদ্ধান্তে দক্ষিণ টাইরোল্ ও ত্রিয়েস্ত তাহাকে দেওয়া হইবে। যুদ্ধের পর অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কতক অঞ্চল সার্ব্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর সহিত সংযুক্ত করিয়া যখন যুগোশ্লেভিয়া রাজ্য গঠিত হয়, তখন শ্লোভেন্ জাতির পক্ষ হইতে ত্রিয়েস্ত দাবী করা হয়। এদিকে ইতালীয়রা তাহাদিগকে প্রদত্ত গোপন প্রতিশ্রুতি পালনের জন্ত জিদ্ করিতে থাকে।

এই পরস্পর-বিরোধী দাবী সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার ভার পড়ে মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের উপর। তিনি বৃটেনের প্রদত্ত গোপন চুক্তি উপেক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, ত্রিয়েস্তে সঙ্গত দাবী যুগোশ্লেভিয়ার। তখন ইতালী বলপূর্ব্বক ত্রিয়েস্তের নিকটবর্ত্তী ফিউম অধিকার করে। মিত্রশক্তি সেখান হইতে [illegible]

ইতালীয়রা ফিউম ও ত্রিয়েস্ত সহ সমগ্র ইষ্টিরিয়া উপদ্বীপ অধিকার করিয়া বসে।

এইভাবে ত্রিয়েস্ত ইতালীয়দের হাতে আসিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালীর স্বাধীনতার ঋষি ম্যাৎসিনি ত্রিয়েস্ত পর্য্যন্ত ইতালীর সীমানা কখনও দাবী করেন নাই। ভেনিসের নাবিকরাই ত্রিয়েস্তকে ইতালীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত আন্দোলন করে। সে যাহা হউক, মার্শাল টিটোকে যদি বর্ত্তমান ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া ত্রিয়েস্ত সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই ব্যাপারের সঙ্গত মীমাংসা হইয়া যাইত।

প্রকৃত কথা এই—যুগোশ্লেভিয়াকে আড্রিয়াতিকের শ্রেষ্ঠতম বন্দরটি দেওয়ায় বৃটেনের আপত্তি আছে; আড্রিয়াতিকের তীর পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তৃতি ঠেকাইবার জন্য সে শেষ চেষ্টা করিতেছে। বৃটেন আশা করে—ইতালীকে সে সায়েস্তা রাখিতে পারিবে; গ্রীসে বামপন্থীদিগকে দাবাইয়া রাখা অসম্ভব হইবে না; স্পেনে ফ্রাঙ্কোকে সরাইতে হইলেও সেখানে একটা গোঁজামিল দেওয়া চলিবে। এই ভাবে বৃটেন্ তাহার ভূমধ্যসাগরের পথটি নির্ব্বিঘ্ন রাখিবার কথা ভাবিতেছে। কম্যুনিষ্ট-প্রভাবান্বিত যুগোশ্লেভিয়াকে আড্রিয়াতিকে প্রবেশপথ দিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই সংযোগসূত্রের নূতন বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। কেবল প্রবেশপথই বা বলি কেন—ইষ্টিরিয়া উপদ্বীপ ও ত্রিয়েস্ত-ফিউম্ যাহার হাতে থাকিবে, সমগ্র আড্রিয়াতিক সাগরেই তাহার প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে।

সীরিয়া ও লেবানন্

১৯৪৩ সালের হাঙ্গামার পর সীরিয়া ও লেবানন্ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইলেও ফরাসী স্বার্থ রক্ষার জন্ত সেখানে কিছু সৈন্ত রাখা হইয়াছিল। এই সব সৈন্ত ক্রমে ক্রমে সরাইবার কথা। কিন্তু গত মে মাসে ফরাসী সরকার সীরিয়া ও লেবাননের সৈন্ত বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব তীরে আবার আগুন জ্বলিয়া ওঠে। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বহু সীরিয়াম্ ও লেবানীজ গত কয়েক দিনে প্রাণ দিয়াছে।

বৃটেন্ মহানুভবতা দেখাইয়া সীরিয়া ও লেবাননের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহার ফলে ফরাসী সেনাবাহিনী এখন সরাইয়া লওয়া হইয়াছে; সীরিয়া ও লেবাননে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বৃটেন চাহিতেছে—মধ্য প্রাচ্যের ব্যাপারে তাহার ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লী করিবার অধিকার থাকুক। এইজন্ত সে তাড়াতাড়ি সীরিয়া ও লেবাননের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু দ গল্ তাহা হইতে দিবেন না—তিনি সোভিয়েট রুশিয়াকে আহ্বান করিবেন। একলা ফ্রান্সের মধ্যপ্রাচ্য হইতে সরিয়া আসিবার হিতকথা দ গল্ বৃটেনের নিকট হইতে শুনিবেন না। তিনি চাহিবেন—মিত্রপক্ষের প্রধান শক্তিগুলি একত্র হইয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করুক; সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবিহীন সোভিয়েট রুশিয়ার উপরই তিনি এই সম্পর্কে বেশী নির্ভর [illegible]

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল লীগ ঃ

কলকাতার মাঠে আবার ফুটবল মরসুম ফিরে এসেছে। আবার মাঠে সেই জনসমুদ্রের জোয়ার ভাটা, পরিশ্রান্ত দেহ মনে আশা নিরাশার উঠানামা। লীগ খেলায় গত কয়েক বছর উঠানামা স্থগিত কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়নসীপ নিয়ে জল্পনা কল্পনা এবং উত্তেজনার কোন অভাব নেই। বলতে কি আগের তুলনায় যে বেড়ে গেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় চ্যারিটি খেলায় টিকিটের চাহিদা দেখে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় গত দু'বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। ১১টা খেলায় তাদের পয়েণ্ট উঠেছে ১৯। একটা খেলাতেও হারেনি। মোহনবাগানের দুর্ভাগ্য যে লীগের খেলায় গোড়াতেই নবাগত দু'জন খেলোয়াড় গুরুতর আহত হয়ে খেলা থেকে ঐ দিন থেকেই অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। ওদিকে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা খেলোয়াড় বুচি রাঁচিতে মক্‌ফাইট করতে গিয়ে হাতে আঘাত পাওয়ায় ঠিক সময়ে লীগের খেলায় যোগ দিতে পারলেন না। আক্রমণভাগ খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। গোল দেবার বহু সুযোগ পেয়েও গোল দেবার লোক পাওয়া যায় না। আক্রমণভাগে একমাত্র নির্ম্মল চ্যাটার্জির খেলাই উল্লেখ-যোগ্য। গোল করার বহু বল দিয়েও হতাশ হয়ে নিজেকে শেষ চেষ্টা করতে দেখা গেছে। ফলে অনেক সময় তাঁর খেলার বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। যদি একজন ভাল ইন্‌স্যান থাকতো তাহলে তাঁর খেলাও খুলতো এবং গোল সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত। নিমু বোস এবং বিজন বোস সবদিন সমান খেলতে পারেন না। হাফব্যাক লাইনে দীপেন সেনের খেলা এবার অনেক পড়ে গেছে; ফলে লেফট্‌ ব্যাক পান্না তাল সামলাতে না পেরে এক একদিন বেশ বেসামাল হচ্ছেন। উভয়ের মধ্যে একান্ত বোঝাপড়ার অভাব থাকার জন্য খেলা ঢিলে পড়ছে। ক্যাপটেন অনিল দে লীগের প্রথম দিকের কয়েকটা খেলায় প্রথম শ্রেণীর খেলা দেখিয়েছেন। সমস্ত দল যে তাঁর অধিনায়কত্বে খেলছে তার পরিচয় বহুবার খেলায় পাওয়া গেছে। তাছাড়া তাঁর জুড়ী শরৎ দাসের খেলার সঙ্গে খুব ভাল রকম বোঝাপড়া থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয় না। কলকাতার মাঠে শরৎ দাসকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ব্যাক বলা যায়। এবং কলকাতা যদি বাংলা দেশের ফুটবল খেলার প্রধান কেন্দ্র হয় তাহলে তাঁকে বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাক বললে ভুল বলা হবে না। ছোটখাট মানুষটি, ব্যাকের পক্ষে কম অসুবিধার নয়; কিন্তু তাঁর প্রখর উপস্থিত বিচার বুদ্ধি এ অসুবিধাকে অতিক্রম করে তাঁর খেলাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে। শরীরটা এমনই তৈরী যে তালগোল পাকিয়ে উলটে পালটে গিয়েও দেখা গেল শরৎ দাস ঠিক আছেন, বল এদিকে বিপদ গণ্ডীর বাইরে চলে গেছে। মোহনবাগানের এবার তিনজন গোলরক্ষক। রাম ভট্টাচার্য্য, ডি সেন ও চঞ্চল। রামের খেলা আগের থেকে পড়েছে। মোহনবাগান ৯টা খেলে একটাও গোল খায়নি। প্রথম গোল হ'ল ক্যালকাটার সঙ্গে খেলে। রামই ২টো গোল খায়। দ্বিতীয় গোলটি পেনালটি থেকে হয়। সট খুব শক্ত ছিল না, সোজা বল হাতে ধরেও পড়ে গোলে ঢুকে যায়। ডি সেন ও চঞ্চলের খেলার মধ্যে এ পর্য্যন্ত মারাত্মক ত্রুটি দেখা যায়নি। ফরওয়ার্ডে বুচি এসে যোগদান করেছেন। তাঁর হাত এখনও সম্পূর্ণ সারে নি। সেই কারণে খেলায়

আড়ষ্ট ভাব থাকলেও পূর্ব্বের তুলনায় দলের আক্রমণের খেলা কিছু উন্নত হয়েছে মনে হয়। বুচির বল আদান-প্রদানের পদ্ধতির মধ্যে নূতনত্ব আছে। আরও খুব পরিশ্রম করেই খেলছেন।

লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। ১১টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট হয়েছে। ভবানীপুরের সঙ্গে খেলায় গোলের বহু সুযোগ পেয়েও শেষে ১—০ গোলে প্রথম হেরে যায়। এরিয়ান্সের দিন বলতে গেলে সৌভাগ্য-ক্রমে খেলার শেষ মুহূর্ত্তে গোল পরিশোধ ক'রে খেলা ড্র ক'রে পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে যায়। ইষ্টবেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইনে সোমানা, আপ্পারাও, পাগসলে, সুনীল ঘোষ ও সুশীল চ্যাটার্জি নামকরা খেলোয়াড় খেলছেন। গোল করবার বহু সুযোগ পেয়েও এই দলটিকে সেই পরিমাণ গোল দিতে দেখা যাচ্ছে না। হাফব্যাকে কাইজার ব্যাকে পরিতোষ ও রাখাল এবং গোলে কে দত্ত সকলেই নামকরা। গোলে কে দত্ত থাকায় দলের অন্য খেলোয়াড়রা অনেকখানি ভরসা পেয়ে খেলতে পারবেন।

ভবানীপুর ক্লাব ১০টা খেলে ১৮ পয়েন্ট করে দ্বিতীয় স্থানে আছে। ভবানীপুর ক্লাবে এবার অনেক নতুন খেলোয়াড় এসেছে। ইসমাইল, বাচ্চি খাঁ, জুম্মা তাজ-মহম্মদ এবং কে রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। লীগে এই দলটি এ পর্য্যন্ত ভালই খেলেছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ৩-২ গোলে এবং ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১-০ গোলে জয়ী হয়ে তারা এই দল দুটিকে এবার লীগে প্রথম হারাবার কৃতিত্ব লাভ করেছে। লীগ তালিকায় এরিয়ান্সের খুব ভাল স্থান না হলেও মাঝে মাঝে তারা শক্ত দলের সঙ্গে ভাল খেলেছে। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ভাল খেলে মন্দ ভাগ্যের জন্যে তারা খেলা ড্র করেছে। তাদের বিরুদ্ধে গোলটি অফ্ সাইড থেকে হয়েছে বলে অনেকেরই মত।

গতবারের শীল্ড বিজয়ী বি এণ্ড এ রেলদলে অনেক নামকরা খেলোয়াড় সত্ত্বেও লীগে তারা এমন কিছু ভাল স্থানে নেই। এক একদিন ভাল খেলে আবার খেলায় ঢিলে দেয়। অথচ আক্রমণ ভাগে তাদের থেকে ক্রতগামী খেলোয়াড় খুব কম দলেরই আছে। রক্ষণভাগও শক্তিশালী। গোলে পি ঘোষ, ব্যাকে মজুমদার, সেণ্টার হাফ মোহিনী ব্যানার্জি, নীলু মুখার্জি, ফরওয়ার্ডে আলাউদ্দিন, অমল মজুমদার, ও নন্দীর খেলা উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় দলের মধ্যে ক্যালকাটা গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার অনেক শক্তিশালী হয়েছে। জল পড়লে তাদের খেলা আরও ভাল হবে আশা করা যায়।

প্রথম বিভাগে কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাবে তা খেলা দেখে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। কোন দলেরই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলে কিছু নেই। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এই তিনটি দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা খেলায় যে পরিমাণ গোল দেবার সুযোগ পায় তার কিছুটার সদ্ব্যবহার হ'লে দর্শকদের কাছে খেলা উপভোগ্য হ'ত এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডও ভাল হ'ত। এই তিনটি দলের জনপ্রিয়তা খেলার মাঠে বেশী বলেই এদের নাম উল্লেখ করলাম। অনেক সময় দুর্ব্বল দলের আক্রমণ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান প্রদান এবং খেলায় বোঝাপড়া উপভোগ্য হয়েছে। নামকরা এই তিনটি দল তাদের খেলায় Teritorial advantage পেয়েও দেখা গেছে হয় হেরেছে কিম্বা কোন রকমে মান রক্ষা করেছে। গোলের মুখে বল নিয়ে গিয়ে গোল দিতে না পারার কারণ উপযুক্ত অনুশীলনের অভাব। খেলার সারাক্ষণের মধ্যে কোথাও সত্যিকারের খেলা না পাওয়ার জন্যে দর্শকরাও বিরক্ত হয়ে কটু সমালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করে না।

মহামেডান স্পোর্টিং ১১টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট ক'রে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে সমান পয়েন্ট করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

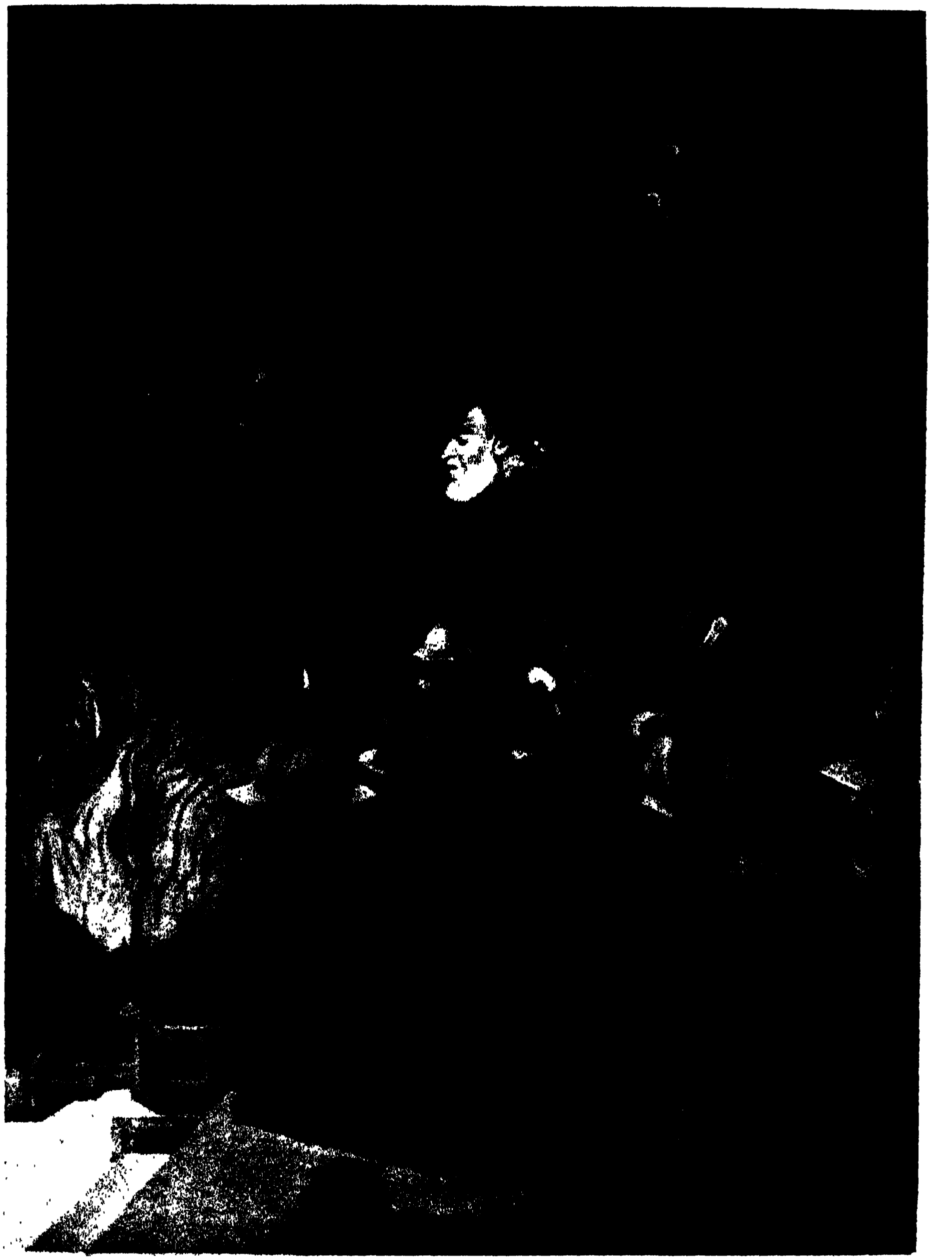
৭।৬।৪৫

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "মরা নদী"—৩৲
শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বালিগঞ্জের ট্রামে"—২৷০
প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "আহুতি"—২৷০
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অভিনয় নয়"—২৷০
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রবি-তর্পণ"—১৷০
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত রহস্যোপন্যাস "কালবৈশাখীর ঝড়"—১৲
প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ"—২৲
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কণ্ট্রোলের শাড়ী"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ



অতীতের স্বপ্ন



শিল্পী—শ্রীপান্না সেন

বলাকা



শ্রাবণ—১৩৫২

প্রথম খণ্ড	ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি, ডি-লিট্

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল, (১) ব্রহ্মতুল্য (২) দেবতুল্য (৩) যাহারা নিজেদের প্রাচীন জনশ্রুতি মানে (৪) যাহারা নিজেদের প্রাচীন জনশ্রুতি মানে না এবং (৫) যাহারা নিকৃষ্ট জীবন যাপন করে। যাহাদের জন্ম পিতৃ ও মাতৃকুলে সাত পুরুষানুক্রমে উচ্চ ও বিশুদ্ধ, যাহারা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করে, চারি বেদ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক পুস্তক সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে এবং অধ্যাপনা কার্য্যে রত থাকে, কালক্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া যাহারা নির্জনে ভগবদ্ চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করে তাহারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যৌবনে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিত। কেবলমাত্র পুত্রার্থে যথা-সময়ে স্ত্রী-সহবাস করিত; অন্যথা কঠোর সাত্বিক নিয়ম পালন করিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া তাহাদের প্রাচীন জনশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিত। চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সমাজের বিভিন্নস্তরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিত এবং পুত্রার্থে সঙ্গমে অসংযত ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ হইতে পঞ্চম শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রভেদ এই যে, জীবিকা উপার্জনের নিমিত্ত তাহারা নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করিত, যথা—কৃষিকার্য্য, ব্যবসা, গো-মহিষাদি প্রজনন, সৈনিকের কার্য্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের জীবনে একদিকে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, সম্যক জ্ঞানলাভ, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ এবং অন্যদিকে বিপরীত গুণগুলি দেখা যায়।

বেদ এবং তাহার আনুসঙ্গিক বিজ্ঞান ও কলা অধ্যয়ন, রাজ্যের এবং প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য এই সকল বিষয়ের অধ্যাপনা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে পৌরোহিত্য করা ব্রাহ্মণগণের কেবলমাত্র পেশা ছিল। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণেরা আশ্রমে কিংবা

সমাজে স্থান পাইত। পুরোহিত, সভাসদ বা মন্ত্রীরূপে ব্রাহ্মণেরা রাজসেবা করিত। যাজ্ঞিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহকারীরূপে কার্য্য করিত। তাহারা বৈদিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থান অধিকার করিত। সময়ে সময়ে রাজদূতের কার্য্যও করিত। সেনাপতি, সৈনিক, সারথী, হস্তী-শিক্ষক, আইনজ্ঞ এবং বিচারক, পুরোহিত, চিকিৎসক, ঔষধপ্রস্তুতকারক, জ্যোতিষিক, সৌধশিল্পী, লোকপ্রিয়গাথা-আবৃত্তিকারী এবং ঘটকের কার্য্য তাহারা করিত। ইহা ব্যতীত তাহারা নানাবিধ ব্যবসা করিত। দান ও ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতে হইত বলিয়া ব্রাহ্মণগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না।

রাজদরবারে পুরোহিতের স্বতন্ত্র স্থান ছিল। সে আংশিক রাজকার্য্য করিত। অন্যান্য রাজকর্মচারীর অপেক্ষা তাহার আধিপত্য অধিক ছিল। রাজকুল-পুরোহিত বলিয়া সে রাজাকে লৌকিক ও পারত্রিক বিষয়ে পরামর্শ দিত। আচার্য্যও যজ্ঞ-পুরোহিতের কার্য্য করিত এবং রাজা ও রাজপরিবারের হিতের জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিত। অমঙ্গল দূর করিবার জন্য সে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সাহায্যে যজ্ঞ করিত। রাজার কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে সে কোন নিদর্শনের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিত। রাজার শিক্ষক, ক্রীড়াসঙ্গী অথবা সহপাঠিগণের মধ্য হইতে রাজপুরোহিত নির্বাচিত হইত। ইহার কারণ এই যে রাজা সুখে দুঃখে তাহাকে প্রকৃত বন্ধুরূপে বিশ্বাস করিতে পারিত। রাজকোষ রক্ষা করা তাহার অন্যতম কার্য্য ছিল। কখন কখন তাহাকে বিচারকের কার্য্য করিতে হইত।

একই পরিবারের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজ-পুরোহিতের কার্য্যে রত ছিল এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও পুরোহিতের পদ পুরুষানুক্রমিক ছিল না। যজ্ঞ এবং বিভিন্ন পর্ব ও উৎসব উপলক্ষে পুরোহিত যে দক্ষিণা পাইত তাহাই তাহার আয় ছিল।

প্রাচীন রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ সভাসদ ও মন্ত্রীর কার্য্য করিত। তাহারা ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। তাহাদের সততা ও যোগ্যতার উপর সুশৃঙ্খলভাবে রাজকার্য্য-পরিচালনা নির্ভর করিত। তাহারা কূটরাজনীতিজ্ঞ ও শাসননীতিজ্ঞ ছিল। মগধের একজন ক্ষমতাশালী রাজার দুইটী সুযোগ্য মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পাটলিগ্রাম সুরক্ষিত এবং পাটলিপুত্র নগর গঠিত হইয়াছিল। একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর কৌশলে একটী বলশালী প্রজাতন্ত্রের একতা নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ-সন্তান চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত শক্তিশালী মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

কাশীর রাজপুরোহিতের ব্রাহ্মণ-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় আশ্চর্য্যজনক ধনুর্বিদ্যার কৌশল প্রদর্শন করিয়া পাঁচশত ধনুর্বিদ্‌কে সে পরাস্ত করে এবং ইহার ফলে তাহার মাসিক বেতন বৃদ্ধি পায়। ভরদ্বাজ গোত্রীয় একটী ব্রাহ্মণ কৃষক ছিল। তাহার জমি কর্ষণ করিতে পাঁচশত লাঙ্গলের প্রয়োজন হইত। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কৃষকের কার্য্যে অবলম্বন করিয়া নিজেই জমিতে লাঙ্গল দিত এবং তাহার পুত্র রাজদরবারে সামান্য ভৃত্যের কার্য্য করিত। ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে লাঙ্গল পরিচালনা করিত বহু দৃষ্টান্ত ইহার পাওয়া যায়। পাঁচশত মালবাহী শকট বোঝাই করিয়া কোন একজন ধনী ব্রাহ্মণ ভারতের পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যবসা করিত। সাধারণ ব্রাহ্মণ ব্যবসা ও ফেরিওয়ালার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিত। একজন ব্রাহ্মণ সূত্রধর অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মালবাহী শকট প্রস্তুত করে। একজন ব্রাহ্মণযুবক মৃগয়ালব্ধ পশু বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।

নৃপতিগণের নিকট হইতে চিরস্থায়ীভাবে ভূমি ও স্থায়ীবৃত্তি লাভ করিয়া প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। উত্তর ভারতের চতুর্দিকে বন্যভূমি, শস্যভূমি ও তৃণক্ষেত্রযুক্ত বহু ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। ধনী ব্রাহ্মণগণ এই সকল ভূমির রাজস্ব উপভোগ করিত। বিচার কার্য্যে ও বেসামরিক কার্য্যে তাহাদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল

ব্রাহ্মণগণ উৎপীড়ন ও মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত। যে সকল ভূমি তাহারা স্থায়ী বৃত্তি হিসাবে প্রাপ্ত হইত সেগুলির জন্য তাহাদের কোন কর দিতে হইত না। ব্রাহ্মণগণের এই সুবিধা সম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে কোন উল্লেখ নাই। অপরাধী ব্রাহ্মণ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হইত। পার্থিব ও অপার্থিব কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণের পালনীয় এরূপ উল্লেখ বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বুদ্ধের সময়ে উদীচ্য ব্রাহ্মণগণ কুরু-পঞ্চালদেশীয় বা কুরু-পঞ্চাল বংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল ক্রমশঃ ব্রাহ্মণগণের অবস্থার উন্নতি হয় এবং আরণ্যক যুগে তাহাদের মত সসম্মানে গৃহীত হইত।

মাতৃদায়

শ্রীকানাই বসু

এক মাথা রুক্ষ বড়ো বড়ো চুল, গলায় এক খণ্ড মলিন উত্তরীয়—তাহার দুই প্রান্ত এক করিয়া মধ্যে একটা চাবি বাঁধা, পরণের ধুতিতে পাড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বেশভূষা বাঙালী সমাজে অতি পরিচিত। তাই ছোকরা যখন টেবিলের ধারে আসিয়া বলিল, আমার মাতৃদায় বাবু, তখন সে খবর কাহারও কাছে নূতন শুনাইল না, কেহ বিস্মিতও হইল না। করুণ সুরে ছেলেটি বলিল, ঘাট কামাবার পয়সা নেই বাবু, যদি দয়া করে কিছু সাহায্য করেন তবে দায় উদ্ধার হয়। কেউ নেই বাবু আমার, দুটা ছোট ছোট ভাই বোন, বাপ নেই—

বলিতেছিল বড়বাবুর কাছে। বড়বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—এখানে কিছু হবে না, যাও, যাও।

ছেলেটা নিরুৎসাহ হইল না। হাত দুইটা জোড় করিয়া কহিল, বাবু, গরীবের মাতৃদায়, আপনারা দয়া না করলে কী করে উদ্ধার হব বাবু। আপনারাই গরীবের মা বাপ। কিছু দয়া করুন বাবু।

বড়বাবু পঞ্চাননবাবু রাশভারি লোক। কথা কহেন অল্প এবং তাহাও ধীরে ও অনুচ্চ কণ্ঠে, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার কথা শ্রুতও হয়, পালিতও হয়। ধীরে ধীরে বলিলেন—তা জানি, কিন্তু এটা আপিস, এখানে ওসব চলবে না, যাও।

ছেলেটা হাতজোড় রাখিয়াই অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিজের মনেই বলিল—কী করে আমি কী করব। কেউ কিছু দেবেন না, হা ভগবান! ধীরে ধীরে সে বড়বাবুর টেবিল হইতে সরিয়া আসিল। বড়বাবুর পাশের টেবিল শৈলেন টাইপিষ্টের। তাহার জমকালো গোঁফ জোড়ার পানে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলেন দেখলে না, তাহার মেশিন বাজিয়া চলিল—খট্ খট্ খটা খট্।

মিনিট দুয়েক কাটিয়া গেল। শৈলেন মেশিন হইতে কাগজ বাহির করিয়া নূতন কাগজ পরাইল, তাহাতে কার্ব্বন পেপার চড়াইল, তারপর ছাপিতে শুরু করিয়া হঠাৎ থামিয়া ছেলেটির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। আশায় ও সাহসে ভর করিয়া ছেলেটি বলিল—বাবু আমার মাতৃ—

শৈলেন ইতিমধ্যে তাহার গোঁফের প্রান্তে পাক দিতেছে। বড় গোঁফের চাষ করিতেছে সে বেশী দিন না। উহার প্রতি তাহার যত্নের অন্ত নাই। সে পাক দেওয়া গুম্ফপ্রান্ত টানিয়া চোখের কোণ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—মাতৃদায়, শুনেছি।

—আজ্ঞে আপনারা—

—দয়া না করলে কী করে উদ্ধার হব, তাও শুনেছি। কেউ নেই বাবু, তাও শুনেছি।

বলিয়া শৈলেন গভীর মনোযোগ সহকারে দুইটি গুম্ফাগ্র টানিয়া নিরীক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া মেসিনে হাত লাগাইল ও বলিল—ওসব চালাকি এখানে চলবে না, পথ দেখ।

ছেলেটি কিছুক্ষণ পুনরায় খট্ খটাখট্ শুনিয়া সরিয়া গেল। আর কথা কহিবার সাহস তাহার আসিল না। একে একে সকলের টেবিলেই নিরাশ হইয়া সে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার বাহির হওয়াটাই বাকী। কিন্তু শুধু হাতে বাহির হইতে তাহার মন সরিল না। সে আবার শৈলেনের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—বাবু!

শৈলেন মুখ না তুলিয়া বলিল—ফের তুমি বিরক্ত করছ?

বড়বাবু কহিলেন—আপিসের মধ্যে ভিক্ষে করতে আসা, তোদের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। যা পালা।

কিন্তু সে গেল না। এক দৃষ্টিতে শূন্য পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

—তবু দাঁড়িয়ে আছে? আরে যা—, বলিতে বলিতে চোখ তুলিয়া সেই ম্লান মুখখানা দেখিয়া শৈলেনর মুখের তাড়না মুখেই বাধিয়া গেল। বলিল—এই, শোন।

ঈষৎ আগাইয়া আসিয়া ছেলেটি বলিল—আজ্ঞে?

—সত্যি সত্যি মা মরেছে তোর?

—কী বলছেন?

—বলছি, সত্যিই মা মরেছে না বুজরুকি?

চাদরে চোখ মুছিয়া সে উত্তর দিল—আজ্ঞে, আপনার কাছে বুজরুকি কী করব বাবু। বিশ্বাস না হয় তো চলুন আমার সঙ্গে। কেউ নেই বাবু দুটি ছোট ছোট ভাই বোন—

—বাড়ী কোথা তোর?

—আজ্ঞে বাড়ী? বাড়ী আমাদের আমতার উদিকে। ইষ্টিশন থেকে দু কোশ হবে।

—নাম কী? বাপ আছে?

—আজ্ঞে নাম? আমার নাম সাধন।

—বাপের নাম?

পঞ্চাননবাবু বলিলেন—আঃ, কী বাজে বকছ শৈলেন। বাপের নাম। ঠাকুরদার নাম—সাত পুরুষের কুটুম্বিতের খবর—হুঁঃ, তোমারও যেমন কাজ নেই। যত জোচ্চোর জুটেছে।

শৈলেন কিছু বলিবার পূর্ব্বে সাধনই জবাব দিল। চাদরের এক কোণ হাতে জড়াইতে জড়াইতে একবার বড়বাবুর একবার শৈলেনের প্রতি চাহিয়া বলিল—জুচ্চুরি নয় বাবু। আপনি দয়া করে যদি পায়ের ধূলো দেন তো দেখবেন আমাদের অবস্থা। বাবা কোথায় চলে গেছে অনেক দিন। মা বাবুদের বাড়ী কাজ করে সংসার চালাতো। আট দিন আগে বাসন ধুতে গিয়ে পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়েছিলো—কী করে চলবে বাবু যে বাজার পড়েছে—

গোঁফ পাকাইতে পাকাইতে শৈলেন ধমক দিল—বাজারের খবর আমরা খুব জানি। তোর নিজের খবর বল। বাপের নাম কী?

—আজ্ঞে বাপের নাম? বাপের নাম হরিদাস। দিন কিছু দয়া করে বাবু।

—হুঁ, তুই কাজ করিস না কেন?

—আজ্ঞে কাজ? কাজ করতুম বাবু, কারখানায়। হঠাৎ জবাব দিয়েছে। অনেক দূর যেতে হবে। ছোট বোনের অসুখ—

শৈলেন মণিব্যাগ খুলিয়া একটা আনি বাহির করিয়া বলিল—দেখ, ঠকাচ্ছিস না তো? মা তোর মরেছে সত্যিই তো। যদি কোনদিন মিথ্যে কথা বলে টের পাই তবে আর আস্ত রাখব না। মনে থাকে।

—আজ্ঞে না বাবু মিথ্যে কথা আমি বলছি না বাবু। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে যা।

আনিটি লইয়া যুক্তকরে শৈলেনকে নমস্কার করিয়া সাধন প্রস্থান করিল।

মিনিট তিনচার পরে বাহিরের বারান্দায় উচ্চ কণ্ঠের হুঙ্কার শুনিয়া বড়বাবু বলিলেন—কী হোলরে ওখানে? নিতাই বুঝি চীৎকার করছে? এখুনি সাহেব লাঞ্চ থেকে ফিরবে, ওটার কি একটা আক্কেল নেই। ডাক তো রে নিতাইকে।

নিতাইকে ডাকিতে হইল না। সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। একলা নয়, পিছনে মাতৃদায়গ্রস্ত সাধন। সাধনের গলার চাদর নিতাইয়ের বাম হাতে শক্ত করিয়া ধরা। টানিতে টানিতে সাধনকে লইয়া বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া নিতাই তাহার চাদর ছাড়িয়া নিজের দুই হাতের আদ্দির পাঞ্জাবির আস্তিন গুটাইতে শুরু করিল।

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন, কীহে হল কী?

সাধন প্রায় কান্নার সুরে কহিল—বাবু, আমি জোচ্চোর নই। চলুন দেখবেন আমাদের বাড়ীতে। পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আমার মা—

প্রচণ্ড ধমক দিয়া নিতাই তাহার কথা চাপিয়া দিল—চোপরাও, কের আবার মা? তুই মাসখানেক আগে কেন বলেছিলি তোর বাপ মারা গেছে, শ্রাদ্ধ করবার পয়সা নেই, ছোটবেলায় মরে গেছে? বলিসনি?

—আজ্ঞে, গেল মাসে? না বাবু আমি আর কোনো আসিনি আপনাদের আপিসে। সত্যি বলছি মা কালীর দিব্যি

—আবার দিব্যি গালা? দেব তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে ইয় চড়ে। চালাকি? নিতাই চড় উত্তোলন করিল।

সাধন বলিল—মারুন বাবু, আপনারা মা বাপ। কিন্তু স বলছি বাবু, আমি আর কখনো আসিনি।

—আর কখনো আসনি তুমি? আচ্ছা, তোর নাম কী?

—আজ্ঞে নাম? নাম আমার সাধন। বাড়ী আমতার কাছে ব

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—সে সব ঠিকুজি কুষ্ঠি ঘর সংসা পরিচয় শৈলেন নিয়েছে। ওতে আর কী বুঝবে?

—ওইতেই বুঝে নিয়েছি সার। প্রথম মুখ দেখেই সন্দে হয়েছিল চেনা চেনা। এখন কথা শুনে আর সন্দেহ নেই। ঠি এই বেটাই। এই যে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই, আজ্ঞে আমার নাম আজ্ঞে বাড়ী?' এই অভ্যেসটি সেবারও আমার কানে লেগেছিল বেটা তুমি আমার চেয়ে চালাক, নয়?

—আজ্ঞে না বাবু, আপনার চেয়ে চালাক নই।

—চোপ।

বাবুরা কেহ উঠিয়া আসিয়াছেন, কেহ নিজ আসন হইতে মন্তব্য ছুঁড়িতেছেন। শৈলেন এতক্ষণ নীরবে গোঁফ পাকাইত ছিল। বলিল—ঠিক মনে আছে তো হে নিতাই? এর কত ছেলে ভিক্ষে করছে আজকাল। তা ছাড়া বাপ-মরা মা-মর কিছু দুর্লভ নয়।

—না না, এই ছোঁড়াটাই এসেছিল। আমার বেশ ম আছে। আমি চার আনা পয়সা দিয়েছিলুম, আরও কার ব ঠেঁয়ে চেয়ে কিছু তুলে দিলুম। এসব ওদের tactics, অ জানি। বল বেটা, স্বীকার কর। স্বীকার করলে কিছু বলব নইলে পুলিশে দেব।

সন্দেহ ও বিশ্বাস দুই সংক্রামক মনোবৃত্তি। নিতাইয়ের সন্দে সংস্পর্শে আরও কয়েকজনের মনে সন্দেহ উপজাত হইল। বেয়ারা বলিল—ঠিক ঠিক বাবু, এই ছোঁড়াকে আমিও অ দেকেচি। হ্যাঁ, এই তো বটে, এই রকম কাচা গলায়।

পরিতোষবাবুরও স্মরণশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল। বলিলেন—আ কাছ থেকেও একবার আনা ছয়েক পয়সা নিয়ে গেছল ছোঁড়াই তো। শয়তান ছেলে। মুখখানা দেখছেন না।

পরিতোষবাবুর কাছ থেকে দুই আনা পয়সা আদায় করিয়

এত বড় ক্ষমতা সাধনের চৌদ্দপুরুষের আছে কিনা সন্দেহ। দানের কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই ছেলেটা যে শয়তান এবং ইহার মুখখানা দেখিলেই যে তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়, এ কথায় কেহ অবিশ্বাস করিল না। পাথুরে কয়লায় আগুন যেমন পরস্পরের সহযোগিতায় জ্বলিবার সুবিধা পায়, বাবুদের সন্দেহও তেমনি পরস্পরের সন্দেহের আনুকূল্যে দৃঢ়তর হইল।

প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত রায় হইল, এই ছেলেটি অনেকদিন হইতে এইরূপ মাতৃদায় পিতৃদায় বলিয়া ঠকাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে, ঠকাইতে কাহাকেও বাকী রাখে নাই। সকলের মুখপাত্রস্বরূপ নিতাই দ্বিগুণ উৎসাহে তাড়না করিল—কীহে বাপু, আর কতকাল মাতৃদায় পিতৃদায় চলবে? জবাব দে বেটা।

সাধন কহিল—আজ্ঞে—

জবাব চাহিলেও তাহাতে নিতাইয়ের প্রয়োজন নাই। সে কহিল—চোপরাও, ফের কথা? ঘুসিয়ে তোমার দাঁতের পাটি উড়িয়ে দেব, তুমি চেনো না আমায়। এখনো সত্যিকথা বলবি তো বল, নইলে নির্ঘাৎ মার খেয়ে মরবি। তারপর পুলিশে দিয়ে তোমার পরকালটি খেয়ে দেব।

গুম্ফচর্য্যা স্থগিত রাখিয়া শৈলেন বলিল—ওরে এই ছোঁড়া, সাধন না কী তোর নাম, সত্যি কথা বল না বাবা, কেন মার খেয়ে প্রাণটা যাবে, তারপর দেবে ঠেলে হাজতে।

সাধন কাঁদিতেছিল, কাঁদিতেই রহিল। কিন্তু কিছুতেই বলিল না যে মা তাহার মরে নাই। কোনো কথাই আর সে বলিল না। শুধু হাতের পিঠ দিয়া একটা চোখ অবিরাম রগড়াইতে লাগিল।

—ক্ষেপেছ তুমি! লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে কখনো। ওর অদেষ্টে আছে হাজতবাস। চল্ বেটা। বলিতে বলিতে সাধনকে টানিয়া লইয়া নিতাই বাহির হইল। বিনা পয়সার মজা দেখিবার লোভে পিছনে কয়েকজন চলিল।

মিনিট দশ পনের পরে নিতাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—Hopeless! তাহার অনুচরেরা সাহেবের ভয়ে ফটকের বাহিরে চোরানুগমন করিতে পারে নাই। নিতাই ঘরে পদার্পণ করিবামাত্র দুইদিক হইতে যুগপৎ প্রশ্ন উঠিল—কী করলে হে? কোন থানায় দিয়ে এলে?

জবাব না দিয়া নিতাই নিজের দুই করতল দেখিয়া বলিল—আসছি। ফিরিল ভিজা হাত রুমালে মুছিতে মুছিতে। একজন বলিল—কীরে বাবা, খুন করে এল নাকি?

—করাই উচিত ছিল। বলিয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া নিতাই বলিল—হাতটা ধুয়ে ফেল্লুম। বেটাদের কাপড় নয়তো এক একটা রোগের ডিপো। যত রাজ্যের বীজাণু বিজ্ বিজ্ করছে।

শৈলেন বলিল—ধুয়েছ বেশ করেছ। কিন্তু হাত ধুলেই কি নিস্তার পাবে? The multitudinous seas incarnadine. যাক, তোমার ফল কী হোলো বল সাধনসমরের।

উত্তরে নিতাই যাহা বলিল সংক্ষেপে তাহা এই: বাহিরে গিয়া তাহার চোর ধরার সমস্যা চোরের ধরা পড়ার সমস্যা হইতে প্রবল হয়। সত্যই সাধনকে লইয়া থানায় যাইবে, এমন নির্ব্বোধ সে নয়। বাঘে ছুঁইলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁইলে আঠারশো। সে মতলব নিতাইয়ের ছিল না। কিছু ধমক ধামকে ও পুলিশের ভয়ে ছেলেটা অপরাধ স্বীকার করিবে, এই আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে আশা সাধন পূর্ণ করে নাই। অবশেষে নিতাই তাহাকে গোটা-কতক চড় চাপড় ও প্রচণ্ড ধমক দিয়া, ভবিষ্যতে পুলিশের ভয় দেখাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

অতঃপর অল্পক্ষণ সাধনতত্ত্ব আলোচিত হইল এবং ক্রমে এ তত্ত্বের অবসান ঘটিয়া আলাপের স্রোত মোড় ফিরিয়া ছোট সাহেব, বোনাস, কাপড়ের দর, সানফ্রান্সিস্কো, মেয়ের বিবাহ, রুজভেল্ট ইত্যাদির অভ্যস্ত খাতে বহিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে শৈলেন মেশিন ছাড়িয়া গোঁফে হাত লাগাইয়া বলিল—আমি ভাবছি, কী ভাবছি জান?

কেহই জানিত না তাহা বোঝা গেল। শৈলেন বলিল—আমি ভাবছি কেন, ও'র মা কি মরতে পারে না?

তখন কথা হইতেছিল চিয়াংকাইসেকের। তাহার মায়ের মৃত্যুর কথা উঠিল কেন, কেহ বুঝিল না।

—ধর যদি সত্যি ও'র মা মরে থাকে, নিতাইয়েরই যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে? তাহলে এ্যাটুকু ছেলে, মাতৃদায়ে ভিক্ষে চেয়েছে এই অপরাধে তা'র চোরের শাস্তি হোলো তো? অথচ সে প্রমাণ দিতে চাচ্ছে, সঙ্গে যেতে বলছে, আর কী কত্তে পারে সে?

শুনিয়া নিতাই দুই একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, —না, না আমার বেশ মনে পড়ছে এই ছোঁড়াই। মুখ চোখ কথা কইবার ধরণ সব—

শৈলেন বলিল—খুবই সম্ভব তোমার ভুল হয় নি। কিন্তু সত্যি একবার মা তা'র মরবে তো। এবার সেই সত্যি মরাটা হতেও তো পারে।

—সে তর্কের খাতিরে সবই হতে পারে। বলিয়া নিতাই গম্ভীর হইয়া কাজে মন দিল। মন লাগিল না। বেহারাকে সিগারেট ও পান আনিতে দিয়া সে নিমীলিত চোখে চেয়ারের পিঠে ঘাড় ঠেকাইয়া ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া রহিল।

মনস্থির করিবার জন্যই সিগারেট আনিতে দিয়াছিল। কিন্তু

দৈবপ্রতিকূল। মধু বেয়ারা পান সিগারেট টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—বসে বসে কাঁদছে বাবু।

অন্যমনস্ক নিতাই জিজ্ঞাসা করিল—কোন বাবু?

মধু বলিল—বাবু নয় সেই ছোঁড়াটা। যাকে টেনে নিয়ে গেলেন।

—কোথায়? নিতাই সোজা হইয়া বসিল।

—ঐ ও মোড়ের পানওলার দোকানের পাশে বসে।

—কাঁদুকগে। তুই তোর কাজে যা। নিতাই ফাইল খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে ইনভয়েস পড়িতে লাগিল। একঘণ্টা আগে ঐ সামান্য মার খাইয়াছে, কান্না আসিবারই কথা নয়। আর যদি বা আসে এতক্ষণেও তার শেষ হয় না. শয়তানির প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কী হইতে পারে।

ঘণ্টা কয়েক পরের কথা।

তখন বৈশাখের শেষ। সারাদিনের নিদারুণ গরমের পর সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিত ঝড় উঠিল। ক্ষণপরে সব তাপ ও জ্বালা জুড়াইয়া বহুপ্রত্যাশিত বৃষ্টি নামিল। ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিবার শব্দের সহিত পথের ত্রস্ত পথিকের দ্রুত ধাবনের শব্দ মিশিল এবং এই সকল শব্দ ছাপাইয়া শিশুকণ্ঠে আবাহন সঙ্গীত উঠিল—আয় বিষ্টি ঝেঁপে—

এই ঝড় জলের মধ্যে, কলিকাতায় এক গৃহস্থ বাড়ীতে গৃহস্থ ও তাহার গৃহিণীর মধ্যে প্রবল বচসা হইল। বচসার সকল কথা গোড়া হইতে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই. কেবল শেষের কথাগুলি বলিলেই চলিবে।

গৃহিণী বলিলেন—এমন গোঁয়ার গোবিন্দ লোকের হাতেও পড়েছিলুম গা। পরের ছেলেকে মেরে ধরে, একী বীরত্ব। যত রাজ্যের লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে ঘরে আনা। তুমি কি মানুষ, না চামার? আহা মা মরা গরীব—

গৃহস্থ জবাব দিলেন—মা-মরা না হাতী! তুমি থামো। তোমাদের কাছে কোনো গল্প করাই ঝকমারি। যা জানো না তাতে কথা কইতে এস না। অমন ঢের মা মরা দেখেছি। রোজ ওদের একটা করে মা মরছে রোজ একটা করে বাপ মরছে।

সিগারেট ধরাইয়া গৃহস্থ গুম্ হইয়া বসিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—পথের ধারে অপরিচিত একটি ছেলে বসিয়া কাঁদিতেছে। ছেঁড়া ময়লা চাদরে চোখ মুছিতেছে। পথ দিয়া লোকের পর লোকের আনাগোনারও বিরাম নাই, ছেলেটার কান্নারও ছেদ নাই। কেহ ফিরিয়াও দেখিতেছে না।

কঠিন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গৃহস্থ বলিল,—ও সব বুজরুকি আমি একদিনে চিট্ করে দিতে পারি। কান্না! আর একদিন পড়ুক আমার হাতে, কান্না কাকে বলে দেখিয়ে দি।

সেই সময়ে কলিকাতার বাহিরে এক অখ্যাত গ্রামে এক চালা-ভাঙ্গা জীর্ণ মাটির ঘরে একটি ছেলে ভাত খাইতে বসিয়াছে। তাহার বাম পাশে একটি বছর চারেকের মেয়ে শুইয়া একটানা কান্নার সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে, গানের একটি মাত্র কলি—আঁমি ভাঁত খাঁবো ও ও। দক্ষিণে আর একটি শিশু, সাত আট বছরের বালক—বসিয়া বর্ণপরিচয়ের কয়েকখানা ছেঁড়া পাতা হাতে লইয়া দাদার মুখের পানে চাহিয়া আছে। দাদা সারাদিনের কাহিনী সত্য মিথ্যা মিশাইয়া, দুঃখের অংশ বাদ দিয়া, রঙ চড়াইয়া বলিয়া যাইতেছে, পথের বর্ণনা করিতেছে, পাহারাওলার হুঙ্কার, ফেরিওলার ডাক নকল করিয়া দেখাইতেছে। বর্ণপরিচয়ের মাধুর্য্য অপেক্ষা এই সব কথা অনেক মধুর লাগিতেছে।

বাহিরে বৃষ্টি বাড়িয়া উঠিল। ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে জলধারাও বাড়িল। লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতে লাগিল। কখন এক সময়ে রুগ্ন ছোট বোনটি একঘেয়ে কান্না ভুলিয়া দাদার গল্প শুনিতে শুনিতে হাসিতে শুরু করিয়াছে। এই দুইজন শিশু শ্রোতা ব্যতীত আরও একজন গল্প শুনিতেছিল। মলিন ক্ষীণ আলোতে, মলিন জীর্ণ বিছানার সহিত তাহার মলিন শীর্ণ দেহ এমন মিশাইয়া আছে, যে আছে কি না তাহা বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তবে দৃষ্টির গোচরে আসে।

হঠাৎ আহার ও গল্প থামাইয়া ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—পায়ের ব্যথাটা তোমার কেমন আছে মা এবেলা?

মা বলিল,—ভালই আছে, তুই খা।

—তুমি ভাবছ তোমার সেধোটা কী পেটুক। খেয়ে দেয়ে পেটটি ঠাণ্ডা করে তবে মায়ের খবর জিজ্ঞেস করবার সময় হল ছেলের। ধন্যি ছেলে যাহোক।

মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা, কী খেলি বাবা। ভাত কম হল তোর।

সাধন জিজ্ঞাসা করিল—তুমি? তুমি কী খেলে মা আজ? ভাত কম হবে বলে খাওনি বুঝি?

মায়ের আগেই খোকা জবাব দিল—মা আজ ভাত খায়নি গো।

সাধনের মা কহিল—তুই থাম।

তুমি খেয়েছ ভাত?

—ভাত খাব কী করে? গায়ে যে জ্বরের মতন হয়েছে যে আজ। ভাত খেলে কি রক্ষে থাকতো।

সাধন বিশ্বাস করিল না। বলিল,—হ্যাঁ, জ্বরের মতন হয়েছে, ও সব চালাকি আমি জানি না, না? যেদিনই ঘরে চাল থাকে না সেইদিনই তোমার জ্বর হয়। আচ্ছা বেশ, আমারও জ্বর হয়েছে, আর ভাত খাব না; এই রইল—

অন্নলুব্ধা ছোট বোন বলিল—আমি খাব,ঐ ভাতগুলো আমার।

সাধনের মা বলিল—সত্যি রে, দেখ গায়ে হাত দিয়ে দেখ,—গা গরম কি না।

সাধন বাম হাত দিয়া মায়ের কপাল বুক স্পর্শ করিয়া দেখিয়া বলিল—কেন? জ্বর হল কেন? কেবল তোমার জ্বর কেন হবে?

রাত্রি অধিক হইল। সাধনের মা ছোট মেয়েটাকে ভুলাইয়া বার্লির জল খাওয়াইয়া নিজের শয্যায় ঘুম পাড়াইতে লাগিল। ছোট খোকা বর্ণপরিচয়ের পাতা মুঠায় ধরিয়া দাদার বিছানার এক পাশে ঘুমাইতেছে। তাহার ভাব মায়ের চেয়ে দাদার সঙ্গেই বেশী।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। বাহিরে সঙ্কীর্ণ দাওয়ার উপর বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন সাধন বহুক্ষণ পরে হাতের বিঁড়িতে টান দিয়া ধোঁয়া না পাইয়া সেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আরও কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া সে যখন ঘরে আসিল তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তেল অভাবে লণ্ঠনের শিখা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে।

সেই প্রায়-অন্ধকার ঘরে অতি সন্তর্পণে সাধন মায়ের কপালে হাত রাখিল। কপাল যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সেই স্পর্শে মা চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে? সাধু? কী হয়েছে?

সাধন জবাব দিল না। মা তাহার মনের কথা বুঝিয়া বলিল—কিছু হয়নি আমার, কালই জ্বর ছেড়ে যাবে। তুই ঘুমো সাধু। তোকে আবার সকালেই বেরোতে হবে কারখানায়। আর রাত করিসনি বাবা, শুয়ে পড়।

সাধন বলিতে পারিল না যে তাহার কারখানার চাকরী আর নাই। নীরবে আসিয়া সে শয্যা লইল।

এক সপ্তাহ পরের কথা। এক অপরাহ্নে নিতাই লালদিঘীর ধারে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পিছন হইতে একটি ভীত মৃদু ডাক কানে আসিল—বাবু, কিছু সাহায্য করবেন।

নিতাই ফিরিয়া দাঁড়াইল। ছিন্ন মলিন কাপড়পরা, খালি গা, খালি পা, বছর চৌদ্দ পনেরর একটি ছেলে, মাথায় বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল, বলিতেছে—দয়া করে যদি—

কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভিক্ষুকের প্রার্থনা বন্ধ হইয়া গেল। সে বলিল—বাবু, আপনি!

নিতাই বলিল—তোর নাম সাধন, না?

কয়েক মুহূর্ত্ত সাধন ইতস্ততঃ করিল। সে পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছে বুঝিয়া নিতাই তাহার হাতখানি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু ধরিতে পারিল না। তৎপূর্ব্বেই সাধন দুইটি হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, আমার মা—

উদ্গত ক্রন্দনের আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কণ্ঠের বাষ্প দমন করিবার চেষ্টায় সে চুপ করিল, কিন্তু চোখ জলে ভরিয়া গেল। নিতাই পুনরায় হাত বাড়াইল এবং তাহার রুক্ষ চুলের—মুঠি ধরিল না—চুলের উপর হাত বুলাইয়া মিষ্ট স্বরে বলিল—জানি জানি, বলতে হবে না আর। কী করবি বল বাবা, মা কি কারও চিরকাল থাকে। কাঁদিসনে—

এই অপ্রত্যাশিত অচিন্তনীয় সহানুভূতিতে সাধন বিস্মিত হইল, কিন্তু কান্না তাহার বাড়িল। নিতাই বলিল—এমনি হয় রে বাবা, এমনি হয়। আমার যখন মা মারা যায় আমি তোর চেয়ে ছোট। থাক সে কথা। বলিতে বলিতে নিতাই পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিল।—তোকে কদিনই খুঁজছি! কিছু মনে করিসনে বাবা সেদিনের—

তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর দিল না সাধন, হঠাৎ নীচু হইয়া নিতাইয়ের পা ছুঁইয়া বলিল—বাবু, আপনি বেরাহ্মণ, আমাকে মাপ করুন বাবু। বলুন আমার মা ভালো হয়ে উঠবে মায়ের অসুখ সেরে যাবে বলুন বাবু—

এবার বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইবার পালা নিতাইয়ের। সাধন বলিয়া চলিল—আপনি সেদিন শাপ দিলেন, তাই সেইদিন থেকেই মা'র অসুখ করল। রোজই অসুখ বাড়ছে। আজ বাড়ীউলি পিসি বল্লে, তোর মা আর—

কান্নায় সাধনের কথা আবার বন্ধ হইয়া গেল। নিতাইয়ের মনে পড়িল সেদিন সাধনকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিয়াছিল, আমি বামুন, এই দেখ পৈতে, মিথ্যে কথা স্বীকার কর। নইলে তোর মা যদি বেঁচে থাকে সত্যিই মরে যাবে দেখিস।

মণিব্যাগ বন্ধ করিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়া নিতাই বলিল—মা তোর মারা যায়নি। মিছে কথাই বলেছিলি তাহলে? হুঁ।

রোরুদ্যমান সাধন বলিল—আর কখনো বলব না বাবু, আপনার শাপ ফিরিয়ে নিন, পায়ে পড়ি আপনার। বলুন আমার মা ভালো হয়ে যাবে। আমাদের আর কেউ—

সেই সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল। ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টি সাধনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বিনা বাক্যে নিতাই ট্রামে উঠিয়া বসিল।

অপ্রার্থিত সহানুভূতি, প্রার্থিত আশীর্ব্বাদ ও তাহার সহিত প্রত্যাশিত অর্থসাহায্য, তিনই সাধনের সত্যভাষণের উত্তাপে উবিয়া গেল। বিমূঢ় সাধন অশ্রুবাষ্পের মধ্য দিয়া চলন্ত ট্রাম গাড়ীর পিছনে চাহিয়া রহিল। গাড়ীর ভিতরে নিতাই বলিল—শয়তান, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর কোথাকার!

দৈবপ্রতিকূল। মধু বেয়ারা পান সিগারেট টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—বসে বসে কাঁদছে বাবু।

অন্যমনস্ক নিতাই জিজ্ঞাসা করিল—কোন বাবু?

মধু বলিল—বাবু নয় সেই ছোঁড়াটা। যাকে টেনে নিয়ে গেলেন।

—কোথায়? নিতাই সোজা হইয়া বসিল।

—ঐ ও মোড়ের পানওলার দোকানের পাশে বসে।

—কাঁদুকগে। তুই তোর কাজে যা। নিতাই ফাইল খুলিয়া নির্বিষ্টচিত্তে ইন্‌ভয়েস পড়িতে লাগিল। একঘণ্টা আগে ঐ সামান্য মার খাইয়াছে, কান্না আসিবারই কথা নয়। আর যদি বা আসে এতক্ষণেও তার শেষ হয় না. শয়তানির প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কী হইতে পারে।

ঘণ্টা কয়েক পরের কথা।

তখন বৈশাখের শেষ। সারাদিনের নিদারুণ গরমের পর সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিত ঝড় উঠিল। ক্ষণপরে সব তাপ ও জ্বালা জুড়াইয়া বহুপ্রত্যাশিত বৃষ্টি নামিল। ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিবার শব্দের সহিত পথের ত্রস্ত পথিকের দ্রুত ধাবনের শব্দ মিশিল এবং এই সকল শব্দ ছাপাইয়া শিশুকণ্ঠে আবাহন সঙ্গীত উঠিল—আয় বিষ্টি ঝেঁপে—

এই ঝড় জলের মধ্যে. কলিকাতায় এক গৃহস্থ বাড়ীতে গৃহস্থ ও তাহার গৃহিণীর মধ্যে প্রবল বচসা হইল। বচসার সকল কথা গোড়া হইতে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই. কেবল শেষের কথাগুলি বলিলেই চলিবে।

গৃহিণী বলিলেন—এমন গোঁয়ার গোবিন্দ লোকের হাতেও পড়েছিলুম গা। পরের ছেলেকে মেরে ধরে, একী বীরত্ব। যত রাজ্যের লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে ঘরে আনা। তুমি কি মানুষ, না চামার? আহা মা মরা গরীব—

গৃহস্থ জবাব দিলেন—মা-মরা না হাতী! তুমি থামো। তোমাদের কাছে কোনো গল্প করাই ঝকমারি। যা জানো না তাতে কথা কইতে এস না। অমন ঢের মা মরা দেখেছি। রোজ ওদের একটা করে মা মরছে রোজ একটা করে বাপ মরছে।

সিগারেট ধরাইয়া গৃহস্থ গুম্ হইয়া বসিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—পথের ধারে অপরিচিত একটি ছেলে বসিয়া কাঁদিতেছে। ছেঁড়া ময়লা চাদরে চোখ মুছিতেছে। পথ দিয়া লোকের পর লোকের আনাগোনারও বিরাম নাই, ছেলেটার কান্নারও ছেদ নাই। কেহ ফিরিয়াও দেখিতেছে না।

কঠিন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গৃহস্থ বলিল,—ও সব বুজরুকি আমি একদিনে ঢিট্ করে দিতে পারি। কান্না! আর একদিন পড়ুক আমার হাতে, কান্না কাকে বলে দেখিয়ে দি।

সেই সময়ে কলিকাতার বাহিরে এক অখ্যাত গ্রামে এক চালা-ভাঙ্গা জীর্ণ মাটির ঘরে একটি ছেলে ভাত খাইতে বসিয়াছে। তাহার বাম পাশে একটি বছর চারেকের মেয়ে শুইয়া একটানা কান্নার সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে, গানের একটি মাত্র কলি—আমি ভাঁত খাঁবো ও ও। দক্ষিণে আর একটি শিশু, সাত আট বছরের বালক—বসিয়া বর্ণপরিচয়ের কয়েকখানা ছেঁড়া পাতা হাতে লইয়া দাদার মুখের পানে চাহিয়া আছে। দাদা সারাদিনের কাহিনী সত্য মিথ্যা মিশাইয়া, দুঃখের অংশ বাদ দিয়া, রঙ চড়াইয়া বলিয়া যাইতেছে, পথের বর্ণনা করিতেছে, পাহারাওলার হুঙ্কার, ফেরিওলার ডাক নকল করিয়া দেখাইতেছে। বর্ণপরিচয়ের মাধুর্য্য অপেক্ষা এই সব কথা অনেক মধুর লাগিতেছে।

বাহিরে বৃষ্টি বাড়িয়া উঠিল। ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে জলধারাও বাড়িল। লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতে লাগিল। কখন এক সময়ে রুগ্ন ছোট বোনটি একঘেয়ে কান্না ভুলিয়া দাদার গল্প শুনিতে শুনিতে হাসিতে শুরু করিয়াছে। এই দুইজন শিশু শ্রোতা ব্যতীত আরও একজন গল্প শুনিতেছিল। মলিন ক্ষীণ আলোতে, মলিন জীর্ণ বিছানার সহিত তাহার মলিন শীর্ণ দেহ এমন মিশাইয়া আছে, যে আছে কি না তাহা বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তবে দৃষ্টির গোচরে আসে।

হঠাৎ আহার ও গল্প থামাইয়া ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—পায়ের ব্যথাটা তোমার কেমন আছে মা এবেলা?

মা বলিল,—ভালই আছে, তুই খা।

—তুমি ভাবছ তোমার সেধোটা কী পেটুক। খেয়ে দেয়ে পেটটি ঠাণ্ডা করে তবে মায়ের খবর জিজ্ঞেস করবার সময় হল ছেলের। ধন্যি ছেলে যাহোক।

মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—আহা, কী খেলি বাবা। ভাত কম হল তোর।

সাধন জিজ্ঞাসা করিল—তুমি? তুমি কী খেলে মা আজ? ভাত কম হবে বলে খাওনি বুঝি?

মায়ের আগেই খোকা জবাব দিল—মা আজ ভাত খায়নি গো।

সাধনের মা কহিল—তুই থাম।

তুমি খেয়েছ ভাত?

—ভাত খাব কী করে? গায়ে যে জ্বরের মতন হয়েছে যে আজ। ভাত খেলে কি রক্ষে থাকতো।

সাধন বিশ্বাস করিল না। বলিল,—হ্যাঁ, জ্বরের মতন হয়েছে, ও সব চালাকি আমি জানি না, না? যেদিনই ঘরে চাল থাকে না সেইদিনই তোমার জ্বর হয়। আচ্ছা বেশ, আমারও জ্বর হয়েছে, আর ভাত খাব না; এই রইল—

অরলুবা ছোট বোন বলিল—আমি খাব,ঐ ভাতগুনো আমার।

সাধনের মা বলিল—সত্যি রে, দেখ গায়ে হাত দিয়ে দেখ,—গা গরম কি না।

সাধন বাম হাত দিয়া মায়ের কপাল বুক স্পর্শ করিয়া দেখিয়া বলিল—কেন? জ্বর হল কেন? কেবল তোমার জ্বর কেন হবে?

রাত্রি অধিক হইল। সাধনের মা ছোট মেয়েটাকে ভুলাইয়া বার্লির জল খাওয়াইয়া নিজের শয্যায় ঘুম পাড়াইতে লাগিল। ছোট খোকা বর্ণপরিচয়ের পাতা মুঠায় ধরিয়া দাদার বিছানার এক পাশে ঘুমাইতেছে। তাহার ভাব মায়ের চেয়ে দাদার সঙ্গেই বেশী।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। বাহিরে সঙ্কীর্ণ দাওয়ার উপর বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন সাধন বহুক্ষণ পরে হাতের বিড়িতে টান দিয়া ধোঁয়া না পাইয়া সেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আরও কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া সে যখন ঘরে আসিল তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তেল অভাবে লণ্ঠনের শিখা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে।

সেই প্রায়-অন্ধকার ঘরে অতি সন্তর্পণে সাধন মায়ের কপালে হাত রাখিল। কপাল যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সেই স্পর্শে মা চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে? সাধু? কী হয়েছে?

সাধন জবাব দিল না। মা তাহার মনের কথা বুঝিয়া বলিল—কিছু হয়নি আমার, কালই জ্বর ছেড়ে যাবে। তুই ঘুমো সাধু। তোকে আবার সকালেই বেরোতে হবে কারখানায়। আর রাত করিসনি বাবা, শুয়ে পড়।

সাধন বলিতে পারিল না যে তাহার কারখানার চাকরী আর নাই। নীরবে আসিয়া সে শয্যা লইল।

এক সপ্তাহ পরের কথা। এক অপরাহ্নে নিতাই লালদিঘীর ধারে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পিছন হইতে একটি ভীত মৃদু ডাক কানে আসিল—বাবু, কিছু সাহায্য করবেন।

নিতাই ফিরিয়া দাঁড়াইল। ছিন্ন মলিন কাপড়পরা, খালি গা, খালি পা, বছর চৌদ্দ পনেরর একটি ছেলে, মাথায় বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল, বলিতেছে—দয়া করে যদি—

কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভিক্ষুকের প্রার্থনা বন্ধ হইয়া গেল। সে বলিল—বাবু, আপনি!

নিতাই বলিল—তোর নাম সাধন, না?

কয়েক মুহূর্ত্ত সাধন ইতস্ততঃ করিল। সে পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছে বুঝিয়া নিতাই তাহার হাতখানি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু ধরিতে পারিল না। তৎপূর্ব্বেই সাধন দুইটি হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, আমার মা—

উদ্গত ক্রন্দনের আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কণ্ঠের বাষ্প দমন করিবার চেষ্টায় সে চুপ করিল, কিন্তু চোখ জলে ভরিয়া গেল। নিতাই পুনরায় হাত বাড়াইল এবং তাহার রুক্ষ চুলের—মুঠি ধরিল না—চুলের উপর হাত বুলাইয়া মিষ্ট স্বরে বলিল—জানি জানি, বলতে হবে না আর। কী করবি বল বাবা, মা কি কারও চিরকাল থাকে। কাঁদিসনে—

এই অপ্রত্যাশিত অচিন্তনীয় সহানুভূতিতে সাধন বিস্মিত হইল, কিন্তু কান্না তাহার বাড়িল। নিতাই বলিল—এমনি হয় রে বাবা, এমনি হয়। আমার যখন মা মারা যায় আমি তোর চেয়ে ছোট। থাক সে কথা। বলিতে বলিতে নিতাই পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিল।—তোকে কদিনই খুঁজছি! কিছু মনে করিসনে বাবা, সেদিনের—

তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর দিল না সাধন, হঠাৎ নীচু হইয়া নিতাইয়ের পা ছুঁইয়া বলিল—বাবু, আপনি বেরাহ্মণ, আমাকে মাপ করুন বাবু। বলুন আমার মা ভালো হয়ে উঠবে মায়ের অসুখ সেরে যাবে বলুন বাবু—

এবার বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইবার পালা নিতাইয়ের। সাধন বলিয়া চলিল—আপনি সেদিন শাপ দিলেন, তাই সেইদিন থেকেই মা'র অসুখ করল। রোজই অসুখ বাড়ছে। আজ বাড়ীউলি পিসি বল্লে, তোর মা আর—

কান্নায় সাধনের কথা আবার বন্ধ হইয়া গেল। নিতাইয়ের মনে পড়িল সেদিন সাধনকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিয়াছিল, আমি বামুন, এই দেখ পৈতে, মিথ্যে কথা স্বীকার কর। নইলে তোর মা যদি বেঁচে থাকে সত্যিই মরে যাবে দেখিস।

মণিব্যাগ বন্ধ করিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়া নিতাই বলিল—মা তোর মারা যায়নি। মিছে কথাই বলেছিলি তাহলে? হুঁ।

রোরুদ্যমান সাধন বলিল—আর কখনো বলব না বাবু, আপনার শাপ ফিরিয়ে নিন, পায়ে পড়ি আপনার। বলুন আমার মা ভালো হয়ে যাবে। আমাদের আর কেউ—

সেই সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল। ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টি সাধনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বিনা বাক্যে নিতাই ট্রামে উঠিয়া বসিল।

অপ্রার্থিত সহানুভূতি, প্রার্থিত আশীর্ব্বাদ ও তাহার সহিত প্রত্যাশিত অর্থসাহায্য, তিনই সাধনের সত্যভাষণের উত্তাপে উবিয়া গেল। বিমূঢ় সাধন অশ্রুবাষ্পের মধ্য দিয়া চলন্ত ট্রাম গাড়ীর পিছনে চাহিয়া রহিল। গাড়ীর ভিতরে নিতাই বলিল—শয়তান, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর কোথাকার!

অর্থই অনর্থের মূল

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

স্বর্ণমান (ক)

বাল্যকালের একটা কথা মনে পড়ে। বাড়ীর আত্মীয়বর্গের মধ্যে যখন কথোপকথন হতো, তখন প্রায়ই তাঁরা বলতেন যে গবর্ণমেন্টের নাকি অর্থের বড় টানাটানি, তাই গবর্ণমেন্ট নূতন লোকও সহজে চাকরিতে বহাল করতে চান না ; উপরন্তু যারা সরকারের স্থায়ী কর্মচারী, তাদের বেতনও যাতে কমান যায় সেই চেষ্টাই চলছে। এমন কি অর্থের সঙ্কুলান না করতে পেরে সরকার মাঝে মাঝে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। অর্থাভাবে দেশের কলকারখানাগুলি বন্ধ হবার যোগাড় হচ্ছে, কাজেই বেকার সমস্যাও নাকি দিনের পর দিন হুহু করে বেড়েই চলেছে।

শুনে, ব্যাপারটিকে অনেকটা রূপকথার মত আজগুবি মনে হতো এবং অভিভাবকদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে কখন কখন সন্দেহও যে না হতো—তাও নয়। সুলভ কাগজের উপর যত টাকার ছাপ মারা যায়, সেটা যখন তত টাকার নোটেই পরিণত হয় এবং সেই ছাপ মারার যন্ত্রটি যখন অহরহ গবর্ণমেন্টের কাছেই থাকে, তখন তার আবার যে টাকার অভাব কি করে হতে পারে, এ তত্ত্বটি অভিভাবকদের উপর অগাধ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। বালকের এই চিরস্বাভাবিক প্রশ্নের জবাবই হলো আমাদের আজকের এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

দেশের অর্থ বাড়লেই যে দেশের দারিদ্র্য ঘোচে না, এ আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখেছি। দেশের টাকা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যাদির মূল্যই সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, দেশের সম্পদ তাতে একটুও বাড়ে না। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণের মতো সরকারের খরচও বৃদ্ধি পায়, কাজেই অতিরিক্ত মুদ্রা বা নোট বার করে তাঁর যে লাভ হলো, তাতে তাঁর অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না ; লাভ ও খরচ দুইই বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্ণমেন্টের অবস্থা পূর্ব্ববৎই রয়ে গেল। তা ছাড়া, দাম একবার বাড়তে আরম্ভ করলে সে ক্রমাগত বাড়তেই থাকে—কারণ আগত দিনের মূল্যবৃদ্ধির আশায় দ্রব্য বিক্রেতাগণ পূর্ব্বদিনই পরদিনের মূল্য (To-morrow's price) চাহিয়া বসে। সরকারী বাজেটে আরো ঘাটতি পড়ে, সরকার অর্থবৃদ্ধি করতে আরও তৎপর হয়। কাজেই দেশের দারিদ্র্য ঘোচাতে হলে টাকা বাড়ালে কিছুই হবে না, বাড়াতে হবে দেশের সম্পদকে। অর্থ ও ঐশ্বর্য্য এই দুইটি জিনিষের পার্থক্য আমাদের ভাল ভাবে বুঝতে হবে। অর্থ সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য নয়, কিন্তু অর্থ ঐশ্বর্য্যের প্রতিভূ (representative)। আমার যত অর্থ আছে, আমি দেশের ততখানি সম্পদের অধিকারী। আমার টাকা বাড়লো অর্থে বোঝায়, দেশের আরো বেশী সম্পদের উপর আমার অধিকার জন্মলো রামের চেয়ে আমার অর্থ বেশী মানে—রামের চেয়ে বেশী সম্পদ উপভোগ করবার অধিকার আছে। তবে এর মধ্যে আর একটা কথা আছে যদি আমার টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে দেশের দ্রব্যাদির মূল্যও বেড়ে থাকে, তবে আমার বেশী টাকা সত্ত্বেও আমি পূর্ব্ববৎ সম্পদের অধিকারীই রয়ে যাব। অর্থাৎ আমার অর্থ বাড়লো বটে, কিন্তু তবুও আমি বড়লোক হলাম না। অর্থশাস্ত্রে এই সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য (wealth) বলতে অনেক কিছুই বোঝায়, এমন কি দেশের জনসাধারণের কর্ম্মদক্ষতা ও মানসিক বিকাশও দেশের সম্পদের পর্য্যায়ভুক্ত। তবে সম্পদ বৃদ্ধির মূল ভিত্তিই হলো দেশের কৃষি, খনিজ ও শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার লাভ করা।

দেশে টাকা চলে শুধু বিশ্বাসের উপর। প্রত্যেকেই জানে যে তার টাকা নিতে কেউ অসম্মতি প্রকাশ করে না, যখন খুসী টাকা দিয়ে লোকের কাছ থেকে জিনিষপত্র কেনা বা তাদের ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। টাকা থাকলেই অন্তত দৈহিক সুখ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না, টাকার উপরে এ বিশ্বাস আমাদের আছে—তাই "ফেলো কড়ি, মাখো তেল," প্রবাদ বাক্যটি একদিক থেকে খুবই সত্য। টাকার উপরে বিশ্বাস থাকার অর্থই হলো, যে বা যার আদেশে এই টাকা মুদ্রিত হয়ে বের হয় তার উপরে বিশ্বাস থাকা। টাকার এই সৃষ্টি কর্ত্তা দেশের খোদ গভর্ণমেন্টও হতে পারে, অথবা তার সংস্পর্শিত এবং অনুমোদিত কোন বিশ্বাসী ব্যাঙ্কও হতে পারে। টাকার উপরে বিশ্বাস আমাদের এনে দিতে হয় না, জন্ম অবধি দেখে দেখে বিশ্বাস আমাদের আপনিই এসে পড়ে। সরকারের আরো দশটা নিয়ম-কানুন যেমন আমরা নির্ব্বিবাদে ও নিঃসন্দেহে মেনে নিয়ে থাকি, টাকার অসীম ক্ষমতাকেও আমরা তেমনিই চোখ বুঁজে স্বীকার করে নি—একবার প্রশ্নও করি না যে এর মূলে শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু আছে কিনা। দেশের গবর্ণমেন্টের উপর যতদিন বিশ্বাস থাকে, টাকার উপর আস্থাও ততদিন অটল, কিন্তু যেদিন সরকারের স্থায়িত্ব বা তার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তার উপর বিশ্বাস হারাতে থাকি, টাকার উপর আস্থাও সেদিন থেকে আমাদের কমতে থাকে, সেদিন আমরা বুঝতে পারি টাকাটা স্রেফ একটা ধোঁকাবাজি, শুধু মাত্র একটা অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এতদিন তাকে দেবতার সমতুল্য উচ্চ আসন দিয়ে এসেছি। তাই সেদিন মেকী ছেড়ে খাঁটির দিকে নজর পড়ে বেশী, আমরা টাকার দ্বারা যে সম্পদের অধিকারী, সেই সম্পদ আহরণ করতে সেদিন ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেদিন টাকার উপস্থিতি আমাদের শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আনে, তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তাকে হাত ছাড়া করতে আমরা ব্যস্ত ; তার

পরিবর্ত্তে যত কিছু দ্রব্য সামগ্রী ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ করে রাখা যায়, সেদিকেই মানুষের নজর পড়ে বেশী। দুর্দ্দিনের ভিতর দিয়েই টাকার আসল রূপটি ধরা পড়ে।

সোনার উপর মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ, মানুষ সোনাকে ভালবেসে থাকে। কিন্তু এ ভালবাসা তার অন্ধ বিশ্বাস নয়, সোনার নিজস্বও কতকগুলি গুণ আছে। এই ধাতুটি খুবই শক্ত, সহজে এর ক্ষয় নেই; দেখতে শুনতেও এ মন্দ নয়, কাজেই লোকে অলঙ্কার তৈরী করে এর দ্বারা অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে থাকে। অন্যান্য অনেক দ্রব্য প্রস্তুতের সময়েও স্বর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সর্ব্বোপরি এ ধাতুটি যেখানে সেখানে বহুল পরিমাণে না পাওয়ায় এ একটি দুর্লভ সামগ্রী বলে গণ্য, কাজেই এর মূল্যও অধিক। সামান্য পরিমাণ স্বর্ণের মধ্যে বহুল পরিমাণ মূল্য সঞ্চিত থাকায় (Store of value)' সম্পত্তি হিসাবে একে বহন করে বেড়ান নিরাপদ ও সহজসাধ্য। এই সব কারণে সোনার উপর মানুষের একটা স্বাভাবিক আস্থাও আছে, তাই সোনার টাকার উপরে মানুষের বিশ্বাস সুদৃঢ়। কারণ সে জানে যে রাজনৈতিক গোলযোগ বা অন্য কোন কারণে যদি এ জিনিষটি হঠাৎ কোনদিন টাকা বলে আর না চলে, অর্থাৎ লোকে যদি তাদের দ্রব্যের মূল্য হিসাবে এই ছাপমারা স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়, তবুও ধাতু হিসাবে চিরদিনই এই স্বর্ণের একটা সর্ব্বস্থানে মূল্য পাওয়া যাবে। তাই স্বর্ণমুদ্রাকে সে নিরাপদ বলে স্বীকার করে। রৌপ্যের মধ্যেও কিছু কিছু এই সব গুণাবলী থাকায় রূপাও মুদ্রা হিসাবে বহুকাল হতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এককালে ইউরোপের অন্তর্গত অনেক দেশে সোনা ও রূপা দুইই একসঙ্গে সম অধিকারে মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথাকে দ্বিধাতুমান (Bi.netalism) বলে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট একটা অনুপাত ঠিক করে দিতেন এবং সেই হিসাবে আদান প্রদান চলতো। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যেত যে বাজারে ঐ দুই ধাতু মূল্যের তারতম্য হেতু গবর্ণমেণ্টের স্থিরীকৃত অনুপাতের সঙ্গে বাজার দরের অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে, কাজেই বাজারে যে ধাতুটির মূল্য বেশী সেটি লোকে নিজের কাছে জমা করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেই ধাতুটি বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যায়। যেমন মনে করা যাক্, সরকার ১২টি রৌপ্য মুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান—এই ঠিক করে দিলেন। কিছুদিন পরে রূপার মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে ১৩টি রৌপ্য মুদ্রাই হয়তো একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান হয়ে গেল, অথচ কানুন হিসাবে একটা স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা তখনও ১৫টি রৌপ্যমুদ্রার কাজ চালান যায়। কাজে কাজেই লোকে সস্তার টাকা স্বর্ণমুদ্রার দ্বারাই সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ পরিশোধ করতে থাকবে এবং রৌপ্য মুদ্রাকে গলিয়ে ধাতুতে পরিণত করে, হয় তাকে দেশের মধ্যেই বেশী দামে বিক্রী করবে, নয়ত বিদেশে চালান দেবে। এইভাবে সস্তার বা খারাপ টাকা দামী বা ভাল টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়—**Bad mo.iey tends to drive good money out of circulation**—এই সত্যটি রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে (১৫৫৮—১৬০৩) অর্থনীতিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বণিক গ্রেসাম সাহেব বহুদিন পূর্ব্বেই আবিষ্কার করেছিলেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের সতত পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য এই দ্বিধাতুমান প্রথা বড়ই উৎপাত আরম্ভ করে এবং এই জন্য গতযুদ্ধের সময় ও পরে বহু দেশে এই প্রথাকে ত্যাগ করে ক্রমে একবিধ ধাতুমান (Mononutalism) গ্রহণ করে। তাতে করে রূপা বা সোনা যে কোন একটি ধাতুই প্রধান মুদ্রা হিসাবে দেশে অবাধ শক্তিতে প্রচলিত থাকে।

ভারতবর্ষেও বহুদিন অবধি স্বর্ণ ও রৌপ্য দুইই মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। হিন্দু রাজারা সাধারণতঃ স্বর্ণ মুদ্রাই বেশী পছন্দ করতেন, মুসলমান বাদশারা সেই যায়গায় রূপাকেই পছন্দ করতেন বেশী। এদেশের এক এক রাজা এক এক রকমের মুদ্রা প্রচলন করতেন, তাদের মধ্যে না থাকতো কোন সামঞ্জস্য, না থাকতো তাদের আদান প্রদানের কোন স্থির ও নির্দ্দিষ্ট অনুপাত। এতে করে এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বড়ই অসুবিধা হতো। মুদ্রা ব্যবস্থার এই জটিলতার সুযোগ নিয়ে যারা বিভিন্ন প্রদেশের মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতো, তারাই শুধু প্রচুর পরিমাণে লাভবান হতো। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে ভারতে প্রায় ৯৯৪ রকমের রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। ১৮৩৫ সালে মুদ্রার এই জটিলতা দূর করে সমগ্র বৃটিশভারতে একই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত করবার উদ্দেশ্যে একটি আইন পাশ হয়। সেদিন থেকে এ দেশে রৌপ্যমান প্রথা স্থাপিত হয় এবং সোনার মোহরের পরিবর্ত্তে রূপার টাকাই প্রাধান্য লাভ করে। ভারতের সঙ্গে আরো একটি দেশের মুদ্রানীতি হিসাবে খুবই সাদৃশ দেখা যায়, সে হলো চীন। চীনে আজও বহুবিধ মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত আছে এবং একটি মুদ্রার সঙ্গে অন্য একটি মুদ্রার বিনিময় কার্য্যে লিপ্ত ব্যবসায়ীরা এর দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লাভবান হয়ে থাকে।

পূর্ব্বেই বলেছি স্বর্ণের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই নিজের দেশে প্রচলিত যে কোন মুদ্রার সঙ্গে যদি স্বর্ণের কিছু একটা সম্বন্ধ বজায় থাকে তবে সে নিজের অর্থকে নিরাপদ মনে করে। দেশের প্রচলিত টাকা যে কোন ধাতুর বা এমন কি কাগজেরই হোক্ না কেন যদি সরকার বা যে ব্যাঙ্ক সেই টাকা প্রচলন করে সেই ব্যাঙ্কের তহবিলে সমপরিমাণ সোনা জমা থাকে, তাহলেও মানুষের সেই টাকায় বিশ্বাস আসে; কারণ সে জানে যে বর্ত্তমানে তার হাতের টাকা যদি কাগজেরও হয়, তবুও ব্যাঙ্কে বা সরকারের নিকট চাইলেই তার পরিবর্ত্তে সমপরিমাণ সোনা বা স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যাবে। আবার ঐ পরিমাণ সোনা নিয়ে গেলে তার পরিবর্ত্তে যখন খুশী নোট অথবা কাগজী মুদ্রাও সরকার দিতে দ্বিরুক্তি করবেন না। কাজেই দেশের প্রচলিত মুদ্রা যে প্রকারেরই হোক না কেন, তা স্বর্ণমুদ্রারই সমান। যে দেশে এই ধরণের মুদ্রা বর্ত্তমান, সেই দেশে বলা হয় স্বর্ণমাপ বা Gold Standard প্রচলিত আছে। স্বর্ণমাপের আর একটা সর্ত্ত যে জনসাধারণের স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা আমদানি বা রপ্তানির উপর অবাধ অধিকার থাকবে।

স্বর্ণমান বা Gold Standardএর অশেষ গুণ। প্রথমত, সরকার ইচ্ছামত দেশের অর্থ বৃদ্ধি করতে বা নোট ছাপাতে পারেন না। কারণ প্রত্যেকটি টাকার পশ্চাতে গবর্ণমেন্টের তহবিলে সমপরিমাণ সোনা জমা থাকা প্রয়োজন। এ সোনাটা গবর্ণমেন্ট যতক্ষণ না জোগাড় করতে পারে ততক্ষণ সে নোট ছাপতেও পারবে না। যে কোন মুহূর্ত্তে নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণমানের সর্ত্ত হিসাবে সরকার সোনা দিতে বাধ্য। কাজে কাজেই স্বর্ণমান সরকারের প্রয়োজন ও খুশীমত অর্থসৃষ্টির পথে বাধা দান করে দেশের পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির পথ (ইন্‌ফ্লেশন) বন্ধ করে। ঠিক সেই ভাবেই অর্থ সঙ্কোচন করাও (deflation of currency) সরকারের হাতে থাকে না, কারণ সোনা জমা দিলেই সরকার জনসাধারণকে সমমূল্যের নোট দিতে বাধ্য।

এত গেল দেশের ভিতরকার ব্যাপার। নিজ দেশের লোককে কাগজের নোট দিয়ে সন্তুষ্ট রাখলেও বিদেশীদের প্রাপ্য মিটাবার সময় সরকারের সোনা প্রদান করতে হয়, কারণ এক দেশে অন্যদেশের টাকা অচল। সেইজন্য সরকারের তহবিলে পর্য্যাপ্ত সোনা জমা থাকা প্রয়োজন। দেশের বাণিজ্যের গতি যদি প্রতিকূল হয়—অর্থাৎ রপ্তানির থেকে আমদানি যদি বেশী হয়, (Unfavourable balance of trade) তবে সেই পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশীদের দিয়ে দিতে হবে। যেহেতু সেই পরিমাণ স্বর্ণের বদলে সমমূল্যের নোট ছাপান হয়ে রয়েছে, কাজেই সেই পরিমাণ টাকাও বাজার থেকে সরকারকে সরিয়ে নিতে হবে। এইভাবে দেশের মুদ্রা হ্রাস পাওয়ায় দ্রব্যের মূল্য যায় কমে, বিদেশীরা এ দেশে মাল বেচে আর লাভ করতে পারেনা, উপরন্তু এদেশে দ্রব্যের মূল্য কম হওয়ায় অন্যান্য দেশের হাটে এদেশের মালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে আমদানি যায় কমে, রপ্তানি যায় বেড়ে, প্রতিকূল বাণিজ্যের গতি মোড় ঘুরে আবার অনুকূলের দিকে যায়।

দেশে বাণিজ্যের গতি যদি অনুকূল (favourable balance of trade) হয়, বিদেশ থেকে সেই পরিমাণ স্বর্ণ এসে উপস্থিত হয়, সেই স্বর্ণের পরিবর্ত্তে দেশে মুদ্রা বাড়ান হয়, তাতে দেশের মূল্যমানের (general price level)এর উন্নতি হয়, অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি পায়, দেশে দ্রব্যের আমদানি (import) বাড়াতে থাকে, রপ্তানি (export) কমে যায়, অনুকূল বাণিজ্যের গতি আবার আপনা আপনিই সংশোধিত হয়ে বহির্বাণিজ্যের সমতা ফিরে আসে।

প্রশ্ন হবে, দেশের মোট রপ্তানির থেকে যদি আমদানি বেশী হয়, তবে এই অতিরিক্ত আমদানির জন্য যে সোনা বিদেশীদের দিতে হবে তাতো যারা বহির্বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত তারাই দেবে; সরকারের তহবিলের স্বর্ণেই বা কি করে ঘাটতি পড়বে এবং তার জন্য মুদ্রা সঙ্কোচনই বা কেন হবে? কথাটা সোজাসুজিভাবে ঠিকই, কিন্তু তলিয়ে দেখলে অন্যরকম। ব্যবসায়ীরা যে স্বর্ণ তাদের বিদেশী মহাজনদের দ্রব্যের মূল্য বাবদ দেবে, সে স্বর্ণ তারা কোথায় পাবে? দেশে স্বর্ণমান বর্ত্তমান থাকায় ব্যবসায়ীরা জানে যে সরকারী খাজাঞ্চীখানায় নোট দিয়ে গেলেই তার পরিবর্ত্তে সমপরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যাবে, সুতরাং তারা তাই করবে এবং এই স্বর্ণ পরে বিদেশে নিজেদের দেনা পরিশোধের জন্য চালান দেবে। কাজেই প্রকারান্তরে সেই সরকারী তহবিলেই টান পড়লো এবং স্বর্ণমানের নিয়ম হিসাবে তাতে করে মুদ্রাসঙ্কোচনও হবে। ঠিক এই ভাবেই দেশের রপ্তানি যখন আমদানির থেকে বেশী হয়, বিদেশীরা যে স্বর্ণ এই দেশের ব্যবসায়ীদের নিকট তাদের দ্রব্যের মূল্যবাবদ পাঠায় সেই স্বর্ণ দেশীয় ব্যবসায়ীরা সরকারের নিকট জমা দিয়ে সমমূল্যের নোট ছাপিয়ে নিয়ে আসে, কাজেই এইভাবে অনুকূল বাণিজ্যের গতির জন্য দেশে মুদ্রা সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও কাজে কাজেই মূল্যমানের (general price level)এর উন্নতি হয়।

সুতরাং দেখা গেল স্বর্ণমানের নিয়ম মেনে চললে, দেশের সিক্কা বা মুদ্রানীতি চালনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বুদ্ধি বা বিবেচনা খরচ করতে হয় না, দেশের অর্থের সঙ্কোচন বা প্রসারণ এবং বহির্বাণিজ্যের সমতা রক্ষা (Equilibrium) আপনা আপনিই হতে থাকে ও বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সরল হয়। স্বর্ণমানে প্রত্যেক দেশের মুদ্রা একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের স্বর্ণ দ্বারা গঠিত হওয়ায় বা নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের সঙ্গে আদান প্রদানের সর্ত্তে আবদ্ধ থাকায়, এক দেশের মুদ্রার সঙ্গে আর একদেশের মুদ্রার বিনিময় হার সহজেই ঠিক হয়ে গিয়ে স্থির থাকে। যদি বিলাতের এক সভারিনে ১২৩.২৭ গ্রেণ সোনা থাকে এবং আমেরিকার এক ডলারে ২৫ গ্রেণ সোনা থাকে, তবে অনায়াসেই বলা যায় এক পাউণ্ড ৪.৮৬ ডলারের সমান হবে। এইভাবে দেশ বিদেশের বিনিময় হার অনায়াসেই স্থির হওয়ায় স্বর্ণমানের অধীনে বাণিজ্যে জুয়া খেলা অনেক পরিমাণে কমে যায়।

দোকানদারের দেশ

স্বর্ণমানের এই সব গুণাবলীর জন্য স্বর্ণমানকে লোকে একটু সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যখন আর্থিক, রাজনৈতিক, মানসিক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ উন্নতির জোয়ার এসে উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময়কার ইতিহাসের সঙ্গে ওদেশের স্বর্ণমানও বিজড়িত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড স্বর্ণমান গ্রহণ করে; তারপর থেকে পুরো শতাব্দিটা ধরে যেন একটা জাগরণ ও উল্লাসের সাড়া পড়ে গেল। বিজ্ঞানের উন্নতি ও ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দৌলতে দেশে হাজার হাজার মাল সস্তায় তৈরী হতে লাগলো, মিল ও কলকারখানায় দেশটা ছেয়ে গেল। কোন দেশ জয় করে, কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের চুক্তি করে, ইংলণ্ড সেই সব মাল বিশ্বের হাটে ছড়িয়ে ফেললো। বাইরের টাকা ও সোনা এসে দেশটা ভরে গেল। স্বর্ণমান বজায় থাকায় দেশ বিদেশের সিক্কার সঙ্গে নিজ মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখা সম্ভব হয়ে পড়ে এবং তাইতে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা ও লেন-দেন আরো সরল ও ঘনিষ্ট হয়। এদিকে শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ায় নূতন নূতন সোনার খণির আবিষ্কারের ফলে স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দেশের মুদ্রারও সম্প্রসারণ হয় এবং শতাব্দির শেষ দিন পর্য্যন্ত দেশের মূল্যমান

প্রায় একটানা ঊর্দ্ধ গতিতে চলে থাকে। শতাব্দির শেষ কয় বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলির স্বর্ণ উৎপাদক ক্ষমতা যেন আরো বেড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্ম চেক্ টাকার প্রচলন খুব বেড়ে গিয়ে দেশের মুদ্রা আরো বিস্তার লাভ করে। ধীর অথচ একটানা মূল্যবৃদ্ধির জন্ম দেশের ব্যবসায়ী মহলে একটা আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, বিশ্বের হাটের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিগূঢ় হয়ে পড়ায় লণ্ডন সহর পৃথিবীর বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়ে, বন্যার স্রোতের মত ব্যবসা ও বাণিজ্যের গতি ইংলণ্ডের দুই কূল ভাসিয়ে নিয়ে চলতে থাকে। উৎপাদনের নানারূপ যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডে সেদিন মাল সস্তায় তৈরী হতে লাগলো, কাজেই বিদেশীদের পণ্য তার দেশে বিকোবার কোন আশা না থাকায় সেদিন সে আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক এবং অন্যান্য সর্ববিধ বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে অবাধ বাণিজ্য-নীতির (**Free trade**) ধোঁয়া তুলে উন্নতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। ইংলণ্ড সেদিন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী", এই মন্ত্রের সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলো এবং সেদিন থেকে প্রকৃতই সে একটি দোকানদারের দেশে (**A nation of shop keeper**) পরিণত হলো। এই সব কারণের জন্যই উনবিংশ শতাব্দির শেষ অর্দ্ধেককে ইংলণ্ডে স্বর্ণযুগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইংলণ্ডের এই স্বর্ণযুগের সময় সে দেশে স্বর্ণমান অটুট অবস্থায় বজায় থাকায় স্বর্ণমানের স্বপক্ষীয়রা এর মানকেই উন্নতির সোপান বলে আজও গণ্য করে থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে যদিও উন্নতির একটানা ঊর্দ্ধ রেখাটি একটু সরল হয়ে আসলো কিন্তু তা এখনও নিম্নগামী হয় নি। কিন্তু গত মহাসমরের প্রারম্ভ থেকেই আর্থিক জগতে যেন রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। যুদ্ধে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কাজেই স্বর্ণমানে আবদ্ধ থাকা আর পোষায় না। প্রায় দেশই স্বর্ণমান ত্যাগ করলো, রাশিরাশি কাগজের মেকী অর্থ সৃষ্টি হলো, দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে গেল, কিন্তু আর্থিক জগতের ভাগ্যচক্র আর ঠিক পথে চালিত হলো না। স্বর্ণমান নিয়ে যেন একটা মল্লযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। একবার স্বর্ণমানে ফিরে যাওয়া হয়, তাকে অটুট রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন মনোবৃত্তির পঙ্কিলতার খাবি খেয়ে আবার ত্যাগ করতে হয়। এই সব দেখে শুনে একালে বিশেষজ্ঞ স্বর্ণমানকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দেবার মতো মতও প্রকাশ করে থাকেন। স্বর্ণমানকে নিয়ে এত টানা-হিঁচড়া করতে করতে এর কিছু অসুবিধা ও দোষের কথাও এখানিং বেরিয়ে পড়েছে। (আগামী বারে সমাপ্য)

ফুড্ কমিটির চেয়ারম্যান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফুড কমিটির চেয়ারম্যানের
পদ তো বেজায় দামী,
পদোন্নতিটা সংখ্যায় কিনা ?
গণিয়া দেখিনি আমি।
নাই কেরোসিন, নাহিক লবণ,
চিনি খাওয়া চেয়ে—হওয়া ভাল মন
চেয়ারে বসিয়া দেখ্‌ছি স্বপন
বিফলে দিবস যামি।
লোকে নুনহীন ব্যঞ্জন খেয়ে
দেয় মোরে গালাগালি,
গুড় দিয়ে খেয়ে চায়ের পাচন
দেখে দেয় করতালি।
এত সুখ্যাতি কোথা ছিল মোর,
ভাবি আনন্দে হয়ে থাকি ভোর,
শুষ্ক শূন্য ভাণ্ডার লয়ে
কাহার আদেশ পালি ?
গৃহে গৃহে দিন দেউটী নিভিছে—
আর যে জ্বলে না বাতি।
বর্ষা বাদল দুর্য্যোগে ভয়ে
কাটিছে আঁধার রাতি।

রিক্ত তিক্ত শুধু নাম সার
উপকার চেয়ে বেশী অপকার,
কোনো কর্ম্মেই লাগিল না হায়
সুবৃহৎ শ্বেত হাতী।
কোথা শর্করা আঁধার বাজারে
গোপনে করিছে পথ,
কেরোসিন টিন গজের ভুক্ত
হয় কপিথ বৎ।
কোথায় কাপড় কম্বল চট,
পাখা মেলি ধায় উড়ি ঝটুপট্,
সাধ্য নাহিকো চিনিতে পারি। যে
কাহারা অসৎ সৎ।
'বস্ত্র বস্ত্র' সঙ্গেই শুনি
কিন্তু দৃশ্য নন,
ডাকি প্রাণপণে কোথা দ্রৌপদীর
হে লজ্জা নিবারণ।
পল্লীবাসিনী আমি চাষবাস,
ক্ষোভে ফিরে চায় ফেলি নিশ্বাস,
হে মধুসূদন—একি অভিশাপ
—একি এ বিড়ম্বন।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

ডাক্তার Military master-tailorদের (দরজিদের) সন্ধান দিলেন ; পথে একজন ক্রত এসে সেলাম করলে, বললে—"আপ্নাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলুম,—বড়া ভাইয়া পেটের দরদে বেচ্যায়েন হয়ে পড়েছে—বলছে বাঁচবনা। হুজুর মাই বাপ—"

"ঘাবড়াও মত্।" পকেটেই ২।৪টে খুচরো ওষুধ থাকে। ডাক্তার। মুটোখানেক Sodi-Bicarb—"গুরু নানক সাহাব কি জয়" বলে খাইয়ে দিলেন। মিনিট ৫।৭ পরে volly fireএর শব্দে মেঘ গর্জ্জনের মত কয়েকটা ঢেঁকুর উঠে যেতেই ভাইয়া উঠে বসল। ডাক্তারের জয় জয়কার পড়ে গেল।

সব "গ্রন্থসাহাব কি" কৃপা, হাম্ হরবখৎ হাজির হায় শিখজি, কুছ্ চিন্তা নেহি। আচ্ছা আব হাম্ চলা, বড়া জরুরি কাম থা, ফির দেখা যায়গা।

"ইয়ে নেহি হো সক্তা, কহিয়ে হুজুর হাম হাজির হায়। তারা দুঃখিত হয় দেখে ডাক্তার উদ্দেশ্যটা খুলে বললেন। "ইয়ে কোন্ বড়া কাম ডাক্তার সাহাব। সামকো হাজির হো যায়গা।"

ঠাণ্ডামে বড় কষ্ট পাতা, তাই তকলিফ্ দিয়া ভাই। আর দেখো হামারা দাওয়াই বড়া তেজ হায়, সব-কুছ খা সেক্তে। রাতকো থোড়া সরাব পিলেনা। আচ্ছা ভাই হাম্ চলা।

ডাক্তার বেরিয়ে পড়লেন।

"একবার ষ্টেসনটা ঘুরেই যাই—কি জানি কে কখন লড়ায়ে ছটরা—অর্থাৎ কড়াইশুঁটি বাগাতে আসবেন।—

ওরে বাবা একি! না চাহিতে জল—শুভানুধ্যায়ী যে! যেখানে বাঘের ভয়—

চোখোচোখি হওয়ায়—"এই যে বিনোদ, তোমাকেই খুঁজছিলুম—"

"আমাকে পাবেন কোথা Sir? এক মিনিটও ছুটি নেই—কলেরা কুটীরেই ঘর বাড়ী। অনেকটা কায়দায় এনে ফেলেছি—"

"বেশ বেশ, এই তো চাই ; তা না তো আর তোমাকে—জলটা গরম করে খাচ্চো তো?"

"আজ্ঞে সকাল বেলা আর মিছে কথাটা—আপনি তো সব বুঝছেন—"

কর্ত্তা সহাস্যে—"সকাল বেলা কি হে! মাথার ঠিক নেই যে দেখছি!"

"তা ঠিক বলেছেন Sir, Patientই impatient করেছে, তারাই মাথায় inceissant ঘুরছে।"

"তা হোক, কিন্তু গরম জলটা অবহেলা কোরোনা। দু'বেলাই—বুঝলে...বিবাহ করেছ, responsibility আছে তা জানো। শুধু পিসিকে আনলেই তো তা ঘোচে না! সেখানে আমরা তো রয়েইছি—"

"আজ্ঞে চাকরির চেয়ে ওটাকে বড় responsibility বলে যে মনেই হয় না। পিসির 'তীর্থ তীর্থ' বাই আছে তাই। ঐ যে ভাগলপুরের কাছে সুমেরু তীর্থের পাহাড় আছে কিনা—কার কাছে শুনেছেন সেই জন্যেই। আমারো কর্ত্তব্য সারা হবে—"

কর্ত্তা সহাস্যে—"সুমেরু নয়, মন্দার—"

"ও: তাই হবে, কে অত খোঁজ রাখে মশাই। এখন পাঠাতে পারলে বাঁচি। পিসির আর কি দরকার ছিল—আপনি রয়েছেন। চলুন না, বাসাটা দেখে আসবেন, দেখে রাখা ভালো—"

"তা মন্দ কথা নয়, আমার trainএর এখনো তিন কোয়াটার দেরী—"

উভয়ে বাসার দিকে চললেন।

বিনোদ। "মাপ করবেন, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। রুগীগুলো দেখে এলুম তাদের কথাই মাথায় ঘুরছে। আপনার সে পায়ের ব্যথাটা কেমন—line ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হবে কিনা।"

সাহেব। "এখন যা আছে তাতে কাজ চলে। আর না চললেই বা ছাড়ে কে? বসে থাকবার জন্যে তো আমাদের কেউ পোষে না। জানতো মেম সাহেবরা হাঁচলেও ছুটতে হয়। এই তোমাদের Regimental O/Cকে বড় সাহেবকে দেখা দিয়ে এলুম। আমরা দেখা দিলেই ওঁদেরও একটা কিছু দেখা দেয়। নেড়ে চেড়ে দেখে Brandy আর Egg flip বাড়িয়ে দিয়ে এলুম—বললুম এটা India Sir, বড় doubtful and faithless climate—তাই expert hand পাঠিয়েছি—সন্দেহ হলেই তোমাকে ডাকতে বলেছি।"

বিনোদ। "very kind of you—ও দয়াটি আপনাতেই দেখতে পাই, সকলকেই এগিয়ে দেন—backgroundএ রাখেন না। অনেকেই subordinateদের চেপে রাখেন—"

সাহেব। "Chance সকলকেই দেওয়া উচিত। আর কতটা হে?"

"এই যে, এসে গেছি।"

"ওটা তো—"

"আজ্ঞে ওই"

"ওতে কি করে—"

"কতক্ষণই বা থাকি, রুগীর ঘরেই সময় কাটে—"

"তা কাটুক, সে ভালো। কিন্তু ঘর তো দেখছি একটি, আর একটু বারাণ্ডা—সাড়ে চার হাত হবে—"

মাণিক বারাণ্ডায় রাঁধছিল, খুন্তি হাতে এসে ঝুঁকে নমস্কার করলে—

"সোজা হয়ে ঢোকা যায় না যে, থাক আমি আর ঘরে ঢুকব না (রুমাল নাকে দিলেন)—এর মধ্যে থাকো কি করে?"

"সে তো বলেছি Sir, এখানে রান্না খাওয়া মাত্র। ভাগ্যে মাণিককে

দিয়েছেন, না হলে—এত রুগী অল্পে সামলাতে পারত না। একটু লম্বা কিনা, ভেতরে পা মেলবার স্থান নেই, আড়কাটায় দড়ি টাঙিয়ে মাণিক পা রাখবার **sling** ঝোলনা বানিয়েছে। অমন দশকর্ম্মান্বিত কাজের লোক না পেলে সামলাতে পারতুম না।"

সাহেব হো হো করে হেসে বললেন—"না না, বাসা বদলে ফ্যালো—বাসা বদলে ফ্যালো—"

"মাপ করবেন—ছামায় **plus allowance** যা পাই এ দুর্দ্দিনে তাতে পক্কায় জোটানোই দায়। আপনি ও বিষয় ভাববেন না আমাদের কষ্ট বলে কিছু নেই, বেশ চলে যাবে—অবশ্য মাণিক থাকলে। যা সব নিত্য দেখছি, আমরা তাদের তুলনায় বাদশা। কারো কুঁড়েতে একমুঠো দানা নেই—"

সাহেব। "থাক্। ওটা এক্ষেত্রে সুসংবাদ হে। দানা থাকলে একটি রুগীকেও বাঁচাতে পারতে না। দেশে সাবুর সাক্ষাৎ তো নেই—ঐ দানা খেতো আর মরতো। কেবল জল দেবে, আর ভগবান জোটান তো কমলালেবু।"

বিনোদ। (স্বগত) লঙ্কার আম্রকানন যাঁদের দখলে পড়েছিল, তাঁদের কুলুলে মিলবে। (প্রকাশ্যে)—"যে আজ্ঞে। এখন বাঁশের ও **nasty** লাঠি গাছটি দয়া করে ফেলুন দিকি, বড় বেমানান—দৃষ্টি-কটু লাগছে—"

সাহেব। "আরে ওরি সাহায্যে চলতে পারছি—"

বিনোদ। (ঘরের কোণ থেকে বার করে এনে) না **Sir**, এইটি নিন, ও ফেলে দিন—

সাহেব। (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) বাঃ এ যে **grape stick**, কোথায় পেলে? না, এ তোমার সখের জিনিস—তুমি রাখ।

বিনোদ। ও একজন **present** করেছিল—উপহার দিয়েছিল। ও নিয়ে আমি কি করব **Sir**, পড়েই থাকে, বড় জোর কুকুর তাড়ানো হয়। আপনার হাতে ত **proper place** পাবে—যোগ্য স্থানে থাকবে।

সাহেব। তবে দাও, তোমার ইচ্ছা হয়েছে (হাত-ঘড়িটা দেখে) ইস্ আর সময় নেই বিনোদ—চল্লুম। (মাণিকের প্রতি) খুব ভাল করে কাজ কোরো, সুনাম নিয়ে ফেরা চাই। আচ্ছা আজ আর নয়।

সাহেব বেরিয়ে পড়লেন। বিনোদ লাইন পার করে সেলাম করে বললে—"মাণিক আছে বলেই পেরে উঠছি **Sir**—"

সাহেব। আমি জানি বলেই ওকে দিয়েছি। আচ্ছা যাও। গরম জলের কথাটা—

বিনোদ। আজ্ঞে মনে আছে। (স্বগত) মনেই থাকবে। কিন্তু লোকটা তো মন্দ নয়—ও অলুক্ষণে দুর্ভাবনাটা কোথা থেকে এসে আমাকে—দূর করো, এখনো কি গেছে!

* * * * * *

বাসায় ফিরে বিনোদ বললে—"এদিকে কতদূর হে?"

মাণিক। আজ্ঞে সব **ready**, কিন্তু আপনি যে আমার **length**-এর কথা কয়ে সব **strength** শুকিয়ে দিয়েছেন। বেঁটে রাঁধু এসে না বাড়া ভাত খায়।

বিনোদ। কথাটা বলেই বুঝেছিলুম—সেরে নিয়েছি—ভেব না। পাকা করে নিয়েছি।

মাণিক। বাঁচালেন **Sir**, বসে পড়ুন।

বিনোদ। (খেতে বসে) বাঃ তুমি যে রন্ধনেও অরুন্ধতি দেখছি, কি ঝোলই বানিয়েছ, যেন যশোরে শ্বশুরবাড়ী এসেছি। আঃ ভাত পেটে প'ড়ে বাঁচলুম। কিন্তু বেশী খাওয়া হয়ে যায়, চালের মণ যে তেইশ টাকায় তাকাচ্ছে—

মাণিক। খাবার সময় ওসব ভাববেন না—হরি আছেন—

বিনোদ। তা ঠিক্, যখন ধর্ম্মকে ধরে আছি, বিশেষ 'হরিকে'—ওঁর চেয়ে দয়া আর কোন্ দেবতার বেশী! তিনি দেখবেন বই কি।

মাণিক। থাক্ মশাই—

বিনোদ। হ্যাঁ, ধর্ম্মের কথা এখন কেন, বিপদের সময়েই ভাল, সে তো সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এখন যে শুতে হবে মাণিক, এ **load** নিয়ে নড়তে পারব না—

মাণিক। দরকার কি, খাটিয়া পাতাই আছে—একধারে জাল আছে, এক ধারে খোঁটা পুতে দিয়েছি, পাশ ফিরতে ভয় নেই, পড়বেন না।

বিনোদ। এত সুখ সইলে হয় যে!

মাণিক। কোনো চিন্তা নেই মশাই। এ বাসা ছাড়া হবে না, বড় লক্ষণযুক্ত, কিন্তু রুগীদের যে একবারও—

বিনোদ। হ্যাঁ ধর্ম্মের দিকে চাইতে হবে বই কি—তাই ভালো করে চোখ বুঁজে নিচ্ছি—শরীরম্ আদ্যম্ কিনা; শরীর রক্ষাও ধর্ম্ম—

বিনোদ হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন।

মাণিক। মাথা ঠিক না রাখলে শরীরকে চালাবে কে মশাই। এখন একটা…

বিনোদ। মনে আছে মাণিক—**you mean** Gold Flake—কইয়ের ঝাঁক যে পেটে ঢুকেছে, ধোঁয়া ঢোকবার ফাঁক আছে কি? এ-পাশ ওপাশ করে সব চৌরোস করে নিচ্ছি হে—

মাণিক। তাই তো বলি আপনার কি ভুল হয়!

বিনোদ। হয় হে হয়। সেকালের ভোজভীমেরা আঁচিয়েই নাকে কাটি দিয়ে দুটো হাঁচতেন, তার ধাক্কায় যে যার স্থানে গুঁড়ি মেরে বসে যেত, তার পর একটা কাঁটালও প্রবেশ পথ পেতো। কি সব মুষ্টিযোগই ছিল। সময়ে ভুলে যাই—

মাণিক। সেকালের ব্যবস্থা একালে না চালানই ভাল, ওকে ভুল বলে না মশাই, এখন গড়িয়ে চৌরোস করুন। বেলা আড়াইটে বাজে। রাত্রে তখন কালকে—

বিনোদ। আর লোভ বাড়িও না। সাহেব বলছিলেন—যে করেছ, **responsibility** আছে।

মাণিক। সাহেব আবার কে—পল্টনের কর্ত্তা?—O/C?

বিনোদ। কি পাগল, আরে না হে, জান না,—সাবধান। **Depart**-

mentএর ডগায় বসলেই—তিনি হন সাহেব—তা তিনি যে রঙেরই হোন, আর যতই কালো হোন। কিষণজি আজ বৃন্দাবনে থাকলে বড় সাহেব হতেন। সোলার hat হাল্কা হ'লে কি হয়, Crownএর চেয়ে ভারী—brown সাহেবের মাথায় থাকলেও মেজাজে মেরে রাখে। খবরদার 'বাবু' বলে ফেল না।

মাণিক। আজ্ঞে আর কি ভুলি! আচ্ছা শুয়ে পড়ুন। আমার কাজ আছে—

* * * * *

কাজ সারতে সারতে মাণিক ভাবছে—পিসি এলেন, কই মাছ এলেন, কিন্তু কলেরার কথা যে কন না—ওদিকে পটাপট মরছে। চাকরি গেল দেখছি! এমন ভাললোক পেয়েও—(চমকে) কেরে বাবা—:পল্লায় লম্বা ছায়া যে—পাগড়িশুদ্ধ সাত ফুট লম্বা জোয়ান—

"ডাক্তার সাহেব হায়?"

"আবি বোলা দেতা হায়" বলেই ঘরে ঢুকে—"এই যে উঠেছেন, আপনাকে কে খুঁজছে দেখুন—এক আকাশ-ফোঁড়া মূর্ত্তি, আমার ওপর এক হাত—

বিনোদ। রুগী নয় তো?

মাণিক। রোগের সাধ্য নেই তার ত্রিসিমানায় ঘেঁষে, well dressed কিন্তু—

বিনোদ। পুলিশ টুলিশ নয় তো হে, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাস্ত্র নয় তো? (চিন্তিত ভাবে) যেতে তো হবেই—(হ্যাটটা মাথায় দিয়ে) জয় মা মঙ্গলচণ্ডী, চলো—

বাইরে পা দিয়েই এক মুখ হাসি! "এই যে মাষ্টার ভাইয়া! ইসকোইতো military punctuality বলে,—মরদ কি বাত্।

দর্জ্জি। হুজুর ইসমে রহতে হেঁ! দৌলতখানা ইয়েই হায়? —তোবা—

বিনোদ। (সহাস্তে) আরে নেহি ভাইয়া, ইঁহা খানা-পিনা করনে আতে—

দর্জ্জি। দেখকে হাম তো তাজ্জব হো গিয়া থা। ইঠো 'কিচেন্' হায়, শুকুর (Thank God) লিজিয়ে আপকা হুকুম তামিল হো গিয়া। (half pantএর পুঁটলি বার করে দিলে)

বিনোদ। হাড় ভাঙা ঠাণ্ডা ভাই, বড়া আপ্যায়িত কিয়া। বড়া ভেইয়া ক্যায়সা হায়?

দর্জ্জি। আপ্কা দোয়াসে বাঁচগিয়া হুজুর—

ডাক্তার একটু আড়ালে গিয়ে তার হাতে চারটি টাকা দিলেন।

বিনোদ। বড়া মেহেরবাণী কিয়া। হামকো আবি ছুটনে হোগা, চতুর্দ্দিকে ডামাডোল—

দর্জ্জি। আচ্ছা—ডাক্তার সাব—সেলাম—

বিনোদ। সেলাম ভাই—

(দর্জ্জি চলে গেল)

"এই নাও মাণিক—তোমার গড্রেজের লোহার সিন্দুক—এখন প্রবেশ পথ বানাও, অভিমন্যু যেন বেরিয়ে আসতে পারেন, অগস্ত্য গমন না হয়।

মাণিক। আজ্ঞে তাতো বুঝেছি। আপনি টাকা টাকা বলছেন কেন—সবি তো খুচরো কাগজ, ওরা যে একস্থানে জড় হয়ে তাল পাকাবে, তখন প্যাণ্ট যে তেজপাতার থলে হ'য়ে দাঁড়াবে—

বিনোদ। ভেবনা ভেবনা। খাদি, পুঁটি মন্ত্রঃপুত হয়ে ঘরে এলেই অপ্সরী। ছাপ থাকলেই মাপ। কেষ্টচন্দ্রের সনন্দে কি আর কেষ্ট থাকতেন, তিনি মথুরায় মতিচুর মারতেন। কাগজেই কাজ চলে—

মাণিক। বাঁচলুম মশাই, ঐ পাঁচহাত লোকটা যেন পীলের ওষুধের মত এসেছিল, আমার পীলেটা শুকিয়ে দিয়ে গেছে। Spyটাই (গুপ্তচর) নয়তো,—বুঝে ফেলেনি তো? দৌলতখানা বললে কেন?

বিনোদ। ওরা বুসের কুঁড়েকেও দৌলতখানা বলে, নবাবী ভাষা কিনা। এখনো ওটা ছাড়তে পারেনি…

মাণিক। তা না ছাড়ুক, আমাদের ছাড়লে যে বাঁচি…

বিনোদ। আরো না না—ভয় নেই—ওরা সেপায়ের জাত—ছোটায় হাত দেয়না—মাথা নেয়, রাজ্য নেয়, তাও নিজের জন্তে নয়—খাটি পরার্থপর। যাক্ তুমি প্যাণ্টে সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেল,—ওদের আর ফেলবো কোথা?—দেশে বিদেশে আমাদের সর্ব্বত্র শুভানুধ্যায়ী যে—

মাণিক। আজ্ঞে হাঁ,—ওকাজ এখুনি করে ফেলছি। আপনার কোনো কাজ থাকে তো—

বিনোদ। ওঃ—ভারি মনে করে' দিয়েছ thank you—আছে বইকি। কাজের লোকদের কি মরবার ফুরসৎ আছে—একবার 2nd classটা হয়ে আসি—

মাণিক। কেন বলুন দিকি?

বিনোদ। কৈফিয়ৎ দেবার সময় নেই। এ মরা পেটে—ভরা খোরাক সইবেনা হে—চললুম—

বিনোদ চলে গেল। মাণিক ভাবতে লাগল—আবার একটা কিছু না মাথায় করে আসেন। কই problem যুধিষ্ঠিরকে পাইয়েছে, এবার না একটা অনাসৃষ্টি আমদানী করে ফেরেন! সকালে কিন্তু রুগী দেখতে না গেলে এ চাকরী ফেলে পালাতে হবে—হাহাকার পড়ে গেছে। ষ্টেসনে দেখলুম দু'তিন জন লোক ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাসার খোঁজ নিচ্ছে, এখন ওঁকে বললে সারারাত আর ঘুমুবেন না। ও খাটিয়ায় ছট্‌ফট্ করার জায়গাও নেই। যেমন ভীতু, তেমনি নার্ভাস্, একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন।

মাণিক কাঁচি আর সূচ-সুতো নিয়ে সুন্দরের যাতায়াতের সুড়ঙ্গ বানাতে বসল।

* * * * *

·তিনটি ভাল ম্যাজিক

যাদুকর পি-সি-সরকার

এবারে আমি তিনটি অতিশয় সহজ অথচ চমকপ্রদ ম্যাজিকের কৌশল প্রকাশ করিব। প্রথম খেলাটির নাম "অপরের লিখিত বিষয় পাঠ করা" বা **Billet Reading Tests.** বিলাতে ও আমেরিকায় এই জাতীয় খেলা আজকাল খুবই প্রচলিত কারণ ইহা **Mental Magic**এর অন্তর্গত, আমেরিকায় "Dr. Q" নামক জনৈক বিশিষ্ট যাদুকর এই ধরণের খেলা আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীময় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। সে দেশে মানসিক খেলা (**Mental Magic**) সম্বন্ধে নিয়মিত গবেষণার জন্য "Jinx"



আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর জ্যাক গুইন (Jack Gwynne)

নামক একটি পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। পরবর্ত্তী খেলা দুইটি যান্ত্রিক কৌশলের খেলা বা **Apparatus Magic.** আমাদের দেশের যাদুবিদ্যাসমূহ প্রায়ই হস্তকৌশলজাত, ইহাতে যান্ত্রিক কৌশল বা ঔষধপত্রের কারসাজী খুব কমই থাকে। কিন্তু জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশীয় যাদুবিদ্যাতে হস্তকৌশল অপেক্ষা যান্ত্রিক কৌশলই বেশী থাকে। কোন দেশ বা জাতির পূর্ণতা নির্ভর করে তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্নতির উপরে। কাজেই এদেশের ম্যাজিককে পূর্ণতা দিতে হইলে, এদেশীয় হস্তকৌশলজাত খেলার সহিত পাশ্চাত্যের অতি আধুনিক যন্ত্রকৌশল সম্বলিত খেলার যোগ করিতেই হইবে। এটা যে বিজ্ঞানের যুগ, বিদ্যুৎ-রেডিও-টেলিফোন টেলিগ্রাম প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়া ইহা ম্যাজিকের উপরের ম্যাজিক "**Super Magic**" দেখাইয়া চলিয়াছে। আধুনিক যাদুকরকে ওদেশীয় এবং এদেশীয় উভয় প্রকার যাদুবিদ্যার মিশ্রণ করিয়া লইতে হইবে। সেজন্যই ভারতীয় যাদুকরগণ আমেরিকা ও ইউরোপীয় যন্ত্রসম্বলিত খেলা শিক্ষা করিবেন এবং সে দেশীয়গণ এ দেশীয় খেলা শিক্ষা করিবেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে টাকা থাকিলেই (অর্থাৎ টাকা ব্যয় করিয়া যন্ত্র তৈয়ার করিলেই) সেদেশের



যাদুকর গুইন একটি চীনদেশীয় খেলা দেখাইতেছেন

বড় বড় খেলাগুলিও আমরা করিতে পারি, কিন্তু আমাদের খেলা যে তাহাদের ধাতে একেবারে সহিবে না। ইহার পশ্চাতে প্রয়োজন হইবে দীর্ঘকালের সাধনা, বৎসরের পর বৎসর নিয়মিত চেষ্টা ও অভ্যাস। সেদিন আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 'জাক গুইন' **Jack Gwynne** সাহেব চীনযাত্রার পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ রণ-ক্ষেত্রে মার্কিণ সৈন্যদিগকে আনন্দ পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই এদেশে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পর তিনি এদেশীয় খেলার ধরণ দেখিয়া অবাক হইয়া যান। এই ধরণের যাদুবিদ্যায় তিনি বা তাঁহারা মোটেই অভ্যস্ত নহেন। আমার কতকগুলি খেলায় তিনি এরূপ

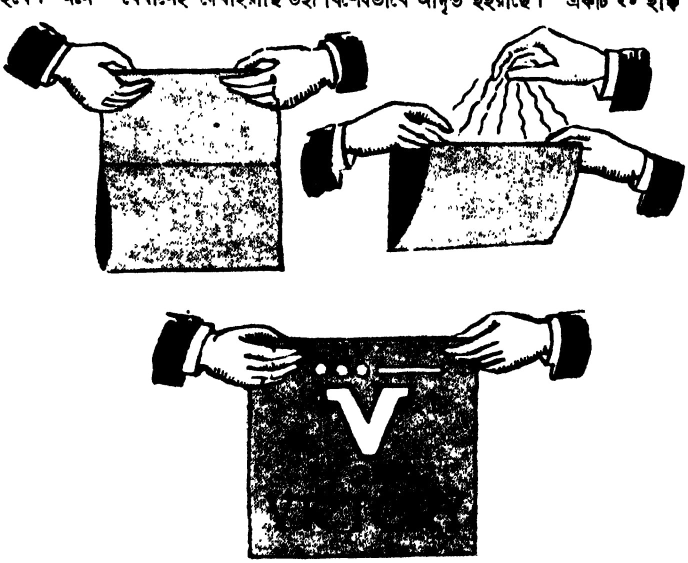
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন যে মুক্তকণ্ঠে তিনি আমেরিকার পত্রিকাসমূহে উহার বিস্তৃত বিবরণ ও প্রশংসা করিয়াছেন। সে গৌরব আমার নিজের প্রাপ্য নহে। উহা ভারতীয় যাদুবিদ্যার গৌরব—কারণ তাঁহারা পাশ্চাত্যের যাদুবিদ্যাই জানেন—প্রাচ্যের মনস্তত্ত্ব সম্বলিত খেলাসমূহের তাঁহারা কিছুই জানেন না এবং সেইজন্য পথের সামান্য বেদিয়ারাও তাঁহাদিগের নিকট এক একটি বিরাট বিস্ময়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্কিণ যাদুকর 'জ্যাক গুইন' (Jack Gwynne) ভারতীয় যাদুবিদ্যা দেখিয়া যে মুগ্ধ হইয়াছেন ইহা আমাদেরই গৌরবের কথা। যাহা হউক এক্ষণে আমার খেলা তিনটির কৌশল প্রকাশ করিতেছি।

অপরের লিখিত বিষয় পাঠকরা (Billet Reading Tests)

অপরের লিখিত বিষয় পাঠ করার খেলাটি খুবই চমকপ্রদ এবং ঠিকমত করিতে পারিলে এই এক খেলাতেই যাদুকরের যথেষ্ট নাম হইবে। মনে করুন যাদুকর অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড কাগজ দর্শকদের মধ্যে বিলি করিয়া দিলেন এবং দর্শকদিগকে উহার মধ্যে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন ফুলের নাম, ফলের নাম, লোকের নাম যাহা খুশী লিখিতে বলা হইল, তাঁহারা ইচ্ছামত লিখিয়া ছোট করিয়া ভাঁজ করিয়া যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিলেন। যাদুকর সর্ব্বসমক্ষে একটি কাঁচের গ্লাস তুলিয়া লইয়া উহা বামহাতের তালুতে বসাইলেন এবং ডান হাতের মুঠার সমস্ত লিখিত কাগজগুলি সর্ব্বসমক্ষে গ্লাসের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। পরে গ্লাসের মুখ একটি সাধারণ রুমাল দ্বারা ঢাকিয়া সেটিকে রবারের ব্যাণ্ড অথবা সুতা দ্বারা বাঁধিয়া গ্লাসটিকে সর্ব্বসমক্ষে একটি টেবিলের উপর বসাইয়া দিলেন। এইবার তিনি কয়েক মিনিটের জন্য পর্দার অন্তরালে যাইয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া চক্ষুমুখ ধুইয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন—একজন লিখিয়াছেন "হল্যাণ্ড", অপরজনে "গোলাপ ফুল", অপরজনে "রডড্রেনডন গুচ্ছ" ইত্যাদি। দর্শকগণ নিজেদের লিখিত বিষয় পঠিত হইতেছে দেখিয়া অবাক হইলেন। এইবার যাদুকর গ্লাসটি পুনরায় বাম হাতের তালুতে বসাইয়া উপরকার রুমাল খুলিয়া দিলেন এবং ভিতরকার কাগজের টুকরাগুলি দর্শকদের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। এইবার খেলার গোপন কৌশল বলা যাইতেছে। যে সাধারণ কাঁচের গ্লাসে ঐ কাগজের খণ্ডগুলি রাখা হইল উহা মোটেই সাধারণ নহে। উহার তলা নাই, কাজেই বাম হাতের তালুতে বসাইয়া মধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে উহা বাম হাতের তালুতেই যায় এবং হাতের তালুতে জিনিষ রাখিয়া গ্লাস তাহার উপরে বসাইলে এবং উপুড় করিলে গ্লাসের মধ্য হইতে জিনিষ বাহির হয়। বাকী অংশ নিরতিশয় সহজ। দর্শকদিগের লিখিত বিষয় গেলেন সেই ফাঁকে তিনি সেখানে কাগজগুলি খুলিয়া বিষয়গুলি পাঠ করিয়া মুখস্থ করিয়া পুনরায় ভাঁজ করিয়া লইয়া আসিলেন। এক্ষণে পাঠ করা হইলে বাম হাতের তালুস্থিত কাগজগুলির উপর গ্লাস বসাইয়া গ্লাসের মুখ খুলিলেই সমস্ত হইল। গ্লাসের তলা কাটিয়া সেখানে revolving এবং সেলুলয়েডের তলা লাগাইয়া লইয়া (যাহার নীচের পিঠে কয়েক খণ্ড কাগজ আঠার দ্বারা লাগান থাকিবে) এই খেলা আরও উন্নত করা চলে। তবে যন্ত্রটি তৈয়ার করা কঠিন হইয়া পড়ে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে এইটুকুমাত্র অসুবিধা।

ভিক্টরী ফ্লাগের খেলা(A Patriotic Move)

আমি এই খেলাটি যুদ্ধকালে মিলিটারীর লোকদিগকে এবং রাজপুরুষদিগকে—বিশেষ করিয়া বড়লাট, ছোটলাট, যুদ্ধের সেনাপতি প্রভৃতিকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে আবিষ্কার করি। বলাবাহুল্য আমার এই খেলা যেখানেই দেখাইয়াছি উহা বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। একটি ২০ ইঞ্চি



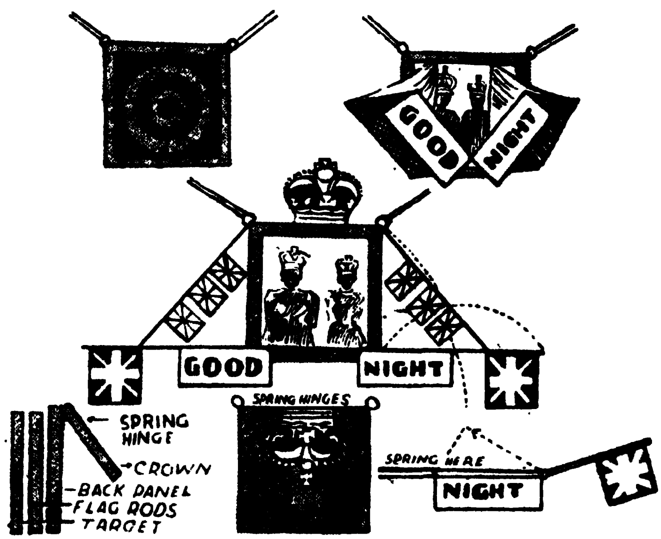
ভিক্টরী ফ্লাগের খেলা

লম্বা ও ১৬ ইঞ্চি প্রস্থ কাল রংএর ভেলভেট কাপড়ের টুকরা দেখান হইল—উহাকে চিত্রের ন্যায় মধ্যস্থলে ভাঁজ করিয়া ধরিয়া মধ্যস্থলে কয়েকখণ্ড সরু সিল্কের (হলুদ) ফিতা রাখা হইল—চিত্রে উহাও দেখান হইয়াছে। এইবার ঐটিকে ঝাড়িয়া ফেলিতেই দেখা যাইবে যে সেই ফিতা দ্বারা......—এবং 'V' for victory লেখা হইয়া গিয়াছে (চিত্র দেখুন)। দর্শকগণ এতদ্দর্শনে খুবই অবাক হইয়া যাইবেন। খেলাটি অনেকাংশে আমার তাসের রং পরিবর্ত্তন খেলাটির ন্যায়। আমার 'ছেলেদের ম্যাজিক' পুস্তকে দেখান হইয়াছে কি ভাবে একটি তাসের 'ফ্লাপ' উপর হইতে নীচে উঠা নামা করাইলেই তাসের রং পরিবর্ত্তন হয়। এ ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে মধ্যকার ফ্লাপ ছাড়িয়া দিলেই 'V' for victory লেখা বাহির হয়। চিত্রের প্রথমে (......) চিহ্ন দ্বারা

উঠান থাকিলে একরূপ দেখাইবে এবং নামান থাকিলে অন্যরূপ দেখাইবে। পূর্ব্ব হইতেই একদিকে 'V' for victory লেখা থাকিবে এবং ফ্লাপদ্বারা উহা ঢাকা থাকিবে। যে সব ফিতাগুলি দেওয়া হয় উহা ফ্লাপের পিছনের ব্যাগে লুকান থাকে। এইবার জোরে ঝাঁকানি দিলেই 'V' for victory লেখা বাহির হইবে। যাহারা এই লেখার পরিবর্ত্তে অন্য লেখা বাহির করিতে চাহেন, তাঁহারা Good Night লেখা বাহির করিতে পারেন। এই ভাবে Good Night লেখা বাহির করিয়া খেলা শেষ করাটা খুবই 'আর্টিষ্টিক' হয় এবং বিলাতের বড় বড় যাদুকর নিজেরা এইরূপই করেন এবং এইরূপ করিতে নির্দ্দেশ দেন। এক্ষেত্রে সুবিধা এই যে চিরচলিত প্রথামত আর মুখে বলিতে হয় না "সমবেত দর্শকমণ্ডলী, এই খেলাই আজ আমার শেষ খেলা, ইত্যাদি"। ঝাঁকানি দিয়া Good Night লেখা বাহির করিয়া দিলেই হইল। বর্ত্তমানে আমি Good Night Target একটি খেলার আবিষ্কার করিয়াছি—এটি দ্বারা প্রোগ্রাম শেষ করা যায়।

"Good Night Target" গুড নাইট্ টারগেট

এইটি আমার সর্ব্বশেষ খেলা। রঙ্গমঞ্চের মধ্যে একটি Target বা চাঁদমারী ফিতা দ্বারা ঝুলান রহিয়াছে। যাদুকর সমস্ত খেলার শেষে রঙ্গমঞ্চে আসিলেন এবং দর্শকদিগকে তাঁহার মন্ত্রপূত চাঁদমারীর দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন। দর্শকগণ সেইদিকে তাকাইয়া আছেন, তখন দুম্ করিয়া যাদুকরের পিস্তলের আওয়াজ হইল। কি আশ্চর্য্য, যেস্থলে চাঁদমারী ছিল সেখানে রাজা ও রাণীর ছবি রহিয়াছে—উপরে রহিয়াছে রাজমুকুট (crown), দুইদিকে বড় বড় দুইটি ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' এবং দুইটা ছোট ফ্লাগের মালা দ্বারা উহা ঝুলান—শুধু তাহাই নহে, দুইটা ছোট বোর্ডের উপর লেখা রহিয়াছে Good Night সঙ্গে সঙ্গে "God save the king" এই Back ground Music বাজিয়া উঠিল এবং খেলা শেষ। যাঁহারা ইচ্ছা করেন মধ্যস্থলে মহাত্মা গান্ধীর ছবি, উপরে চরকা এবং দুইদিকে স্বরাজ পতাকা দ্বারা খেলাটি করিতে পারেন—এক্ষেত্রে back ground music 'বন্দে মাতরম্' দিতে হয় তবে খেলা সুন্দর হয়। আমি এইভাবে অনেকবার করিয়াছি এবং সকলেই এই খেলা পছন্দ করিয়াছেন। এই খেলায় সুবিধা এই যে চিরাচরিত প্রথায় আসিয়া বলিতে হয় না—"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! এবারে আমার খেলা শেষ হইল, ইত্যাদি।" একটিবারমাত্র বন্দুকের আওয়াজ করিলেই Good Night লেখা বাহির হইল এবং যাদুকর মাথা একটু নীচু করিয়া দর্শকদিগকে অভিবাদন করিলেন ও বিদায় লইলেন, সকলেই বুঝিলেন খেলা শেষ। এই খেলাটির মূল কৌশল ঐ যন্ত্রটি প্রস্তুত করার মধ্যে—লিখিয়া উহা বুঝান কষ্টকর—চিত্রে ইহা খুব ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে। 'ক্রাউন'টি স্প্রিংএর সাহায্যে ফিট করা থাকে এবং টারগেটের পিছনে ভাঁজ (fold) করা থাকে। সুতা টানিয়া দিলে উহা লাফ দিয়া সোজা দাঁড়াইয়া উঠে। ফ্লাগের রড দুইটি দুইবার ভাঁজ হইয়া টারগেটের পিছনে লুকান থাকে—ঐগুলিও স্প্রিং-এর কব্জা দ্বারা আটকান কাজেই একটু আঘাত দিলেই লাফ দিয়া দুইদিকে দুইটি খুলিয়া যায়। ছোট ছোট ফ্লাগের মালা দুইটির একপ্রান্ত ঐ ফ্লাগরডের সহিত ও অপর প্রান্ত টারগেটের উপর দিকে আটকান থাকে এবং উহা গুটাইয়া (ভাঁজ করিয়া) রাখিতে হয়। সম্মুখের টারগেটটি তিন পিস (3 Ply) কাঠের তৈয়ারী, মধ্যস্থলে দুই খণ্ড হইয়া দুইদিকে চলিয়া যায় এবং প্রত্যেক খণ্ড মধ্যস্থলে ভাঁজ হইয়া পড়ে—উহাতে লেখা থাকে একটিতে Good এবং অপরটিতে Night, এই খেলার মজা এই যে একটিমাত্র ১৬ ইঞ্চি স্কোয়ার টারগেট হইতে ৮০ ইঞ্চি লম্বা ও ২৪ ইঞ্চি চওড়া জিনিষ বাহির হইয়া ষ্টেজ ভরিয়া যায় কাজেই সকলে এখেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। চিত্রে প্রথমে ঐ টারগেট দেখান হইয়াছে—তৎপর দেখান হইয়াছে কি ভাবে টারগেট দুই ভাঁজ হইয়া Good এবং Night কথা দুইটি বাহির হয়। তারপর দেখান হইয়াছে Good Night Target খুলিয়া গেলে উহা কিরূপ দেখাইয়া থাকে। উহার পরেই এই টারগেটের যথাক্রমে পার্শ্বের দৃশ্য (Side View) এবং পশ্চাতের দৃশ্য (Back View) দেখান হইয়াছে। সর্ব্বশেষে Flag Rodগুলি কি ভাবে ভাঁজ করা থাকে তাহাই দেখান হইয়াছে। খেলাটি অতিশয় সহজ, সুন্দর এবং এইটি প্রত্যেক ব্যবসায়ী যাদুকর দেখাইতে পারেন। আমি নিজে এই খেলাটি অদ্যাবধি দেখাইয়া থাকি। চিত্র ভাল করিয়া দেখিলে এই যন্ত্র প্রস্তুতের কৌশল সহজে বোধগম্য হইবে। ইহার সমস্ত অংশই কাঠের তৈয়ারী হইলেও আমি পিতল দিয়া ইহা তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছি। পিতলের উপর নিকেল করা 'গুড নাইট টারগেট' যন্ত্র সম্বলিত ম্যাজিক জগতে খুবই আদরের খেলা। এই ধরণের খেলাকেই আমরা "delightfully beautiful" আখ্যা দিয়া থাকি।



গুড-নাইট টারগেট খেলা ও তাহার নির্ম্মাণ কৌশল

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫

খুব ভোরে ওঠাই মণিমোহনের অভ্যাস। আজও যখন তার ঘুম ভাঙিল, ঘড়িতে পাঁচটা বাজে নাই তখনও। কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অনুজ্জ্বল আলো ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারটাকে যেন সবুজ আর স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। পাশে রাণী ঘুমাইয়া আছে, ঝিণ্টু দু হাত দিয়া একান্ত করিয়া আঁকড়াইয়া আছে মা-কে। রাণীর বিস্রস্ত চুল হইতে একটি স্তবক আসিয়া ঝিণ্টুর নিদ্রিত মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—মায়ের উপর স্পর্শ সুগভীর ভালোবাসার মতো।

এই তো জীবন। পরিপূর্ণ—সমস্যাহীন, সংঘাতহীন। বংশচক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, মানুষের বিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে—বিস্তার ঘটিয়া চলিয়াছে জৈব প্রবাহে। প্রাণ হইতে প্রাণে, রূপ হইতে রূপে। কী প্রয়োজন বিপ্লব ঘটাইয়া, উল্কার আলোকে জীবনে আহ্বান করিয়া? যা কখনো সত্য হইয়া উঠিবে না—একটা প্রখর আলোর বিচ্ছুরিত রশ্মিধারায় জ্বালাইয়া দিয়া যাইবে শুধু?

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিল মণিমোহন। ভোরের আলোয় তন্দ্রাচ্ছন্ন পৃথিবী। চর ইসমাইলের নোনা মাটিতে প্রাণের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তো পরিণতি। অসীম উন্মুক্ততার যাযাবর বৃত্তি হইতে নীড়ের সংকীর্ণ সীমানাতে—সংঘাত হইতে সন্ধিতে।

রাণী ঘুমাইতেছে—ঝিণ্টু ঘুমাইতেছে। পায়ের কাছ হইতে র‍্যাগটা তুলিয়া আনিয়া দুজনকেই সযত্নে ঢাকিয়া দিল মণিমোহন। এ পাশের জানালা দিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। এই ঠাণ্ডাটা ভালো নয়, রাণীর জ্বর আবার বাড়িতে পারে। টেবিলের উপরে ম্লানাভ লাল লেখা বিকীর্ণ করিয়া একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, পোড়া কেরোসিনের লঘু বিস্বাদ গন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মণিমোহন লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিল।

পায়ের মধ্যে চটিটা টানিয়া আনিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল সে। আবছায়া আলোর গ্রাম এবং অরণ্য যেন অবসিত স্বপ্নের রেশ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। সামনের বাব্‌লা গাছটায় দু তিনটা কাক একসঙ্গে পাখা ঝাড়া দিয়া কা কা করিয়া প্রভাতী ঘোষণা করিল, বৈতালিক মুরগীর উদাত্ত আহ্বান ভাসিয়া আসিল গ্রামের দিক হইতে। ওপাশে নদীর উপরে খানিকটা হালকা কুয়াশা জমিয়া আছে, ভালো করিয়া নজর চলে না, শুধু কতগুলি নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলকে অনুমান করিয়া লওয়া চলে মাত্র।

বারান্দায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। ভারী ভালো লাগিতেছে—এই অপূর্ব ব্রাহ্ম মুহূর্তে মনের উপর হইতে সমস্ত দ্বন্দ্ব—সমস্ত সংশয়ের জালটা যেন সরিয়া গিয়াছে। ঝির ঝির করিয়া হাওয়া আসিয়া যেন উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে রাত্রির সমস্ত জড়তা—সমস্ত ক্লান্তি।

একটা দাঁতন করিতে করিতে পিয়ারী দেখা দিল। মণিমোহন বলিল, কোটটা বার করে দে তো, দু পা হেঁটে আসা যাক।

নদীর ধার দিয়া মেটে পথটায় সে চলিতে লাগিল। একটু একটু করিয়া প্রসন্ন উজ্জ্বল দিন দিগন্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। আকাশের নীলিমা এখনো স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই—ধূসরতার একটা আচ্ছাদন পূর্বাঞ্চলকে সমাবৃত করিয়া আছে। তাহারি মধ্য দিয়া উজ্জ্বল রক্ত বিন্দুর মতো সূর্য দেখা দিল—সেদিকে তাকাইয়া মণিমোহনের মনে হইল যেন ভস্মভূষণা গৌরীর সীমন্তে সিন্দূরের একটা বিন্দু জ্বলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন একনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতেছে—যেন স্থিরব্রতা পার্বতীর মতো বরাভয় কামনা করিতেছে জীবনের জন্য, কল্যাণের জন্য, সন্তানের জন্য।

পায়ের নীচে ঘাসের উপর শিশির বিন্দু চিক চিক করিতেছে। নদীর গেরি মাটি রাঙা জল লাল হইয়া উঠিল। এক একটি করিয়া নৌকা ভাসিয়া পড়িল—পূবের কোনো চরে কাজ করিতে চলিল হয়তো।

—সেলাম হুজুর।

সামনে একটি মুসলমান যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একটি কালো ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা দুধ। বলিষ্ঠ বুক, বলিষ্ঠ পেশী। হাতটা আর একবার কপালে তুলিয়া বলিল, হুজুর, সেলাম।

মণিমোহন দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কী চাই তোমার?

—একটা কথা বলব হুজুর।

—বলো।

রূপার সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া মণিমোহন সিগারেট ধরাইল, তারপর লোকটির মুখের দিকে তাকাইল। ঠিক মুখের দিকে নয়—মুখের পাশ দিয়া তির্যক ভঙ্গিতে আকাশের একপ্রান্তে এক খণ্ড শাদা মেঘের দিকে। অধস্তনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার ইহাই আভিজাত্য সম্মত প্রথা—বহুদিনের অভ্যাসে এই আর্টটা মণিমোহন আয়ত্ত করিয়াছে। নীচের দিকে চাহিলে দীনতা, পাশের

দিকে তাকাইলে অন্যমনস্কতা, ঠিক মুখোমুখি তাকাইলে একটা অবাঞ্ছিত সাম্যবোধ। অতএব ঠিক কানের পাশ দিয়া এমনভাবে উপরের দিকে চোখ তুলিয়া রাখিবে যে তোমার মুখের পানে চাহিলেই মনে হইবে তুমি নিতান্তই এই পৃথিবীর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নও—তোমার সহিত উর্ধ্বের কোনো একটা স্বর্গলোকের নিবিড় আত্মীয়তা আছে। একজন সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এই সমস্ত মূল্যবান মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক উপদেশ দিয়া মণিমোহনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করিল—নিজের মনের সংকোচ ও সংশয়টাকে জয় করিবার চেষ্টা করিল বার কয়েক। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলিল, আপনি হাকিম, আপনাদের হাতেই সব। জুলুমবাজি বন্ধ করবার একটা ব্যবস্থা করুন হুজুর।

জুলুমবাজি? কিসের জুলুমবাজি?

—মহাজনের, আড়তদারের।

কথাটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ হইয়া মণিমোহনের কানে আসিয়া আঘাত করিল। এই সুরটা ভালো নয়—সাধারণ একজন মুসলমান চাষা প্রজার মুখ হইতে কথাগুলি যেমন অবাঞ্ছিত, তেমনি অস্বস্তিকর। জমি লইয়া ঝামেলী নয়, নারীঘটিত ব্যাপারও কিছু নয়, নজরটা সোজা গিয়া পড়িয়াছে মহাজন আর আড়তদারদের উপরে। অবচেতন চিন্তাকে চকিত করিয়া দিয়া মনে হইল, লোকটা যাহা বলিতেছে, এইখানেই তাহার শেষ নয়—ইহার মূল দূর-দূরান্তব্যাপী—ইহার জটিল শিকড়ের জাল আরো অনেকখানি গভীরে গিয়াই ঠেকিয়াছে। সহরের পথে ঘাটে বজ্রকণ্ঠে 'শ্লোগান' শুনিলে ভয় করে না—পতাকাবাহী জনতার চলন্ত মিছিলটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ভালোই লাগে একরকম। কিন্তু চর ইসমাইলের এই প্রত্যন্তে এমনি একটা সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই যেন আসন্ন বৈশাখী ঝড়ের সংকেত লুকাইয়া থাকে।

উর্ধ্বচারী দৃষ্টিটা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল—সোজা আসিয়া পড়িল লোকটির মুখের উপরে। যেন তাহার ভিতরের সবটাই মণিমোহন দেখিয়া ফেলিতে চায়। খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশব্দে নদীর হুহু বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে জমির। কলুপাড়ায় আমার বাড়ী—হাট বাজার করতে প্রায়ই এখানে আসতে হয় আমাকে। কাসেম খাঁর ব্যাটা বললেই লোকে চিনবে আমাকে।

—হুঁ। তা আড়তদার মহাজনের ওপরে এত চটেছ কেন?

—তা ছাড়া আর কার ওপরে চটব হুজুর? আপনি তো হাকিম—প্রজার মা বাপ, নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধের জন্যে আকাল দেখা দিয়েছে চারভিতে। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না—আধপেটা খেয়ে কোনোমতে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। ওদিকে অসুখ বিসুখ—সরকারী দাওয়াই-খানাতে এক ফোঁটা ওষুধ নেই যে—

যেমন অস্বস্তি, তেমনি বিরক্তি বোধ করেন মণিমোহন। যেন বক্তৃতায় পাইয়াছে লোকটাকে। কখন যে সংকোচ আর ছায়ার আবরণটা তাহার সরিয়া গেছে—একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা পড়িয়াছে চোখে মুখে—কঠিন হইয়া উঠিয়াছে খাড়া চোয়ালে, কুঞ্চিত ভ্রূ রেখাতে। প্রসারিত বুক আর সুগঠিত মাংসপেশীতে যেন শক্তির তরঙ্গ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। চকিতে একটা তীব্র সন্দেহে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠল। লোকটা পলিটীক্স করিয়া বেড়ায় না তো? গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িয়া যাহারা—

হাতের সিগারেটটাকে জুতার নীচে মাড়াইয়া সে অসহিষ্ণুভাবে বলিল—আমার সময় নেই, সংক্ষেপে বলো।

—আজ্ঞে, সংক্ষেপেই বলব। আপনি হাকিম—কত কাজ, কত ভাবনা আপনার—সে কি আর জানিনা। যেন বিনয়ে গলিয়া গেল জমির।

কিন্তু এই বিনয়টাও তেমন প্রীতিকর লাগিলনা! ইহার মধ্যে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে—একটা বিদ্রূপের খোঁচা আছে। হঠাৎ মনে হইল সরকারী বাবু কিংবা হাকিমদের সে সব দিন যেন আর নাই। মাটির তলায় কোথায় বাসুকীর ফণা আর ভার বহিতে পারিতেছে না—বহুদিনের আদায় করিয়া লওয়া সম্মান আর আভিজাত্যের সিংহাসনটা যেন কিসের স্পর্শে টলমল করিয়া নড়িতেছে।

—বলো, বলো, কী বলছিলে বলো।

—আজ্ঞে চাল তো ক্রমেই আক্রা হয়ে উঠছে। বেশি দর পেয়ে যারা ধান বেচে দিয়েছিল, তাদের ঘরের খোরাক ফুরিয়ে গেছে। আধিয়ার আর জনমজুরদের তো কথাই নেই। চাল কিনতে পারছে না কেউ। সব গিয়ে জমেছে আড়তদার আর মহাজনের গোলায়। ধান কিনতে গেলে পনেরো ষোলো টাকা দর হাঁকে তারা। অথচ হুজুর—বোঝেন তো—

—বুঝি।—মণিমোহনের গলার স্বরে এবারে আর স্বচ্ছন্দ ঔদার্য প্রকাশ পাইল না: তা আমাকে কী করতে হবে?

জমির কিন্তু দমিল না: আপনিই তো সব করবেন হুজুর। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সকলকে চাল ছাড়তে বলে দিন, নইলে মানুষ না খেয়ে মরে যাবে।

লোকটা যেন হুকুম করিতেছে!

চড়া গলায় মণিমোহন বলিল: চাল ছাড়তে বলব? আমার

কথা কেন শুনতে যাবে ওরা? মহাজনের ধান—সে যদি বিক্রী করতে না চায়, তা হলে কার কী বলবার আছে?

জমির আবার হাসিল: আপনার কথা শুনবে না? এও কি একটা কথা হল হুজুর? আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনাকে মানবে না—কার ঘাড়ে এমন কটা মাথা গজিয়েছে?

শেষ কথাগুলির মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা আছে তবু মণিমোহন খুশি হইয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, আমি তো বললাম, তবু ওরা যদি চাল ছেড়ে না দেয়?

জমিরের চোখ ঝক ঝক করিয়া উঠিল: তা হলে বাকীটা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দেবেন। আমরাই দেখব কিছু করতে পারি কি না! বড়লোক হলেই গরীবকে মারবার এক্তিয়ার কারো জন্মায় না হুজুর।

কিন্তু মণিমোহনের প্রসন্নটা আর ভালো লাগিতেছে না। প্রসন্ন সকাল—নদীর জলে প্রথম সূর্যের আলো পড়িয়াছে। ভিজা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাটির মিষ্টি গন্ধ। সমস্ত পৃথিবীটার যেন সুর কাটিয়া গেছে—আকাশ বাতাস ঘিরিয়া একটা আসন্ন দুর্যোগের কালো ইঙ্গিত যেন ছায়া ফেলিয়াছে লোকটার সর্বাঙ্গে। অধীরভাবে মণিমোহন বলিল, আচ্ছা, পরে আবার দেখা কোরো। এখন সময় নেই আমার।

—সেলাম হুজুর।

জমির আর দাঁড়াইল না। দুধের ভাঁড়টা মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানে এডিংটনের দান

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে

স্যার আর্থার এডিংটনের মৃত্যু বিজ্ঞান জগতের অপরিসীম ক্ষতি; জ্যোতির্বিদ্ ও প্রাকৃতিক দর্শনবিদ্‌রূপে এই মনীষী বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতিভাসূর্য্য মধ্যাহ্ন আকাশে বিদ্যমান থাকিতেই ৬২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। জন্ম মৃত্যু মনুষ্যজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু এক একজন মানুষ এই পৃথিবীতে আসেন যাঁহাদের মৃত্যুতে বিশ্বমানব ক্ষতি ও অভাববেদনা বোধ করে। এডিংটন ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষ। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার দান বিপ্লবাত্মক ও সুগভীর সম্ভাবনাপূর্ণ। তাই তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় এবং আজ পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞানপিপাসু মাত্রেই তাঁহার অভাব বেদনা বোধ করিতেছে।

এডিংটন ছাত্রজীবনে একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকীয় বীক্ষণাগারের (**Royal ovservatory**) প্রধান সহায়ক নিযুক্ত হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষে প্লুমিয়ান প্রফেসার (**Plumian Professor**) পদ পান এবং পরবর্ত্তী বৎসর ক্যাম্বিজ বীক্ষণাগারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই বৎসরই তিনি রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী।

নাক্ষত্র-জ্যোতিষ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অতি অল্প দিনের। এডিংটনের রচিত **Stellar Motions and the structure of the Universe** পুস্তকে (১৯১৪ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম নাক্ষত্র-জ্যোতিষ সম্বন্ধে সমগ্রভাবে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এডিংটন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১৪—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় মহাসমরের জন্য আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে তথ্যাদি ইংলণ্ডে অনেকটা অজ্ঞাত ছিল। ওলন্দাজ জ্যোতিষী ডিসিটারের (**desitter**) নিকট হইতে তিনি আইনষ্টাইনের প্রবন্ধসমূহের এক প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। আপেক্ষিকতা' বাদ সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ তাঁহারই রচিত। এই প্রবন্ধ ফিজিক্যাল সোসাইটিতে পঠিত হওয়ার পর আপেক্ষিকতাবাদ ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণের জন্য যুগপৎ দুইটি অভিযান হইয়াছিল; একটির অধিনায়ক ছিলেন এডিংটন। আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে আলো সূর্য্য বা কোন নক্ষত্রের নিকট দিয়া যাইবার সময় বাঁকিয়া যায়। সূর্য্যের আকর্ষণে বাঁকার মাত্রাও অঙ্ক কষিয়া বাহির করা হইয়াছিল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আপেক্ষিকতাবাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হয় এবং ইহার ফলে আপেক্ষিতাবাদ বৈজ্ঞানিকমহলে পরিগৃহীত হয়। এডিংটনের রচিত **Space, Time and Gravitation** গ্রন্থ (১৯২০ খৃঃ) সাধারণভাবে আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। এই সময়ে অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে বহুগ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন গ্রন্থকারই এডিংটনের ন্যায় বিষয়টি এমন সুষ্ঠুরূপে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত **The Mathematical Theory of Relativity** গ্রন্থ তাঁহার গবেষণা লইয়া প্রকাশিত হয়।

এডিংটনের **Internal constitution of the stars** গ্রন্থ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাপূর্ণ গবেষণা লইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বহুদূরস্থিত নক্ষত্রের অন্তর রাজ্যের সংবাদ দিয়াছেন তিনি, গণিতের সাহায্যে, 'গাণিতিক ছেঁদা করিবার যন্ত্র' (**Mathematical boring machine**) বলিয়া তাঁহার এই গণিতের কার্য্যকে সম্মান দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার এই সমস্ত গবেষণা গণিতের অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেয়। বলা হইয়াছে তিনি যদি এমন কোন গ্রহে জন্মগ্রহণ

করিতেন—যেখান হইতে এ গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অবচ্ছলতা হেতু নক্ষত্রদের দেখা যাইত না, তবুও তিনি গণিতের সাহায্যে বলিয়া দিতে পারিতেন যে মহাশূন্যে স্বতঃ জ্যোতিষ্মান জড়পিণ্ড থাকিলে তাহার আভ্যন্তরিক গঠন কিরূপ হইবে, তাঁহার প্রসিদ্ধ mass-luminocity law নক্ষত্রদের ঔজ্জ্বল্য ও ভারের (weight) মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা বলিয়া দেয়। নক্ষত্রদের উজ্জ্বলতা জানিবার উপায় জ্যোতির্বীদের জানা আছে এবং এই উজ্জ্বলতা জানিয়া এডিংটনের mass-luminocity lawএর সাহায্যে অঙ্ক কষিয়া তাহার বস্তুমান বা ভার জানা যায়। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে আয়তনে নক্ষত্রদের মধ্যে মহাপার্থক্য থাকিলেও তাহাদের বস্তুমান বা ভারের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। নক্ষত্রের আয়তন পৃথিবীর সমান, এমন কি পৃথিবী অপেক্ষা কমও হইতে পারে।১ সূর্য্যের লক্ষাংশ কি তাহারও কম আয়তনের এবং অপর পক্ষে সূর্য্যের কোটি গুণ কি তাহারও বেশি আয়তনের সব নক্ষত্র আছে। কিন্তু বস্তুমান সাধারণতঃ সূর্য্যের এক তৃতীয়াংশ হইতে দশ গুণের মধ্যেই। এই বস্তুমানের নিম্ন ও উচ্চ সীমা যথাক্রমে সূর্য্যের দশমাংশ ও শতগুণ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অবৈজ্ঞানিক পাঠকদের উপযোগী এডিংটনের **Stars and Atoms** গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, পর বৎসর তাঁহার **Nature of the physical world** গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে চিন্তা রাজ্যে তিনি বহু উচ্চে বিচরণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষা সহায়ে যে সমস্ত সত্যে উপনীত হইতেছে তৎসমুদয়ই এক বিরাট উপলব্ধিগম্য জ্ঞানের অন্তর্ভূ্ত।

বিশ্বের বিশালতা সম্বন্ধে যে তথ্য আজ জ্যোতির্বীদের বোধগম্য হইয়াছে এডিংটন তাহাকে রূপ দিয়াছেন তাঁহার প্রসিদ্ধ সূত্রে—

দশ সহস্র কোটি নক্ষত্র = ১ নাক্ষত্র জগৎ।

দশ সহস্র কোটি নাক্ষত্র জগৎ = ১ বিশ্ব।

সাধারণ পাঠকের জানা আছে যে এক একটি নক্ষত্র ছোট বড় এক একটি সূর্য্য। দুইটি নক্ষত্রের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব প্রায় ৪ আলোক-বৎসর অর্থাৎ আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া কোন নক্ষত্র হইতে তাহার নিকটতম নক্ষত্রে পৌঁছিতে অন্ততঃ ৪ বৎসর২ সময় অতিবাহিত হয়। এক একটি নক্ষত্র-জগতে এরকমভাবে প্রায় দশ সহস্র কোটি নক্ষত্রের সমাবেশ, এই রকম একটি নক্ষত্র-জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছিতে ৫০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে, এক একটি নক্ষত্র জগতের চারিদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত বিরাট শূন্য এবং একটা নক্ষত্র জগৎ যে স্থান জুড়িয়া আছে তাহার অন্ততঃ ৮ গুণ দূরে আর একটা নক্ষত্র জগৎ মিলে, এই রকমভাবে অন্ততঃ দশ সহস্র কোটি নক্ষত্র-জগৎ আমাদের এই বিশ্বে বর্ত্তমান, সমগ্র বিশ্বে কতটা পদার্থ আছে অর্থাৎ বিশ্বের ইলেকট্রণ ও প্রোটন সংখ্যাও তিনি অঙ্ক কষিয়া নির্ণয় করিয়াছেন—অবশ্য ইহা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ, নক্ষত্র জগৎগুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে ইহা জ্যোতির্বীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এজন্য বলা হইয়াছে বিশ্ব প্রসারণশীল। এডিংটনের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক **Expanding universe** (১৯৩৩ খৃঃ) এই প্রসারণশীল বিশ্ব সম্বন্ধে গবেষণায় পূর্ণ অথচ সাধারণের অধিগম্য গ্রন্থ। বিশ্ব স্ফীত হইতেছে বলিয়াই নক্ষত্র-জগৎগুলির পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। ছবি বা চিহ্ন আঁকা রহিয়াছে এমন একটি খেলনার বেলুনকে ফুলাইলে ছবি বা চিহ্নগুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া যায়। এখানে বেলুনের পৃষ্ঠদেশ স্ফীত হইতেছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট তিন আয়তনে। নক্ষত্র জগৎগুলি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ বিশিষ্ট তিন আয়তনেই বিদ্যমান, অতএব এই তিন আয়তন স্ফীত হইতেছে দেশকাল বিশিষ্ট চার আয়তনে। চার আয়তন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও গণিত শাস্ত্র ইহার সভ্যতা প্রমাণ করে।

কিন্তু এই যে নক্ষত্র জগৎ সমন্বিত বিশ্ব ইহা কি সসীম না অসীম—সান্ত না অনন্ত, আর নক্ষত্র জগৎগুলির পরস্পর দূরত্ব যে বাড়িয়া চলিয়াছে ইহারই বা পরিণতি কোথায়? ভূপৃষ্ঠের উপর কেহ যদি একদিকে চলিতে থাকে তাহার চলার পথ কোন সীমায় গিয়া আটকাইয়া পড়ে না সত্য, কিন্তু এ যাত্রা তাহাকে অনন্তে লইয়া যায় না—একদিন সে আবার যাত্রা স্থানেই ফিরিয়া আসে। আমরা বলিতে পারি ভূপৃষ্ঠ অসীম,—কিন্তু তাই বলিয়া অনন্ত নয়। ইহা তিন আয়তন বিশিষ্ট পৃথিবীকে ঘিরিয়া আছে এবং ইহার পরিমাণ বা ক্ষেত্রফল সান্ত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে পৃথিবী পৃষ্ঠকে সমতল মনে করিতেন, যিনি পৃথিবীর গোলত্ব ধারণা করিতে অক্ষম ছিলেন—তাঁহার কাছে ইহা খুবই আশ্চর্য্য ঠেকিত সন্দেহ নাই। আপেক্ষিকতাবাদ মতে এই বিশ্বও অসীম কিন্তু অনন্ত নহে। সুতরাং নক্ষত্র জগৎগুলি যে দেশের (space) অভ্যন্তরে আছে তাহার পরিমাণ বা ঘনমানের একটা অন্ত আছে। ইহা চার আয়তন বিশিষ্ট, আমাদের দেশ-কালকে ঘেরিয়া আছে এবং স্ফীত হইতেছে অর্থাৎ ইহার ঘনমান (volume) বাড়িয়া চলিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও ক্ষতি নাই! বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ যদি ইহাই হয়, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলিয়া ইহাকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ চিরকালই ঠকিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর গোলত্ব, পৃথিবীর সূর্য্য পরিক্রমণ এবং আপন মেরুদণ্ডের উপর পূর্ব্বাভিমুখী আবর্ত্তন—এগুলি একদিন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল না এমন কি বুদ্ধিগ্রাহ্যও ছিল না, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের ঘুরপাক খাওয়াকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সত্য মনে করিতেন—আজ আমরা জানি এত বড় অসত্য আর নাই। তেমনই আজ যে সত্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কঠিন আমাদের পরবর্ত্তীরা যখন অধিকতর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে তখন তাহাদের পক্ষে উহা হয়ত সহজ হইবে। এডিংটনের সন্ধানী দৃষ্টি নব্য-বিজ্ঞানকে প্রশ্ন করিতেছে—বিশ্ব যে স্ফীত হইতেছে, এই স্ফীতি একটা সীমায় পৌঁছানর পর ইহা কি আবার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিবে, অথবা কালের কোলে ফাটিয়া পড়িবে খেলানার বেলুনেরই মত? এ প্রশ্নের উত্তর মানুষ কোনদিন পাইবে কিনা বলা যায় না, শেষ প্রশ্ন—বিশ্ব-রচয়িতা যিনি, তিনি এরকম কোটি কোটি বিশ্বের জনক কিনা তাহাই বা কে বলিয়া দিবে?

১ সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তের লক্ষ গুণ।

২ এক বৎসরে আলোক ছয় লক্ষ কোটি (৬ × ১০১২) মাইল পথ ভ্রমণ করে।

নীচে-তলা

শ্রীসুবোধ বসু

বেলা দশটায় কর্তা-মশায়ের দুধ খাইবার সময়। তার আর দশ মিনিটও বাকি নাই।

পঙ্খের কাজ-করা মেঝের তৃতীয়াংশ জোড়া নিচু তক্তপোষের উপর ধবধবে চাদর পাতা। কিংখাবে মোড়া এবং কিংখাব ছাড়া গোটাকয়েক তাকিয়া তার উপর ছড়ানো। পান-দান, আতর-পাশ, পিক-দান এসব ফরাসের উপরেই কর্তা-মশায়ের কাছাকাছি রহিয়াছে যাতে প্রয়োজনের সময় পাইতে বেগ না হয়। জবরজঙ্গ আলবোলাটার বিচিত্র নল একটা অজানা সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে। নিবিয়া-যাওয়া অম্বুরি তামাকের একটা অনতিস্পষ্ট গন্ধে ঘরটা ভরা।

কর্তা-মশায় সুমুখের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। আর সামান্য পরেই ভিতর হইতে রঙিন পাখিটা বাহির হইয়া আসিয়া দশটি ঠোকর মারিয়া যাইবে। তখনও যদি দুধ না আসিয়া পৌঁছায় তবে যমরাজের রথই আসিয়া পৌঁছাইবে। অথচ রামু-বেয়ারা এত বড় একটা জীবন-মরণের ব্যাপারের প্রতি সামান্যমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বেশ নিশ্চিন্তে গা-ঢাকা দিয়া আছে! এটা শুধু বেয়াদপি নয়, রীতিমত শত্রুতা! অথচ ছেলেরা সুপারিশ করিয়াই এই তরল-মতি ছোক্‌রাটাকে তার খাস্‌-বেয়ারার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল!

তাকিয়াটায় ভর দিয়া কিছু সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ সাতঙ্কে কয়বার হাঁক ছাড়িলেন। কোনও সাড়া মিলিল না। কেন? কেন একপ্রান্তে তাহার বৈঠকখানা হইবে? ছেলেরা বলে, পুব আর দক্ষিণ খোলা এটাই নাকি দোতলার সেরা ঘর। বহিয়া গেল সেরা ঘরে, অথচ কণ্ঠ ফাটাইয়া চিৎকার করিলেও যে একটা বেয়াদপ চাকরের কানে ডাক পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় না, তার কি? কর্তা শিবপ্রকাশ চৌধুরী রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিলেন।

কালই তিনি ওদিককার ছেলেদের অফিসঘরগুলির একটিতে তার বৈঠকখানা পরিবর্তন করিবেন। সিঁড়িতে লোক ওঠা-নামার শব্দে তার কোনই অসুবিধা হইবে না। পাঁচ পুরুষে জমিদার তিনি, তাঁর বৈঠকখানায় চিরদিনই লোক গিস্‌গিস্‌ করিয়াছে। বার্দ্ধক্যের ওজুহাতে এবং শহুরে কেতার খাতিরে ছেলেরা তাকে নির্জ্জনতার মধ্যে নির্ব্বাসন দিবে, এ তিনি সহিবেন না! 'এখনও আমি বাড়ির কর্তা,' তিনি ছেলেমানুষের মতো মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ কি! দশটা বাজিতে যে আর মাত্র পাঁচটা মিনিট! স্বয়ং যে এত বড়ো জমিদার, ছেলেরা যার এতগুলি মিলের মালিক, তাকে কিনা শেষে দুধের অভাবেই শেষ হইতে হইবে!

বৃদ্ধ শিবপ্রকাশ গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেন জলে পড়িয়াছেন, ডুবিয়া মরিতে আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব।

রামু-বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'কর্তা, আমাকে ডাকছিলেন?'

'ডাকছিলাম মানে হারামজাদা,' রাগে শিবপ্রকাশের কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিল, 'বাড়ি ফাটিয়ে ফেলছিলাম, হৃৎপিণ্ড বন্ধ করবার জোগাড় করেছিলাম। গোলামের বাচ্চা, ছিলি কোথায়? মারতে চাস্‌? মারতে চাস্‌ আমাকে?' উত্তেজনার ঘোরে তিনি একই কথার অনুবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

'হুজুর, এখনও তো সময় হয় নি। দুধ গরম বসেছে।'

'চুপ রও হারামজাদা। সময় হয় নি! আমার চেয়ে বেশি জানিস তুই?' অবসন্ন হইয়া বৃদ্ধ কিংখাবের তাকিয়াতে এলাইয়া পড়িলেন। 'বেশ, সময় হয় নি, হয় নি। কিন্তু থাকিস কোথায়? ডাকলে সাড়া পাব না কেন, বেয়াদপ? ছিলি কোথায়?'

রামু অপরাধীর কণ্ঠে কহিল, 'খুকুদিদির ইস্কুলে পড়ছিলাম, হুজুর!'

বৃদ্ধ তাকিয়ায় ভর দিয়া আবার উঠিয়া বসিলেন। গণ্ডের শ্মশ্রু-বিমুক্ত স্থানগুলি সহসা প্রসন্ন হাস্যের আভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চোখের দৃষ্টি প্রসন্ন ও তরল হইল। প্রায় মোলায়েম কণ্ঠে কহিলেন, 'ওঃ, তুই-ও বুঝি আমার দিদিমণির ইস্কুলের ছাত্র! বেশ, বেশ! খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বি। কি বই পড়িস তুই?'

রামু মুখ নিচু করিয়া কহিল, 'বর্ণ-পরিচয়, ফার্ষ্ট-রিডার আর প্রথম পাটিগণিত।'

'ওঃ, সে বুঝি এগুলি শেষ করেচে! চমৎকার, চমৎকার মাষ্টার পেয়েছিস রামু। এমন মাষ্টার পেতে হলে সাত জন্মের পুণ্যি করতে হয়।' বলিয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বের ক্রুদ্ধ, তিরস্কার-পরায়ণ বৃদ্ধ হো হো করিয়া অজস্র হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। 'মাষ্টার! খুদে মাষ্টার! হাতে বেত থাকে? থাকে না। বেশ, বেশ। এই নে, এক টাকা বক্‌শিষ, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়বি। একটু ফাঁকি দিয়েচিস কি মাষ্টারের হয়ে…ওরে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর, দেখচিস কি হাঁ করে তাকিয়ে? দশটা বাজতে যে আর দুমিনিটও নেই। ব্যাটা খুনে'-র বাচ্চা, তুই কি আমাকে জলজ্যান্ত খুন করতে চাস্‌?'

রামু বাক্যব্যয় না করিয়া কর্তা-মশায়ের দশটার দুধ আনিতে ছুটিল।

'দাদু?'

'কি দিদিমণি? এই অসময়ে বৈঠকখানা ঘরে মহারাণীর উদয় কেন? অধীনকে এত্তালা পাঠালেই তো সে নিজে তোমার তেতলার খাস্‌-দরবারে হাজির হ'তো!'

'যাও, তুমি কেবল জ্বালানো করো, দাদু। আমার একটা কাজের কথা আছে। চুপটি করে' শুনবে, আর যা করতে বলব করবে, কেমন?'

'তবে আর শোনার প্রয়োজনটা কি দিদিমণি? কি হুকুম, আজ্ঞা কর। বান্দা তামিল করবার জন্ত হুজুরে হাজির আছে।'

কর্ত্তা শিবপ্রকাশের নাত্নী খুকু এগারো বারো বছরের মেয়ে। কিন্তু কথায় ও কর্ত্তৃত্বে সে অতুলনীয়া। তার নিজস্ব একটা জমিদারি আছে। সেটা বাড়ির চাকর, বেয়ারা, ঝি, দারোয়ান, সহিসদের লইয়া। এ জমিদারি হইতে খাজনা আদায় হয় না, নানা ভাবে খাজনা দিতে হয়। তবে অনুগত একদল প্রজা রাণী-মা বলিতে অজ্ঞান হইয়া ওঠে। বাড়ির নিচতলার বাসিন্দাদের উপর খুকুর রাজত্ব।

'দেখো, দাদু…'

'চশমাটা আবার কোথায় রাখলাম?'

'ধ্যেৎ, তোমাকে কিছুই দেখতে হবে না। শুনতে বলছি।'

'তবে তাই বলো,' দুষ্টু হাসিয়া বৃদ্ধ কহিলেন।

'বাবার টাকা বাড়চে, কাকাদের টাকা বাড়চে,' খুকু কহিল, 'তুমি তো রাজা-ই। তবে চাকর-বাকরদের মাইনে বাড়বে না কেন?'

বৃদ্ধ শিবপ্রকাশ চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন, 'এসব কথা কে তোকে শিখিয়ে দিলে, দিদিমণি?'

'কে আবার শিখিয়ে দেবে,' খুকু অবজ্ঞার সঙ্গে কহিল, 'আমি বুঝি সেই ছোট্টটিই আছি। আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারি নে। তুমি একটা কাজ করে' দাও, দাদুমণি। আফিসের চাকরিতে যেমন বছর-বছর মাইনে বাড়ে, ওদেরও তুমি তেমনি করে' দাও। ওরা তো চাকরিই করে আমাদের বাড়িতে। চাকরি করে বলেই তো চাকর।'

দাদু হাসিয়া কহিলেন, 'মহারাণীর যখন এই অভিপ্রায়, তখন তো তোর বাবা-কাকাদের জানিয়ে দিতেই হবে। তারাই তো চাকর রাখে।'

'তবেই হয়েচে!' খুকি প্রবীণার ভঙ্গিতে কহিল, 'ওসব বাবুদের বল্‌লে, তাদের মাইনে বাড়াতে বয়ে গেছে। দূর করে' দেবে সব্বাইকে। ভাববে, ওরা বুঝি আমাকে শিখিয়ে দিয়েচে, যেমনটা তুমি প্রথম ভেবেছিলে। শিখিয়ে দিতে হবে কেন? আমি ওদের পড়াই না? ওদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প আমি শুনি না? ছোটলোক বলে তো আমি নাক-সিঁটকে বেড়াই নে, ওদের সব কথাই জানি।—আর কাউকে বলা-টলা নয়, যা করবার তোমাকেই করতে হবে।'

'আর একটা কথা আছে।' খুকি এইবার একটু দ্বিধা করিয়া কহিল।

'আবার কি হুকুম? এবার থেকে চাকরদের 'বাবু' বলেও ডাক্‌তে হবে কি?'

'বাবু বলবে কেন', খুকি ফ্রকের প্রান্তটা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, 'কিন্তু যখন-তখন গালাগালি করতে পারবে না। পান থেকে চুণ খসলো, অমনি গালি! এই করা পছন্দ হলো না, অমনি বকুনি, এই দালান মন-মতন হলো না, অমনি চোখ-রাঙানি!'

'ওরে বাবা! এ যে চাকরদের সেলাম করে' চলতে হবে দেখচি। এতটা পারব কি, দিদিমণি?'

'পারতেই হবে।' খুকি মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে কহিল। 'গালাগালি দিলে ওদের বুঝি আর কষ্ট হয় না? একটু কড়া কথা বল্‌লেই তো আমার কান্না পায়। চাকর-বাকরেরা লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ নিশ্চয়ই অনেক কাঁদে, আমরা দেখতে পাইনে!'

সত্যকিঙ্কর কর্ত্তা-মশায়ের বড় ছেলে। অসময়ে আজ তিনি অন্দরে আসিলেন। কাজকর্ম্মে সারা সকালটা ঠাসা থাকে; লোকজন আসে, সলা-পরামর্শ হয়, নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির ভাবিতে হয়; নতুন কোম্পানী গঠন, নতুন শেয়ার ছাড়ার পরিকল্পনা বাড়ির অফিস-ঘরেই জন্মলাভ করে। বাহিরের ঘর হইতে আহার করিয়া, পোষাক করিয়া তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা অফিসে যান। অন্দরমহলের সঙ্গে রাতের পূর্ব্বে সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে।

অফিসে আজ ডিরেক্টারদের মিটিং, ব্যাঙ্কের সঙ্গে আরও কয়েক লাখ টাকার ওভার-ড্রাফ্‌টের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কাজের আজ অন্ত নাই। তা সত্ত্বেও অফিসে যাইবার পূর্ব্বে একবার অন্দরে যাইয়া স্ত্রীকে খবরটা জানাইয়া দেওয়া দরকার।

সমুখে মোক্ষদা ঝি-কে দেখিয়া কহিলেন, 'বড়বৌদিকে ডাক দেখি।'

বড়বৌ মৃণালিনী শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতেই বাড়ির গৃহিণী। দিনের অন্তহীন কর্ত্তব্যের মধ্যখানে স্বামীর অসময়োচিত আহ্বানে, বিস্মিত হইয়া তিনি শয়ন-কক্ষে আসিলেন। কহিলেন, 'কি ব্যাপার?'

ভাবলেশহীন মুখে, পোষ্টপিয়নের ঔদাসীন্যের সঙ্গে একটা চিঠি আগাইয়া দিয়া সত্যকিঙ্কর কহিলেন, 'সঞ্জীবের চিঠি। জামাই-ষষ্ঠীতে আসতে পারবে না। ছুটি পেলে না।'

'কেন?' হতাশ হইয়া মৃণালিনী কহিলেন।

'কেন আবার কি। নকরির তো এই হাল্। যত ব্যাটা ছোটলোক সেখানে কর্ত্তা হয়ে কর্ত্তৃত্ব ফলায়।' এবং ভেংচাইয়া কহিলেন, 'সাহেব বলছেন, এখন কাজের খুব ভিড়। জামাই-ষষ্ঠীটা এমন কোনও জরুরি দরকার নয়। এখন যাওয়া চলবে না।—দরকার নয়! ব্যাটা হারামজাদা, তুই কি বুঝবি কোন্‌টা আমাদের জরুরি দরকার, আর কোন্‌টা জরুরি দরকার নয়। সব প্ল্যান্ ভেস্তে দিলে! ভেবেছিলাম, সঞ্জীবকে দিয়ে ধরিয়ে রাজা কমলেশ্বর রায়চৌধুরিকে নতুন কোম্পানীটার মধ্যে টেনে আনব, সম্পর্কে বুড়ো শুধু আমাদের সঞ্জীবের দাদামশাই হয় না, ওকে একটু বিশেষ স্নেহও করেন। তা দিলে সে গুড়ে বালি। বুড়োঘুঘু যা কঞ্জুষ, ওকে বাগানো আমার একলার কর্ম্ম নয়।—একটা মূর্খ সাহেবের জন্ত আমার লাখ লাখ টাকার স্কীমটা মারা পড়বার জোগাড়! —ওদের ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি স্মিথ্ সাহেব কলকাতায় আসুক না, একবার আমি দেখে নেব। তাঁর মেমকে কম টাকার গয়না প্রেজেণ্ট করেছি!'

উত্তেজনায় ঘাম তিনি রুমাল দিয়া মুছিতেছিলেন, সহসা রুমালটা নিচে পড়িয়া গেল।

'ঈস্, এ কি !' মেঝে হইতে রুমাল উঠাইয়া সত্যকিঙ্কর সবিস্ময়ে কহিলেন, 'ধুলো নাকি ! মেঝেতে এত ধুলো এলো কি করে'? মার্বেলের মেঝেতে ধুলো থাকবে কেন ? প্রতি ঘণ্টায় মোছা হচ্ছে, তবু ধুলো ?...'

'আমি রুমালটা পাল্টে দিচ্ছি।' মৃণালিনী দেরাজের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন। 'আজ এসব এখনও কিছু পোঁছা হয় নি। শম্ভুর জ্বর হয়েচে। অন্য কাউকে আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকতে দিতে...'

'শম্ভু ? জ্বর করে' বসেচে ! বটে ?' সহসা সত্যকিঙ্কর জ্বলিয়া উঠিলেন। 'কোথায় সেই হারামজাদা। চাব্‌কে ওকে আমি লাল করব। ছুটি দিইনি বলে মেজাজ দেখানো হচ্ছে ! জ্বর !'

গতকাল শম্ভু চাকর আসিয়া বলে, দেশ হইতে ছোটমেয়ের অসুখের খবর আসিয়াছে। কয়দিনের ছুটি দিতে হইবে। সত্যকিঙ্কর তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়াছিলেন। আর অমনি চট্ করিয়া জ্বর করিয়া বসা হইল ! নেমকহারাম ব্যাটাদের চাব্‌কাইলেও রাগ যায় না। চাওয়া মাত্রই ছুটি দিতে হইবে ? চাকরের ছুটি, পেয়াদার শ্বশুরবাড়ি !

সত্যকিঙ্কর দারোয়ানকে হাঁক দিলেন, 'পাঁড়ে, পাঁড়ে...'

'না, না, দারোয়ানকে কেন', মৃণালিনী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, 'সত্যই হয়তো জ্বর। খোকা দেখে এসেচে। শরীরের ওপর তো কারুর হাত নেই।...'

'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা ! খোকা দেখে এসেছে !' সত্যকিঙ্কর রাগে ফুঁসিয়া উঠিতে লাগিলেন (কেন সঞ্জীব ছুটি পাইবে না, শুনি ?)। 'একটা লোক হাজির না থাকলে এমন কিছু এসে যায় না। কিন্তু জোরাদপি আর মেজাজ কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। চাকর থাকবে চাকরের মতো। আমি দেখচি...'

পাকশালার ওদিকটায় অন্ধকার ভাপ্‌সা একটা ঘরে ভাঙা একটা তক্তপোষের সমুখে আধ-ছেঁড়া শলা-ওঠা একটা মোড়ার উপর বসিয়া খুকি পাখার হাওয়া করিতেছে। ছেঁড়া মাদুরটায় বাড়ির পুরাণো চাকর শম্ভু চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। তার কপালে জল-পটি।

'একটু ভালো লাগচে, শম্ভু ?'

'হ্যাঁ, দিদিরাণী। তুমি এবার যাও। বাবুরা দেখলে রাগ করবেন।'

'তুমি চুপটি করে' শুয়ে থাক।' খুকি কহিল, 'আমার যা ইচ্ছে আমি করব। বকুক না দেখি একবার ! তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না, শম্ভু। দেখো তোমাকে আমি ছুটি পাইয়ে দেই' কিনা। তাড়াতাড়ি জ্বর ভালো করে' ফেল, তারপর কায়দা করে'...তোমার মেয়ে কত বড় ? কি বই পড়ে ? পড়ে না ? এ রাম ! মুখ্‌খু হয়ে থাক্‌বে ? এবার যখন তুমি বাড়ি থেকে ফিরবে, তাকে সঙ্গে করে' নিয়ে এসো। আমার ইস্কুলে তাকে ভর্তি করে' নেব...ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক...'

'এই শম্ভো, শম্ভো', দরজার কাছ হইতে দারোয়ান পাঁড়েজীর বাজখাই কণ্ঠ শুনা গেল। 'বাবুজী এসেচেন, উঠে আয়।' সঙ্গে সঙ্গে সত্যকিঙ্কর নিজেই একেবারে দরজার সমুখে আবির্ভূত হইলেন। মাথার অসহ্য যন্ত্রণা ভুলিয়া, জ্বরের অবসাদ ভুলিয়া শম্ভু চাকর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যকিঙ্কর তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না ; স্তম্ভিত হইয়া কন্যার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বেশ নির্লিপ্তভাবে সে মোড়ায় উপর বসিয়া রহিয়াছে।

কণ্ঠস্বরের উপর দখল ফিরিয়া পাইয়া সত্যকিঙ্কর জলদ-কণ্ঠে কহিলেন, 'এখানে কি হচ্ছে ?'

'শম্ভুকে হাওয়া করচি', খুকি নির্লিপ্তস্বরেই জবাব দিল। 'বেচারীর অসুখ করেছে কিনা।'

'হাওয়া করছ !' ভেংচাইয়া সত্যকিঙ্কর কহিলেন। 'কে তোমাকে হাওয়া করতে বলেছে, কে হাওয়া করতে বলেছে তোকে ?'

'কেউ বলেনি, আমি নিজেই করছি।' খুকি মোড়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল। 'আর সকলের কাজ আছে তো, কে আর বেচারীকে হাওয়া করবে !'

শম্ভু ভয়-পাংশু মুখে তোৎলাইয়া কহিল, 'তুমি যাও, দিদিরাণী। কতবার মানা করচি, শুনচ না...তুমি যাও দিদিমণি...'

'যাও দিদিমণি !' সত্যকিঙ্কর দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, 'এতক্ষণে ব্যাটার হুঁস্ হলো, যাও দিদিমণি—পালা এখান থেকে লক্ষ্মীছাড়ী। চাকরদের রাণীমা হচ্ছেন ! চাব্‌কিয়ে লাল করব, দিনে দিনে বাঁদর হয়ে উঠচ ! আহ্লাদে, আস্কারে, পাজি মেয়ে। আর কখনও তোমাকে চাকর-বাকরদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেচি, তো তোরই একদিন আর আমারই একদিন। যাও, এই মুহূর্তে চলে যাও......'

খুকি মাথাটা উঁচু করিয়া, ঠোঁটটা বাঁকাইয়া, চিবুকটা শক্ত করিয়া, কাঁধটা একবার কানের সঙ্গে ছোঁয়াইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

'আচ্ছা, দাদু, চাকরদের রবিবার হয় না কেন ?' দাদুর শিয়রে বসিয়া পাকাচুলের মধ্যে আঙুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে খুকি প্রশ্ন করিল।

শিবপ্রকাশ আলবোলা টানিতেছিল, মুখ হইতে নলটি সরাইয়া কহিলেন, 'কি বলছিস্, দিদিমণি ? সারাক্ষণ এত কথা তুই কোথায় পাস্ ?'

'বলছি, রবিবারে যেমন বাবুদের অফিস ছুটি থাকে,' খুকি প্রতিটি অক্ষর টানিয়া টানিয়া আলাদাভাবে উচ্চারণ করিয়া কহিল, 'চাকরদেরও তেমন থাকে না কেন ?'

'চাকরদের রবিবার ! হাসালি, দিদি, হাসালি।' বলিয়া বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে প্রচুর হাসিতে লাগিলেন। 'চাকরদের রবিবার থাকবে তো কাজ করবে কে ?'

'আমাদের তো অনেক চাকর আছে,' খুকি বোঝার মতো কহিল, 'পালা করে ছুটি দিলেই হয়।'

'আর যাদের', বৃদ্ধ জব্দ করিবার জন্ত কহিলেন, 'একটা মাত্র চাকর ?'

'তারা নিজেরাই একদিন কাজ চালিয়ে নেবে। সবাই ছুটি পাবে, আর ওরাই বুঝি পাবে না ?'

'ছোটলোকদের ভারি তো ছুটির দরকার !'

'ওরা ছোটলোক কেন, দাদু ?' খুকি প্রশ্ন করিল।

'ওরা যে ছোট কাজ করে।' দাদু কহিলেন।

'কেন ওরা বড়ো কাজ করে না ?'

'ওদের কি বুদ্ধি আছে, না টাকা-পয়সা আছে ?'

'বুদ্ধি নেই কেন ?'

'লেখাপড়া শিখলে তবে তো বুদ্ধি হবে।'

'তবে লেখা পড়া শেখে না কেন ?'

'পয়সা পাবে কোথায় ?'

'কেন পয়সা নেই ?'

'বাপ-ঠাকুর্দ্দা রেখে যায় নি।'

'কেন রেখে যায় নি ?'

'তাদের ছিল না।'

'কেন ছিল না ?'

'তাদেরও বুদ্ধি ছিল না। বাঁচাবার মতো পয়সা কামাতে পারে নি।'

'কেন তাদেরও বুদ্ধি ছিল না ?'

'লেখা পড়া শেখেনি, সুযোগ পায়নি…'

'কেন লেখাপড়া শেখেনি, সুযোগ পায়নি ?'

'পয়সা ছিল না, বড়লোক আত্মীয়-স্বজন ছিল না…?'

'দুর ছাই, দাদু,' এবার খুকি রাগিয়া কহিল, 'পয়সা প্রথমে কি করে' আসে তাই তো জিজ্ঞেস করছি। ওদের পয়সা নেই, আমাদের এলো কি করে ?'

'ওরে কৌঁসলী', দাদু বিব্রত হইয়া আলবোলার নল ফেলিয়া কহিলেন, এত জেরার যে আমি জবাব দিতে পারি নে। এর জবাব জানেন ভগবান, তিনি যাকে দেন, সে-ই পায়…'

'তবে যে বল,' খুকি না দমিয়া কহিল, 'ভগবানের কাছে সবাই সমান ? তবে আর তিনি একজনকে টাকা দেবেন আর একজনকে দেবেন না কেন ? যত বাজে কথা ! তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বলছ না ; জান, কিন্তু বলছ না।'

'জিজ্ঞেস করিস তোর বাবাকে, যে বড় বড় কলকারখানা ফেঁদেছে ; মজুর খাটিয়ে লাখ লাখ টাকা আয় করচে।'

'নিশ্চয়ই তোমরা বড়লোক হবার কোনও ফন্দি জানো', খুকি দুষ্টু চোখ মেলিয়া কহিল। 'আমি যদি টের পেতাম, সব্বাইকে বলে দিতাম। সব্বাই হয়ে যেত সমান বড়লোক…'

'তুই আমার মাথা ঘুরিয়ে দিবি।' দাদু সাতঙ্কে কহিলেন, 'কি অসম্ভব কথা বলিস্ তুই ? পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছে, এমন অদ্ভুত কথা তো শুনিনি। সবাই হবে সমান বড়লোক !…যা তো, দিদিমণি, একবার ওদিক থেকে ঘুরে আয়। আর বেশিক্ষণ এসব কথা বলবি তো আমার মাথায় জট পাকিয়ে যাবে।…'

খুকি দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাসিয়া কহিল, 'বেশ যাব। এক্ষুণি যাব। কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করে' দিতে হবে, দাদুমণি…'

শিবপ্রকাশ আতঙ্ক ও কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে কহিলেন, 'আবার কি ? এবার থেকে একবেলা করে' নিয়মিতভাবে ঝিদের বদলে আমাকে বাসন মাজতে বস্‌তে হবে কি ?'

খুকি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল, 'দুর, কি যে বল ! সবটাতেই তোমার ঠাট্টা। মোটেই ওসব নয়। শম্ভুর মেয়েটার খুব অসুখ কিনা। ওকে বাড়ি যাবার জন্য ছুটি দিতে হবে। আজই দিতে হবে। কেমন ? লক্ষ্মীটি তো দাদু…'

শিবপ্রকাশ দাড়িতে হাত বুলাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, 'তথাস্তু। এর চেয়েও বেশি কিছু চেয়ে বসোনি, এই আমার বাপের ভাগ্যি।…শম্ভুর ছুটি মঞ্জুর।'

এক সেকেণ্ড চোখ বুজিয়া খুকি অবস্থা ভাবিয়া লইল। বাবাই হও, আর কাকাই হও, শম্ভুর ছুটি একশোবার মঞ্জুর। ইহার উপর কথা বলিতে পারে, এ-বাড়িতে এমন সাধ্যি কারও নাই।

দুষ্টু হাসিতে সহসা খুকির সারাটা মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সে বিলম্ব করিল না। নাচিতে নাচিতে সে ছুটিল নীচেতলায়।

বিজ্ঞাপনে আর্ট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

বাগদাদের প্রসিদ্ধ সুলতান হারুণ-অল-রসিদ একদিন রজনী শেষে তিনজন প্রিয় অনুচরের সহিত প্রজাবৃন্দের অবস্থা অবগত হইবার জন্ত নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজধানীর অপর প্রান্তে দরিদ্র পল্লীতে নানালাদরজাবিহীন গৃহে আলো-গান ও জনসমাবেশ দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে লোকজন একটা দোলনায় উঠানামা করিতেছে। তিনিও সঙ্গীদের সহিত কৌতুক দেখিবার জন্ত দোলনায় চড়িয়া উপরে উঠিলেন। ঘটনাচক্রে সেইদিন রাজ্যের যত ভিখারী সেখানে সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল শেষরাত্রে বাগদাদের সুরম্য প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রসিদকে হত্যা করিবে এবং বাগদাদ সহর ধ্বংস করিবে। তবুও সাহসী ও প্রজানুরক্ত রাজা আত্মপরিচয় দিলেন ; তখন সমবেত জনতা তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীত্রয়কে লৌহ-গারদে বন্দী করিল। দার্শনিক রাজা বন্ধন ও মুক্তি—সময়ের এই ব্যবধানটুকুর সদ্ব্যবহার করিবার জন্ত সঙ্গীদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি উজীর জাফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভাবছেন ?

জাফর বলিলেন, "মানুষের কাজ ও কাজের উদ্দেশ্য, ইহার মধ্যে কত অসঙ্গতি তাহাই চিন্তা করিতেছি।" কোতোয়াল মসরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কি করিবেন ?"

মসরু উত্তর দিলেন, "ততক্ষণ পাঁজরার উপরে তরোয়ালেরধার তুলিব।" তদনন্তর কবি হাসানকে প্রশ্ন করিলে হাসান জবাব দিলেন, "আমি ততক্ষণ এই কার্পেটখানা অমার্জ্জনীয় কুৎসিৎ নক্সা তৈরীর কারণ বাহির করিব।" রাজা সানন্দে বলিলেন, "হাসান, আমিও তোমার সহিত যোগদান করিব ; তোমার রুচির আমি প্রশংসা করি।"

উল্লিখিত ঘটনায় প্রাণসংশয় বিপদের মধ্যেও বাদশাহ রসিদের যেরূপ কবিজনোচিত রুচি, উদার্য্য ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দ্বারা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব হইলেও প্রত্যেক দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিকের জীবন-সন্ধিক্ষণে করণীয় কি তাহা সুস্থির হইয়া উঠা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয়-জীবনের অরুণোদয়ের সম্ভাবনা! দিগ্বলয় রঞ্জিত হইবার ক্ষণকাল পূর্ব্বে অন্ধকার যেমন আরও নিবিড় হইয়া উঠে, আমাদের সামনে জীবনের প্রত্যেক স্তরেও সেইরূপ অন্ধকারে ভরিয়া উঠিতেছে। এই বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইলে হারুণের মতন ঔদার্য্য, রুচি ও সাহস আমাদের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

অর্থলোলুপ স্বার্থবাহের দল জীবনের নানাক্ষেত্রে নানাভাবে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র "বিজ্ঞাপনী" প্রণালীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখিব। আধুনিক বিজ্ঞাপনী চারু-শিল্পের আবরণে কিরূপ মিথ্যা ও কুরুচি প্রচার করিতেছে তাহার সম্যক জ্ঞান অনেকেরই নাই। ভাষা ও কথার চটকদারে ইহা যখন আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার অক্ষমতা অনেকেরই। রোজ একই কথা চোখের সামনে উপস্থিত হইলে মিথ্যাও সত্য হইয়া দাঁড়ায়। মানব-সভ্যতার প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পই এই অভিনব প্রণালীর বিজ্ঞাপনে ভারগ্রস্ত ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে,—যেখানে রাজনৈতিক অধিকার অপরের হাতে, সেখানে ইহার পরিবেশন অজ্ঞ ও শিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়েরই ভয়ানক ক্ষতি করিতেছে ; বিশেষতঃ, যেখানে শিল্প ও সুকুমার শিল্পের অতি শৈশবাবস্থা, যেখানে বৈদেশিক সুদৃঢ় ব্যবসা নানারকম মোহন উপায়ে, কথায়, ছন্দে, রেডিও, সিনেমায়, আকাশে তাহাদের দাবী-সমূহ অহরহ আমাদের চোখের সম্মুখে, কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে ; যেখানে আজও জাতির অধিকাংশের মধ্যে পরাজয়ের মনোভাব বর্ত্তমান, সেখানে জনসাধারণের মনকে প্রতারিত করা খুব দুঃসাধ্য নহে। এই অবস্থায় বিদেশে কি হইতেছে তাহা যদি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যায় তবে সমূহ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আমরা জানি মার্কিন দেশ বিলাসের নন্দনকানন। সিনেমার হলিউড যে সমস্ত মার্কিন মুলুক নয় এই খবর অনেকেই হয়তো জানেন না। নানা বিষয়ের জ্ঞানচর্চ্চায় মার্কিন শুধু সমৃদ্ধ নয়, অনেক অনেক বিষয়ে মার্কিন মুলুক সভ্যতার কেন্দ্রীভূত দেশ বলিলেও অন্যায় হইবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেও চলিয়াছে। রূপচর্চ্চা ও প্রসাধন-শিল্পেও মার্কিনই আজকাল সমৃদ্ধতম। এই উন্নতির মূল কারণ জাতি হিসাবে ইহারা খুব সংঘবদ্ধ ; ভেজাল তাহাদের দেশে চলিতে পারে না। সেখানে ব্যবসায়ীদের মতন ব্যবহারকারীরাও খুব সংঘবদ্ধ। ব্যবসায়ীদের লিখিত দাবী সঠিক কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে একটী সমিতি আছে ; এই সমিতির নাম **Federal Trade Commission.** সংক্ষেপে ইহাকে **F. T. C.** বলা হয়। এই **F. T. C.**-এর দাপটে কত বিক্রমশালী ব্যবসায়ীকে তাহাদের দাবীর পাত্‌তাড়ি গুটাইতে হইয়াছে তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিব। আমাদের মত অনগ্রসর দেশে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সম্যক গুণাগুণ অবগত হইবার লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। বিজ্ঞাপনের চটকে কত রকমে যে লোকে প্রতারিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখাদেখি আমাদের দেশের শিশু-শিল্পপতিগণও বৈদেশিক চাতুর্য্য গ্রহণ করিতেছেন। যাহাতে এই পাপের পরিণতি বৈদেশিক ক্রোড়পতিদের ন্যায় না হয় তাহার জন্য এখন হইতেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনে প্রথমে ছিল কেবলমাত্র ভাষার লালিত্যের বাহাদুরী। আইনের ফাঁক খুঁজিয়া লালিত্যময় ভাষার ঝঙ্কারে লোকে নিজের জিনিষের গুণাগুণ প্রচার করিতেন। এই পদ্ধতি কতকটা আমাদের দেশের পুরাতন ভাটদের ন্যায়। এই রকমে দেশে একরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও বৈদেশিক বিজ্ঞাপনীর কৃপায় আমরা নিত্য নূতন আপাতঃ সুন্দর কথা শিখিতেছি ; তফাৎ এই—পূর্ব্বে ছিল ঝঙ্কারময় সঙ্গীত-মূলক কাব্য, বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সাহায্যে যে সকল শব্দের কিম্বা কথার সৃষ্টি হইতেছে অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহাদের অর্থ থৈ পাইতেছে না। "Body odour", "Night starvation", "Cosmetic skin", "Five O' Clock chin" প্রভৃতি শব্দময় কথা এই বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য হইতে পাইয়াছি। ভাষা ও সাহিত্যে প্রচার মানুষের মনের উপরে স্থায়িত্ব লাভ করিতে তবুও ক্ষণকাল বিলম্ব হইত কিন্তু বর্ত্তমান যুগে, **Radio, Aerial demonstration, Film** ও **Neon advertisement** মানুষের সকল রকম ইন্দ্রিয়কে একই সঙ্গে আক্রমণে স্থায়িত্ব-লাভে বিলম্ব হয় না। ইহার উপরেও গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে **Sex appeal** (যৌন আবেদন) আছে। যে নারীকে আমাদের দেশে জগজ্জননীর প্রতিচ্ছায়া মনে করা হয়, সেই নারীকেই পসারী করিয়া বিজ্ঞাপনী পণ্য করা হইয়াছে। রুচিবিকার এমন হইয়া পড়িয়াছে যে নগ্ন নারীদেহের বিজ্ঞাপনে শুচিতার মুণ্ডপাত হইয়াছে। সুকুমারমতি বালক হইতে সুস্থ সুগঠিত মানুষের মনেও ইহা চিত্তবিভ্রম জাগায় কিনা বিচার্য্য বিষয়। অনেকেই বলিতে পারেন ইহাতে কি আসে যায় ; বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য আলোচনা ; কোনও নগ্ন ছবি দেখিয়া যদি সেই আলোচনা সুরু হয় তবেই বিজ্ঞাপনের কাজ শেষ হইল। ছবি ইহার উদ্দেশ্য নহে। একই উদ্দেশ্যে "Night club" ইত্যাদি জাঁকাল নামে গণিকালয়ের বিজ্ঞাপনও সমর্থিত হয় ; অর্থোপার্জ্জন—এই মহৎ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাহা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, জাতিগতভাবে তাহাই সর্ব্বনাশ আনে। এই জন্যই এই সকল ব্যবসাকে **Anti-social** বা অসামাজিক ব্যবসা

নব। অনেক পেটেন্ট ঔষধ আছে যাহা ক্ষণিক ব্যবহারে উপকার তো সম্ভব কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারে অশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

এই সম্বন্ধে Rose's Lime Juice, the Ovaltine busk baly, ং Stork Margerine-এর বিজ্ঞাপন হইতে কয়েকটী কথা নিম্নে াহরণ দিতেছে। এইগুলিতে Romance, Fear এবং Ambitionএর ৎকার চিত্র পাইবেন।

›mance—

Two days after she washed her ears, Tom came to opose.

›ar—

Failure to eat breakfast lost Jim his job.

mbition—

Mid morning gargle made Fred Governing Director.

উপরোক্ত উদাহরণগুলি Cartoon ছবি ও লালিত্যময় ভাষায় এমন ার করিয়া লিখিত যে পাঠকের মনে দাগ না পড়িয়া যায় না। ঢ়্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন শিক্ষিত লোকের মনেও কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে হার উদাহরণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি। প্রত্যেক ফিল্মেই াশিল্পের ও কথাচিত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও সত্যিই যে হা নহে, ইহা জানা সত্ত্বেও কলিকাতা নগরীতেই কত বাজে ফিল্মও াহের পর সপ্তাহ চলিতেছে দেখা যায় এবং বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকও কত াহ চলিতেছে খবর নিয়াই নাট্যালয়ে যান এবং প্রতারিত হন।

রাজনৈতিক অধিকার সুনিয়ন্ত্রিত না থাকিলে বিদেশী শিল্প বিজ্ঞাপনের াহায্যে কি ক্ষতি করে তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা বে। এই ঘটনা Soap Trade and Perfumery পত্রিকা 1931, arch ও July মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের শেষে জার্ম্মানীর াভব হইলে সম্মিলিত মিত্রশক্তি যখন জার্ম্মান সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র শক্তিতে রণত করিল তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হইল, যে বিরাট র মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীরঅপর জাতিসমূহের বিভীষিকার কারণ হইয়াছিল হা শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এমন নহে, জার্ম্মান জাতির নিত্য প্রয়োজনীয় াগুলিও বৈদেশিক শিল্পপতিগণের কুক্ষীগত হইল। আমাদের দেশে মন চমকপ্রদ নামমাহাত্ম্য সংযুক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ঠিক তেমনি র্ম্মানীতে অখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের স্বাক্ষরযুক্ত প্রচার-পত্রে র্ম্মান-শিল্পকে ঘৃণা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে রম্পরিক প্রচার কার্য্য হইত। অখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে শাঁসাল ার বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা করিতেন; ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা জার্ম্মান ল্পের অপকর্ষতা সম্বন্ধে মন্তব্য দিতেন। নিম্নে কয়েকটী মন্তব্য লিখিত ল। এই মন্তব্যগুলি এমন করিয়াই লিখিত হইত যাহাতে সাধারণে ন করেন যে ইহা বিশেষজ্ঞদের স্বাধীন পরীক্ষার রায় ব্যতীত কিছুই ়। নিম্নের উদাহরণে "ordinary" কথাটা লক্ষ্য করিবেন।

"Ordinary"—that is to say rival, toilet soaps are jurious to the skin, containing as they do too much alkali. "Ordinary" soaps are not compounded of the pure cosmetic oils of the oil of Palm and Olive and in consequence, inferior to Palmolive. 'Ordinary" soaps are dangerous to complexion. নিম্নে উক্ত কোম্পানীর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রচার দেখুন। **Read what Leo Carsten of Berlin what Madam de Nerville, what Vincent of Paris have to say about Palmolive soaps. The same views are also held by two hundred other beauty specialists in Europe, who all recommend Palmolive for the daily care of the complexion.**

জার্ম্মান জাতির দুঃখের অমানিশা শীঘ্রই শেষ হইল। শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কের প্রভাবে জার্ম্মান সঙ্ঘবদ্ধ হইল; ত্যাগের নিকষ প্রস্তরে জাতির আত্মসম্মান-জ্ঞানও ফিরিয়া আসিল। The verbund Deutscher Feinseifen und Perfumerie Fabriken E. V. জাতীয় অপমানের প্রতিবিধানের জন্য বিচারালয়ের দ্বারস্থ হইল। বিচারে Palmolive কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ ও ভবিষ্যতে এইরূপ আচরণ যাহাতে পুনরায় না করে তাহার জন্য নগদ টাকার জামিন দেওয়ার আদেশ হইল। এইভাবে ক্ষুব্ধ জাতীয় সম্মান জয়যুক্ত হইল। আমাদের দেশেও এই রকম বৈদেশিক বিজ্ঞাপন ভাবে ও চিত্রে অহরহ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের জাতীয়আত্মসম্মানজ্ঞান এত সুপ্ত যে প্রতিবাদ হওয়া দূরে থাকুক, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমর্থকের অভাব নাই; স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন না বলিয়া গর্ব্ব করিতে আমাদের মত দেশেই লোকের অভাব হয় না! মেকলে সাহেবের কল্পনা কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে তাহা দেখিতে মেকলে সাহেবের ভৌতিক আবির্ভাব যদি আজ সম্ভবপর হয় তবে তিনিও বিস্ময়ান্বিত হইবেন। তাই বৈদেশিক দ্রব্য বিশেষতঃ প্রসাধন দ্রব্য আজও সমারোহের সহিত বিক্রয় হয়। টাক মাথায় চুল গজাইবার, পাকা চুল কাল করিবার তৈল, বীজাণু হইতে আত্মরক্ষা করিবার সাবান, হলিউডের তারকাদের মতন মসৃণ ও সুন্দরী হইবার জন্য প্রসাধন, মুখমণ্ডল চির-যুবতীর ন্যায় কমনীয় রাখিবার জন্য ক্রীম, দন্ত শুভ্র,দন্তরোগ নিবারণ ও মুখমণ্ডল সুগন্ধ রাখিবার জন্য Toothpaste, আমাদের মনের অসীম দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া বিপুল ব্যবসা চালাইতেছে। আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে এমন কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু F. T. C.-এর কল্যাণে আজ দিবালোকের মতন এই অসত্য প্রচারের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়াছে। লম্বা ফিরিস্তিতে পাঠকের ধৈর্য্য হানি হইবার আশঙ্কা আছে মনে করিয়া নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। মার্কিণ দেশের এই Federal Trade Commission সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে তাহাদের বিজ্ঞাপনী দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য নোটীশ দেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবীর সপক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থিত করিতে হইবে, যুক্তি প্রমাণিত করিতে না পারিলে তথাকথিত দাবী প্রত্যাহার করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কোম্পানীর দাবী প্রমাণিত না হওয়ায় F. T. C. সংশ্লিষ্ট

কোম্পানীকে ভবিষ্যৎ ইস্তাহারে ঐ সমস্ত দাবী প্রচার করিতে পারিবেননা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত Kolynos Companyকে তাহাদের নিম্নলিখিত দাবীসমূহ প্রমাণ করিবার জন্য ২০ দিন সময় দিয়াছিলেন কিন্তু কোম্পানী তাহাদের দাবী প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

The claims that "Kolynos" toothpaste erases or removes stain and tarter that it will whiten teeth several shades in a few days and that it cleans teeth down to the whilte enamel without injury ; other claims to the effect that "Kolynos" almost instantly kills millions of germs which cause most ailments of teeth and gums, that it keeps the teeth and mouth thouroghly clean and healthy on account of its germicidal and antiseptic properties and that it will remove or conquer bacterial mouth (Soap—April 1937) ; published in U. S. A. বিখ্যাত Lever Bros কোম্পানীর Lux toilet, Lux flakes ও Life Buoy Soapএর বিক্রয় আমাদের দেশে দিন দিন কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা অনেকেই জানেন। এই কোম্পানী নিম্নলিখিত দাবী তাঁহাদের প্রচার-পত্রে সর্ব্বদাই করিতেছেন কিন্তু মার্কিণ মুলুকে F. T. C.-এর কল্যাণে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে।

Lever Bros আর B O. theme ব্যবহার করিতে পারিবেন না। Lux Toilet সাবান "Keeps skin flawless" because it is compounded specially to guard against "cosmetic skin" was barred as an advertising story. The Lux flakes claim to "make cloth newer" was also condemned,- "It's the soap nine out of ten screen-stars use to keep skin flawless" and "the active lather" of this fine soap "sinks deep into pores" were also old slogans.

F. T. C.এর সহিত Lever Brosএর যে agreement হইয়াছে তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

The respondent hereby admits : that the number of diseases which can be spread solely by the hands has not been definitely established, that no soap can be depended upon to improve the skin of a user to 100% or any other stated percentage, that dull or blotachy skin is frequently due to internal conditions as well as external conditions, that while the product Lux flakes contains a minimum of free alkali and will not itself fade or shrink fabrics no soap will improve the original strength, colour or quality of fabrics. "That no soap can be relied upon to keep the skin flawless ; that Lux Toilet Soap is not compounded especially to guard against cosmetic skin, that no soap can be relied upon to keep the skin clear, except in connection with conditions due to or aggravated by dirt, cosmetic residue, epithelial debris or foreign matter.

That according to clinical test and scientific opinion bacteria are present on the skin under normal conditions, and that perspiration has no offensinve odour when it exudes from the sweat glands and ducts, but acquires an offensive odour as the bacteria cause decomposition of the perspiration intermigled with oil, disquamation by the skin and foreign substances ; that while such decomposed material and most of the bacteria can be removed by the use of a good soap which also contains a sufficient amount of special ingredient which is included in Life Buoy soap, thereby removing temporarily all perspiration odours, no soap will completely remove all such bacteria and the remaining baceria as they multiply will act upon newly excreted perspiration and produce some odour within from twenty four to forty eight hours and that no permanent elimination of perspiration or body odour can be effected by the single application of Life Buoy or any other soap.

আমার আশঙ্কা হইতেছে পাঠকদের ধৈর্য্য ধারণ ক্রমশঃই কঠিন হইতেছে, কাজেই অধিকতর বিস্তৃত উদাহরণ প্রদর্শনে নিবৃত্ত হইলাম। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে Pond's skin vitamin, Coty's "air spun" Talcum Powder, Albone's "Hospital proved" Cream—কেহই F. T. C.-র দৌরাত্ম্যে রেহাই পান নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 'নারী দেহ'-প্রচার পত্রিকায় বড় মূলধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈদেশিক পত্রিকায় যৌন-আবেদনের ঢেউ ক্রমে আমাদের দেশেও পৌঁছিতেছে। কোনও বিশিষ্ট বৈদেশিক-বিজ্ঞাপনীতে লিখিত হইয়াছে—Woman wants man, 'Make up' helps her to catch them, many men, almost invariably married ones, pretend they do not approve of cosmetics. Just watch them when when a woman passes by." ঠিক এই রকম না হইলেও "যৌন আবেদন" নানাভাবে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়া আমাদের দেশেও প্রচারিত হইতেছে। আমি পাঠকদের নিকট নিবেদন করি, এই সকল বিজ্ঞাপন যে-সকল গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে লিখিত হইতেছে তাঁহারাই সমবেতভাবে জাতিগঠন কি করিতেছেন না? জাতীয় জাগরণের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে, পাশ্চাত্যের এই বিষ যেন আমাদের সমাজ-দেহে প্রবেশ না করে। নরনারীর বিশুদ্ধ মিলন জাতীয় সম্পদ। এই মিলন ততক্ষণই জাতিকে শক্তিসম্পন্ন করিবে, যতক্ষণ ইহার পবিত্রতা রক্ষিত হইবে, যতক্ষণ ইহা ইন্দ্রিয় লালসার স্ফুলিঙ্গে আহুতি অর্পণ না করিবে।

এই প্রবন্ধের জন্য S. P. C. Nov. 1938 and January, 1939—An article by "Look-out" manএর নিকটে লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

শনিবার বৈকালে হিসাব করিয়া অমল দেখিল, পাঁচ আনার পয়সা আছে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাওয়া ও ফার্ষ্ট ক্লাসে ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু মাসের শেষের কয়েক দিন বিড়ির কি উপায় করিবে তাহা বুঝিয়া পাইল না। ধার করাটা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কিন্তু আজকার প্রলোভন তাহার অদম্য হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই সে কাপড় জামা পরিয়া ফেলিল। বাড়ী খুজিয়া বাহির করিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অমল যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইল তখন একজন মহিলা উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিতেছেন। মহিলাটির মুখখানা পরিচিত, পোষ্ট-গ্রাজুয়েটেরই ছাত্রী। সভাকক্ষের বাহিরে বারান্দায় অপর্ণার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। অপর্ণা অমলের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ এমনি দেরী ক'রতে আছে? সকলে অপেক্ষা ক'রছে, একটু সকালে বেরুতে পারেন নি।

অমল হাসিয়া বলিল—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়নি ত? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই—শেষোক্ত অজুহাতটি একেবারেই মিথ্যা।

উদ্বোধন সঙ্গীত থামিয়া গেল। অপর্ণা অমলকে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া সভাস্থ সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ইনিই আমাদের নতুন সভ্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সহপাঠী, গেজেটে আমার ওপরে যে নামটি ছিল সেটা ওর। ইনি সংহতির 'প্রেম' কবিতার কবি, আর—

অমলের দিকে ফিরিয়া বলিল—এঁদের সকলকে পরিচয় করিয়ে দি—ইনি ইলা সেন, ইনি ডলি মিত্র অমল চাহিয়া রহিলমাত্র এবং ধারাবাহিক ভাবে নমস্কার করিয়া যাইতে লাগিল। অপর্ণা কতকগুলি একালের কতকগুলি সেকালের নাম মুখস্থ নামতার মত বলিয়া গেল। পরিশেষে সকলকে বিস্মিত করিয়া হটাৎ বলিল—নতুন সভ্যকে প্রথমদিনে কিছু ব'লতে হয়, এই আমাদের ক্লাবের আইন। অতএব অমলবাবু যা হয় বলুন—

অমল মাথা চুলকাইয়া, ক্ষণিক বিভ্রান্তের মত সমবেত পুরুষ ও মহিলাগণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আগে জানলে আমি কখনই এ ক্লাবের সভ্য হ'তে রাজি হতাম না—

সকলে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

—যারা নিরপরাধ ভদ্রলোককে ডেকে এনে, সভাস্থলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ ক'রবার মত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে পারেন তারা জগতে অমানুষিক নিষ্ঠুর ও গর্হিত কাজও ক'রতে পারেন এই আমার বিশ্বাস। বর্ত্তমানে অবাধ্য পা' দুটো যে রকম ভাবে বিকম্পিত হ'চ্ছে তা'তে অদূর ভবিষ্যতে হৃৎপিণ্ডে এ কম্পন সংক্রামিত হ'তে পারে বলে আমি শঙ্কিত হচ্ছি এবং এর বেশী কিছু ব'লতে হ'লে হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনা এত বেড়ে যাবে যে শেষে সেটা অনিবার্য্যই হ'য়ে উঠ্‌বে—

কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া এবং কোনও রূপ ভদ্রতার অপেক্ষা না করিয়া অমল ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সভাগৃহে বসিবার বন্দোবস্ত ভারতীয় রীতি অনুসারে—পুরু একটা গালিচা পাতা, তাহার 'পর ইতস্ততঃ বালিশ বিক্ষিপ্ত, মাঝখানে পান ও সিগারেটের প্লেট রহিয়াছে—

অমল যেখানে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাশেই যে মেয়েটি বসিয়া ছিল সে হাসিতে হাসিতে প্রায় অমলের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। সভাস্থ সকলেই তখন হাসিতে হাসিতে প্রায় বিবশ। অকস্মাৎ এই মহিলাটি, অর্থাৎ ডলি মিত্র অমলকে বলিল—পান খান ত? এই নিন্—পানের পাত্র সে আগাইয়া দিল—

অমল পুনরায় বলিল—এ শুষ্ককণ্ঠ কি পানের রসে ভিজবে, এখন প্রয়োজন ষ্টিমুলেন্ট—

সভায় অকারণেই পুনরায় হাসির রোল পড়িয়া গেল।

সেক্রেটারী অপর্ণা তাহার খাতা দেখিয়া পড়িয়া গেল—আজকার কার্য্যসূচী, ডলি মিত্রের কবিতা, প্রশান্ত মজুমদারের 'কাব্যে ইয়েট্‌স্', অমলা বসুর "টমাস হার্ডি কল্পিত গ্রাম" ইত্যাদি। খাতা নামাইয়া বলিল—এখন

সভাপতি নির্ব্বাচন ক'রে সভার কাজ আরম্ভ হ'তে পারে—

ডলি মিত্র প্রস্তাব করিল অমলেরই নাম, কয়েকজন সমস্বরে সমর্থন করিলেন। অপর্ণা স্মিতহাস্যে সগর্ব্বে অমলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—আসুন, সভার কাজ পরিচালনা করুন।

অমল আগাইয়া বসিয়া বলিল—নার্ভস্ট্রেণে যদি আমি মারা যাই তা'হলে আমি কিন্তু দায়ী হ'ব না।

সভায় পুনরায় একটা হাসির রোল উঠিল। হাসি থামিয়া আসিলে অমল বলিল—কবিতা আবৃত্তি ডলি মিত্র।

ডলি মিত্র স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেলেন। সভা চলিতে লাগিল—

অমলের পাশেই অপর্ণা বসিয়া ছিল। অমল হঠাৎ চাহিয়া দেখে অপর্ণা তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই একটু হাসিয়া সে মাথা নীচু করিল। অমল বুঝিল না কেন, কিন্তু অপর্ণার এই চাহনি ও হাসির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন একটা সগর্ব্ব সহানুভূতি ও কৃতকার্য্যতার আত্মতৃপ্তি ছিল তাহা সে বুঝিয়াছিল—সকলে একবাক্যে তাহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করায় অপর্ণার আনন্দ হইয়া থাকিবে, যেহেতু সে তাহারই বন্ধু। অমল নিম্নকণ্ঠে ডাকিল কিন্তু অপর্ণা শুনিল না—অপর্ণার শুভ্র আঙুল কয়টি ক্লাবের খাতার উপর বিক্ষিপ্ত কয়েকটি চাঁপার কলির মত পড়িয়া আছে। অমলের ইচ্ছা করিতেছিল ওই কয়েকটিকে সে নিজের হাতের মধ্যে সঙ্গোপনে টানিয়া লয়। কি যেন ভাবিয়া অকস্মাৎ সে তাহারই একটিকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—খাতাখানা আপনি নিলে আমি সভার কার্য্য পরিচালনা করি কেমন ক'রে—জানেন আমি সভাপতি!

অপর্ণা হাসিয়া খাতাখানি তাহার সামনে খুলিয়া ধরিল—আঙুলটিকে মৃদু আকর্ষণে মুক্ত করিয়া লইল।

সভান্তে জলযোগ ও জলযোগান্তে সকলে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপর্ণা তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সদর দরজা পর্য্যন্ত যাইতেছিল, অমলও দলের পিছনে পিছনে চলিতেছিল। একে একে সকলে প্রস্থান করিতেছিলেন; পরিশেষে অমল বলিল—আসি তা হ'লে মিস্ রায়।

অপর্ণা বলিলে—না, আসুন, আপনাকে এখন যেতে হবে না।

অমল বলিল—কেন? আরও কিছু খাওয়াবেন না কি?

—আপনি ত আচ্ছা পেটুক, আসুন—

অমল পুনরায় আসিয়া অপর্ণার পড়িবার ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অপর্ণার বোন ভাই পিতা মাতা সকলের সঙ্গেই পরিচয় হইল। অপর্ণার মা বলিলেন—মাঝে মাঝে এস বাবা, শুনি তোমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়াশুনো কর।

অপর্ণার পিতা ইঞ্জিনিয়ার তিনি পরিহাস করিলেন—অমল বাবা, শুনলাম তুমি কবি, মানুষ কবিতা লেখে কেমন ক'রে ব'লতে পারো? গরমিল শব্দ ছাড়া ত আমি খুঁজে পাই নে—

অমল বলিল—কবি আমি কোন দিনই নয়, মিস্ রায় অত্যন্ত বাড়িয়ে বলেন—

তিনি পুনরায় পরিহাস কহিলেন—কমিয়ে বলার চেয়ে বাড়িয়ে বলাই ত ভাল, তোমার লাভ। হ্যাঁ আজকাল শুনছি এক রকম কবিতা উঠেছে হাল ফ্যাসানের তাকে গদ্য বলে—অর্থাৎ গদ্য কবিতা, তা কিছু কিছু দেখাতে পারো, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতাম—

অমল জবাব দিল না। অপর্ণার পিতা খুব জব্দ করিয়াছেন এমনি ভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। আরও কিছু আলাপ আলোচনার পর অপর্ণা ব্যতীত সকলেই প্রস্থান করিলেন। অপর্ণা মুখ টিপিয়া বলিল,—আপনাকে congratulate করি, আপনার বক্তৃতা চমৎকার হ'য়েছে।

অমল প্রশ্ন করিল—পরিহাস!

—মোটেই নয়, আপনার বক্তৃতা কতখানি উপভোগ্য হ'য়েছে তা' ত বুঝলেনই, প্রথম দিনেই সভাপতি—

—কিন্তু, অমনি ক'রে মানুষকে বেকুব ক'রবার এত লোভ কেন আপনার?

—সে কি!

—অমনি ক'রে হটাৎ বক্তৃতা দিতে বলা যে কত বড় নিষ্ঠুর কাজ—

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ও তাই! যা হোক্, মায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে কবে আস্ছেন?

—যেদিন ব'ল্বেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, যদি সত্যি উত্তর দেন তবে জিজ্ঞাসা করি—

—আমি মিথ্যাবাদী এ অপবাদ আপনি প্রথম দিলেন—

—মিথ্যা ভাষণ ও সত্য গোপন করা ত এক নয়। যা জিজ্ঞাসা ক'রব তার উত্তর মানুষ সাধারণতঃ সরল ভাবে দেয় না—

—কিন্তু আমি বল্ছি, সারল্যের অভাব আমার মধ্যে নেই—

অমল একটু থামিয়া অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—এত ছেলে থাক্‌তে আপনি আমার সঙ্গেই বা আলাপ ক'রলেন কেন এবং আমাকেই বা ক্লাবের সভ্য হওয়ার সম্মান দিলেন কেন?

—এই কথা! এর আবার একটা গোপন কি আছে? আপনিই বা এত মেয়ে থাক্‌তে আমার শাড়ীপরা নিয়ে অভিযোগ করেন কেন?

—সেটা আলাপের পূর্ব্বে নয় পরে—খানিকটা পরিচয় তথা ঘনিষ্ঠতার পরে।

অপর্ণা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আপনি যেমন ক'রে জান্‌লেন আমার নাম ডেজি, তেমনি ক'রে আমিও জানলাম আপনার নাম অমল। চেহারাটা দেখে ভাবলুম, অত্যন্ত গোবেচারা, ভাবলুম নেহাত গোবেচারী লোক নিয়ে তামাসা করা উপভোগ্য হবে—তাই আলাপ ক'রলাম কিন্তু শেষে দেখি একেবারে কালসর্প, মুখে ক্ষুরধার—

—কালসর্প?

—হ্যাঁ শুনুন, আর একটা কথা ভেবেছিলাম সেটা হ'চ্ছে এই যে আপনার কোন বিষয়েই কোন আগ্রহ নেই দেখে সমবেদনা বোধ ক'রেছিলাম—আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রবার কোন কৌতূহল আপনার নেই কেন, এইটে জানবার কৌতূহলও হ'য়েছিল—

—এখন কৌতূহল নিবৃত্ত হ'য়েছে আশা করি।

—না, আপনি বল্‌লে নিবৃত্ত হ'তে পারে।

—যদি সত্যি কথা ব'লতে হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে ভয়। ভয়টা ঠিক বাঘের ভয়ের মত নয়, অন্য জাতীয়। আমার যা ধারণা তাতে অনেক আধুনিক মেয়েই মনে করেন যে তাদের প্রেমে পড়বার জন্য সকল লোকই ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে রয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে গেলে তারা যা ভাববে তা আপনিও বুঝ্‌তে পারেন, কাজেই সেধে গিয়ে এ অসম্মানকে ডেকে আনি কেন?

—আমাকেও কি ওই জাতীয় ভাবেন?

—কোন কারণ নেই, পরন্তু এও ভাবিনা যে যেহেতু আপনি আমার সঙ্গে আগে আলাপ ক'রেছেন সেই হেতুই আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন।

অপর্ণা হাসিয়া একটু ব্রীড়া ভঙ্গি সহকারে বলিল—তাও হতে পারে ত?

—কোন কারণ নেই, আপনারা I. C. S. স্বামীর স্বপ্ন দেখেন, মনে মনে আমাদের মত নিরীহ পথচারীকে মোটর চাপা দেন, আপনাদের এ দৈন্য কল্পনাতীত।

—কেন? আপনারাও ত I. C. S. হ'তে পারেন, তা ছাড়া ঘনিষ্ঠতায় স্বপ্নটা ত ক'মে আস্‌তে পারে—

—পারে একথা অস্বীকার করি না, তবে সাধারণতঃ স্বপ্নটা কমে না। বিশেষতঃ আমার মত একটি বর্ব্বরের প্রেমে আপনি পড়তে পারেন, আপনার মাঝে এ দৈন্য আমি কল্পনা ক'রতে বাধা পাই।

অপর্ণা বলিল—আপনার বিনয় কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনায় পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে।

—কেন আপনার কি সে রকম মনে হয়?

অপর্ণা অশোভন ভাবে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—রোগের লক্ষণ সে রকম প্রকাশ পায় নি—যাক্ আর একটু চা খাবেন কি?

—এতখানি অভদ্রতা আশা করিনি, কিছু খাওয়াবেন বলেই ত ফিরিয়ে নিয়ে এলেন; এখন এ জিজ্ঞাসা করাটা সম্মানিত অতিথির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

—বাবা, এতখানি সম্মান-জ্ঞান আপনার আছে? একটু বিনয় কি ভাল দেখাতো না—চা ও চুরুট দু'টোকে কমাতে হবে।

—আপনার অনুরোধ।

—হ্যাঁ, আমার অনুরোধ।

—আপনার অনুরোধের এত মূল্য আপনি কেন দেন?

অপর্ণা পর্দ্দার আড়ালে যাইয়া সম্ভবতঃ চায়ের আদেশ

দিয়া ফিরিয়া আসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আপনি ত ভারি প্রতিহিংসা-পরায়ণ—ওই কথাটা আমি বলেছিলাম বলে তা ফিরিয়ে না দিয়ে আর পারলেন না। তবে আর আপনার প্রেমে পড়া হ'ল না—

—আহা-হা, কেন ?

—এই রকম প্রতিশোধ যদি নিতে থাকেন তবে ভয় ক'রবে না ?

অমল হাসিয়া বলিল—এত ভয় যায় সে আর প্রেমে পড়বে কেমন ক'রে ? কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিল।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। অহেতুক ভাবে চোখ দু'টিকে বিস্ফারিত করিয়া, দক্ষ অভিনেত্রীর মত ন্যাকামীর সুরে বলিল—আপনি অভিনেতাও তা হলে—

চা আসিল। অপর্ণার ছোটবোন চা দিয়া গেল। চা'র বাটিতে একটা চুমুক দিয়া অমল বলিল—চা তুমি তৈরী করেছ ? করুণা ?

—হ্যাঁ।

—বেশ চা হ'য়েছে। ভবিষ্যতেই তুমিই চা দিও, তোমার দিদি যা চা তৈরী করেন !

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—আমার তৈরী চা আবার কবে খেলেন ?

অমল সংক্ষেপে বলিল—খেয়েছি। হ্যাঁ করুণা তোমার দিদি আমার নিন্দে করেন না ?

করুণা জবাব দিল—হ্যাঁ।

—কি বলেন ?

—আপনি নাকি মানুষকে বড় কটু কথা বলেন।

অপর্ণা বলিল—কবে বলেছি ?

—ওই সেদিন তুমি বল্‌লে, উনি বড্ডো উচিত কথা বলেন।

—কটুকথা মানে উচিত কথা ?

অমল বলিল—হ্যাঁ, অভিধানে পাবেন না, তবে মনের অভিধানে ওটার ওই মানে হয়।

অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি যখন আমার নিন্দে করেন তখন আর কি ? চলেই যাই—

অপর্ণা বলিল—রাগ ক'রে—

—হ্যাঁ। আসি নমস্কার। করুণা, নমস্কার।

করুণা ফিরিয়া নমস্কার করিল, অমল হাসিতে হাসিতে সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া আসিল।

অমলের দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবনযুদ্ধেরত সুদীর্ঘ বাইশটি বৎসরের মধ্যে এমনি মহার্ঘ স্মরণীয় দিন একটিও যায় নাই। যাহা জানিবার জন্য, দেখিবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ছিল আজ তাহাই সে পাইয়াছে—এমনি করিয়া তাহার জীবনে যে কল্পনাময়ী, স্বপ্নাচ্ছন্ন নারী মূর্ত্তি ধরিয়া সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইবে—এমনি করিয়া মাদকতা দিয়া মোহ দিয়া তাহার জীবনকে রোমাঞ্চিত করিয়া দিবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। ট্রামে উঠিবার পর হইতে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটা অপ্রাপ্ত, অনির্দ্দিষ্ট অস্বচ্ছ সুখাশার পদ্মগন্ধে তাহার অন্তর সুবাসিত হইয়া রহিল। মনে মনে নানাভাবে অপর্ণাকে সাজাইয়া সে দেখিল—মনে হয়, জীবনের মাঝে এই নারীর পরিচয় অতি আকস্মিক কিন্তু সে যেন মনের অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। উন্মুখ যৌবনের প্রথম দিনে সে যে মানসীমূর্ত্তিকে কল্পনা দিয়া, বাসনা দিয়া, মনের সংগোপনে স্থাপিত করিয়াছিল সে যেন আজ মর্ত্তে আসিয়া ধরা দিয়াছে—কিন্তু সে জানে না তাহার অজ্ঞাতে, মনের অগোচরে সে অপর্ণার কত ত্রুটি, কত অক্ষমতাকে এই পরিচয়ের ঘনিষ্ঠার মাঝে ক্ষমা করিয়া লইয়াছে। নিজের মনকে সে যুক্তি দ্বারা, সহানুভূতি দ্বারা, বাসনার দ্বারা প্রতারিত করিয়াছে, তাহা না হইলে অপর্ণাকে সে এমনি করিয়া আপনার করিয়া ফেলিতে পারিত না, তাহা না হইলে জগতের কোন বাস্তব প্রাণীকেই ভালবাসা সম্ভব হইত না।

এতদিন সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া রবিবারের অপেক্ষা করাই তার স্বভাব ছিল, কিন্তু অমল আজ সবিস্ময়ে দেখিল যে সে সোমবারের প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে মনে সে ভাবিল ক্ষতি কি। এমনি করিয়া যদি স্বপ্নাবেশে জীবনের গুরুভার দিনগুলি চলিয়া যায় তবে সেই ত পরম লাভ।

সোমবারে কলেজে যাইবার সময় সে মণিব্যাগটিকে খুলিয়া দেখিল তাহা একেবারেই শূন্যোদর। সেটাকে

বিছানার নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া হিসাব করিল, মাস শেষ হইতে তিন দিন বাকি, কলেজে চা না খাইয়াই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে, আর বিড়ির বন্দোবস্ত যেমন করিয়াই হোক হইয়া যাইবে—দোকানটা ত পরিচিত, অবশ্যই বাকী দিবে—

কলেজের সদর দরজায় সাম্‌নাসামনি রাস্তা পার হইবার সময়ে সে দেখিল—অপর্ণা ট্রাম হইতে নামিতেছে—চিনিতে বিলম্ব হইল না, সেই নীল শাড়ীখানিই সে পরিয়া আসিয়াছে। অমল গেটের নিকটে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, অপর্ণা নিকটবর্ত্তী হইতেই বলিল—ধন্যবাদ।

অপর্ণা না থামিয়া চলিতে চলিতে বলিল—কারণ ?

—আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন—মানে মূল্য দিয়েছেন দেখে।

—ও—শাড়ীর কথা। খুব ভাল দেখাচ্ছে—না ?

—দেখাচ্ছে কিনা জানিনা, আমি দেখছি।

—চোখ খারাপ হয়নি ত !

—ভগবানের কৃপায় এমনি খারাপই চিরদিন থাক্।

অপর্ণা লিফ্‌টে উঠিয়া চলিয়া গেল। অমল মৃদু-পাদক্ষেপে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া চলিল।

ক্রমশঃ

ছেলেটা

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মায়ায় ভরা স্তব্ধ রাত্রি, অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বালা অনন্ত আকাশের নীল অংগনতলে। চাঁদ নেই কিন্তু আলো আছে, ঝাপ্‌সা আলো। দূরের গ্রামগুলির ঘুমন্ত চোখে যেন অনন্ত নিদ্রা, জেগে থেকে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে।

ও কিসের আলো ? যেন চোখ ঝল্‌সে দিয়ে গেল ! তারা ছুটেছে। আকাশের বুকে সাজানো দীপান্বিতার সমারোহ থেকে নিভে গেল একটা তারার প্রদীপ। বন্ধ্যা রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে কানে এলো 'বল হরি, হরি বল।'

তাই তো, এ কি স্বপ্ন···না, এই তো আমি জেগে আছি, ঐ তো সামনের জামরুল গাছ থেকে রাত-জাগা পাখীর একটানা কান্নার শব্দ আস্‌ছে ; আবার কর্ণভেদী রব 'বল হরি, হরি বল !'

না, সত্যিই তবে, সত্যিই তবে পৃথিবীর বুকে দোলানো মালা থেকে আজ একটা ফুল খসে গেল। নিভে গেল একটা উজ্জ্বল প্রদীপ। তবে কি উল্কাপাত এরই ইংগিত ?

যে ছেলেটির অস্তিত্ব আজ নিমেষে ধরণীর ধূলিকণার সাথে মিশে গেল, একে আমি চিনতাম, জানতাম এবং ভালবাসতাম। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের মত সে এসেছিল পৃথিবীর বুকে। অন্ধকার রাতের মেঘাড়ম্বরের মধ্যে ও ছিল বিদ্যুতের আলো···মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করতো সব মানুষের মনকে।

এত তাড়াতাড়ি যে ওকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে কে জানতো ? ওর পৃথিবী থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনে হয়েছে, প্রভাতের সান্দ্র স্নিগ্ধ ছায়াখানি ওর মাঝে লুকোচুরি খেল্‌ছে···যে দেশ থেকে অভিশপ্ত দেবতার মত ও এসেছিল, সে দেশের মায়া যেন ভুল্‌তে পারেনি ? কে জানতো, ও জীবনের লীলা প্রভাতের মায়াময় আলোতেই শেষ হয়ে যাবে। পদ্ম যখন কুঁড়ি থেকে ফুটে বেরোয় তখন তার পূর্ণবিকাশ দেখবার জন্য পৃথিবী উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু সে যখন অকালে ঝ'রে যায় তখন ধরণীর চোখে নেমে আসে ব্যথার অশ্রুধারা।

তার নাম ছিল প্রণব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, শ্রেষ্ঠ ধ্বনি যেমন লুকিয়ে আছে এই নামটিতে—তেমনি আমাদের সব চেয়ে বেশী ভালবাসা, সব চেয়ে বড় আকর্ষণ লুকিয়ে ছিল এই ছেলেটির মধ্যে। তাই তার অন্তর্ধানে আমাদের মনের দুয়ারে আঘাত লেগেছে, বজ্রপাতের যেমন আঘাত লাগে পৃথিবীর বুকে।

তবু পৃথিবী টলে না। আঘাত আসে নব নব, বেদনা পায়, অজস্র, তবু পৃথিবী স্থির, স্তব্ধ অচঞ্চল···তাই পৃথিবী সর্বংসহা। অহরহ তার বুকে মৃত্তিকার শিশুদের আবির্ভাব। আবার তারই বুকে ভস্মমুষ্টি হয়ে তারা মিলিয়ে যায় অনন্ত শূন্যে। তবু ধরণীর বুকে কোন চঞ্চলতা নেই। সে ভাবে···এর চেয়ে আরোও একটা উন্নততর ধরণী আছে। যেখানে পরিত্যক্ত জীবনগুলি লাভ করবে মহদাশ্রয়। যেখানে যাবার সাধনা মানুষ এখানে এসে করে—তাই সে কাঁদে না, শুধু একবার চমকে চেয়ে দেখে আবার চোখ বোজে। সেই চমকে ওঠাটাই হয় তার সম্বল। আমাদের কাছে সেই চমকে ওঠাটা ভেসে আসে স্মৃতি হয়ে···অনন্তকালের জন্যে সঞ্চিত হয় মনের মণিকোঠায়···এই বুঝি সত্য···এই বুঝি চিরন্তন।

আধুনিক ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্য

শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষ

"আমাদের সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।" মানব-চিত্তের ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় তার সাহিত্যের ধারা হ'তে। কোন জাতীয় জীবনকে বিশ্লেষণ করতে হ'লে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করতে হয়, সাহিত্য-কলা তন্মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে।

এই সাহিত্য কলায় ইংলণ্ড, শুধু ইউরোপ কেন, সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছে। বিশ্ব-সাহিত্যের বোধ-হয় সকল পুস্তকই ইংরাজীতে অনূদিত হ'য়েছে। অধুনা উপন্যাস সাহিত্যই ইংলণ্ডের প্রধান সাহিত্য। এই যুগের আরম্ভ হয়—ভিক্টোরিয়া-যুগের পরবর্তীকাল থেকে। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বেশ বুঝতে পারা যায়—এলিজাবেথের যুগে নাটকই ছিল সমস্ত জাতির আশা-ভরসা। তাই সে যুগে পাই Shakespeare, Merlawe, Benjonson প্রভৃতি খ্যাতনামা নাট্যকারকে। তারপর এলো কবিতার যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও কবিতা ছিল সাহিত্যের প্রধান অংগ। বর্তমান যুগে নাট্যকার বা কবিদের রচনায় বর্তমান মানব-জীবনের জটিলতা ভালো ক'রে ফুটে উঠ্‌তে পারে নি। তাই আজ সাহিত্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে—উপন্যাস।

ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় সাহিত্যের সব স্থানে রয়েছে একটা বিদ্রোহের সুর, তার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকরা চাইছেন এক আমূল পরিবর্তন, সমস্ত পুরাতনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে নূতনের প্রতিষ্ঠা।

ভিক্টোরিয়া যুগ ছিল ইংলণ্ডের সর্বাংগীণ উন্নতির যুগ। সুখে শান্তিতে বাস করার ফলে সাহিত্যিকদের মতবাদেও ছিল একটা সামঞ্জস্য ও প্রসন্নতা। কিন্তু এ যুগে—অশান্তির যুগে সাহিত্যিকদের প্রসন্নতার ভাব গেছে টুটে; তাই তাঁদের কণ্ঠে ফোটে বিদ্রোহের ধ্বনি। কারো কণ্ঠে সে বিদ্রোহ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে বাগ্মিতা পেয়ে—কারো বা মনে মনেই গুম্‌রে মরছে। তাই ঐ যুগে "Victorian compromise" বা বিভিন্ন মতবাদের মিল আর লক্ষিত হয় না।

এ যুগের সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই আত্মসম্পূর্ণ। সহযোগী সাহিত্যিকদের দিকে নজর বড় একটা কারুর নেই। তাই কেউ আলোচনা করছেন সমাজতন্ত্র নিয়ে, কেউ সমাজ সংস্কার নিয়ে, আর কেউ যৌন-বিজ্ঞানকে দিচ্ছেন রূপ। এই যুগের মাত্র আরম্ভ হ'য়েছে; পরিণতি কোথায় কে জানে?

ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির সংগে সংগে গ্রাম ধ্বংস পেতে লাগলো। গ্রামের বুকে জুড়ে বসল বিরাট ফ্যাক্টরী আর নগর। বস্তিতে বস্তিতে কুলি-মজুররা অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিকার করতে না পেরে নিজেদের মধ্যে গুম্‌রে মরতে লাগ্‌লো। আবার সাম্রাজ্য-বিস্তারের সংগে সংগে সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠ্‌লো। তাই একদল সাহিত্যিক সমাজ-তন্ত্রকে আশ্রয় করলেন, আর একদল মন দিলেন সাম্রাজ্য-বাদে। রুডিয়ার্ড কিপলিং কবিতা ও উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদের প্রচার করেছেন।

যখন সাম্রাজ্যবাদীদের চীৎকারে সহর হ'য়ে উঠেছে মুখরিত, তখন প্রতি বস্তি ভরে উঠ্‌ছে নির্য্যাতীত, নিষ্পেষিতদের আর্তনাদে। এই উৎপীড়িতদের দল থেকে খুব কম লোকই এসেছেন যাঁরা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার মধ্য-দিয়ে মর্মকথাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। দরিদ্রের মুখপাত্র হিসাবে Richard whiting এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Galsworthy এর উপন্যাসে দারিদ্র্যের কথা বেশী স্থান না পেলেও তাঁর নাটকে দরিদ্র-জীবনের রূপ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে।

Lower Middle class এর মুখপাত্র H. G. Wells এর বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। বিজ্ঞানের প্রভাবে জগতের কি পরিবর্তন ঘটবে, Wells দেখেছেন তারই স্বপ্ন। এঁর কল্পনা শক্তি এবং চিন্তাধারার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। তিনি শুধু কল্পনা-জগৎ নিয়েই মেতে থাকেন নি; তার তাঁর সাহিত্যেও আমরা পাই দরিদ্র এবং সমাজের বিক্ষোভিত রূপ।

Arnold Bennett ছিলেন Lower Middle class-এর অন্যতম প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন Artist—বর্তমান সামাজিক জীবনকে রূপদান করেছেন। তিনি লেখার ধরণ ও 'টেক্‌নিক্‌' নিয়ে Wells এর চেয়ে বেশী ভাবতেন।

Intelligentsia দলের প্রতিনিধি হিসাবে "Bernard Shaw" এর নাম সর্ব-প্রথমে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিলেন পুরাতনের ধ্বংস আর নূতনের সৃষ্টি। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর মতবাদকে ফোটাতে না পেরে তিনি

নাটকের আশ্রয় নেন। তাঁর সব লেখার মধ্যেই আমরা "Propagandist show" কে দেখতে পাই।

Upper Middle classএর মনোভাব বেশ ফুটে উঠেছে John Galsworthyর লেখায়। তিনি বুঝেছিলেন সমাজে ধ্বংসের বীজ প্রবেশ করেছে—এখানে হৃদয়াবেগের স্থান নেই, সব জিনিষকেই টাকা পয়সার মাপকাটিতে বিচার করা হয়। নরনারীর যৌনবোধ সম্বন্ধে যে হীন ধারণা জেগে উঠেছিল তার মূলে তিনি করেছিলেন কুঠারাঘাত। মানবের অন্তর্জীবনের সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বকে তিনি বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেছেন।

এরপর মহাযুদ্ধের পর থেকে সাহিত্যের নব-যুগ। মহাযুদ্ধের পূর্বে যে নৈরাশ্য ছিল সাহিত্যের অন্তরে, যুদ্ধের পরে তা' মূর্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সবেতেই ফুটে উঠ্‌লো একটা গভীর ঔদাসীন্য।

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" (Eat, drink and be merry, for to-morrow we shall die) ভাবটা বেশ ফুটে উঠ্‌লো। সংগে সংগে উচ্ছৃঙ্খলতাও গেল বেড়ে। এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র ক'রে লিখলেন Aldous Huxley, তিনি দেখ্‌লেন সমাজ মরতে বসেছে। দেহ-সর্বস্ব লোক নিয়ে সমাজ বাঁচবে কেমন কোরে? Huxley ভবিষ্যত মানব-জীবনের কোন আশা ভরসাই দেখেন নি।

মহাযুদ্ধের পর এই অভিজ্ঞতাকে নিয়ে উপন্যাস রচিত হ'ল—যেমন "All quiet on the Western front" আর একদল মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। মহিলা ঔপন্যাসিক Virginia Wolfe এঁর লেখায় রাশিয়ার ঔপন্যাসিকদের প্রভাব লক্ষিত হয়।

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল ঔপন্যাসিক নানা তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে D. H. Lowrence-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরনারীর যৌন-বোধ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল মধুর এবং পবিত্র।

মহিলা ঔপন্যাসিক Mary Webbএর রচনায় পল্লীর একটা সুন্দর রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে; তাঁর আর একটা বিশেষত্ব—নারী হ'য়েও যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্ভীক আলোচনা করবার সাহস।

আধুনিক ইংলণ্ডের উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের সাহিত্যের দৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে উদার—বদ্ধ গণ্ডীর সীমা ক্রমে বিলীন হচ্ছে। ইংলণ্ডের ভাবধারা ক্রমে ইউরোপের ভাবধারার সংগে 'বিশ্বসাহিত্যের সংগে মিলিত হ'তে চলেছে—এইটেই ইংলণ্ডের বর্তমান সাহিত্যের বিশেষত্ব।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্মরণে

কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মহা-বিশ্বজীবনের প্রথম স্পন্দন তুমি রসরাজ মহাভাব মাঝে
আবির্ভাব পুণ্য দিনে ভাগবত মহোৎসবে হেরি তব পাদপদ্ম রাজে।
বৈষ্ণবের আবাহনে তুমি এলে এ বঙ্গের সারস্বত সাধনা-দেউলে
সাথে করে এনেছিলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে নদীয়ার প্রাণ-গঙ্গাকূলে।
নিজে হাতে ধুয়ে দেছ নিখিলের পাপ-তাপ এ বঙ্গেরে দিলে ধন্য করি,
তোমার করুণাবলে এ বঙ্গ বৈকুণ্ঠ পেলো, তীর্থভূমে ছিলে রাসেশ্বরী।
নিগূঢ় ধ্যানের রাজ্যে দেখায়েছ লীলাচ্ছবি দূর করি গভীর আঁধার,
দীনের অর্চনা লহ হে কালের আদ্যাশক্তি, অর্ঘ্য লহ অন্তর আমার।
আজি নব বর্ষ এলো—পড়ে মনে কত কথা, কত স্মৃতি স্নিগ্ধ মধুরিমা!
কিশোরীর বেশ ধরি জাহ্নবীর জনাকীর্ণ ঘাটে তুমি সৌন্দর্য্য-প্রতিমা
দিয়েছিলে যবে দেখা, স্তব্ধ হয়ে সেদিনের যাত্রাপথে শচীদেবী রয়,
দেখার অতীত করে প্রতি দিবসের মাঝে মাতৃচিত্ত করেছিলে জয়।
সংসারের খেলা ঘরে প্রবেশিয়া বধূবেশে দেখায়েছ চৈতন্য বিলাস,
নবদ্বীপ লীলা লয়ে ভাবরসে তোমারি মা নিত্যলীলা করেছ বিকাশ।
সংসার পাষাণ ভেদি অশ্রুর নির্ঝর দিয়া বহায়েছ প্রেমপ্রবাহিনী,
বুঝিতে পারেনি তাহা নদীয়ার জনারণ্য—বুঝেছিল শুধু মন্দাকিনী।
তোমার কঠোর ব্রত মানবের চিন্তাতীত, হেরিয়াছে নবদ্বীপবাসী
ভাবেনি সে ব্রত মাঝে পরম রহস্য রাজে যে রহস্য যুগে যুগে আসি
দেখাও বৈশাখী প্রাতে বর্ষণ মুখর রাতে ফাল্গুনের গন্ধসমীরণে—
জীবন কল্লোল গীতে প্রাণের মৃদঙ্গাঘাতে বিরহের নিবিড় বেদনে।
রুদ্ধকক্ষে আত্মভোলা জীবন কাব্যেরে তব রেখেছিলে মৌন অগোচরে,
বাহিরে বিরহ যাহা, ভিতরে সে মিলনের মাধুর্য্যেরে ব্যক্তাতীত করে।
বহু পুণ্যফলে মাগো তোমার পেয়েছি কৃপা তাই তব ভক্ত অনুরাগী,
যুগল মিলন লয়ে নিত্য নূতনের লীলা হেরি যেন,—এই ভিক্ষা মাগি।
নহ গৌর-অপেক্ষিতা, নহ গৌর-উপেক্ষিতা বিরহিনী নহ বিষ্ণুপ্রিয়া
নহ গোপী ঠাকুরাণী—চৈতন্যের চিত্তেশ্বরী বৃন্দাবন-মাধুর্য্যেরে নিয়া।
তাই তো তোমায় দেখি বৈরাগী বসন্ত যেথা করে তব সঙ্কীর্ত্তন নাম,
ছন্দের অঞ্জলি দিয়া সেথায় রাখিনু মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া আমারি প্রণাম।

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গত সংখ্যার পরের অংশ

জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। হুজুর—

প্রতুল। (চমকে) কে? জনার্দ্দন! তুমি এখনও যাওনি?

জনার্দ্দন। যাচ্ছিলুম। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, নাম বললেন মল্লিকা বসু—

প্রতুল। তাঁকে পাঠিয়ে দাও। আর তুমি এবার বাড়ী যাও।

জনার্দ্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জনার্দ্দনের প্রস্থান

নিরঞ্জন। কে? (ছবির দিকে দেখিয়ে) ইনি?

প্রতুল। হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ এখানে—

নিরঞ্জন। টানে। বলেছি তো প্রেম ভয়ানক জিনিষ।

প্রতুল। (অন্যমনস্ক ভাবে) হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। আমি ততক্ষণ তোমার ল্যাবরেটরী দেখি।

প্রতুল। তার কোন প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছা তুমি তার সঙ্গে আলাপ করে দেখ।

নিরঞ্জন। এই সব কথার পর—

প্রতুল। তাতে কি হয়েছে।

মল্লিকা বসুর প্রবেশ

মল্লিকা। আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন না?

প্রতুল। তা একটু হয়েছি বই কি। এস, তোমায় আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত, মল্লিকা বসু।

নিরঞ্জন। নমস্কার, মিস্ বসু।

মল্লিকা। নমস্কার। পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হলুম, বিশেষ করে আপনি যখন মিষ্টার চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

নিরঞ্জন। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার পূর্ব্বেই ঘটেছে—

মল্লিকা। (বিস্ময়ের সুরে) কবে? কোথায়?

নিরঞ্জন। আজকে, এইখানেই। (ছবির দিকে দেখিয়ে) ঐ ছবির সাহায্যে।

মল্লিকা। (হেসে) ওঃ, তাই বলুন। (ছবির কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রতুলের প্রতি) শেষ হয়ে গেছে?

প্রতুল। না, একটু বাকী আছে।

মল্লিকা। চমৎকার হয়েছে। আমি কিন্তু এতটা—

নিরঞ্জন। আপনার প্রকৃত প্রতিকৃতিই প্রতুল এঁকেছে। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি যে এত সুন্দরী মহিলা থাকতে পারেন—

মল্লিকা। ইজ দ্যাট এ কম্‌প্লিমেণ্ট?

নিরঞ্জন। ইয়েস, অ্যাণ্ড এ ট্রু ওয়ান টু।

মল্লিকা। (হেসে) থ্যাঙ্কস্। (প্রতুলের প্রতি) ছবিটা আঁকা শেষ হয়ে গেলে আমাকে দেবেন তো?

প্রতুল। নিশ্চয়ই।

মল্লিকা। আমাদের বসবার ঘরে টাঙিয়ে রাখব। সকলে দেখে হিংসেয় মরে যাবে। বাবা আপনার নৈনীতালের পাহাড়ের ছবির খুব প্রশংসা করছিলেন।

প্রতুল। লেকের ধারে, যেখানে আমরা বসতুম—

নিরঞ্জন। প্রতুল, তুমি কি আরও ছবি এঁকেছ?

প্রতুল। আর একটা মাত্র। নৈনীতালে।

মল্লিকা। বাবা বলেন এরকম রঙের কাজ ভারতবর্ষে আর কারো ইদানীং নেই। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে, মানে আমাদের জন্মাবার আগে, একটীমাত্র লোক, এই রঙ ব্যবহার করেছিলেন।

নিরঞ্জন। তার নাম জানেন?

মল্লিকা। না। ছবিতে তাঁর নাম ছিল না। বাবা বলেন, সে ছবি দেখে আর্টিষ্ট মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। তাতে শুধু তারিখ ছিল।

নিরঞ্জন। স্থান?

মল্লিকা। দিল্লী।

প্রতুল। দিল্লী?

মল্লিকা। হ্যাঁ। প্রথমে দিল্লীর আর্ট প্রদর্শনীতে সেটা এগ্‌জিবিট করা হয়, তারপর তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হওয়ায় সেটাকে কলকাতায় এনে আবার এগ্‌জিবিট করা হয়। বাবা ছবিটা কলকাতায় দেখেছিলেন।

নিরঞ্জন। আর্টিষ্টের খোঁজ করা হয় নি?

মল্লিকা। হয়েছিল, কিন্তু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

প্রতুল। ছবিটা এখন কোথায়?

মল্লিকা। জানি না। আচ্ছা প্রতুলবাবু, আপনি অথবা আপনার কোন আত্মীয় কখনও দিল্লীতে ছিলেন?

প্রতুল। না।

মল্লিকা। আপনি কার কাছে আঁকা শিখেছিলেন?

প্রতুল। কারো কাছে নয়।

মল্লিকা। ভারী আশ্চর্য্য তো। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের একজন

অজ্ঞাত আর্টিষ্টের অঙ্কনপদ্ধতি, রঙের বিন্যাসের সঙ্গে আপনার অদ্ভুত মিল রয়েছে···

প্রতুল। এমন কিছু অসম্ভব নয়—

মল্লিকা। আপনি বাবার সঙ্গে একদিন দেখা করবেন তিনি মিলটা কোথায় বুঝিয়ে দেবেন। আজ কি আপনি খুব ব্যস্ত?

প্রতুল। ডাক্তার গুপ্তর সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কাজ ছিল। তা ছাড়া এখুনি ডাক্তার সুবোধ রায়ও আসবেন—

মল্লিকা। সেইজন্যই আমি আরও এলুম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব।

নিরঞ্জন। ডাক্তার রায় কি খুব ভাল ডাক্তার?

মল্লিকা। হ্যাঁ। কলকাতায় তাঁর খুব নাম।

নিরঞ্জন। কিছু মনে করবেন না, আমি বম্বেতে থাকি, কলকাতার ডাক্তারদের তো চিনি না। তাই প্রশ্ন করলুম। প্রতুল, আমি এবার তোমার ল্যাবরেটরী দেখি—

প্রতুল। বেশ তো। কিন্তু বিশেষ কিছু নেই।

নিরঞ্জন। তা হোক। কিছু তো আছে। এক্সকিউজ মী মিস বসু—

ল্যাবরেটরীর দরজা খুলে নিরঞ্জনের প্রস্থান

মল্লিকা। লোকটা খুব ভদ্র—

প্রতুল। এবং ভারতবিখ্যাত সার্জ্জন। আজকাল আর প্র্যাকটিস করেন না।

মল্লিকা। আপনার ঘরটা বেশ মিষ্টার চৌধুরী, কিন্তু এত আলো কেন?

প্রতুল। আমি বেশী আলো ভালবাসি।

মল্লিকা। আপনার কি শরীর খারাপ?

প্রতুল। না। কেন? ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছি বলে?

মল্লিকা। আবার ডাক্তার গুপ্ত···

প্রতুল। আমি একটা রীসার্চ করছি। এঁদের মতামত এবং সাহায্য নেব।

মল্লিকা। আর কিছু নয় তো। আমায় লুকোবেন না—

প্রতুল। না, আর কিছু নয়।

মল্লিকা। তবে ঘরে এই সব কেন?

আল্ট্রা ভায়োলেট রে'র সরঞ্জাম দেখালে

প্রতুল। ওসব গবেষণার জন্য প্রয়োজন।

মল্লিকা। আপনি সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে বার হন না। ডায়েট সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি—কেন? সত্যি বলুন, শরীর ভাল তো?

প্রতুল। হ্যাঁ মিলি, শরীর আমার ভালই আছে।

মল্লিকা। শুধু গবেষণার জন্য—

প্রতুল। হ্যাঁ। আমি কলকাতায় এসেছি এই কাজের জন্যই এবং শেষ হলে আবার চলে যাব।

মল্লিকা। কোথায়? নৈনীতালে?

প্রতুল। না। কোথায় তা আমি নিজেই জানি না।

মল্লিকা। অনেক দিনের জন্য।

প্রতুল। হ্যাঁ।

মল্লিকা। (একটু পরে) তবু?···কতদিন?···

প্রতুল। জানি না, হয়ত' আর ফিরব না।

মল্লিকা। খেয়াল?

প্রতুল। (ব্যথিত স্বরে) খেয়াল নয় মিলি, নিরুপায়।

মল্লিকা। (অন্য দিকে চেয়ে) হবে।

প্রতুল। মিলি, তুমি আমায় ভুল বুঝ না। তুমি তো জান আমি তোমায় কত—

মল্লিকা। তবে যাওয়ার কথা মিথ্যা।

প্রতুল। মিথ্যা হলে সব চেয়ে সুখী হতুম আমি, কিন্তু অন্য কোন পথ নেই? আমায় চলে যেতেই হবে।

মল্লিকা। একথা পরে আর একদিন আলোচনা করা যাবে।

প্রতুল। তুমি আমায় ক্ষমা কর মিলি, এ অপ্রিয় আলোচনা আর কোরো না।

মল্লিকা। বেশ। ওকি! আপনার চোখ দু'টো অমন জ্বলছে কেন?

তাড়াতাড়ি কতকগুলি আলো জ্বেলে

প্রতুল। তোমায় দেখছি। দেখে আশ মেটে না।

মল্লিকা। কিন্তু আপনার চাউনি, সে যে আমি সহ্য করতে পারছি না। যেন ঝলসে দিচ্ছে—

প্রতুল। (আরো অনেকগুলি আলো জ্বেলে) আমি ভাবছি—

মল্লিকা। কি ভাবছেন?

প্রতুল। পতঙ্গরা দু'দণ্ডের সুখের আশায় আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন জলাঞ্জলি দেয়—

মল্লিকা। (ভীতভাবে) হঠাৎ এ কথা কেন?

প্রতুল। আমারও এ দু'দিনের সুখ—

মল্লিকা। নিশ্চয়ই আপনার শরীর খারাপ। এ অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা—

প্রতুল। তোমায় দেখলে আমি একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ি।

মল্লিকা। আপনার একজন অভিভাবক দরকার।

রেজার প্রবেশ

রেজা। হুজুর—

প্রতুল। কি রেজা?

রেজা। একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান—(কার্ড দিল)

প্রতুল। (কার্ড দেখে) ডাক্তার সুবোধ রায়—(মল্লিকার দিকে চাইলেন)

মল্লিকা। আমার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন না।

প্রতুল। রেজা, তাঁকে আসতে বল।

রেজা। আচ্ছা হুজুর।

রেজার প্রস্থান

মল্লিকা। আমাকে এখানে দেখলে ডাক্তার রায় বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন না।

প্রতুল। কেন?

মল্লিকা। তিনি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড, এবং...আমাকে একটু...

প্রতুল। তাই নাকি। আমি তা জানতুম না—

মল্লিকা। এমন কিছু ইম্পর্টেণ্ট কথা তো নয়। আমি তবে এখন যাই। আপনাদের কাজের কথাবার্ত্তার মধ্যে...

ডাক্তার সুবোধ রায়ের প্রবেশ

মল্লিকা। নমস্কার ডাক্তার রায়—

সুবোধ। মিলি! তুমি এখানে?

মল্লিকা। আমি এসেছিলুম আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে।

সুবোধ। ওঃ! কিন্তু তার কি বিশেষ প্রয়োজন ছিল!

মল্লিকা। (যেন একথা শুনতে পান নি এমন ভাবে) ইনি ডাক্তার সুবোধ রায়, কলকাতার বিখ্যাত সার্জ্জন আর ইনি মিষ্টার প্রতুল চৌধুরী।

প্রতুল। নমস্কার।

সুবোধ। নমস্কার। পরিচিত হয়ে সুখী হলুম।

মল্লিকা। যাক্, এইবার আমার কাজ শেষ হয়ে গেল—

সুবোধ। সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মল্লিকা। মিষ্টার চৌধুরী আপনার সাহায্যপ্রার্থী—

সুবোধ। আই উইল ডু মাই বেষ্ট।

প্রতুল। ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্তও এসেছেন। আমি তাঁকে ডেকে আনছি।

সুবোধ। যাঁর কথা আপনি চিঠিতে লিখেছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ।

সুবোধ। আচ্ছা, ইনিই কি "গ্ল্যাণ্ডস্ অ্যাণ্ড দেয়ার ইম্পর্টেন্স ইন্ দি সিষ্টেম্" বইটা লিখেছেন?

প্রতুল। হ্যাঁ।

ল্যাবরেটরীর দরজা দিয়ে প্রতুলের প্রস্থান

মল্লিকা। ডাক্তার গুপ্ত কি খুব বিখ্যাত লোক?

সুবোধ। "গ্ল্যাণ্ড ট্রীটমেণ্টে" ভারতবর্ষে উনি একজন অথরিটি।

প্রতুল ও নিরঞ্জনের প্রবেশ

প্রতুল। (ল্যাবরেটারীর দরজায় চাবী দিতে দিতে) ডাক্তার রায়—

সুবোধ। ইয়েস প্লীজ।

প্রতুল। (এগিয়ে এসে) ইনি ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত, আমার বিশেষ বন্ধু, আর ডাক্তার গুপ্ত ইনি হলেন ডাক্তার সুবোধ রায়।

নিরঞ্জন। সো গ্ল্যাড টু মীট ইউ ইয়ং ম্যান।

সুবোধ। আমার সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল স্যর। আপনার পুস্তক "গ্ল্যাণ্ডস্ অ্যাণ্ড দেয়ার ইম্পর্টেন্স ইন্ দি সিষ্টেম্" আমি পড়েছি এবং আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে শ্রদ্ধায় শির নত করেছি।

নিরঞ্জন। ধন্যবাদ। ডাক্তার রায়, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। হয়ত বেশী দিন বাঁচব না। আপনাদের মত বিচক্ষণ ইয়ং ডাক্তাররা যদি যতখানি আমি এগিয়েছি তার পর থেকে এই লাইনে কাজ করেন, তবে হয়ত' জগৎকে আমরা নতুন কিছু দিতে পারব।

সুবোধ। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন স্যর, কিন্তু আপনার লাইনটা খুব ডেলিকেট। জীবন-মরণ নিয়ে খেলা—

নিরঞ্জন। ইউ আর এ গুড্ সার্জ্জন। আর নতুন কিছু করতে গেলেই বিপদ আছে, কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন?

মল্লিকা। আপনারা কাজের কথা ক'ন। আমি এবার চলি। নমস্কার।

নিরঞ্জন। নমস্কার, মিস্ বসু।

সুবোধ। নমস্কার। কাল সকালে আপনাদের ওখানে যাব। মিস্ বসু এখন কেমন আছেন?

মল্লিকা। অনেকটা ভাল।

প্রতুল। এক্সকিউজ মী। আমি এঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসেছি।

প্রতুল ও মল্লিকার প্রস্থান

সুবোধ। ঘরটি দেখেই মনে হয় বৈজ্ঞানিকের গবেষণা মন্দির।

এদিকে ওদিকে দেখতে দেখতে মল্লিকার ছবির দিকে নজর পড়ল। কাছে এগিয়ে গিয়ে একমনে দেখতে লাগলেন

নিরঞ্জন। কি রকম দেখছেন?

সুবোধ। ওয়াণ্ডারফুল! আমি জানতুম না যে উনি একজন আর্টিষ্ট!

নিরঞ্জন। প্রতুল অদ্ভুত লোক।

সুবোধ। আমার সঙ্গে কি বিষয়ে পরামর্শ করতে চান জানেন?

নিরঞ্জন। সেই বলবে।

সুবোধ। যদি কিছু মনে না করেন, আপনিও কি কন্সাল্টেশনের জন্য এসেছেন স্যর?

নিরঞ্জন। না, কারণ আমি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছি। আমি ওর গবেষণায় ইণ্টারেস্টেড, তা ছাড়া আমি ওর বন্ধু।

সুবোধ। কিন্তু ওঁর বয়স বোধ করি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী হবে না।

নিরঞ্জন। বয়সে কি ডাক্তার রায় বন্ধুত্ব আটকায়?

সুবোধ। (লজ্জিত ভাবে) না, না, আমি তা বলছি না।

প্রতুলের প্রবেশ

প্রতুল। মাফ করবেন, আপনাকে বসিয়ে রাখলুম—

সুবোধ। নট্ অ্যাট্ অল্। আপনার আঁকা ছবিটি দেখছিলুম। চমৎকার হয়েছে।

প্রতুল। ইউ থিঙ্ক্ সো?

সুবোধ। ইয়েস্। আচ্ছা, আপনি কি নৈনীতালে ছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। মাস পাঁচ-ছয়। কেন বলুন তো?

সুবোধ। এমনি জিজ্ঞেস করলুম।

প্রতুল। ডাক্তার রায়, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

সকলে বসলেন

প্রতুল। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক ডাক্তার রায়?

সুবোধ। নো থ্যাঙ্কস্।

প্রতুল। দেখুন ডাক্তার রায়, আপনার সার্জ্জারী আমার ওপর করতে হবে।

সুবোধ। আপনার ওপর! দেখে তো আপনাকে সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে।

প্রতুল। আমি ঠিক অসুস্থ নয়। তবুও আপনার সাহায্য দরকার। ইউ আর দি বেষ্ট ম্যান অ্যাভেলএবল—

সুবোধ। কম্প্লীমেণ্ট!

প্রতুল। সোজাসুজিই বলা ভাল। আমার আড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড বদলে আর একজনের গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্ট করে দিতে হবে।

সুবোধ। (বিস্মিত হয়ে) হোয়াট! গ্ল্যাণ্ড বদলে—

প্রতুল। হ্যাঁ।

সুবোধ। আর একজনের গ্ল্যাণ্ড—

প্রতুল। এগজ্যাক্টলি।

সুবোধ। কেন?

প্রতুল। দরকার আছে বলে।

সুবোধ। আমি ডাক্তার, মিষ্টার চৌধুরী। কারণ না জেনে কাজ করতে পারব না। পেশেণ্টের ইচ্ছানুসারে সব কাজ করা সম্ভবপরও নয়, কর্ত্তব্যও নয়। তা ছাড়া আপনি যা বলছেন তা করা অসম্ভব?

প্রতুল। আমি জানি সম্ভব। ডাক্তার ভরনফ—

সুবোধ। বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড দিয়ে কাজ করা চলে, কারণ ওয়ান ক্যান কিল ইট। কিন্তু আর একজন মানুষের গ্ল্যাণ্ড দিয়ে—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, তাও সম্ভব।

সুবোধ। সম্ভব! কি বলছেন স্যর?

নিরঞ্জন। ঠিকই বলছি ডাক্তার রায়। আমার বইতে এই রকম একটা হিণ্ট দিয়েছি এবং নিজে হাতে করেও দেখেছি।

সুবোধ। করে দেখেছেন!

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। একবার নয় বহুবার।

সুবোধ। কিন্তু স্যর…

নিরঞ্জন। বলছি, শুনুন। আমি বইতে যখন একথা লিখি, তখন মেডিক্যাল ওয়ার্ল্ডে কেউ তা বিশ্বাস করতে চায় নি। অনেকে তীব্র প্রতিবাদও করেছিল। কিন্তু আমি শীঘ্রই জগতকে জানাব তা সম্ভব। ব্লড গ্রুপস্ আছে, জানেন?

সুবোধ। হ্যাঁ জানি। ডাক্তার ল্যাডষ্টেনার—

নিরঞ্জন। এগজ্যাক্টলি। এক ব্লডগ্রুপের দুই সাবজেক্টের মধ্যে গ্ল্যাণ্ড কেন প্রত্যেক অরগ্যান অদল বদল করা চলে, অ্যাণ্ড দে উইল গ্রো।

সুবোধ। বদলাতে গিয়ে তার শক্তি কমে যাবে—

নিরঞ্জন। সুইফ্টনেস দরকার।

সুবোধ। রক্তের সাপ্লাই, হেমরেজ—

নিরঞ্জন। যে রকম ভাবে লাঙ্গস সীল করা হয়, সেই রকম ভাবে আর্টারী সীল করে রাখতে হবে, আর গ্রাফ্টিংএর পর কিছুক্ষণ আর্টিফিশিয়াল পাম্পিং প্রয়োজন হবে।

সুবোধ। পেশেণ্টরা বাঁচবে?

নিরঞ্জন। নিশ্চয়ই বাঁচবে। অপারেশানটা ডেলিকেট কিন্তু ইম্পসিবল নয়। আমি বহুবার করে দেখেছি।

সুবোধ। একেবারে নতুন—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। এখনও এ জিনিষ কেউ জানে না, করে নি। আই ওয়াণ্ট টু টীচ ইউ। আপনি ভাল সার্জ্জন, চেষ্টা করলে পারবেন।

প্রতুল। এর জন্য আপনার যত টাকা ফী লাগে আমি দিতে প্রস্তুত।

সুবোধ। আপনি কেন এ কাজ করতে বলছেন?

নিরঞ্জন। কারণ উনি এই এক্সপেরিমেণ্টটা করতে চান এবং নিজের ওপর দিয়ে। যখন এতটা আপনাকে বললুম, তখন আর একটা কথাও আপনাকে বলা চলতে পারে। অবশ্য সবই কনফিডেনশিয়াল। কিন্তু আপনি ডাক্তার, বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। এই নতুন গ্ল্যাণ্ড এক্সচেঞ্জের থিওরী ওঁরই আবিষ্কৃত। আমি ওঁকে এসিষ্ট করেছি মাত্র।

সুবোধ। ওঁর আবিষ্কৃত।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। উনি বহু দিন গবেষণা করে এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

সুবোধ। হী ইজ এ ষ্ট্রেঞ্জ ম্যান—

নিরঞ্জন। ইয়েস, বীকজ হী ইজ এ জিনীয়াস।

প্রতুল। আমার গ্ল্যাণ্ডসের জীবনীশক্তি কমে গেছে—

সুবোধ। ভেরী ইণ্টারেষ্টিং এক্সপেরিমেণ্ট!

প্রতুল। শরীরে থাকলে প্রভূত ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বদলে নিলে দে উইল ফাংশন নর্ম্যালি।

নিরঞ্জন। হী ইজ অ্যাবসোলিউটলি রাইট।

সুবোধ। আর একজন লোক,…সে কি এতে রাজী আছে?

প্রতুল। নিশ্চয়ই। তা না হলে কাজে এগোবো কি করে। তাকে দেখবেন?

সুবোধ। আই উড লাইক টু।

প্রতুল। বেশ।

কলিং বেল টিপলে

সুবোধ। স্যর, এ কিন্তু সত্য হলে চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে।

নিরঞ্জন। ডাক্তার রায়, এতে কিন্তু নেই। এ সত্য এবং সম্ভব।

আমি তো বলেছি যে এর পূর্ব্বে বহুবার আমি এ অপারেশান করেছি।

রেজার প্রবেশ

রেজা। স্তর ডাকছেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। ডাক্তার রায়, হিয়ার ইজ দি আদার ম্যান।

সুবোধ। (ডাক্তার গুপ্তকে) এর ব্লড টেষ্ট করেছেন?

নিরঞ্জন। এখনও করি নি। কাল করব।

সুবোধ। কোথা দিয়ে গ্রাফ্‌টিং করবেন?

নিরঞ্জন। লাম্বার—

সুবোধ। (রেজার পিঠে হাত দিয়ে) রেট্রোপেরিটোনিয়াল ইনসিশন—

নিরঞ্জন। ইয়েস। অ্যাণ্ড কুইকনেস ইজ এসেনসিয়াল!

সুবোধ। বটেই তো। (প্রতুলের প্রতি) এর স্বাস্থ্য তো খুব ভাল নয়।

প্রতুল। দেখতে হবে।

নিরঞ্জন। স্বাস্থ্য তো ইম্পর্টেণ্ট নয়, ব্লড টেষ্টই হ'ল আসল।

সুবোধ। দু'জনের এক গ্‌রূপ হওয়া চাই।

নিরঞ্জন। এগজ্যাক্টলি।

সুবোধ। দু'জনকে এক সঙ্গে ওপেন করতে হবে…

নিরঞ্জন। ওফ কোর্স, ইট ইজ ডেলিকেট!

সুবোধ। ভেরী ডিফিকাল্ট অপারেশন—

নিরঞ্জন। বাট ইণ্টারেষ্টিং।

সুবোধ। তা বটে। (রেজার প্রতি) কি করা হবে তুমি জান?

রেজা। হ্যাঁ স্তর। অপারেশন। খুব লাগবে না তো?

সুবোধ। না। ক্লোরোফর্ম করে করা হবে। তোমার কোন আপত্তি আছে?

রেজা। আজ্ঞে না। আমি তো তা লিখে দিয়েছি। পাঁচশ' টাকা পেলে—

সুবোধ। তুমি একাজে সম্পূর্ণ রাজী?

রেজা। হ্যাঁ স্তর। অনেক দিন পাথর ভাঙতে হয়েছে—

প্রতুল। রেজা, তুমি এবার যেতে পার।

সুবোধ। মানে, তুমি কি…

রেজা। পাঁচশ' টাকার পরিবর্ত্তে আমি অপারেশনে রাজী আছি। (প্রতুলের প্রতি) আমি এবার যাব স্তর?

প্রতুল। হ্যাঁ। যেতে পার। দরকার হলে ডাকব।

রেজার প্রস্থান

প্রতুল। ও রাজী আছে, দেখলেন তো।

সুবোধ। কিন্তু গুরুত্বটা কি বোঝে?

প্রতুল। অত ফাইনার পয়েণ্টস্ ওর সঙ্গে ডিস্কাস করিনি। ও ডাক্তার নয়, সব জিনিষ বুঝতেও পারত না।

সুবোধ। তা ঠিক। (একটু থেমে) পাথর ভাঙ্গার কথা কি বলছিল? লোকটা কি জেল ফেরত।

প্রতুল। হ্যাঁ। দু'একবার পুলিশের হাতে পড়েছিল—

নিরঞ্জন। কিন্তু তাতে ইণ্টার্নাল অরগ্যান্সের কোন ক্ষতি হয় না।

সুবোধ। না, না, আমি তা মীন করিনি—

নিরঞ্জন। না করলেও, কথা বলার ভঙ্গীতে সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছে।

সুবোধ। ব্যাপারটা একটু আনইউজুয়াল—

নিরঞ্জন। প্রথম হিউম্যান বডি নিয়ে কাটা ছেঁড়াও আনইউজুয়াল ছিল।

প্রতুল। আগেও আমি একাজ করিয়েছি।

সুবোধ। তাই তো শুনছি। কোথায়?

প্রতুল। এলাহাবাদে।

সুবোধ। কার সঙ্গে?

প্রতুল। তার কি কোন দরকার আছে?

সুবোধ। সে বেঁচে আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখব।

প্রতুল। এ সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত গোপনীয়…

সুবোধ। গোপনীয়? কেন?

প্রতুল। প্রত্যেক নতুন জিনিষ আবিষ্কার গোপনেই করা হয়। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

নিরঞ্জন। আপনি কিজন্য এত চিন্তিত হচ্ছেন?

সুবোধ। দু'জন অজানা লোকের গ্ল্যাণ্ড অদল বদল—তার মধ্যে আবার একজন জেল ফেরত—

প্রতুল। আপনি রাজী নন?

সুবোধ। সবই গোপনে করতে হবে। যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, তখন আমার পোজিশন কি হবে?

নিরঞ্জন। আমি বলছি ভুল হতে পারে না।

সুবোধ। আপনি আগেও করেছেন স্তর তাই আপনার সাহস আছে কিন্তু আমার এই প্রথম। ভয় হওয়া স্বাভাবিক। (প্রতুলের প্রতি), আমাকে দু'এক দিন ভাবতে সময় দিন।

প্রতুল। বেশ।

সুবোধ। খুব তাড়া নেই তো?

প্রতুল। যত শীঘ্র সম্ভব হয় তত ভাল।

সুবোধ। দুদিন ভাবতে সময় দিন। (হাতঘড়ি দেখে) আমাকে এবার উঠতে হবে। কেস আছে।

প্রতুল। অল রাইট।

নিরঞ্জন। আশা করি শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

সুবোধ। হোপ সো। নমস্কার।

সুবোধের প্রস্থান

নিরঞ্জন। তোমার মিস বসুর ছবি আঁকাটা ওঁর পছন্দ হয় নি।

প্রতুল। না। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি।

নিরঞ্জন। একটু গণ্ডগোল করবে—

প্রতুল। না রাজী হয় অন্য লোক দেখব।

নিরঞ্জন। রাজী হলেও হতে পারে। লোকটা ভাল সার্জ্জন, ওকে ছাড়া ঠিক হবে না। এইবারই হয়ত' আমি তোমাকে শেষ সাহায্য করতে পারব, পরে···কে জানে?

প্রতুল। তুমি আর থাকবে না, এ আমি ভাবতেই পারি ন'। যেদিন থেকে একাজে নেমেছি প্রত্যেকবারই তুমি আমার পাশে ছিলে।

নিরঞ্জন। আর কোন ভাল সার্জ্জন জোগাড় হলেও চলে যাবে—

প্রতুল। তা হয়ত' যাবে, কিন্তু তুমি থাকবে না ভেবে আমার মনটা দমে যাচ্ছে। আমি আরও কতদিন থাকব—একলা, সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন অবস্থায়।

নিরঞ্জন। মিস্ বসু—

প্রতুল। না নিরঞ্জন, আমার জীবনে বন্ধুত্ব, প্রেম, সোসাইটী কিছুই থাকতে পারে না। প্রতিদিন আমার ভয়ে ভয়ে কাটে, কি জানি কখন কি হয়। সর্ব্বদা নতুন দেশে নতুন পরিচয়ে আমায় বাস করতে হয়—পাছে আমার কোন ট্রেস পিছনে পড়ে থাকে। তাহলেই আমার সীকরেট বেরিয়ে পড়বে।

নিরঞ্জন। কর্ম্মচারীটীরও তো কোন ট্রেস রাখলে চলবে না।

প্রতুল। না এবং সেইটাই আমার চলার পথে সবচেয়ে অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য।

নিরঞ্জন। প্রতুল, বহুদিন আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলুম, মনে পড়ে?

প্রতুল। কি কথা?

নিরঞ্জন। তুমি যা করছ' তা প্রকৃতির নিয়মবিরোধী এবং বোধ-করি ভগবানেরও নিয়ম বিরোধী।

প্রতুল। না, আমি তা স্বীকার করি না। তাহলে প্রত্যেক রোগীকে আরোগ্য করবার চেষ্টাও নিয়মবিরুদ্ধ বলতে হয়।

নিরঞ্জন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি তোমার এই অপূর্ব্ব প্রচেষ্টার সুখ্যাতি করি, কিন্তু তোমার বন্ধু হিসেবে আমার মনে হয়—

প্রতুল। বুঝেছি, কিন্তু এখন টু লেট্।

নিরঞ্জন। তোমার মনে কখনও কোন সন্দেহ জাগে না?

প্রতুল। ন'। তবে এইবার একটু···

নিরঞ্জন। প্রেম? মল্লিকা?

প্রতুল। (চমকে) প্রেম? না, না, বন্ধু, ওকথা উচ্চারণ কোরো না। প্রেমে আমার অধিকার নেই। আমি মানুষ হয়েও মানুষ নই। (অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ নিরঞ্জনের সামনে থেমে।) নিরঞ্জন, তুমি হয়ত' বললে বিশ্বাস করবে না, জীবনে আমার মনে এই প্রথম সন্দেহ, ভয় উঁকি দিয়েছে। তুমি চলে যাবে, মিলি চলে যাবে—একে একে সকলে চলে যাবে। আমি একা থেকে যাব—একা—একা—

নিরঞ্জন। প্রতুল, তুমি আজ ক্লান্ত। শুতে যাও।

প্রতুল। (লজ্জিতভাবে) মাফ করো নিরঞ্জন, আমি ভুল বকছিলুম।

নিরঞ্জন। তোমার সাহস হারালে চলবে না বন্ধু। যে জীবনমরণ যজ্ঞে তুমি ব্রতী, তা শেষ করে যেতে হবে।

প্রতুল। তা হবে। তারপর···ডাক্তার, তারপর কি? শুধু অন্ধকার—

নিরঞ্জন। (চীৎকার করে) প্রতুল—

প্রতুল। ভয় পেও না নিরঞ্জন, আমি পাগল হয়ে যাইনি। সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি। সেই গাঢ় অন্ধকারে যদি তুমি আমায় দেখ, ভয় পাবে?

নিরঞ্জন। না!

প্রতুল। আমার শরীর দিয়ে আগুন বেরোবে—তবু ভয় পাবে না?

নিরঞ্জন। না। (আজ্ঞার সুরে) প্রতুল, তুমি শোবে চল।

প্রতুল। (ধীরভাবে) চল।

প্রতুলকে নিয়ে নিরঞ্জনের প্রস্থান

ক্রমশঃ

গান

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতসুধাকর

ভুলে যেও মোর গান॥
মনে রেখ শুধু অতীতের স্মৃতি
মনে রেখ অভিমান॥

আমার মাঝারে তোমার মাধুরী
বিকাশে শতেক বরণ-চাতুরী
স্বপনের মাঝে যায় গো ভাঙিয়া
মিলনের অভিমান॥

কি হবে গো প্রিয় কলহ মিলনে,
আশীষ্ যেথায় নাই,
শুধু আঁখিজল লয়ে সম্বল—
যাই আজি চলে যাই॥
যদি মনে পড়ে ভালবাসা মম,
ভুলে যেও প্রিয় স্বপনের সম,
বিজয়ার মত সব কিছু আজি
হোক্ তবে অবসান॥

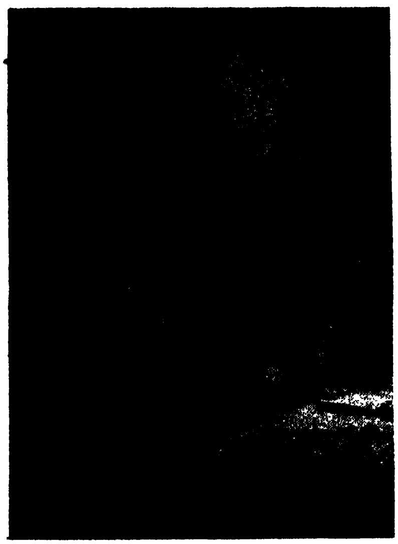
উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

১৩

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয়। অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান এবং ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু স্যর উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। উমেশচন্দ্রের অনুরোধে পার্লিয়ামেণ্টের নির্ভীক সদস্য ও ভারতবন্ধু চার্লস ব্র্যাডল এই অধিবেশনে যোগদান করায় এই অধিবেশনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। ব্র্যাডল ফ্রি থিঙ্কার ছিলেন। তিনি নাস্তিক বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টের চিরপ্রচলিত শপথ গ্রহণে অস্বীকার করেন—সুতরাং কয়েকবার উপর্য্যুপরি নির্বাচিত হইয়াও পার্লিয়ামেণ্টে বসিবার অধিকার পান নাই,



সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ

বহু মামলা মোকদ্দমা ও অর্থব্যয়ের পর তিনি পার্লিয়ামেণ্টে আসন প্রাপ্ত হন। অধ্যাপক ফসেটের পর ভারতবর্ষের জন্য আর কেহ তাঁহার ন্যায় পার্লিয়ামেণ্টে পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাই 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন—"আমাদের কি দুঃখ, আমরা কি চাই তাহা পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া কেহ বলা চাই, কেন না, পার্লিয়ামেণ্ট ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পার্লিয়ামেণ্টই প্রকৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা। ফসেট সাহেব দয়া করিয়া ভারতবর্ষের এই উপকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকৃতপক্ষে এ ভার আর কেহ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে মিষ্টার ব্যানারজি ও দাদাভাই ব্র্যাডল সাহেবকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন।" ব্র্যাডলকে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। যে সমিতির প্রতি এই অভিনন্দন পত্র প্রণয়নের ভার প্রদত্ত হয় তাহাতে উমেশচন্দ্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্র্যাডল সাহেবও ভারত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধীয় একটি নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে পেশ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনও করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার অনতিকাল মধ্যে তিনি পরলোকগমন করায় তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট লর্ড ক্রশ যে সংশোধিত বিল পেশ করেন তাহাই বিধিবদ্ধ হয়। এই অধিবেশনে হিউম ও অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে পুনর্নিযুক্ত হন এবং হিউমের অনুপস্থিতিকালে যুগ্ম সম্পাদক এবং উমেশচন্দ্র বাঙ্গালায় কংগ্রেসের আইন সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে কংগ্রেসের এজেণ্টরূপে কার্য্য করিবার জন্য স্যর উইলিয়ম



রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

ওয়েডারবার্ণ, মিঃ ডব্লিউ-এস-কেইন এম-পি, ডব্লিউ-এস-ব্রাইট-ম্যাক্ল্যারেন এম-পি, জে-ই-এলিস এম-পি, দাদাভাই নৌরোজী ও জর্জ্জ ইউলকে নিযুক্ত করা হয় এবং সম্পাদক ডব্লিউ ডিগবী সি-আই-ই কে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়। কংগ্রেস যে সকল সংস্কারের প্রার্থী তাহা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এবং তাহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ইংলণ্ডে আন্দোলন করিবার ভার প্রদত্ত হয়:—

জর্জ্জ ইউল, এ-ও-হিউম, অ্যাডাম, আর্ডলি নর্টন, জে-ই-হাউয়ার্ড, ফিরোজশাহ মেটা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, মিঃ

শরফুদ্দীন, এন মুধোলকার, ডব্লিউ-সি বনার্জ্জী। ইংলণ্ডে কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহের জন্য ৫৫০০০৲ টাকা চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হয়।

'ইণ্ডিয়া।' পারিবারিক বিপদ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ

ইংলণ্ডে কংগ্রেসের একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে উমেশচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণ 'ইণ্ডিয়া' পত্র প্রবর্ত্তিত করিতে সাহায্য করেন। এই বৎসর উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের অধিবেশনে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরটী উমেশচন্দ্রের পক্ষে ভয়ানক দুর্ব্বৎসর। মোক্ষদা দেবী লিখিয়াছেন—"সে বৎসর (১৮৯০ খ্রীঃ) পূজার বন্ধের পরেই কলিকাতায় আমার দাদার খুব ব্যারাম হয়। আমার ভাজ শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী তাঁর ছেলেমেয়েদের লইয়া তখন বিলাতে। সেখানে ঐ সময়ে তাঁর বার বৎসরের ছেলে, কিটি (সরলকৃষ্ণ) হঠাৎ মারা পড়াতে আমার দাদার অসুখ আরও বৃদ্ধি



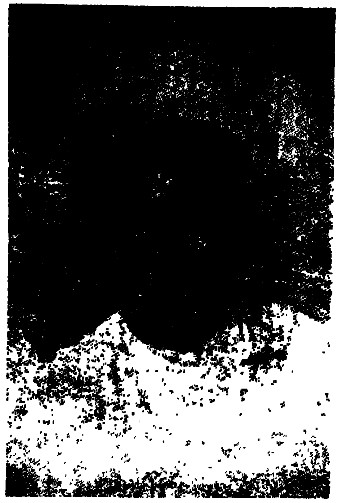
সরলকৃষ্ণ কীট্‌স্ বনার্জ্জী

পায়। তাঁর শুশ্রূষার জন্য আমাকে ভাগলপুর ছাড়িয়া প্রায় ছয় মাস কলিকাতায় থাকিতে হয়। * * * আমার দাদা ১৮৯১রের মার্চ্চ নাগাৎ সুস্থ হইয়া উঠিলে আমি ভাগলপুরে ফিরিয়া যাই।"

উমেশচন্দ্র তাঁহার তৃতীয় পুত্র সরলকৃষ্ণ কীট্‌সকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তিনি যখন বাতব্যাধিসংক্রান্ত জ্বরে শয্যাগত তখন এই আকস্মিক শোক সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই বৎসরে তাঁহার বিমাতা গোবিন্দমণিও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইঁহাকেও তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং ইঁহার পারলৌকিক কার্য্যের জন্য অন্যূন দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রোগের জন্য কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন কলিকাতাতে হইলেও তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথও এই সময়ে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে লিখিত আছে—"**There was another fellow-sufferer whose absence was severely felt by Congress-workers. That was Mr. W. C. Bonnerjee, who too, was confined to a sick-bed, prostrated with rheumatic fever.**"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন উমেশচন্দ্রের সতীর্থ স্যর ফিরোজশাহ মেটা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ ১২৯৭-৮ সালের 'ভারতীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের ব্রিটিশ এজেন্সীর সম্পাদক "শ্রীযুক্ত ডিগবী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুধলকার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নর্টন ও শ্রীযুক্ত হিউম মহাসমিতির প্রতিনিধিস্বরূপে গত বৎসরে ইংলণ্ডে যেরূপ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব গুরুতর কার্য্যভার সম্পাদন করিয়াছিলেন" তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি মহাসমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথমে একজন মহিলা প্রতিনিধি—বাঙ্গালী মহিলা



কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় "সংক্ষেপে সুমধুর ভাষায় সভাপতির গুণকীর্ত্তন ও মহাসমিতির গুরুতর কার্য্য একান্ত দক্ষতার সহিত পরিচালন জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ" দান করেন। সভাপতি মহাশয়ও সর্ব্বপ্রথম একজন মহিলা প্রতিনিধির নিকট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল এবং সহকারী চারুচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কংগ্রেসকর্ম্মীকেও সুব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ দেন। এই অধিবেশন উপলক্ষে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক "মহাপূজা" রচিত ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

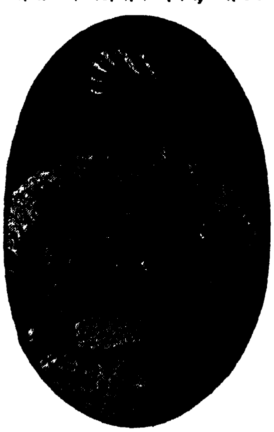
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আর একটি ঘটনা এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিব। উহা রাজনীতিঘটিত নহে। 'রেইজ ও রায়ত' সম্পাদক সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উমেশচন্দ্র আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার পত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিক মতামত উমেশচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিত এবং উমেশচন্দ্র তাঁহাকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া হিউম সাহেবও একবার উমেশচন্দ্রকে লিখিত এক পত্রে গুরুজী বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে শম্ভুচন্দ্র বিশেষ অপমানিত বোধ করেন এবং উমেশচন্দ্রকে বলেন "তোমরা গুরুজী বল তাহাতে দোষ হয় না কিন্তু যখন একজন বিদেশী ঐ ভাবে সম্বোধন করে তখন মনে হয় সে বিদ্রূপ করিয়া ঐরূপ বলিতেছে।" হিউম একথা শুনিয়া শম্ভুচন্দ্রকে লিখেন তিনি যথার্থই শম্ভুচন্দ্রের ভক্ত এবং বিদ্রূপ করিয়া ঐ ভাবে লিখেন নাই। স্ক্রীন বিরচিত শম্ভুচন্দ্রের ইংরাজী জীবনচরিতে (**An Indian Journalist by F. H. Skrine (I. C. S.** হিউমের পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে। শম্ভুচন্দ্র একবার তাঁহার পত্রে কোনও ধনী ব্যক্তির মান-হানিকর মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়। এই মানহানির মোকদ্দমায় উমেশচন্দ্র তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং স্যর চার্লস পল প্রভৃতিকে বুঝাইয়া এই প্রবীণ রাজনীতিক লেখক ও সম্পাদককে বিপন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু অর্থ দণ্ড (৫০০৲) দিতে হইয়াছিল কিন্তু শম্ভুচন্দ্র একখানি পত্রে লিখিয়াছেন বিপক্ষকে তিনি উমেশচন্দ্রের বক্তৃতার দ্বারা যে আঘাত দিয়াছিলেন তাহার তুলনায় উহা কিছুই নহে।

বন্ধু বিয়োগ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে চার্লস ব্র্যাডল রাজা স্যর তাঞ্জোর মাধব রাও, ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতির মৃত্যুতে উমেশচন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত তিনজন কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কংগ্রেসে তাঁহাদের উদ্দেশে সভাপতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। তাঁহার দৌহিত্র সাহিত্যগুরু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মুখে শুনিয়াছি যে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহাকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস কেবল আবেদন নিবেদনের দ্বারা কোন



শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রকৃত রাজনীতিক অধিকার লাভ সম্ভব নহে। বিদ্যাসাগরের প্রতি উমেশচন্দ্রের অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং উমেশচন্দ্রের অসাধারণ মাতৃভক্তির জন্য



উমেশচন্দ্র ও সার ফিরোজশাহ মেটা (সম্মুখে উপবিষ্ট)
পশ্চাতে দণ্ডায়মান—নলিনবিহারী সরকার, মনোমোহন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক ও শেফালী বনার্জী

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উমেশচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা বিনয়কৃষ্ণকে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করিতে উদ্বুদ্ধ করেন * এবং তাঁহার আশা ছিল ইঁহাদের দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত করিবেন! কিন্তু অল্প বয়সে নীলকৃষ্ণ ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হয়। তিনি নীলকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর বিনয়কৃষ্ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

খিদিরপুর ভবন বেডফোর্ড পার্ক, ক্রয়ডন ১৭ই জুলাই ১৮৯১

প্রিয় বিনয়কৃষ্ণ,

গত মেলে তোমার দাদা মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি যে কিরূপ শোকান্বিত হইয়াছি—তাহা প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন একনিষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী এবং তাঁহার বন্ধুগণ একজন প্রেমময়, সদাশয়, সহৃদয় এবং সুবিবেচক সঙ্গী ও সহকর্মী হারাইল। তাঁহার পারিবারিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা তুমি বাহিরের লোক অপেক্ষা বেশী জান কিন্তু এক্ষেত্রেও আমি কিছু জানি বলিয়া দাবী করিতে পারি, এবং যদি আমি বলি যে তাঁহার মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা হইলেও তাঁহার শোকাবহ মৃত্যুতে লোকে যাহা অনুভব করিতেছে তাহার সহস্রাংশের

* দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৮৮৬) নীলকৃষ্ণ যোগদান করিয়াছিলেন এবং ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৮৯০) তিনি একটী প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

একাংশও অভিব্যক্ত হয় না। * * * এ সময়ে আর অধিক কিছু বলিতে যাওয়া অনুচিত।

ভবদীয় প্রীতিভাজন বন্ধু
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উহাতে আনন্দ চার্লু সভাপতিত্ব করেন। ইংলণ্ডে কংগ্রেসের একটা অধিবেশন হইবে এইরূপ একটা প্রস্তাব চলিতেছিল এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষে পরবর্ত্তী অধিবেশন স্থগিত রাখিবার জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র বলেন যতদিন না কংগ্রেসের দাবী স্বীকৃত হইতেছে ততদিন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া উচিত এবং তাঁহার প্রস্তাবই গৃহীত হয়।



আনন্দ চার্লু

মাতৃ বিয়োগ

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র একটা ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর তাঁহার গর্ভধারিণী জননী সরস্বতী দেবী বারাণসীধামে স্বর্গারোহণ করেন। উমেশচন্দ্রের মাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয় ছিল। বিলাত যাত্রায় পিতার মত ছিল না, কিন্তু তাঁহার মাতা আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও পরিণীতা হইয়াও যথেষ্ট উদার মতাবলম্বিনী ছিলেন এবং বিলাত গমনের পূর্ব্বে উমেশচন্দ্র কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাকে চট্টগ্রামে একটি উচ্চ পদ পাইলে পুত্রকে তথায় যাইতে দিতে তাঁহার আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুত্রের উন্নতির জন্য তাঁহাকে কালাপানি পার হইতে দিতে সম্মতি দিয়াছিলেন। এই সম্মতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উমেশচন্দ্র বিলাত যাইতে দ্বিধা করেন নাই, হয়ত মাতার আপত্তি থাকিলে তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতেন। ইংলণ্ডে দারুণ অর্থকষ্টের সময় উমেশচন্দ্র তাঁহার মাতুল দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্যের মধ্যবর্ত্তিতায় মধ্যে মধ্যে জননীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। মাতার গভীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও আচারনিষ্ঠা উমেশচন্দ্র শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহার সকল ইচ্ছা পূরণ করিতে তিনি সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি খিদিরপুরে ৫ বিঘা পরিমিত জমির উপর যে উদ্যান ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার জননী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে সাহেবটোলায় ইংরাজের ন্যায় বাস করিলেও প্রতি সপ্তাহে বলরাম দে (এখন ডব্লিউ-সি-বনার্জী) ষ্ট্রীটে তাহার পৈতৃক ভবনে জননীর চরণ বন্দনা করিতে আসিতেন। দেব সেবা, কথকতা, অতিথি সেবাদির জন্য, যখন তাঁহার যাহা প্রয়োজন হইত, তাহা তখনই তাঁহাকে দিয়া আসিতেন। শেষ জীবন তিনি ৺কাশীধামে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উমেশচন্দ্র তথায় (সোণারপুরায়) একটী বাটী ক্রয় করিয়া তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি মাতার তুলাদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মাতার দেহের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী একবার দীক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হন কিন্তু উমেশচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মকে এরূপ শ্রদ্ধা করিতেন ধর্ম্ম লইয়া ভণ্ডামী তাঁহার সহ্য হইত না। তিনি বিলাত প্রত্যাগতা একজন বন্ধুপত্নীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে একদিকে হিন্দুধর্ম্মের নিষিদ্ধ আচার সমূহ পালন করিবে অপরদিকে মালা জপিবে ইহা হইতে পারে না। হেমাঙ্গিনী দেবী বলেন যে "একটা ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কিরূপে জীবনযাপন করিব, তাহা হইলে এস আমরা খৃষ্টান হই।" উমেশচন্দ্র বলেন যে "পতিত হইলেও হিন্দুধর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করিব না, ইচ্ছা হয় তুমি খৃষ্টান হইতে পার।" হেমাঙ্গিনী দেবী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন সন্তানও খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু উমেশচন্দ্র আজীবন আপনাকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

শুনা যায়, উমেশচন্দ্র তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ) প্রায় ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। মহারাজা, রাজা, হাইকোর্টের বিচারপতি ও ব্যবহারাজীব প্রভৃতি সমাজের উচ্চতম স্তরের ব্যক্তিরা এই শ্রাদ্ধ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি-আই-ই এই সভায় অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। এরূপ দানসাগর শ্রাদ্ধ অতি অল্পই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কাঙ্গালীদিগকে ।০ করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় উমেশচন্দ্র অপব্যয় মনে করিতেন না। অধ্যাপকগণকে মুক্তহস্তে দান, নরনারায়ণের সেবা তিনি পবিত্র কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এইজন্য যখনই কেহ তাঁহার নিকট পিতামাতার শ্রাদ্ধাদির জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইতেন, তিনি তাহাকে প্রভূত অর্থ সাহায্য করিতেন। কন্যার বিবাহে ক্ষমতাতিরিক্ত যৌতুকাদির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না এবং কন্যাদায়গ্রস্তদিগের প্রতি সেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন না।

সেতু

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

সন্ধ্যা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ধীর মন্থর গতিতে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে—বিষণ্ণ রোগপাণ্ডু মলিন মুখে। বেলা তখন ১০টা। ট্রামে বাসে ভয়ানক ভীড়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একখানা দোতলা বাসে ভীড় ঠেলে উঠে বসবার যায়গা পেলো। শ্রান্তভাবে মেয়েদের সিটে বসে পড়লো অবসন্ন দেহে। সে এসেছিল তার প্রিয় বান্ধবী অমিয়ার কাছে তাঁকে ধরে হাসপাতালে একটী সিট্ সংগ্রহের চেষ্টায়। অমিয়া এম-বি পাশ করে হাসপাতালে শিক্ষানবীশ। তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে বাড়ী ফিরছে।

সন্ধ্যা বাসে বসে ভাবছে তা'র অদৃষ্টের ঘটনালহরী : বাল্যে মাতৃহারা হ'লে পিতা সুহৃদকুমার মাতার স্থায় কত স্নেহে আদরে তাকে মানুষ করেন। স্নেহান্ধ পিতার কথা স্মরণ হ'তে তা'র দুই গণ্ড বয়ে পড়তো বাষ্পধারা। সুহৃদকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের লেক্‌চারার ছিলেন—ইউনিভার্সিটী ক্লাশে কয়েক ঘণ্টা ক্লাশ করে ফিরতেন বাড়ী—এসে ভার নিতেন কন্যা প্রতিপালনের। এমনি করে সন্ধ্যার বাল্য কিশোর বয়স কেটে গেল ; বাবার অত্যধিক আদরে মায়ের স্নেহের অভাব সে অনুভব করে নি। রুগ্ন-শয্যায় দেখেছে পিতাকে তা'র শয্যাপ্রান্তে দিবারাত্র ; তাতে মায়ের কোমল হস্তের স্পর্শ সে পেয়েছে। সুহৃদকুমার উচ্চশিক্ষিত খ্যাতনামা প্রফেসর ; তিনি কন্যাকে গড়ে তুল্লেন বর্ত্তমান যুগের স্ত্রী-শিক্ষার দোষ-বর্জ্জিত আদর্শস্থানীয় করে। পিতা-পুত্রী আনন্দে সংসার করছিলেন। হঠাৎ বিধাতা বিমুখ হলেন। সুহৃদকুমার কঠিন 'টাইফয়েড' জ্বরে শয্যা নিলেন—তৃতীয় সপ্তাহে রোগ দুরারোগ্য হয়ে দাঁড়ালো, চতুর্থ সপ্তাহে সুহৃদকুমার সজ্ঞানে অমর ধামে প্রস্থান করলেন। শোকবিধুরা সন্ধ্যা শেষ মুহূর্ত্ত অবধি পিতার সেবাশুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেছিল। মৃত্যুর পূর্বে প্রিয় ছাত্র অমিয়কুমারের হাতে তিনি সন্ধ্যাকে সঁপে দিলেন। অমিয়কুমার 'অর্থনীতি' শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর এম-এ মেধাবী ছাত্র ; চরিত্রের সুষমায় সকলের প্রিয়। সুহৃদকুমার তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন ; সন্ধ্যা অমিয়কুমারের গুণমুগ্ধা।

সুহৃদকুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে সন্ধ্যা সর্বহারা হলো—তার পিতৃকুলে কেউ ছিল না। বাল্যে মাতৃহারা হওয়ায় মাতৃকুলের কোন খবরও জানত না সে। অমিয়কুমার সংসার অনভিজ্ঞ সরল যুবক, ধনী পিতার একমাত্র পুত্র ; আদালের ঘরের দুলাল। পিতার নিকট অকপটে সন্ধ্যার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার বিষয় লিখে জানালো। পত্রের উত্তরে পিতা শীতল ভট্টাচার্য জমিদারী চালে যে ব্যঙ্গ উক্তি করে কড়া চিঠি লিখলেন তাতে সরলমতি অমিয়কুমার পিতার প্রতি বিরক্ত হলো ; ফলে পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ঘটলো। তার ইন্ধন যোগালো জামাতা রমানাথ চৌধুরী মোক্তার। জমিদার পিতা পুত্র অমিয়কুমারকে তিরস্কারপূর্ণ ভাষায় চিঠি লিখে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে শাসালেন। অমিয়কুমারের মাথায়ও খুন চাপলো। সামান্য ব্যাপারে পিতার এই অন্যায় বিধানে মর্ম্মাহত হয়ে অমিয়কুমার পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করলো। অমিয়কুমারের জননী হরসুন্দরী স্বামীর কার্য্যে প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বামীর রূঢ় ব্যবহার ও অগ্নিমূর্ত্তি দেখে অন্তরে তীব্র আঘাত পেয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিন পরে মায়ের নামে অমিয়কুমারের এক পত্র এল। পত্রে লেখা ছিল :

মা, বাবার নির্মম পত্র আমাকে রীতিমত আঘাত দিয়েছে। আমি সন্ধ্যাকে বিবাহ করলুম। তোমাদের সম্পত্তি আমি চাই না। আমি যুদ্ধে চল্লুম, হয়তো আর ফিরবো না। আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ করো।

—হতভাগ্য অমু।

পুত্রের পত্র পাঠ করে শীতল ভট্টচায বজ্রাহতের ন্যায় বসে পড়লেন ; স্ত্রী হরসুন্দরী মূর্চ্ছিতা হ'লেন।

অমিয়কুমার সন্ধ্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলো। সন্ধ্যা শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী যুবতী ; অমিয়কুমারের এই সৎসাহস ও দৃঢ়তায় মুগ্ধা হলো। সেই সময়ে পৃথিবীব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম চলছিল। অমিয়কুমার বৈমানিক-রূপে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও রয়াল এয়ার ফোর্সে চাকুরী নিয়ে যাত্রা করলো এক অজ্ঞাত স্থানে—বিদায়কালে সন্ধ্যাকে অনেক সান্ত্বনার সঙ্গে ভবিষ্যতের অনেক রঙিণ আশার বাণী শুনিয়ে দিল। সন্ধ্যা অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বামীকে বিদায় দিল।

টালীগঞ্জে সুহৃদ গুপ্তের বাড়ীর নীচের তলায় সন্ধ্যা আশ্রয় নিয়েছে। গুপ্তমশায় তা'র স্বামীর বিশিষ্ট বন্ধু। অমিয়কুমার যাবার সময়ে বন্ধুপত্নীর হাতেই সন্ধ্যার সম্পূর্ণ ভার দিয়ে যায়। গুপ্ত-গিন্নী ছোট বোনের মত সন্ধ্যাকে ভালবাসেন ও স্নেহ করেন। সন্ধ্যা তাঁহার স্নেহ ভালবাসার পীযূষধারায় নিজের সব কিছু দুঃখ কষ্ট ভুলে আছে। অমিয়কুমার মাসে মাসে সন্ধ্যার জন্য যে টাকা পাঠান, তাতে তার অর্থের অনটন হয় না। দেখতে দেখতে আট মাস কেটে গেল।—সন্ধ্যার সমস্ত অঙ্গে মাতৃত্বের ছাপ দেখা দিয়েছে। গুপ্ত-গিন্নীর তাড়নায় সন্ধ্যা গিয়েছিল, বান্ধবী অমিয়ার কাছে প্রসূতি-হাসপাতালে আশ্রয় পেতে। অমিয়ার সুপারিশে তা'র আশ্রয় মিলে গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রসূতি-আগারে গিয়ে সন্ধ্যা এক অনিন্দ্য-কান্তি সুন্দর বলিষ্ঠ-পুত্ররত্ন প্রসব করলো।—সাতদিন তা'কে হাসপাতালে আটক থাকতে হলো।—এই সাত রাত্রে সে বাংলার শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলো তা'তে তার এই প্রতিষ্ঠান তথা বর্ত্তমান শিক্ষার্থী যুবকযুবতী ডাক্তার ও সেবিকাদের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেল। গভীর রজনীতে যখন রুগ্না যুবতীগণ রোগযন্ত্রণায়

আর্তনাদ করছে, সেই সময় যুবক ডাক্তার যুবতী নার্সের সঙ্গে প্রেমালাপে তন্ময়! আরো কত কি কুৎসিৎ দৃশ্য! আর, সন্ধ্যা ভাবে এই কি আমাদের দেশের শিক্ষিত শিক্ষিতা তরুণী!—এই কি সেবা ধর্ম্ম! এর কি কোন প্রতীকার নাই?

এক বৎসর পর। নবাগত শিশু তা'র মোহন মূর্তিতে মায়ের পুঞ্জীভূত দুঃখকষ্টকে ভুলিয়ে রেখেছে। তার কচিমুখে হাসি ফুটেছে—আধ আধ বুলী শিখেছে। এই সুস্থ সবল সুন্দর শিশুকে সবাই ভালবাসে, কোলে নেয়। সন্ধ্যা তার শিশুপুত্রের মুখে স্বামীর মুখের সাদৃশ্য দেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে স্বামীর বিরহ ব্যথা ভুলে যায়। অমিয়কুমার পুত্রের জন্ম সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হয়ে চিঠি লিখেছে—পুত্রের ফটো পাঠাতে লিখেছে; শিশুপুত্রের নাম সে-ই দিয়েছে "নরেন্দ্রকুমার"। পুত্র প্রসবের পর হ'তে সন্ধ্যার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তার সুন্দর কমনীয় মুখমণ্ডলে কে যেন এক পোচ কালী লেপে দিয়েছে। ডাক্তার দেখান হলো—তিনি পরামর্শ দিলেন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েক মাসের জন্য নব প্রসূতিকে পাঠাতে—আর যদি সম্ভব হয় সন্ধ্যার স্বামীকে একবার আসতে লিখতে। গুপ্ত মহাশয় শঙ্কিত হলেন; অমিয়কুমারকে পত্রে সব কথা লিখে একবার ছুটি নিয়ে আসতে লিখলেন। তারপর দুই মাস কেটে গেল অমিয়কুমারের কোন পত্র বা মণিঅর্ডার না পেয়ে সন্ধ্যার রুগ্না পাণ্ডুর মুখ আরো মলিন ও চিন্তাকুল হলো। গুপ্তমশায়ের সদা প্রফুল্ল মুখও মলিন হ'লো। তিনি অমিয়কুমারের উপরওয়ালার নিকট একখানি দরখাস্ত সন্ধ্যার নাম দিয়ে লিখলেন—প্রায় ৩ সপ্তাহ পরে একসঙ্গে তিনমাসের খরচ এল, কিন্তু তা'তে অমিয়কুমারের কোন খবর মিলিল না। গুপ্তমশায় অগত্যা মন্দের ভাল মনে করে সন্ধ্যাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাবার মন করলেন। পুরীর এক আশ্রমে তাঁর একটী বন্ধু ছিলেন; গুপ্ত মশায়ের অনুরোধে তিনিই সন্ধ্যার জন্য উপযুক্ত স্থানসংগ্রহ ও তাঁর দেখাশুনার ভার নিতে প্রতিশ্রুত হ'লেন—গুপ্তমশায়ের মলিনমুখে হাসির রেখা ফুটল। বৈশাখের এক শুভদিনে সন্ধ্যার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুপ্তমশাই তাঁর পুত্র শ্যামলকে দিয়ে সন্ধ্যাকে পুরীতে পাঠালেন—সঙ্গে বিশ্বাসী ঝি সৌদামিনী গেল।

পুরীতে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রের তটে একখানি দোতলা ঘরে সন্ধ্যার বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল। বিশাল সমুদ্রের নীলজলরাশি ও পর্ব্বত প্রমাণ অবিশ্রান্ত উর্মিমালা দেখে সন্ধ্যা মুগ্ধা হলো—সমুদ্রের শীকরসংপৃক্ত শীতল বাতাস তার মন-প্রাণ পুলকিত করলো—হৃদয়ের সব ক্ষত যেন কার কোমল স্পর্শে শীতল হলো। সায়াহ্নে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে আরতির মঙ্গল শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে তার হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হ'লো; সন্ধ্যা যুক্ত করে মঙ্গলময়ের চরণে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করলো।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। সন্ধ্যা হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেল। তবে মাঝে মাঝে তার মানসিক অশান্তি হয়—কিন্তু মন্দির ও সমুদ্রের তীর তা'র সেই অশান্তি দূর করে। সমুদ্রের হাওয়ার সঙ্গে তার উদাস মন উড়ে যায় কোন অজানা দেশে—তার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হ'য়ে যায় উড়ো জাহাজের নির্ঘর শব্দে; মনে করে এই জাহাজে হয়তো আছে তা'র হৃদয় দেবতা! অমনি মনের কোণে খচ করে ওঠে তার লুকানো ব্যথা! কত মাস পায়নি তার স্বামীর এক ছত্র হাতের লেখা। সেদিন সন্ধ্যা সমুদ্রতীর থেকে ফিরে বাড়ী ঢুকতে দেখলো পাশের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়েছে; কত মাল পত্র গাড়ী থেকে নামছে। সর্ব্বশেষে নামানো হোল একটী রুগ্না বর্ষীয়সী নারীকে 'ষ্ট্রেচারে' করে।

পরদিন দুপুর বেলা সন্ধ্যার খোকাবাবু এক কাণ্ড করে বসলো। মা ও সৌদামিনী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই সুযোগে খোকাবাবু আপন মনে ঘরের মধ্যে খেলা করতে করতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশের বাড়ীর নবাগত বড়লোক ভাড়াটে ঘরের তক্তপোষের উপর শুয়ে আরাম করছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সন্ধ্যার শিশুপুত্রের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তড়িৎপৃষ্ঠের ন্যায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন—অপলক দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে তাকিয়ে রইলেন, পরে আপন মনে বললেন, 'কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!—ঠিক যেন আমাদের সেই বালক অমু। ওগো, ছুটে এসো, তোমার ছোট্ট অমু এসেছে?"—ভাবের আতিশয্যে বৃদ্ধের মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে এলো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যে রুগ্না শয্যাশায়িনী তা ভুলে গিয়েছিলেন! সে ভাব কেটে গেলে তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে জানালার পাশে দাঁড়ালেন—দুই হাত বাড়িয়ে সাশ্রুনয়নে কোমল কণ্ঠে ডাকলেন, "এসো"—খোকা তার নরম হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে আধ আধ কণ্ঠে উত্তর দিল, "দা-দু!" শিশুর এই সম্বোধন বৃদ্ধের হৃদয়ে নবীন ভাবের সৃষ্টি করল—তাঁর দুই নয়নে অশ্রুবারি ছুটল।—দুই হাতে চোখের জল মুছে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন খোকা জানালা থেকে নেমে গেছে। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে পড়লেন; বহুদিনের হারানো স্মৃতি তাঁর মনপ্রাণ বিচলিত করে তুললো। কানের কাছে কে যেন তখনো সুধাবর্ষণ করছিলো "দাদু!"

বৃদ্ধ শীতল ভট্টাচার্য স্ত্রী হরসুন্দরীর নিকট পাশের বাড়ীর খোকার কথা সবিস্তারে বললেন। হরসুন্দরী শুনে অশ্রুজলে বিছানা সিক্ত করলেন; শিশুর ন্যায় বায়না ধরলেন, বললেন, "ওগো, একটি বারের জন্য সেই খোকামণিকে দেখাও আমায়।" কর্তার হুকুমে বৃদ্ধা ঝি মুক্তার মা পাশের বাড়ীতে সন্ধ্যার কাছে গিয়ে হাজির হ'লো। জমিদারের বাড়ীর ঝি সাজিয়ে গুজিয়ে অনেক রকম ভনিতা করে সন্ধ্যাকে জানিয়ে দিলো তার বাবু মস্তবড় জমিদার—কত লোক লস্কর দাস দাসী ধন দৌলত তার বাবুর, জমিদার গিন্নী শয্যাশায়িনী, ব্যারাম পীড়া তেমনি কিছু নয়, একমাত্র ছেলে রাগ করে লড়াইয়ে গেছে সেই মনোকষ্টে বিছানা নিয়েছেন। আহার নিদ্রা নেই। বড়লোকের খেয়াল বায়না ধরেছে সন্ধ্যার ছেলেটাকে একবার কোলে নিয়ে আদর করবে, তাই হয়ত, ছেলেকে একটা সোনাদানা খয়রাৎ করবে। সন্ধ্যা মুক্তার মায়ের কথায় ও হাবভাবে মোটেই সন্তুষ্ট হ'লো না, সে তার ছেলেকে বড়লোকের বাড়ীতে পাঠাতে অস্বীকৃত হ'লো। মুক্তার মা বিফলমনোরথ হ'য়ে গিন্নীর কাছে সন্ধ্যার নামে অনেক কথা লাগিয়ে শেষে বললে "ছুঁড়ীর বড় দেমাক, মাগো।" গিন্নী হরসুন্দরীর পুঞ্জীভূত শোকভার উথলে উঠলো, তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে প্রবল বেগে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হয়ে উপাধান সিক্ত হ'ল। বৃদ্ধা ঝি সৌদামিনী খোকাকে নিয়ে

সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসত। তার অনতিদূরে শীতলবাবুও গিয়ে বসে থাকতেন—একদৃষ্টে খোকার পানে তাকিয়ে এমনি করে বৃদ্ধ শীতল ভট্টাচার্য তার বুভুক্ষু হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাতেন; যেদিন খোকাকে না দেখতে পেতেন তাঁর মন প্রাণ শোকাচ্ছন্ন হ'তো। একদিন সৌদামিনী ঝিকে শীতলবাবু অনেক মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করে খোকাকে হরসুন্দরীর নিকট নিয়ে গেল; হরসুন্দরী অবাক হ'য়ে খোকাকে দেখলেন, আদর করে চুমো খেলেন। স্বামীকে বললেন, এ যেন আমার অমুর নব-কলেবর! হরসুন্দরীর রোগে পাণ্ডুর মলিন মুখে সেদিন হাসির রেখা দেখে শীতলবাবুর হৃদয় শীতল হল। হরসুন্দরী ঝি সৌদামিনীর হাতে পাঁচটি টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন "তুমি মা, আমাকে একটিবার খোকামণিকে রোজ দেখাবে—আমি তোমায় খুসী করব।" সৌদামিনী এদের ব্যবহারে ও হাব ভাবে অবাক হল—সে সন্ধ্যাকে কিছু জানালো না, পাছে তার আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। নিত্য খোকার সন্দর্শনে ও সাহচর্যে হরসুন্দরীর জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল। চিকিৎসক এই আকস্মিক রোগমুক্তির কারণ খুঁজে পেলেন না, কিন্তু মুখে তাঁর চিকিৎসার প্রশস্তি করতে ভুললেন না।

সেদিন সন্ধ্যা স্বামীর চিঠি পেল—অমিয়কুমার বৈকালের গাড়ীতে পুরী পৌঁছিবেন। তা'র সমস্ত হৃদয়ে অনির্বচনীয় পুলকের সঞ্চার হ'লো, মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো—খোকার কোমল গালে অসংখ্য স্নেহচুম্বন দিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুললো। ঝি সৌদামিনী সন্ধ্যার আনন্দাতিশয্য দেখে বললে, "মায়ের মুখে যে আজ হাসি ধরে না—কি সুসংবাদ মা?" সন্ধ্যা লজ্জিতভাবে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকে অমিয়কুমারের আগমন বার্তা জানালো—সৌদামিনী হৃষ্টমনে প্রস্থান করলো। বৈকালে জমিদার-গিন্নী সশরীরে সন্ধ্যার ঘরে এসে উপস্থিত হ'লেন। সন্ধ্যা সসম্ভ্রমে তাঁ'কে অভ্যর্থনা করে বসালেন। গিন্নি স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বললেন "মা, তোমাকে দেখে অবধি মনে কেমন একটা মায়া জন্মেছে, মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার অতি আপনার জন। আমি তোমার নিকট থেকে একটী প্রশ্নের জবাবের জন্য ছটফট্ করছি।" বলেই তিনি সাশ্রুনয়নে সন্ধ্যার মুখের পানে তাকালেন। সন্ধ্যার সুন্দর মুখখানি অশ্রু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অভ্যাগতা মহিলাটিকে সে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো এমনি মুহূর্তে ঝি সৌদামিনী খবর দিলে, বাবু এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অমিয়কুমার সহাস্যমুখে ঘরের দরজায় উপস্থিত হলো। হরসুন্দরী মাথার কাপড় টেনে দরজার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে দেখলেন—সম্মুখে তাঁরই হারানো নিধি স্নেহের পুত্তলী! দুই নয়নে অশ্রুর প্লাবন নিয়ে ছুটে গিয়ে বুকে ধরলেন তিনি অমিয়কে—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন, "বাবা অমু, এমনি করেই কি বুড়ো মা'কে কষ্ট দিতে হয়।"—অমিয়কুমার দুই চোখে বাষ্প ধারা নিয়ে মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে বললো মা, তুমি এখানে! সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে হরসুন্দরীর পদতলে বসলো। গাড়ী থেকে নামবার সময় শীতলবাবু পুত্রকে চিনেছিলেন, তিনি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছিলেন এ বাড়ীতে—আনন্দের আতিশয্যে রণুকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমি যে ঠিক ধরেছিলুম দাদুমণি, আমার অনুমান মিথ্যা নয়?" স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে হরসুন্দরী বস্ত্রাদি সামলে নিলেন। অমিয় ও সন্ধ্যা ধীর মন্থর গতিতে শীতল ভট্টাচার্যের পদতলে নতজানু হলো; শীতল সস্নেহে দু'জনকে তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন, "এবার আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চল মা, আর ত তফাতে থাকা চলবে না, আমার দাদুমণি যে আগেই বেঁধেছে মিলনের সেতু।"

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

তৃতীয় প্রকরণ—ইন্দ্রিয়জয়

ষষ্ঠ অধ্যায়—অরিষড়্‌বর্গত্যাগ

মূল:—বিদ্যা-বিনয় হেতু ইন্দ্রিয়জয়—কাম ক্রোধ-লোভ-মদ হর্ষ-ত্যাগ-দ্বারা কর্ত্তব্য। কর্ণ ত্বক্ অক্ষি জিহ্বা ঘ্রাণ—(এই) ইন্দ্রিয়গুলির (যথাক্রমে) শব্দ স্পর্শ-রূপ রস গন্ধে—(এই বিষয়সমূহে) অবিপ্রতিপত্তি, অথবা শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান(ই) ইন্দ্রিয়জয়। যেহেতু এই কৃৎস্ন শাস্ত্র(ই) ইন্দ্রিয়জয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ের হেতু)।

সঙ্কেত:—ইন্দ্রিয়জয়—ইন্দ্রিয়—মূলতঃ দ্বিবিধ—(১) অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ ও (২) বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ। বহিরিন্দ্রিয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১)জ্ঞানেন্দ্রিয়—সংখ্যায় পাঁচটি—কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুঃ-জিহ্বা-নাসা, (২) কর্ম্মেন্দ্রিয়—সংখ্যায় পাঁচটি—বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি (কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুঃ-জিহ্বা-নাসিকা) যথাক্রমে পঞ্চ বিষয় (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) গ্রহণের দ্বারভূত। আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্-পাণি-পাদ পায়ু-উপস্থ) যথাক্রমে পঞ্চবিধ কর্ম্ম (শব্দোচ্চারণ-গ্রহণ-গমন-বিসর্জ্জন-আনন্দভোগ) করণের দ্বার। অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ (মন) একাই এই দশটি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক—একাই এই দশ বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ। ইহা ব্যতীত ইহার নিজ কর্ম্মও আছে উহা চতুর্ব্বিধ—(১)

সংশয়, (২) নিশ্চয়, (৩) স্মরণ ও (৪) অহম্ভাব বা গর্ব্ব অনুভব। যখন ইহা সংশয়যুক্ত (সঙ্কল্প-বিকল্পে দোলায়মান) হয়, তখন ইহার নাম—'মন'। যখন ইহা নিশ্চয় করে, তখন ইহাকে বলা হয়—'বুদ্ধি'।' যখন ইহা স্মরণ করে, তখন ইহার নাম দেওয়া হয়—'চিত্ত'। আর যেরূপে ইহা গর্ব্বানুভব বা অহম্ভাবানুভব করে,ইহার সেই রূপের নাম—'অহঙ্কার'। বহিরিন্দ্রিয়-জয় করিবার নিমিত্ত যে সাধনা অবলম্বনীয়, তাহার নাম—'দম' সাধন। অন্তরিন্দ্রিয়-জয় সাধনার নাম—'শম'-সাধন। বিদ্যাবৃদ্ধগণের সহিত সংযোগ ইন্দ্রিয়জয়ের হেতু—এই কারণে 'বৃদ্ধসংযোগ' প্রকরণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রকরণে ইন্দ্রিয়জয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

অরিষড়্‌বর্গ—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য—এই ছয়টির নাম ষড়্‌রিপু বা অরিষড়্‌বর্গ। কিন্তু এস্থলে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে সাধারণতঃ প্রচলিত দুই রিপুর (মোহ ও মাৎসর্য্য) পরিবর্ত্তে কৌটিল্য দুইটি নূতন রিপুর নাম দিয়াছেন—'মান' ও 'হর্ষ'।

বিদ্যা-বিনয়-হেতু—শ্যাম শাস্ত্রীর অভিপ্রায় বিদ্যা ও বিনয়ের হেতু—'on which success in study and discipline depends'; কিন্তু গণপতি শাস্ত্রী অর্থ করিয়াছেন—বিদ্যাসংস্কার-কারণ; বিদ্যা-জনিত বিনয় (অর্থাৎ সংস্কার)—তাহার হেতু—**cause of culture (discipline) arising out of education** বলা চলে; অথবা **cause of education and culture (discipline)**। কাম—পরস্ত্রী-বিষয়ক অভিলাষ (গঃ শাঃ); **lust (SH)**; কিন্তু 'কাম' বলিলে কেবল 'কামনা' (**desire**)—এরূপ অর্থও বুঝাইতে পারে। ক্রোধ—হিংসা-প্রবর্ত্তক চিত্তবিকার (গঃ শাঃ); **anger (SH)**; কাম পূর্ণ না হইলে—কামনা বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উদ্রেক হয়। লোভ—পরদ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছা (গঃ শাঃ); **greed (SH)**; মান—মূর্খতাবশতঃ নিজের উপর অনুপমত্ব-বুদ্ধির আরোপ (গঃ শাঃ); অহম্ভাব; **vanity (SH)**; **self-conceit**। মদ—ধন-বিদ্যাদি-জনিত গর্ব্ব (গঃ শাঃ); **haughtiness (SH)**; **pride**. হর্ষ—অভিলষিত বিষয়ের উপভোগ-জনিত প্রীতি (গঃ শাঃ); **overjoy (SH)**। এই ষড়্‌রিপু বর্জ্জন করিলে তবেই ইন্দ্রিয়-জয় সম্ভব। অবিপ্রতিপত্তি—স্বতঃ অবিরুদ্ধা প্রবৃত্তি (গঃ শাঃ); **absence of discrepancy in the perception of (SH)**; **proper or legitimate application in the (perception of)**—বলাই সঙ্গত। তাৎপর্য্য—শব্দাদি বিষয়ে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অবিরুদ্ধভাবে প্রবৃত্তির নামই—ইন্দ্রিয়-জয়, অর্থাৎ—শোত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি অবিরুদ্ধ শব্দাদি বিষয় ভোগ করে—তাহারই নাম ইন্দ্রিয়-জয়; আর বিরুদ্ধ বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বলা চলে ইন্দ্রিয়লৌল্য। বিষয়ের বৈধ ভোগ ইন্দ্রিয়-জয়; অবৈধ ভোগ—ইন্দ্রিয়-চাপল্য। শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠানই ইন্দ্রিয়-জয়—ইহার তাৎপর্য্য এই যে—এই সকল শব্দাদি বিষয় সেব্য—এইরূপ জ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবগত হইলে তত্তৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়-জয় নামে খ্যাত হইয়া থাকে। শাস্ত্র-বিহিত বিষয়-সেবার নাম বৈধ-বিষয়-সেবা—উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিহিত বিষয়-সেবায় ইন্দ্রিয়-জয়ের পরিচয় পাওয়া যায়—ইহাতে বিষয়-চাপল্যের লেশমাত্রও থাকে না। কৃৎস্ন শাস্ত্রই ইন্দ্রিয়-জয়—শাস্ত্র যে সকল বিষয় অনুষ্ঠেয় বলিয়া প্রতিপাদন করেন, সেই সকল বিষয়ই ইন্দ্রিয়-জয়ের হেতু। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-জয়ের হেতুকেই ইন্দ্রিয়-জয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণে কার্য্যোপচার (গঃ শাঃ); **the sole aim of all sciences is nothing but restraint of the organs of sense (SH)**; শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-জয়—একথা বলা অনুচিত। তবে শাস্ত্র ইন্দ্রিয়-জয়ের হেতু—একথা বলা সঙ্গত।

মূল :—তদ্বিরুদ্ধবৃত্তি অবশীকৃতেন্দ্রিয় রাজা চতুঃসমুদ্রব্যাপিনী পৃথ্বীর অধীশ্বর হইলেও সদ্যঃ বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—তদ্বিরুদ্ধবৃত্তি—শাস্ত্র-বিরুদ্ধানুষ্ঠানকারী (গঃ শাঃ); **whosoever is of a reverse character (SH)**; 'তৎ' বলিতে শাস্ত্রকেই বুঝাইতেছে। অবশ্যেন্দ্রিয় (মূল)—অবশ্য ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার এমন রাজা। চাতুরন্তঃ—চতুঃসমুদ্রা পৃথ্বীর অধীশ্বর রাজা—সার্ব্বভৌম সম্রাট্; **possessed of the whole earth bounded by four quarters (SH)**; **lord of the land bounded by the four oceans**—বলাই সঙ্গত। চতুরন্ত—চতুর্দিগন্ত—এরূপ অর্থ হয় না চতুঃসমুদ্রান্ত—এইরূপ অর্থই সঙ্গত ও সাধারণতঃ চতুঃসমুদ্রা ধরণীর অধীশ্বর—এইরূপ প্রয়োগই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

মূল :—যথা—দাণ্ডক্য-নামক ভোজবংশীয় রাজা ব্রাহ্মণ কন্যার উপর অভিমান করায় বন্ধু ও রাষ্ট্রসহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন—আর বিদেহাধিপতি করালও ঐ পে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সঙ্কেত :—ভোজবংশীয় রাজা দাণ্ডক্য কামবশতঃ ব্রাহ্মণ-কন্যা অপহরণ করায় তৎপিতৃ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার বন্ধু (অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ) বিনষ্ট ও রাজ্য মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়াছিল। আর বিদেহাধিপ করাল ব্রাহ্মণীর প্রতি লোলুপ হওয়ায় ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন (গঃ শাঃ) '**"No Purana mentions the particular historical incident in connection with some of the kings" (SH)**; **"The majority of the twelve legends…two for each of the six destructive passions of a king may be found with some variations no doubt, in the great epics. Several of them may be traced in Buddhist works. Thus Karala and Dandakya recur in the Buddhacharita XI. 31 as Maithila and Dandaka, and the former as Karalajanaka as well (IV. 80). As for Dandakya, see also Kamasutra, p. 24, l. 5"—Jolly.** রামায়ণে (উত্তরকাণ্ড ৭৯-৮১ অঃ) দৃষ্ট হয়—ইক্ষ্বাকুর কনিষ্ঠ তনয় দণ্ড ভার্গবের কন্যা অজার উপর অত্যাচারে বিনষ্ট হয়।

মূল :—কোপবশতঃ জনমেজয় ব্রাহ্মণগণের উপর বিক্রম

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তালজঙ্ঘ ভৃগুগণের উপর (অত্যাচার করিয়াছিলেন)।

সঙ্কেত :—জনমেজয়-নামক রাজা অশ্বমেধ-যাগকালে কোপবশতঃ ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহ করিয়া তাঁহাদিগের শাপে বিনষ্ট হন। আর তালজঙ্ঘ ভৃগুবংশীয়গণের প্রতি অত্যাচারে ফলে বিনষ্ট হইয়াছিলেন (গঃ শাঃ)। **"Janameja**y**a and Talaj**a**ngha are mentioned in another poem of As'vaghosha, the Saundarananda" (VII. 39. 44)—Jolly.**

মূল : লোভবশতঃ ঐল চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিকট অতিরিক্ত আহরণ করিয়া (বিনষ্ট হন), আর সৌবীর-(পতি) অজবিন্দু।

সঙ্কেত :—ঐল—ইলার পুত্র পুরূরবাঃ নামক চন্দ্রবংশীয় রাজা অত্যন্ত ধনাহরণ-দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের পীড়াদানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-কোপে বিনষ্ট হন। লোভবশতঃ ঐল নিমিশারণ্যে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞশালায় প্রবেশপূর্ব্বক অপরিমিত ধনহরণে উদ্যোগী হইলে ব্রাহ্মণ-শাপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন—এইরূপ ঐতিহ্যও কেহ কেহ বর্ণনা করেন (গঃ শাঃ)। অত্যাহারয়মাণঃ—অত্যন্ত আহরণ করিয়া ; **in his attempt to make exactions (SH) ; making extortions** from বলাই ভাল। চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ (মূল)—শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজি করিয়াছেন—**Brahmans**—ইহা অত্যন্ত শিশুসুলভ ভ্রম।

মূল :—মানবশতঃ রাবণ পরদার প্রদান না করিয়া ও দুর্য্যোধন রাজ্যের অংশ (প্রত্যর্পণ না করিয়া) (বিনষ্ট হইয়াছিলেন)।

সঙ্কেত :—পরদার—রামপত্নী সীতা। রাজ্যের অংশ—পাণ্ডবগণের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অংশ। **"These allusions sufficiently establish the historical nature of the Ramayana and of the Mahabharata" (SH)**।

মূল :—মদবশে ডম্ভোদ্ভব ও হৈহয় অর্জ্জুন ভূতগণের অবমানকারী (হওয়ায়) (বিনষ্ট হইয়াছিলেন)।

সঙ্কেত :—ডম্ভোদ্ভব—মদবশে সকল প্রজার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে নর-নারায়ণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন (গঃ শাঃ)। হৈহয়-বংশাধিপ কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন মদবশে পরশুরামের পিতা ঋষি জমদগ্নিকে অবমানিত করায় পরশুরাম-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। (গঃ শাঃ)। ভূতাবমানী—ভূত—প্রাণী ; প্রাণিগণের অবমানকারী। মদাদ্ ভূতাবমানী—**being so haughty as to despise all people (SH) ; slighter of people through pride (haughtiness)** বলা উচিত। মহাভারতে 'দম্ভোদ্ভব' নাম দৃষ্ট হয়—নরনারায়ণের সহিত যুদ্ধে তিনি বিগতদর্প হন,—নিহত হন নাই (উদ্যোগপর্ব্ব ৯৬ অধ্যায়)।

মূল :—হর্ষবশতঃ বাতাপি অগস্ত্যকে বঞ্চনা করিয়া ও বৃষ্ণিসঙ্ঘ দ্বৈপায়নকে (বঞ্চনা করিতে যাইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল)।

সঙ্কেত :—বাতাপি—ইল্বল ও বাতাপি দুই অসুরভ্রাতা। বাতাপি মেষরূপ ধারণ করিত ও ইল্বল সেই মেষ-মাংস পাক করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইত। ভোজনের পর ইল্বল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিলে বাতাপি ব্রাহ্মণের উদরভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিত ও ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইতেন। একবার মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত এইরূপ চালাকি খেলিতে যাইলে অগস্ত্য মেষরূপী বাতাপির মাংস ভোজন-পূর্ব্বক জীর্ণ করিয়া ফেলেন (বনপর্ব্ব, ৯৯ অধ্যায়)। অত্যাসাদয়ন্—বঞ্চনা করিয়া (গঃ শাঃ); **in his attempt to attack (SH)**। বৃষ্ণিসঙ্ঘ—বৃষ্ণিবংশীয় বালকগণ কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীরূপে সজ্জিত করিয়া পরিহাসচ্ছলে মুনিগণের নিকট প্রশ্ন করেন—'এই মেয়েটির কি সন্তান হইবে ?' তাহাতে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন—'এ কুলনাশন মুষল প্রসব করিবে'। দ্বৈপায়ন—ব্যাসকে প্রবঞ্চিত করার কথা অর্থশাস্ত্রেই নূতন বলা হইয়াছে। মহাভারতে (মৌষলপর্ব্বে) প্রবঞ্চিত মুনিগণের নাম—বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ। শ্রীমদ্ভাগবতে নাম—বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসাঃ, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বসিষ্ঠ, নারদ ইত্যাদি। ব্যাসদেবের নাম কোথাও নাই।

মূল :—ইহারা ও অন্য বহু অজিতেন্দ্রিয় রাজা—শত্রু-ষড়্‌বর্গাশ্রয়-পূর্ব্বক বন্ধু রাষ্ট্রসহ বিনষ্ট হইয়াছিল।

সঙ্কেত :—শত্রুষড়্‌বর্গমাশ্রিতাঃ (মূল)—**falling a prey to the aggregate of the six enemies (SH)**। অন্য—বেন প্রভৃতি।

মূল :—শত্রুষড়্‌বর্গ বিসর্জ্জন দিয়া জিতেন্দ্রিয় জামদগ্ন্য ও নাভাগ অম্বরীষ চিরকাল মহী ভোগ করিয়াছিলেন।

সঙ্কেত :—জামদগ্ন্য—জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যকৃত পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন। পরে একবিংশতিবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া নির্জ্জিতা মহী কশ্যপকে দান করেন (মঃ ভাঃ, বনপর্ব্ব, ১১৬-১১৭ অধ্যায়)। নাভাগ অম্বরীষ—নভাগের পুত্র অম্বরীষ নামক রাজা। ইনি অতি সাধুপ্রকৃতি, ভক্ত, প্রজারঞ্জক ছিলেন। ইঁহার উপাখ্যানের সংখ্যা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষতঃ মহাভারতে ইঁহার সম্বন্ধে একাধিক আখ্যান আছে। মহাভারতে প্রসিদ্ধ ষোড়শ-রাজকীয় মধ্যে নাভাগ অম্বরীষ অন্যতম (দ্রোণপর্ব্ব, ৬২ অধ্যায় ; শান্তিপর্ব্ব, ২৯ অধ্যায় ও ৯৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই শ্লোকে জামদগ্ন্যকে জিতেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আলোচনায় পাওয়া যায়—তিনি অত্যধিক ক্রোধী ছিলেন।

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে ইন্দ্রিয়জয়-নামক তৃতীয় প্রকরণে অরিষড়্‌বর্গত্যাগ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

হাই হিল্

শিশির সেন

তিন ইঞ্চি উঁচু হিলের জুতো পরতো অমলা।

ঠকাঠক ঠক্ আওয়াজ হতো মেজেতে, রাস্তায়, মাটীতে।

কলেজের ছেলেরা আদর করে কোড্ নাম দিয়েছিল 'হাই হিল্'।

কথাটা অমলা নিজে জানতো। জানতো আশেপাশের আরও মেয়েরা।

নোতুন নামকরণে অমলা নিজেকে অনেকটা গর্বিতই অনুভব করত। সমালোচনার পাত্রী হওয়া ত আর সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। সাধারণের থেকে একটু কিছু পার্থক্য না থাকলে আর কি করেই বা ঘটবে।

অমলা আধুনিকা। মন-মেজাজও সেই ধাচে গড়া। অনাগত যুগে কলেজী পাঠ সাঙ্গ হলে যে সংসার নীড় গড়ে উঠবে তার একটা মনগড়া ছবি সে যে না এঁকেছে, তা নয়। যেমন: তার স্বামীটি কি রকম হবে? রূপে রাজপুত্র, বিদ্যায় সরস্বতী, পদমর্যাদায় প্রবল প্রতাপান্বিত, গুণে যশস্বী ও কৃতী। কিন্তু কোন আধুনিকার স্বামী যদি সংস্কৃতসাহিত্যের আলংকারিক বিশেষণ নিয়ে ধরা দেন, তা হলে কি তাদের মন ওঠে! তারা চান দাম্ভবৃত্তিতে সিঁড়ির কে কত উঁচু ধাপে উঠতে পেরেছেন। কারণ মানদণ্ডের যন্ত্রত আজ দাম্ভবৃত্তিতে। সুতরাং বিজয়ের বরমাল্য যে তাদেরই একচেটে হবে, তা'তে আর আশ্চয কি আছে।

দেখতে দেখতে কলেজ জীবন একসময় পেরিয়ে গেল।

বাইরে থেকে দেখে ওর বুড়িয়ে যাওয়া যৌবনের প্রান্তসীমা যুবকের হৃদয়ে তুফান তুলতে পারে বলে আর মনেই হয় না। এতটা অধিক বয়স পর্যন্ত বিয়ে হলো না—কাজেই চারিত্রিক জনশ্রুতিও কিছু কিছু শোনা যায়। বিয়ের মন্ত্রে যা' হতে পারত মাধুর্যমণ্ডিত, আইবুড়ো হবার অভিশাপে ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের ছিটে ফোঁটায়—রসিক নাগর তাতেই দেয় অফুরন্ত রসের যোগান।

এই ত সংসার! কাকেই বা আর কি বলা যায়!

একবার নাকি এক মদ্রদেশীয় সিভিলিয়ান এস্-ডি-ও অমলার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন। এশিয়ার পোয়েট্ লরিয়েটের দেশের কালচার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষা-মিশ্রিত গর্বের বস্তু। বাঙালী মেয়ের কোমল হিয়া—চিত্ত শতদল দেয় ভরিয়া—

তবে এটা শোনা কথা—শোনা কথার ভিত্তিই বা কতটুকু!

অমলার বাপ-মা কোনদিন ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিনা, তা' আমাদের জানা নেই। যদি বলি কুমারী জীবনের জন্য অমলা পিতা-মাতাকে দায়ীকরে, তা' হলেও হয়ত ঠিক বলা হবে না—কারণ ইদানীং পাড়ার বিশ্ব বখাটে ছোকরা করালীকান্তের উপর অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব দেখাতে সুরু করেছে।

করালীকান্তের বিদ্যে হাই-স্কুলের ফোর্থ ক্লাশ পর্যন্ত। পিতৃমাতৃহীন করালী. মাতুল কর্তৃক বহুবার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আবার একদিন স্নেহ-প্রবণতার আতিশয্য হেতু নিজে নিজেই গৃহে ফিরেও এসেছে।

করালীর বয়সমাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর। পুরুষ মানুষের তুলনায় কিছুই নয়।

বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। অকেজো করালী হলো কাজের মানুষ। মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। আমেরিকান লেপ্টেনাণ্ট সাহেব ডভিন্ জিপস্-এ করে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায় দূরের উড়ো জাহাজ ঘাঁটী থেকে।

এত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পাড়ার বর্ষীয়ান পুরুষরা এ ধরণের অকস্মাৎ ভাগ্যবিবর্তনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখে। সান্ধ্য আলোচনায় মন্তব্য পাশ করে: করালী সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা চালায় কি করে?

তারপর বিস্ময় চরমে এসে পৌঁছাল, যখন করালী বিরাট ঝক্‌ঝকে প্লি-মাউথ্ গাড়ী ড্রাইভ করে বাড়ী ফিরলে একদিন।

মিলিটারী কনট্রাক্টার। হবেই ত হবেই। ভূতে দেয় ওদের টাকা জোগান। আমরা শালারা না খেয়ে মরলুম। কবে যে পোড়ার যুদ্ধ থামবে, কে জানে!

যুদ্ধ আমাদের গুণের বৈষম্য দূর করে দিলে। মুড়ি মিছরীর সমান দর। যুদ্ধ না থামলে করালীর মার্কেট ভ্যালু জিরো মাইনাস্ সাম্থিং।

করালীর ভক্তসংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়। ভক্তের দলই প্রধানতঃ তার কম সহচর। ফেউয়ের মত সর্বদা তারা তাঁর পিছনে লেগেই আছে।

সন্ধ্যে ছ'টার পর করালীকে আর সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। এ সময়টা আমরা তাঁকে দেখতে পাই অমলার দপ্তরখানায়, নতুবা ড্রাইভিং-এ উঁচু নীচু পিচ্ বাঁধানো ধূ ধূ করা গ্রাণ্ডট্রাংক রোডের সীমাহীন থমথমে নির্জনতায়।

গাড়ীতে বসে অমলা গলাটা একটু কেসে করালীকান্তের সান্নিধ্যে নিবিড় হয়ে বললে: য়ুনিভার্সিটি ছাড়বার পর পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেছে। দিনগুলি কেটেছে আমার রিক্ততার হাহাকারে। ভবিষ্যতের যে ঔজ্জ্বল্য আমার দাম্ভিকতার মূলধন ছিল, তাই যেন কলেজ ছাড়বার পর নামপরিচয়হীন, অখ্যাত জনসমাজে তলিয়ে গেল। কোথায় আমি? কে আমি? কলেজে যোগাতুম চকমকানি বিদ্যুৎবহ্নি। হারিয়ে গেল আমার সে-শক্তি, সে-রূপশিখা, আঘাত হানবার সেই উন্মত্ত উল্লাস।

করালী সরল রেখার মত একটি নিরলম্ব জবাব দিল: তুমিই ত আমায় মানুষ করলে···

অমলা ওই ছোট্ট কথাটাকে ফেনিয়ে গুণ-গুণিয়ে এমনি একটি রূপ

দিলে : আমার সোনার কাঠির পরশ তোমায় সোনা করলে…বল, বল আরও একটু কবিত্ব করে বল—আমার শুনতে বেশ ভাল লাগবে—

করালী বললে : জান ত আমার ভাষা নেই…

অমলা হঠাৎ দীপ্ত কণ্ঠে বললে : একটু উচ্ছৃঙ্খল হতে পার করালী—একটু উচ্ছৃঙ্খল…

করালী বিস্ময়ের একটা আলগা গাম্ভীর্য চোখেমুখে টেনে বললে : নৈতিক স্খলনকে আমি বড্ড ভয় পাই, মালা।—সেখানে আমি ভীরু, কাপুরুষ…

অমলা বললে : এ-ধারে যে নানান্ লোকে নানান্ কথা বলছে, তুমি তাদের মুখ চাপা দেবে কি করে ?

ভয় আমি কাকেও করি না। বাংলা দেশে ভয় ত শুধু রজনীদাকে…তা' টাকা আছে আমার…টাকা যেমন নিতে জানি, দিতেও জানি…সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভয় পেয়ো না তুমি…

তোমার ওই এক গোঁ—টাকা দিয়ে কি সব পাওয়া যায় ?

সব পাওয়া যায়…

না, না—ঠিক হলো না—বিদ্যে, কালচার এগুলো ত পাওয়া যায় না।—তুমি কিন্তু একটু ভুল করলে…

ভুল আমি করিনি…টাকা না হলে তোমার বিদ্যে আর কালচার কিনবার কথা কি স্বপ্নেও কখন ভাবতে পারতুম…

এভাবে attack করলে আমাকে শেষকালে…

বিশ্বাস করো তোমাকে আঘাত দেবার জন্য করিনি…

তবে কিসের জন্য করলে ?

শুধু সত্যটুকু বললুম। টাকা হবার আগে পেটে বোমা মারলেও আমার মুখ থেকে 'ক' অক্ষর গো-মাংস বেরুত না…আর আমার কথা কে-ই বা শুনতে চাইতো…এখন যা' বলি তাই হয় বাণী…আমার কথা শুনবার জন্য কত লোকের কত আকুল আগ্রহ, ব্যাকুল প্রতীক্ষা…অবশ্য কথা বলবার শিক্ষা তুমিই আমাকে দিয়েছ…

তা'হলে একথাটা স্বীকার করো…

করি বলেই ত বললুম। সবই ত হলো, কিন্তু বড্ড একা একা লাগে। আমার যেন কেউ নেই। আমি বড় একা…আপনার জন বলতে কেউ নেই…

পুরুষ মানুষ বড় হলে বৌ ছাড়া আর কে-ই বা আপনার জন থাকে…

সত্যি সত্যি প্রাণের কথাটাই বলেছ বটে…কিন্তু সেখানেও আছে বোধহয় স্বার্থসম্বন্ধ…

রূপসীতে তৈরী হবে নোতুন বিমানঘাঁটী।

টেণ্ডারের সাড়া পাওয়া গেল দূরের দেশ-দেশান্তর থেকে। বহুলোকের ভিড়। সি-পি-ডাবলিউ-ডি'র হেড্‌ক্লার্ক মাণিকবাবুর স্ত্রীর অঙ্গে উঠলো নোতুন জড়োয়া গহনা। একটা হৈ হৈ ব্যাপার। শাড়ীর দোকানগুলো লজ্জায় শহর ছেড়ে পালিয়ে এসে স্থান করে নিলে মাণিকবাবুর অন্দর মহলে…

কাজ হবে আনুমাণিক পাঁচ কোটি টাকার।

পিচ্ বাঁধানো রাস্তা, রাণ-ওয়ে, ছোট বড় মাঝারি বাড়ী ঘর, মাটি কাটা, লোডিং আনলোডিং—কত রকমারি কাজ তার কি কিছু ঠিক আছে। সাবসিস্‌টেন্‌স্ অফিস, রেড্‌ক্রস্, এম্প্লয়মেণ্ট ব্যুরো, সার্ভিস্ ক্লাব, ম্যালেরিয়া-কণ্ট্রোল, ক্যানটিন্, বেকারি—পাশাপাশি তৈরী হবে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংস্কৃতির এক ভারতীয় নব সংস্করণ।

করালীকান্তের দক্ষিণহস্ত ত্রিপুরাশংকর এসে খবর জানালো : উপঢৌকন পর্ব শেষ হয়েছে। রেসে জিত হয়ত আমাদেরই। তবে হেড্ ক্লার্ক মাণিকবাবু টেণ্ডারের নিম্নতম হারটি কাকেও ফাঁস করেন নি এখন পর্যন্ত। সুতরাং মনিবের নিজে একবার গেলে কাজটা সম্ভবত সহজ হয়ে যাবে।

করালীকান্ত তোড় জোড় করে রওনা দিল। গায়ে একটি খদ্দরের পাঞ্জাবী——গলায় একটি চাদর—নগ্ন পদদ্বয় ও একটি লাঠি সম্বল করে।

রূপসীতে পৌঁছে করালীকান্ত কঠোর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়মকানুনগুলোর একটা জোরালো বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্রতী হলেন। কিন্তু কাজ আর অগ্রসর হয় না। মাণিকবাবুর কঠিন বিজাতীয় ক্রোধ করালীকান্তের উপর। কারণটা ঠিক বোঝা যায় না।

করালীকান্তও ঝানু ছেলে। গোয়েন্দা লাগিয়ে আসল খবরটি জেনে নিলে। ব্যাপারটা ছিল এইরূপ : কলেজী আমলে হাইহিল অর্থাৎ অমলা ছিল মাণিকবাবুর সহাধ্যায়িনী। একদিন কি একটা অযথা ভাবাবেগের জন্য অমলা অপমান করেছিল মাণিকবাবুকে। বর্তমানে সংসারধর্ম পালন করলেও মাণিকবাবু অমলার জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন নয়। সব খবরই তার নখদর্পণে।

করালী অমলাকে আনবার ব্যবস্থা করে লোক পাঠালে। কিন্তু অমলার মা বেঁকে বসলেন। আইবুড়ো মেয়েকে আমি শহরে বেড়াতে দেই বলে করালীর সঙ্গে বন বাদাড়েও পাঠাব ? ওকথা চলতে পারে সিঁথেয় সিঁদুর পরলে পরে—তার আগে নয়।

এবারে করালী নিজে এলো।

অমলার মা বললেন : না বাবা, বিয়ের জল গায়ে না পড়লে মেয়েকে আমি কোথাও যেতে দেবো না…

বিয়ে আমি করব না বলে ত অস্বীকার করিনি, তবে দুদিন সময় সাপেক্ষ—কণ্ট্রাক্ট বিজনেস্ বড় ন্যাস্টি বিজনেস্—বিশেষ করে মিলিটারী কনট্রাক্ট্—অন্য জিনিষে তর সয়, কিন্তু এসব জিনিষে তর সয় না—

তা' ত বুঝলুম, বিয়েটা করতে আর কতই বা সময় লাগবে, সেটা শেষ করে তুমি দিল্লী দিল্লী মক্কা যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও আমার কোন আপত্তি নেই…

আপনি বুঝতে পারছেন না—কনট্রাক্টটা ফসকে গেলে আমার কত বড় ক্ষতি হবে জানেন ! শুধু অমলার একটা মুখের কথা বইত নয়…সে কথাটি বলেই সে চলে আসবে রূপসী থেকে…

সে হয় না বাবা, তুমি যদি মেয়ের মা হতে তবে বুঝতে পারতে আমার কথা…

আপনাদের বোধকরি আমার চাইতে নোতুন কোন ভালপাত্র হাতে আছে, সুতরাং···

এ—কি কথা বলছ তুমি···

তা' নইলে আপনারা ত সামান্য কথা নিয়ে পূর্বে আমার সঙ্গে এরকম করতেন না···

রকম আর কি করেছি বাছা, তুমি ঘরে এসে বসো করালী···

থাক্—বসবার আমার সময় নেই—তবে এটুকু শুনে রাখুন, ভারতবর্ষে আজ যত বড় উঁচু চাকুরেই থাক না কেন, তাঁদের চাইতে আমার আয় বেশি···

তুমি রাগ করলে করালী···

রাগ না করলেও খুসী যে হইনি সেকথা বলাই বাহুল্য—কথা কয়টি বলে জবাবের প্রতীক্ষা না করে করালী ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়ে উঠে বসে তার গাড়ীতে—

মুহূর্ত পরেই অমলা দোতলা থেকে নীচে নেমে মা'র সঙ্গে মুখোমুখি বচসা সুরু করে দেয়। নির্লজ্জতার সম্মার্জনী তুলে।

তারপর মনে মনে নিজেই একটা ব্যবস্থা ঠিক করে অনেকটা প্রকৃতস্থ হলো।

এদিকে করালীকান্ত মনের খেদে উত্তর দক্ষিণ কোলকাতা চষে ফেলে দিলে পরাজয়ের আবহাওয়া বুকে নিয়ে।

দিনের শেষে গোধূলির ঠিক পরে। অমলা করিডোরের রেলিং-এ তির্যক ভঙ্গীতে দুই কনুতে ভর করে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে। এলোমেলো চিন্তার স্রোত ওকে বিপর্যস্ত করে তোলে। করালীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। এই রাস্তা দিয়েই সে সন্ধ্যাবেলা যায় আসে।

মাণিক—কত বড় স্কাউণ্ড্রেল মাণিক···আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য করালীর উপর এই অবিচার···ক্ষমতা হাতে পেলে চুনোপুঁটিরই তেজ হয় সবচাইতে বেশি। কা'র সঙ্গে লড়াই করতে চলেছে, সে কি তা' জানে? কতবার কিনে কতবার বেচতে পারে তোকে আর তোর মনিবকে একসঙ্গে! "চাঁদনীর জুতো' সইতে পারবি তুই—তোর মত থার্ডক্লাশ এম-এ কত ঘোরে পথেঘাটে ফ্যা ফ্যা করে···

এই যে করালী—করালী। প্রাণের রসসুধা উপচে ঢেলে দিয়ে হাক দিলে অমলা।

করালী নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো অমলার কাছে।

বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমরা পুরুষমানুষ হীরের আংটি—রাগটা তোমাদেরই শোভা পায়—

কি রকম?

সকালে এতবড় একটা কেলেকাংরি করে, বুকে দুঃখ নিয়ে সারাটা দিন ঘুরে বেড়ালে, আমাকে একটুও ভাগ দিলে না—

সব জিনিষের ভাগ কি সবাইকে সব সময় দেওয়া যায়—

বুঝেছি, অভিমান—ইংরেজীতে যার প্রতিশব্দ নেই। আমি যাব, যাব, যাব। আজ রাত বারোটার গাড়ীতেই তোমার সঙ্গে রূপসী যাব।

তবে তৈরী হয়ে নাও। ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি যেন করালী কোন এক বিলেতী একজিবিশনের শো-রূমে তুলে ধরলে।

চা খাবে করালী, চা—বললে অমলা।

চা খাব, যা' দেবে তাই খাব। খুসীতে ফেনিয়ে-পড়া মন নিয়ে করালী অমলার ডান হাতটি তুলে নিয়ে হঠাৎ একটা চুমো খেলো।

হাসিতে গলে পড়ে অমলা বললে; চরিত্র নষ্ট করো না করালী···

ডিগ্রীওয়ালাদের চরিত্রের মাপকাঠি বড় উঁচু সুরে বাঁধা—বুঝলে হাইহিল। পদে পদে তারা হারিয়ে বসে, আমাদের সে বালাই নেই।

খুব হয়েছে আর দুষ্টুমিতে কাজ নেই—অমলা বললে চোখেমুখে একটা ক্ষিপ্রতা এনে।—ইলেট্রিক্ হিটার থেকে চায়ের জলটা নামিয়ে নিয়ে ঢাললে টি-পটে।

নাম-না-জানা এঁদো পাড়াগাঁ রূপসী ভাগ্যান্বেষীর ভিড়ে গেছে ভরে। রূপসীর বনে আর পাপিয়া গাইবে না গান, দোয়েল দেবে না শীষ, মন মাতাবে না বুনোফুলের বসন্ত ঋতু উৎসব। নদীর ধারে বনের ছায়ায় কৃষকপ্রিয়ার অশ্রুচোখ দেখবে না আর কেউ। বনের অবান্তর ঘেঁটিয়ে দিয়ে নিঃশব্দতার বুকে সদর্প সৈন্যদলের কোলাহল উঠেছে মেতে।

সবই হলো। কনট্রাক্ট-ও মিলল। কিন্তু অনেক কান্না জমলো অমলার মনে।

সান্ত্বনা দিলে করালীকান্ত। যুক্তি দিয়ে দ্বন্দ্ব থামতে চায় না।

অমলা জিদ্ ধরলে সাইনাড্ খাবে। টাকা দিয়ে এ-ক্ষতিপূরণ হয় না। স্তিমিত দেহ আর অবসন্ন মন ধিক্কারের স্তূপে ডুবে গেল।

করালী সালংকারে দেশের কাগজগুলোতে প্রচার করলে ওদের বিয়ের সংবাদ খুবই জাঁকের সঙ্গে।

খবর শুনে পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা কার্টুন পিকচার এঁকে ছাপালে। বখাটে ছোকরারা হাইহিল সম্বন্ধে কবিতা লিখে প্রীতি-উপহার তৈরী করলে। প্রাজ্ঞরা বললেন: ম্যাচটা একেবারেই ঠিক হলো না। শুধু মালা পরাচ্ছে এক কাঁড়ি টাকার গলায়। মাতব্বরেরা বললেন: ছেলে বটে করালীকান্ত—মাতুলের প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা—ঠিক যেন সেকেলে ছেলের মত—বিয়ে-ও করতে চলেছে একটা ড্যাব ডেবে জ্যান্ত সরস্বতীকে।

জনমত আর জনস্রোত দেখেশুনে অমলার দেহ ক্লান্তিতে হিম হয়ে আসে। চোখে ওর ঘুম নেই। শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের একফালি ওর বিছানায় এসে লুটোচ্ছে। তারায় ভরা আকাশ। একটা পৈশাচিক নিঃশব্দতা প্রেতরাজ্যের বাণী সদম্ভে ঘোষণা করে।

মাণিকের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা মনে পড়ে: বুঝলে হাইহিল, আমার কলেজ জীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাকে গুড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে তুমি···শুধু শিখলে ব্যথা দিতে···তোমার রূপের শিখায় দগ্ধ হলো কত বিরহীচিত্ত···তাদের অভিশাপেই আজ তুমিও জীবনে সুখ পেলে না···

অমলা জবাব দিয়েছিল: নতি স্বীকার করে আবার এলুম ত তোমার দুয়ারে···

মাণিক এবারে তার শেষ বান নিক্ষেপ করলে: তুমি যে একদিন আমার কাছে আসবেই—সেকথা আমি জানতুম। মানি-ইনফ্লেশনে

রূপোর চাকতির মোহ আমার গেছে—রূপোতে আর এবার ভুলোবে না হাই-হিল—রূপ চাই…

আর ভাবতে পারে না অমলা। শেষটা কি রকম গুলিয়ে যায়। একটা মোহাচ্ছন্ন আবেশ মুহূর্তে প্রেতায়িত হয়ে অতীতের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিলে অমলার। তার দম্ভ করবার আর রইল না কিছু। উঁচু হিলের আভিজাত্য পণ্যস্ত্রীর দুয়োরে হোচোট্ খেলো। তার সঙ্গে আর সাধারণের তফাৎটা কোথায়?

শ্যেনপাখীর দৃষ্টি দিয়ে অমলা পৃথিবীর প্রভাতিক মাধুর্য একবার নিরীক্ষণ করলে। মুহূর্ত পরেই এ-পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গেই আর ওর যোগাযোগ থাকবে না। প্রেম, ভালবাসা, পীরিতি—কত কি তৈরী করলো মানুষ—অচিরেই সব ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে—ভালবাসে সে, কিন্তু দেহ দিয়ে অর্থ-গৃধ্নুতার স্বর্গারোহণ! ধিক্—মৃত্যু দিয়ে করবে সে শুচিতার বহিঃপ্রকাশ…মাণিকের লোলুপতার ক্ষমা চললেও করালীর ক্ষমা নেই—যে নিজের ভাবী স্ত্রীকে অর্থের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে পারে।—যুদ্ধের ডাকে এমনি নীচু মনোবৃত্তি ঘর বেঁধেছে আমাদের অন্তরে। আমরা সব পারি, অর্থের বিনিময়ে আমরা সব পারি…

চিত্রধর্মের গোড়ার কথা

শ্রীইন্দু রক্ষিত

আদিম মানব যেদিন প্রাকৃতিক গুহা পরিত্যাগ করিয়া নিজেই গুহাগেহ নির্মাণ করিতে শিখিল, শিকার সংগ্রহ বা আত্মরক্ষার জন্য পাথর ঠুকিয়া আয়ুধও প্রস্তুত করিয়া লইল, সেদিন সে তার শিল্পীজীবনের প্রথম পর্যায়ে পদার্পণ করিল। কিন্তু তখনই সে তার রসজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিল না। মানবমনের অন্তঃপুরে, ক্ষুৎপিপাসাদি প্রয়োজনবোধের অন্তরালে আরও যে একটি অনুভূতির অবকাশ আছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল আরও পরে, পুরা-প্রস্তরযুগ কাটাইয়া হিমালযুগে। এই অনুভূতির উন্মেষের ফলে সে শুধু আর হাতিয়ার বানাইয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাহার



কগুল গুহাচিত্র—নবপ্রস্তর যুগ

হাতলটাকেও সুশ্রী করিতে চেষ্টিত হইল; শীতাতপ বা বহিরাক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আস্তানা গাড়িয়াই নিশ্চিন্ত বা তৃপ্ত রহিতে পারিল না, চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত সেই গুহাগেহ চিত্রিতও করিল। কিন্তু হঠাৎ এই রসচেতনা প্রকাশ হইয়া পড়িল কি করিয়া? মনের নিভৃতে নিহিত ছিল যে তরল রস তাহা এমন দানা বাঁধিতে সুরু করিল কি প্রকারে? বাহির হইতে কোনও অনুপ্রেরণার স্নিগ্ধ সংস্পর্শ লাভেই অবশ্য এমন ঘটিতে পারিয়াছিল; নতুবা আপনাআপনিই তাহা কিছু সম্ভব হইত না। প্রভাতের অরুণ তাহার সাতরঙা আলোর পরশ বুলাইয়া দেয় বলিয়াই পাতায় পাতায় তারুণ্যের আমেজ সবুজ হইয়া উঠে, ফুল্লকুসুম রঙীণ হইয়া হাসিতে থাকে। তবে আদিম মানব এই অনুপ্রেরণা লাভ করিল কোথা হইতে? যে সুর তরঙ্গ ধ্বনিত হইয়া তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানিল, তাহাতে ঝনন রণন ঝঙ্কার তুলিয়া দিল তাহার উৎস কোথায়? উত্তরে বলিতে হয় প্রকৃতি। কোনও



প্রাচীন মিশরের—থিবীয় যুগ

অজানিত অদৃশ্যলোক হইতে অনুপ্রেরণা আসিয়া পৌঁছে নাই, জীবনের জাগতিক পরিবেশ বা প্রকৃতি, অথবা বাস্তবই এই রসচেতনার জাগৃতি আনিয়া দিয়াছে এবং বাস্তব বা স্বভাব হইতে উদ্বুদ্ধ যে রসচেতনা শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রথম রূপায়িত হইয়াছিল তাহা মূলতঃ স্বভাবানুকৃতিই, নিছক খেয়ালপ্রসূত কল্পনাবিলাস নহে। চিত্রকলার এইখানেই সূত্রপাত এবং চিত্রধর্মের ইহাই গোড়ার কথা।

কিন্তু চিত্রধর্ম মূলতঃ অনুপ্রেরণালব্ধ স্বভাবেরই অনুকৃতিপ্রকাশ—এই সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাতে আর একটি সন্দেহ ছায়ারূপ পরিগ্রহ করিয়া উঁকি মারিতে থাকে। প্রশ্ন জাগে, মনোরাজ্যের সহিত স্বভাবের যোগসূত্রস্থাপনে যে রসের বিকাশ তাহার প্রকাশে মনন প্রতিভার কি কোনও সহযোগিতা নাই! স্বভাব বা প্রকৃতি দেবী তাহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রস পরিবেশন করিল, সেই রসাস্বাদনে রসিক মানব প্রকৃতিকে ভালবাসিয়া ফেলিল, মজিল এবং অনুরাগভরে তাহারই আলেখ্য রচনায় মন ঢালিয়া দিল। তবে মানব কি তাহার প্রিয়জনের প্রতিকৃতি রচনায় কেবল সাদা চোখের দৃষ্টির উপরই নির্ভর করিয়া রহিতে পারিল? তাহার মনশ্চক্ষু কি সেই বাস্তবরূপকে আরও একটু রঙীণ করিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল না? অবশ্যই চাহিল, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল স্বাভাবিক মনে হইলেই এই বিশ্বাসটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়তো যাইবে না। তাহার জন্য আরও বিচারের প্রয়োজন হইবে। বাস্তবিক এই প্রশ্নের আজও মীমাংসা হইয়া উঠিল না যে—চিত্রকলা, যাহার সূত্রপাত মূলতঃ দৃশ্যমান বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতি



আমেনোফিস্‌এর শিলাফলক—থিরীয় যুগ

রচনায়, তাহা কি কেবলমাত্র সেই অনুকারিতাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া চিত্রধর্মকে বাঁচাইয়া চলিতে সম্ভব হইবে? অথবা এই অনুকৃতির উপরও কল্পনার কারুকৃতির প্রয়োজন হইবে তাহার পূর্ণতা সম্পাদনে?

যে কোনও কারণেই হউক প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকলা বাস্তবের যথার্থ প্রতিচ্ছবিরূপে প্রকাশিত নহে। হালে দেখা যায় পাশ্চাত্যশিল্পকলাও (এদেশে সৃষ্টও) বাস্তবানুকৃতির প্রতি তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা পরিহার করিয়া বাস্তবাতিরিক্ত কিছুর সন্ধানে বাহির হইয়াছে। ইহার ফলে দেশকালনির্বিশেষে যে চিত্ররসসৃষ্টির এক সার্বজনীন ধর্ম স্থির হইয়া গিয়াছে এতটা মনে করিবার মত অবস্থায় এখনো না পৌঁছাইলেও, স্বভাবের যথার্থ অনুকৃতি রচনার আদর্শ ইহাতে কোথাও আর প্রধান হইয়া থাকিতে পায় না। কিন্তু এখনও এই বাস্তবিকতাবর্জননীতি সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এখনও নূতন করিয়া অনুকৃতির আদর্শই আদর্শ বলিয়া প্রচারিত হইতে দেখা যাইতেছে। বিশেষজ্ঞ মহল হইতে উচ্চারিত এমন কথা শোনা যাইতেছে—যাহা বলিতে চাহে যেন স্বভাবানুকৃতিই চিত্রধর্মের চরম লক্ষ্য এবং একমাত্র তাহাই চিত্ররসসৃষ্টির শাশ্বত ও সনাতনরীতি। তবে এই নূতনতর ঘোষণাও বক্তব্য বিষয়ে সুস্পষ্ট নহে। এই অবলোকনের ক্ষেত্রে এমন কোনও সত্যের সন্ধান মিলে না যাহা প্রকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে। কারণ একদিকে 'ভাবপ্রবণ চিত্র' বলিয়া যাহা বাস্তবের হুবহু প্রতিকৃতি নহে এমন এক শ্রেণীকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং "চিত্রকলা বাস্তবানুকৃতিতেই পর্যবসিত নয়" তাহা "বাস্তবাতিরিক্ত কিছু ও বাস্তবের রূপান্তর" কথিত হইয়াছে, অপরদিকে "পটের উপর বাস্তব বস্তুর দৃষ্টিবিভ্রমকারী অনুকৃতিরচনা না করিয়াও চিত্রকলা সম্ভব" এই অভিমতটুকুও অগ্রাহ্য হইয়াছে। যুগপৎ এই পরস্পর-বিরোধী উক্তি কিঞ্চিৎ গোলযোগ সৃষ্টির সহায়ক। কারণ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেও ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারা কঠিন হইবে যে, যে চিত্রকলা বাস্তবাতিরিক্ত কিছু বা বাস্তবের রূপান্তর তাহা পটের উপর বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার গুণসম্পন্ন কি করিয়া হইতে পারে? যাহা হউক, চিত্রধর্মের এই নূতনতর



পদ্মাসন লিপিকার—প্রাচীন মিশর, প্রথম যুগ

বিচারপ্রচেষ্টা তথ্যবহুল এবং পাণ্ডিত্যের সুনিপুণ প্রকাশ সন্দেহ নাই। বহু উক্তির উল্লেখে ও যুক্তির অবতারণায় যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বাস্তববাদেরই সমর্থক হিসাবে বিচার দাবী করিবে। (কারণ "বাস্তবাতি-রিক্ত বা বাস্তবের রূপান্তর" বিষয়ে কোনও উল্লেখ আলোচনা প্রকাশ পায় নাই)

এই নূতনতর অভিমতের প্রাথমিক এবং প্রধানতম যুক্তি এই যে বাস্তবানুকৃতির রীতিকে ঠেলিয়া কল্পনা বা ভাবাবেগকে আশ্রয় করিতে চাহিলে আরও দুইটি প্রস্তাব নাকি নির্বিচারে মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন। প্রথমতঃ অলঙ্কারশিল্পই চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং দ্বিতীয়তঃ, আদিমকাল হইতে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত সৃষ্ট যাহা চিত্রকলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহা মোটেই চিত্রকলা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব অপর সূক্ষ্ম তর্কালোচনায় নিয়োজিত না হইয়াও এই

দুইটি প্রস্তাবকে অবলম্বন করিয়া বিচারে অগ্রসর হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

'ফটোগ্রাফি যেমন আর্ট নয়' এবং সে প্রশ্ন অবান্তর, তেমনি অলঙ্কার শিল্পও চিত্রকলা নয়। কিন্তু কেবল ওইটুকু বলিয়াই উল্লিখিত প্রথম প্রস্তাবটিকে ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না, আরও কিছু বলিবার প্রয়োজন হইবে। সেখানে বলিতে হইবে চিত্রকে চিত্ররূপে পরিগণিত হইবার জন্য কয়েকটি বিশেষ গুণ বা লক্ষণ সম্পন্ন হইতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে এই-রূপ আটটি বা ছয়টি গুণ বা অঙ্গের নির্দেশ আছে অন্য দেশের শাস্ত্রেও আছে।১ অলঙ্কারশিল্পে এই "ষড়ঙ্গের" ভাব ও সাদৃশ্য লক্ষণের বিশেষ অভাব ঘটে এবং লাবণ্যসংযোগকল্পে যদি বাস্তবের রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন হয় তবে তাহার মাত্রা অত্যধিক হইয়া পড়ে। যদি সব কয়টি লক্ষণই উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তবে সেই নক্সা বা অলঙ্কারশিল্পও যে চিত্রকলা হইয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই কয়টি কথার



সেতু ও কুঞ্জি পাহাড়—হকুসাই—অষ্টাদশ শতাব্দী

ভিতরই প্রথম প্রস্তাবটির সবটুকু উত্তর পাওয়া যাইতে পারিবে। অতঃপর অপ্রাসঙ্গিক হইবে কি না বলিতে পারি না, তবু এই সূত্রে আরও কয়েকটি প্রশ্ন পাল্টাইয়া করিবার বাসনা করি। অলঙ্কার শিল্পের একটি প্রয়োগ মনে করা যাউক। অভিনন্দন লিপি বা সেইরূপ কিছু—যাহার খানিকটা আয়তনকে বেষ্টন করিয়া লতাপাতার নক্সা আঁকা হইয়াছে। বলিতে হইবে ইহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্যবর্ধন। লতাপাতা বাস্তবেরই বস্তুবিশেষ। আমরা বলিয়া থাকি সমগ্র বাস্তবজগৎ, বিশ্বচরাচর সৌন্দর্য-সুষমায় ভরপুর। অতএব প্রশ্ন আসিতে পারে স্বভাবের অবিকৃত অনুকরণই যদি সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় তবে আসল লতাপাতা ছাড়িয়া এস্থলে লতাপাতার ঢং (motif) সৃষ্টি করিতে হইল কেন? ইহা কি মধ্যযুগীয় অপরিণত রসবোধের রীতি এবং বর্তমানে পরিত্যাজ্য? অধুনা যে শাড়ীর Scenery পাড় দেখা দিয়াছে সোনার চাঁদমালা পদ্মের ঢং ছাড়িয়া পাপড়ি তুলিয়া realistic হইতে চাহিতেছে, পূজার প্রতিমার পরিকল্পনায় থিয়েটারের ষ্টেজ নির্মিত হইয়া বাস্তবিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছাড়িতেছে, তাহা কি তবে ওই অপরিণত (?) রসবোধের যথার্থ পরিণতি? প্রশ্ন আসিয়াছে "মোগল ছবির ছবিটুকু বাদ দিয়া হাঁসিয়াটুকু লইয়া মাতামাতি করিবার বিপক্ষেই বা কি যুক্তি আছে?" পাল্টা প্রশ্ন করিতে হয়—মোগল বা পারসিক চিত্রাভ্যন্তরের লতাগুচ্ছ ও হাঁসিয়ার নক্সার মধ্যে প্রভেদ কতটুকু? যাহা হউক এ সকল হয়তো অবান্তর হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ইহাই বলা চলে আদিমযুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকলা, যাহা বাস্তবের অনুকরণ মাত্র বলিয়া প্রস্তাবিত তাহা কেবল অনুকরণমাত্রই নহে; সুতরাং চিত্রকলা বিবেচিত হইবার বাধা নাই। তবে ইহার জন্যও একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

আদিম যুগের চিত্রকলার সুরু যে বাস্তবানুকৃতি এবং বাস্তবই যে রস-চেতনার জীয়নকাঠি একথা আগেই দেখা গিয়াছে। এমন কি আদিম মানব রেখার আঁচড়ে যে জ্যামিতিক ঢং (design) রচিয়াছে, পণ্ডিতেরা অনুমান করেন জলের ঢেউ, স্রোতের গতি প্রভৃতি বাস্তব জগতেরই অংশ হইতে তাহার প্রেরণা আহরিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা হয়তো সঙ্গত হইবে না যে চিত্ররসের অনুকরণগত সৃষ্টির মধ্যে কল্পনার স্থান ছিল না বা নাই, অথবা তাহা অপ্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ চিত্রকাব্য রচনায় ভাবের যথার্থ অভিব্যঞ্জনাকল্পে চিত্র-ভাষায় একটি আবেগ—লক্ষণের (emphasis) আবশ্যকতাবোধ আদিম অবস্থা হইতেই হইয়াছিল। অবশ্য আদিম মানবের অপটু হস্ত ও অপরিণত বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণসাদৃশ্য রচনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না বলিয়াও, সেই অপূর্ণতার কতক পূরণের জন্যও কল্পনার সাহায্য দরকার হইয়াছিল। কিন্তু কল্পনা যে ভাবলাবণ্যের খাতিরেও আদিম শিল্পীকে স্বাভাবিকতা ডিঙ্গাইয়া যাইতে প্ররোচিত করিয়াছে তাহারও নিদর্শন অপ্রচুর নহে। উদাহরণ পরে আসিতেছে। আরও এক কথা। দৃষ্টির গোচরীভূত বস্তু বা ঘটনামাত্রই নহে, তাহার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি মাত্র আদিম মানবের মন-দুয়ারে রূপায়িত হইবার আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যে বন্য হরিণকে জীবন পথের সাথী করিয়া সে সংসার পাতিয়াছিল, বা যে মৃগ শিশুর চকিত আবির্ভাব অন্তর্ধানের তড়িৎচঞ্চলগতি তাহার নিবাদ নয়নেও পুলক জাগাইয়াছিল তাহারই ছবি দিয়া সে বাসগৃহ চিত্রিত করিয়াছে। যে বন্য মহিষের অতর্কিত উপস্থিতি তাহার জীবন সংশয় ঘটাইয়াছিল এবং যাহার নিধন সাধিয়া সে শুধু আত্মরক্ষাই করে নাই অন্তরে অনন্ত তৃপ্তির স্বাদ পাইয়াছিল অথবা দুর্ধর্ষ শত্রুদলের সহিত যে সংগ্রাম হইতে সে বিজয়ীর গর্ব লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিল সেই গৌরবদীপ্ত ঘটনাস্মৃতিই সে সঞ্জীবিত করিতে চাহিয়াছে রেখার আঁচড়ে। ঋতুতে ঋতুতে নব নব রূপে প্রকাশ পাইয়া তাহার কৌতূহলের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল যে লতাপাতা ফুলফল, তাহাকেই তাহার দরদী চিত্ত চিত্রাকারে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে অর্থাৎ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত ও অনুভূত যে সকল বস্তু বা ঘটনার স্মৃতি তাহার চিত্তপটে বার বার

১ রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

ফুটিয়া উঠিয়াছিল, রসাবেশে মাত্র তাহাই সে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এই সকল সে লক্ষ্য মাত্রই আঁকিয়া ফেলে নাই। অতীব অনুভূতির তিমিরাচ্ছন্ন বিস্মৃতিরাশির মধ্যে দ্যুতিমান এই কয়টি স্মৃতিখণ্ডকে সে পরে কল্পনার সহযোগিতায়ই রূপদান করিয়াছে। বলা বাহুল্য আদিম অবস্থার অনুকৃতির অপ্রকৃতার মত এই ভাব লক্ষণের প্রকাশও ছিল স্থুল প্রকৃতির। যথা—নব প্রস্তর যুগের (Neolithic) সূচনা কালে চিত্রিত কগুল (cogul), আল্পেরা (Alpera-Almeria) প্রাচীর চিত্রে অথবা বুশম্যানদের (Bushmen) চিত্রের যুদ্ধ দৃশ্যে দেখা যায় স্বপক্ষীয় বা প্রধানদের প্রাধান্য সূচিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাদের দেহাবয়ব অনৈসর্গিক কল্পনাবশে বৃহদাকার করিয়া আঁকিয়া। (১) এরূপভাবের স্থুল প্রয়োগ পরিকল্পনার উদাহরণ আরও পাওয়া যাইতে পারে। কালক্রমে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হস্তনৈপুণ্যের উন্নতির মত এই ভাবাবেগ লক্ষণের প্রয়োগ পরিকল্পনা উৎকর্ষতায় বিকশিত হইতে থাকে।



চৈনিক নিসর্গচিত্র—মিঙ্‌ যুগ

আদিম যুগের পর শিল্পের মিশর, ব্যবিলন বা আসিরীয় সভ্যতালব্ধ যে পরিণতি তাহাকেও নিছক বাস্তবধর্মী মনে করিবার কারণ নাই। পরিণত থীবিয় যুগোৎকীর্ণ প্রস্তর ফলকের ভাস্কর্য, পুঁথির পট বা ভিত্তি চিত্রকে উদাহরণ ধরিয়া বলা যাইবে যে সে যুগের শিল্প দৃষ্টি-বিভ্রমকারী বাস্তবের অনুকৃতি ত নহেই, এমন কি অক্ষমতাজনিত অপূর্ণতা মাত্রও নয়। এই অবাস্তবিকতার অনেকটাই স্বেচ্ছাকৃত। থিবীয় যুগের আমেনোফিস্ তৃতীয়ের উৎকীর্ণ ফলক এবং তাহারও পরের যুগের তুতেন্‌খামেনের কবরে প্রাপ্ত "রথবাহিত যুদ্ধ বন্দী"র খোদিত ফলক একদিকে এবং থিবীয় যুগের ফেরোদের (Pharaoh) প্রতিমূর্তি, এমন কি তাহারও আগের যুগের "পদ্মাসন লিপিকার" (seated scribe) মূর্তি অপরদিকে রাখিয়া যথাক্রমে অবাস্তবিকতা এবং বাস্তবিকতা লক্ষ্য করিতে পারিলেই ইহা পরিষ্কার হইবে। মিশর শিল্প যেখানে টেঁকে না, সেখানে আসিরীয় বা বাবিলনীয় শিল্প যে নিছক বাস্তবের অনুকারী ছিল তাহা বলাই চলে না। ভারতের কথা এখন না হয় বাদই রহিল। চতুর্থ শতাব্দীতে ফেইদিআস্ প্রমুখ শিল্পীদের ভাস্কর্যও সেই ধারায় পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর অনুবর্ত্তন; বিশেষ করিয়া গ্রীক ও রোমক, এবং "Renaissance" (রেনেসাঁস্) এর পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিত্রকলাকে মাত্র যথার্থ স্বভাবানুকৃতির নিদর্শন বলা চলে। শিল্পেতিহাসের হিসাবে এই কয়টি বছর খুব দীর্ঘকাল বলা চলে না। যথার্থ সাদৃশ্য সংঘটিত হইলেই শিল্পের পর্য্যায় হইতে বাদ পড়িয়া যাইবে এমন যুক্তি "বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়াও চিত্রকলা সম্ভব" এই উক্তির মধ্যে খুঁজিয়া পাইবার কথা নয়। ইহাই বা বুঝিতে হইবে কি যে তৎকালীন বিশ্বসভ্যতা তথা শিল্পের পরিচিতি লইয়া ধরা পৃষ্ঠে একমাত্র য়ুরোপখণ্ডই বিরাজ করিতেছিল? নতুবা সমসাময়িক চৈনিক, ভারতীয়, কাম্বোডীয়, জাপ প্রভৃতি যে সকল শিল্পকে জগৎ সশ্রদ্ধ নতি জানাইতে দ্বিধা করে নাই তাহার কোনটি নিছক বাস্তবিকতার আদর্শে সৃষ্ট অথবা বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার গুণসম্পন্ন? বলা চলিবে কি যে এই সকল শিল্প বাস্তবিকতার আদর্শই মানিতে চাহিয়াছে—তবে সাফল্যলাভ করে নাই? এই মত গ্রাহ্য হইলে ইহাও মানিতে হয় ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় শিল্প যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বা আজও, অনেক মাজাঘসাতেও চৈনিক বা জাপানী চিত্রকলা তাহার ধারপাশেও পৌছে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর ওস্তাদ মনসুর ও সপ্তদশ শতাব্দীর পল পটার (paul pottar) যদি একধর্মী হন তবে কাহাকে কোন স্তরে রাখা যৌক্তিক? আরও গোলের কথা যে—যে যুগে ইংলণ্ডে লর্ড লেটনের (Leighton) মত রক্তমাংসের উপাসক ও বাস্তব সৃষ্টির অন্যান্য ওস্তাদ শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, প্রায় সেই যুগেই তথায় হকুসাইএর কাঠ খোদাইএর ছাপ (—যাহাকে অনৈসর্গিক নিসর্গ চিত্র বলিলে অদ্ভুত শোনাইলেও ভুল হইবে না—) তথাকার শিল্পী বা রসিক সমাজে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব নিছক বাস্তবের দৃষ্টি-বিভ্রমকারী অনুকৃতির আদর্শকেই সার বুঝিয়া তৎকালীন য়ুরোপও যে বসিয়াছিল তাহাও নহে। (আগামী বারে সমাপ্য)

---

(১) স্পেনিশ শিল্পব্যাপক জোসেফ পিজোআন (Josup Pijoan) বুশমেন চিত্রপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"It is curious to note that the victorious Bushman are of exaggerated size, just as all primitive people represent persons as larger or smaller according to their relation, rank and importance"—History of Art, Vol 1.—Pijoan



বিজয়লক্ষ্মী

নরেন্দ্র দেব

নির্ভীক সতেজ কণ্ঠে সত্য আজ কে তোলে ধ্বনিয়া
স্বার্থান্ধ সিন্ধুর দূর পারে ?
নির্দ্দয় শোষণে মত্ত সাম্রাজ্য-সম্পদ-লুব্ধ হিয়া
লজ্জানত অপরাধ ভারে।
অহল্যা পাষাণ-শিলা অকস্মাৎ লভিয়া কি প্রাণ
কহে নিজ ইতিবৃত্ত কথা ?
লজ্জিত কি শুনি আজ দৃষ্টিহীন কৌরব প্রধান
গান্ধারীর মর্ম্মের বারতা ?
বিস্মিত জগৎ শুনি কুরুক্ষেত্র চলেছে ভারতে,
ভীষ্ম শুয়ে শরশয্যা'পরে।
নির্ব্বাসিতা সীতা সেথা মিথ্যা অপবাদ মুক্ত হ'তে
অভিযুক্ত করে লঙ্কেশ্বরে !
বৃত্রাসুর অত্যাচারে স্বর্গহারা দেবেন্দ্রাণী শচী
রুদ্রের শরণ যেন যাচে !
শম্ভু নিশম্ভুর দ্বন্দ্ব ঘটায়ে যে মরীচিকা রচি
গৃহযুদ্ধ অন্তরালে বাঁচে,
সুরাসুরে বাধে রণ মোহিনী মায়ায় যার ভুলি,
পরাস্ত করে যে বীরে ছলে,
অমৃত হরিয়া তারা বিষভাণ্ড দেয় করে তুলি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যায় রসাতলে !
পৌর সভা মাঝে যেন অসহায়া লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী
দুঃশাসনে হানে অভিশাপ !
কৌটিল্য কৌশলে যারা অবজ্ঞাত ছিল নিরবধি
সহিয়া সত্যের অপলাপ--
আত্মপ্রকাশের লাগি ব্যাকুলতা তাহাদের চিতে,
যাজ্ঞসেনী ব্যগ্র তাই আজ।
জানি, তুমি মহাবীর্য্য সঞ্চারিয়া বীরের শোণিতে
যুগে যুগে এনেছো স্বরাজ,
স্বাধীনতা সাধকের মুক্তি-যজ্ঞে উত্তর-সাধিকা
ঈপ্সিতা বিজয়লক্ষ্মী তুমি !
ভাগবতী তেজে তব দীপ্ত হবে নির্ব্বাপিত শিখা
নব জন্ম পাবে জন্মভূমি।
প্রণমি ধরণী-ধন্যা আর্য্যকন্যা প্রয়াগ-নন্দিনী,
বন্দি তব অনন্য প্রতিভা,
শোনো ওই আশীর্ব্বাণী উচ্চারিছে জননী বন্দিনী
ম্লানমুখে মা'র দিব্য বিভা।



"পঞ্চাশের মন্বন্তরে"র কারণ নির্ণয়

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

গত ১৩৫০ অগ্রহায়ণের "ভারতবর্ষে" বাঙ্গালার ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষ আলোচনা প্রসঙ্গে "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর'-এর সহিত তুলনায় লেখক বলেন—

"আবার যদি কমিশন বসে, আবার যদি হাণ্টারের মত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক "পঞ্চাশের মন্বন্তরের" ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, দেখা যাইবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষা বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষ গুরুত্ব হিসাবে মোটেই কম নয়; বরং প্রায় দুই শত বৎসরের সভ্যতার ধারা, লোক সেবার মান, যানবাহনের সুবিধা সবই উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আজ যে ভাবে লোক মরিতেছে, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষ মহামারী, পৌনে দুই শত বৎসরের আগের ঘটনা অপেক্ষা তুলনায় ভীষণতর।"

এ কথা আজ ১৯৪৪ সালে নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির সদ্যপ্রকাশিত বিবরণী হইতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে আরও বহু অদ্ভুত তথ্যের সন্ধান মিলিয়াছে। মানুষের অবিবেচনা, অদূরদর্শিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অতি লোভ, স্বজাতিপোষণপ্রবৃত্তি প্রভৃতি দোষ, অন্নের অভাবকে দারুণ দুর্ভিক্ষে পরিণত করিয়াছে। ভারতের দুর্ভাগ্য অব্যবস্থিতচিত্ত কতগুলি কর্ম্মচারীর উপর এতগুলি লোকের মঙ্গলামঙ্গলের ভার নির্ভর করিতেছে। যে দেশের শাসিত ও শাসকের যোগাযোগ কেবলমাত্র একজন খরচ দিয়া অপরকে পুষ্ট রাখে, একজন মুখের অন্ন বিক্রয় করিয়া অপরের সফর, সদর, চাপরাশীর খরচ যোগায়, সেখানে বারে বারে দুর্ভিক্ষ মহামারী আবির্ভূত হওয়াই ত স্বাভাবিক।

দুর্ভিক্ষ তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ, এই অদ্ভুত দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের মত দুর্ভিক্ষবহুল স্থানেও পূর্ব্বে হয় নাই। যেখানে দুর্ভিক্ষ ছিল না, দুর্ভিক্ষ ঘটিবার কারণও ছিল না, সেখানে অনাহার-মহামারীতে দশ হইতে বিশ লক্ষ লোকের প্রাণান্ত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের অজন্মা হইতে ১৯৪২ সালের মোট ভাণ্ডার কম হইয়া যায়; তাহার উপর আংশিক অজন্মা—১৯৪৩ সালে পূর্ব্ব বৎসর হইতে জমা চাউল প্রয়োজন মত পাওয়া গেল না; সুতরাং দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু রিপোর্ট অতি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছে যে এই সামান্য পরিমাণ চাউলের ঘাটতি দুর্ভিক্ষকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে নাই। সময়মত চেষ্টা করিলে ইহা স্বচ্ছন্দে দূর করা যাইত। ইহা কম ক্ষোভের কথা নয় কিন্তু এই ক্ষোভ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও গতি নাই।

চাউলের ঘাটতি ছাড়া ইহার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অপর কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দরিদ্র বাঙ্গালা; ক্রয়শক্তির অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় যত লোক অন্নাভাবে মরিয়াছে, শক্তির অভাবে ক্রয় করিতে না পারায় হয়ত তত লোকই মরিয়াছে। ধনীতে মরে নাই; সরকার যাহাদের চাউল সরবরাহের ভার লইয়াছিল—অর্থাৎ যুদ্ধসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মিবৃন্দ—তাহারা কেহ মরে নাই, শ্বেতাঙ্গ এমন কি ফিরিঙ্গি কেহ মরে নাই, মরে নাই বাঙ্গালার বক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অবাঙ্গালী যাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে তাহাদের একজনও।

এই মূল্যবৃদ্ধির কারণও রাজশক্তি—রাজকর্ম্মচারী। যখন বাহিরের আমদানী পড়িয়া গেল, তখনও রপ্তানী চলিয়াছে। ভারতের বাহিরে এবং বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে যাহারা ব্রহ্মের চাউলের উপর নির্ভর করিত তাহারা বাঙ্গালার চাউল টানিয়াছে। যাহাদের এই সময় সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল, তাহারা বেতন পাইয়াছে, সেলুন পাইয়াছে ও দিনের শেষে কর্ম্মহীন অবসাদগ্রস্ত দেহখানি এলাইয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অভাব পূরণের চেষ্টা হয় নাই। উপরন্তু সরকারী স্নেহপুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি বাজার হইতে চাউল টানিয়া লইয়াছে। বিবরণীতে প্রকাশ যদি সময়মত গম আমদানী করা যাইত, এদিক-ওদিক ছাড়িয়া পঞ্চনদ সরকারকে অনুরোধ করা যাইত, তাহা হইলে এই দুর্দ্দশা ঘটিত না। চাউলের দর বৃদ্ধি না পাইলে এ অবস্থা দাঁড়াইত না। তদন্ত কমিটীর সভ্যগণ অতি জোরের সহিত বলিয়াছেন যে সময়মত উপায় অবলম্বন করা এবং রপ্তানী বন্ধ করিয়া লোকের মনে ভরসা দেওয়া সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

শত্রু কবে আসিবে সেই আশঙ্কায় চাউল অপসারণ এবং নৌকা ও সাইকেল নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার "সভ্যগণ" (তদন্ত কমিটীর সভ্যগণ বুঝিতে হইবে) বেশ সুনজরে দেখেন নাই। চাউল অপসারণ যে কেবল মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা নহে; শত্রুর আগমন আসন্ন বুঝিয়া লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে; যাহার যে চাউল ছিল শক্তিতে কুলাইলে এবং সরকারী কর্ম্মচারীর শ্যেনদৃষ্টি ও বিরাট কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ছাড়ে নাই।

নৌকা নিয়ন্ত্রণ আরও অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কমবেশ ৬৬ হাজার নৌকার মধ্যে মাত্র ২০ হাজার (তাহাও রেজিষ্ট্রেশনের মধ্যে) লোকের হাতে ছিল। বাকী ৪৬ হাজার সরকারী আওতায় পড়িয়াছে; তাহার মধ্যে কতগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সরকারী আস্তানায় ("reception stations") ছিল, তাহারা বে-মেরামতে থাকায় যখন মাল চলাচলের জন্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন ব্যবহার করা যায় নাই। বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছিলেন যে ঐ সকল নৌকা মেরামতে রাখা অসম্ভব ছিল। "সভ্যগণ" বলিয়াছেন, তাঁহারা ওকথা বিশ্বাস করেন না।

ছাউনী, বিমানপোত অবতরণক্ষেত্র প্রভৃতি কাজে বহু লোককে (সরকারী বিবরণীর মতে ৩০,০০০ পরিবার) ভিটাচ্যুত হইতে হয়। তাহাদের অনেককে খেসারত দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সরকার মনকে

প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের অনেকেই যে অনাহারে মরিয়াছে, তাহা "সভ্যগণ" মনে করেন।

চাউল, নৌকা, লোক অপসারণ করিয়া দারুণ দুর্বিপাক যাহারা ঘটাইল, তাহাদের কি ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন? পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া যাহারা হুকুম চালাইয়া মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ অপরের মৃত্যুর কারণ হয়, তাহারা কি কেবল পদের বেতন ও মর্য্যাদাভোগ করিবে? না, তাহাদের কাজের ত্রুটী ঘটিলে তাহার জন্যও দায়ী হইবে?

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও অবাধ ক্রয় বিক্রয় বা গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে যে প্রহসনের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা একটী শিশু কিশোরের পক্ষেও লজ্জার বিষয়। আজ যে হুকুমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, কাল সে হুকুম রদ করা হইয়াছে। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাপারী চাউল সংগ্রহ করিয়াছে; পরদিন একবার বন্ধ করা হইয়াছে, সরকারী সরাইয়া বেসরকারী ব্যাপারীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; বাঙ্গালার বাহির হইতে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। বেসরকারী ব্যাপারীর হাতে ভার ছাড়িয়া দেওয়ায় সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। প্রকাশ্য ভাবে লোকে বলিয়াছে, সরকারী ছাড় লইয়া ইহারা যে পরিমাণ চাউল ভিন্ন প্রদেশে ক্রয় করিয়াছে, বাঙ্গালা সরকারকে তাহা দেয় নেই এবং যে দরে কিনিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী দাম আদায় করিয়াছে। "সভ্যগণ" এ সন্দেহ পোষণ করেন বলিয়া ভারত সরকারের সাহায্যে একটী কোম্পানীর খাতাপত্র পরীক্ষা করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এ কার্য্যে বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। যখন এই সন্দেহ প্রকাশ্যে আলোচিত হইত, তখনই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ ছিল।

যে দিকেই আলোচনা করা যায়, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা সরকারের অযোগ্যতা এবং অপরিণামদর্শিতার কথা মনে পড়ে। যখন লোকে অনাহারে পথে পড়িয়া মরিতেছে, তখন তাহারা দেশের মধ্যে অভাব নাই বলিয়া প্রচার করিয়াছে। "সভ্যগণ" ইহাকে ভুল, অন্যায় এবং অযৌক্তিক কাজ বলিয়া রিপোর্টের তিন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে কটূক্তি করিয়াছেন। তখন যাহারা লজ্জাহীন ভাবে লোকের জীবন সংশয় ঘটাইয়াছে, তাহাদের আজ এ কথায় কোনও লজ্জা, কোনও অনুশোচনা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

যথাকালে খাদ্য বণ্টনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে। বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তিত করার মত পরিমিত পরিমাণ মজুত ছিল না এবং তাঁহাদের তাঁবে লোক শক্তি কম ছিল। সকল ব্যাপারেই "সভ্যগণ" বাঙ্গালা সরকারের কাজের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। যে পরিমাণ চাউল ছিল তাহাতে রেশনিং করা চলিত, পুরাতন দোকানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে চেষ্টা করা এবং রেশনিং কাজে নিয়োগের জন্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক হার বজায় রাখিবার চেষ্টা যে ঘৃণ্য ব্যাপার তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিলে বিপন্ন লোকে আরও সত্বর সাহায্য পাইত, দুর্ভিক্ষ কমিশনার নিযুক্ত হইলে প্রাদেশিক সরকারের খামখেয়ালীর হাত হইতে লোক বাঁচিয়া যাইত এবং বাহিরের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণে সহায়তা করিত। ইহার কিছুই হয় নাই; যে যুক্তিতে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নাই, তাহা মোটেই বিচারসহ নহে।

ভারত সরকার বসিয়া "মজা" দেখিয়াছে। যানবাহনের অসুবিধা দূর করা, বাহির হইতে মাল আমদানী করা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্য লইয়া তর্কের ব্যাপারে নিজ মতামত জোরপূর্ব্বক চালু করা প্রভৃতি কাজে ইহাদের শিথিলতার অন্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের "খাদ্য-বিভাগ" বলিয়া কার্য্যের ভার লইতে লোকের অভাব ঘটিয়াছিল। লাট বাহাদুর সফর করিতে ব্যস্ত, অথচ তিনি কয়েক মাস এই দপ্তর হাতে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। যুদ্ধের চাপে কলিকাতা, তথা বাঙ্গালা দেশে অজস্র লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের খাদ্য সরবরাহের ভার লইলেন না; উপরন্তু রেল, বন্দর, বড় বড় কারখানা, চা বাগান, কর্পোরেশন, এ-আর-পি, সিভিক গার্ড ইত্যাদি, ইত্যাদি সকল কারবারকে বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিবার সুযোগ করিয়া দিতে, হয় নির্দ্দেশ আর না হয় প্রকারান্তরে উৎসাহ দিয়াছেন। বৃহত্তর কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহের ভার বহু পূর্ব্ব হইতে ইহাদের লওয়া উচিৎ ছিল বলিয়া "সভ্যগণ" মত দিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকের সাহায্য করিতে উপযুক্ত সময় অন্তর্হিত হইতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দুঃখ হয়; তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয়, আর্থিক অপ্রতুলতার অজুহাতে যাহা করা সমীচীন ছিল তাহা হয় নাই; আর পরে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মূর্ত্তিমান হৃদয়হীনতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া "রিপোর্টে" বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে; ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহার আলোচনা সম্ভব নয়। ফলে ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক মরিয়াছে (বে-সরকারী মতে অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণ); অন্ততঃ এক কোটী লোকের স্বাস্থ্য, বিত্ত, ভবিষ্যতের আশা গিয়াছে; দেহ জীর্ণ হইয়া, অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়াছে, উত্তমর্ণের তাগিদে জর্জ্জরিত হইতেছে, চারিদিকে ঘনায়মান অন্ধকার দেখিয়া মৃত্যুর দিন গণিতেছে।



দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের দাবী

জার্ম্মানীর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং জাপানের যুদ্ধও শেষ হইতে চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্ম্মানীর যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এখন ইয়োরোপে ব্রিটিশ জাতি নিশ্চিন্ত অবকাশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং জাপানী যুদ্ধের সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে যত উদ্বেগই দেখা যাক, তাহা মূলতঃ ব্রিটেনের প্রাত্যহিক জীবনকে বিশেষ ব্যাহত করিতেছে না। ব্রিটেনের দিক হইতে যখন এইরূপ শান্তির সুযোগ আসিয়াছে ও ভারতের সীমান্ত হইতে যুদ্ধের ঢেউ যখন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, তখন এই দুই দেশের পুনর্গঠন কার্য্য একই সঙ্গে আরম্ভ হওয়া উচিত এবং সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে দেনাপাওনার বোঝাপড়ায় আর অনর্থক বিলম্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বলা বাহুল্য, যুদ্ধজয়ী ব্রিটেন তাহার মানসিক উদ্বেগহীন ও উৎফুল্ল জনসাধারণের স্বাভাবিক সহযোগিতা, পরাজিত শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ তহবিল মূলধন করিয়া পুনর্গঠনের যেরূপ সুযোগ পাইবে, ভারতের পক্ষে সেরূপ সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটেনে অবিরাম যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অনাহারে একজন ব্রিটিশ প্রজাকে মরিতে হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। নানাভাবে মাথা খেলাইয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে পণ্যাদির জোগান ও মুদ্রানীতির ভারসাম্য এমন চমৎকারভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই এবং ইহার কুফলসমূহের কোন আঘাত ব্রিটিশ জাতির দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহ-রীতিকে সমস্যাপূর্ণ করিয়া তুলে নাই। ভারতবর্ষের উপর কিন্তু এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ আঘাত না হইলেও যুদ্ধের পরোক্ষ চাপে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবতঃ পরনির্ভরশীল এই দেশ যুদ্ধের আমলে মোটামুটি বাঁচিবার মত পণ্যাদির অভাবেও মারাত্মক দুঃখস্বীকার করিয়াছে এবং সরকারী দায়িত্বহীনতার অভিশাপে রাশি রাশি ফাঁপাই টাকা শ্রেণীবিশেষের হাতে যাইয়া পড়ায় বাজারের স্বল্প পরিমাণ পণ্যাদি এত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে জনসাধারণ বাধ্য হইয়া এই সকল পণ্য ছাড়াই বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে অন্য কোন উপায় স্থির করিতে পারে নাই, সে ক্ষেত্রে বরণ করিয়াছে অপমৃত্যু। এইভাবে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ও নানাপ্রকার ব্যাধিতে কালগ্রাসে পতিত হইয়া সারা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে করিয়াছে চরম বিপন্ন। এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সরকার উৎসাহ করিয়া যদি অগ্রসর হন এবং নিজদায়িত্বে যদি ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, তবেই এখনও যাহারা এদেশে মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া বাঁচিবার স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহারা হয় ত আবার জীবন ফিরিয়া পাইতে পারে।

কিন্তু ভারতসরকার এদেশবাসীর বাঁচামরার সমস্যায় কতটা মাথা ঘামান, তাহা প্রকৃতই একটা জটিল প্রশ্ন। যে ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সহিত ভারতের ভালমন্দের সমস্যা একই সঙ্গে জড়ানো থাকে, সে সময় নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে স্বভাবতঃ ভারতসরকারের দৃষ্টি চলিয়া যায় সাত হাজার মাইল দূরে এবং ভারতবর্ষের শাসন করিবার মালিককে পালন করিবার সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া অসহায় এদেশের সামান্য দুর্দশা সময়োচিত প্রতিকারের অভাবে মারাত্মক হইয়া উঠে। ভারতের যুদ্ধকালীন এই যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, ভারতসরকার উপযুক্ত সহানুভূতি ও দূরদর্শিতা দেখাইলে এদেশের অবস্থা এতটা শোচনীয় অবশ্যই হইতে পারিত না। ভারতের সামান্য পণ্য হইতে ব্রিটেনের সুখসুবিধার জন্য একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, ভারত-সরকার আমেরিকাকে পণ্য জোগাইয়া আমেরিকার ডলার পাওনা এম্পায়ার-ডলার-পুলের মারফৎ ব্রিটিশ ষ্টার্লিংয়ে রূপান্তরিত হইতে দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতের হিসাবের সেই ডলার দ্বারা আমেরিকা হইতে পণ্যাদি লইয়া গিয়া স্বদেশে রক্ষা করিয়াছেন পণ্যাদির চাহিদা ও জোগানে ভারসাম্য। ভারতসরকার ব্রিটেনকে এই যুদ্ধের সময় বহু কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করিয়াছে এবং স্বাভাবিক মূল্য হিসাবে একটুকরো স্বর্ণ না পাইয়া—পাইয়াছেন ষ্টার্লিং সিকিউরিটি অথচ ভারতে সেই পণ্যের জোগানদারদের পাওনা স্বর্ণের জামিনবিহীন নোট ছাপাইয়া ভারতসরকার করিয়াছেন পরিশোধ। প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লগ্নী করিয়া ভারতসরকার উর্দ্ধপক্ষে পাইতেছেন বার্ষিক শতকরা ১ টাকা হারে সুদ, অথচ যুদ্ধের খরচ মিটাইবার জন্য ভারতের সরকারী ঋণপত্রের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে এখন প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার পৌঁছাইয়াছে এবং তজ্জন্য ভারতসরকারকে দিতে হইয়াছে গড়ে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি। এই যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার বহু সুবিধা ছিল, অভাবের দিনে দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিতে করিতে আমরা কতকটা অভ্যস্ত হইয়া যাইতাম, কিন্তু ভারতসরকার নানারূপ বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদের শিল্পপ্রসারের ইচ্ছা অনেকাংশে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক কথায় যুদ্ধের সময় সহানুভূতির অভাব দেখাইয়া ভারতবর্ষকে ভারতসরকার শুধু যে নিঃস্ব ও রিক্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাদের শুভেচ্ছার অভাবে দেশবাসীর মন বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের সম্বন্ধে একান্তভাবে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

সাম্প্রতিক আশানুযায়ী ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে ভারতসরকারকে সর্ব্বপ্রথম এদেশের আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠনের দিকে নজর দিতে হইবে। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং ঋণ যে ব্রিটেন স্বেচ্ছায় অবিলম্বে শোধ করিবে, এখনও ব্রিটিশ সরকার বা ব্রিটিশ জনসাধারণের দিক হইতে সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। গত ব্রেটন উডস্ কনফারেন্সে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি লর্ড কেনেস যথাসম্ভব ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরেই বৃটেনের পক্ষে দেনা শোধের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কারণ আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রথম বহির্বাণিজ্য পুনর্গঠনে মনোযোগ দিতে হইবে। তারপর বিগত প্যাসিফিক রিলেসনস্ কনফারেন্সেও জনৈক পদস্থ ব্রিটিশ সরকারী কর্ম্মচারী পরিষ্কারভাবে বলেন যে, ভারতবাসী যদি বর্ত্তমানে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার আশায় শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনাসমূহ রচনা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে হতাশ হইতে হইবে। এই সকল বিবৃতি হইতে অন্ততঃ এটুকু বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ব্রিটেন নিতান্ত নিরুপায় না হইলে ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে মোটেই আগ্রহশীল হইবে না। শুধু ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইতে বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনাই আমাদের একান্ত দুর্ভাবনার কারণ নয়; সম্প্রতি ব্রিটেনের দিক হইতে এই ঋণের পরিমাণ কমাইবার জন্য অপচেষ্টাও দেখা যাইতেছে। কতকগুলি ব্রিটিশ সংবাদপত্র অভিযোগ করিয়াছে যে, ব্রিটেনকে পণ্যাদি জোগাইতে ভারতবর্ষ সেই পণ্যসমূহের জন্য যে মূল্য ধরিয়াছে তাহা ন্যায্য মূল্য নয় এবং এই বাড়তি দাম বাদ দিলে প্রকৃত পাওনার পরিমাণ অনেক কম হইবে। অবশ্য ভারতের সৌভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটি সংবাদপত্রের উপরিউক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতসরকার ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ক্রয়মূল্যের চেয়ে কমদামেই ব্রিটিশ সরকারকে পণ্য সরবরাহ করিয়াছে। ভারতে কাপড়ের মূল্য যখন শতকরা ৪ শত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তখনও ব্রিটিশ-সরকারের নিকট হইতে শতকরা ১শত ভাগের বেশী মূল্যবৃদ্ধি দাবী করা হয় নাই এবং ভারতে লৌহ ও ইস্পাত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইলেও ব্রিটিশ সরকার শতকরা মাত্র ২৭ ভাগ বাড়তি মূল্যে ভারত হইতে ইস্পাতাদি কিনিতে পারিয়াছেন। অবশ্য এইভাবে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও ঋণের পরিমাণ কমাইবার অপচেষ্টা যখন একবার দেখা দিয়াছে তখন ভবিষ্যতে যে এই চেষ্টা পুনরায় নূতন কোনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে না এমন কথাও বলা চলে না। গত যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ তহবিলে সাহায্যের নামে ভারতসরকার দরিদ্র ভারতের ১৯০ কোটি দান করিয়াছিলেন, এবারও যে অনুরূপ কোন সদ্বুদ্ধি ভারতসরকারের দেখা দিবে না, এখন হইতে সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের মুদ্রামান ব্রিটিশ মুদ্রামানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহে টাকা ও ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় হারে যদি কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা হইলেও ভারতের পাওনার পরিমাণ এক কলমের খোঁচায় অনেকখানি কমিয়া যাইতে পারে।

এই সকল কারণে ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য টাকাগুলি (যাহা সঞ্চিত হইবার জন্য ভারতের আর্থিক বিশৃঙ্খলা চরমে উঠিয়াছে) যাহাতে যথাসম্ভব ফিরিয়া পাওয়া যায় তজ্জন্য এ দেশের সরকারী অর্থবিভাগের অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা উচিত। ভারতবর্ষ যে অতি দরিদ্র দেশ এবং অকেজোভাবে আটকাইয়া রাখিবার মত যথেষ্ট অর্থ তাহার নাই ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশ, যাহারা পৃথিবীর মোট স্বর্ণের শতকরা ৭৫ ভাগের মালিক, তাহারা পর্য্যন্ত ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশকে যে টাকা ধার দিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আর্থিক উন্নয়ন কমিশনের মুখপাত্র মিঃ বেয়াউলে রুমল মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের যে যুদ্ধ সংক্রান্ত পাওনা জমিয়াছে তাহা অবিলম্বে পরিশোধিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা সংক্রান্ত পাওনার মীমাংসাও শীঘ্র করিয়া ফেলিতে হইবে কারণ এই সকল ঋণ অনিশ্চয়তার উৎস এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সুপরিচালনার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমেরিকার মত সম্ভ্রান্ত এবং ধনী দেশও যখন পাওনা টাকা যুদ্ধ শেষ হইবার আগেই ফিরিয়া পাইবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছে, সেক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার একমাত্র অছিস্বরূপ লণ্ডনে সঞ্চিত ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের দাবী এখনই ভারতসরকারের করা উচিত এবং ঔদাসীন্যবশতঃ তাঁহারা যদি এই দাবী না জানান তাহা হইলে তাঁহারা যে এই অসহায় দেশের দুর্ভাগ্য আরও বাড়াইয়া দিবেন তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ সমস্যা

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে ঠিকাদারীর কাজ করিয়া ভারতবর্ষ কিছু টাকা করিয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্পাদি প্রসারের সুযোগ সুবিধা হয় নাই বলিয়া সেই টাকা মুষ্টিমেয় জনকয়েকের হাতে আটক পড়িয়া দেশে সুতীব্র মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিয়াছে। তবে যুদ্ধকালীন বাড়তি টাকায় ভারতে যে শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই তাহার জন্য অবশ্য ভারতবাসী ততটা দায়ী নয় যতটা দায়ী ভারতসরকারের অদূরদৃষ্টি আর ঔদাসীন্য। বরং বলিতে গেলে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় এখন প্রায় ৯ শত কোটি বাড়তি টাকা হাতে আসায় ভারতের অর্থশালী সমাজ সেই টাকা কাজ কারবারে খাটাইতে চান এবং প্রকৃতপক্ষে নানারূপ সরকারী বিধিনিষেধের চাপে শিল্পাদিতে যথেচ্ছ টাকা খাটাইবার সুবিধা পান না বলিয়াই তাহারা টাকাগুলি ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হন। এখনও ভারতে শিল্পোৎসাহ এত অধিক মাত্রায় বজায় আছে যে, সুবিধা পাইলেই ভারতবাসী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া শিল্পাদিতে লগ্নী করিতে দ্বিধা করিবে না এবং যুদ্ধের কাঁপা টাকার দৌলতে এ দেশের সমৃদ্ধ ব্যাঙ্কগুলিও এই শিল্পপ্রগতিতে লক্ষণীয় সাহায্য করিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে বড়লাট ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্ত যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার জন্ত এতকাল ভারতসরকার যে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, অতঃপর তাঁহাদের সেই চেষ্টা কতকটা প্রতিরুদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য, এই আশা সত্য হইলে যুদ্ধোত্তরকালে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী অসুবিধার মধ্যেও ভারতে উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রসার হইবে।

ভারতসরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তনের লক্ষণ যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা বা ডলার পাওনার সাহায্যেও এই শিল্পপ্রসারের পথ অনেকটা বাধাহীন করিয়া তোলা যাইতে পারে। যুদ্ধের পরে ভারতে শিল্পাদি প্রসারিত হইলে ভারতীয় পণ্যাদি রপ্তানী করিতে ও ভারতে পণ্যাদি আমদানী করিতে ভারতের একটী নিজস্ব জাহাজ শিল্প গড়িয়া উঠার প্রয়োজন, না হইলে পণ্যাদি বহনের ভাড়া বাবদ বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর লাভের কড়ি যোগাইতে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পাদির পক্ষে পৃথিবীর খোলা বাজারে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের সহিত প্রতিযোগিতা চালানো সম্ভব হইবে না। এই জাহাজ শিল্পের সংগঠন এত গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতে শিল্পপ্রসারের যে কোন পরিকল্পনার অঙ্গাঙ্গীভাবে ভারতের নিজস্ব জাহাজ-শিল্প সংগঠনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা উচিত।

অবশ্য ভোগ্য পণ্য নির্ম্মাণের শিল্পসমূহ যত সহজে এবং শীঘ্র গড়িয়া উঠিবে, জাহাজী শিল্প হয়ত তত সহজে গড়িয়া তোলা চলিবে না। তবে দেরীতে হইলেও এই প্রয়োজনীয় শিল্পটির গঠনে অবহেলা দেখানো ভারতের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইবে। যতদিন নিজস্ব জাহাজ তৈয়ারীর পূর্ণাঙ্গ কারখানাগুলি গড়িয়া না উঠে, ততদিনের জন্য পৃথিবীতে বাণিজ্য চালাইবার উপযুক্ত জাহাজ সংগ্রহ করাই সমীচীন এবং এইভাবে সংগৃহীত জাহাজের সহিত নিজ কারখানায় নির্ম্মিত জাহাজগুলি যুক্ত হইয়া কালে ভারতকে জাহাজ শিল্পের দিক হইতেও জগতে সম্মানজনক আসন প্রদানে সমর্থ হইবে।

ভারতে শিল্পপ্রসারের প্রথম অবস্থায় বিদেশ হইতে শিল্পপণ্য উৎপাদন-উপযোগী যন্ত্রপাতি আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে বাণিজ্য জাহাজ ক্রয়ের চেষ্টাও দেখিতে হইবে। দেশবাসীর আগ্রহ অনুধাবন করিয়া ভারতসরকার যদি ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং হইতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষভাবে বিলাতী যন্ত্রের জন্য ষ্টার্লিং বা মার্কিনী যন্ত্রের জন্য ডলার ব্যবহারের অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে সেই অর্থের একাংশ হইতেও পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকখানি বাণিজ্য জাহাজ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি রয়টারের একটি সংবাদে প্রকাশ যে,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট নাকি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই প্রায় ১৭৩ কোটি ডলার মূল্যের (প্রতি শত ডলার ৩৩২৸০ আনা) কতকগুলি জাহাজ (এইগুলির মোট ভার বহনের ক্ষমতা ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন) ন্যায়সঙ্গত ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিকট বিক্রয় করিবার একটি পরিকল্পনা করিতেছেনএবং যুক্তরাষ্ট্রের "হাউস অফ রিপ্রেসেণ্টেটিভসের" বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত কমিটি উক্ত জাহাজ বিক্রয় সম্বন্ধে একটি বিল আলোচনা করিতেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমেরিকা যদি এইভাবে বিক্রয়ের জন্ত বাণিজ্য জাহাজ বাজারে উপস্থিত করে তাহা হইলে ভারতের দাবী সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হইবে, কারণ নিজস্ব জাহাজের অভাবে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল বহির্বাণিজ্যের দিক হইতে যে ভাবে আঘাত পাইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। ষ্টার্লিং পাওনার একাংশ ডলারে রূপান্তরিত করিয়া ভারতসরকার যদি এই মার্কিনী জাহাজ ভারতের নামে কিনিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পপতিগণের অনেকেই নিজস্বার্থে এই বাণিজ্য জাহাজের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদানে প্রস্তুত থাকিবেন। অবশ্য এ পর্য্যন্ত ভারতসরকারের এ সব ব্যাপারে যেরূপ ঔদাসীন্য দেখা গিয়াছে তাহাতে মনে করা কঠিন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এ ভাবে জাহাজ কিনিয়া ভারতীয় জাহাজশিল্প সংগঠনের প্রাথমিক সুযোগ ভারতসরকার করিয়া দিবেন। তবে সম্প্রতি নানা কারণে তাঁহাদের মধ্যে যেটুকু ঔদার্য্য প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসীর নিজের হাতে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার ফিরিয়া আসিবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাতেই আশা হয় যে, হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের এই বিক্রীতব্য জাহাজের একাংশ ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়া ভারতবর্ষ যুদ্ধোত্তর শিল্পপ্রগতির সহিত বাণিজ্য-প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের বাজারে কতকটা সুবিধা পাইবে।

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী

যুদ্ধের আগে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের ব্যবহারের শতকরা প্রায় ২½ ভাগ চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী হইত এবং এই চাউলের মূল্য অত্যন্ত সুলভ ছিল বলিয়া ভারতের বাজারে সাধারণ চাউলের দর মন প্রতি ৪।৫ টাকার বেশী হইতে পারিত না। ১৯৪২ সাল হইতে ব্রহ্মদেশ জাপকবলে ছিল এবং ব্রহ্মদেশীয় চাউলের অভাবে ও ভারতের উপর অতিথি অভ্যাগতের চাপ পড়ায় ভারতবর্ষে অন্নাভাব মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে এবং চাউলের মূল্যও হইয়াছে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় চতুর্গুণ। সম্প্রতি উত্তরব্রহ্ম ও আরাকান হইতে জাপসৈন্য বিতাড়িত হইবার ফলে ব্রহ্মদেশের উদ্বৃত্ত চাউল পুনরায় ভারতবর্ষে আমদানী হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। প্রকাশ, ব্রহ্মে নাকি প্রচুর ধান সঞ্চিত আছে, অথচ সেখানে চাউল করিবার যন্ত্রাদি এবং চাউল পাঠাইবার থলিয়া প্রভৃতির অত্যন্ত অভাব থাকায় সেই চাউল স্থানান্তরিত করা চলিতেছে না। তবে আশা করা হইতেছে যে, শীঘ্রই ভারত হইতে ঐ সকল দ্রব্য ব্রহ্মে পাঠান হইবে এবং ব্রহ্ম হইতে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতে চাউল রপ্তানী সুরু হইবে। সম্প্রতি নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রের রেঙ্গুনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতে ভারতে শীঘ্রই আনুমানিক ৫ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইবার সম্ভাবনা আছে।

জাপানী দখলের সময় ব্রহ্মের ধানচাষ কতকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কাজেই স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এই চার বৎসর ঐ দেশে কম শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপাদন হ্রাসের দরুণ উদ্বৃত্ত ধান্যের পরিমাণও কম হওয়া স্বাভাবিক এবং রপ্তানীও উপস্থিত কিছু কম হইবেই। এইভাবে এমনিই ভারতে কম চাউল আসিবার সম্ভাবনা, তাহার উপর

সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস জানাইয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতে ভারত ছাড়া মধ্য ইউরোপের অন্নভোজী জাতিসমূহের জন্যও প্রচুর পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইবে। এই সূত্রে আরও সংবাদ আসিয়াছে যে ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সাউথ-ইষ্ট-এশিয়া-কমাণ্ড নাকি ব্রহ্মের দুই বৎসরের উদ্বৃত্ত চাউল কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাছাড়া ব্রহ্ম গভর্ণরের সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় এমন আভাবও পাওয়া গিয়াছে যে ব্রিটিশ মিনিষ্ট্রি-অফ-ফুড বা ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগ অতঃপর ব্রহ্মের উদ্বৃত্ত চাউলের রপ্তানীনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বলা বাহুল্য এই সকল সংবাদ পড়িলেই মনে হয় যে, ব্রহ্মের চাউল আমদানী দ্বারা ভারতের অন্নসঙ্কট সমাধানের যে আশা আমরা করিতেছি তাহা ফলপ্রসূ হইবার পথে অনেক বিঘ্ন দেখা দিবে। ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগ অথবা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে উদ্বৃত্ত চাউল পড়িলে তাহারা ভারতের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের কথা মধ্য-ইউরোপের প্রয়োজনের চেয়ে যে অবশ্যই বড় করিয়া দেখিবেন, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মের উদ্বৃত্ত চাউলের কারবার প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের হাতে ছিল এবং সেইজন্য এই চাউল হইতে দরিদ্র ভারতবাসী গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ পাইত। বর্ত্তমানে সমস্ত কিছু ওলট পালট হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত হইতে ব্রহ্মের চাউলের কারবার চলিয়া যাইবার এই যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, ইহাও অবশ্যই ভারতের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হইবে। অবশ্য ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা পরের কথা, উপস্থিত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারত ব্রহ্মের চাউল আমদানীর উপর কতটা নির্ভর করিয়া আছে, তাহা লইয়া বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা আশা করি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ, ব্রিটিশ সরকারের খাদ্যবিভাগ বা যে কেহই ব্রহ্মের চাউল হস্তগত করুন, ভারতসরকার তাঁহাদিগকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও চরম অভাবের কথা জানাইয়া এই দেশে অধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী করিতে সম্মত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

১।৭।৪৫

স্বপ্ন

ডাঃ শ্রীদুর্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক আলোচনা বা এই নির্দ্দিষ্ট স্বপ্নের বিষয় কোনও মন্তব্য না করিয়া উহা যথাযথ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম।

বর্ষাকাল। সন্ধ্যা আগত প্রায়। তখনও বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছে। অজানা গ্রামের কর্দ্দমাক্ত ক্ষুদ্র পথ দিয়া লক্ষ্যশূন্যভাবেই চলিয়াছি। স্বীয় পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন ব্যতীত আর কোনও আবরণ নাই। নগ্ন পদ। আজ আমি গৃহহীন, আশ্রয়বিহীন ও সর্ব্বপরিত্যক্ত, তাই চলিয়াছি। আজ আমার পথ ছাড়া আর গতি কি? কিন্তু বক্ষে আমার একটী জীর্ণ কায়া, অপরিচিতা, ক্ষুদ্র শিশুকন্যা, সে কে? আজ আর আমার বংশগত মর্য্যাদা, জাতিগত মান, বিদ্যাগত অভিমান এবং অর্থগত দম্ভ নাই। এ অবস্থা তাঁহারই দান, এরূপ একটী প্রশান্ত মনোভাবই যেন আমার সম্পূর্ণ সম্বল হইয়াছে। চারিধারে ধান্য ক্ষেত্র। উহার মধ্যের পথ দিয়া কেবলই চলিয়াছি। কিয়ৎকাল পরে সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর দেখিয়া, বালিকাটীকে বৃষ্টির কবল হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। ঐ কুটীরে পৌঁছাইবার জন্য রাস্তা ত্যাগ করিয়া একটী পুষ্করিণীর পাড় হইয়া ঘাটের দিকে কিঞ্চিৎ নামিয়া কুটীরের পথ ধরিয়া চলিয়া ক্রমে কুটীরের আচ্ছাদিত দাওয়ায় উঠিবামাত্র আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—"নারায়ণ"। মুহূর্ত্তে গৃহ মধ্য হইতে কর্কশকণ্ঠে প্রতিউত্তর আসিল "দাওয়ায় কে? বেরিয়ে যা, এখনই গিয়ে লাঠি পেটা করব"। অভিমান এখনও বর্ত্তমান। মনে হইল উদরের যাতনা নিবারণ করা তো দূরের কথা, এমন কি, কিয়ৎকালের জন্য আশ্রয়ও ভগবানের সহ্য হইল না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে নিজ ভ্রম বুঝিলাম। তিনি যাকে আশ্রয়হীন করেন তাহার আশ্রয় তো নাই। নিশ্চিন্তভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পুষ্করিণীর পাড়ে উঠিবার সময় পদস্খলন হইল। নিমেষে কর্ম্ম অভিজ্ঞতাপ্রসূত দূরদৃষ্টিতে বালিকার অপঘাত মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য মানস নেত্রে উদিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য, পড়িয়া গেলাম না। কে আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিল। পূর্ব্বক্ষণে কর্কশকণ্ঠে যে বিতাড়িত করিয়াছিল, এ কি সেই ব্যক্তি? ইতস্তত চিন্তা করিয়া পশ্চাদভাগে তাকাইয়া দেখি, স্থানটী জনশূন্য। এ কাহার করস্পর্শ? বুঝিলাম। সর্ব্বস্ববিহীন অবস্থায়ও যে চিন্তা-দ্বন্দ্বের গুরুভার ছিল, তাহা নিমেষে অপসারিত হইল। অনুভূতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিল, কৃতজ্ঞতা আনিল গদগদ ভক্তি উচ্ছ্বাসে অশ্রুনীর, উদয় হইল চৈতন্য। অশ্রুবিগলিত নয়নে আবার পথে চলিলাম।



বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার প্রতীচ্য মিত্রশক্তির একটা বিরোধ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সান্ ফ্রান্সিসকোর ভিটো সম্পর্কে কিছুতেই মীমাংসা হইতেছিল না; আড্রিয়াতিকের তীরে ত্রিয়েস্তের ব্যাপার লইয়া একটা খণ্ড যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল; পোল্যাণ্ড সম্পর্কে নূতন সমস্যা দেখা দেওয়ায় একটা বড় রকমের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়া আপোষের মনোভাব লইয়া তিনটি ক্ষেত্রেই মীমাংসা করিয়াছে। কোন বিষয়ে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আসর হইতে সে সরিয়া আসিতে চায় না। তাহার প্রতীচ্য মিত্রশক্তিগুলির শাসনক্ষমতা যাহাদের হাতে, তাহারা অনেকেই যে প্রগতিপন্থী নয়, তাহা সোভিয়েট রুশিয়া জানে। তবু, তাহাদের সহিত এখন যথাসম্ভব সহযোগিতা করিয়া যুদ্ধোত্তর জগতে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রভাব কমাইতে সচেষ্ট হওয়াই তাহার নীতি। অনমনীয় মনোভাব লইয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আসর ছাড়িয়া গেলে প্রতিক্রিয়াপন্থীদেরই জয় হইবে।

সান্‌ফ্রান্সিসকো সম্মেলন

নয় সপ্তাহ অধিবেশন চলিবার পর সান্ ফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনের অবসান হইয়াছে। সম্মেলনে ৫০টি জাতির প্রতিনিধি জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কতকগুলি বিধান রচনা করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি রক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, এবার প্রয়োজন হইলে, সামরিক শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে; প্রধান পাঁচটি শক্তির হাতে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক একটি প্রধান শক্তিকে কতকগুলি অঞ্চলে ম্যাণ্ডেটারী প্রভুত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, এবার তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ধরণের অঞ্চলে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একটি ট্রাষ্টিসিপ্ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।

সান্ ফ্রান্সিসকোয় রচিত সনদ ত্রুটিশূন্য হয় নাই; বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা বলা চলে না।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। শ্রমশিল্পে উন্নত দেশগুলির ধনিকরা পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতে চায়; এই প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করে, তাহা হইতেই আন্তর্জ্জাতিকক্ষেত্রে হানাহানি ঘটে। কোন একটি দেশ বা কোন বিশিষ্ট মতবাদ যুদ্ধের হেতু হইতে পারে না। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ—এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই কতকগুলি দেশের উপর যতদিন অন্যের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, এই সব দেশের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা যতদিন উন্নত দেশগুলির ধনিক শ্রেণীকে প্রলুব্ধ করিবে, তত দিন বিশ্বে স্থায়ী শান্তি আসিবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে জাতি-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল, আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনীর অভাবে উহা অন্তঃসারশূন্য হয়। সেই সঙ্ঘের ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ—উহার প্রধান পাণ্ডারা বিনা যুদ্ধে নিজ নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘকে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ইতালীর আবিসিনিয়া অভিযান প্রভৃতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের অক্ষমতা সামরিক শক্তির অভাব নয়—এই অক্ষমতার মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবুদ্ধি। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সক্রিয় বিরোধিতা করিতে হইলে চীনে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে পাশ্চাত্য শক্তির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের আত্মকর্ত্তৃত্বের দাবী অপ্রতিরোধ্য হইতে পারিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পুরাতন জাতি-সঙ্ঘে অত্যাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগের যে নির্দ্দেশ ছিল, তৎকালে জাপান ও ইতালীর বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থাও প্রযুক্ত হয় নাই।

নূতন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয় নাই। অথচ, আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে স্বভাবতঃই আশঙ্কা হয়—পুরাতন জাতি-সঙ্ঘের কেবল কূটনৈতিক গুরুত্বকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহারের সুবিধা ছিল; এবার হয়ত নূতন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের সামরিক শক্তিও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে।

কিন্তু আশার কথা এই যে, এবার বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি প্রধান পাণ্ডা সাম্রাজ্যবাদী নয়। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই জানেন—মঃ মলোটভ্ সান্ ফ্রান্সিস্‌কোতে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, পরাধীন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা লাভ না করিলে জগতে স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভণ্ডামীর মুখোস এইভাবে খুলিবার মত শক্তিও এবার বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানে রহিয়াছে। মঃ মলোটভ্ মূল অধিকারের ঘোষণায় প্রত্যেক মানুষের কাজ করিবার অধিকার ও শিক্ষা পাইবার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করাইতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান শক্তি সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনে যথেষ্ট প্রগতি শক্তি না থাকায় সোভিয়েট রুশিয়ার এই সব প্রগতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠানে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের এই প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। প্রধান পাঁচটি শক্তির মধ্যে বৃটেন ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রূপ সত্বর পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা অবশ্য অল্প। বৃটেনে আসন্ন নির্ব্বাচনে সেখানকার রাজনীতিক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটিবার আশা নাই। কিন্তু ফ্রান্সের রাজনীতির স্রোত ক্রমেই আরও প্রগতিমুখী হইবে। চীন শ্রমশিল্পে অনুন্নত দেশ; তাহার স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। অদূর ভবিষ্যতে চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক একতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কাজেই ভবিষ্যতে সে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আঁচল ধরিয়া আর চলিবে না। এই ভাবে শীঘ্রই ফ্রান্স ও চীন সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির ঐকান্তিক সমর্থক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহার পর, বর্ত্তমানে সিকিউরিটী এসেম্বলীতে আমেরিকার অনুরক্ত কতকগুলি দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র এবং বৃটেনের অনুরক্ত কতকগুলি মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্র যোগ দেওয়ায় এই দুইটি শক্তির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই সুবিধা চিরদিন থাকিবে না—অদূর ভবিষ্যতে এসেম্বলীতেও প্রগতিশীল শক্তির সংখ্যা বাড়িবে।

এবার বড় বড় শক্তিকে বেশী ক্ষমতা দেওয়ায় অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের ভণ্ডামী ব্যর্থ করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট উপায় থাকিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে জগতে অশান্তি সৃষ্টি করে বড় বড় শক্তি; ছোট ছোট শক্তির বিরোধের মূলেও থাকে ইহারা। ইহারাই ইচ্ছা করিলে জগতে শান্তি রক্ষা করিতে পারে। ছোট শক্তিগুলি এক একটা বড় শক্তির আঁচল ধরিয়া চলে; আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহারা যদি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বড় বড় শক্তির সমান অধিকার পায়, তাহা হইলে বড় শক্তিগুলি নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহাদিগকে শিখণ্ডীরূপে ব্যবহার করিবার সুবিধা হয়। বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের সনদে বড় শক্তিগুলির হাতে ভিটোর ক্ষমতা দেওয়ায় বাস্তব অবস্থাকেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ছোট ছোট শক্তির ভোট লইয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির খেলা করিবার সুযোগ বন্ধ করা হইয়াছে।

সান্-ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ইহা অপেক্ষা উত্তম ফল বর্ত্তমান অবস্থায় আশা করা যায় না। সম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিজ নিজ রাজনৈতিক অবস্থা সম্মেলনের সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। সান্ ফ্রান্সিসকোয় যে সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশেই রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতে। কাজেই, এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে প্রগতিমূলক হইতে পারে না। তবে, ষ্টালিন-টিটো-বেনেসের দেশের প্রতিনিধি যে সান্-ফ্রান্সিসকোয় ছিলেন, তাহার পরিচয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। ইডেন্-স্মাট্স্-ষ্টেটিনিয়াসের দেশের প্রভাবও উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

পোলিস্ সমস্যার সমাধান

এবার পোলিস্ সমস্যার সত্যই মীমাংসা হইয়াছে; কয়েকজন নূতন সদস্য লইয়া অস্থায়ী পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের (লুব্‌লিন্) বিস্তার সাধিত হইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকা সত্বর এই গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইবে। তাহাদের আপত্তির কারণ এখন দূর হইয়াছে। বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধি নূতন গভর্ণমেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচনে মধ্যস্থতা করিয়াছেন।

ষোল জন পোলিস্ প্রতিনিধিকে সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করিয়াছেন শুনিয়া মিঃ ইডেন ও ষ্টেটিনিয়াস্ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশ পাইবার পর তাঁহারা মঃ মলোটভের সহিত পোল্যাণ্ড সম্পর্কে আর আলোচনা করিতে সম্মত হন নাই। সোভিয়েট রুশিয়া প্রকাশ্যে বিচারের ব্যবস্থা করিয়া এই পোলিস্ ধুরন্ধরদের স্বরূপ বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছে। লণ্ডনের আশ্রিত পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত পরিচয়ও এই বিচারে প্রকাশ পাইয়াছে; তাহাদের "হিরো" জেনারল বর জীবটিকেও বিশ্ববাসী চিনিয়াছে। ওয়ার্স'য় বিদ্রোহের সময় লালফৌজ কেন বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই, তাহার উত্তরও এই বিচারে মিলিয়াছে।

লণ্ডনের পিঁজরাপোলে অবস্থিত পোল্যাণ্ডের জমিদার-গভর্ণমেণ্টের এবার সত্যই সমাধি হইয়াছে। তাহারা এখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে তাহাদের মিথ্যা অধিকার সম্বন্ধে জগতের কাছে কাঁদুনী গাহিবার সিদ্ধান্ত করিতেছে। তাহারা এখনও বুঝিতেছে না (অবশ্য বোঝা স্বাভাবিকও নয়) যে, বিভিন্ন দেশে তাহাদের স্বগোত্র শ্রেণীর আসন টলিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর হতভাগ্য জীব এখনও লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের জন্য মায়াকান্না কাঁদিতেছে। এই কান্নার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে লণ্ডন পোলদের সত্যকার রূপ জানিবার জন্য তাহাদের একটু পরিশ্রম করা উচিত। এই জীবগুলি ওকুলিকি ও তাহার সহকর্ম্মীদের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় সোভিয়েট রুশিয়ার বিচার-পদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছে। তাহাদের জানা উচিত—বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক ও প্রতিনিধিদের সমক্ষে এই বিচার হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া হইতে সংবাদ প্রেরণের অসুবিধা থাকিতে পারে। কিন্তু এই সব সাংবাদিক ও প্রতিনিধিকে সোভিয়েট রুশিয়া বন্দী করিয়া রাখে নাই। তাহারা রুশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিয়া ত "প্রকৃত তথ্য" ফাঁস করিয়া দিতে পারে! সোভিয়েট রাশিয়ার দেশদ্রোহের বিচার সম্বন্ধে তৎকালে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জন্ গান্থার এই যুক্তি দেখাইয়াছেন।

ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গ

গত মাসে ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ত্রিয়েস্ত সমস্যার আপাততঃ মীমাংসা হয় নাই। মার্শাল টিটো ত্রিয়েস্ত অঞ্চলে সৈন্য রাখিবার জন্য জিদ্ করেন নাই। তবে, ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে যুগোশ্লেভিয়ার

দাবী তিনি ত্যাগ করেন নাই। শান্তি বৈঠকে এই অঞ্চল সম্পর্কে যুগোস্লোভিয়ার পক্ষ হইতে দৃঢ়তার সহিত দাবী উত্থাপিত হইবে।

বৃটেনে আসন্ন নির্ব্বাচন

মিঃ চার্চ্চিল চাহিয়াছিলেন—জাপান পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত থাকুক। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের ব্যাপারে তিনি কতকটা গুছাইয়া লইতে পারিবেন। শ্রমিক দল নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি কোয়ালিসন গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া অবিলম্বে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার আশা—ইউরোপীয় যুদ্ধের বিজয়ে তাঁহার যে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে, তাহার সুযোগে রক্ষণশীল দল অনায়াসে নির্ব্বাচন বৈতরণী পার হইবে।

শ্রমিক দলের নির্ব্বাচনী ধ্বনি—মূলশিল্প, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিব, একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তন করিব, সর্ব্বতোভাবে জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। রক্ষণশীল দলের পাল্টাধ্বনি—আমরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিব; সোস্যালিষ্ট দল বৃটিশ জাতির এই অধিকার হরণ করিতে যাইতেছে।

যুদ্ধের সময় বৃটেনের শ্রমিক দলের শক্তি বাড়িয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচনে এই শক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। কিন্তু শাসনক্ষমতা লাভ করিবার উপযোগী সাফল্য তাহাদের হইবে কিনা, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ—রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই, বিরুদ্ধ পক্ষে এই বিভেদের সুযোগ রক্ষণশীলরা বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া, বৃটিশ জনসাধারণ এখনও যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে না। কাজেই, এই সময় শাসন-ব্যবস্থায় একটা বড় পরিবর্ত্তন তাহারা হয় ত চাহিবে না। মিঃ চার্চ্চিলের ব্যক্তিগত প্রভাবও রক্ষণশীলদের বিশেষ উপকারে আসিবে। শ্রমিক দল যে নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচী উপস্থাপিত করিয়াছে, বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টিতে উহা পরীক্ষামূলক। বৃটিশ জাতির প্রকৃতি রক্ষণশীল; পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থার প্রতি তাহারা সহজে আকৃষ্ট হয় না। কাজেই, পুরাতন ব্যবস্থা যে যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্যাগুলি সমাধান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম—ইহা কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ জাতি শ্রমিক দলের প্রগতিমূলক কার্য্যসূচী সমর্থন করিবে কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। মনে হয়, বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর তাহারা যখন জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী পূরণ করিতে অসমর্থ হইবে, তখনই বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রকৃত সুযোগ আসিবে। এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল যদি জয়ী হয়, তাহা হইলেও শীঘ্র বৃটেনে আবার নির্ব্বাচন হওয়া সম্ভব; পাঁচ বৎসর রক্ষণশীল দল হয়ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

সারিয়া ও লেবনেন

সারিয়া ও লেবনেনের সমস্যা এখনও মেটে নাই। সোভিয়েট রুশিয়া, চীন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত বৈঠকে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যের প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বৃটেন ও আমেরিকা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যে মাতব্বরি করিবার অধিকারকে তাহারা অন্যের সহিত ভাগাভাগি করিতে চায় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এখন সোভিয়েটের প্রভাব বিস্তৃতি নিবারণের জন্য মধ্য-প্রাচ্যকে প্রাচীররূপে ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বাল্টিক রাজ্যগুলি ও বল্‌কান অঞ্চল যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, যুদ্ধোত্তরকালে মধ্য-প্রাচ্যকে সেই উদ্দেশ্যে তাহারা ব্যবহার করিতে চায়। কাজেই, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সোভিয়েট রাশিয়াকে ডাকিতে তাহারা সম্মত হইতে পারে না। ফ্রান্স একাকী এখন লেভান্ত রাজ্যের সহিত একটা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছে।

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ

ওকিনাওয়ার প্রচণ্ড সংগ্রাম শেষ হইয়াছে, ছয় মাস যুদ্ধের পর ফিলিপাইনসের লুজন দ্বীপে মার্কিণ সেনা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বোর্ণিও দ্বীপে অষ্ট্রেলিয়ান্ সেনাবাহিনী অবতরণ করিয়াছে। ইহাই সুদূর প্রাচ্যের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খাস জাপানে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ সমান ভাবেই চলিতেছে।

জাপানীরা যেরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করিতেছে, তাহাতে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা খুব অল্পই। সুদূর-প্রাচ্যের যুদ্ধে শেষ পর্য্যায়ে উভচর অভিযান চলিবে খাস জাপানে, খাস চীনে এবং মালয়ে। এই তিনটি অভিযান অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। এই সব অভিযান আরম্ভ হইবার পর বলা চলিবে যে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে।

১।৭।৪৫

লাল-কাকাতুয়া *

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনাম হইতে প্রেরিত এ উপহার
লাল-কাকাতুয়া,—রং দেখিবার মত;
পীচ্-কোড়কের মত লাল রং তার,
মানুষের ভাষা ব'লে যায় অবিরত।

তার সাথে তারা করে একই ব্যবহার
যেমন করিল বিজ্ঞ বাগ্মী জনে;
শক্ত খাঁচায় বন্ধ করিয়া দ্বার—
বন্দী করিয়া রেখে দিল সযতনে।

* চীনা-কবি পো চু-ইর কবিতার অনুবাদ।

সাময়িকী

সিমলায় নেতৃ-সম্মিলন—

গত ২৫শে জুন হইতে সিমলায় লাটপ্রাসাদে নেতৃ-সম্মিলন আরম্ভ হয়। প্রথমেই বড়লাট এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আলোচ্য বিষয় সকলকে বুঝইয়া দেন। মহাত্মা গান্ধী সম্মিলনে যোগদান করেন নাই—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ ও বাকী ২০জন নিমন্ত্রিত নেতা উপস্থিত ছিলেন। ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুন তিন দিন ধরিয়া সকল নেতা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। ২৭শে তারিখে কংগ্রেসের সহিত রফা করিবার জন্য মিঃ জিন্না একদিন সময় চান। সেজন্য ২৮শে সম্মিলনের সভা বন্ধ রাখা হয়। ২৯শে সম্মিলন বসিলে ঘোষণা করা হয় যে কংগ্রেস ও মুসলেম লীগ বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদের সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। ২দিন ধরিয়া পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বিফল হইয়াছেন। মিঃ জিন্না ভারতবাসী সকল মুসলমানের নিজেকে একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মনে করেন। কংগ্রেস তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কাজেই শুক্রবার (২৯শে) সম্মিলনে বড়লাট ঘোষণা করেন, তিনি সকল দলের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা গ্রহণ করিবেন। ৬ই জুলাই সেই তালিকা বড়লাটের নিকট নেতারা পেশ করিবেন। বড়লাট ঐ তালিকা হইতে বাছিয়া নিজ পছন্দ মত শাসন পরিষদ গঠিত করিবেন ও ১৪ই জুলাই পুনরায় সম্মিলনে মিলিত হইয়া নূতন পরিষদের সদস্যগণের নাম ঘোষণা করিবেন।

হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে সম্মিলনে কোন প্রতিনিধি আহুত না হওয়ায় সম্মিলনে সে কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, কংগ্রেসকে শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধি মনে করা খুবই অন্যায় হইয়াছে। কংগ্রেস ভারতের সকল জনগণের প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান, কাজেই সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। ক্রমে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সে কথা বুঝিতে পারিতেছেন। মিঃ জিন্না যে অন্যায় জিদ করিতেছেন, সে কথাও নাকি বড়লাট মিঃ জিন্নাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

২৯শে তারিখে সম্মিলন স্থগিত হইলে তখনই রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে সিমলায় আহ্বান করেন। জহরলাল ১লা জুলাই সিমলায় পৌঁছিয়াছেন। ২রা তারিখে বড়লাটের সহিত জহরলালের ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। ৩রা জুলাই হইতে সিমলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা চলিতেছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি নামের তালিকা বড়লাটকে দেওয়া হইবে। তাহাতে কংগ্রেসের লোক ছাড়াও বহু যোগ্য ব্যক্তির নাম থাকিবে। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, নূতন শাসন পরিষদে যাহাতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই শুধু গ্রহণ করা হয়, সেজন্য সকল দলেরই চেষ্টা করা উচিত। সেজন্য কংগ্রেস নিজেদের দল ছাড়াও যাঁহাদের ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাদের সকলের নাম বড়লাটকে জানাইয়া দিবেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ১৫ জনের নাম দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে—(১) মৌলানা আজাদ (২) মিঃ আসফ আলি (৩) পণ্ডিত নেহেরু (৪) সর্দ্দার পেটেল (৫) রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৬) মিঃ জিন্না (৭) লিয়াকৎ আলি খাঁ (৮) নবাব ইসমাইল খাঁ (৯) মুনিস্বামী পিলাই (১০) রাধানাথ দাস (১১) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১২) গগনবিহারীলাল মেটা (১৩) রাজকুমারী অমৃত কাউর (১৪) তারা সিং (১৫) সার আরদেশীর দালাল। বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধিত্বের কথা আলোচনার জন্য বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়কে সিমলায় আহ্বান করা হইয়াছে ও তিনি তথায় গিয়াছেন। সম্মিলনে বাঙ্গালার ডক্টর

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার নাজিমুদ্দীন, রাষ্ট্রপতি আজাদ আছেন। মৌলানা আজাদের সঙ্গে তাহার সেক্রেটারী অধ্যাপক হুমাউন কবীর সিমলায় বাস করিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য হিসাবে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সিমলায় গিয়াছেন। বাঙ্গালার দাবী যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেজন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ জিন্না ৯ই জুলাই বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহাকে সমগ্র ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার না করায় তিনি মুসলেম লীগের পক্ষ হইতে কোন নামের তালিকা পেশ করিবেন না।

বোধহয় ৬ই জুলাই সকল দলের নিকট হইতে নামের তালিকা পাইয়া বড়লাট সে বিষয়ে সকল নেতার সহিত পৃথকভাবে আলোচনা করিবেন ও আলোচনার শেষে সকলকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিয়া নিজে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ১৪ই জুলাই নেতৃ সম্মিলনে তাহা প্রকাশ করিবেন। তাহার পূর্ব্বে নূতন শাসন পরিষদের সদস্যদের নাম জানা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

আপোষ চেষ্টা—

১৪ই জুন সন্ধ্যায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁহার বিবৃতি প্রকাশ করেন। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতীয় নেতাদের সহিত আপোষ করিবার জন্য তিনি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন—তখনই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ধৃত সদস্যগণকে মুক্তি দেওয়া হয় ও ভারতীয় নেতাদের লইয়া ২৫শে জুন সিমলায় এক বৈঠক স্থির হয়। ঐ বৈঠকে বড়লাট সভাপতিত্ব করিবেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনভার বৈঠকে সম্মিলিত নেতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণের উপর অর্পণ করা হইবে। শুধু বড়লাট পরামর্শদাতা হিসাবে ও জঙ্গীলাট সমরসচিব হিসাবে ঐ পরিষদের সদস্য থাকিবেন। নূতন শাসন পরিষদকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে হইবে। (১) যতদিন না জাপান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়, ততদিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা (২) বৃটীশ ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালন—যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্য সম্পাদন—নূতন স্থায়ী শাসনতন্ত্র গঠন (৩) কি ভাবে নূতন স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে তাহা স্থিরীকরণ। যতদিন না স্থায়ী ব্যবস্থা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই অস্থায়ী ব্যবস্থা চলিবে। কেন্দ্রে নূতন শাসন পরিষদ গঠিত হইলে প্রদেশসমূহেও নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে বা পুরাতন (ভাঙ্গিয়া দেওয়া) মন্ত্রিসভাগুলিকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে। নূতন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক শাসনপরিষদ পরে অন্যান্য কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিদান করিতে পারিবেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাও নূতন মন্ত্রীদের করিতে হইবে।

সিমলায় নেতৃ-সম্মিলনে বড়লাট নিম্নলিখিত ২১ জনকে প্রথমে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—(১) মহাত্মা গান্ধী (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস) (২) মিঃ এম-এ জিন্না (নিখিল ভারত মুসলেম লীগ) (৩) শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই (কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসীদলের নেতা) (৪) নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ (কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলেম লীগ দলের ডেপুটী নেতা) (৫) ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কেন্দ্রীয় পরিষদে জাতীয় দলের নেতা) (৬) সার হেনরী রিচার্ডসন (কেন্দ্রীয় পরিষদে ইউরোপীয় দলের নেতা) (৭) শ্রীযুক্ত জি-এস মতিলাল (রাষ্ট্রীয় পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা) (৮) মিঃ হোসেন ইমাম (রাষ্ট্রীয় পরিষদে মুসলীম লীগ দলের নেতা)। এই ৮জন ছাড়া ১১টি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী (যাঁহারা ছিলেন ও আছেন)—(৯ শ্রীযুক্ত বি-জি খের (বোম্বাই) (১০) শ্রীযুক্ত রাজাগোপালচারী (মাদ্রাজ) (১১) শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ (যুক্তপ্রদেশ) (১২) পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা (মধ্যপ্রদেশ) (১৩) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (বিহার) (১৪) পার্লাকামেদীর মহারাজা (উড়িষ্যা) (১৫) খাজা সার নাজিমুদ্দীন (বাঙ্গালা) (১৬) সার সাদুল্লা (আসাম) (১৭) সার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা (সিন্ধু) (১৮) মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ (পাঞ্জাব) (১৯) ডাক্তার খান সাসাহেব (সীমান্ত প্রদেশ)। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—(২০) মাষ্টার তারা সিং (শিখ) ও (২১) রাও বাহাদুর শিবরাজ (তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়)। ইহার পর মহাত্মা গান্ধী নিজেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলিয়া অস্বীকার করায় তাঁহার নির্দ্দেশে বড়লাট কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদকে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

১৫ই জুন মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে জানান যে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি নহেন—কাজেই কংগ্রেস সভাপতিকে নিমন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ঐ সঙ্গে মহাত্মাজী বড়লাটের একটি ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন। বড়লাট সকল প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করেন বটে, কিন্তু বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধিরা বাদ পড়িয়া যায়। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হওয়া কংগ্রেসের কর্ত্তব্য নহে। সম্মিলনে হিন্দুদের কোন প্রতিনিধি আহুত না হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র বড়লাটের এই পক্ষপাতিত্বের তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তারযোগে বড়লাটের যে আলোচনা হয়, তাহার ফলে বড়লাট একদিকে যেমন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদকে নেতৃ-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিতে সম্মত হন, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার বিবৃতিতে 'বর্ণহিন্দু' কথাটির উল্লেখ থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তিনি শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে ''বর্ণহিন্দু' সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না বলিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লয়েন। মিঃ জিন্না সম্মিলনের তারিখ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে বড়লাট তাহাতে সম্মত হন নাই।

২৩শে জুন মৌলানা আজাদ ও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই সিমলায় উপস্থিত হন। ২৪শে জুন সিমলায় মহাত্মা গান্ধী বড়লাট প্রাসাদে বড়লাটের সহিত আলোচনা করেন ও বড়লাট পত্নীর সহিত কথা বলেন। ঐদিন মৌলানা আজাদ দেড় ঘণ্টাকাল বড়লাটের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার সময় পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ও অধ্যাপক হুমাউন কবীর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মিঃ জিন্নাও ঐদিন বড়লাটের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাটের আলোচনার ফলে স্থির হয় যে গান্ধীজি সিমলায় নেতৃ-সম্মিলনে যোগদান করিবেন না—তবে যতদিন না সম্মিলন শেষ হয় ততদিন সিমলায় উপস্থিত থাকিবেন এবং যাহার যখন প্রয়োজন হইবে ,তখন তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন।

বড়লাটের আন্তরিকতা—

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার দেশবাসী চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। সার তেজবাহাদুর সাপ্রুর প্রস্তাব মত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই পরিষদের মুসলেম-লীগ দলের ডেপুটী নেতা নবাব লিয়াকৎ আলি খাঁর সহিত একযোগে আপোষের যে প্রস্তাব করেন, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার আপোষ প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশাই-লিয়াকৎ প্রস্তাবই লর্ড ওয়াভেলের বর্ত্তমান প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত দেশাই গত ১২ই জুন পাঁচগণিতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ প্রস্তাবটি গান্ধীজিকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীজি উহার যৌক্তিকতা সমর্থন করায় এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত দেশাই-এর উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তাহার পর গত ২১শে জুন বোম্বায়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই তাঁহার প্রস্তাব সকলকে বুঝাইয়া দিয়া লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবের মধ্যে যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ভুলাভাই সে বিষয়ে সকল কংগ্রেস নেতাকে নিঃসন্দেহ করায় সকলে সিমলা বৈঠকে যাইতে সম্মত হন। হিন্দু মহাসভাদল বড়লাট কর্ত্তৃক বৈঠকে নিমন্ত্রিত না হওয়ার জন্য বড়লাট মহাত্মা গান্ধীর নিকট ত্রুটি স্বীকার করায় এ বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়। বড়লাট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মাহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় লইয়া যাইবার জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

নূতন অধ্যাপক নিয়োগ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি দুইজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। (১) ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনি বহু বৎসর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাকে ১৩শত মাসিক বেতনে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। (২) ডক্টর নীলরতন ধর—ইনি বহুদিন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের সরকারী শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালকের কাজও করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মাসিক হাজার টাকা বেতনে কৃষিবিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করা

হইয়াছে। উভয়েই তাঁহাদের বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ—

নেতৃ-সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই হইতে সিমলা পর্য্যন্ত রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মৌলানা আজাদ, শ্রীযুক্ত পন্থ প্রভৃতি উড়োজাহাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বোম্বাই হইতে সিমলা গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী প্রমুখ কয়েকজন মহাত্মা গান্ধীর সহিত একই ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অসুস্থ শরীর লইয়া মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে এই দারুণ গ্রীষ্মে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্য দিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই বুঝা যায়। পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে তাঁহার দর্শন-প্রার্থীর দল এত অধিক গোলমাল করিয়াছে যে তাঁহার পক্ষে দুই দিনে একটুও নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, দেশের জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে গমন করিয়া থাকেন। এবার তাঁহার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে ডক্টর সুশীলা নায়ার, সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ও পুত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধী ছিলেন। সিমলায় অবস্থানকালেও তাঁহাকে প্রত্যহ বহু দর্শনার্থীর নিকট দর্শন দিতে হইতেছে। সম্মিলনের সকল সংবাদ রাখিয়াও তিনি সারাদিন নিয়মিত কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। এই বয়সে তাঁহার কর্ম্মশক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিত জহরলাল সম্বর্দ্ধনা—

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি একদিন পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জনপ্রিয়তার দিক দিয়া পণ্ডিতজী গান্ধীজি অপেক্ষা অধিক সাফল্যলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা বোম্বায়ে, এলাহাবাদে ও সিমলায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ছাড়া অপরে পণ্ডিতজীর জনপ্রিয়তার পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। পণ্ডিতজী যখন বোম্বায়ে পৌছেন (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ২১শে জুনের সভায় যোগদানের জন্য) তখন তথায় খুব বৃষ্টি হইতেছিল; তাহা সত্ত্বেও সমস্ত পথ ও ষ্টেশনে এত লোকারণ্য হইয়াছিল যে পণ্ডিতজীকে মোটর গাড়ীর ছাদে চড়িয়া পথে যাইতে হইয়াছে। এলাহাবাদে ফিরিয়াও তিনি বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। গত ১লা জুলাই সিমলায় পৌছিলে তাঁহাকে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে, তাহা সিমলার লোক কখনও কল্পনাও করে নাই। কাল্‌কা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ জনাকীর্ণ ছিল এবং সিমলা সহরের পথে এত জনতা ছিল যে পণ্ডিতজীকে গাড়ী ছাড়িয়া জনতার মধ্য দিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। প্রকাশ, তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়া পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইবেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম কর্ম্মনিষ্ঠা, অনমনীয় দেশপ্রীতি, তাঁহাকে সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই জয়যুক্ত করিবে বলিয়া তাঁহার দেশবাসী সকলের বিশ্বাস আছে।

যুবমঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন—

গত ৩রা জুন অপরাহ্নে বুড়ুল যুব-মঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। গীতিকবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রধান অতিথি হন। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার করাল প্রভৃতি অনেকেই বক্তৃতা দেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পাঠাগারের উদ্দেশ্য, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। সভায় বহু জনসমাগম হয়।

গান্ধীজির আশীর্ব্বাদ—

মিঃ রজনী পামী দত্ত নামক একজন ভারতবাসী বিলাতে পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে ভারতসচিব মিঃ এন-এস্-আমেরীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নির্ব্বাচনে সাফল্য কামনা করিয়া তাঁহাকে এক তার করিয়াছেন। মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে নামক

একজন শ্বেতাঙ্গ ভারতবন্ধু বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নির্ব্বাচন কেন্দ্রে তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে যাইবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর আদেশ প্রার্থনা করেন। উত্তরে মহাত্মাজী জানাইয়াছেন—"বিলাতে যে দল ভারতের ও অন্যান্য পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিতেছে বা করিবে, আমি শুধু তাহাদেরই জয়লাভ কামনা করিব। ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত জার্ম্মানীর বা জাপানের নিকট জয়লাভ নিরর্থক হইবে।"

সেল-ট্যাক্স বৃদ্ধি—

বাঙ্গালা সরকারের বর্ত্তমান বর্ষে আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ২৫শে জুন হইতে বিক্রয়-করের হার টাকা প্রতি দুই পয়সার স্থলে ৩ পয়সা করা হইয়াছে। এই করবৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহার ধারণা করিবার শক্তি বোধহয় বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নাই। বাঙ্গালা দেশে গত ৯৩ ধারার শাসন অর্থাৎ গভর্ণরের স্বৈরশাসন চলিতেছে। লোক আশা করিয়াছিল মিঃ কেসি জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে অবহিত হইবেন। চাউলের দর কমিবার ব্যবস্থা করিবেন ও খাদ্য-দ্রব্যের যাহাতে মূল্য হ্রাস হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। তাহার পরিবর্তে দরিদ্র ক্রেতার উপর নূতন বিক্রয়-কর বসাইয়া লোককে বিব্রত করা হইল। খুচরা পয়সা পাওয়া যায় না—৩ পয়সা বিক্রয়-কর আদান প্রদানের অসুবিধাও কম হইবে না। কিন্তু দুঃখীর ব্যথা শুনিবে কে?

রাজবন্দীদের মুক্তি—

সিমলায় নেতৃসম্মিলনের প্রথম দিকে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জানাইয়াছেন যে, সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে অবিলম্বে মুক্তিপ্রদান করা না হইলে দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইবে না এবং দেশে সন্তোষজনক আপোষ প্রবর্ত্তন সম্ভব হইবে না; কলিকাতার খ্যাতনামা নেতা ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এই সময়ে সকল রাজনীতিক বন্দীর সুবিধার জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে তার করিয়াছেন ও কলিকাতায় আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন। তিনি জানাইয়াছেন—১৯৩৭ সালের পূর্ব্বে ধৃত ৭২জন রাজনীতিক বন্দী ১২ হইতে ২০ বৎসর জেলে আছেন। মহাত্মা গান্ধী গত ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে তাহাদের মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে সময়ের জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইলেও ভারতরক্ষা আইনে তাঁহাদের আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলকে এখন মুক্তিদানের সময় আসিয়াছে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

রুশিয়ায় স্থানীয় বিজ্ঞান পরিষদের ২২০ বৎসর বয়স উপলক্ষে যে উৎসব হইতেছে, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা গত ১৪ই জুন মস্কৌ সহরে গিয়া ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মস্কৌ যাওয়ার কথা ছিল, তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাইতে পারেন নাই। ডক্টর সাহা জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মস্কৌতে থাকিয়া পরে লেলিনগ্রাডে যাইবেন ও জুলাই মাসের শেষভাগে ভারতে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি তথায় ভারতের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন—ইহাই তাঁহার দেশবাসী সকলের বিশ্বাস।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি—

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী ও শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য পি-আর-এস বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তারাপদ কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক। উভয়েই কৃতী ছাত্র—তাঁহাদের জীবন সাফল্য মণ্ডিত হউক।

সাহিত্যিকের সম্মান—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, উত্তরবঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুত কুলদাচরণ সরকার রায়পুর সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক সাহিত্য-ভারতী ও কবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তিকেই এই সম্মান প্রদান করা হইয়াছে—তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার এই পুরস্কারে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

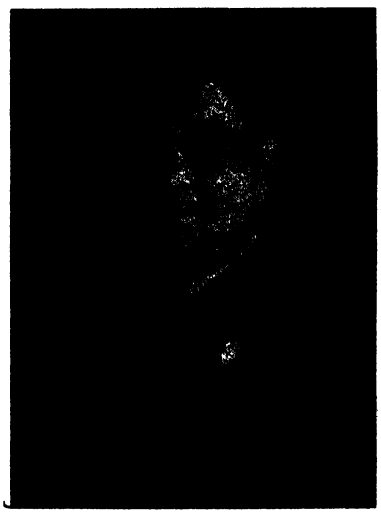
বর্ত্তমান দুর্নীতি ও জহরলাল—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বোম্বাই হইতে এলাহাবাদ ফিরিবার পথে জব্বলপুর ষ্টেশনে সমবেত যুবকগণকে বলেন

—ঘুস প্রথা, হীন মনোবৃত্তি, অন্যায়ভাবে লাভ করা, অহেতুক মজুত করা, চোরা বাজার প্রভৃতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্দ্দয়ভাবে অভিযান চালাইবার জন্য দেশবাসী সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আমরা দেশের জাতীয়তাবাদী যুবকবৃন্দের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহারা জহরলালকে শ্রদ্ধা করেন—কাজেই জহরলালের নির্দ্দেশ মত সকলের একযোগে দেশকে এই পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যতদিন না দেশে জাতীয় নূতন আন্দোলন আরম্ভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে প্রবল আন্দোলন হইলে দেশবাসী তদ্দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিতে পারিবে।

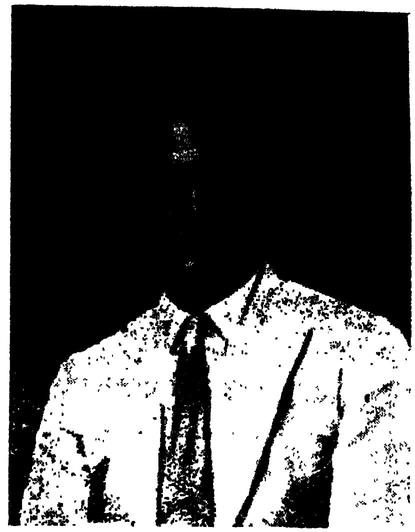
উপাধি বর্ষণ—

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে গত ১৪ই জুন বড়লাট ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপাধিদান করিয়াছেন। ইহা বার্ষিক



রাজা শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্যবস্থা। যাঁহারা এই উপাধি লাভ করেন, তাঁহারা নিজেদের সম্মানিত মনে করেন। তবে যাঁহারা দেশের সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁহাদের উপর এই উপাধি বর্ষিত হইলে উপাধিরও গৌরব বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩ জন পণ্ডিত ও লেখক আছেন। তাঁহাদের এই সম্মান লাভে শিক্ষিত সমাজ আনন্দ লাভ করিয়াছেন—(১) প্রথমেই লালগোলার (মুর্শিদাবাদের) জমীদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের 'রাজা' উপাধি লাভের কথা বলা যায়। তাঁহার বংশ দানশীলতার জন্য সমগ্র বঙ্গে সুপরিচিত। তাঁহার পিতামহ



মহামহোপাধ্যায় ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য

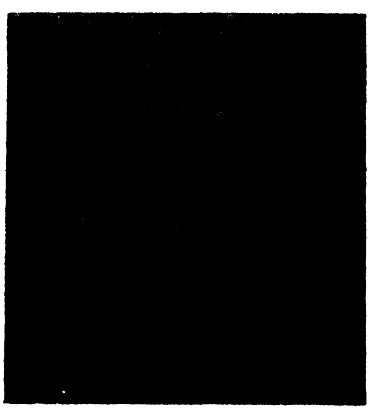
মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও মহাশয়ের বয়স বর্ত্তমানে ১০৬ বৎসর এবং তাঁহার জীবনব্যাপী দানের পরিমাণ করা যায় না। তাঁহার পৌত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণও বহু সৎকার্য্যে বহু টাকা দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার লেখক ও সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি কম নহে। (২) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি এম-এ, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট্; বহুদিন যাবৎ তিনি অধ্যাপনা দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী হিসাবে তাঁহার এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরববোধ করিবেন। (৩) মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ডক্টর বিমান বিহারী দে মহাশয় 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনিও খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও বৈজ্ঞানিক এবং বাঙ্গালাভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের এই রাজ-সম্মান লাভে তাঁহাদের সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন—

দৈনিক 'ভারত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন গত ২৫শে জুন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ২৬শে নভেম্বর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় 'ভারত' প্রচারও বন্ধ করা হইয়াছিল।



শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়
(ইনি হাওড়া মিউনিসিপালিটীর নূতন চেয়ারম্যান—নির্বাচন সংবাদ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।)



কবি ৺কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়
(ইহার পরলোকগমন সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।)

হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত—

গত ২৩শে জুন পুনায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হয়। সভায় বীর সাভারকর, ডাক্তার মুঞ্জে, মিঃ বোপৎকার, আশুতোষ লাহিড়ী, মনোরঞ্জন চৌধুরী, ডি-জি-দেশপাণ্ডে, জে-এস-করণ্ডিকার, মেজর পি-বর্দ্ধন, কে-শিবানন্দ, মোহান্ত দিগ্বিজয় নাথ, শ্রীমতী জানকীবাঈ যোশী, রামপ্রসাদ, রঙ্গনাথম, কৃষ্ণ পাণ্ডে ও ধানদেরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত এন-সি কেলকারকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ২৪শে তারিখে কমিটীতে ওয়াভেল ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়—হিন্দুরা ভারতের শতকরা ৭৫জন অধিবাসী। ওয়াভেল ব্যবস্থায় তাহাদের মধ্যে বিভেদের চেষ্টা করিয়া ভারতের জাতীয়তা নষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। যাহাতে ভারতে বৃটীশ স্বার্থ কায়েম থাকে, সেজন্য লর্ড ওয়াভেল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত জানাইয়া বড়লাটকে এক তার করিয়াছেন।



শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই লেখিকাকে সম্প্রতি 'জগত্তারিণী পদক' দেওয়া হইয়াছে।)

বিলাতে ভারতীয় শিল্পপতিবৃন্দ—

৭জন ভারতীয় শিল্পপতি ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার

কারখানাসমূহ দেখিতে গিয়াছেন। ঐ দলে আছেন—(১) শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা (২) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার (৩) মিঃ লায়েক আলি (৪) সার সুলতান চিনয় (৫) এ-ডি-ব্রুক্ (৬) আজাইব সিং ও (৭) জে-আর-ডি-টাটা। নলিনীবাবু দেশে ফিরিয়া বাঙ্গালায় নূতন ১০ হইতে ২০টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়াছেন ও সেজন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিরলা এদেশে মোটর গাড়ী ও সাইকেল প্রস্তুত করিবার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী করিবেন। প্রয়োজন হইলে মিঃ টাটা ঐ প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র হিসাবে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলাতের কারখানাসমূহ দেখিবার পর আমেরিকায় গিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী—

দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রবাসী ভারতবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য তথায় যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কমিশনে ২ জন ভারতবাসীও ছিলেন। কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারত হইতে একজন ভারতীয় নেতাকে তথায় লইয়া গিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা তাঁহাদের দেখান হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা নূতন নহে—৪০ বৎসর হইতে গান্ধীজি তথায় এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছিলেন—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।



অধ্যাপক ৺কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
(ইহার পরলোকগমন সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।)

চাউলের দর—

ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে খবর আসিয়াছে যে তথায় চাউল ১৮ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। অথচ বগুড়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় ৮ টাকা মণ দরে প্রচুর চাল পাওয়া যায়। যেখানে চাউল রেশন করা হইয়াছে সেখানে চাউলের মণ ১৬ টাকা ৪ আনা—আর তাহারই পাশের গ্রামে চাউল ১২ টাকা মণ পাওয়া যায়। সরকারের অনুমতি ব্যতীত এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চাউল লইয়া যাওয়া চলে না। বহুদিন ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে এই অব্যবস্থা চলিতেছে। সরকারী কর্ত্তারা কি ইহার কোন সুরাহা করিতে অসমর্থ—না লোকের সুখ সুবিধার দিকে দেখিবার সময় তাঁহাদের নাই ?

শ্যামনগরে হিন্দু সম্মেলন—

গত ১৪ই জুন হইতে ২৪শে জুন ৮ দিন ধরিয়া ২৪ পরগণা শ্যামনগরে ঠাকুরবাবুদের প্রকাণ্ড সংস্কৃত কলেজ গৃহে শ্যামনগর হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে হিন্দু সংস্কৃতির প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম দিন সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও শেষ দিনে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ উৎসব হয়। সেদিন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তথায় সম্বর্দ্ধনা করা হয় ও তিনি হিন্দু আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া এক বক্তৃতা করেন। প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বহু নূতন জিনিষ প্রদর্শিত হইয়াছিল। একটি গ্রামে এইভাবে ৮ দিন ধরিয়া উৎসব—দেশবাসীর অসাধারণ উৎসাহ ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক।

মিশরে ভারত সম্বন্ধে অপ্রচার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায়চৌধুরী ইসলামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য মিশরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিয়াছেন—"আধুনিক ভারত ও ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মিশরবাসীর জ্ঞান যৎসামান্য এবং অত্যন্ত অস্পষ্ট। ভারতীয় সংবাদ মিশরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। ভারত-বিরোধী সংবাদসমূহ মিশরে প্রচারিত হয়।" রায় চৌধুরী মহাশয় এল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন—সেখানে দুইজন বাঙ্গালী আছেন—তাঁহারা প্রাচীন পন্থী। মিশর সম্বন্ধে তিনি পুস্তক প্রকাশ করিয়া সে দেশের কথা ভারতবাসীকে জানাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন।



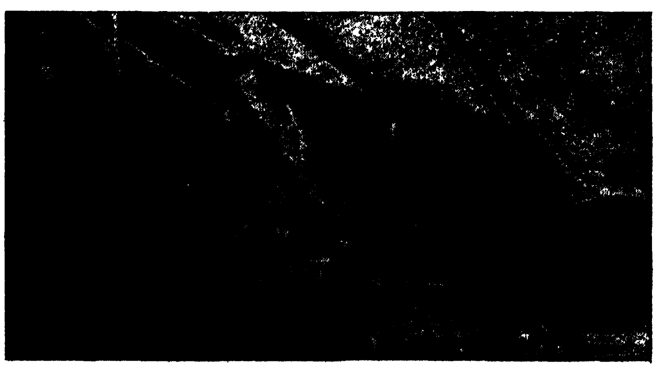
দুর্ঘটনার পর রেলগাড়ীগুলির অবস্থা

ফটো—তারক দাস



দুর্ঘটনার পর উৎক্ষিপ্ত এঞ্জিন

ফটো—তারক দাস



এঞ্জিন—অপর দিক হইতে

ফটো—তারক দাস



মণিরামপুর (ই-আই-রেল) রেল দুর্ঘটনার হতাহতগণ—(সংবাদ পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে)

ফটো—তারক দাস

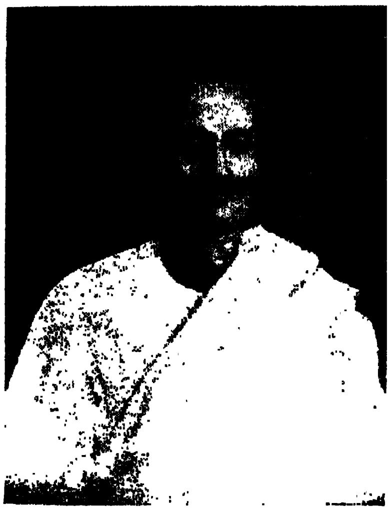
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে বিনা বিচারে বাঙ্গালা দেশ হইতে দূরে মাদ্রাজের কুন্নুরে আটক

করিয়া রাখা হইয়াছে। তথায় তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন। যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল—এখনও কেন যে অসুস্থ শরৎবাবুকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে না, তাহা বুঝা যায় না। বর্ত্তমানে তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়াও তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

বহরমপুরে কবি সম্বর্দ্ধনা—

মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সহরের সৈদাবাদ তরুণ সমিতি বহরমপুর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে এবং গত ৪ঠা মে স্থানীয় প্রবীণ কবি শ্রীযুত সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হওয়া উপলক্ষে

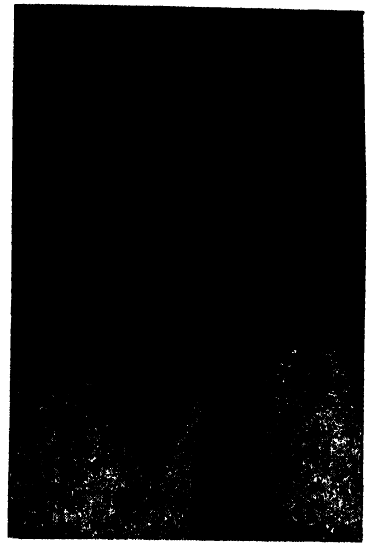


কবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

াণ্ট হলে এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ভায় স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় ভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্বর্দ্ধনা শেষে বি স্বরচিত এক কবিতায় উত্তর দান করেন।

ারলোকে শম্ভুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—

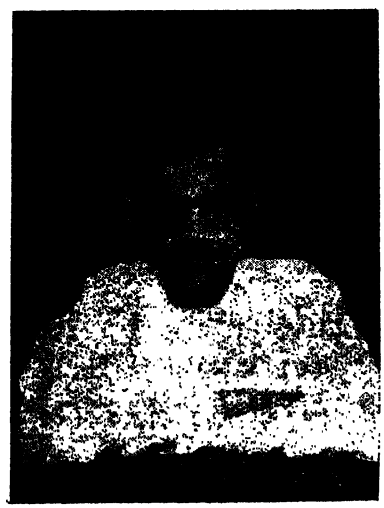
আগড়পাড়া কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ম্মী ও িলিক শম্ভুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৯ই মে বার মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ট্টাপাধ্যায় ভ্রাতৃগণ অসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠা ও শ্রম-শীলতার রা একটি বিরাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া বহু লোকের উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য তাঁহারা জনপ্রিয়তাও লাভ করিয়াছেন।



৺শম্ভুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

গ্রিফিথ প্রাইজ—

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ও 'ভারতবর্ষে'র লেখক শ্রীযুত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এবার "রবীন্দ্র



অধ্যাপক শ্রীযুত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

জীবন ও সাহিত্যের আদি পর্ব্ব" বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ' লাভ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার এই সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলা ঃ

আগের মতই বাঙ্গলা দেশে খেলোয়াড় আমদানির প্রতিযোগিতা চলেছে নিজ নিজ দলের যোগ্যতা দেখাবার জন্যে। এই ভাবের খেলাতে নতুন কিছু রেকর্ডও করা যায় কিন্তু ভবিষ্যতের পুঁজি বলে দেশের কিছুই থাকে না। বাংলা দেশের তরুণ ফুটবল খেলোয়াড়রা যে আশায় খেলাধুলা করবে আর কোন আদর্শই আজ তাদের সামনে রইলো না। বর্ত্তমানে ফুটবল খেলায় যে আধা-কোন অগৌরবের নয়। আমরা লেখাপড়া শিখছি এবং তার বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এমন কি অপরকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়েও অর্থ গ্রহণ করছি। সুতরাং খেলার বিনিময়ে প্রকাশ্যভাবে অর্থ উপার্জ্জন করতে আমাদের দেশের লোকের যেন বড় বেশী চক্ষুলজ্জা; অথচ গোপনে এ ব্যবসায় খেলোয়াড়রা বেশ উৎসাহ পেয়ে আসছে। কেবলমাত্র নিজের চিত্তবিনোদন এবং অপরকে আনন্দ দেবার জন্য যারা খেলে থাকেন তারা সত্যিকারের সখের খেলোয়াড়, এর চেয়ে মহৎ আদর্শ দুর্লভ। কিন্তু আমাদের



নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি

(মোহনবাগান)



ডি সেন

(মোহনবাগান)



শরৎ দাস

(মোহনবাগান)

পেশাদারী খেলা আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রলুব্ধ করেছে তার ফল খুব ভাল নয়। যাঁরা এই শ্রেণীর নীতি অবলম্বন ক'রেছেন ফুটবল খেলার প্রসারকল্পে তাঁদের দান কোন দিনই স্বীকার হবে না। আমাদের দেশে অন্য দেশের মতই পেশাদার এবং সখের খেলোয়াড় এই দুই শ্রেণীতে খেলোয়াড়দের ভাগ করে খেলান উচিত। খেলার জন্য প্রকাশ্যভাবে অর্থ গ্রহণ করা একটী কথা ভাবতে হবে, মানুষের এ আদর্শের স্থি কতখানি এবং স্থিতিই বা কতদিন। কেবলমাত্র যে আকাঙ্ক্ষায় মানুষের মন বেশীদিন লেগে থাকতে পারে ন জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন; এ প্রয়োজন মিটা না পারলে খেলাধুলা থেকে খেলোয়াড়ের মন অনেকখ সরে আসে। বাঙ্গালী যুবকের চাকুরী জীবনে খেলা করা যে কি বিড়ম্বনা তার পরিচয় আমাদের একে

অজানা নেই। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ফুটবল খেলার উৎসাহ আর কতখানি থাকে! যাদের সারা রাত্রি কাজ করতে হয় তাদের অবস্থাও ভাবা দরকার। রাত্রে কাজ করতে হয় এমন খেলোয়াড় প্রথম বিভাগে কয়েকজন নামকরা রয়েছেন। এই অবস্থায় খেলোয়াড়দের কাছ থেকে খুব উচ্চাঙ্গের খেলা আশা করা আকাশের চাঁদ ধরে আনার আবদারেরই সামিল নয় কি? সংসারের আর্থিক অভাব পূরণ করতে গিয়ে খেলোয়াড়দের অর্দ্ধেকের বেশী উৎসাহ এবং শক্তি ব্যয় হচ্ছে। খেলাধূলায় আকর্ষণ কমে যাওয়ার ফলেই আমাদের দেশের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এতখানি নিম্নস্তরে নেমেছে। খেলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারলে খেলোয়াড়রা অনেক বেশী সময় এবং শক্তি নিয়োজিত করতে পারত, খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডও উচ্চাঙ্গের হ'ত। অন্য দেশে ফুটবল মরশুমে নিয়মিতভাবে খেলোয়াড়দের অনুশীলন খেলার ব্যবস্থা আছে। দলের ট্রেনার বা কোচ প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অনুশীলন খেলায় যোগদান করতে বাধ্য করান। খেলার পর তাদের জলযোগেরও ভাল ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এ সবের বালাই নেই বললে চলে। এই অনুশীলন খেলার উপর এখানে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। খেলোয়াড় অফিস থেকে সরাসরি খেলার মাঠে হাজিরা দিলেই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন। আমরা জানি ক'লকাতায় একাধিক ক্লাব আছে যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। অবাঙ্গালী খেলোয়াড় সংগ্রহে তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। সে অর্থ যদি বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের অনুশীলন খেলায় অভিজ্ঞ ট্রেনার আনিয়ে ব্যয় করতেন তাহলে বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত খারাপ হত না বরং ভালই হত। ভাল অবাঙ্গালী খেলোয়াড় দলে স্থান দিয়ে দলের অন্য খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির চেষ্টা করা দোষনীয় নয়। স্বেচ্ছায় কোন অবাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলতে চাইলে আমরা সানন্দেই তাকে গ্রহণ করবো। কিন্তু সখের খেলার মধ্যে আধা-পেশাদার খেলোয়াড়ের স্থান কোনমতেই পাওয়া উচিত নয়। বাঙ্গলা দেশের ভবিষ্যত ফুটবল খেলার কথা ভেবে এই দুই বিষয়ে সত্বর আলোচনা করা উচিত। (১) সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড় এই দুই পৃথক শ্রেণী বিভাগ করে খেলার ব্যবস্থা। (২) ফুটবল মরশুমে বৈদেশিক ফুটবল খেলোয়াড়ের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অনুশীলন খেলার ব্যবস্থা।

ফুটবল বিদেশী খেলা। আমাদের দেশের ফুটবল এসোঃ ও ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখানে ইংলণ্ডের মত কেন যে ফুটবল খেলায় পেশাদার খেলোয়াড়দের পৃথক স্থান হচ্ছে না তা বোঝা যায় না। খেলোয়াড়রা এ ব্যাপারে আন্দোলন আরম্ভ করলে যথেষ্ট কাজ হবে আশা করা যায়।



এস নন্দী
(বি এণ্ড এ রেল)



মোহিনী ব্যানার্জি
(বি এণ্ড এ রেল)

ফুটবল লীগ ঃ

লীগের খেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। কে লীগ পাবে এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের মধ্যে কেউ পাবে। ভবানীপুরের আশা পর পর দুটো ম্যাচ হেরে যাওয়ায় কমে গেছে তবে একেবারে হতাশ হয়ে যাবার মত নয়। মোহনবাগানকে হারানোর পরের থেকে ইষ্ট বেঙ্গলের খেলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তাদের ফরওয়ার্ড লাইন এখন বেশ শক্তিশালী; ভিজে মাঠে সুনীল, পাগসূলি ও আপ্পারাওয়ের খেলা দর্শনীয়। তুলনায় সুনীলই শ্রেষ্ঠ। আদান-প্রদান নিখুঁত; সটের তীব্রতা এখনও বজায় আছে। রক্ষণভাগও বেশ শক্তিশালী, ব্যাকের ও হাফে কাইজারের খেলা উল্লেখযোগ্য।

মোহনবাগানের ফরওয়ার্ড লাইনের দুর্ব্বলতা বার বার ধরা পড়েছে যার ফলে এক একদিন রক্ষণভাগের উপর বড় বেশী চাপ পড়ে। লীগের প্রথম ভাগে স্পোর্টিংকে ৪—০ যে টীম হারিয়েছিলো দ্বিতীয়ভাগে তারাই খেলার শেষ দিকে গোল দিয়ে তবে ড্র ক'রেছে। পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট ক'রেছে। তা ছাড়াও বহু সুযোগ ছিলো।

ভবানীপুরকে সমস্ত সময় চেপে রেখেও ফরওয়ার্ড লাইন গোল ক'রতে পারেনি। ব্যাকে শরৎ ও মান্না, হাফে আও, অনিল আর ফরওয়ার্ডে বুচির খেলা উল্লেখযোগ্য। মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের এখন সমান পয়েণ্ট আছে। ভবানীপুর যদি তাদের রক্ষণভাগের মত আক্রমণভাগ পেত তাহ'লে তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া কেউ আটকাতে পারতো না। ইসমাইল, তাজ এবং ডি পাল

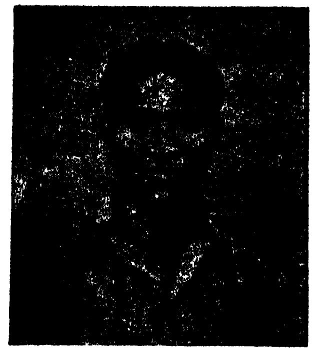
অনেক দিন পরে ক্যালকাটার খেলা দেখবার মত হ'য়েছে; তবে রক্ষণভাগ বড় দুর্ব্বল। ভিজে মাঠে ক্যালকাটার ফরওয়ার্ড লাইনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে আর শুকনো মাঠেও তাদের চেয়ে দর্শনীয় খেলা কেউ দেখাতে পাচ্ছে ব'লে মনে হয় না। তাদের আদান-প্রদান নিখুঁত আর সটের তীব্রতাও খুব বেশী। খেলার প্রথমার্দ্ধে তার ক্ষিপ্রতায় তারা ভারতীয় খেলোয়াড়দের



সুনীল ঘোষ



এস মান্না



টি আও

ফটো: শীতল ষ্টুডিও

এবার অদ্ভুত খেলা দেখিয়েছেন। ইসমাইলের খেলা অতুলনীয়; ক'লকাতা মাঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোলকিপার নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ফরওয়ার্ডে রবি ছাড়া কারো খেলা উল্লেখযোগ্য নয়। হাফ আরো দুর্ব্বল।

মহমেডানের খেলার সে জৌলুস নেই। তাদের ভাল খেলছে নুর, সাবু আর সিকান্দার।

সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দেয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাদের খেলা কিন্তু শিথিল হ'য়ে পড়ে। এর জন্যে রক্ষণ-ভাগই সম্পূর্ণ দায়ী। ভবানীপুর ও বি এণ্ড এ রেলদলের শক্তিশালী টীমকেতারা খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দু'খানা ক'রে গোল দিয়েছিলো কিন্তু ম্যাচ জিততে পারেনি।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপনিবেশ" (২য় পর্ব্ব)—২৲
বনস্পতি-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "ভোলানাথ কে ?"—২৲
শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত শিশু-উপন্যাস "মহারণ্যের বিভীষিকা"—১।৹
শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-গল্পগ্রন্থ "যুদ্ধের যুগে"—৸৴৹
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ প্রণীত "রাণা প্রতাপসিংহ"—৸৹
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত শিশু-উপন্যাস "আলোকের দেশ"—৸৴৹
শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মরু-প্রদীপ"—২৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা "চকমকি"—১৲
গিরীন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ইতিহাসের গল্প" (২য় ভাগ)—১।৹
শ্রীগৌরগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "বুকের ঋণ"—১।৹
শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রণীত রহস্যোপন্যাস "দেশের ডাক"—১৲
শ্রীশক্তিপদ কোঙার প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "অশ্রু"—১।৹
বনফুল প্রণীত নাটিকা "কঞ্চি"—১৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—"বাংলার দুলাল"—১৲ ও "গল্পাঞ্জলি"—১।৹
শ্রীমনোজ বসু প্রণীত উপন্যাস "সৈনিক"—৩।৹
অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী অনূদিত ব্যঙ্গ-নাট্য "গভর্ণমেণ্ট ইন্‌সপেক্টর"—১।৹
শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "অন্তরাল"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণি গাঙ্গুলী

শকুন্তলা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



ভাদ্র—১৩৫২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কর্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

পূর্বাভাস

গীতায় যে তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে—জ্ঞান ভক্তি কর্মযোগ—তা যে খুবই প্রাচীন—গীতার যুগেও প্রাচীন—সে কথা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উল্লিখিত হয়েছে। যা বহু পূর্ব হতেই ছিল, সে আবার নতুন করে রূপ নিল কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে। এই সুপ্রাচীন যোগ বিবস্বান্ সূর্যকে বলা হয়েছিল, মনু-ইক্ষ্বাকুরা জানতেন, পরবর্ত্তীকালের রাজর্ষিরা জানতেন, তারপর 'কালেন মহতা'—সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে গেল। সূর্য মৌন হ'য়ে আছেন, মনু-ইক্ষ্বাকু রাজর্ষিরা সব মৃত—কিন্তু একজন সাক্ষী আজও আছেন—যিনি গীতার এই উক্তির সত্যতার অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ দিচ্ছেন। সেই সাক্ষী বেদ—আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতম সঞ্চয়। এই বেদেরই অঙ্গীভূত, উপকণ্ঠে বা সামীপ্যে স্থিত উপনিষদের মধ্যে অনুসন্ধান করলে সেই অবলুপ্ত যোগের সন্ধান মিলবে।

তার আগে উপনিষৎ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ দুএকটি কথা জানতে হবে। বাংলা দেশে উপনিষৎ প্রায় অপঠিত, অবহেলিত, তাই ছোট্ট একটু ভূমিকায় তার পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'উপনিষৎ' নামে পরিচিত রচনাগুলির সংখ্যা অনেক হলেও পণ্ডিতদের মতদ্বৈধ নেই যে ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি বারোখানিই হল আসল উপনিষৎ, আর বাকি সব বহু পরবর্ত্তিযুগের রচনা। এই আসল উপনিষৎগুলি হয় একেবারে বেদেরই অঙ্গ, আর নয় তো অতি অল্পকালের ব্যবধানে বেদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ঋষিদের রচনা। মতদ্বৈধ নেই যে ঈশোপনিষদই প্রাচীনতম উপনিষদ।

বেদের কোন্ অংশ উপনিষৎ, বেদের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? বেদের প্রধানতঃ দুটি অংশ, এক হল 'মন্ত্র' বা দেবস্তুতি ও যজ্ঞাত্মক বচন, আর এক অংশ হল ব্রাহ্মণ',—কোন্ মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে প্রয়োগ করতে হবে, তার বিধিব্যবস্থাই বা কি রকম, এই সব। বেদমন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যা কবিতা, যা গান, আর যা গদ্য। যজ্ঞের সময় কবিতা বা 'ঋক্' আবৃত্তি করতেন হোতা, সঙ্গীত বা 'সাম' গান করতেন উদ্গাতা, আর গদ্য বা 'যজুঃ' পাঠ করতেন অধ্বর্যু। বেদের 'ব্রাহ্মণ' অংশের ভেতর এমন বেদাংশ আছে যা যজ্ঞবিধিও নয়, মন্ত্রও নয়, স্তবস্তুতিও নয়,—তারই সাধারণ নাম 'আরণ্যক' বা উপনিষৎ। 'আরণ্যক' এর নাম, কেননা এ ছিল অরণ্যবাসী তপস্বীদের জন্যে। এর যে প্রতিপাদ্য বিষয়,

তার জন্যে কোনো দেবায়তন ছিল না, যজ্ঞবেদী ছিল না, হোমাগ্নি ছিল না ; অনাড়ম্বর, নিরায়োজন, নিরুপকরণ সে-যজ্ঞ শুধু মনে মনেই, শুধু অন্তরের শ্রদ্ধায়, ধী ও মনীষায়। উদার তার ছন্দ, পুলকময় তার ভাষা, মৃত্যুবিজয়ী তার বাণী, অমৃতলোকের সে সন্ধানী। এ যেন অরণ্য তার আড়ম্বর-বিহীন শ্যামল অঙ্গুলি তুলে ধরেছে আকাশ পানে। কোনো বিশেষ দেবালয় গাঁথা হয় নি, কোনো বিশেষ পূজা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা নয়, শুধু অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে উপনিষৎ দেখতে চেয়েছেন সৃষ্টির পরমতম তথ্যকে, অন্তরতম আত্মাকে—ব্রহ্মকে, যিনি বাক্যমনের অতীত হ'য়েও আনন্দরূপে এই আকাশে পরিব্যাপ্ত, যাঁকে আশ্রয় ক'রে আছে সকলে, অথচ কেউই যাঁকে অতিক্রম ক'রে নেই, যিনি বৃক্ষের মতো একাকী এই আকাশে স্তব্ধ হ'য়ে আছেন, যাঁর দ্বারা এই যা কিছু সমুদায় পরিপূর্ণ। এমন প্রাচীন হ'য়েও সকল যুগের সকল ধর্মের মানুষের জন্যে উপনিষদের দুয়ার খোলা। কোনো দীক্ষা নিতে হবে না, কোনো ধর্মকে ছেড়ে আসতে হবে না, কোনো বিরোধের সঙ্গে সত্যই নেই—যেমন আছ তেমনি বেশে যখন খুশি এসো, কোনো বিধিনিষেধ, বাচবিচার নেই—শুধু পবিত্র মনে এসো, সংযত চিত্তে এসো, অন্তরের শ্রদ্ধায় এসো। উপনিষৎ মানুষকে আহ্বান করেছেন এক অন্তর্গূঢ়লোকে, যেখানে কবির অনুভূতিই দেখতে পারে,—এমন এক অমৃতলোকে যার আনন্দ সর্বদেহে, সর্বমনে,—ছন্দে ছন্দে সমস্ত আকাশ প্লাবিত ক'রে, গ্রহে উপগ্রহে, তারায় তারায়, সমগ্র বিশ্বচরাচরে হিল্লোলিত—যেখানে যা-কিছু-গতিশীল, যা-কিছু চলমান—সমস্তই সেই ব্রহ্ম হ'তে নিঃসৃত হ'য়ে তাতেই আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে, তাঁরই বিরাট প্রাণের হোমাগ্নিতে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সমস্ত প্রাণশিখা নিশিদিন কম্পিত হচ্ছে। মানুষের মনীষায় এত বড় কাব্য সাহিত্য, এমন ধারা রচনা আর কোনোদিন রচিত হয় নি।

এরি মধ্যে প্রবেশ করতে হবে কর্মযোগের প্রথম বাণীর অনুসন্ধানে। ভেবে দেখো কত সহস্র বর্ষের ব্যবধান,—আজও যা সঠিক নিরূপণ করতে মানুষ পারে নি,—তারই ওপার হ'তে ভেসে আসছে আমাদের পিতৃ-পিতামহগণের কণ্ঠস্বর ;—মনে রেখো, কত স্মরণাতীত কাল ধরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পিতা হতে পুত্রে এই মৃত্যুহীন বাণী সঞ্চারিত ক'রেছিলেন আর সকল বাণীকে উপেক্ষা ক'রে,—খ্যাতি নয়, সম্মান সম্পত্তি নয়, গর্বোদ্ধত সভ্যতার ইতিবৃত্ত নয়, সমস্ত নশ্বরতা তুচ্ছ করা এই বাণী। স্বর্গত পিতৃদেবের আলেখ্য, পিতামহের পদচিহ্ন তুলট কাগজে ধরা,—এ সব কত শ্রদ্ধায় মাথায় রাখি। সে সবের তুলনায় কত সহস্রগুণ শ্রদ্ধাই সুন্দরতম পিতৃপিতামহগণের এই বাণী! অস্পষ্ট মধুর জলোচ্ছ্বাসের মতো এই বাণী শোনায় ঈশোপনিষৎ—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

এ জগতে যা কিছু ঘটছে, যা কিছু আসছে আর চলে যাচ্ছে, যা কিছু পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, সমুদায়কে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করতে হবে। তিনিই দিয়েছেন এই জেনে ভোগ করবে, কারো ধনে লোভ করবে না। জগত্যাং জগৎ—চলন্তের মধ্যে যা চলন্ত। এই যে সংসার, এ কেবলি সরে যাচ্ছে, ঘূর্ণায়মান রঙ্গভূমিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য পাল্টাচ্ছে। এখানে কাকেও স্থির থাকবার জো নেই, কাকেও আঁকড়ে থাকলে চলবে না, সবাইকেই ছাড়তে ছাড়তে চলতে হবে। ধাবমান এই রথের মধ্যে কেউই স্থির হয়ে বসে নেই। চলার মধ্যে এই যে চলন্ত, গতিময় আবেষ্টনের মধ্যে এই যে গতিশীলতা, সে হল উপনিষদের ভাষায় জগত্যাং জগৎ। তাদের সকলকে ঈশ্বর দিয়ে ঢাকতে হবে। এ কেমন? ঢেউএর পর ঢেউ এসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে, যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলি তরঙ্গের পর তরঙ্গ। এদের কেউই স্থির নয়, সবই দুলছে সবই চলছে, বালুকাময় সৈকতে এসে লুটিয়ে পড়ছে। সমুদ্র কোথায়? তরঙ্গের অন্তরালে সে আত্মগোপন ক'রে আছে, তাকে তো দেখান যায় না। কিন্তু জানি এই শত লক্ষ কোটি ঢেউ, তাদের ফেনশীর্ষ ফণা সব কিছু নিয়েই সমুদ্র, সমুদ্র দিয়েই এরা ঢাকা। তেমনি ঈশ্বর। তেমনি এই বিশ্ব-চরাচর—সে কেবলি দুলে দুলে উঠছে, কেবলি ঢেউএর পর ঢেউ, কেবলি আসা আর যাওয়া। তাদেরই অন্তরালে আছেন ঈশ্বর, তাই তাঁকে দেখাই যায় না। তবু তিনিই এই, এই সকলই তিনি। একেই বলে ঈশা বাস্যং—ঈশ্বরের দ্বারা ঢাকা।

জগৎ চরাচরকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি, তাঁর বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই। অথচ এ সবে তিনি নির্লিপ্ত। 'ন কর্ম লিপ্যতে নরে'—কর্মযোগের এই প্রথম বাণী এখনি আমরা আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে ঈশ্বরের নির্লিপ্ততা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এ নির্লিপ্ততা কেমন? ঐ তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের মতো। তরঙ্গ কি তাকে দোলাতে পারে, টলাতে পারে? তরঙ্গ সমুদ্রের গায়ে গায়ে লাগা, অথচ তাতে সে জড়িয়ে পড়ে নি, সে নির্লিপ্ত। ঢেউগুলি তার গায়ে আঠার মতো লেপ্টে নেই, তারা সব আসে আর চলে যায়, তাদের অন্তরালে মহাসাগর স্থির, ধীর, নির্লিপ্ত। তেমনি এই বিশ্বচরাচরের কোনো কর্মচাঞ্চল্য বিশ্বস্রষ্টার চঞ্চলতা ঘটায় না—ধ্যানের নেত্রে তাঁর এই রূপটি মানুষের ধারণা করতে হবে, মানুষকে তাঁরই অনুসরণ করতে হবে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতাং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কাজ করতে করতেই এ জগতে শত বৎসর বেঁচে থাকবার ইচ্ছা করবে। আর কোনো রকমে নয়, এমনি ভাবে কাজ করলে মানুষকে কাজ আর লিপ্ত করবে না। কেমন ভাবে কাজ করবে?—আগে সব আভাস দেওয়া হল, তেমনি ভাবে। ঈশ্বর যেমন অতন্দ্রিতে এই জগৎ চরাচরের কাম্য-বিধান করে চলেছেন, যা-কিছু মানুষ ভোগ করে সে তাঁরি ত্যাগের দান,—মানুষকেও তেমনি তাঁরি অনুসরণে কাজ করতে হবে, তাকেও ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। এমনি ক'রে কাজকে যদি কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করো, কাজ আর তোমাকে লিপ্ত করবে না। কর্মফল তোমাকে আর জড়াবে না, টলাবে না, কর্ম আর তোমার কোনো বন্ধন রচনা করবে না। এই জরামরণশীল, দুঃখকষ্টে

জর্জরিত সংসারে শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করবার সাহস আছে কার?—যিনি যথার্থ বীর, বলিষ্ঠ যাঁর মন, যিনি যথার্থ প্রেমিক, যাঁর প্রেম আপনাকে অতিক্রম ক'রে প্রতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মানুষই চাইতে পারে দীর্ঘতম পরমায়ু, যাতে তার কাজের দান ক্ষুদ্র না হয়। যে ভীরু, অপরের ভাল করবার দায়িত্ব নিতে তার ভয়, সেই চাইবে পালাতে। মৃত্যুর মধ্যে, আত্মহত্যার মধ্যে কি বীরত্ব আছে? উপনিষদের এই বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের শিক্ষা স্বদেশের ও বিদেশের বহু কবি তাঁদের রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরাজ কবির কয়টি লাইন উদ্ধৃত করছি—

'Teach me to live!' 'Tis far easier to die
Teach me the harder lesson—how to live,
To serve Thee in the darkest paths of life,
Arm me for conflict new, fresh vigour give
And make more than conqueror in the strife."

আমাদের দেশের শিক্ষা নিয়ে ওদেশের লোক হল কর্মবীর, আর আমরা হয়ে রইলাম কর্মত্যাগী পলাতক, এটিই হল বিধাতার নিষ্ঠুরতম বিদ্রূপ।

এক ধরণের স্বার্থপরতা আছে যা কুষ্ঠের চেয়েও ঘৃণ্য,—দুষ্পূরণীয় ভোগাকাঙ্খা। এই হ'ল মঙ্গলেচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী,—এও অনলস, অতন্দ্রিত, সব কিছুকে এ নিজের দিকে টানে, আয়োজনের পর্বত-প্রমাণ আড়ম্বরকে এ পিঠে বেঁধে চলে, এর শাণিত নখদন্তের আস্ফালন হিংস্র পশুকেও হার মানায়। যযাতির ছিল এমনি ধারা বৈষয়িকতা, এমনি উগ্র ভোগাকাঙ্ক্ষা—তাই নিজের যৌবন শেষে পুত্রের যৌবন ধার করেছিলেন। অতি ভয়াবহ হল তার পরিণাম। ভোগেচ্ছা আত্মকেন্দ্রিক, কল্যাণেচ্ছা বহিঃকেন্দ্রিক। ভোগের পুঞ্জীভূত উপকরণ গুরুভার হয়ে পিঠে ঠেসে বসে, কেননা অন্তরের আকর্ষণ যতই তীব্র হবে, অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে ভারও ততই গুরু হবে। তাতে মানুষের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে, মনুষ্যত্ব ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হয়, সমস্ত রুচি, সমস্ত শ্রী, সব উৎকর্ষ চিরদিনের মতো নাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কল্যাণের টান বাইরের দিকে। ভারকে সে লাঘব করে, কর্মকে সে মুক্তি দিতে দিতে চলে।

এই যে স্বার্থপরতা, এই যে বৈষয়িকতা, উপনিষৎ একেই বলেছেন 'অবিদ্যা'। জ্ঞান থাকলে মানুষ কখনো নিজের পিঠের ভার এমন ক'রে বাড়ায় না, আয়োজন বাহুল্যের ষ্টিম রোলারের চাপে নিজেকে এমন ক'রে পিষে মারে না,—তাই চরম স্বার্থপরতা যে অজ্ঞানতায় প্রসূত তারই নাম 'অবিদ্যা'। উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যায় রত তারা অন্ধতমসায় প্রবেশ করে। অকল্যাণই সেই অন্ধকার, সর্বনাশই সেই তমঃ। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য কথা উপনিষৎ বলেছেন, যে যারা বিদ্যায় রত তারা আরো গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

ভোগতৃষ্ণায় অন্ধ ক্রূরকর্মার দুষ্টচেষ্টাসকলের মধ্যে যে মূর্খতা আছে, তার চেয়েও বেশী মূর্খতা পাণ্ডিত্যের। যারা কোনো কিছুই করল না জীবনে, কেবল পড়েই চলেছে, পড়েই চলেছে,—কি লাভ হল দুনিয়ার তাদের সেই পড়ায়? শুধু তাদের পাণ্ডিত্যাভিমান বেড়ে চলল, ভোগীর দাম্ভিকতার মতো এও তো সমান ঘৃণার্হ। কিন্তু তাই ব'লে কাজকর্ম বিসর্জন দিতে হবে নাকি, জ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিতে হবে নাকি? না, তা মোটেই নয়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, কাজও যেমন মানুষের চরম লক্ষ্য নয়, জ্ঞানও তেমনি মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। কাজ আর জ্ঞান মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার পথ। ভক্তি তেমনি আর একটি পথ। পথ যদি মানুষের লক্ষ্য হয়, তবে তো আর পৌঁছানোই ঘ'টে ওঠে না। সুতরাং কর্ম আর জ্ঞান লক্ষ্য নয়, এরা উপলক্ষ। চরম লক্ষ্য তবে কি? চরম লক্ষ্য হল উপনিষদের ভাষায় 'অমৃতম্'। যা মানুষকে পদে পদে ছোট করছে, পদে পদে মারছে, সেই সব ক্ষুদ্র বৃহৎ মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে, যেখানে আর মৃত্যু নেই, নীচতা নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে সব কিছু বিরাট, সব কিছু মহৎ, সব কিছু উদার, অনন্ত—উপনিষৎ তাকেই বলেছেন ভূমা, এই ভূমাই ব্রহ্ম, এই ভূমাই অমৃত। নদী যখন দুই তীরে মঙ্গলবর্ষণ করতে করতে সাগরে এসে পড়ে, তখন তার যা কিছু আছে সমস্তই সে মহাসাগরকে সমর্পণ ক'রে দেয়। তেমনি ক'রে মানুষকেও তার সংসারের, সমাজের, দেশের, পৃথিবীর মঙ্গল করতে করতে তার যা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ ক'রে দিতে হবে। যে-নদী সাগরে মিলল তার আর মৃত্যু নেই, তার স্রোত আর কোনোদিন শুকিয়ে যাবে না। তেমনি যে-মানুষ ব্রহ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছে, তারও আর মৃত্যু নেই, সে অমৃতকে পেয়ে গেল। নদীর লাল জল কণায় কণায় সমুদ্রের নীলের সঙ্গে মিশে যায়, এমনি ক'রে সে তিলে তিলে সমুদ্র হ'য়ে উঠছে। এই সমুদ্র হওয়ায় তার শেষ নেই। তেমনি মানুষকেও ব্রহ্ম হয়ে উঠতে হবে, এ হওয়ায় আর তার শেষ নেই। এই ভাবটি অতি অনবদ্য ভাষায় গীতা প্রকাশ করেছেন—ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। আমাদের আর সব মিলনের শেষ আছে, পরিসমাপ্তি আছে, তারপর বিচ্ছেদ। কিন্তু ব্রহ্ম মিলনের শেষ নেই, তাই বিচ্ছেদও নেই। এমনধারা মানুষ ক্রমাগতই ব্রহ্ম হ'য়ে হ'য়ে উঠছে, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

কর্ম আর জ্ঞান এর কোনোটিই মানুষের লক্ষ্য নয়, একথা জানতে হবে। কর্মকেও ছাড়লে চলবে না, জ্ঞানও অপরিহার্য। অমৃতের সন্ধান এরাই দেবে সে-কথা বোঝা চাই। উপনিষৎ তাই বললেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যিনি জ্ঞান ও অবিদ্যা উভয়কে এক সঙ্গে জানেন, তিনি অবিদ্যার (অর্থাৎ কর্মের) দ্বারা মৃত্যুকে তরণ ক'রে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতলাভ করেন।

যস্তদ্বেদ উভয়ংসহ,—যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কেই একসঙ্গে জানেন, মানে যিনি জ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে কাজ ক'রে যান, আবার কর্ম যাঁর জ্ঞানের পরিপোষক। যে-ব্যক্তি একান্তভাবে সংসারে রত, তার যত কাজ সব

নিজের জন্তে। সে জানে না স্বার্থপরতন্ত্রতায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হবে। জ্ঞান তাকে কাজের পথ দেখিয়ে দেবে। মানুষের বুদ্ধি যতই উৎকর্ষতা লাভ করবে ততই সে বুঝবে তার কর্ত্তব্য। জ্ঞানের আলোকে তার চিত্ত যতই আলোকিত হবে, তার মনের উদারতা ততই বাড়বে, সঙ্কীর্ণতা ততই দূরে সরে যাবে। তার প্রেম ততই প্রসারতা লাভ করবে। সঙ্কীর্ণচেতা মূর্খের প্রেম শুধু আপনাকে নিয়ে, জ্ঞানীর ভালবাসা সমস্ত মানুষে ছড়িয়ে আছে। কে না জানে, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, জাতিকে জাতিতে মনোমালিন্য, স্বদেশী-বিদেশীর মনোমালিন্য—সবই অজ্ঞানতার পরিচায়ক। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে যতই পারব, নিজের যা কিছু সব ততই তাদের দেওয়া সহজ হবে, আনন্দময় হবে। যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে দেওয়া মানেই যে পাওয়া। পিতা পুত্রকে অঞ্জলি ভ'রে দেন কেন, প্রেমিক তার প্রিয়তমার জন্তে উপহার আনেন কেন? এই দেওয়ার মাঝেই যে আনন্দ আছে, কারণ এখানে যে প্রেম আছে। যখন এই ভালবাসা শুধু আত্মীয়-স্বজনে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে, তখন আমাদের কাজ হবে তাদের সবাকার সুখবিধানের জন্তে। একেই বলে মঙ্গল, একেই বলে কল্যাণ। কাজ তখন কল্যাণ মূর্ত্তিতে দেখা দেবে। আবার জ্ঞান তখন শুধু নীরস পাণ্ডিত্য হয়ে থাকবে না, যা পড়ব, যা শিখব, সমস্তই নিয়োজিত করব কল্যাণে। একেই বলা, যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে তরণ ক'রে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতকে পাওয়া,—সে কেমন? মৃত্যু-বৈতরণীর পরপারে অমৃত আছে, মানুষকে এই মৃত্যু-নদী পার হয়ে যেতে হবে, তবেই তার অমৃতে প্রবেশলাভ ঘটবে। সাধারণ মানুষ কাজ করে, তার ফলটি পাবার জন্তে। কাজের ফলগুলি তার পিঠের বোঁচ্‌কায় জমে ওঠে, এই বোঁচকা নিয়ে সে যখন মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়ায়, মরা তার একবারেই শেষ হয় না। মৃত্যু বলে, যাও আবার নবজন্মে ফিরে যাও, যে-ফল পিঠে বেঁধে এনেছ সেটুকু ভোগ ক'রে এসো। এমনি ক'রে কেবলি তার বাঁচা, আর কেবলি তার মরা। মানুষ যদি মৃত্যুকে বলে, দাও না আমায় তোমার ঐ নদীটুকু পার ক'রে,—মৃত্যু বলে—না বাপু, এখান থেকেই তোমায় ফিরতে হবে, তরণ করা চলবে না। বোঁচ্‌কা নিয়ে তরীতে ওঠবার হুকুম নেই। কিন্তু যিনি কর্মফল নিজে নেন না, যিনি তাঁর যা-কিছু-সব ব্রহ্মে সমর্পণ করেছেন, তিনি ঝাড়া-হাত-পা। একেবারেই তরীতে এসে উঠে বসেন। মৃত্যুকে তরণ ক'রে অমৃতলোকে যাবার একমাত্র অধিকারী তিনি। এই যে সর্বকর্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করে দিয়েছেন, এ কেন? কারণ তিনি যে জ্ঞানী, তিনি যে জানেন, বোঝা পিঠে রাখতে নেই। তাই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি অমৃতলোকে চলে যান,—বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে।

উপনিষদের কয়েকটিমাত্র শ্লোক উল্লেখ করেছি, কেন না পুঁথি বাড়াতে চাই না। এই শ্লোকগুলির নিহিতার্থ অত্যন্ত সুকঠিন। হিমাদ্রি-শিখরে পরিবেষ্টিতা গঙ্গার মতো ভাব এখানে দুরূহ বাধায় বেষ্টিত। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্তলোকে এনেছিলেন। পাঞ্চজন্যের শঙ্খনিনাদে জটিলতার সহস্র বন্ধন ছেদন ক'রে নররূপী নারায়ণ ভগীরথের মতোই উপনিষদের গিরিশৃঙ্গ হ'তে কর্মযোগের বাণীকে আমাদের চিত্তমধ্যে প্রবাহিত ক'রে গেছেন। যদি গীতা না থাকত, কে বুঝত এই কর্মযোগের বাণী? গীতা উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্য। এত বড় ভাষ্য,—যা উপনিষদের সমান আসনের দাবী করে। তাই এর নাম গীতোপনিষৎ। উপনিষদে যা ছিল আভা, গীতায় তাই হয়েছে আলো, যা ছিল বীজ, গীতায় তাই হয়েছে মহা মহীরূহ।

শরৎ

কাদের নাওয়াজ

দুর্দ্দিন আজ, তোমারে শরৎ!
তবু যে বরণ করি,
কি দিব অর্ঘ্য মোরা যে এবার
অনশনে প্রায় মরি।
কুঞ্জে তোমার মধুপের গীতি,
শুনি জাগে হৃদে অতীতের স্মৃতি,
যেদিন তোমায় প্রাণের আসন
দিয়েছি আমরা কত না সুখে,
সেদিনের সেই স্মৃতিগুলি আজি
সায়কের সম বিঁধিছে বুকে।

ছাতিম্ হিজল শিউলি ফুটিছে,
ভুঁই চাঁপা বনে হাসিছে একি?
কি বলিব হায় মোদের নয়নে
শুধু সরিষার ফুল যে দেখি।
জানি শারদার বাহন তুমি,
তাই আবাহন বঙ্গভূমি—
দিতেছে তোমারে সাদরে শরৎ
দীন কবি শুধু অশ্রু ফুলে,
পাঠায় তোমায় প্রাণের অর্ঘ্য
গ্রহণ করিতে যেও না ভুলে।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

কাজ শেষ করে মাণিক দাঁড়িয়ে আলিস্যি ভাঙ্গিল।

ডাক্তার এসে পড়লেন। কি হে, হয়ে গেছে নাকি? আমিও যে ঐ চিন্তা নিয়েই ছিলুম।

মাণিক। "আপনার এক চিন্তা নয়, ঠোকাঠুকি হবে। ওটা আমার মাথায় ছেড়ে দিন।"

'আচ্ছা try, আমাদের জন্যে Free passage থাকলেই হ'ল, not for others—"

"সে ঠিক আছে মশাই। আমি এখন রাঁধতে যাই। ডাল-রুটি, আর মাছ-ঝাল-দে—কি বলেন?"

Grand—একদম মল্লিক বাড়ীর menu—শরীরটেও হালকা বোধ হচ্ছে বেশ। আজ আর রামমোহন নয়—তাঁর "শেষের সে দিনও মনে" কই থাকতে নয়। এটা রবীন্দ্রনাথের যুগ—

"আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জে"—তার পর কি?

"আজ্ঞে আমার তো—"

"আচ্ছা হো যায়গা—মালাক্কার মাছি গুঞ্জে। না auther's own 'অলিই' better—কি বলো—"

"আজ্ঞে তাই থাক্।"

বিনোদ মাথা চুলকে—মেলাতে হবে তো—

"ধাক্কা দেয় বীণার ঝঙ্কার
রক্ষা করো সাধু স্বর্ণকার।"

মাণিক বিনোদের পায়ের ধুলো নিয়ে—"আপনার যে কি আসেনা মশাই সেইটাই বুঝলুম না। বহু ভাগ্যে আপনাকে পেয়েছি, এর পর সব শুনবো, এখন তবে—"

"আচ্ছা যাও, কিন্তু—বেশী ঝাল দিও না লঙ্কার।"

"কি সুন্দর, এর পর আর ছেড়ে যেতে পারব না Sir"

ডাক্তার সুর সংযোগে মন দিলেন। Fortunately তন্দ্রাসুর ঘুম পাড়িয়ে থামালে।

* * *

খেতে বসে—

বিনোদ। ডালটার তোফা সুগন্ধ ছেড়েছে হে। না না চাচ্ছি না, দিতে হবে না—রাত্রে আর বাড়ের দিকে যেও না—

মাণিক। তাই একটা কথা আজ দু'দিন থেকে ভাবছি—

বিনোদ। মাথা থাকতে ভাবনা আমাদের যাবে না হে। বড়দের মাথা নেই—বেশ আছেন সব, হেডের কাজ হাটেই চলে। হ্যাঁ, কি বলছিলে বলোদিকি—

মাণিক। দেখছি আর ভাবছি, এখানে আপনার শোবার বড় অসুবিধে, খাটিয়াখানা ছেলেদের দোলা খাটাবার মতই কিনা—

বিনোদ। You mean short and shallow এই ভাবনা? আর তোমার slingএর ব্যবস্থা দেখে আমার সুধু ভাবনা নয়—দুর্ভাবনা যে। যুধিষ্ঠিরের শিন্নি রয়েছে সঙ্গে, প্রসাদ-লোভী ভক্ত ঢুকলে—ঘুমের ঘোরে চট্ করে উঠতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজেই না ফেঁসে যাও। তখন তোমায় ছাড়াই, না ভক্তকে তাড়াই।

মাণিক। ছালে হাঁটু ঠ্যাকে বলেই ওটা উঁচু দিকে পায়ের support মাত্র, দড়িটে শক্ত নয়—টান সইবে না, ভয় নেই। যাক্, বলছিলুম কি Trainখানা তো জখম্ হয়ে এখন invalid, 2nd classএ তোফা কুশন পাতা—

বিনোদ। ওঃ 2nd classএ গিয়ে শোবার কথা? ও নামটি মুখে এন না মাণিকলাল। ওতে বড় ঠকেছি। ওরা চুপটি মেরে থাকে, চললে—জেলের cell পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়। গাড়িগুলো এখন সরকারের প্রাণ নাড়ী, ভাঙা ফুটোর question নেই। টান পড়লেই চাঙ্গা। রাতারাতি কোথায় পাড়ি মারবে বিশ্বাস নেই। বড় দাগা দিয়েছে—

মাণিক। সে আবার কার?

বিনোদ। সে অনেক কথা। পিটিসন পকেটে করে বাঙালী চাকরির জন্যে যমের বাড়ীও যায়। সবার মুখেই

শুনলুম—বিদেশে চণ্ডীর কৃপা—অর্থাৎ চাকরির। যা করতে বাঙালী জন্মেছে। বর্ম্মায় নাকি তার ছড়াছড়ি। তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনে পাড়ি মারলুম। লেগেও গেল রেলের ডাক্তারী। ভাগ্য সঙ্গেই ছিল, সেখানের messএ স্থানাভাব, শোবার কষ্ট, দাঁড়িয়ে পাশ ফিরতে হয়। দেখতুম—সেখানেও একখানা Engine-শূন্য মুণ্ডুকাটা গাড়ি, দেড় মাস sidingএ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, নড়ে না। আর পায় কে! কাকেও না বলে 1st class কুশনে গিয়ে গা ঢাললুম। উপবাসী নিদ্রা পোষাই ছিল, আড় হতেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে নিদ্রার competition চট্ করে সুরু হয়ে গেল—

মাণিক। তার পর?

বিনোদ। তার পর বামনের ভাগ্যে যা ঘটে। ঘুম ভাঙলে দেখি, লোকজন ছুটোছুটি করছে সবাই ব্যস্ত—মস্ত station! কি ব্যাপার! স্বপ্ন-নাকি? তাড়াতাড়ি উঠে রাগখানা নিয়ে নামতেই একজন বার্ম্মিজ্ টিকিট্-কলেক্টর টিকিট চাইলে। টিকিট কোথায়—তায় আবার 1st class passenger! সে কথা শোনে কে? 1st class এর ভাড়া এবং ইত্যাদিও চাই। পকেটে হাত দিয়ে দেখি হাতটা গলে' একদম হাঁটুতে ঠেকলো! জিভটেও তেলোয় উঠলো—পকেট সুদ্ধ পাচার! কাল যে মাইনে পেয়েছি। দিনে অন্ধকার দেখলুম। টেনে নিয়ে গেল SMএর 'স্টেসন মাষ্টারের' কাছে। তিনি নাম ধাম পেশা সব শুনে হ্রেসা রবে হো হো করে হেসে বললেন "পাক্কা চোর।" তখন পুলিসে সোপর্দ্দো।

মাণিক। বলেন কি! একখানা টেলিগ্রাম—

বিনোদ। দাম কোথা, তখন সব তো গয়াধামে হে!

মাণিক। সর্ব্বনাশ, তার পর—

বিনোদ। তার পর আর শুনে কাজ নেই—সে এক মহাভারত, অন্য দিন শুনো; এখন sideএর নিরীহ silent গাড়িতে আমাকে আর কুশনে শুতে বলো কি?

মাণিক। না মশাই, কোনো অবস্থাতেই নয়।

বিনোদ। মা তখন বেঁচে ছিলেন—ছেলের চিন্তা নিয়েই থাকতেন। জগতে ওই একজনই "ছেলে সর্ব্বস্ব" থাকেন। আমার কল্যাণ কামনায় কেঁদে কেঁদে তখন যেতে বসেছেন। চিঠি পেয়েও আমি অতটা খেয়াল করিনি। বাঙালীর চাকরির চেয়ে বড় দুনিয়ায় যে আর কিছু নেই। আছে কি?

মাণিক। বোধ হয় নেই—

বিনোদ। আবার বোধ হয় লাগাও কেন? মাস গেলেই হাতে হাতে ফল প্রাপ্তি, বাঁধা বরাদ্দ

মাণিক। আজ্ঞে তা ঠিক

বিনোদ। শুধু ঠিক নয়—সত্য কথা; কিন্তু তার উপরও মায়ের চোখের জল আছে, সেই আপিসে সব ধুয়ে দেয়। মায়ের পত্র আপিসে এসে পড়েছিল—পেলুম লিখেছেন—"চোখে ঝাপসা দেখছি বাবা, এলেও যে আর তোর মুখ দেখতে পাব না" কিন্তু মনটা বিগড়েই ছিল। আপিস কর্ত্তার সহানুভূতিও এগিয়ে এল। দয়া করে পরম আত্মীয়ের মত জিজ্ঞাসা করলেন—সব ভালো তো ডাক্তার? অবস্থা শুনে বললেন—"ইস্ ছেলের তো যাওয়াই উচিত এবং আমারো উচিত তোমাকে ছুটি দিয়ে সাহায্য করা। এখন মার কাছে থাকাই ছেলের কাজ।" ইত্যাদি—তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ পেয়ে আমি চাকরিতে রিজাইন করলুম। বাহবা পড়ে গেল। তিনি খুব খুশি হয়ে সার্টিফিকেট দিলেন। বললেন, তোমার উপকার করতে পেয়ে আমি ধন্য হলুম। অর্থাৎ তাঁর বেকার সম্বন্ধীর উপায় হল। তিনি বাঁচলেন, আমিও মরে বাঁচলুম।

মাণিক। মরে বাঁচলুম মানে?

বিনোদ। 'চাকরি-ছাড়া" মানেই বাঙালীর মৃত্যু বরণ করাতো। যাক্। মা সত্যিই আমাকে আর চোখে দেখতে পাননি। গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনেক করে দেখেছিলেন "এই যে তোর সে জড়ুলটি রয়েছে।" তাতেই তাঁর কি আনন্দ। সে মা আমার আর নেই মাণিক!

বিনোদের চোখে জল এলো।

তার পর মা মাস দুই ছিলেন। তাঁর শেষ কথা—"সদ্বংশের একটি বড় মেয়ে দেখে বিয়ে করিস, মা কালীর পাদপদ্মে থাকিস, তোর ভাল হবে—বড় হবি। কিন্তু গরীব দুঃখীদের যত্ন করে দেখিস বাবা—পয়সা নিস নি—পয়সা বড় নয়—"

বলেছিলুম—"পয়সা নেব না, তবে বড় হব কি করে মা?" বললেন—"তাঁদের আশীর্ব্বাদেরে। দীন দুঃখীর

আশীর্ব্বাদ অন্তর থেকে আসেরে, সেটা মুখের কথা নয়। সে নিষ্ফল হয় না বাবা। টাকা আপনি আসবে।"

তাই তো দেখছি মাণিক।

মাণিক। বলতে ভুলেছি, যুধিষ্ঠির যে অস্থির করলে, 2nd Instalment দুয়ের কিস্তি পাঠিয়েছে—

বিনোদ। (অন্যমনস্কভাবে) যুধিষ্ঠির বেটাই মাথা খেলে দেখছি। মাথা ঘুলিয়ে মায়ের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

মাণিক। সে তো গরীব দুঃখী নয়, তার ঘরের টাকাও নয়।

বিনোদ। সত্যি মিথ্যে বুঝতে পারছি না, মনটা আজ ঠিকানায় নেই মাণিক। বড় সন্দেহে পড়েছি, মহাপাপ করেছি—

মাণিক। কি বলছেন বুঝতে পারছি না sir—

বিনোদ। আমিও পারছি না, তবে অপরাধটা বুঝতে পারছি। Too late না হয়।

মাণিক। দয়া করে খুলে বলুন, আমি যে—

বিনোদ। শোনো—তোমাকে না বলে আমার শান্তি নেই। স্টেসন থেকে বেরবার সময় যেন মায়ের আওয়াজ পেলুম, ঠিক আমার মায়ের গলা। চমকে চেয়ে দেখি—একটি বছর দশেকের মেয়ে—একটি বৃদ্ধাকে হাত ধরে নিয়ে চলেছে। বৃদ্ধা বলছেন—"কই কোনো খবর তো পেলুম না রাণী, গরীবের যে কেউ নেই মা—আমার বিনুর কি হবে!" একি ?—মেয়েটি বললে—"রামজি তো হ্যায়!"

আমি কথা না কয়ে পারলুম না। প্রাণটা তখন তোলপাড় করে দিয়েছে। মেয়েটি হ্যাট্‌কোট্‌-পরা লোক দেখে ভয়ে তার মায়ের পেছনে সরে গেল। বৃদ্ধা আকুল-কণ্ঠে বললে—"বাবা আমার সর্ব্বস্ব যায় আমার ঐ এক ছেলে বিনোদীলালের হায়জা হয়েছে বাবা, আমার আর কেউ নেই—চক্ষুও নেই, আমি তার অন্ধ মা। ডাক্তার সাহেবকে খুঁজে পাচ্ছি না বাবা। কেই বা খুঁজে দেবে।" সে কি হতাশ ধ্বনি!

তাঁকে বললুম—"সন্ধ্যা হয়েছে বাড়ী যাও। ভেব না, সকালেই ডাক্তার যাবে, আমি পাঠিয়ে দেব। রামজি ভাল করে দেবেন মা, ভেব না।" তাঁর আশীর্ব্বাদ আর চোখের জল নিয়ে এসেছি, ঠিকানাও নিয়েছি—এই কাছেই। মনটা সেই মায়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছে মাণিক। কি হতভাগা ছেলেই হয়েছিলুম। বিপদে পড়ে তাঁকেই আসতে হ'য়েছে। এখন কটা বেজে থাকবে, রাত্রেই একবার যাব নাকি ?

মাণিক। ঘটনাটা আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে বটে, তার ওপর নিজেদের অপরাধও রয়েছে। যে ভাবেই হোক্—মন যখন সাড়া পেয়েছে, ভাববেন না। রাতে গিয়ে বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। সকালেই যাবেন। ওদের নাড়ীতে আমাদের নাড়ীতে অনেক তফাৎ—সহজে বেগড়াবে না।

মাণিকের শেষ কথাগুলি বিনোদের ভাল লাগছিল না। বললে "আচ্ছা যাও, খেয়ে শুয়ে পড়। আমি আর খাব না। সকালে খালি পেটে যাওয়া হবে না—চা আর বিস্কুট খেয়ে যাব। তুমিও যাবে। ওষুধপত্র সব যেন ঠিক থাকে।"

মাণিক। এখন রাত প্রায় দশটা, সকাল হতে এখনো ৮।৯ ঘণ্টা দেরী। কিছু খেতে হবে বই কি—যা পারেন।

খেতে বসে মাণিক বললে—"কিছু মনে করবেন না sir, আমি আজ সপ্তাহ ধরে আপনাকে বার করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিলুম। কাল সকালে যেমন করে হোক নিয়ে যেতুমই। কি জানি কখন কি ঘটে যাবে, তখন আর"—

বিনোদ আজ ও কথার উল্লেখ সইতে পারছিল না। সত্যের কামড় সাপের কামড়ের চেয়েও সাংঘাতিক।—"আচ্ছা থাক্" বলে উঠে পড়ল।

মাণিক। দুধটা যে—

বিনোদ। থাক মাণিক, কলেরা রুগী দেখতে হবে। শীত আছে নষ্ট হবে না—

মাণিক। তবে একটা gold flake ধরিয়ে শুয়ে পড়ুন—ঘুমবার চেষ্টা করুন। এখন ভেবে কোনো ফল নেই—

মাণিকলাল—instalment-পোরা প্যাণ্টএঁটে, দড়ির দোলায় পা ঢুকিয়ে নাক ডাকালে।

"ইস্ এ ডাক শুনলে বাইরের চোর না ঘরে ঢুকে প্যাণ্টে কাঁচি চালায়। আচ্ছা আমার তো আজ ঘুম

নেই।" বিনোদ আর একটা gold flake ধরালে। নিদ্রা এসে গেল।

সকালে ধড়মড় করে উঠে—"মাণিক ওঠো ওঠো, সর্ব্বনাশ করলে। চা খেতে আর দিলে না। ওঠো—ওঠো হে!" দেখলেন মাণিক নেই। "মানুষ সুদ্ধু পাচার করলে নাকি?" মাণিক ঠিক বলেছিল, এ তাদেরই কাজ। উপায়?

মাণিক ঘণ্টাখানেক আগে উঠে, সব ঠিক করে চা রুটি নিয়ে ডাকতে আসছিল।—"কি হয়েছে, মেঝেয় বসে কেন? নিন সব তয়ের"

"ওষুধ?"

"সব ready Sir"—

"আমি মরে ঘুমিয়েছিলুম হে।"

"ভালই হ'য়েছে। জল গরম। কুলকুচোটা করে চা খান"—

"সে প্যাণ্টটা?"

"আজ্ঞে পরাই আছে Sir"

"All right—ওষুধগুলো নিও।—গিয়ে কি যে দেখব মাণিক—"

"ভালই দেখবেন।—ওদের প্রাণ আমাদের মত পল্‌কা নয়।"

কথাটা বিনোদের কাণে বড় কটু লাগলো।

মাণিকলালও তাঁর ভাবটা দেখে চুপ করলে—

"আচ্ছা এখন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক। বোধ হয় বাড়াবাড়ি হয় নি। ওষুধগুলো ভুলো না।"

"সঙ্গেই আছে।"

পাড়ায় ঢুকে—"সবি যে ফুসের বুঁড়ে হে! কোনটি? ওর মধ্যে যে সহজ মানুষই বাঁচে না!"

"আমরা তো বেঁচে আছি মশায়—"

"হ্যাঁ, সব ওই এক মায়ের পেটেরই বটে! তাই না তোমাকে বলছিলুম—ওদের ওদের করচ কেন?"

একটি মেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুচছিল। বিনোদ বললেন—"হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিকেই তো কাল দেখেছিলুম। আমাদের অপেক্ষাই করছে বোধ হয়। ভেতরে ঢুকে গেল। চোখ মুচছিল না?"

"রাত জেগেছে কিনা, ঘুমুতে পায় নি, তাই চোখ রগড়াচ্ছিল। ভাববেন না—আমি না হয় এগিয়ে দেখছি—"

"তাই করো মাণিক—"

মাণিক যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি বৃদ্ধাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। মাণিকের ঈশারা মত ডাক্তার এগিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধা—"আমার বিনোদীকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তার সাহেব। আমার আর কেউ নেই, আমি তার অন্ধ মা—"

মাণিকলালই কথা কইলে—"কোনো ডর নেই মায়ি, লেড়কা আরাম হো যায়গা—ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

"কাহাঁ ডাক্তার সাহেব" বলে বৃদ্ধা তাঁর চরণোদ্দেশে হাত বাড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

বিনোদ সযত্নে ধরে ফেললেন, বললেন—"ভেব না মা, রামজি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই তো বিনোদীকে আরাম করে দেবেন। চলো আমি তাকে দেখবো। এখন সে কেমন আছে, রাতে কেমন ছিল?"

"রাতে দু'তিনবার—পা গেল, পা গেল বলে কুঁকড়ে যাচ্ছিল, আর দণ্ডে দণ্ডে জল চেয়েছে। কিছুক্ষণ থেকে প্রলাপের মত—রামজি আয়া, রামজিকো বয়েঠনে দো—বলতে বলতে—চুপ করেছে বাবা—ঘুম কিনা দয়া করে দেখুন ডাক্তার সাহেব—"

বিনোদ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখলেন—সুন্দর সরল যুবা। মুখ চোখ ঠিক আছে। ঘুমই বটে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে বললেন—"এখন কেউ কাছে যেও না, ডেকো না, ঘুমুতে দাও।—আমি—পাড়াটা ঘুরেই এখুনি আসছি।"

বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে, মাণিকলালকে নিয়ে বিনোদ বেরিয়ে পড়ল। মাণিককে বললেন—"দেখলে তো—ছেলেটি ইতর সাধারণের মত নয়—but age and health against him—মা দয়া করুন। ওষুধের ওপর দুখ্‌ দরদ না রেখে, পুকুর, খানা, ডোবা, কুয়ো সব ব্লিচিং পাউডার ঢেলে disinfect—নির্দ্দোষ করে ফ্যালো।"

"যে আজ্ঞে—"

হিন্দুনারীর দায়াধিকার ও হিন্দু কোড্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, এম্ এল্, পুরাণরত্ন

হিন্দুনারীর দায়াধিকার বিলটীর সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলিতেছে। ইহার পক্ষে ও বিরুদ্ধে বহু আলোচনা হইতেছে। যাঁহারা স্বপক্ষে তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিলটী পাশ হইলেই হিন্দুনারীর বর্ত্তমান অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে। আবার যাঁহারা বিপক্ষে তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিলটী পাশ হইলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ হইবে। এই দুইটী মতই extreme বা উৎকট। যাঁহারা ভাবিতেছেন যে "এই আইনের দ্বারা হিন্দুনারীর হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার হইবে এবং সামাজিক মর্য্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বাড়িবে" (শ্রীবেলা দত্ত চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ প্রবাসী মাঘ ১৩৫১ দ্রষ্টব্য)—তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের মুসলমান সমাজের নারীজাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিবেন। আইনের বলে পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে ভ্রাতার সহিত দায়াধিকার পাইলেই যদি সামাজিক মর্য্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের কোটী কোটী পুরুষ মর্য্যাদাবোধহীন ও আত্মপ্রত্যয়শূন্য কেন? প্রগতির ধুয়া ধরিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন যে নারীর সম্মান বোধ হয় এই অধিকারের অভাবেই নাই। যাহার যে জিনিষ বা অধিকার নাই তাহার সেই জিনিষ বা অধিকারের জন্য প্রলোভন স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে দায়াধিকারের সহিত মর্য্যাদা বা আত্মপ্রত্যয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থনৈতিক কারণে সম্মানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভ্রাতার সহিত উত্তরাধিকার পাইলেই যে নারীজাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে বা সম্মানের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে ও হঠাৎ নারীজাতির আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠিবে তাহা মনে হয় না। আমাদের দেশে নারীজাতির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কি পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভ্রাতার সহিত অধিকারে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিলেই সম্পন্ন হইবে? যদি কেবল এই দায়াধিকারের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইত তাহা হইলেও বুঝিতাম যে এক প্রবল সমস্যার সমাধান এই আইনের দ্বারা হইতেছে কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মুসলমান সমাজের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে কেবল দায়াধিকার দ্বারা অর্থ-নৈতিক সমস্যার মীমাংসা হইবার নয়। দেশের স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা ও কৃষ্টির দ্বারা হিন্দুনারীর আজ যে সম্ভ্রম ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হইয়াছেন তাহা কেবল শিক্ষার দ্বারাই বৃদ্ধি হইতে পারে। হিন্দুনারীর ভ্রাতার সহিত সমান দায়াধিকার না থাকা সত্ত্বেও আজ ভারতবর্ষে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলাদেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ন্যায় নারী সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্রী। দায়াধিকারের অভাব ত তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। অথচ দায়াধিকার সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশের মুসলমান সমাজে এরূপ নারীর সংখ্যা কি বিরল নয়? ইহা হইতে কি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না যে কেবল দায়াধিকার দান করিলেই হিন্দুনারীর অবস্থার উন্নতি হইবে না।

তাহাই যদি হয় আমরা আজ এই হিন্দু দায়াধিকার আইনের হঠাৎ আমূল পরিবর্ত্তন করিব কেন? প্রত্যেক বিষয়ের একটা ঐতিহাসিক দিক আছে। হিন্দু আইনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে হিন্দু দায়াধিকার আইন চিরকাল একভাবে নাই। ইহার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণীর দার্শনিক ব্যবহারশাস্ত্রাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই ইহার ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু সেই ক্রমোন্নতি এরূপভাবে হওয়া উচিত যে মূলসূত্রের সহিত তাহার যেন যোগ থাকে। এই যোগ ছিন্ন হইলে হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে। আমার মনে হয় রাও কমিটী হিন্দু কোড্ প্রস্তুতের সময় এই তথ্যটীর প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন নাই। হিন্দু দায়াধিকার আইনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না একথা যেমন ভুল, সেইরূপ হিন্দুদায়াধিকার আইন এরূপভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যে হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া ইহাকে কতকগুলি বিভিন্ন আইনের সমষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে তাহাও ভুল। রাও কমিটি কার্য্যতঃ তাহাই করিতেছেন। তাঁহারা সংহিতা সৃষ্টির নামে কতকগুলি বিভিন্ন আইনের ধারা হিন্দু আইনে সংযোজিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে হিন্দু আইনের ইতিহাসের ধারা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং এই আইন সাধারণের শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিবে না। রাও কমিটীর প্রস্তাবিত হিন্দু কোড্ বা সংহিতার প্রধান লক্ষ্য দুইটী—(১) বৃটিশ ভারতের হিন্দুরা এখনও যে সব বিষয়ে হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত হয় সে সব বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইনের প্রবর্ত্তন (২) হিন্দু আইনের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার। এই দুইটী উদ্দেশ্যই সাধু কিন্তু প্রস্তাবিত কোড্ দ্বারা তাহা কতদূর সাধিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া হিন্দু আইনের নিজস্ব ভাব ও স্বাতন্ত্র্যের মূলে আঘাত করা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা দেশের সুধীগণের বিচার্য্য। আমার মনে হয়, হিন্দু আইনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও মূল সূত্রগুলির সহিত যোগ ছিন্ন না করিয়া তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত বিকাশলাভ করিতে দেওয়া হইলে হিন্দু দায়াধিকার আইন বর্ত্তমান যুগোপযোগী হইবে এবং সকলের গ্রহণীয় হইবে। হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে রাও কমিটীর প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ—নিকট সম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি দায়ভাগের অনুসরণ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি মিতাক্ষরার অনুকরণ। কারণ নিকট সম্পর্কীয়-গণের উত্তরাধিকারে দায়ভাগের বিধান মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অধিকতর

অনুরূপ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মানুষের বিশেষ কোন স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে কাহারও কোন বলিবার থাকে না, কারণ হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য ইহা দ্বারা নষ্ট হয় না। ইহা ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। কিন্তু দ্বিতীয়তঃ রাও কমিটীর প্রস্তাবে স্ত্রী সম্পর্কীয়দের উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রচলিত আইন অপেক্ষা বেশী স্বীকার করা হইয়াছে এবং মুসলমান আইনের অনুকরণে বিধবা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহাতে হিন্দু আইনের ধারা ক্ষুণ্ণ হইবে ও হিন্দু আইনের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য নষ্ট হইবে। সেইজন্যই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অধিকাংশ লোকের আপত্তি এবং এই আপত্তি যাঁহারা তুলিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মূর্খ নহেন অথবা সকলেই স্বার্থপর পুরুষ নহেন। অধিক দৃষ্টান্ত না দিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আপত্তিকারীদের মধ্যে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ন্যায় বিদুষী ও মনীষাসম্পন্ন আধুনিকা মহিলাও আছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে এই আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রধানতঃ আপত্তিগুলি এইরূপ :—(১) ইহা দ্বারা হিন্দুর সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া হিন্দুর আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটাইবে (২) সংসারে ভ্রাতাভগ্নীর মধুর সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া হইয়া বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিবে—প্রীতির ও স্নেহের সম্বন্ধ আর থাকিবে না (৩) কৃষিপ্রধান দেশে এই বিভাগের ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে (৪) হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু দর্শনের সহিত হিন্দু আইনের যে সম্বন্ধ তাহা ছিন্ন হইবে। এই আপত্তিগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। ইহাদের প্রত্যেকটী ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার মত। এই আপত্তিগুলি খণ্ডনকালে হিন্দু কোডের একজন বিশিষ্ট সমর্থক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেন "সম্পত্তির যাহাতে ভাগ বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন রচিত হয় নাই। তাহা হইলে পিতার এক পুত্র অথবা দুই পুত্র মাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তি পাইবে এইরূপ বিধান হইত। উত্তরাধিকার আইনের একটী প্রধান লক্ষ্য—যাহাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সম্মত বলিয়া মনে হয় তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করা। অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্যই উত্তরাধিকারের একমাত্র, এমন কি প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বাপের বিষয়ে মেয়েদের অংশ ও সে অংশ ছেলের অর্দ্ধেক নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। যাঁহারা এই ব্যবস্থায় হিন্দুর আর্থিক অবনতির আশঙ্কা করেন তাঁহারা সম্ভবতঃ ভাবিয়া দেখেন নাই যে ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এবং বহু দেশে ছেলেমেয়ের একসঙ্গে উত্তরাধিকার প্রচলিত আছে এবং তাহাতে তাহাদের অবস্থা হীন হইয়াছে ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।" ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে যেমন সম্পত্তির যাহাতে ভাগ বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন রচিত হয় নাই একথা সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে যাহাদের দায়াধিকার ন্যায়সম্মত কেবল তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই হিন্দু দায়াধিকার স্থির হয় নাই। তা ছাড়া 'ন্যায়সঙ্গত' কথাটির যথার্থ মাপকাঠি পাওয়া অতীব শক্ত। আজ রাও কমিটির নিকট অথবা হিন্দুকোডের সমর্থকগণের নিকট যাহা ন্যায়সম্মত বলিয়া মনে হইতেছে কাল হয়ত দেখা যাইবে তাহা ন্যায়সম্মত নয়। ন্যায়ের দণ্ডে আজ যদি মনে হয় যে কেবল স্ত্রী পুত্র এবং কন্যার একসঙ্গে ত্যক্ত সম্পত্তি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, তাহা হইলে যদি কেহ বলে যে বৃদ্ধ পিতা, মাতা বা ভ্রাতার অধিকার কি ন্যায়সঙ্গত নয় তাহা হইলে তাহার কি উত্তর রাও কমিটীর বা রাও বিলের সমর্থকগণ দিবেন জানি না। সেইজন্য আমার মনে হয় হিন্দুদায়াধিকার আইন যে মূলসূত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সূত্রগুলির সহিত যোগ রাখিয়া এই সংস্কার প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের নিব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকার করিলে নিব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রী পুত্র কন্যা ইহাদের একসঙ্গে সম্পত্তিতে অধিকার দিবার যে প্রস্তাব তাহা হিন্দু দায়াধিকার আইনের মূলসূত্রগুলির বিরোধী এবং তাহা গ্রহণ করিলে হিন্দু-আইনের ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ হইবে। মুসলমান আইনে মৃতব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার যে নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা হইতেছে এই যে মৃতের নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে যাঁহাদের দাবী বেশী তাঁহারাই উত্তরাধিকারী। কোরাণে লিখিত আছে—"পিতামাতা এবং পুত্রগণের মধ্যে কে অধিক নিকট এবং উপকারী তাহা বলা শক্ত।" আধুনিক যুগের অত্যাধুনিকদের নিকট কি কোরাণের এই বাণী অর্থশূন্য? যাহাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গত তাহাদের উত্তরাধিকার প্রদান করিতে হইলে মুসলমান আইনের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে হয়। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটী সেইজন্য আশ্রিত পিতামাতা ও বিধবা পুত্রবধূকেও পুত্রকন্যার সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও যাহাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গত তাহাদের উত্তরাধিকার প্রদান করা হয় না কারণ পিতামাতা আশ্রিত হউন বা ধনী হউন, তাঁহাদের অধিকার পুত্রকন্যার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যায়ের দণ্ডে কম নয়। এইভাবে ন্যায়ের বিচার সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং সেইজন্যই হিন্দুআইনে উত্তরাধিকারীর স্তর সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই স্তরে পুত্রের স্থান প্রথমে রাখা হইয়াছে—কারণ পুত্রই সর্ব্ব বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে পিতার সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ। এ কথা আজ জোর করিয়া যদি কেহ অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাহা জোরের কথাই হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যাপারের ন্যায় আইনের ক্ষেত্রেও বিবর্ত্তন (evolution) বাঞ্ছনীয়, বিপ্লব (revolution) নয়। কারণ বিপ্লবের ফল অধিকাংশ সময়েই মন্দ হয় এবং জনসাধারণ বিপ্লবপ্রসূত কোন ব্যাপার সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও রাও কমিটীর হিন্দু কোড যেরূপভাবে দায়াধিকারের সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাকে বিবর্ত্তন বলা যায় না কারণ বর্ত্তমান আইনের যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত সম্প্রসারণ ইহা নয়। প্রত্যেক সভ্যজাতি স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রত্যেক ব্যাপারের উন্নতি চায়। ইংরাজ জাতির আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে স্বীয় ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরাজ জাতি আইনের কিরূপভাবে উন্নতি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ লেখকের নিম্নের বক্তব্যটী প্রণিধানযোগ্য :

"ইংরাজ জাতির সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে এইরূপ মনীষাসম্পন্ন বিচারকগণ জাতীয় ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ইংরাজ জাতির আইনের মূলসূত্রগুলির সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ব্যবহারশাস্ত্রের এইরূপ উন্নতি ও সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে তাহা প্রত্যেক যুগের উপযোগী হইয়াছে। রাষ্ট্রের ও আইনের ইতিহাসে এই সামঞ্জস্য রক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা এই মঙ্গল সাধন করিয়াছে যে ইহা ইংরাজজাতির আইনের প্রতি চিরন্তন শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং শ্রদ্ধা হইতেই ইংরাজ জাতির নিয়মানুবর্ত্তিতার অভ্যাস বিকাশলাভ করিয়াছে। আইনশাস্ত্রের ইতিহাসেও এই সামঞ্জস্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কম নয় কারণ ইহা দ্বারাই ব্যবহারশাস্ত্রের যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবর্ত্তন সম্ভব এবং এইরূপ বিবর্ত্তনের ফলে দেশে একটা স্থায়ী ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।" অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতি স্বীয় জাতীয় ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রত্যেক ব্যাপারের উন্নতি প্রার্থনা করে। হিন্দু আইন—যাহার সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন যে ইহার অতি প্রাচীন উদ্ভব সত্ত্বেও ইহার ধারার কোন লক্ষণ নাই—যদি আজ কয়েকজন অত্যাধুনিকের অতিতৎপরতায় স্বীয় সামঞ্জস্য বিচ্যুত হয় তাহা হইলে সত্যই পরিতাপের বিষয়।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মণিমোহন যখন ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিল—তখন রোদ বেশ চড়িয়াছে। চারিদিকের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে প্রতিদিনের চিরন্তন কর্ম্মকুশলতা লইয়া। জেলেপাড়ায় কালো কালো প্রকাণ্ড কড়াইগুলিতে গাবের রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে—রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া অতিকায় বেড়াজাল শান্ত রোদে শুকাইতেছে—ফাঁসের এখানে ওখানে রূপোর টুকরার মতো চিক চিক করিতেছে মাছের আঁশ। লেংটি পরা এবং উলঙ্গ একপাল ছেলেমেয়ে বিহ্বল ভীত চোখে মণিমোহনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কতগুলি মাথা ভাঙা সুপারীর গাছ এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া তিনবছর আগে যে সাইক্লোন বহিয়া গেছে তাহারি চিহ্ন বহন করিতেছে যেন। আদিম বর্ব্বরদের উত্তরপুরুষেরা মাথায় টোকা পরিয়া, হাতে হাঁসুয়া লইয়া এবং কাঁধে লাঙল তুলিয়া নিরীহের মতো কাজ করিতে চলিয়াছে। একজনের হাতে একটা হুঁকা, চলিতে চলিতেই সে তাহাতে গোটাকতক টান মারিল। সব যেন নিজের চক্রপথে ঘুরিতেছে নির্ভুল নিয়মে, এতটুকু ছন্দপতন হইবার আশংকা বা সম্ভাবনা নাই কোনোখানে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছয় ফুট উঁচু যে সমস্ত মানুষের পায়ের চাপে মাটি টলমল করিত, আজ তাহারা কোথায় গেল?

তাহারা নাই—কিন্তু একেবারেই কি নাই? সময় যখন আসে, তখন তাহারাও কি ধুলা-হইয়া-যাওয়া কবরের তলা হইতে ঠেলিয়া ওঠেনা নতুন সাড়া লইয়া, নতুন মত্ততা লইয়া? তাহা হইলে জমিরের চোখে কিসের আগুন দেখিল সে? ওই যে মানুষগুলি অহিংস অনাসক্তভাবে মন্থরগতিতে পথ চলিতেছে—সময় আসিলে ওরা কি অমনি প্রশান্ত স্তিমিত চোখ মেলিয়াই তাকাইয়া থাকিবে? ইহাদের সকলের কাছ হইতেই কি বিন্দু বিন্দু করিয়া আগুন লইয়া জমিরের চোখ অমন দপ দপ করিয়া শিখায়িত হইয়া ওঠে নাই?

ডাকবাংলোর বারান্দায় রাণী বসিয়া আছে। রোগক্লান্ত মুখশ্রীতে একটা শান্ত কমনীয়তা—একটা অপরূপ মাধুর্য। এই তো বাংলা দেশ—করুণ আর স্নিগ্ধ. বর্দ্ধমানের ধানক্ষেতের পাশ দিয়া দ্রুতগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলিবার সময় চারিদিকের পৃথিবীকে যেমনটা মনে হয়, ঠিক তেমনই। এখানে ওখানে বিল আর মরা-নদীর জল ঝলমল করিতেছে, তাহার উপরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে খণ্ড চন্দ্রের মধু জ্যোৎস্না। ছোট ছোট গ্রামগুলি আমবাগানের অন্ধকারে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে। যতগুলি লাল নীল আলো হাতছানি দিয়া ডাকিল—কালো কাঁকর-ফেলা টিনের শেড্ দেওয়া নগণ্য একটি ষ্টেশনে আসিয়া দম লইল রেলগাড়ি। সেখান হইতে এক মেটে পথ দিয়া বাজারটি পার হইলেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারের আশ্রয় মিলিবে। পথের ধারে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইতেছে—সান্ধ্য-হুঙ্কারকে উপলক্ষ করিয়া বৈরাগীর আখড়া হইতে উঠিতেছে কীর্ত্তনের সুর। বাড়ির সদর দরজায় একটুখানি ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল দরজাটা। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গলবস্ত্রে একটি প্রণাম করিতেছে—তাহার সীমন্তে এয়োতির চিহ্ন গৃহস্থের মঙ্গল আর কল্যাণের বার্ত্তার মতো জাগিয়া আছে। এই রাণী, আর এই বাংলা দেশ।

সপ্রেমে মণিমোহন রাণীর দিকে তাকাইল: এই সকালে উঠেই বাইরে এসে বসেছ যে? ঠাণ্ডা লাগবে না?

রাণী হাসিল: এত রোদ—সকাল কোথায়? ঠাণ্ডা লাগবে না···ভয় নেই তোমার। কী সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, দেখেছ? ঘরে থাকতে কি ইচ্ছে করে?

—জ্বর নেই তো ?

—না।

রাণীর হাতটা টানিয়া লইয়া মণিমোহন নাড়ী পরীক্ষা করিল হুঁ ছেড়ে গেছে। কবিরাজ চিকিৎসা করে ভালো, পাঁচনের গুণ আছে দেখছি। ঝিণ্টু কোথায় ?

—ওই তো।

একটু দূরেই ছোট একটা ঝোপ। নাম না জানা একরাশ বেগুনী রঙের ফুলে আকীর্ণ হইয়া আছে। ছোট বড় কতগুলি প্রজাপতি সকালের আলোয় উল্লসিত পাখা কাঁপাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরই দু একটাকে ধরিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছে ঝিণ্টু।

—প্রজাপতির সন্ধানে আছে বুঝি ? কিন্তু এদিকের ঝোপ-জঙ্গল বড় খারাপ, সাপ-খোপ থাকতে পারে। ঝিণ্টু, ঝিণ্টু !

—আসছি বাপী !

—না, এক্ষুণি চলে এসো।

অপ্রসন্ন হইয়া ঝিণ্টু ফিরিয়া আসিল—একেবারে ঘেষিয়া দাঁড়াইল বাবার কোলের কাছে। ছোট মাথাটির চুলগুলি আঙুল দিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল—শিকার মিলিল ? ধরতে পারলে প্রজাপতি ?

—না বাপী, ভারী দুষ্টু ওরা। ধরা যায় না।

—ধরতে নেই ওদের। ঝিণ্টুকে দুহাত দিয়া হাঁটুর উপর তুলিয়া আনিয়া মণিমোহন বলিল, আমি তোমাকে খুব মস্ত একটা ঘোড়া কিনে দেব, আর একটা মোটর। কেমন, তা হলে তো হবে।

পিয়ারী চা আর টোষ্ট লইয়া দর্শন দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা টোষ্ট অধিকার করিল ঝিণ্টু। রাণী হাসিয়া বলিল, ঝিণ্টু কী বলেছে জানো না বুঝি ? ও আর মোটর কিংবা ঘোড়ায় চড়বেনা। একেবারে এরোপ্লেনে উঠে কোথায় যেন যুদ্ধ করতে যাবে।

—সত্যি নাকি ? তা হলে পুরোদস্তুর পাইলট ?

ঝিণ্টুর সমস্ত মনোযোগ হাতের পাঁউরুটির টুকরাতেই সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ। রাণী বলিল, বেশ, তা হলে এই কথাই ঠিক রইল। কালই তোমার জন্যে এরোপ্লেন আনা হবে, তাইতে চড়ে তুমি যুদ্ধ করতে যেয়ো। কিন্তু একটা কথা আছে। সেখানে মা ও থাকবেনা, বাপীও থাকবেনা। কার কোলে উঠবে, কার বুকের মধ্যে ঘুমোবে, শুনি ? আর পিয়ারীও যাবেনা—আমাদের চা করে দিতে হবে তো। তা হলে যুদ্ধটা কার সঙ্গে হবে ?

ঝিণ্টু বিশ্বাস করিলনা, ভয়ও পাইলনা। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপরে বলিল, ঈস্ !

রাণী ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, দুষ্টু !

মণিমোহন সস্নেহে গভীর দৃষ্টিতে ঝিণ্টুর কচি কোমল মুখের দিকে তাকাইল, তাকাইল রাণীর স্নেহ সুকুমার নিবিড় দুইটা কালো চোখের দিকে। তাহার সন্তান, তাহার স্ত্রী, তাহার সংসার। বর্ধমানের পল্লীপ্রান্তে সেই শঙ্খধ্বনিমুখরিত বিরাম মধুর সন্ধ্যাটির বার্তা যেন ইহারা বহন করিয়া আসিয়াছে। এই চর ইসমাইলে ইহাদের মানায় না—এই খাপছাড়া জগতের বন্যতার মাঝখানে একান্তভাবেই অনাহূত আগন্তুক।

—আর না রাণী, চলো, এখান থেকে ফিরে যাই।

—কেন, কাজ কি শেষ হয়ে গেছে তোমার ?

—কাজ তো শেষ করলেই শেষ হয়ে যায়, আবার বাড়ালেই বাড়ে। আরো পাঁচ সাতদিন থাকতে পারলে অবশ্য ভালো হত, কিন্তু তোমার শরীর টিকছেনা এখানে। যা হতভাগা দেশ, একটু ওষুধ বিষুধের ব্যবস্থাও তো করা যায় না দরকার হলে। তা ছাড়া আমারও ভালো লাগছে না।

—বেশ তো, তোমার ভালো না লাগে, চলো।

—হুঁ, তাই ভাবছি। দেখি, কাল পরশুর মধ্যেই—

বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটা সাইকেল দ্রুতগতিতে আসিয়া থামিল। নামিল ইউনিফর্ম-পরা একটি মূর্তি—পুলিশের লোক নিঃসন্দেহ। চোখে মুখে তাহার একটা ব্যগ্র ব্যস্ততা। কিন্তু বাংলোর বারান্দায় রাণীকে দেখিয়াই সে চমকিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, তারপর সাইকেলটা লইয়া কয়েক পা পিছনে সরিয়া গেল।

—কে আবার এল এই সময় ? একটু বিশ্রাম করতেও এরা দেবেনা নাকি ? ভেতরে যাও তো রাণী। লোকগুলো জ্বালাতন করে মারল একেবারে। নাঃ, কালই পালাতে হল এখান থেকে। ঝিণ্টুকে টানিয়া লইয়া রাণী ভিতরে চলিয়া গেল।

—পিয়ারী, দ্যাখ তো কে এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়।

যিনি আসিলেন, তিনি পুলিশের দারোগা। সশ্রদ্ধভাবে একটা নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, একটু জরুরি তাগিদেই আপনাকে বিরক্ত করতে হল স্যার, কিছু মনে করবেন না।

পলকের জন্য জমিরের আগ্নেয় দৃষ্টিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। নতুন প্রাণ, নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ বুকের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কোন্ অনাগত কালের সুনিশ্চিত পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে যেন। আর দারোগার মুখে যা প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তা কি রাশীকৃত ক্লান্তি আর অবসাদ ? যেন বোঝা টানিতে টানিতে নিজের সম্পর্কেই বিস্ময়করভাবে অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছে ! যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়া যাক, পৃথিবী যেমন করিয়া চলিতেছে, তেমনি ভাবেই চলুক।

তাহার জীবনটা যেন নিমিত্ত মাত্র—তাহার বেশি এতটুকু কোথাও কিছু নাই। পুলিশের চাকুরী আর ফকিরিটা তাহার কাছে একই পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রয়োজন হইলেই সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া কম্বল অবলম্বন করিতে পারে।

মণিমোহন বলিল, বলুন, কী দরকার ?

অত্যন্ত সংকোচে দারোগা বসিলেন। ঘর্মাক্ত মলিন টুপিটা রাখিলেন টেবিলের উপরে—শ্রান্তস্বরে বলিলেন, আমি মামুদপুর থানার দারোগা।

—চা খাবেন এক পেয়ালা ?

—না, থ্যাঙ্কস স্যার। চা আমি খাই না।

—তা হলে কী বলছিলেন, বলুন।

দারোগা বড় করিয়া একটা নিশ্বাস টানিলেন—যেন বাতাস হইতে খানিক অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করিয়া লইতে চান। আবার জমিরের ছায়ামূর্তিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। ইহারা দুইজন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমানেই তো ? একজন নতুন জীবনের আলোকে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর একজনের সর্বাঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু শ্রান্তির দ্যোতনা। জয় হইবে কার ?

দারোগা বলিলেন—আগষ্ট মুভমেন্টের ব্যাপার আশা করি, জানেন স্যার।

—জানব না কেন, ভারতবর্ষের মানুষ তো। কিন্তু কী হয়েছে, এখানে আবার নতুন করে একটা ওইরকম আন্দোলন দেখা দেবে নাকি ?

—কী যে বলেন স্যার।—গর্বে গৌরবে দারোগা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন. তাঁহার কণ্ঠে আত্ম প্রত্যয়ের সুর লাগিল: আমার এলাকায় ট্যাঁ ফোঁ করতে আমি দেবনা, সেদিক দিয়ে শক্ত আছে বনোয়ারী দারোগা।

অকারণেই মণিমোহনের ঠোঁটের আগায় সূক্ষ্ম একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল: তা হলে তো আর কথাই নেই; কিন্তু আপনার সমস্যাটা কোথায় ?

—তাই বলছিলাম স্যার। আমার এলাকায় না হলেও আমাদের জেলাতে নানা রকম ট্রাবল্‌স হয়ে গেছে, আপনি বোধ হয় সবই জানেন। খবর পেয়েছি, ওখান থেকে জনকয়েক অ্যাব্‌স্কণ্ডার এসে কালুপাড়ায় লুকিয়ে আছে। সদরে খবর দেওয়ার সময় নেই, তার আগেই হয়তো পালাবে। তাই আপনি একটু হেল্প করবেন, মানে লীড্‌ করবেন আমাদের। একজন রেস্‌পন্‌সিব্‌ল অফিসার যখন আছেন—

মণিমোহন অপ্রসন্ন হইয়া গেল। বড় ঝামেলা—অত্যন্ত বিরক্তিকর। তা ছাড়া এ তার কাজও নয়। বলিল, আপনারাই যান না। আমাকে আবার এর ভেতরে কেন ?

—বুঝতে পারছেন না স্যার। রিস্কি ব্যাপার তো—হয়তো ফায়ার করতে হবে। আপনি থাকলে আমার দায়িত্বটা কমে, সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।

—আচ্ছা বেশ, যাবো আমি।—মণিমোহনের মুখের উপর দিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল: কখন যেতে চান ?

—শুভস্য শীঘ্রম্‌ স্যার—এক সারি দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন দারোগা: একটা পাকা খবরের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। লোকও পাঠিয়েছি। যদি ডেফিনিট্‌ হতে পারি. তা হলে কাল রাত্রেই রেইড্‌ করব। আজ আমি সদরে একটা টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি—দেখি কী জবাব আসে। ওখান থেকে লোক পাই ভালোই, নইলে যা করবার আমাদেরই করতে হবে।

—তা হলে আগেই আমাকে খবর দেবেন।

—দেব স্যার, নিশ্চয় দেব। সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর আপনার কোনো অসুবিধেই হবেনা—সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই ঠিক করে রাখব আমরা। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবেন,তা হলেই জোর পাবো আমরা—বুঝতে পারছেন না ?

—বুঝতে পারছি।—ক্লান্তি বিরক্ত মণিমোহন প্রসঙ্গটা থামাইয়া দিবার জন্যই যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তাই হবে।

দারোগা টুপিটা তুলিয়া লইলেন টেবিলের উপর হইতে। এত উৎসাহ, উদ্দীপনা সত্ত্বেও মণিমোহনের মনে হইল দারোগার চোখের কোণায় ক্লান্তির মসীরেখাটা যেন গাঢ়তর হইয়া পড়িতেছে।

—তা হলে আসি স্যার, নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—না, না, মনে করবার কী আছে। এ তো আপনার ডিউটি—আমারও। আচ্ছা, নমস্কার। প্রত্যুত্তরে দারোগা আবার খানিকটা বিগলিত হাসি হাসিলেন, তারপরে সাইকেলে উঠিয়া বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার অনেক কাজ—এতটুকুও সময় নাই।

রেলিংয়ের উপরে ভর দিয়া শূন্য চোখে নদী আর দিগন্তের দিকে তাকাইল মণিমোহন। আবার এক নতুন বিড়ম্বনা দেখা দিল—ফেরারী ধরিয়া বেড়াইতে হইবে তাহাকে। যাহারা দেশে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে.যুদ্ধকালীন নিরাপত্তায় বিঘ্ন সঞ্চার করিয়াছে—অপরাধী তাহারা নিশ্চয়ই—শাস্তি তাহাদের পাইতেই হইবে ?

কিন্তু ইহারা কাহারা ? পলকের জন্য তাহার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল: কী ধাতু দিয়া এই ছেলেগুলি তৈরী হইয়াছে ? ঘর থাকিতেও ঘর ভাঙিয়া মৃত্যু এবং রাজরোষের অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল কী কারণে এবং এই সর্বনাশা প্রেরণাই বা পাইল কোথা হইতে ?

মানস-দৃষ্টির সামনে ভাসিয়া গেল আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দী-শিবির। রুগ্না পত্নীর মৃত্যু শয্যার পাশে ধ্যান-স্তিমিত নেত্র মেলিয়া বসিয়া আছে Naked Fakir of India—তাহার মুখের উপরে প্রসন্ন সূর্যালোক স্বর্গ কিরণের মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে ভারতীয় ভাবধারায় শুচিস্নাত করিয়া পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও জীবনের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য যে কয়েকজন মনীষী আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ —শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী। যে শিক্ষা আমাদের দেশে এখন চলিতেছে তাহার যে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। সংস্কার সুরু হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। সংস্কার কিরূপ হইবে ও কোন্ পথে আসিবে তাহারও একটা মোটামুটি আভাষ আমরা পাইয়াছি। কেননা, এখন আমরা সকলেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, এই শিক্ষার সহিত দেশের নাড়ীর কোনও সম্পর্ক নাই; ইহার শিকড় দেশের মাটী হইতে রস আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে নাই। *ইহা কচুরিপানার মত ভাসিতে ভাসিতে এই দেশে আসিয়াছে*; আমরা যত্ন করিয়া তুলিয়া আনিয়া টবে বসাইয়া উপরের বারান্দা হইতে ঝুলাইয়া দিয়াছি ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য কি উপায় ছিল? যে শিক্ষাকে আমরা একদিন বরণ করিয়া তুলিয়াছি, যে শিক্ষার অনিশ্চিত ফলের কথা স্মরণ করিয়া মাতা ক্রোড়স্থ শিশুর কানে কানে গাহিয়াছেন—'লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে'—তাহার স্বস্তিবাচন ছিল "To form a class who may be interpreters between us and the mellions whom we govern—a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."

সুতরাং ইহার দক্ষিণান্ত যে 'হরীতকীস্বলমিবম্' না হইয়া 'রম্ভায়' সারিতে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু কে আমাদের অবচেতন মনকে সর্ব্বপ্রথম প্রবুদ্ধ করিল? কে আমাদের বলিল, 'জাগৃহি'? শিক্ষা-সমস্যা, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষার বাহন, শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে আমরা যত কথা বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি তাহা রবীন্দ্রনাথের বাণীর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

প্রায় বায়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান শিক্ষার এই গলদ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব, আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব, সে-গৃহের উন্নত-চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। * * * যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যেই আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই।"

একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান; ইহার গোড়ায় এই গলদ থাকায় আমাদের বিদ্যালয়গুলি প্রাণহীন; ছাত্ররা নিষ্প্রভ—নিরানন্দ, আমাদের বিদ্যালয়ের ইট, কাঠ, চেয়ার, বেঞ্চ এবং টেবিলের চাপে এমনই নিষ্পীড়িত যে, আনন্দের এতটুকু অবকাশ সেখানে নাই। শিশুদের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির দিকে নজর না রাখিয়া শুধু পড়া মুখস্থ করিবার জন্য যে পাঠ্যতালিকা রচিত হইয়াছে তাহাতে শিশু-মনের স্ফুরণের অবকাশ কোথায়?

কি বাংলা কি ইংরাজী শিশু-পাঠ্যপুস্তক খুলিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুস্তকের ভাষা, ভাব, শব্দ ও বিষয়ের সহিত শিশুর পরিচয় নাই। এখন অবশ্য ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অভিনব প্রণালীতে নূতন নূতন পাঠ্য-পুস্তক বাহির হইতেছে। কিন্তু এই সংস্কারের মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী লেখনী। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—"কোনো একটা শিশুপাঠ্য readerএ hay making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা Snow ball খেলায় Charlie ও Katieর মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলি পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মত করিয়া কিছু দেখিতে পায় না।"

শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন আধুনিক ইংরেজ পণ্ডিতের মন্তব্য শুনুন। তাঁহারা ভারতবর্ষের কয়েকটী প্রদেশের স্কুল-কলেজ দেখিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"Neither cultural nor utilitarian needs can be met by an education which does not fully derive its content and its inspiration from the environment of the pupils. Some of the best Schools that we have seen in India are those which eschewing the teaching of English lease their instruction and their activities on the natural and social phenomena with which they

are familiar" প্রশ্ন উঠিবে, দোষ কার? রামপ্রসাদের গানের দুইকলি মনে পড়িয়া যায়—"স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

কেবল যে ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপরিলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা নহে। বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের রচনাপদ্ধতিও শিক্ষার্থীর মনে হৃৎকম্পের উদ্রেক করিত। চারুপাঠের 'চারুত্ব প্রলোভনে' চোখের বালির আশায় অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; 'বল্মীক' সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে অক্ষরগুলা ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মত সার বাঁধিয়া চলিয়া যায় এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও "পুরুভুজ" সম্বন্ধে তাহার অনভিজ্ঞতা দূর হয় না।

এখনও এর জের মেটে নাই। এখনও দেখি যে কানমলার চোটে বাঙ্গালী ছেলেরা "জাড্য" কথঞ্চিৎ পরিহার করিলেও "বাষ্প" হইবার দুরাশায় "কুজ্ঝটিকায়" "দিগ্বিদিক" জ্ঞান হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বেচারারা দোটানায় পড়িয়া মার খাইতেছে। বোধ করি ইহাদের কথা স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"বাঙালী ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দ মনে ইক্ষু চর্ব্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চের উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধ মাত্র বেত হজম করিতেছে।"

শুধু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিশুপাঠ্য কয়েকটী পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। বাজারের জিনিষ নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ স্কুলের বাজারে ইহার প্রচলন নাই।

শিক্ষার মূলতত্ত্বগুলি রবীন্দ্রনাথ এরূপ সুন্দরভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়; মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে। তিনি দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন একথা স্মরণ করিয়া আমরা মনে বল পাই, সাহস পাই। আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্গণ সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেবল ভাষা শিক্ষার উপর অত্যধিক ঝোঁক দিবার নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীনতা নাই। ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেলেন তাহাও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে দুইটী অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চ্চা না করিলে কাজের সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত শুধু ভাষা শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। মাল-মসলা যাহা জড় হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযুক্ত এত ইট-পাটকেল পূর্ব্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্ম্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয় সেইটেই একটা মস্ত ভুল।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির বহু বৎসর পরে, ইংরাজী ১৯৩৭ সালে ভারতসরকারের অনুরোধে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার সমাধান কল্পে দুইজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এদেশে পাঠান। এ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে পুঁথিগত বিদ্যার বাহুল্য ও ভাষা শিক্ষার উপর অত্যন্ত ঝোঁক দেখিয়া তাঁহারা যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রতিধ্বনি:—

"It is surprise to discover that this concentration at the infant stage on literacy as the goal of schooling finds its natural expression in the worship of literary facility at the higher stage. If the seed is sown in the infant school it is idle to complain of the fruit as it ripens in the University."

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শিক্ষার ধারাটা আগাগোড়া বিদেশী বলিয়া আমাদের দেশের শিক্ষাটা কাজে লাগিতেছে না। ধারা বা পদ্ধতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দেশের উপযোগী করিয়া ইহার অদল বদল করা চলে। কিন্তু বিদেশী বলিয়াই যে শিক্ষাটি বর্জ্জনীয় তাহা নহে। বস্তুতঃ যাহা সত্য তাহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "যা সত্য তা'র জিয়োগ্রাফী নাই" ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা' পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়।"

আসল কথা, বিদেশীর জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে মধু আহরণ করিতে হইবে। কিন্তু তার উপযুক্ত বাহন চাই। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষা তাহার উপযুক্ত বাহন। আমাদের শিক্ষা, শুধু উপযুক্ত বাহন পায় নাই বলিয়াই "স্কুল কলেজের জিনিষ হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে।"

"Sooner or later in the course of the higher education of Indian boys the English language becomes not only a subject of study but the medium through which instruction is given in other subjects. This is indeed another great hardship from which the system of education in India suffers—the use of a language not native to the people as a medium for their education.".

এখন অবশ্য মাট্রিকিউলেশন পর্য্যন্ত ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য বিষয় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। একটি মামুলি প্রতিবাদ উঠিতে পারে যে, বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ নাই। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন:—

"শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে। কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

সুখের বিষয়, এই বৎসর বাংলাদেশের কলেজের শিক্ষকদের যে সম্মিলন হইয়া গেল তাহাতে বাংলাভাষাকে উচ্চ-শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচটিকে একেবারে আগাগোড়া বদল করার অসুবিধাও আছে। অন্ততঃ কাজ খুব সোজা নহে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, এই কলটি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ ছাঁচে তৈয়ারী। ইহার উপাসকগণের সংখ্যাও কম নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "শুধু চাকরীর বাজারে নয়, বিবাহের বাজারে বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাতেই।" সুতরাং এই রাস্তাটাতেই যে, লোক চলাচল বেশী করিবে তাহা জানা কথা। কিন্তু অনেক ছেলে ভাষা শিক্ষায় তেমন পটু নহে। তথাপি তাহাদের শিখিবার আগ্রহ ও উদ্যম কাহারও অপেক্ষা কম নহে। এই সব ছেলেদের উচ্চ-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় গোড়া হইতে তাহাদিগকে আট্‌কাইয়া দিয়া দেশের শক্তির অপব্যয় করা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা সমাধানের একটি সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রিপারেটারি ক্লাস পর্য্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে ইংরাজী ও বাংলার দুইটি বড় বড় রাস্তা খুলিয়া দিতে। ইহাতে ভিড়ের চাপ কমিবে, শিক্ষার বিস্তার হইবে।' এইরূপ ব্যবস্থায় দেশের মন মানুষ হইয়া উঠিবে।'

প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। অভিভাবকদিগের প্রসন্ন দৃষ্টি যে, বাংলা অঙ্গের দিকে পড়িবে না তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ইংরেজী চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িবে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে এবং এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিতে পারিবে।" কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাংলা অঙ্গ হইবে সজীব পদার্থ। তাই তিনি লিখিয়াছেন:—"কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।"

এইখানেই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম দেশকে ভারতের বাণী শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। বাংলা অঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়েই সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

"এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মত মিলিয়া যায়, তবে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর পক্ষে একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।"

তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী শুধু আজ বাঙালীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর মিলনতীর্থ। এই তীর্থেই ভারত পশ্চিমকে তাহার বাণী শুনাইবে। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় হইবে—

"দিবে আর নিবে মিলাবে মিলাবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

বক্তব্য

শ্রীলেখা সেন

—"শান্তি তার কথা শেষ করতে পারলে না। কাসতে কাসতে তার মুখ দিয়ে আবার এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। ক্লান্ত হয়ে সে বিছানায় এলিয়ে পড়লো।"

এই পর্য্যন্ত পড়ে বিরক্ত হয়ে নিরুপমা বইখানা রেখে দিলে। কেন যে এই সব বাজে কথাগুলো লেখে। যক্ষ্মা রোগটা আজকাল নভেলের জগতে বড়ই ছড়িয়ে পড়েছে। ছোঁয়াচে রোগ কিনা। সকলেরই যক্ষ্মা হচ্ছে। আর যক্ষ্মা হলেই কথায় কথায় মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত উঠছে। যা জানে না তা নিয়ে কেন যে কবিত্ব করতে যায় নিরুপমা ভেবে পায় না। তার হাসি পেল। সে নিজে এই রোগে ভুগছে আজ তিন বছর, কই তার মুখ দিয়ে তো একদিন একফোঁটাও রক্ত উঠল না। সে স্যানাটরিয়ামে থাকে; তিনবছর রয়েছে, রোগী তো কম দেখল না, কিন্তু কারুরই মুখ দিয়ে যখন তখন রক্ত উঠে বিছানা লাল হয়ে যায় না। রক্ত ওঠে খুব কম রোগীর, সংখ্যায় তারা শতকরা দশটার বেশী হবে না। তাও রোজ রোজ ওঠে না, কিম্বা যখন রক্ত ওঠে তখন তারা প্রেমের কথা কয় না। কোন কথাই কয় না—ক্ষমতা থাকে না।

নিরুপমা ভাবে সে যখন ভাল হয়ে যাবে, এই নিয়ে কাগজে লিখবে, তার অনেক কিছু বলবার আছে। বাংলা দেশের লেখক-সমাজের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ জানাবে,—"দোহাই তোমাদের, মিনতি করছি, আমাদের তোমরা আর গল্পের নায়িকা কোরো না। কোন মাধুর্য্যই আমাদের নেই। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার মধ্যে কী অসীম সৌন্দর্য্যের সন্ধান তোমরা পেয়েছ তা

তোমরাই জান, কিন্তু আমি তো নিদারুণ যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। তোমরা শুধু দূর থেকে দেখে আর শুনে আমাদের নিয়ে যা খুশী তাই লিখো না। সত্যি যদি কাছে এসে ভাল করে দেখতে তাহলে হয়ত তোমাদের গল্প লেখবার সাধ মিটে যেত। যদি আর একটু ভাল করে মিশতে আমাদের সঙ্গে, দেখতে পেতে তোমাদের কল্পনার সঙ্গে কোথাও আমাদের মিল নেই। রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে করে কী ভীষণ স্বার্থপর আমরা হয়ে গেছি। মায়া, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা সব আমাদের জ্বরের তাপে শুকিয়ে মরে গেছে। এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় পৃথিবী—যা আজ আমাদের ভোগের বাইরে চলে গেছে, তার ওপরে আছে শুধু অসীম বিতৃষ্ণা। নিরুপায় হতাশাপূর্ণ হিংসা।" নিরুপমা শিউরে উঠলো। হিংসা? সে কী ভাবছে? সে কী আজ হিংসাও করছে অপরকে? এত অবনতি তার হয়েছে? কিন্তু আজ তো সে নিজের কাছে নিজেকে লুকোতে পারে না, মনোবিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছে, এই যে সব কিছুর প্রতি নিদারুণ ঔদাসীন্য,অসীম বিতৃষ্ণা,এটা হিংসারই নামান্তর ছাড়া কিছু নয়। অক্ষম বঞ্চিতের হিংসা।

প্রেম? প্রেম কী? নিরুপমা ভুলে গেছে। নিজেকে ভুলে গিয়ে একজনকে ভালবাসা তার সুখের জন্য নিজের কষ্টকে তুচ্ছ করা এই রকম কোন মনোবৃত্তি কি মানুষের থাকে? তার ছিল? কে জানে, নিরুপমা ভুলে গেছে। মনই কি আছে? সেও কবে মরে গেছে। এখন শুধু মানুষের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্পর্ক। বহুদিন স্যানাটরিয়ামে বাস করার ফলে সে জেনেছে যে নিজের সুবিধা নিজে করে নিতে না পারলে কেউ তোমার মুখ চেয়ে করে দেবে না। স্বার্থপর,চক্ষুলজ্জাহীন না হতে পারলে তার অশেষ দুর্গতি।

তার মাথা গরম হয়ে উঠল। একবার এসব জিনিষ নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলে তার মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুটতে থাকে। ভাবনার কি শেষ আছে? আবার সে বইখান তুলে নিলে।

—অবিনাশ শান্তির মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বাতাস করতে লাগলো। রুমাল দিয়ে সযত্নে তার মুখখানি মুছিয়ে দিল।

হায়! এও মিথ্যে কথা। লেখক কি জানে না কতবড় ছোঁয়াচে এই রোগ! আর কতখানি ভয় মানুষের প্রাণে? এ ভয়ের কাছে স্বামীর প্রেম, স্ত্রীর ভালবাসা, পিতার স্নেহ সব বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। অসীম ভালবাসাও এই ভয়ের কাছে তুচ্ছ। নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দিতে সে আজ পর্য্যন্ত কাউকে দেখলে না। আর রোগীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে তাহলে সে তা করতে দেবেও না। লেখক মহাশয়রা জানেন না—এ জ্ঞান প্রত্যেক রোগীরই থাকে কাসি অথবা রক্ত ওঠার সময় তার যত কষ্টই হোক্ কাউকে সে কাছে আসতে দেয় না, গায়ে এলিয়ে পড়া তো দূরের কথা।

এসব খবর কি তোমরা রাখ? তোমরা খালি যক্ষ্মারোগীকে দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলাতে পার, আর কাজ শেষ হয়ে গেলেই মেরে ফেলতে পার।

হায় রে! এ দয়াটাও যদি ভগবান আর একটু অকৃপণভাবে করতেন। যক্ষ্মারোগীর মৃত্যুও তো সহজে হয় না। জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তবুও তারা বেঁচে থাকে। অশেষ কষ্ট নিজে পেয়েও লোককে দিয়ে, সকলের ধৈর্য্য ও অর্থ শেষ করে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে ধনেপ্রাণে মেরে তবে তাদের এই ঘৃণিত ধিক্কারপূর্ণ জীবনের শেষ হয়। যমের অরুচি যক্ষ্মারোগী! যে সময়ে মরলে সহানুভূতি পাওয়া যেত, তার দু'বছর পরে তারা মরবে। সে নিজেও তিন বছরের বেশী ভুগছে, কই এখনও মরলো না তো। তা[illegible] স্বামী পিতামাতা আগে তার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হ[illegible] কেঁদেছিলেন, এখন মরণ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে ভীত হয়েছেন। এ[illegible] শেষ কোথায়?

নিরুপমা চোখবুজে শুয়েছিল, পায়ের শব্দে চোখ তাকাল কতকগুলি সুসজ্জিত নরনারী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সকৌতূহ[illegible] তার দিকে চেয়ে আছে। হাসপাতাল দেখতে এসেছে, প্রা[illegible] এরকম আসে। "অসীম সহানুভূতি" নিয়ে দরজার বাইরে থে[illegible] তাদের পর্য্যবেক্ষণ করে যায়। অসহ্য। সে যখন ভাল হয়ে যা[illegible] এই নিয়ে কাগজে লিখবে। তার অনেক কিছু বলবার আছে লোকগুলি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কি দেখছে? তার চেঁচি[illegible] বলতে ইচ্ছে করে—"ওগো তোমরা আমাদের দিকে অমন ক[illegible] কী দেখ? এটা চিড়িয়াখানা নয়। আমরাও একদিন তোমাদে[illegible] মতই মানুষ ছিলাম। হয়ত এখনও আছি। কিন্তু তোমাদে[illegible] মুখ দেখে মনে হচ্ছে—একটা বিচিত্র জীব দেখছ। তোমরা দয়া ক[illegible] চলে যাও। আমাদের শরীরের কষ্ট এবং মনের দুঃখ নি[illegible] একপাশে পড়ে আছি. আমাদের তাই থাকতে দাও, এর ওপর আ[illegible] তোমাদের সহানুভূতি দেখাতে এসে আমাদের জ্বালাতন কোরো না কেন আমাদের এমন করে দেখবে?" নিজের মুখটা আড়াল করব[illegible] জন্য সে বইখানা তুলে নিলে। আবার সেই হাস্যকর বর্ণনা- "শান্তির নিদ্রিত দেহখানি একগাছি বাসি বকুলের মালার মত করু[illegible] কোমল ম্লান দেখাচ্ছিল।" ভাল এক কবিত্ব করবার বিষয় পে[illegible] তোমরা। বাসি মালা. ঝরাফুল! এই ভীষণ রোগের মধ্যে এত মিষ্টি কথা ঢোকাতে পার, তোমাদের বাহাদুরী আছে।

এঁরাই হয়ত কেউ ফিরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসবে হয়ত গল্পের উপাদান খুঁজতেই এসেছেন। কিংবা প্রবন্ধ। কিছু জ্ঞাতব্য সব জানা হয়ে গেল। সচক্ষে দেখে গেলেন। এ[illegible] প্রবন্ধের দাম বেশী হবে। সাধারণ লোকে আবার তাই পড়ে জ্ঞ[illegible] সঞ্চয় করবেন—স্যানাটরিয়াম এবং রোগীদের সম্বন্ধে।

কিন্তু সে জানে তাদের বেশীর ভাগই ভুল হবে। সে য[illegible] ভাল হয়ে যাবে তখন সে নিজেই এই সম্বন্ধে কাগজে লিখবে লোকে তখন অনেক সত্যকথা জানতে পারবে। তার অনেক কি[illegible] বলবার আছে।

কবে সে ভাল হবে? শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে থাকে [illegible] পর্য্যন্ত। সব ভাবনার শেষ ভাবনা।

বারাণসী ধামে

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

কাশী সহর ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরানো সহর। এখানে জিনিষ-পত্র কলকাতার চেয়ে বেশ সস্তা। এখনও তামার পয়সা চলে। পাণ্ডাদের উপদ্রব বেশী নেই তবে পথের সাধুবাবাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা যায় না। মন্দিরের আশে পাশে ভিখারীর আক্রমণ মন্দ নয়। কাশীতে এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে কোনও না কোন ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী নেই। কাশী আসমুদ্র হিমাচল, ভারতবাসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথম বারাণসীর অদূরে সারনাথ। যেখানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেছিলেন ও প্রধান পাঁচজন শিষ্য এখানেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কারণ, প্রাচ্য ভূখণ্ডে কাশী তিন হাজার বছরের অতীত ইতিহাস নিয়ে বিদ্যমান। এর প্রতি গলিতে দেব-মন্দির। বাইশ কোটী হিন্দুর জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে অভিষিক্ত এর প্রতি ধূলিকণা।

ষ্টেশনের পথেই ভারতমাতার মন্দির। বাইরের থেকে এই মন্দিরটী আমাদের বেলুড় মঠের মত দেখতে লাগে। তবে অত বৃহৎ নয়। সমস্ত মন্দিরটী কারু কার্য্য খচিত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে ভারতবর্ষের ভৌগলিক মানচিত্র প্রস্তর খুঁদে নির্মাণ করা। অখণ্ড হিন্দুস্থানের পরিকল্পনা করে তার মন্দির স্থাপনের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

ভারতমাতার মন্দির দর্শন করে আমরা বাড়ীতে এলুম। আমাদের বাড়ীটী ছিল ঠিক দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর। আমরা ছিলাম পাঁচ তলায়। প্রত্যহ দিনে পাঁচ ছয় বার সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় আমার মনে হোত আমরা যেন কেদারনাথের যাত্রী। ছাদ ও জানালা দিয়ে সব সময় দেখা যেতো, উত্তরবাহিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। তার পশ্চিম পারে পুণ্যকামী স্নানার্থীর মেলা, পূর্বপারে দেখা যাচ্ছে, কাশীরাজের রাজধানী রামনগর। উত্তর পারে বিন্ধ্যাচল পর্বতমালা অটল গৌরবে স্থির হয়ে আছে; আর দক্ষিণে শুধু জল আর জল। দেখতে দেখতে মনে হয় এ দেখার তৃপ্তি কোন কালে নেই। এই সেই কাশী, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত, সাধক, পাপাত্মা ও দুরাত্মার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরম আশ্রয়স্থল। পাপপুণ্যের অপূর্ব সম্মিলনী সভা। এই গঙ্গায় একবার অবগাহন করলেই দেহ পাপমুক্ত, মন পবিত্র হয়। কিন্তু মনে যার বিশ্বাস নেই কোনও তীর্থে-ই তার দেহ ও মন কখনও পাপমুক্ত পবিত্র হতে পারে না।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে এলুম। লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, তাই সেদিন ছিল ভয়ঙ্কর ভীড়। বসুমতীর বুকে পাথর চাপা দিয়ে মন্দিরের পথ নির্মাণ করা হয়েছে বলেই হয়ত তিনি এই সহস্র সহস্র যাত্রীর ভার বহন করতে সমর্থ হন। আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই বিশ্বনাথের মন্দির। সর্বজাতির সমন্বয় ঘটে এই মন্দির প্রাঙ্গণে। বহু কষ্টে বিশ্বনাথের দর্শন লাভ ঘটল। এখানে দেবাদিদেব মহাদেব বিরাজ-মান। সমস্ত মন্দিরটী লাল প্রস্তরে নির্মিত। এখানে যেমন বহু সাধু সন্ন্যাসী আছে, সেই রকম মন্দিরের আশেপাশেও অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে। নাট-মন্দিরে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসে বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের কাছে জনতার কোলাহল নিস্তেজ হয়ে যায়। তাঁদের সেই বেদ ও সাম গান শুনে মনে হোল, আমরা সুদূর অতীতের সেই আর্যসভ্যতার গৌরবময় যুগে ফিরে গেছি। মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথের বাণী, "প্রেম মোর ভক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া—মোহ মোর মুক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া!"

বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে—শয়ন আরতি। তাঁর পূজার প্রত্যেকটী বাসন, সুবৃহৎ, সুদৃশ্য, রৌপ্য নির্মিত। বাবার স্নানের জন্য দুধ, দই, চন্দন, ফুলের সাজ ইত্যাদি আর বহু জিনিস, ভারে ভারে অকাতরে আসে। সাজ করানোর পদ্ধতিও চমৎকার। সে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। স্নানের পর ভোগের সময়, অসংখ্য যাত্রীর চোখের সামনে ঠাকুর ঘরের দরজায় পর্দার আড়াল দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজে। তারপর রূপার পালঙ্কে বাবার শয্যা প্রস্তুত হয়। এখানে শ্মশানবাসী ভিখারী ভোলানাথ, অন্নপূর্ণার প্রতাপে রাজরাজেশ্বর। সন্ধ্যা আরতির সময়, যাজ্ঞিক ও পুরোহিতবর্গের মন্ত্রপাঠে, ধূপ, ধুনা, পুষ্প চন্দনের গন্ধে; শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্যোদ্যমের বিপুল দ্যোতনায় সমস্ত কাশী সহর যেন ভক্তিতে, সাধনায়, প্রেমে, করুণায় অকস্মাৎ জেগে ওঠে।

দেবেন্দ্র সভা। এই মন্দিরটা দেখার মত একটা স্থান বটে। এর অভ্যন্তরে হিন্দুর সকল দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখতে বড় সুন্দর। সমস্ত শ্বেতপ্রস্তরের, সুবৃহৎ এবং শিল্প চাতুর্যও চমৎকার। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা এই দেবেন্দ্রসভা দেখতে গেলুম। দেখলুম হরপার্বতীর মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী একতারা বাজিয়ে গান গাইছেন। মনে হ'ল এটা যেন সত্যই দেবেন্দ্র সভা! আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে হয়ত গান শুনতুম, কিন্তু সঙ্গীদের ডাকে ফিরতে হোল।

পরের দিন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করতে যাওয়া ঠিক হোল। কাশীর সেই বিখ্যাত পাহাড়ী গলি অতিক্রম করে ঘাটে পৌঁছানো হোল। কাছেই শ্মশান। পাণ্ডাজীকে বহু সাধ্য সাধনা করে সঙ্গীদের লুকিয়ে আমি শ্মশানের মধ্যে ঢুকলুম।

মণিকর্ণিকা ঘাটের পাশেই সিন্ধিয়া ঘাট। বিরাট সে ঘাট। দেখার মত জিনিষ বটে। তার পাদমূলে মাতৃঋণের ধ্বংসস্তূপ পড়ে রয়েছে। প্রবাদ শুনা যায়, কোন রাজা নাকি, মণিকর্ণিকার তীরে এক অপূর্ব কারুকার্য খচিত, বিরাট মন্দির ও ঘাট,নির্মাণ করে দর্পের সঙ্গে বলেছিলেন,

"আমি মাতৃ পিতৃঋণ শোধ করলাম" দর্পিত রাজার স্পর্ধা জননীর সহ্য হয়নি। তাই সেই বিরাট শিল্পচাতুর্যকে জলস্রোতে ধূলিসাৎ করে তাঁর দর্পচূর্ণ করেছিলেন। তারই স্মৃতি অর্দ্ধেক জলগর্ভে, অর্দ্ধেক ভূমিবক্ষে আজও বিদ্যমান। তার পাশেই চক্রতীর্থ। যেখানে হাজার বছর তপস্যার ফলে, ভগবান বিষ্ণু বান মেরে পাতাল কেটে গঙ্গোত্রীকে এনেছিলেন। এখন সেখানে সামান্য একটু ঘোলাজল পড়ে রয়েছে। গঙ্গা দূরে সরে গেছেন, কাজেই পড়ে আছে শুধু স্মৃতি মাহাত্ম্য। পুরাকালে একদিন হরপার্বতী এই ঘাটে স্নান করতে এসে জলকর দিতে অস্বীকার করায়, শিবের কানের মণিকুণ্ডল এই জলে হারিয়ে যায়। তাই এই ঘাটের আদি নাম "মণিকা হারিণী কর্ণিকা।"

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখে অতীত যুগের নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় কাহিনী মনে পড়ে। আর্য সভ্যতার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, শিল্প পুরোভাগে রেখে, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞান ও ললিতকলার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ বলে মনে হয়। সমগ্র বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী দেখলে শুনলে সমস্ত মন এক অপূর্ব আনন্দরসে ভরে ওঠে। মনে হয় আদর্শে এবং প্রাচুর্যে এত বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় এসিয়া খণ্ডের আর কোথাও নেই। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান বাড়ীর অদূরে একটী নূতন কৃত্রিম হ্রদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর পরিকল্পনা অতি চমৎকার! এই হ্রদের মধ্যভাগে একটী সুন্দর অলিন্দ আছে। তার সর্বোচ্চ মঞ্চ হতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টীকে সুন্দররূপে নিরীক্ষণ করা যায়। যিনি এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই সর্বজনবরেণ্য পণ্ডিত মালবীয়কে মনে মনে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বজরা ও শণক্ষেতের পাশ দিয়ে বিরাট প্রাঙ্গণ পার হয়ে আমরা ফিরে এলুম।

সন্ধ্যার তখনও কিছু দেরী ছিল, সেই সময় আমরা দুর্গাবাড়ী দেখে সঙ্কটমোচনের মন্দিরে এলুম। আমলকী বনের ছায়ায় ঢাকা নির্জন মন্দিরটী। মন্দিরের অভ্যন্তরে হনুমানজীর পাষাণ মূর্ত্তি। তার অপর ধারে একটী মন্দিরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। সেই নির্জন মন্দিরের মর্মর চত্বরে বসে বহু সন্ন্যাসী রামায়ণ পাঠ করছেন। আমি খানিকক্ষণ সেখানে বসে শুনলুম। জ্ঞান দিয়ে না বুঝলেও মন দিয়ে কিছু বুঝলুম। জায়গাটী বড় সুন্দর। আমার ভারী ভালো লাগল। ঠিক যেন সেই আদিকালের শান্ত সৌন্দর্য্যময় ঋষি তপোবন। আমরা যে নাগরিক জীব, আর এটা যে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্লাবিত, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ, একথা কিছুক্ষণের জন্য মন থেকে মুছে যায়। মনে হয়, বহু শতাব্দী পূর্বের বৈদিক যুগের এক প্রসন্ন সন্ধ্যায় আমরা ফিরে গেছি। এটা যেন মহাকবি বাল্মীকির আশ্রম। সমস্ত মন্দির ও বনের অন্তরাত্মায় যেন ধ্বনিত হচ্ছে —

"সেই আর্য্যাবর্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনও ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।"

মধ্য ভারতের শের পরব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম্-এ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন আছে। এই উৎসবগুলির মূল্য অপরিসীম। জনসাধারণ্যে প্রচলিত উৎসবগুলিকে 'জন-উৎসব' (**Folk-Festivals**) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। জন-উৎসবগুলি বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং এগুলি সাধারণতঃ ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি দেশের নরনারীর প্রাণের প্রাচুর্য্যের পরিচয়। উৎসবগুলির ভিতর দিয়া নরনারী দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় অপরিমেয় আনন্দ ও বৈচিত্র্য লাভ করে। জন-উৎসবে গ্রামবাসী আনন্দের উচ্ছ্বসিত আবেগ অনুভব করে। উৎসবের বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের অন্তরে আনন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং মানুষের আত্মার সৌন্দর্য্য-পিপাসা তৃপ্ত হয়। ইহাতে মানুষের অন্তর হইতে ক্ষণেকের জন্য দীনতা ও বিষাদ অন্তর্হিত হয়। জন-উৎসবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একস্থানে বলিয়াছেন—"**We, in the United states, are amazingly rich in the elements from which to weave a culture. We have the best of man's past on which to draw, brought to us by our native folk from all parts of the world. In binding these elements into a native fabric of beauty and strength, let us keep the original fibers so intact that the fineness of each will show in the complete handiwork.**"

এখানে মধ্য ভারতের জনসাধারণ্যে প্রচলিত 'শের পরব' সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। বাংলার স্থানে স্থানে যেমন পৌষ সংক্রান্তির দিনে ব্যাঘ্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ উৎসব মধ্য ভারতে 'শের পরব' নামে সুপরিচিত। বাংলায় পৌষ-সংক্রান্তির সময়ে গ্রামবাসীরা দল বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে 'দক্ষিণরায়ের গান' অথবা 'বাঘাইর বয়াত্' গাহিয়া দান গ্রহণ করে এবং পৌষ-সংক্রান্তির দিনে গ্রামের মণ্ডপে মাটির ব্যাঘ্র মূর্ত্তির পূজা দেয়। মধ্য ভারতের শের পরবে কিন্তু বেশ বৈচিত্র্য রহিয়াছে। পল্লীতে একটী করিয়া দল সংগঠিত হয় এবং আট দশজন 'শের' অর্থাৎ ব্যাঘ্র সাজে। প্রত্যেকের সমস্ত গাত্র হলুদ, কাল প্রভৃতি বর্ণে বিচিত্রিত করা হয় এবং মুখে ব্যাঘ্রের মুখোস ও কোমরে লেজ পরাইয়া দেওয়া হয়। পল্লী-শিল্পীরা সোলা দিয়া রং বেরং-এ চিত্রিত করিয়া ব্যাঘ্রের মুখোস ও কাপড়ের সাহায্যে লেজ তৈয়ারী করে। এইরূপে 'শের' দল প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ঢোল ও সানাইয়ের তালে তালে নাচ দেখায়। শের দলের সর্দ্দারকে লোহার লম্বা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই শের নাচ আরম্ভ হয়। সংক্রান্তি দিনে পাহাড় অঞ্চলে বন-ভোজনান্তে শের পরবের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখানে শের দল সমারোহের সহিত নৃত্য করে। শের পরব উপলক্ষে কোথায়ও কোথায়ও মেলা বসে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরদিন সকাল। প্রতুল চৌধুরীর বাড়ীর ল্যাবরেটরী। কেমিষ্ট্রির যন্ত্রপাতি চারিধারে সাজানো। একটা টুলে প্রতুল বসে। সার্ট আর একটা চেয়ারের পিঠে টাঙ্গানো। ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে প্রতুলের বুক পরীক্ষা করছে।

নিরঞ্জন। হার্ট খুবই ভাল…তবে…

প্রতুল। তবে…কি?

নিরঞ্জন। বীট্‌স ঠিকই আছে, কিন্তু সামান্য হলেও…ডেফিনিট নার্ভাস ট্রেমর রয়েছে।

প্রতুল। (সার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে) এ সময় ওটা স্বাভাবিক। অপারেশান—

নিরঞ্জন। সেজন্য নয়। ওঘরে তোমার বাথটাবে যা তৈরী করে রেখেছ—সেই জন্য।

নোট বুকে লিখতে লাগল। প্রতুল চুপ করে রইল। লেখা শেষ করে

ওতেই কাজ হবে?

প্রতুল। হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। তা হলেই বডির কোন ট্রেস পাওয়া যাবে না। একেবারে ডিজলভ্‌ হয়ে যাবে তো?

প্রতুল। হ্যাঁ। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক্‌।

নিরঞ্জন। (মাইক্রোস্কোপে দেখতে দেখতে) বেশ। আমি তোমার রক্তের স্লাইড পরীক্ষা করছি। রেজার স্লাইড কোথায়?

প্রতুল। দিচ্ছি।

প্রতুল স্লাইড খুঁজতে লাগল

নিরঞ্জন। বডিটা কমপ্লীটলি গলতে কতক্ষণ লাগবে?

প্রতুল। ঘণ্টা পাঁচেক।

নিরঞ্জন। একেবারে সলিউশন, মানে জলবৎ হয়ে যাবে?

প্রতুল। (স্লাইড হাতে) হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। তারপরেই বাথটব ছেড়ে দেবে—ব্যস্‌!

প্রতুল। হ্যাঁ। এই নাও রেজার রক্তের স্লাইড।

নিরঞ্জন। তোমার কেমিষ্ট্রীর জ্ঞান সত্যই অসাধারণ।

প্রতুল। (আড়ষ্ট ভাবে) ধন্যবাদ।

নিরঞ্জন। লোকটার জন্য দুঃখ হয়।

প্রতুল। আমিও কম দুঃখিত নয়, কিন্তু নিরুপায়।

নিরঞ্জন। সে লোকটার নাম কি?

প্রতুল। গিরীন পাত্র।

নিরঞ্জন। গিরীন পাত্র। কাল বলছিলে বটে, ভুলে গিছলুম। (প্রতুলের হাত থেকে রেজার স্লাইড নিয়ে) টাকাটা কবে পাবে?

প্রতুল। যখন সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

নিরঞ্জন। (রেজার স্লাইড দেখতে দেখতে) ঠিক আগেকার মত—

প্রতুল। হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। কি করে টাকাগুলো সরাতে হবে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

প্রতুল। হ্যাঁ। (একটু থেমে) ডাক্তার গুপ্ত, এত কথা জিজ্ঞেস করবার কারণ কি?

নিরঞ্জন। এমনি। কিন্তু তুমি যখন এ সম্বন্ধে কথা বলতে নারাজ, লেট আস ফরগেট ইট। (হঠাৎ চমকে) একি! একবার দেখতো। মোটেই সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না।

প্রতুল। (মাইক্রস্কোপে চোখ দিয়ে) তাইত! তবে?

নিরঞ্জন। তোমার আর রেজার রক্ত এক সাবডিভিজনে পড়ে না।

প্রতুল। কেবল মাইক্রস্কোপিক টেষ্টেই তো মীমাংসা হয় না।

নিরঞ্জন। তা হয় না বটে—তবু…

প্রতুল। না মিললে তো একে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

নিরঞ্জন। শেষ অবধি দেখা যাক। ওর আর একটা স্লাইড কোথায়?

প্রতুল। এই যে।

আর একটা স্লাইড এনে দিল। বাহিরের দরজায় খট খট ধ্বনি

প্রতুল। কে?

জনার্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর। জনার্দন।

প্রতুল। দাঁড়াও খুলছি।

দরজার চাবি খুলতে জনার্দন ঘরে ঢুকল

প্রতুল। কি?

জনার্দন। হুজুর, আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

প্রতুল। কে? কি নাম?

জনার্দন। গিরীন পাত্র।

প্রতুল। গিরীন পাত্র!

জনার্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ। খিড়কী দোর দিয়ে এসেছেন। আর কয়েকটা বাক্স নিয়ে একজন সামনের ফটক দিয়ে এসেছেন—

প্রতুল। কোথা থেকে এসেছে কিছু বলেছে?

জনার্দন। ওষুধের দোকান থেকে। বললে আপনার সই দরকার।

প্রতুল। আচ্ছা। আমি যাচ্ছি। তুমি গিরীনবাবুকে পাশের ঘরে নিয়ে এসে বসাও।

জনার্দনের প্রস্থান

নিরঞ্জন। গরীন পাত্রের আসবার কথা ছিল কি?

প্রতুল। (কোট পরতে পরতে) না। বরং আমি ওকে এখানে আসতে বারণ করেছিলুম।

নিরঞ্জন। রাদার রিস্কি।

প্রতুল। বটেই তো। দেখা যাক কি চায়।

প্রস্থান

নিরঞ্জন একটা টেষ্টটিউবে কি সব করছে। নেপথ্যে প্রতুলের ও গিরীনের কথা শোনা যাচ্ছে

প্রতুল। (নেপথ্যে) কি খবর গিরীনবাবু……

গিরীন। (নেপথ্যে) একটা বিশেষ দরকার ছিল। এসেছি বলে কিছু মনে করেন নি তো?

প্রতুল। (নেপথ্যে) না, বসুন। আমি এখনই আসছি।

কথোপকথন শেষ হয়ে গেল। নিরঞ্জন দরজার কাছে গিয়ে ডাকল

নিরঞ্জন। গিরীনবাবু, ওখানে একলা বসে কেন? ভেতরে আসুন না।

গিরীনের প্রবেশ

গিরীন। ধন্যবাদ! নমস্কার।

নিরঞ্জন। নমস্কার। বসুন।

গিরীন। (বসে) ধন্যবাদ।

নিরঞ্জন। আমার নাম নিরঞ্জন গুপ্ত। প্রতুল বাবুর বন্ধু।

গিরীন। আপনি প্রতুলবাবুর বন্ধু। নমস্কার। পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হলুম। (চারিধারে দেখে) ঘরটা যেন ডাক্তারখানা। প্রতুল-বাবুরও ডাক্তারীর সখ আছে বলেছিলেন।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, তা একটু আছে। আপনি আগে কখনও এখানে আসেন নি?

গিরীন। না। এই প্রথম।

নিরঞ্জন। আমি ওর বন্ধু। মধ্যে মধ্যে ওর কাজে একটু আধটু সাহায্য করি।

গিরীন। আমিও ওঁকে সাহায্য—মানে—

নিরঞ্জন। আপনিও বুঝি ডাক্তার।

গিরীন। আজ্ঞে না। আমার সঙ্গে ওর একটু ব্যবসাদারী—

নিরঞ্জন। ওঃ! আপনি ব্যবসাদার।

গিরীন। মানে দেখুন ঠিক ব্যবসাদার নয় তবে—আজ ভয়ানক গরম।

নিরঞ্জন। কই? বিশেষ গরম বলে তো মনে হচ্ছে না।

গিরীন। আমি খুব জোরে হেঁটে এসেছি কিনা—

নিরঞ্জন। অবশ্য তাহলে গরম লাগবে বই কি। আমি পাখা খুলে দিচ্ছি।

পাখা খুলে দিল

গিরীন। ধন্যবাদ। আমাদের আধ ঘণ্টা মাত্র লাঞ্চের ছুটী। সেই সময়ের মধ্যে আপিস থেকে এখানে আসা আর যাওয়া……মানে বুঝতে পারছেন তো, হাতে সময় খুবই অল্প।

নিরঞ্জন। আপনি প্রতুলবাবুর সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা বলতে চান?

গিরীন। মানে, যদি কিছু মনে না করেন উনি এলে……

কয়েকটা পার্শেল নিয়ে প্রতুলের প্রবেশ

প্রতুল। আই অ্যাম সো সরি, দেরী হয়ে গেল—

পার্সেলগুলি টেবিলের ওপর রাখল

নিরঞ্জন। প্রতুল, আমার নোট বইটা শোবার ঘরে রয়েছে। আমি নিয়ে আসি। কিছু মনে করবেন না গিরীনবাবু…

গিরীন। না, না। বটেই তো, বটেই তো…

নিরঞ্জনের প্রস্থান

প্রতুল। আপনি এখানে এলেন কেন?

গিরীন। কোন ক্ষতি মানে অন্যায়…

প্রতুল। বলেছিলুম না যে, নিজে কখনও এখানে আসবেন না। যদি কেউ দেখে ফেলে…

গিরীন। আমি বাড়ীর পিছন দিকের গলি দিয়ে এসেছি। এত দরকারী কথা যে নিজে না এসে থাকতে পারলুম না। আপনি বলেছিলেন কোন গণ্ডগোল হলে তক্ষুণি আপনাকে খবর দিতে—

প্রতুল। কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

গিরীন। ফণীবাবু, মানে আমাদের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ভারী গোলমাল করছে। এবার থেকে ওয়ার্কশপের লোক এসে টাকা নিয়ে যাবে, আমরা আর ভবিষ্যতে পেঁাছে দেব না।

প্রতুল। তবে তো আমাদের সব প্ল্যানই গুলিয়ে গেল।

গিরীন। প্রায়। তবে নতুন নিয়মে কাজ আরম্ভ হতে এখন দিন দশ বারো লাগবে—

প্রতুল। তা হলে অবিলম্বে কাজে হাত দিতে হয়।

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই পরামর্শই তো করতে এসেছিলুম।

প্রতুল। এই সপ্তাহে কোন বড় চালান আছে?

গিরীন। আপনাকে খোঁজ নিয়ে জানাব।

প্রতুল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ হাসিল করতে হবে।

গিরীন। আমরা তো তৈরী আছি। নয় কি?

প্রতুল। হ্যাঁ। শুধু আপনার মুখের কথার অপেক্ষা।

গিরীন। তারপর আমায় আর কাজ করতে হবে না।

প্রতুল। না।

গিরীন। রোজ রোজ ঘানির বলদের মত খাটুনী—সে সব থেকে রেহাই পাব। কি বলেন?

প্রতুল। পাবেন বই কি।

গিরীন। কোন অভাব অশান্তি আর ভোগ করতে হবে না।

প্রতুল। না, কিছুই আর ভোগ করতে হবে না।

গিরীন। আমার কাপড় জামা সব রেডী করে রেখেছেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। আপনার কাছে যে ব্যাগে টাকা যায় তার ডুপ্লিকেট চাবী আছে তো?

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। বুক পকেটের মধ্যে যে ঘড়ির পকেট আছে তার মধ্যে। (চাবী বার করে) এই দেখুন।

প্রতুল। বেশ। সাবধানে রাখবেন।

গিরীন। সে তো বটেই। এই সপ্তাহে কবে চালান যাবে আর কত যাবে তা খোঁজ পেলেই আপনাকে জানাব।

প্রতুল। আচ্ছা। এখন ওসব কথা থাক—

বাহিরের দরজায় খট খট ধ্বনি

প্রতুল। কে?

জনার্দ্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস।

জনার্দ্দন ভেতরে এল

প্রতুল। কি চাও? বলেছি না কাজের সময় বিরক্ত কোরো না।

জনার্দ্দন। আজ্ঞে কাল যে মেয়েটী এসেছিলেন তিনি এসেছেন—

প্রতুল। মল্লিকা! মিলি! এখানে!

জনার্দ্দন। তাঁকে বসবার ঘরে বসিয়েছি—

গিরীন। আমি এবার যাই—

জনার্দ্দন। তাঁকে এখানে নিয়ে আসব কি?

প্রতুল। একটু পরে। আগে এঁকে পৌঁছে দিয়ে এস—

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। আমি একলা চুপ করে বসে থাকতে না পেরে বিনা হুকুমেই চলে এলুম—(গিরীনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে) সরি, আমি জানতুম না কেউ আছেন—

প্রতুল। তাতে কি হয়েছে। ইট ইজ অল রাইট।

গিরীন। আচ্ছা মিষ্টার চৌধুরী, আমি এবার চলি।

মল্লিকা। আমার জন্যে চলে যাবেন না, আমি না হয় বাইরে একটু অপেক্ষা করছি—

গিরীন। না, না—আমি যাচ্ছিলুমই—

মল্লিকা। আপনাদের কাজের ক্ষতি হ'ল বোধ হয়—

গিরীন। আজ্ঞে না। আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে গেছে। নমস্কার। ধন্যবাদ—

গিরীন ও জনার্দ্দনের প্রস্থান

মল্লিকা। বেশ লোকটী।

প্রতুল। হ্যাঁ।...তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে?

মল্লিকা। পেয়েছিলুম। আপনাকে একটা দরকারী কথা বলবার জন্য তাড়াতাড়ি এলুম?

প্রতুল। কি কথা?

মল্লিকা। আজ সকালে সুবোধবাবু আমাদের বাড়ী গিছলেন।

প্রতুল। ডাক্তার রায়?

মল্লিকা। হ্যাঁ।

প্রতুল। কাল বলেছিলেন বটে তোমার মাকে সকালে দেখতে যাবেন।

মল্লিকা। হ্যাঁ। মাকে দেখতে গিছলেন। কিন্তু তাঁর ভিজিটের আসল কারণ অন্য ছিল।

প্রতুল। তুমি?

মল্লিকা। না আপনি।

প্রতুল। আমি?

মল্লিকা। হ্যাঁ। বাবা কিছু দিন গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন, জানেন?

প্রতুল। না, তা জানতুম না।

মল্লিকা। তাতে প্র্যাকটিসের ক্ষতি হয় বলে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সরকার মহলে ওঁর খুব খাতির আছে।

প্রতুল। তা তো থাকবেই। অত বড় ব্যারিষ্টার, তার ওপর আবার লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলীর মেম্বার—

মল্লিকা। ডাক্তার রায় বাবার কাছে গিছলেন কারণ তিনি একটু... ধাঁধায় পড়েছেন।

প্রতুল। ধাঁধায় পড়েছেন! কেন?

মল্লিকা। আপনি তাঁকে কোন কাজ করতে বলেছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ।

মল্লিকা। তিনি বাবাকে বলেছেন, অবশ্য আমি জানি সব বাজে কথা—যে আপনি ওঁকে এমন একটা কাজ করতে বলেছেন যা ঠিক উচিত নয়।

প্রতুল। উচিত নয়! কেন?

মল্লিকা। জানি না। বাবা আমায় সব কথা বলেনি। আমার মনে কেমন যেন ভয় হ'ল তাই আপনাকে বলতে এলুম। গোলমালের কিছু—

প্রতুল। না, না। ডাক্তার হিসেবে ওঁকে ডেকেছিলুম আমায় একটু সাহায্য করতে। যদি তাঁর আপত্তি থাকে অন্য ডাক্তার ডাকব। এতে অসুবিধার কিম্বা গোলমালের কিছু নেই।

মল্লিকা। যাক্, অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

প্রতুল। আমার মনে হয় উনি মিছিমিছি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছেন, কারণ তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা তিনি ঠিক পছন্দ করেন না।

মল্লিকা। আই ডোণ্ট কেয়ার।...আচ্ছা, এখানে রেজ্জা বলে কোন লোক আছে?

প্রতুল। আছে।...কেন?

মল্লিকা। জেল ফেরত?

প্রতুল। হ্যাঁ।

মল্লিকা। সুবোধবাবু তার কথাও বলেছেন। রেজ্জাকে মানে জেল ফেরত লোককে আপনার কি প্রয়োজন?

প্রতুল। রেজা অথবা জেল ফেরত লোককে আমার ঠিক প্রয়োজন য়। আমার দরকার এমন একজন লোক যে আমার এক্সপেরিমেণ্টে াহায্য করবে। রেজা সাহায্য করতে রাজী হয়েছে, তাই তাকে দরকার।

মল্লিকা। অন্য কোন লোক হলেও চলত'?

প্রতুল। নিশ্চয়ই।

মল্লিকা। তা হলে জেল-ফেরত লোক বলে তাকে নিয়ে গণ্ডগোল রবার তো কোন কারণ দেখি না।

প্রতুল। কোন কারণই নেই। আমি তো বলেছি ও সব বাজে থা। আসল কারণ তুমি।

মল্লিকা। আমার জন্য অনর্থক আপনাকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।

প্রতুল। না মিলি, এ কথা কেন বলছ? তুমি তো জান তামার জন্য…

মল্লিকা। জানি। (একটু পরে) আমার এক এক সময় কি মনে য় জানেন?

প্রতুল। কি?

মল্লিকা। মনে হয় যেন আপনি দু'জন লোক…

প্রতুল। (হেসে) তাই নাকি। এ যে ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড ষ্টার হাইডের মত হ'ল।

মল্লিকা। একজন মিষ্ট কথা কয়, আমাকে…(একটু থেমে) আর একজন রুক্ষ—একনিষ্ঠ সন্ন্যাসী যাকে দেখলে ভয় করে, যার চোখে আগুন লে—আপনার চোখের তারা অমন জ্বলে কেন?

প্রতুল। বোধ হয় ঘরে আলো জ্বলছে বলে অমন দেখাচ্ছে।

মল্লিকা। দিনের বেলা ঘরে আলো জ্বেলে রেখেছেন কেন?

প্রতুল। মাইক্রস্কোপে স্লাইড দেখছিলুম।

মল্লিকা। আপনার বাড়ীটা যেন হাসপাতাল…

প্রতুল। উঁহু, ঠিক হ'ল না। হাসপাতালে রুগী থাকে এখানে রুগী কই? এ যে গবেষণামন্দির।

মল্লিকা। (একটা যন্ত্রের দিকে দেখিয়ে) ওটা কি?

প্রতুল। "ইনফ্রা-রেড" অ্যাপারেটাস। মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করতে হয়।

মল্লিকা। চার ধারেই যন্ত্রপাতি। আমার জানতে ইচ্ছে করে আপনি এখানে কি করেন?

প্রতুল। এই সব গবেষণা ইত্যাদি করি।

মল্লিকা। (ঘরের মধ্যে এদিকে ওদিক বেড়াতে বেড়াতে) কত বই! এটা কি?

প্রতুল। ভরটেক্স মেশিন।

মল্লিকা। ও ঘরটায় কি আছে? (পাশের ঘরের দরজা খুলে) এ যে একটা বাথ টব—

প্রতুল। (রূঢ়স্বরে) হ্যাঁ। ওটা বাথরুম। সরে এস।

উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল

মল্লিকা। রাগ করলেন?

প্রতুল। না, না। আই অ্যাম সরি মিলি—

মল্লিকা। আমার এ সব জিনিষে হাত দেওয়া আপনি পছন্দ করেন না—না?

প্রতুল। তা নয়। চারধারে ওষুধ বিষুধ ছড়ানো রয়েছে, যদি হাত পা পুড়ে যায়—তার চেয়ে এস, তোমায় মাইক্রস্কোপ দেখাই—

মল্লিকা। মানে যাতে আর আমি কোন দুষ্টুমী না করতে পারি। বড্ড বিরক্ত করছি না?

প্রতুল। ও কথা বোলো না মিলি।

মল্লিকা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

প্রতুল। কি?

মল্লিকা। এখান থেকে চলে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন?

প্রতুল। না। আমি তো বলেছি আমায় যেতে হবেই এবং—হয়ত' কিছু দিনের মধ্যেই—

মল্লিকা। কেন?

প্রতুল। নিরুপায়। যদি সম্ভব হত…(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

মল্লিকা। অসম্ভব কিসে?

প্রতুল। তা তোমায় বোঝাতে পারব না মিলি।

মল্লিকা। কেন পারবে না?

প্রতুল। কারণ…(মিলির একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে) কারণ, মিলি আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। কিন্তু আমার এই কাজ—

মল্লিকা। আমি লেখা পড়া শিখেছি। তোমার কাজে তো আমি সাহায্য করতে পারি। তুমি আমায় শিখিয়ে নেবে—

প্রতুল। তা হয় না মিলি।

মল্লিকা। কেন হয় না? পৃথিবীতে কোন কাজ শেখাই অসম্ভব নয়। মেয়েরাও তো ডাক্তার হয়—

প্রতুল। কিন্তু এ তো ঠিক ডাক্তারী নয়—

মল্লিকা। তবে কি?

প্রতুল। আমি বলতে পারব না। আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। এ অসম্ভব। তোমাকে এর মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। মিলি, তুমি যাও—আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, আর এস না—

মল্লিকা। (ভীত ভাবে) কি বলছেন? চলে যাব—

প্রতুল। না, না, মিলি, তুমি যেও না। আমি একা, বড় একা। একটু আগে মনে হয়েছিল তুমি পারবে—আমার কাজের, আমার জীবনের—

মল্লিকা। কেন পারব না বল?

প্রতুল। (মল্লিকার দিকে চেয়ে) পারবে? হয়ত' পারবে। তুমি আর আমি—জগতে প্রথম…সত্যই চমৎকার হবে…কিন্তু না, না, তা হতে পারে না—সে এক ভয়ানক জীবন!

মল্লিকা। তুমি অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন?

প্রতুল। আই অ্যাম সো সরি। মিলি, আমায় ক্ষমা করো। কি আবোল তাবোল বকছিলুম—আজ ওসব কথা থাক্—

বাহিরে হৈ হৈ ধ্বনি

প্রতুল। কে?

জনার্দ্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস।

জনার্দ্দনের প্রবেশ

প্রতুল। কি?

জনার্দ্দন। একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন—

কার্ড দিল

প্রতুল। (কার্ড দেখে) ডিটেক্‌টিভ ইন্‌সপেক্টর খগেন দত্ত—

মল্লিকা। খগেন দত্ত। আমাদের বাড়ীতে বাবার কাছে তিনি বহুবার এসেছেন। আমি তাঁকে চিনি।

প্রতুল। কিন্তু আমার কাছে কেন?

মল্লিকা। নিশ্চয়ই এ সুবোধবাবুর কাজ।

প্রতুল। তা হতে পারে। (জনার্দ্দনের প্রতি) ওঁকে এখানে নিয়ে এস, আর ডাক্তার গুপ্তকে একবার আসতে বল।

জনার্দ্দন। আচ্ছা হুজুর।

জনার্দ্দনের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

স্থূল দৃষ্টি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার চোখে যা লাগেনাকো ভাল—
দেখেই বলো না ছাই,
হয় ত তাহার মহিমা বুঝিতে
অধিকারী হওয়া চাই।
চেনে যারা, জানে তারাই ত দাম,
শিলা হয়ে পড়ে রহে শালগ্রাম,
জানে ভূ-গর্ভে মণি-রত্নের
সন্ধান গুণীরাই।
রুক্ষ প্রাচীন তুলট কাগজ
নেহাৎ অসুন্দর,
কত অমৃত ধরিয়া রেখেছে
কাল ও কালির গড়।
কতই শান্তি, কত আনন্দ,
ওকি ধ্রুবলোক রয়েছে বন্ধ
যাহার নিকটে তুচ্ছ ক্ষুদ্র
গোটা এ পৃথিবীটাই।
দেখিয়া দেখি না শুষ্ক শীর্ণ
বসে আছে সন্ন্যাসী,
বুঝিনা ও বুকে কত উৎসব
কত আনন্দ রাশি।
চলে শ্রীহরির কত রাস, দোল,
কত ঝুলনের কত হিল্লোল,
সুধা সাগরের কত কল্লোল উঠিতেছে একলাই।
মন্দির গায়ে কুৎসিত ছবি দেখিয়াই হয় ঘৃণা,
আছে ভক্ত ও শিল্পীর কাছে মূল্য উহার কি না?
মন তন্ময়, জানে না বিকার,
মন্দিরে তারি প্রবেশাধিকার,
পিপাসু চকোর সুধা চায় শুধু
আন ক্ষুধা তার নাই।
পূজার পথেতে নীড় পাতাইয়া
বিলাসিনী দল রয়
মুক্তা-তোলার ডুবারীরে কিসে
ভুলাবে সফরীচয়?
যাহারা পূজারী, যারা উপাসক,
তারা চির শিশু তাহারা বালক,
দেখিয়া তাদিকে পাপ প্রলোভন
ভাবে "লাজে মরে যাই।"
লৌহ মনকে চুম্বক পারে
করিতে আকর্ষণ
সোনা যে হয়েছে নির্ভিক আর
নির্ম্মল তার মন।
ছাগলে কি ভয় কল্পতরুর,
ঘুঘু ফাঁদে পড়ে, পড়েনা গরুড়,
কালো ও নিকষে খাঁটি স্বর্ণের
প্রথমে হয় যাচাই।
বাহির দেখিয়া আমরাই ভুলি অনধিকারীর দল,
বুঝিতে পারিনে তবু করি শুধু তর্ক ও কোলাহল।
চিনিতে দেবের চরণ দাগগো,
চাই যোগ্যতা—চাই যে ভাগ্য,
বুঝা ও পড়ায় পাইনে যাহারে পূজায় তাহারে পাই।

নঞ্‌তৎপুরুষ*

বনফুল

১

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল কিন্তু পুরন্দরবাবু কার্য্যগতিকে কোলকাতা ছাড়তে পারলেন না। দার্জ্জিলিং যাবেন ঠিক ছিল কিন্তু সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল। হাইকোর্টে মকোর্দ্দমাটার কোন কূলকিনারাই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। জমিদারি সংক্রান্ত এই মকোর্দ্দমাটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে যেন। বেশ ভালর দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কেমন বিগড়ে গেল। হু হু করে' টাকা খরচ হচ্ছে, নামজাদা বড় বড় উকীল লাগিয়েছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন তিনি, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, নিজেই নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে সুরু করেছেন। দলিলপত্র দেখে নিজে যে এজাহারটা লিখেছিলেন তাঁর উকীল নাকচ করে' দিলে সেটাকে। তিনি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, সাক্ষী জোগাড় করছেন, একে বলছেন, তাকে ধরছেন—এবং সম্ভবত কাজের চেয়ে অকাজই করছেন বেশী। তাঁর উকীল অন্তত সেই কথাই বলছে। সে তাঁকে দার্জ্জিলিং পাঠাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পুরন্দরবাবু কিছুতেই যেতে পারছেন না। কোলকাতা শহরের ধুলো, ধোঁয়া, গরম, কলের তেল, পচা মাছ, শ্যামবাজারে তাঁর বাড়ির পাশের ড্রেনটা সব হার মেনেছে। পুরন্দরবাবুকে কিছুতেই কোলকাতা থেকে তাড়ান যাচ্ছে না। "কিচ্ছু হচ্ছে না, সব গেল" বারম্বার তিনি মনে মনে আবৃত্তি করছেন, স্নায়বিক বিকার বেড়ে যাচ্ছে রোজ, কিন্তু কিছুতেই কোলকাতা ছাড়তে পারছেন না।

একদা পরিপূর্ণ এবং বিচিত্র জীবন ছিল পুরন্দর রায়চৌধুরীর। যদিও বয়সের হিসাবে তিনি যৌবন-সীমা পার হয়েছেন—এখন আটত্রিশ বছর বয়স তাঁর—কিন্তু বুড়ো হবার সময় হয় নি এখনও। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে বার্দ্ধক্য এসে গেছে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে এসে গেছে। বয়সের হিসাবে নয় অন্তরের মানদণ্ডে, বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে অনুভব করছেন তিনি এবং যতই সেটা অনুভব করছেন ততই যেন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন আরও। বাইরে থেকে এখনও তাঁকে বেশ শক্ত সমর্থ দেখায়। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি, একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—একটি পাকেনি এখনও। যদিও খুব ছিমছাম নন, কিন্তু একটু নজর করে' দেখলেই বোঝা যায় যে অভিজাত বংশের ছেলে তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। কথায় ব্যবহারে বনেদি ঘরের চিহ্ন সুস্পষ্ট এখনও। ইদানিং অবশ্য চরিত্রে একটু শৈথিল্য এসেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে—তবু কিন্তু অভিজাতসুলভ সহজ সহৃদয়তা অবলুপ্ত হয় নি এখনও চরিত্র থেকে। এ ছাড়া তাঁর এমন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় আছে—যা প্রায় অহঙ্কারেরই সম-গোত্র। বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কৃতি, এমন কি কিঞ্চিৎ প্রতিভা সত্ত্বেও এই দাম্ভিকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি তিনি কিছুতেই। তাঁর চোখে মুখে ফুটে বেরুত তা। চোখে মুখে একটা সরলতাও ছিল। পুরাকালে তাঁর টকটকে লাল মুখখানাতে এমন একটা নারীসুলভ কমনীয়তা ছিল যা সকলকে মুগ্ধ করত, বিশেষ করে' নারদেরই। এখনও অনেকে তাঁকে দেখে বলে—"বাঃ কি চমৎকার রং, কি সুন্দর স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের।" কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে স্নায়বিক বিকারে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন—তা কেউ বুঝতে পারত না। বড় বড় টানাটানা চোখ ছিল তাঁর—দশ বছর আগে এই চোখই মোহ বিস্তার করত অনেকের মনে—এমন প্রদীপ্ত, এমন প্রাণবন্ত ছিল যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে সে চোখের দীপ্তি নিবে গেছে, চোখের কোনে বলি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ, আশায় আনন্দে ঝলমল করত একদিন যে চোখের দৃষ্টি, এখন তাতে ফুটে উঠছে নীতিচ্যুত বিপর্য্যস্ত ছন্নছাড়া জীবনের ভণ্ডামি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস—কিঞ্চিৎ ব্যথা এবং হতাশা। কেমন যেন একটা নাম-হীন ব্যথা এবং অনির্দ্দিষ্ট হতাশা। যখন একা থাকতেন তখন এই হতাশাটা আরও যেন প্রবল হয়ে উঠত। আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি মাত্র দু'বছর আগে হাল্লা হৈ হৈ নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন, হাসতেন হাসাতেন, চমৎকার গল্প বলতে পারতেন তিনি এখন একা থাকতে পেলে আর কিছু চান না। এই কারণে, তিনি বহু লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছেন যাঁদের সঙ্গে এখনও (মানে, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও) সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলেও চলত। অবশ্য দাম্ভিকতা একটা কারণ। তা ছাড়া কোন কিছুর উপরই আস্থা ছিল না আর। কিছু আর ভাল লাগত না, কারও সঙ্গ আর সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ক্রমশ একা থেকে থেকে তাঁর এই দাম্ভিকতারও রূপ বদলে গেল। একটুও কমল না, বরং ঠিক উল্টো। কিন্তু তা এক বিশেষ রকম অভিনব দাম্ভিকতায় পরিণত হল; নানা বিভিন্ন অদ্ভুত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তেন—যেন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। কারণগুলো অদ্ভুত—পূর্ব্বে একথা ভাবাও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। সেগুলো ঠিক আধিভৌতিক নয়, যেন আধ্যাত্মিক। "আধ্যাত্মিক কারণে কারও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব না কি"—নিজেই মনে মনে বলতেন, কিন্তু কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না।

না, কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না। একটা 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার সর্ব্বদাই চিত্তকে আকুল করে' রাখত। পূর্ব্বে এমন কখনও হয় নি—এ সব নিয়ে মাথাই ঘামান নি কখনও ইতিপূর্ব্বে। তিনি সেই সব ধারণাকেই আধ্যাত্মিক বলতেন যা কিছুতেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুতেই যায় না! নিজের অন্তরে অন্তরে তা মানতেই হয়। লোক সমাজে পাঁচজনের সামনে অবশ্য হেসে

* ফিয়ডর ডস্টয় ভেস্কিয় 'দি ইটারনাল হাস্‌বাণ্ড' অবলম্বনে রচিত।

উড়িয়ে দেওয়া যায়—লোক-সমাজের কথাই স্বতন্ত্র! প্রয়োজন হলে কালই তিনি পাঁচজনের সামনে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রসিকতা করবেন হয় তো। বিবেকের কথা, বিশ্বাসের কথা তখন মনেই থাকবে না। আর প্রকৃতই তাই হচ্ছে। তথাকথিত 'স্বাধীন চিন্তা' 'স্বাধীন মতবাদ' প্রভৃতির কবলে' পড়ে এই সেদিন পর্য্যন্ত তিনি এই করেছেন। বিনিদ্র নয়নে সারারাত যা ভাবেন সকালে লজ্জা পান তার জন্য। আজকাল রাত্রে ঘুমও হচ্ছে না। কিছুদিন থেকে এ-ও লক্ষ্য করেছেন যে আজকাল মনটাও বড় সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে—কারণ ক্ষুদ্র বৃহৎ যা-ই হোক। সুতরাং মনের উপর নির্ভর করতে ভরসা হয় না তাঁর। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইদানিং এক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে। রাত্রে তিনি যা ভাবেন, যা সত্য বলে' অনুভব করেন, সকালে ঠিক তা ভাবতে পারেন না, সকালে তা সত্য বলে' স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। রাত্রিতে সমস্ত রূপান্তরিত হয়ে যায় যেন। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে বলেছিলেন ব্যাপারটা। ডাক্তারটি অবশ্য বন্ধুলোক—রহস্যভরেই বলেছিলেন তাকে কথাটা। ডাক্তারবাবু বললেন যে ওরকম হয়। বিশেষত যারা ভাবুক প্রকৃতির তাদের মনে একাধিক বিভিন্ন চিন্তাধারার অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বিনিদ্র রজনীরও এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে যে সমস্ত জীবনের সংস্কার রাতারাতি বদলে যেতে পারে। সব সময়ে হয় না অবশ্য। কেউ যদি তার এই দ্বিবিধ সত্তার সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হয়ে কষ্ট পায় তাহলে অবশ্য সেটা রোগেরই সূচনা বলে' ধরতে হবে এবং তার চিকিৎসা করা উচিত। সব চেয়ে ভাল হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুরটাই বদলে ফেলা। আহার, বিহার, পারিপার্শ্বিক সমস্ত আমূল পরিবর্ত্তন করা। সব ছেড়ে ছুড়ে দিনকতকের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়া মন্দ নয়···ওষুধ অবশ্য আছে··· কিন্তু···

পুরন্দরবাবু আর শুনছিলেন না—তিনি যা জানতে চাইছিলেন তা জেনে গেছেন। এটা একটা অসুখেরই সূচনা তাহলে।

"অসুখ? এই সব আধ্যাত্মিক ধারণা অসুখ ছাড়া কিছু নয় তাহলে।" মন কিন্তু কিছুতেই মানতে চাইত না এ কথা।

অনতিকাল পরে আর একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এতদিন যা রাত্রিতেই নিবদ্ধ ছিল তা সকালেও ঘটতে লাগল। তফাত রাত্রিতে মনটা বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত সকালে হত রাগ। রাত্রির আবেগ সকালে রূপান্তরিত হত তিক্ত আত্মগ্লানিতে। অতীতের—এমন কি সুদূর অতীতের কতকগুলো ঘটনাও—বার বার মনে পড়ত। অদ্ভুতভাবে মনে পড়ত। কিছুতেই এড়াবার উপায় ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য্য কাণ্ড। পুরন্দরবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। পরিচিত লোককে চিনতে পারেন না, নাম মনে থাকে না, বই পড়বার দুই একদিন পরেই গল্পটা ভুলে যান—এ সবের জন্যে অনেকবার অপ্রস্তুতও হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু স্মৃতি-ভ্রংশ হওয়া সত্ত্বেও সুদূর অতীতের এই ঘটনাগুলো—যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি—এমন স্পষ্ট এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আশ্চর্য্য রকম নিখুঁতভাবে স্মৃতিপটে ফুটে উঠছে কি করে? মনে হচ্ছে কিছুই যেন অতীত হয় নি, আবার যেন ঘটছে সব, আবার যেন সে জীবন ভোগ করছেন তিনি। অস্বাভাবিক অলৌকিক কাণ্ড বলে' মনে হচ্ছে তাঁর এটা। এমন কতকগুলো ঘটনা মনে পড়ছে যা বিস্মৃতির তলায় একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়—অতীতের অনেক কথাই অনেকের অনেক সময় মনে পড়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই—কিন্তু পুরন্দরবাবুর যা হচ্ছিল তা একটু বিস্ময়কর। শুধু স্মৃতি নয়, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অনুভূতি যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছিলেন তিনি—মনে হচ্ছিল কেউ যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই জীবনের ঘটনা-প্রবাহের মাঝখানে। অতীত জীবনের এই ঘটনাগুলোকে হঠাৎ পাপ বলেই বা মনে হচ্ছে কেন? নিজে বিচার করে' যে সেগুলোকে পাপ বলে' ঠিক করছেন তা নয়—নিজের এই ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ অসুস্থ মনের উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই তাঁর···কিন্তু আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে অকারণে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে! মাত্র দু'বছর আগেও কি তিনি ভাবতে পারতেন—কেউ কি ভাবতে পারত—যে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়া সম্ভব!

প্রথম প্রথম যে ঘটনাগুলো তাঁর মনে পড়ছিল সেগুলো ঠিক অশ্রু-জনক নয়—ক্ষোভজনক। জীবনের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ছিল, কোথায় কবে অপমানিত হয়েছিলেন তা-ও মনে পড়ছিল। একবার একটা লোক কুৎসা রটিয়েছিল তাঁর নামে, ফলে ভদ্রসমাজে গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর কিছুদিন। প্রকাশ্য সভায় একটা লোক অপমান করেছিল তাঁকে একবার, কিন্তু তিনি মানহানির মকোর্দ্দমা করেন নি: আর একবার এক মহিলা-মজলিসের কয়েকটি সুন্দরী সভ্যা তাঁর সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল তার জবাব দিতে গিয়ে আরও হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন তিনি: টাকা ধার করে' শোধ করেন নি এরকম কয়েকটা ঘটনাও মনে পড়ল—সামান্য সামান্য টাকা—কিন্তু শোধ করা হয় নি। শুধু তাই নয় তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন—নিন্দাও করেছেন তাদের নামে। খুব যখন মন খারাপ হ'ত তখন মনে পড়ত—দু' দুবার কি জঘন্য বাজে ব্যাপারে টাকা উড়িয়েছেন তিনি। এক আধটাকা নয় প্রচুর টাকা! কিন্তু এসবের চেয়ে গুরুতর ঘটনাও মনে পড়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বুড়ো কেরাণীটার কথা মনে পড়ে যেতে—সেই নিরীহ পক্ককেশ লোকটাকে চোখের সামনে দেখতে পেতেন যেন, বিস্মৃতির তলায় সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে গিয়েছিল অথচ···হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যেত। বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ্যে লোকটাকে অসঙ্কোচে অপমান করেছিলেন তিনি। কোন কারণ ছিল না, কেবল বাহবা পাবার জন্য তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে' একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করবার জন্য অনেক লোকের মাঝখানে অপ্রস্তুত করেছিলেন লোকটাকে। এই রসিকতাটি করার জন্যে বন্ধুবান্ধবদের কাছে খাতির বেড়ে গিয়েছিল তাঁর! ঘটনাটা এত দিন আগে ঘটেছিল যে ভদ্রলোকের নামটা পর্য্যন্ত ঠিক মনে করতে পারছিলেন না তিনি···কিন্তু আর সমস্ত পরিষ্কার মনে পড়ছিল···পারিপার্শ্বিক সমস্ত ছবি হুবহু যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। বেশ মনে পড়ছে ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের পক্ষ সমর্থন করছিলেন—অবিবাহিত

মেয়ে—যৌবন সীমা পার হয়েছে—তাকে কেন্দ্র করে' নানারকম গুজব উঠেছিল তখন। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম বেশ জোর গলায় তর্ক করছিলেন, পুরন্দরের বাক্যবাণে বিধ্বস্ত হয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেললেন—সকলের সামনে। এখন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই ছবিটা মনে পড়ছে। ছোট ছেলের মতো কাঁদছিল লোকটা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—দুহাতে মুখ ঢেকে। হঠাৎ মনে হল এ ছবি তাঁর মনে বরাবর আঁকা আছে—কোনদিনই মুছে যায় নি। আর আশ্চর্য্য—তখন যা খুব কৌতুকজনক বলে' মনে হয়েছিল—যেমন ওই ছোট ছেলের মতো দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদাটা—এখন তা আর মোটেই কৌতুকজনক নেই। বরং ঠিক উল্টো।

আর একটা ঘটনা। একবার এক গরীব স্কুল মাষ্টারের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসিৎ একটা রসিকতা করেছিলেন তিনি—কেবল নিছক রসিকতার খাতিরেই। সে কথা তার স্বামীর কাণে গিয়ে উঠেছিল। ফলে কি হয়েছিল তা অবশ্য তিনি জানেন না, কারণ ঠিক তারপরই তাঁকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল—কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে ও জাতীয় রসিকতার বিষময় ফল হওয়া অসম্ভব নয়—হয় তো হয়েছিল···এই নিয়ে তাঁর কল্পনা হয় তো অনেক জাল বুনতো—কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই সেদিনের কথা। সামান্য একটা চাকরাণির সঙ্গে কি কাণ্ড করলেন তিনি···তার যে প্রেমে পড়েছিলেন তা নয়···কিন্তু তাকে নিয়ে যা ঘটল তা লজ্জাকর। আর সব চেয়ে লজ্জাকর তাকে ফেলে পালানো···অসহায় শিশুটার দিকে পর্য্যন্ত চেয়ে দেখেন নি তিনি···অবশ্য এও ঠিক—একটা জরুরি দরকারে তাঁকে চলে' যেতে হয়েছিল সে সময়—দেখা করবার সময়ও ছিল না—তারপর এক বচ্ছর ধরে' তিনি মেয়েটাকে খুঁজেছিলেন, কিন্তু আর পান নি। এরকম বহু ঘটনার স্মৃতি মনে জাগছে···মনে হচ্ছে আরও আছে। আত্মসম্মান সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ।

আত্মসম্মানবোধের মানদণ্ডটাও তাঁর বদলে যাচ্ছিল যেন ইদানিং। আজকাল (অবশ্য, মাঝে মাঝে) পায়ে হেঁটে বেড়াতে তাঁর আর লজ্জা হত না তত। নিজের গাড়ি নেই, রাস্তায় রাস্তায় আপিশে আদালতে টো-টো করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরণে আড় ময়লা জামা কাপড়—আগে এ অবস্থায় পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন—আজকাল ভ্রূক্ষেপই করেন না। ভণ্ডামি নয়। সত্যিই এরকম মনোভাব হচ্ছিল তাঁর আজকাল। কিন্তু সব সময়ে নয়। মাঝে মাঝে এরকম হত—বিশেষ করে' যে সময়ে তাঁর মানসিক চঞ্চলতা বাড়ত, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হয়ে পড়তেন—সেই সময়ে মনে হ'ত···। কিন্তু না, আত্মসম্মানবোধের চেহারাটা বদলে ছিল সত্যিই। যে সব বাহ্যিক আড়ম্বর আত্মমর্য্যাদার জন্তে প্রয়োজনীয় মনে হত আগে, আজকাল তার অভাব বা আধিক্য মনকে আর নাড়া দেয় না তত। আজকাল সমস্ত মন একটি কথাই ভাবছে কেবল এবং দিবারাত্রি সেই দিকে উন্মুখ হয়ে আছে।

শ্লেষ-ভরে মাঝে মাঝে ভাবতেন (এবং যখনই আজকাল নিজের সম্বন্ধে ভাবতেন শ্লেষ থাকত তাতে)—"স্বর্গে হয় তো ভগবান ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমার জন্তে! আমার চরিত্র সংস্কার না করা পর্য্যন্ত ঘুম হচ্ছে না তাঁর বোধহয়। ক্রমাগত জাগিয়ে তুলছেন বীভৎস স্মৃতিগুলোকে। অনুতাপের অশ্রু! হতে পারে। কিন্তু কিছু হবে না। বন্দুক ছুঁড়লে কি হবে—টোটা একদম খালি! আমি জানি না নিজেকে? স্মৃতি অনুতাপ চোখের জল—সমস্ত সত্ত্বেও কিছু করবার উপায় নেই আমার। প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞা সত্ত্বেও আমি কিছু বদলাই নি। কালই যদি প্রলোভন আসে, কালই যদি ঘটনাচক্র এমন হয় যে একটা গুজব রটিয়ে দিলেই আমার স্বার্থসিদ্ধি হবে কালই আমি আবার গুজব রটিয়ে দিতে পারি যে ওই স্কুলমাষ্টারের রূপসী বউ লুকিয়ে টাকা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। কালই পারি আবার—একটু ইতস্তত করব না। অতিশয় ঘৃণ্য জেনেও করব না। ফের যদি আমাকে সেই পুরুতটা আবার অপমান করে—আবার জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব তার··· তার মেয়ের কান্নায় দৃকপাত করব না। সুতরাং টোটায় কিছু নেই··· বন্দুক ছোঁড়া বৃথা। বুঝলেন ভগবান মশাই? অতীতের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়ে, লাভ কি···নিজের হাত থেকেই যে পরিত্রাণ নেই আমার···"

যদিও স্কুল মাষ্টারের স্ত্রীর নামে গুজব রটাবার অথবা পুরোহিতের মুখে জুতো মারবার কোন সুযোগ আর উপস্থিত হল না—কিন্তু উপস্থিত হলে যে তিনি দ্বিধা করবেন না এই চিন্তাই পুরন্দরবাবুকে দগ্ধ করতে লাগল। কোন মানুষই অনুতাপানলে একটানা দগ্ধ হয় না, মাঝে মাঝে ছাড়া পায় এবং সেই মুক্ত অবস্থায় জীবনকে উপভোগও করে।

পুরন্দরবাবুরও অনুতাপের অবকাশে জীবন-উপভোগে আপত্তি ছিল না। অরুচিও ছিল না। কিন্তু কলিকাতা-প্রবাস মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে উঠত তাঁর কাছে। জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হতে চলল···মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছিল মকোর্দ্দমা টকোর্দ্দমা চুলোয় যাক—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, পিছন দিকে না চেয়ে···সোজা কোথাও দৌড় দিতে। বনে পর্ব্বতে যেখানে হোক। হরিদ্বারে গেলে হয়! কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই সব উলটে গেল আবার। মনে হল—"হরিদ্বারেই যাই আর যেখানেই যাই 'কমলি' তো ছাড়বে না কিছুতেই। তাছাড়া দায়িত্ব যখন নিয়েছি—তখন ফেলে পালানোর কোন মানে হয় না। পালাবই বা কেন? এই ধুলো এই গরম, এই বিশৃঙ্খলা এই তো বেশ। আদালতে ওই যে শকুনের ঝাঁক বসে রয়েছে—প্রকাশ্যভাবে দিব্যি ছেঁড়াছেঁড়ি করে' খাচ্ছে—সঙ্কোচ নেই, লজ্জা নেই, ভণ্ডামি নেই। রাস্তায় জনস্রোত চলেছে, স্বার্থপর, ভীরু, লোভীর দল···তার মতো পাষণ্ডের পক্ষে এই তো স্বর্গ! সমস্তই খোলাখুলি, সমস্তই স্পষ্ট পরিষ্কার—ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। তথাকথিত ভদ্র সমাজের মুখোস-পরা ভণ্ডামির চেয়ে এ ঢের ভাল। এ সারল্যকে বরং শ্রদ্ধা করা চলে। যাব না—এইখানেই থাকব আমি।"

ক্রমশঃ

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

(১৪)

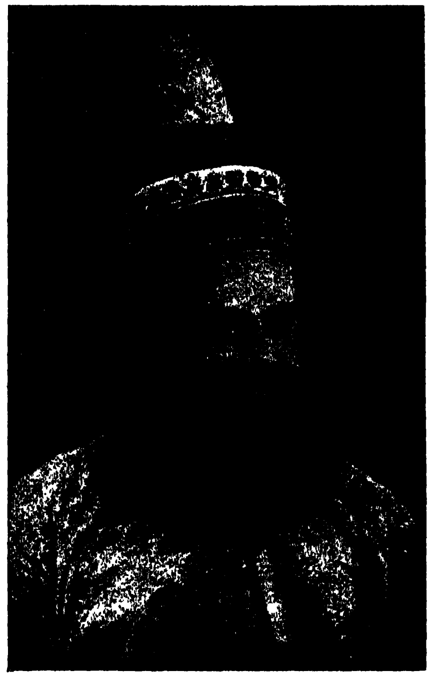
১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে উমেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশন হইয়াছিল এলাহাবাদে লাউদার কাস্‌ল্‌ নামক প্রাসাদে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, কারণ কংগ্রেসের জন্যই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ইতোমধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তখন স্থান সংগ্রহে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ; সেই-জন্য দ্বারভাঙ্গার স্বদেশহিতৈষী মহারাজা স্তর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর লাউদার কাস্‌ল্‌ ক্রয় করিয়া কংগ্রেসকে ব্যবহার করিতে দেন। স্তর হেনরি কটন



মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

তাঁহার Indian & Home Memories নামক গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী। ভূতপূর্ব্ব মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত, দয়ালু ও মহৎচরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। * * তিনি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং উহার জন্য প্রভূত অর্থদান করিতেন। তাঁহার সরল জীবন-যাত্রা প্রণালী ও দেশবিস্তৃত সুখ্যাতি সত্বেও কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতির জন্য 'সন্দেহজনক পাত্রগণের তালিকায়' তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে গোয়েন্দারা অনুসরণ করিতেছে বলিয়া তিনি আমার নিকট ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাকে এই গোয়েন্দার দৃষ্টি হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।" উমেশচন্দ্রই দ্বারভাঙ্গাধিপতিকে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের পর দেশের কাযে যোগদান করিতে উদ্বোধিত করেন। উমেশচন্দ্রের (সভাপতির) অভিভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) পণ্ডিত অযোধ্যানাথ,জর্জ্জ ইউল ও রামস্বামী মুদালিয়র, রামস্বামী নায়ডু, মহাদেব চেট্টি, প্রাণনাথ পণ্ডিত এবং অক্ষয়কুমার দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। অযোধ্যানাথ ও ইউলকে উমেশচন্দ্রই কংগ্রেসে যোগদান করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় কিরূপে তিনি তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের বন্ধুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করেন।



মহারাজা স্তর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর

(২) কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান,অতএব উহাতে সামাজিক সংস্কার লইয়া বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করা অনুচিত। কোন কোন প্রদেশে কোন সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, কোন প্রদেশে কোন সম্প্রদায় বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, কোন প্রদেশে কোন সম্প্রদায় বিধবা বিবাহের বিরোধী, অতএব এই সকল ব্যাপার লইয়া কংগ্রেসে বাকবিতণ্ডা দলাদলি অভিপ্রেত নহে। সামাজিক প্রশ্নাদি সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকিলেও রাজনীতিক সংস্কারের দিকে সকলে একমত হইয়া কার্য্য করা সম্ভব ও উচিত।

(৩) লর্ড ক্রশের ভারত শাসনসংস্কার বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায়

হর্ষ ও বিষাদ। লর্ড ক্রশের আইন অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়, বড় বড় মুন্সিপালিটী প্রভৃতি হইতে অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি লওয়া হইবে এইরূপ নিয়ম হয়। ব্যাপকভাবে প্রজাগণের প্রতিনিধি না লইলেও ইহা মন্দের ভাল।

(৪) দাদাভাই নৌরোজীকে ইংলণ্ডের অন্তর্গত সেণ্ট্রাল ফিন্সবেরীর উদারনীতিক দল কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ভোটদাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান। কমন্স সভার ৬৭০ জন সদস্যের মধ্যে একজনও ভারতীয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইহা আশার উদ্রেককর।

(৫) শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে অধিকতর অর্থসাহায্য করা উচিত।

(৬) জুরীপ্রথার সঙ্কোচসাধনের চেষ্টার জন্য নিন্দা।

(৭) ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস কমিটির জন্য অর্থসংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা।

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইংলণ্ডে যে ভারতপ্রেমিক ইংরাজগণকে লইয়া তথায় কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য চালিত হইতেছিল তজ্জন্য বহু অর্থ আবশ্যক হইত এবং উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হইলে উমেশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে বাকী টাকা প্রদান করিয়া এই পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের মধ্যম খুল্লতাত শম্ভুচন্দ্র পরলোকগমন করেন। ইঁহাকে উমেশচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র তৎকালীন



শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এটর্ণি ওয়েন এণ্ড ব্যানার্জ্জীর অফিসে মুৎসুদ্দী ছিলেন এবং উমেশচন্দ্র বিলাত হইয়া যখন প্রথম প্রত্যাগমন করেন তখন তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য শোভাবাজারের মহারাজ কমলকৃষ্ণ ও রাজা কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমাজপতিগণের নিকট অনুরোধ করেন ও তাঁহাদের সহানুভূতি অর্জ্জন করেন। ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থাতে মোকদ্দমা প্রভৃতি সংগ্রহেও তিনি সাহায্য করিতেন। উমেশচন্দ্র প্রতিবৎসর ৮বিজয়ার পর তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিতেন এবং তাঁহার অনুরোধে স্বামী বিবেকানন্দের (তখন ও নিমাই বসুর আর্টিকেলড্ ক্লার্ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত) পৈতৃক বিষয়াদি বাঁটোয়ারার মোকদ্দমা বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দেন। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও উমেশচন্দ্র যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে লিখিত পত্রাবলীতে এই স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রাবলী তাঁহার রচিত উমেশচন্দ্রের ইংরাজী ও বাঙ্গালা জীবনচরিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের নবম অধিবেশন হয়। পার্লিয়ামেণ্টের নবনির্ব্বাচিত সদস্য ভারতবর্ষের সুসন্তান দাদাভাই নৌরোজী এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'ট্রিবিউন' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার দয়াল সিংহ এইবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। লর্ড ক্রশের নবপ্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে ইতোমধ্যে ব্যবস্থাপকসভাসমূহে কোন কোন প্রতিষ্ঠান হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই—কংগ্রেসের উৎসাহশীল সভ্য এবং সাধারণের উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিলেন, যথা—

(১) বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায়—ফিরোজশাহ মেটা, দ্বারবঙ্গের মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ও গঙ্গাধর চিটনবিশ।

(২) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়।

(৩) মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায়—রঙ্গিয়া নায়ডু, কল্যাণসুন্দরম্ আয়ার ও বৈশ্যম আয়েঙ্গার।

(৪) বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায়—ফিরোজশাহ মেটা ও চিমনলাল

(৫) এলাহাবাদের ব্যবস্থাপক সভায়—রাজা রামপাল সিংহ ও চারুচন্দ্র মিত্র—

দাদাভাই নৌরোজী ইঁহাদের নির্ব্বাচনে আনন্দপ্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রূপে, সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরূপে, লালমোহন প্রেসেডেন্সী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের প্রতিনিধিরূপে, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ জমিদারগণের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হেনরি কটন (চীফ সেক্রেটারী), রমেশ দত্ত (বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার) প্রভৃতি মনোনীত সদস্যদের মধ্যেও অনেকে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তৎকালে মনোনীত সভ্যগণকে ব্যক্তিগত মত পরিহার করিয়া গবর্ণমেণ্ট পক্ষে ভোট দিতেই হইবে এরূপ নির্দ্দেশ না থাকায় (সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন) ইঁহারা কখনও কখনও গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষেও মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা অসম্ভব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উমেশচন্দ্র যেবারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন সেবারে রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করায় তিনিই জয়ী হন। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে

উমেশচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভায় যে কার্য্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্যর আশুতোষের মন্তব্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। স্যর হেন্‌রি কটন লিখিয়াছেন যে তিনি যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ছিলেন তখন শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞতালব্ধ সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত—যিনি সমান দক্ষতার সহিত একদিকে কবিতা দেবীর আরাধনা এবং অপরদিকে ভারতবাসীর ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিক ইতিহাসের গবেষণা করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বাগ্মী.আজীবন শিক্ষাব্রতী ও স্বদেশনেতা এবং চিরস্মরণীয় স্বদেশপ্রেমিক লালমোহন ঘোষ—আর একজন প্রতিভাশালী বাগ্মী যাঁহার বক্তৃতা জন ব্রাইটের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অদ্বিতীয় ব্যবহারাজীব এবং কংগ্রেস-নেতা—যিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্যারো-ইন-ফার্ণেসের উদারনীতিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ছিলেন এবং ইঁহাদের সহিত তিনি বহুবার সভাকক্ষে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে পরাজিত হন নাই তাহার কারণ এই যে সর্ব্বদাই তাঁহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিতেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে উমেশচন্দ্রের ভাগিনেয়ী বিনোদিনীর স্বামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুকাল উমেশচন্দ্রের পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছিলেন। তাঁহার 'গুরুজী' 'রেইজ এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বৎসরে পরলোক গমন করেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও এই বৎসর স্বর্গারোহণ করেন। উমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। বাল্যকালে তিনি থিয়েটারের অনুরাগী ছিলেন, পরিণত বয়সেও উমেশচন্দ্রের সে অনুরাগ যায় নাই এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটার, রয়েলবেঙ্গল থিয়েটার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের গৃহে অভিনীত সখের থিয়েটারে বাঙ্গালা গ্রন্থাদির অভিনয় দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের তিনি একজন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নারী দ্বারা নারীর ভূমিকা অভিনয় তিনি সমর্থন করিতেন। পুরাতন সংবাদপত্রাদি হইতে প্রতীত হয় যে বহুবাজারের অক্রুর দত্ত বংশীয়গণ দ্বারা স্থাপিত সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে—বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সকল অধিবেশনে যোগদান বা প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেন,—তাহাতে উমেশচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতেন। এই বৎসরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বয়ং য়ুরোপীয় বেশভূষা আচার ব্যবহারাদি অবলম্বন করিলেও হিন্দুধর্ম্মের এবং প্রকৃত হিন্দুর প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল; সেইজন্য ভূদেবকে তিনি অসীম শ্রদ্ধা করিতেন।

এই বৎসরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ও পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেমিনারীর অর্থ তাঁহাদের ব্যক্তিগত বলিয়া দাবী করেন। উমেশচন্দ্র এই ব্যাপার মিটমাট করিয়া সেমিনারীর আর্থিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পার্লিয়ামেণ্টের আইরিশ সদস্য অ্যালফ্রেড ওয়েব উহাতে সভাপতিত্ব করেন, রজিয়া নাইডু অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনেও যোগদান করিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, সভাপতি নির্বাচন বোধ হয় উমেশচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। উমেশচন্দ্রের এইরূপ



অ্যালফ্রেড ওয়েব

মত ছিল যে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কংগ্রেসে ভারতবাসীই সভাপতিত্ব করিবেন। (**A nation in Making** ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উমেশচন্দ্রের পত্নী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকৃষ্ণ শেলী* ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় আসেন, তিনি গার্টু্ড নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনী হেলইস একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টার জর্জ্জ ব্লোয়ারকে বিবাহ করেন। মধ্যমা কন্যা সুশীলা এনিটা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং এম-ডি উপাধিলাভান্তে আজীবন কুমারী থাকিয়া রোগী ও আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া উমেশচন্দ্র মনে করিতেন এবং তিনি কাহারও এমন কি নিজ পত্নী ও সন্তানের ধর্ম্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বিবেচনা করিতেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার পিতৃপিতামহগণ প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ কেহ সে দৃষ্টিতে দেখিবে না এবং দেব-সেবা ক্ষুণ্ণ হইবে ইহা মনে করিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইতেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা এটর্ণী সত্যধনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেবসেবার যথোচিত ব্যবস্থা

* গত বারে কংগ্রেসের গ্রুপ ছবিতে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ "শেলী" বনার্জীর পরিবর্ত্তে "শেফালী" বনার্জী মুদ্রিত হইয়াছিল।

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার খুল্লতাত শম্ভুচন্দ্রও তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই পরামর্শের ফলে তিনি সিমলায় বলরাম দে ষ্ট্রীটস্থ (বর্ত্তমান ডব্লিউ-সি-বনার্জী ষ্ট্রীটস্থ) পৈতৃক বাড়ীর ছয় আনা অংশ দেবোত্তর করিয়া এবং এক লক্ষ টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া দেবোত্তর দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্টারী করিয়া গিয়াছেন। এই দলিলে তাঁহার সহোদর সত্যধন একজন দলিলদাতা।


নলিনী ব্রেয়ার


জর্জ্জ ব্রেয়ার

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী আড়িয়াদহ গ্রামে বুড়া শিবতলায় ৺শ্রীশ্রীমুক্তকেশী শক্তিমূর্ত্তির পার্শ্বে যে চাঁদশঙ্কর শিব আছেন তাহা তাঁহার পিতামহ পীতাম্বর স্থাপিত। পীতাম্বরের মাতার নাম চাঁদরাণী ও পিতার নাম রামশঙ্কর ছিল—উঁহাদের নাম হইতে চাঁদশঙ্কর শিব স্থাপনা হয়। ৺শ্রীশ্রীমুক্তকেশী ৺রামনারায়ণ বা নারায়ণ মিশ্র স্থাপিত করেন। উমেশচন্দ্র সেবায়ৎ পুরোহিতগণকে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং রাও বাহাদুর ভীড়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং জুরী দ্বারা বিচার প্রথার সঙ্কোচসাধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কনফারেন্স আহূত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বন্ধু মনোমোহন উমেশচন্দ্রকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখ পিছাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু উমেশচন্দ্র তখন অসুস্থ এবং দেওঘরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি আসিতে সমর্থ হইলেন না। নাটোরাধিপতিও অনুপস্থিত হইলেন, কারণ ('রেইজ এণ্ড রায়ত' লিখিয়াছিলেন, রহস্য করিয়া কি না জানি না,) এইরূপ নাকি রীতি ছিল কৃষ্ণনগরে নাটোরাধিপতির যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজাকে তিনবার সবিনয়ে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং তিনবার তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, পরে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিলে তিনি যথোচিত পার্শ্বচর লইয়া আগমন করিবেন !! এই অধিবেশনের অল্প কয়েকদিন পরে মনোমোহন অকস্মাৎ স্নানাগারে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া বঙ্গভূমিকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও সহযোগীকে হারাইয়া অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। য়ুনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে মনোমোহনের চিত্র প্রতিষ্ঠাকালে উমেশচন্দ্র বক্তৃতা করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন "তোমাদিগের কক্ষের প্রাচীরে তোমাদিগের পরলোকগত হিতকামীদিগের আলেখ্য রক্ষাই যদি তোমাদিগের উদ্দেশ্য হয়—তবে এই কক্ষের প্রাচীর যেন দীর্ঘ—অতি দীর্ঘকাল আলেখ্য-শূন্য থাকে।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন রহমৎউল্লা সিয়ানী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র। স্বয়ং অভিভাষণ পাঠ করিতে অক্ষম হওয়ায় স্যর রাসবিহারী ঘোষ রমেশচন্দ্রের অভিভাষণ পাঠ করেন।

ইংলণ্ডে এই সময়ে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় উদারনীতিক দাদাভাই নৌরোজী পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন এবং রক্ষণশীল ভারতবাসী ভবনাগরী পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। ৭০ বৎসর বয়স্ক দাদাভাই নৌরোজী যৌবনোচিত উৎসাহসহকারে এখনও


রহমৎউল্লা সিয়ানী

ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যপ্রার্থী হইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ এবং অচিরে তিনি সফলকাম হউন এই কামনা কংগ্রেস হইতে তাঁহার পুরাতন বন্ধু উমেশচন্দ্রই করিয়াছিলেন।

যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এই কংগ্রেস উপলক্ষে প্রতিনিধিগণকে একটি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তাঁহার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী !" রচনা করেন।

(ক্রমশঃ)

অলক্ষ্মী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

অনুপম বিয়ে করেছে। বিয়ে করবে না এমন কথা অবশ্য সে কোনো দিন বলেনি। চিরকালই বলে আসছিল, আশে-পাশে, পথে ঘাটে এবং ঘরে ঘরে সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায়, ওসব লক্ষ্মী মেয়ে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না; তার চেয়ে বরং সারাজীবন চিরকুমার থাকার কৃচ্ছ্রসাধন করবে।

বিয়ে করার মতো অলক্ষ্মী মেয়েটি কেমন করে তার ভাগ্যে জুটে গেল সে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যা জানা গেল, গল্প করে তা বলতে গেলে এরকম দাঁড়ায়:—

একদা অফিস ছুটির পরে অনুপম ট্রামে বাড়ী ফির্‌ছিল। যুদ্ধের বাজারে নিজের গাড়ি থাকলেও ইচ্ছামতোই তাতে চড়া যায় না। ট্রাম-এ উঠে বদঅভ্যাসবশে 'সিট্'-এর কোলে গা ঢেলে দিয়ে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ বুক পকেটে একটু চাঞ্চল্যের অনুভবে ঝিমানির ছন্দোপতন হল। সেই সংগে সংগেই কটাং করে একটা আওয়াজ হতেই সে জেগে গেল। বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখল, তার কলম নেই। কলম আজকাল বহুমূল্য হলেও সেজন্য দুর্ভাবনায় পড়ার মতো দুরবস্থা তার নয়। বহুদিন ব্যবহারে যে কলমটির উপর একটা মমতা জন্মে গেছে, সেটা খোয়া গেল পকেটমারার মতো একটা তুচ্ছ ব্যাপারে এজন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

তার ঠিক পাশেই নির্লিপ্ত শান্তমুখে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরী এক তরুণী। তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। কিন্তু সে-মুহূর্ত্তেই সামনের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিঃসংকোচে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে তুলে ধর্‌লেন। দেখা গেল, অনুপমের কলম মেয়েটির হাতে। ভদ্রলোক কৃতিত্বের আনন্দে উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লেন—তখন থেকে সন্দেহ করছিলাম মশাই, সহজ মেয়ে ও নয়; নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা ক'রে ওকে বস্‌বার জায়গা দিলাম, বস্‌ল না; লাভের মধ্যে অপর লোকে আমার জায়গা মেরে নিল।

সেই অপর লোকের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজয়স্ফীত বক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ট্রাম থামার একটা ঝাঁকুনি খেলেন। কলমসুদ্ধ মেয়েটির হাত তখনো তাঁর মুষ্টিবদ্ধ।

আজকাল যে নারীজাতীয়া পকেটমারও দেখা যাচ্ছে, কথাটা তাহলে নিতান্তই গুজব নয়। বিশ্বের যে কোনো বিস্ময় যার কাছে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ব্যাপার, সেই অনুপম বিস্মিত, নির্বাকভাবে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে মুখ রক্তলেশহীন। অপমানের ভয়ে মুখ পাণ্ডুর, কিন্তু কৃতকর্মের জন্য একবিন্দু সংকোচ মেয়েটির চোখে নেই।

চতুর্দিকে তখন নারকীয় চিৎকার উঠেছে। তরুণীকে সকলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেল্‌তে চায়। মেয়েদের সিট্-এর মহিলাদের আক্রোশ যেন সবচেয়ে বেশি। প্রকৃত বিস্ময়ভাব চেষ্টায় ঘুচিয়ে মুখে অভিনয়ের বিস্ময় ফুটিয়ে অনুপম তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াল, মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল,—আরে, সুমিত্রা যে!

তরুণীর মুখে দেখা দিল অকৃত্রিম বিস্ময়ভাব। তার কোমল মণিবন্ধ থেকে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির ধারণমুষ্টি শিথিল হয়ে খ'সে পড়্‌ল। অনুপম বল্‌ল—কতকাল পরে দেখা কি আশ্চর্য্যি, মোটে চিন্‌তেই পারিনি! তুমি তো আমায় চিন্‌তে পেরেছ বোঝা গেল, কিন্তু ঘুমিয়ে প'ড়ে অপরাধ করে ফেলেছ ব'লে এমন রসিকতা কর্‌তে হয়?

মেয়েটির বিস্ময় আরো বেড়ে উঠ্‌ল। তেরশ'একান্নর কল্‌কাতার ট্রামের সূচিভেদ্য জনতা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অনুপম বলে চলেছে,—গাড়িসুদ্ধ লোক যে তোমায় পকেটমার মনে ক'রে মারমুখো হয়ে উঠেছে। এমন সর্বনেশে রসিকতাও করে অ্যাঁ? আমি চিন্‌তে না পার্‌লে তো তুমি নিজে যেচে পরিচয় দিতে ব'লে মনেই হচ্ছে না। মার খেয়ে মরতে যে এক্ষুণি! তরুণীর মুখ নত হয়ে এল। রক্তোচ্ছ্বাসে সে মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল।

যে মেয়ের নাম কোনোকালেই সুমিত্রা নয়, যে তরুণীকে চেনা দূরে থাক, আগে কোনোদিন দেখেই নি, তারি হাত ধ'রে অনুপম বল্‌ল,—মজা কর্‌তে গিয়ে কাণ্ড যা বাধিয়ে তুলেছ এর পর আর এ গাড়িতে থাকা চলে না। চল নেমে যাই।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি জোড়হাত করে বল্‌লেন—দেখুন, না জেনে—মানে একটা—মানে—

হাসিমুখে অনুপম তাঁকে বল্‌ল—কিচ্ছু অপরাধ করেননি; যা করেছেন মানুষের মতোই করেছেন। আচ্ছা, নমস্কার।

স্তব্ধ, বিমূঢ় জনতার মাঝ দিয়ে পথ করে নতমুখী তরুণীর হাত ধরে অনুপম নেমে পড়্‌ল। নিরালা জায়গায় গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বল্‌ল—কলমটা নিশ্চয় বিক্রি করার জন্য নিয়েছিলে। এ বাজারে ওটার দাম শ'খানেক টাকা তো হবেই।

পকেট থেকে একশ' টাকার নোট নিয়ে সে তরুণীকে দিতে গেল। তরুণী কিন্তু নতমুখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টাকা আবার নিজের পকেটে রেখে দিতে দিতে অনুপম বল্‌ল,—নেবে না? ভালো। তোমার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কি নাম তোমার? তরুণী উত্তর দিল না, বিদ্রোহী দৃষ্টিতে অনুপমের মুখের দিকে চাইল। অনুপম বল্‌ল—যাক্‌গে আপাততঃ ওই সুমিত্রা নামই রইল তোমার। কে আছেন তোমার? রূঢ় কণ্ঠে তরুণী উত্তর দিল—কেউ না।—কেউই না?—অনুপম বল্‌ল,—ভালো, আমারো কেউ নেই। ছিলেন, এখন নেই।—আমারো ছিলেন,—মেয়েটি বল্‌ল—কেউ না খেতে পেয়ে মরেছেন, কেউ মরে'ছেন রোগে পড়ে ওষুধ না পেয়ে। অনুপম বল্‌ল,—খেতে পেয়ে এবং ওষুধ পেয়েও আমার সকলে মরেছেন। ও কিছু নয়, যাক্‌গে। তুমি চাকরি করো না কেন? চেষ্টা করেছিলাম—তরুণী বল্‌ল—বিত্তে কম, তাতে কুলোল না।—চাকরি একটা আমার অফিসে তোমায় দিতে পারি;—অনুপম বল্‌ল—কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে তোমায় অপমান কর্‌তে চাইনে। তোমায় আমি বিয়ে করবো।

তার পরের যা সব নাটকীয় ঘটনা এবং কথা, সবই অকেজো। কাজের কথা হচ্ছে, ওই মেয়েটিকেই অনুপম বিয়ে কর্‌ল।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

সন্ধ্যায় লাইব্রেরী হইতে ফিরিবার পথে অপর্ণা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—আজ আপনি চা খেয়েছেন ?

—না। আপনি জান্‌লেন কি ক'রে ?

—বেশ, একবারও লাইব্রেরী থেকে বেরুলেন না।

অমল ঠাট্টা করিল—আপনি তা হলে লাইব্রেরীতে যান পড়তে নয়।

—না, আপনার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌তে। কিন্তু চা খেলেন না কেন ?

—মণিব্যাগ ভুলে রেখে এসেছি—তাই। এক্ষুণি গিয়ে খেলেই হবে—

অপর্ণা কি যেন ভাবিয়া বলিল,—চলুন ইউনিভারসিটি রেষ্টুরেণ্টে চা খেয়ে আসা যাক্‌—আপত্তি আছে ?

—আপনি মেয়েমানুষ হ'য়ে যদি যেতে পারেন, দশজনের কটাক্ষ ও সমালোচনাকে উপেক্ষা ক'রে, তবে আমি পুরুষমানুষ অবশ্যই পারবো।

অপর্ণা ব্যঙ্গ করিল—পৌরুষের অভাব আছে একথা বলা যায় না। চলুন—

চলিতে চলিতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপর্ণা বলিল,—হ্যাঁ, ভাল কথা এমনি ভুল হওয়া রোগে ধ'রেছে কতদিন—

অমল আঘাত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। অপর্ণাকে আঘাত করিয়া সে যেন তৃপ্তি পায়, আঘাতে আঘাতে অপর্ণার খোলোস যেন খুলিয়া পড়িয়া তাহাকে আরও আপনার, আরও সুন্দর করিয়া তুলে। অমল তাই বলিল—আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে ব'ললে আপনি হয়ত খুশী হ'বেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, এটা আমার চিরকালের দুরারোগ্য ব্যারাম।

—আমি খুশী হব কেন ?

—জানেন না, এটাও একটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মেয়েদের পিছনে ল্যাংবোটের মত কতকগুলি হতাশ প্রেমিক চলা ফেরা ক'রলে তারা খুশী হয়—

অপর্ণা জবাব দিল না।

ক্ষণিক অপেক্ষা করিয়া বলিল—কেবল হতাশ প্রেমিক ?

—হ্যাঁ।

—একজনও সফলকাম প্রেমিক থাক্‌বে না।

—না।

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত বলিল—আমার কি হবে তা হ'লে ?

অমল উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—বিয়ে হবে না।

—হবে না ! কেন ?

অমল জানে অপর্ণা অভিমান করিলে বড় ভাল লাগে, সে তাই বলিল—প্রেমিককুলকে হতাশ ক'রতে ক'রতে এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছবেন যখন আর বিয়ে করা যায় না।

অপর্ণা আবার ক্ষণিক অগ্রসর হইয়া বলিল—বড়ই শোচনীয় অবস্থা !

—না হয়, ডাইভ বোমারু বিমানের মত নোজ ডাইভ ক'রবেন কোন ব্যক্তি ঠিক ক'রে, ডাইভ ক'রবেন বটে কিন্তু আর উঠ্‌তে পারবেননা,—মাটিতে পড়ে একেবারে ছাতু !

—সর্ব্বনাশ। তবে এক কাজ করা যাক্‌, একটা দিন ঠিক ক'রে মনে মনে সংকল্প করি, ঘুম থেকে উঠে, যাকে দেখ্‌বো তাকেই বিয়ে ক'রে ফেল্‌বো।

অমল বলিল—এটা ভাল প্রস্তাব, অমনি ডেস্‌পারেট্‌ না হ'লে লোকে বিয়ে ক'রতে পারে না। হ্যাঁ, তবে দিনটা কবে ঠিক ক'রলেন সেটা জানাবেন।

—কেন প্রত্যূষে হাজির হবেন নাকি ?

—মন্দ কি ? লক্ষ্যভেদ ক'রেছিল ফাল্গুনী, কিন্তু সভায় উপস্থিত ছিল ত অনেকেই—তাদের মতই ভগ্ন হৃদয়ে না হয় ফিরে আস্‌বো—

অপর্ণা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া একটু তিরস্কারের সুরেই বলিল—আপনার মুখেও লাগাম নেই, মনেরও না; ল্যাংবোটের মত ঘুরতে সখ করে ? ছিঃ—

অপর্ণা রেষ্টুরেণ্টে প্রবেশ করিয়া বলিল—আলডুস্‌ হাক্সলির কি কি বই পড়েছেন ?

—সামান্যই। অমল জানিত, এ প্রসঙ্গ অবান্তর এবং দোকানের লোকগুলির চোখে কুয়াশার পর্দ্দা টানিয়া দিবার একটা কৌশল মাত্র। অমল অপর্ণার দুর্ব্বলতা দেখিয়া হাসিল।

মেসে ফিরিবার পথে অপর্ণার একটি কথা অমলের মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। যে ইঙ্গিতের উত্তরে সে বলিয়াছিল তাহার মনের লাগাম নাই সে ইঙ্গিত তাহার ইচ্ছাকৃত এবং অপর্ণারও বুঝিবার মত বয়স ও শিক্ষা আছে, কাজেই ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা তাহার নাই এবং এই উত্তরটুকুও তাহার সুচিন্তিত অভিমত নিশ্চয়ই। অমল ভাবে, তাহার পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার কথা জানিলে হয়ত অপর্ণা এইরূপ উক্তি করিতে পারিত, কিন্তু সে ত তাহা জানিবার কোন সুযোগ দেয় নাই। যদি কেবলমাত্র

বন্ধুত্বই হয়, কেবলমাত্র জীবন পথে একটু 'ভাল-লাগা' হয় তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না,—সে নিজেই হয়ত অসংযমের সহিত কল্পনা করিয়া গিয়াছে, অকারণে হঠকারিতার সহিত অযৌক্তিক ভাবে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাই তাহার পক্ষে স্বর্গচ্যুতির আশঙ্কা ও বেদনা পাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু অপর্ণার হয়ত নয়। এত বুঝিয়াও, এত ভাবিয়াও অমল নিজেকে অপর্ণার দুর্নিবার আকর্ষণ-মুক্ত করিতে পারে না, অক্টোপাশের বাহুর মত অপর্ণা তাহাকে যেন নির্ম্মম অনিবার্য্য ভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে—আকর্ষণে তাহাকে ক্রমাগতই সমুদ্রের তলদেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সে প্রাণপণ চেষ্টায়ও নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না; অসহায়, একান্ত নিরুপায় হইয়া অনির্দ্দিষ্ট অদৃশ্য সাহায্যের জন্ম নিমজ্জমান লোকের মত বার বার বাহু প্রসারিত করিতেছে—

মেসে ফিরিয়া অমল বাড়ীর পত্র পাইল—মা লিখিয়াছেন ব-কলমে। মা লিখিতে জানেন না কিন্তু পড়িতে পারেন, কাজেই পাড়ার বৌ ঝি ধরিয়া কোন সময়ে হয়ত পত্র লিখিয়া লন। এতদিন আঁকাবাঁকা অক্ষরে যত পত্র আসিয়াছে তাহার চেহারা অমলের পরিচিত, কিন্তু আজকার পত্রখানির লেখা নতুন ছাঁদের। লেখা মেয়েলী, আঁকা বাঁকাও বটে কিন্তু তাহার মধ্যে বেশ একটা শ্রী আছে এবং বানান ভুল নাই—লেখাটা তাহার একেবারেই অপরিচিত। লেখা যাহাই হোক, পত্রের সংবাদটী শুভ নয়—মা'য়ের আজ কয়েকদিন জ্বর, কিন্তু আজ অর্থাৎ পত্র লিখিবার দিন ভালই আছেন এবং পরিশেষে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অমল মাতৃআজ্ঞা পালন করিতে পারিল না, বিশেষ রকম চিন্তাই করিতে হইল। বাড়ীতে থাকেন মা একা, বার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ বৈধব্যে শরীর জীর্ণ—রোগশয্যায় কে তাহাকে জল দিতেছে, পথ্য দিতেছে—কে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছে! পাড়ার লোক যদি দয়া করিয়া তৃষ্ণায় জল দিয়া থাকে তবে পাইয়াছেন নইলে নয়। পল্লীগ্রামেও পরোপকারের মহৎ প্রবৃত্তি দুষ্প্রাপ্য। অমল ভাবিয়া দেখিল একবার যাওয়া প্রয়োজন—

কিন্তু হাতে একটি পয়সা নাই, মাহিনা পাইতে এখনও দুইদিন—অবশ্য ১লা পাইলে কালই যাওয়া যাইতে পারে। করিবার কিছুই নাই—মাহিনার জন্যে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

অমল ছাত্রবাড়ীতে যাইয়া ছাত্রকে কাজ দিয়া আনমনে ভাবিয়া যাইতেছিল, মায়ের অসহায় অবস্থার কথা—তাহাদের বাড়ীর জীর্ণ দালানের সেই স্বল্পান্ধকার ঘরে মা থাকেন, অযত্নে দালানের গায়ে পাকুড়গাছ জন্মাইয়াছে। তাহাদের উঠান দিয়াই পাড়ার বধূগণ ঘাটে যান, হয়ত যাওয়া আসার পথে মায়ের কুশল প্রশ্ন করিয়া সময় থাকিলে এক ঘটি তৃষ্ণার জল আনিয়া দেন।

এই পর্য্যন্ত—হাতে যদি অর্থ না থাকে তবে ঔষধ হয়ত এক কৌটাও জোটে নাই, জুটিলেও হাতুড়ে বৈদ্যের ঔষধ কাজে লাগে নাই—

কাহার কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া অমল ফিরিয়া চাহিল। বর্ত্তমানের মাঝে মনটাকে টানিয়া দেখে—রমলা দরজার কবাট ধরিয়া কি যেন বলিতেছে—কি বলিয়াছে সে তাহা বুঝিল না! সে একটু উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—কি ব'ললেন ?

—আপনার কি হ'য়েছে? বড় বিমনা মনে হচ্ছে—

সংক্ষেপে অমল বলিল—হ্যাঁ মনটা ভাল নাই।

রমলা কাছে আসিয়া ছাত্রের পাশের চেয়ারে বসিয়া বলিল,—কি হ'য়েছে, কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন ?

—হ্যাঁ, আজ চিঠি পেলাম মায়ের অসুখ।

—মায়ের অসুখ? তা চ'লে গেলে ত পারতেন! আবার পড়াতে এসেছেন কেন ?

প্রকৃতিস্থ থাকিলে অমল হয়ত স্বীকার করিত না, কিন্তু হঠাৎ চিন্তা না করিয়াই সে বলিল,—যাবো ত' কিন্তু এটা মাসের শেষ—

রমলা বলিল—কেন, আপনি একটু খবর দিলেই পারতেন, বাবার কাছ থেকে আপনার মাইনে চেয়ে রাখতুম। কাল সকালে রেখে দেব, আপনি এলেই পাবেন।

—সকাল নয়, রাত্রে পেলেই চলবে। আমি রাতের গাড়ীতেই যাবো।

অমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—এই স্পর্দ্ধিতা মেয়েটির নির্লজ্জ আত্মাভিমানের অন্তরালে কেমন করিয়া কোথায় এই সহানুভূতি লুকাইয়া দিল! সে তাহার দারিদ্র্যের প্রতি একটা নির্ম্মম শ্লেষই প্রত্যাশা করিয়াছিল কিন্তু আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেদনা পাইয়া সে রমলার মুখের পানে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

রমলা পুনরায় প্রশ্ন করিল,—বাড়ীতে আর কে আছেন।

—আর কেউ নেই। প্রতিবেশীরা আছেন ?

—আপনাদের দেশ কোথা ?

—যশোর জেলায় কোন গণ্ডগ্রামে, ম্যাপে সে নাম পাওয়া সম্ভব নয়।

রমলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—বাড়ীতে যখন আর কেউ নেই তখন ত যাওয়াই দরকার—এ রকম অবস্থায় আপনার বিয়ে করা উচিত ছিল।

অমল হাসিল। একটা জবাব দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রমলা পুনরায় বলিল,—জানি ব'লবেন টাকা নেই, চাকুরী নেই ইত্যাদি, আপনাদের কথা শুনলে রাগ হয়, যেন মেয়েরা খেয়েই তাদের ফতুর ক'রে দিলে—

অমল জবাব দিল,—তা নয়, খেয়ে তারা কতুর করে না, তবে তাদের আমাদের মনের মত ক'রে রাখতে পারি না বলেই কষ্ট হয়, ভাবি দারিদ্র্যের মাঝে টেনে দুঃখ দেওয়ার চেয়ে না আনাই ভাল—

রমলা বলিল,—মেয়েরা কি কষ্ট করতে জানে না। তাদের কি ইচ্ছে করে না স্বামীকে সেবা ক'রে সুখী ক'রতে, তারাও কি চায় না স্বামী সুখী হোক্—

অমল আরও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল—রমলার মুখে এমন কথা সে প্রত্যাশা করে নাই। তাহার সমস্ত মুখোস যেন সহসা খুলিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু কেন? অমল বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

রমলা চোখ দুইটিকে দূরে অন্ধকার গলির মাঝে ন্যস্ত করিয়া বলিল—কি দেখ্‌ছেন।

অমল বলিল,—আপনার মুখে এ কথা প্রত্যাশা করি নি!

—কেন?

—যার মধ্যে ইয়েটস্, কিপলিংএর ভাবধারা বিচরণ ক'রছে তার মাঝে ক্ষুদ্র গৃহ, গৃহস্থালীর কথা, তার তুচ্ছতম সুখ দুঃখের কথা কি বেমানান বলে মনে হয় না! আপনার অন্তর হবে গগনবিহারী, তা কেন পৃথিবীর বাস্তবতায় নেমে আস্‌বে!

রমলা অকারণে ক্ষণিক হাসিয়া লইয়া বলিল—মানুষ মানুষই, তারা ব্যোমযান নয়। খোকার উদ্দেশ্যে সে বলিল,—যা আজকে উনি পড়াতে পারবেন না, ওর মন যে রকম তাতে ও হবে না।

খোকা ছুটি পাইয়া মহোল্লাসে হৃষ্টচিত্তে পুঁথিপত্র গোছাইয়া রওনা দিল।

রমলা ক্ষণিক পরে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা অমলবাবু, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন—সত্যি কথা বলতে হবে—

—নিশ্চয়ই ব'লবো। সত্যভাষণের সৎসাহস আমার আছে—

অমলা অত্যন্ত অকস্মাৎ এবং বিনা আড়ম্বরে বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা আপনি কি রকম মেয়ে বিয়ে ক'রবেন? বাজে কথা বাদ দিয়ে ব'লবেন, এখনও ভাবিনি,ভেবে ব'লবো, ওসব কথা চলবে না—

অমল বলিল,—এ সব বিষয়ে আমার চিন্তা করা আছে। আমি বিয়ে করবো একটা গেঁয়োমেয়েকে. যে ঠিকানা লিখ্‌লে পত্র যথা স্থানে পৌছবে না। সাত চড়ে কথা কইবে না, যথেচ্ছ অত্যাচার করা চল্‌বে অথচ প্রতিবাদ শুনতে হবে না, এমনি একটা মেয়েকে—

রমলা হাসিয়া বলিল,—সত্যি কথা আপনি বলেন কি নিশ্চয়ই।

—যথার্থই সত্য কথা বলেছি। মিথ্যা বলার কোন হেতু নেই।

রমলা প্রতিবাদ করিল—হেতু অবশ্যই আছে।

—কি?

—যেহেতু আমি শিক্ষিত, শিক্ষিত না হলেও শিক্ষাভিমানী, সেই হেতুই এই কথাটা বলেছেন, সম্ভবতঃ আমার গর্ব্ব বা স্পর্দ্ধাকে আঘাত ক'রবার উদ্দেশ্যেই—

অমল আরও আশ্চর্য্য হইল—রমলার কথার মধ্যে এতখানি তীক্ষ্নদৃষ্টি ও বুদ্ধির পরিচয় সে কোন দিনই পায় নাই। যে রমলা অত্যন্ত নগ্নভাবে নিজের অন্তরের দৈন্য ও অক্ষমতাকে কথার ফাঁকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সে আজকে এমনিভাবে সরলভাবে নিজেকে প্রকাশ করিবে তাহা সে আশা করে নাই। অমল বলিল,—আপনাকে আঘাত ক'রে আমার লাভ? আপনার গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা থাকতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, কাজেই তাকেও আঘাত করা আমার এক্তারের বাইরে—

—তবে কেন? শিক্ষিত মেয়েদের উপর আপনার রাগ কেন?

—রাগ নেই, যথেষ্ট প্রলোভন আছে, আপনাদের মত মেয়েদের সঙ্গে আমার এই স্বল্প পরিচয়কে আমি যথেষ্ট গৌরবের বলে মনে করি; কিন্তু মোটর থাকা ভাল জানি তাই বলি মোটর কিনবার সখ থাকা আমাদের উচিত নয়। আর যাই হোক, আমি যে আপনাদের বাড়ীতে চাকুরী ক'রেই জীবিকা অর্জ্জন করি একথা আমি কখনও ভুলি না, কাজেই অতখানি আশা পোষণ করা সম্ভব নয়। যাদের আমরা কেবল ফুলের মত দেখ্‌তে চাই তাদের ধূলায় ফেল্‌তে স্বভাবতঃই মায়া করে—এ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিয়া অমল নেহাত অপ্রস্তুতের মতই থামিয়া গেল।

রমলা কি যেন ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বলিল,—এই মাত্র! আর কারণ নেই?

—আর একটা কারণ এই যে, তারা দুঃখের সঙ্গে দারিদ্র্যের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত, কাজেই—আমার দারিদ্র্যকে ভয় করে তারা আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবে না, আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ ক'রবে না।

—শিক্ষিত মেয়েরা ও আপনার কাঁধে কেবল ভারই না হ'য়ে সংসারের সাহায্যও ত ক'রতে পারে।

—পারে না। কারণ আজকার জগতে তাদের মেয়েরাই শিক্ষিত, যাদের ছেলেদের পড়িয়েও মেয়েদের পড়াবার ক্ষমতা থাকে—এক কথায় যারা বড়লোক তাদের মেয়েরাই শিক্ষিত সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ আকাশ পাতাল—

রমলা বলিল,—যাক্ কিছু মনে ক'রবেন না। আপনাকে এ সব প্রশ্ন করলুম কেন জানেন? লিখবার সময় মাঝে মাঝে মনস্তত্ত্বের দিকে নজর যায়, তাই আপনাদের মনের খবর না জান্‌লে

লেখা সম্ভব নয়। আপনাদের মনকে study করা একান্তই দরকার হ'য়ে পড়ে।

অমল বলিল—যা হোক্, আপনার লেখার যদি সহায়তা ক'রতে পারি তবে আনন্দিত হব; কিন্তু আমার যতদূর ধারণা নিজের মনটাকে ভাল ক'রে দেখলেই পরের মনকে বোঝা যায়—সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক।

অবান্তর আরও কিছু আলোচনার পরে অমল চলিয়া আসিল। রমলাকে সে নূতন করিয়া দেখিয়াছে, তাহার নূতন পরিচয় পাইয়াছে—তাহার আভিজাত্য অহঙ্কারের অন্তরালে যে মন আছে তাহা ত আর সকলেরই মত, বৃথা মুখোসে সে কেবল নিজেকে প্রতারিত করে। যাহার সহিত নিষ্ঠুর অভিনয় করিয়া সে সংগোপনে হাসিত ও খেলার আমোদ পাইত আজ তাহার জন্যই সে সমবেদনা বোধ করিতে লাগিল। সভ্যতার মোহ ভারাক্রান্ত অন্তর তাহার সত্যই মুমূর্ষু! তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া লাভ নাই, উদ্ধার করা প্রয়োজন।

পরদিন সকাল হইতে সমস্ত চিন্তা তাহার মন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল কেবল একটিমাত্র চিন্তা শ্রাবণের মেঘের মত সমস্ত অন্তরাকাশ ছাইয়া দিল। অসুখ গুরুতর না হইলে মা কখনও তাহাকে অসুস্থ সংবাদ দেন নাই, কারণ তাঁহার স্বভাব সে জানে। সাধারণ জ্বর-জারিকে তিনি অসুখ বা শয্যাগ্রহণের মত অবস্থা বলিয়াই স্বীকার করেন না। বৃথা একটি দিন দেরী করিয়া সে হয়ত শেষ দেখাও করিতে পারিবে না—রমলা সকালেই টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আনিলেই হইত। বৃথা আভিজাত্যের অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিয়া সে হয়ত' জীবনের মহার্ঘতম সুযোগকে হারাইবে।

যদি মা আর নাই উঠেন, তবে ত এ জগতে তাহার আর কোন আকর্ষণই থাকিবে না—এই পরিশ্রম এই জীবনসংগ্রাম, এ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যদি বৈধব্যক্লিষ্ট, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মা'কে সে জীবনে কয়েক দিনের জন্যও খুসী না করিতে পারে, তবে বৃথা বিদ্যার্জ্জনের সমারোহ ও অর্থের আড়ম্বরে তাহার কি প্রয়োজন!

কলেজের গৃহে বসিয়া এই কথাই সে ভাবিয়া যাইতেছিল—শঙ্কা ও ব্যর্থতাকে উত্তেজিত করিয়া দুঃসংবাদকে মনের ব্যাকুলতা দিয়া ফেনাইয়া চরম দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মনে মনে সে কাল্পনিক দুর্ভাগ্যকে বিশ্বাস করিয়া ফেলিতেছিল। কি পীড়া হইয়াছে কিছুই সে শোনে নাই, মাঝে মাঝে কেবল সজল চোখদু'টিকে পরিষ্কার করিতে বাহিরের পানে চাহিয়াছিল—

বাহির হইবার পথে অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার কি হ'য়েছে? আজ এত চুপচাপ কেন?

অমল বলিল,—না এমন কিছু নয়।

অপর্ণা ব্যাকুলতার সহিত প্রশ্ন করিল,—কি হ'য়েছে বলুন না।

—আমার মা'য়ের খুব অসুখ সংবাদ পেয়েছি, আজই দেশে যাবো—

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—কি অসুখ—আজই যাবেন?

—হ্যাঁ,—আপনার মায়ের আদেশ কবে পালন ক'রতে পারবো জানি না।

—সে পরে হবে—কখন যাচ্ছেন? গাড়ী কখন? আপনাদের দেশ কোথায়?

—অমল ধারাবাহিক প্রশ্নগুলির ক্রমিক উত্তর দিয়া চুপ করিল। অপর্ণা পুনরায় বলিল—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—মা একা।

—তবে, জমিদারী থেকে আপনার পড়ার খরচা সব পাঠান কে?

অমল হাসিয়া বলিল,—চ'লে যায়। মা একা বলেই যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—নিশ্চয়ই, দেরী করা মোটেই সঙ্গত নয়। আর মাকে ওখানেই বা রাখেন কেন, এখানে এনে কাছে রাখলে উভয়েরই দুর্ভাবনা যেতো।

অমল সংক্ষেপে জবাব দিল,—হুঁ।

অপর্ণা ব্যস্ততার সঙ্গে বলিল,—যাক্, এসব আলোচনার সময় এ নয় কিন্তু আপনার মা কেমন থাকেন তা আমাকে একটু জানাবেন—আমিও হয়ত ভাববো—

অমল আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুইটির কৃতজ্ঞতা-করুণ দৃষ্টি অপর্ণার মুখের উপর নির্ভয়ে ন্যস্ত করিয়া বলিল,—আপনি অনুমতি ক'রলে অবশ্যই জানাবো আর আমার দুঃখে যে সহানুভূতির প্রমাণ পেলাম আপনার কাছ থেকে—তার জন্যে মনে মনে গর্ব্ব বোধ করছি। আপনার উদারতাকে প্রশংসা করি।

অপর্ণা কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে ব'লিল,—এখন উদারতা হিসাব করার সময় আপনার না থাকাই উচিত ছিল। যান তাড়াতাড়ি ফল-টল কিনে তৈরী হ'য়ে নিন্—

অপর্ণা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল—

অমল ক্লান্ত পদক্ষেপে চলিতে চলিতে ভাবিল,—তার দীনা দুঃখিনী মাতার জন্যে আজ অপর্ণা যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে তাহা সে না করিলেও ক্ষতি ছিল না, অশোভনও হইত না। তবুও এই আভিজাত্য, ওই শিক্ষার অভিমানের মাঝে তাহার জন্য, তাহার মাতার জন্যে যে সহৃদয়তা সে দেখাইয়া গেল তাহা তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও উদারতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অমল মনে মনে বিশ্বাস করিল,—তাহার প্রতি অপর্ণার

নিশ্চয়ই একটু আকর্ষণ আছে, তাহা না হইলে এই সমবেদনা স্বাভাবিক নয়—সে যে আজ বিমনা একথা ত আর কেহ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু অপর্ণা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে—

……যদি কোনদিন এমন হয় যে অপর্ণা তাহার মায়েরই সেবায় নিযুক্ত হইল। তবে সেইদিন তাহার মাতাকে এমনি আগ্রহে, এমনি যত্নে সে সেবা করিতে পারিবে—এমনি করিয়া তাহার কুশল সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইবে। আজ যেমন তাহার জন্যই তাহার মাতার প্রতি এই আগ্রহ—একদিন সে হয়ত তাহার মাকেই মা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।

অমল আনন্দিত হইল—অপর্ণা সত্যই সুন্দর! তাহাকে না পাইলে দুঃখের কিছু নাই কিন্তু এই সৌন্দর্য্যকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না। অন্তরের এই উদারতা, এই সমবেদনার আকর্ষণ-শক্তি অনিবার্য্য—অমল তাই আজ একান্তই অসহায়।

ক্রমশঃ

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

তৃতীয় প্রকরণ—ইন্দ্রিয়-জয়

সপ্তম অধ্যায়—রাজর্ষি-বৃত্ত

মূল :—সেই হেতু অরিষড়্‌বর্গ-ত্যাগ দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিবে। বৃদ্ধসংযোগ-দ্বারা প্রজ্ঞা, চার-দ্বারা চক্ষুঃ, উত্থান দ্বারা যোগক্ষেম সাধন, কার্য্যানুশাসন দ্বারা স্বধর্ম্মস্থাপন, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা বিনয়, অর্থসংযোগ দ্বারা লোকপ্রিয়ত্ব ও হিত দ্বারা বৃত্তি (করিবে)।

সঙ্কেত :—সেই হেতু—যেহেতু অরিষড়্‌বর্গ-ত্যাগ শ্রেয়ঃ-সাধন, অতএব—। বৃদ্ধসংযোগ-দ্বারা প্রজ্ঞা—করিবে (কুর্ব্বীত)—এইরূপ অন্বয় সর্ব্বত্র হইবে। করিবে—উৎপাদন করিবে, অর্জ্জন করিবে, বর্দ্ধন করিবে, বিকশিত করিবে—ইত্যাদি রূপ অর্থ। চার-দ্বারা চক্ষুঃ করিবে—চরকে চক্ষুঃ-স্থানীয় করিবে। রাজগণ চারচক্ষুঃ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের ব্যাপারসমূহ প্রত্যক্ষ-করণার্থ রাজা চারচক্ষুঃ হইবেন (গঃ শাঃ)। উত্থানেন—উদ্যোগ-অনুষ্ঠান-দ্বারা; **by ever being active (SH)**। কার্য্যানুশাসন—ইহা এইভাবে কর্ত্তব্য ইত্যাদি আদেশ-দ্বারা স্বধর্ম্মে লোককে নিয়ন্ত্রিত করিবে ; **by exercising authority (SH) ; by issuing orders for the performance of duties**—বলা ভাল। স্বধর্ম্ম-স্থাপন—স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থাপন—**restriction in (their) respective duties**, অর্থসংযোগ—উপযুক্ত পাত্রে ধন অর্পণ—ইহা-দ্বারা জনপ্রিয় হওয়া যায়। **Endear himself to the people by bringing them in contact with (SH) ; popularity by means of contact with wealth**—বলা চলে। হিতেন বৃত্তিং (কুর্য্যাৎ)—যাহা বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে উপকার-জনক, তদ্দ্বারা লোকযাত্রা করিবেন। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—**"and doing good to them" (SH)**। **Subsistence by means of what is good**—বলা উচিত।

মূল :—এইভাবে বশীকৃতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরহিংসা বর্জ্জন করিবে। স্বপ্নচাপল্য-অনৃত উদ্ধতবেশ অনর্থসংযোগও (পরিহার করিবে)। আর অধর্ম্ম সংযুক্ত ও অনর্থ সংযুক্ত ব্যবহারও (ত্যাগ করিবে)।

সঙ্কেত :—স্বপ্নলৌল্য—স্বপ্নে চাপল্য ; **lustfulness even in dream (SH, Jolly)** ; গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—স্বপ্নং লৌল্যং—**drowsiness and voluptuousness (Jolly)**. স্বপ্ন—অযথোচিত নিদ্রা, দিবা-নিদ্রা ইত্যাদি ; লৌল্য—চাপল্য। অনৃত—মিথ্যাবদন। উদ্ধত-বেশত্ব—অবিনীত-বেশতা (গঃ শাঃ) ; শ্যামশাস্ত্রী 'বেশ' অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছেন—**haughtiness**. অনর্থসংযোগ—পূর্ব্বোক্ত অর্থ-সংযোগের বিপরীত—অপাত্রে ধন দান, **evil proclivities (SH)**। অধর্ম্মসংযুক্ত অনর্থসংযুক্ত ব্যবহার—**unrighteous and uneconomical transactions (SH)**।

মূল :—ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে কামের সেবা করিবে—সুখ-বিহীন হইবে না। অথবা—পরস্পর-সম্বন্ধ যুক্ত ত্রিবর্গের সমভাবে সেবা করিবে। যেহেতু ধর্ম্ম-অর্থ-কামের একটি অত্যন্ত সেবিত হইলে নিজেকে ও অপর দুইটিকে পীড়িত করিয়া থাকে।

সঙ্কেত :—ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে—যাহাতে ধর্ম্ম ও অর্থের কোন বাধা উপস্থিত না হয়—এভাবে কামের সেবা করিবে—একেবারে কাম বর্জ্জন করিয়া সুখভোগে সম্পূর্ণ উদাসীন হইবে না—ইহাই অভিপ্রায়। অন্যোন্যানুবন্ধং (মূল)—ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম-অর্থ-কামের) প্রত্যেকটি অপর দুইটির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। মনুও বলিয়াছেন—"ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ" (২।২২৪)। ত্রিবর্গের সমভাবে সেবা না করার দোষ কি?—ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—ত্রিবর্গের মধ্যে কোন একটির উপর পক্ষপাত-পূর্ব্বক অধিক সেবা করিলে সেই অতিরিক্ত সেবিত বিষয়টিরও পীড়া হয়—আর অপর দুইটি অল্প সেবিত বিষয়ের পীড়া ত হইয়াই থাকে। অতিরিক্ত ধর্ম্মসেবায় অর্থ-কাম (ও সেই সঙ্গে ধর্ম্মও), অতিরিক্ত অর্থসেবায় ধর্ম্ম-কাম (ও সেই সঙ্গে অর্থও), অতিরিক্ত কামসেবায় ধর্ম্ম-অর্থ (ও সেই সঙ্গে

কামও) পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই বলা হয়—"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা—যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ"।

মূল :—অর্থই প্রধান—ইহা কৌটিল্য (বলেন)—যেহেতু অর্থমূলক ধর্ম্ম ও কাম।

সঙ্কেত :—অথবা সমভাবে ত্রিবর্গের সেবা করিবে—এইমত প্রায় সর্ব্বজনমান্য হইলেও কৌটিল্য ইহার পূর্ণসমর্থক নহেন। তাঁহার মতে—ত্রিবর্গের মধ্যগত অর্থেরই প্রাধান্য—ধর্ম্ম ও কামের অপেক্ষাকৃত অপ্রাধান্য। অর্থমূলক—অর্থসাধ্য (গঃ শাঃ) ; অর্থ থাকিলে তবে ত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কামপূরণ করা চলে—অর্থ না থাকিলে উহা অসম্ভব। শ্যামশাস্ত্রী ধর্ম্ম বলিতে বুঝিয়াছেন—**charity**—ইহা ঠিক নহে—**religious deeds** বলা উচিত। **Charity and desire depend upon wealth for their realisation (SH)**। **Jolly** বলেন—"**The prominence given to** অর্থ **agrees with the standpoint of an Arthashastra of : Yashodhara's remark, Kamasutra p.1**—" "তত্র ব্রাহ্মণাদীনাং গৃহস্থানাং মোক্ষস্থানভিমতত্বাৎ ত্রিবর্গঃ পুরুষার্থঃ। তত্রাপি ধর্ম্মার্থয়োর্হেতুত্বাৎ কাম এব ফলভূতঃ প্রকৃষ্টঃ পুরুষার্থ ইতি কামবাদিনঃ"। এরূপ পক্ষপাত-বিশিষ্ট মতসমূহ অপেক্ষা ভগবান্ মনুর অপক্ষপাতী সিদ্ধান্তই এ প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত বলিয়া শ্রেষ্ঠ—

"ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ" ॥
—মনু (২।২২৪)

মূল :—আচার্য্যগণকে অথবা অমাত্যগণকে মর্য্যাদা (রূপে) স্থাপন করিবেন—যাঁহারা ইঁহাকে অনর্থ কারণ হইতে নিবারিত করিতে পারিবেন, অথবা নির্জ্জনে প্রমাদকারী ইঁহাকে ছায়া-নাড়িকা-রূপ প্রতোদের দ্বারা তাড়িত করিতে পারিবেন।

সঙ্কেত :—মর্য্যাদা—সীমা। আচার্য্য ও অমাত্যগণকে সীমারূপে কল্পনা করিবেন। সীমা যেরূপ অলঙ্ঘনীয়, সেইরূপ গুরু ও মন্ত্রীকে অলঙ্ঘনীয় মনে করিবেন। কে?—রাজা। গুরুবাক্য ও মন্ত্রীর হিতোপদেশ যিনি অবহেলাক্রমে লঙ্ঘন করেন না—তিনিই রাজর্ষি-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। এই আচার্য্য ও অমাত্যগণ কিরূপ হইবেন, তাহাও বলা হইতেছে—যাঁহাদিগের এই রাজাকে অনর্থ-কারণ হইতে নিবারিত করিবার যোগ্যতা আছে। অপায়স্থানেভ্যঃ (মূল)—অনর্থ-কারণানুষ্ঠান হইতে (গঃ শাঃ) ; **keep him from falling a prey to dangers (SH)**। অপায় হইতেছে উপায়ের ঠিক বিপরীত। উপায়—সাধন, **means** ; অপায়-ধ্বংসের হেতু ; **who should check him from the zones of disaster (causes of danger)** বলা উচিত। মর্য্যাদারূপে আচার্য্য ও অমাত্যগণকে স্থাপন করিতে হইবে—এ অংশটির ইংরাজি শ্যামশাস্ত্রী যথাযথভাবে দেন নাই। বলিয়াছেন—'**shall invariably be respected**'. ছায়া-নাড়িকা-প্রতোদ—ছায়া-নাড়িকার বিশদ বিবরণ প্রথম অধিকরণের উনবিংশ অধ্যায়ে (রাজ-প্রণিধি-প্রকরণে) দ্রষ্টব্য। সকালে বা বৈকালে কয়টা বাজিয়াছে, তাহা ছায়া-দর্শনে স্থিরীকৃত হইত। ত্রিপুরুষ-প্রমাণ, একপুরুষ-প্রমাণ, চারি-অঙ্গুলি পরিমাণ ছায়া ও ছায়াবিহীনতা দর্শনে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সময়ের চারিটি ভাগ করা হইত। আবার মধ্যাহ্নের পর হইতেও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় উহার বিপরীত ক্রমে (ছায়াশূন্যতা, চারি অঙ্গুলি, একপুরুষ ও তিনপুরুষ পরিমাণ ছায়াদর্শনে) চারিভাগে বিভক্ত করা হইত। ছায়ার পরিমাণ দেখিয়া সূর্য্যোদয়ের পর কয়ঘণ্টা বা মধ্যাহ্নের পর কয়ঘণ্টা অতীত হইয়াছে—তাহা বেশ বুঝা যাইত। ছায়া-নাড়িকা—ছায়া-দ্বারা সূচিতা নাড়িকা। নাড়িকা—ঘটিকা—যাহাকে 'দণ্ড' (২৪ মিনিট) বলা হয়। ৬০ নাড়িকায় এক অহোরাত্র। প্রতোদ—চাবুক। ছায়া-নাড়িকা-প্রতোদ—ছায়ানাড়িকা-রূপ প্রতোদ। ছায়ানাড়িকার সাহায্যে আচার্য্য-অমাত্যবর্গ পুনঃ পুনঃ সূচিত করিবেন যে, রাজা কার্য্যান্তরে কালাতিপাত করিতেছেন—এক্ষণে তাঁহার অন্য যথাকালোচিত কার্য্যে মনোনিবেশ কর্ত্তব্য। পুনঃ পুনঃ এইরূপ সূচনা পাইলে রাজা যে কর্ম্মে তখন আসক্ত থাকিবেন সেই প্রিয় কার্য্যে বাধা জন্মিবে ও তাহার ফলে তাঁহার মনঃকষ্ট উপস্থিত হইবে। প্রতোদ যেরূপ শরীরে আঘাত প্রদান করিয়া বিপথগামীকে নির্দ্দিষ্ট পথে আনয়ন করে, ছায়া-নাড়িকা-সূচনা-দ্বারা সেইরূপ প্রমাদী রাজাকে তাঁহার প্রিয় ব্যসনাদি কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া ও তাহার ফলে তাঁহার মনঃকষ্টের উদ্রেক করিয়া আলোচিত রাজকার্য্যে নিয়োজিত করা যায়। এই কারণে ছায়া-নাড়িকাকে প্রতোদ-তুল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গণপতি শাস্ত্রীও সংক্ষেপে অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—**by striking the hours of the day as determined by measuring shadows warn, him of his careless proceedings even in secret.**" ইহাতে অর্থব্যাখ্যা থাকিলেও মূলানুগ অনুবাদ হয় নাই। **should whip him, going astray, in private, by means of the whip-like hour measuring shadows**—বলা চলিতে পারে। অভিতুদেয়ুঃ আঘাত করিবেন, ব্যথা দিতে পারিবেন—প্রমাদী রাজার প্রমাদ ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে (গঃ শাঃ) ; **warn him (SH)** ; **strike him**—বলা উচিত।

মূল :—রাজত্ব সহায়সাধ্য। এক (মাত্র) চক্র বর্ত্তমান নাই। সেই হেতু সচিবগণকে (নিয়োজিত) করিবেন ও তাঁহাদিগের মত শ্রবণ করিবেন।

সঙ্কেত :—রাজত্ব—রাজভাব ; **sovereignty (SH)**। প্রশ্ন উঠিতে পারে,—রাজাই ত সচিবসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা—অতএব প্রভু। তবে কেন তিনি স্বয়ং প্রভু হইয়াও স্বেচ্ছায় আপনাকে সচিবগণের অধীন করিয়া রাখিবেন? তাহারই উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজার রাজভাব সহায়সাধ্য—সহায় ব্যতীত রাজা রাজা থাকিতেই পারেন না। তিনি কিছুতেই একাকী রাজকার্য্য-সমূহ নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত :—একটিমাত্র চক্র-দ্বারা শকট বা রথ ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। শকটে যুক্ত একমাত্র চক্র চক্রান্তর রূপ সহায় ব্যতীত থাকিতে বা চলিতে পারে না। অতএব, সচিব-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। সচিব—আচার্য্য ও অমাত্য। নিযুক্ত করিবেন কে?—রাজা। স্বয়ং তাঁহাদিগের নিয়োগকারী হইলেও তাহাদিগের মত শ্রবণ করিতে রাজা বাধ্য—কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—একাকী রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ অসম্ভব।

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে ইন্দ্রিয়-জয়-নামক তৃতীয় প্রকরণে রাজর্ষি-বৃত্ত-নামক সপ্তম অধ্যায় ॥

ক্যাসমেমোর কাণ্ড

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি

সেদিন স্ত্রীর সহিত তুমুল কলহ হইয়া গেল। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু কাণ্ডটা ঘটিল চায়ের পেয়ালায় তুফানের মত।

আমার জামার পকেটে পাঁচ টাকা আট আনা দামের ব্লাউসের একটা ক্যাসমেমো পাওয়া গেল। ক্যাসমেমোর সঙ্গে ব্লাউজটা পাওয়া গেলে কোন অনর্থই অবশ্য হইত না। গৃহিণী সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ব্লাউজটা আবিষ্কার করিতে পারিল না। আমিও বিস্মিত কম হই নাই কারণ সে ব্লাউজ আমি কিনি নাই, তাহার ক্যাসমেমো আমার পকেটে আসিল কেমন করিয়া; অথচ এমন একটা হাস্যকর কৈফিয়তে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশী বলিয়া অগত্যা চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। এমন একটা সন্দেহজনক ব্যাপার বাংলা দেশের কোন সতী স্ত্রীই সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেদিন বিকাল বেলা গৃহিণী সপুত্র পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। বলিতে লজ্জা নাই মনে মনে খুসীই হইলাম—দিনকতক মুক্তির আনন্দে ইচ্ছামত ঘুরিতে পারিব। কিন্তু যাত্রার সময় মদীয় বদনমণ্ডল যথাসম্ভব করুণ করিয়া তুলিলাম—কি করিব উপায় নাই। অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান মাথা পাতিয়াই লইতে হইবে। খোকার জন্য মনটা—থাক্ ভাবিয়া লাভ নাই। মায়ের ছেলে মায়ের সঙ্গেই যাইতেছে তার মামার বাড়ী।

সন্ধ্যার দিকে শূন্য বাড়ীতে একটা তক্তাপোষের উপর চিত হইয়া শুইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে ক্যাসমেমোর রহস্যের কথাটাই ভাবিতেছিলাম। ক্যাসমেমোর ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। যদি মাসটা হইত এপ্রিল আর তারিখটা হইত পয়লা, তাহা হইলে না হয় এই রহস্য সমাধানের একটা ক্লু পাওয়া যাইত। কিন্তু বঙ্গদেশের ঘোরতর বর্ষাকালটাকে কোন মতেই ইংরাজি এপ্রিল মাসের সামিল করা সম্ভব হইল না এবং ডজনখানেক বিড়ি পুড়াইয়াও যখন সমাধানের কোন সূত্রই পাওয়া গেল না তখন উত্তপ্ত মস্তিষ্কে একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম একটা পার্কের উদ্দেশ্যে। মাথাটা একটু শীতল করিয়া লইতে হইবে।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং। মেঘের কোলে সচকিতা দামিনীর ভ্রূকুটী-বিলাস। গুরুগর্জ্জনে আকাশ মাঝে মাঝে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। জলকণা-বাহী শীতল বাতাস চলিতে চলিতে যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বৃষ্টি নামিল বলিয়া। ভজহরির চায়ের দোকানের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া লইয়া পার্কের দিকেই পা চালাইয়া দিলাম। ভজহরির আবার আজ নগদ, কাল ধার—অথচ পকেটে আমার একটা কানাকড়িও নাই। রাগের মাথায় মালতী অনেক আবশ্যক জিনিষই ভুলে ফেলিয়া গিয়াছে, তবে তার মধ্যে চাবির রিংটা নাই।

সন্ধ্যার আসন্ন বাদলের মধ্যে পার্কে কাহারো থাকিবার কথা নয় এবং বিশেষ কেহ ছিলও না। এতবড় পার্ক প্রায় খালি—উৎসব শেষে জনহীন পুরীর মত বিষণ্ণ, বিরস।

মনটা দমিয়া গেল। যে স্থান থাকে নিত্য কোলাহলমুখর, তার মূক নির্জ্জনতায় মনে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব আসে। ভাবিলাম চায়ের দোকানেই ফিরিয়া যাই। তার দোকানে অনেকদিনই চা পান করিতেছি, কোন দিনই ফাঁকি দিই নাই। মানুষ ত, চক্ষুলজ্জা একটা আছে। কিন্তু হাতের কাছের বেঞ্চিটায় চক্ষু পড়িতেই দেখি, এক কোণে একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক বসিয়া। যাক্ ভালই হইল—একজন সঙ্গী ত বটেই। আমি বেঞ্চিটার আর এক কোণ দখল করিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম। ভাবনাটা অবশ্য আজিকার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মগজে অনবরত পাক খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রীর সঙ্গে খুব কম দিন ঘর করিতেছি না এবং নারীজাতিকে যদি ভাল করিয়া চিনিয়াই থাকি তাহা হইলে বলিতে হয়—সংসারে এমন স্ূঁচ হইয়া ঢুকিতে আর ফাল হইয়া বাহির হইতে ইহাদের জুড়ী নাই—শুধু কি তাহাই? নিজেদের রঙীণ দেহ-পেয়ালা ভরিয়া মদ খাওয়াইয়া সমস্ত পুরুষজাতটাকেই ইহারা অক্ষম দুর্ব্বল নির্লজ্জ মাতাল করিয়া রাখিয়াছে।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পকেটে একটা বিড়িতে হাত দিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে আড় চক্ষে চাহিয়া দেখি, তিনি আমার দিকেই চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া আবার বেঞ্চিতেই বসিলাম।

বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। সমগ্র পার্কটায় একবার চক্ষু বুলাইয়া লইলাম। ইতিপূর্ব্বে যে দুই একজন পার্কে ছিলেন তাহারাও বোধ হয় চলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের ম্লান ছায়ায় পার্কটা যেন অবসন্নের মত স্থির, নিশ্চল। রাস্তার ঘোমটা পরা দূরদূরান্তে স্থিত আলোগুলি অন্ধকারে জোনাকীর মত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। পার্কের দক্ষিণ দিকের লালরংএর বাড়ীর বাতায়নে আলোর রেখা। অকস্মাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া গেল। বাহিরের শীতলতায় অন্তর যেন ক্রমশঃ কেমন সিক্ত হইয়া উঠিতেছে। চিন্তার ধারা বদ্‌লাইয়া গেল। নারীর মনস্তত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ক্যাসমেমোর কীর্ত্তিটা খুবই তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। আর যদি তুচ্ছই হয়, সামান্যই হয়! তাহা হইলেই বা কি? সামান্যতম তুচ্ছতম ঘটনা জগতে অনেক প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তর মানবজীবনে এই প্রলয় কাণ্ডের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কথাটা তা নয়। আজ হউক, কাল হউক, তিন দিন বাদে হউক গৃহিণী আবার গৃহে ফিরিবে। কিন্তু আজিকার এই বাদল রাত্রিটা আর ফিরিবে না।

ক্ষণকাল পূর্ব্বে মালতীর অন্তর্দ্ধানে যতখানি উল্লসিত হইয়াছিলাম মনটা আবার ততখানি বিষণ্ণ হইয়া গেল। আবার উঠিয়া দাঁড়াইলাম

এবং পকেটে হাত দিয়া একটা বিড়ি তুলিব তুলিব করিতেছি, দেখি ভদ্রলোক আমার মুখের দিকেই পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। নেশার তৃষ্ণা যথাসম্ভব দমন করিয়া বসিব কি চলিয়া যাইব ঠিক করিতে পারিলাম না।

—ম'শায়ের থাকা হয় কোথায়? ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন; বিরক্ত কণ্ঠেই জবাব দিলাম—চিৎপুর।

—তা হ'লে ত গঙ্গার কাছে—ভদ্রলোক বলিলেন।

বুঝিলাম দড়ি ও কলসী লইয়া গঙ্গায় ডুবিবার ইঙ্গিত ভদ্রলোক দিতেছেন না, তবুও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত খোঁচাটুকু সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিল। একবার রুখিয়া উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গিয়া একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম—খুবই কাছে।

ভদ্রলোক পকেট হইতে একটা সিগারেট কেস বাহির করিয়া আমার সামনে ধরিয়া বলিলেন—নিন একটা।

নিলাম।

তিনি নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে বলিলেন—তা হ'লেই দেখুন কাছের চাইতে দূরের আকর্ষণ কত বেশী।

সিগারেটে একটা দীর্ঘ দম দিয়া ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিলাম। তিনশ ছাপান্ন নম্বর চিৎপুর হইতে গঙ্গা খুবই কাছে এবং বিলাস ভ্রমণের পক্ষে তুলনা করিলে দেশবন্ধু পার্কের দূরত্বটা একটু বেশীই বলিতে হইবে। তবুও বোধহয় আমার চোখের দৃষ্টিতে এবং মুখাকৃতিতে একটা জিজ্ঞাসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভদ্রলোক বলিলেন—আমি মানুষের মনের কথাই বলছি। কি অদ্ভুতই না এই মন।

ব্যাপারটা ঠিক ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিলাম না। নিজেকে ভদ্রলোকের কাছাকাছি একটু ঠেলিয়া দিয়া উত্তর দিলাম—কথাটা এক হিসাবে সত্য। এক হিসাবে মানে? ভদ্রলোকটি যেন চমকাইয়া উঠিলেন। তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—যা সত্য তার সবটাই সত্য। এর মধ্যে মাপজোক করে কোন অংশ বাদ দেবার উপায় নেই। তা না হ'লে কি ম'শাই ব্লাউজের চাইতে ক্যাসমেমো বড় হয়?

ক্যাসমেমো! ব্লাউজ! বলেন কি ভদ্রলোক? স্বপ্ন দেখিতেছি না ত? বিব্রত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

আমার ভাব দেখিয়া ভদ্রলোকটি বোধহয় একটু অপ্রতিভই হইলেন, একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন—কথাটা বোধহয় বুঝতে পারেন নি না? দেখুন আজই একটা ব্লাউজ কিনেছি, কিন্তু তার ক্যাসমেমোটা যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

—তাতে আর হয়েছে কি? সহানুভূতির স্বরে জবাব দিলাম। হয়েছে কি? শুনবেন? হয় ব্লাউজটা কোথাও বিক্রী করতে হবে, নয়ত যেমন করেই হ'ক ক্যাসমেমো একটা যোগাড় করতেই হবে। দামের কথা শুধু মুখে বললে সবাই বিশ্বাস নাও ত করতে পারে।

কেন? সভয়ে প্রশ্ন করিলাম।

—হিসেব মশাই, হিসেব। হিসেবের সঙ্গে ভাউচার না থাকে সে হিসেবের মূল্যই বা কি বলুন। এখন যদি ক্যাসমেমোটা না পাই, আমার ধার করে টাকাটা গর্চা দিতে হবে।

—নিজের স্ত্রীর কাছেও এই ভাবে হিসেব দিতে হবে? পুনরায় প্রশ্ন করিলাম।

—কড়ায় ক্রান্তিতে। একচুল এদিক ওদিক হবার যো নেই।

বলিলাম—তবুও—

কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না। আমার নবলব্ধ বন্ধু বাধা দিয়া বলিলেন—এর মধ্যে তবু নেই। যখন স্ত্রী হিসেব নেন, তখন তিনি মনিব। এখানে তার কোন দুর্ব্বলতা নেই।

কিন্তু টাকা ত আপনার। বলিলাম।

তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন—মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। অর্থাৎ পয়লা তারিখ আফিস থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত।

ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া আমার করুণা হইল এবং সহমর্ম্মিতায় মনটা গলিয়া গেল। জীবনে অযাচিতভাবে কাহাকেও কোন দিন কিছু সাহায্য করিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না, কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই ক্ষণ পরিচিত দুর্ভাগা বন্ধুর মর্ম্মবেদনা যেন আমাকে অতি মাত্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যে ক্যাসমেমোটি আজ আমার জীবনে ট্রেজেডির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দান করিলেই ত ভদ্রলোকের ফাঁড়া কাটিয়া যায়। কথাটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলাম, হয়ত ভদ্রলোক কিছু মনেও করিতে পারেন। অপাঙ্গে একবার চাহিলাম—তিনি আর একপ্রস্থ সিগারেট বাহির করিবার চেষ্টায় আছেন। নিজের পকেট হইতে অভিশপ্ত ক্যাসমেমোটা অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া লইয়া টুক্ করিয়া ভদ্রলোকের পাঞ্জাবীর পকেটে ফেলিয়া দিতেই তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং আমাকে আর একটা সিগারেট দিয়া বলিলেন—নমস্কার। দোকানটা একবার ঘুরেই যাই।

হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া প্রত্যভিবাদন করিতে করিতে আমি কতকটা সান্ত্বনার সুরে বলিলাম—তা যান। তবে পকেটটা আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখবেন।

নবপরিচিত বন্ধুটি চলিয়া গেলেন। স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই আজিকার এই যোগাযোগটা যেমনি বিস্ময়কর, তেমনি অসম্ভব রকমের অদ্ভুত—অবশ্য কতকটা সিনেমার সস্তা ছবির মত। তা হউক। ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেন্জার দ্যান ফিক্‌সন। হঠাৎ বেঞ্চির নীচে নজর গেল, খবরের কাগজে মোড়া ছোট্ট একটা বাণ্ডিলের মত কি পড়িয়া আছে। তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি কাগজটাকে ছিঁড়িয়া দেখি—কচি কলাপাতা রংএর একটি সিল্কের ব্লাউস। ভগবান, জানি না আজ সকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম। এত বিস্ময় কি তুমি আমার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলে? কিন্তু এই মাত্র সে লোকটা ক্যাসমেমোর খোঁজে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া গেলেন, হায়রে! তিনি যখন একটি ক্যাসমেমো শেষ পর্য্যন্ত নিজের পকেটেই পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিলেন তখনই জানিবেন ব্লাউজটা আর তাঁহার কাছে নাই। কল্পনা নেত্রে ভদ্রলোকটির দুঃখ ও দুর্দ্দশার ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

তখন তাহাকে ধরিবার আর কোন উপায়ই ছিল না। প্রত্যাসন্ন বৃষ্টি

মাথায় করিয়া অতি দ্রুত পদে খোকার মামার বাড়ীর দিকে চলিলাম—পার্কের গায়েই লাল রংএর বাড়ী।

ব্লাউজটা চাকরের মারফৎ উপরে পাঠাইয়া দিতেই ব্লাউজটা হাতে করিয়া গৃহিণী নীচে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—ছি, ছি, তোমার জন্য কি আমি গলায় দড়ি দেব, না বিষ খেয়ে মরব।

নুতন কোন বিপদের আশঙ্কায় আবার ভয় পাইয়া গেলাম। শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত বক্ষে তবুও প্রশ্ন করিলাম—ব্যাপার কি?

—আজ রাণুর জন্ম দিন তা তুমি জানো না?

রাণু আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালকের কনিষ্ঠা কন্যা। রাগে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। শ্যালক কন্যার জন্মদিনের খবর আমার রাখিবার কথা নয়। কিন্তু বুঝাইব কাহাকে? যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর নরম করিয়া জবাব দিলাম—না।

স্ত্রীর মুখ গহ্বর হইতে অতি মাত্রায় নিষ্পেষিত হইয়া বিক্ষুব্ধ ঠোঁটের ফাঁক দিয়া বাহির হইল—না। কেন, দাদা তোমাকে আফিসে বেরোবার সময় চিঠি দেন নি?

চিঠি? যেন আকাশ হইতে পড়িতেছি। হঠাৎ ধরণীর ধুলায় পা ঠেকিয়া গেল। সত্যইত। সকালবেলা আফিসে যাইবার সময় ভীড় ঠেলিয়া ট্রামে উঠিবার জন্য যখন রীতিমত ঘামিয়া উঠিয়াছি তখন দাদা কাগজের মত কি একটা আমার পকেটস্থ করিয়াছিলেন। হয়ত কিছু বলিয়াও থাকিবেন, গোলমালে শুনিতে পাই নাই।

অন্ধকারে যেন আলো দেখা দিল। ক্যাসমেমো রহস্যের সমাধানসূত্র পাওয়া যাইতেছে। তবু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলাম সেই ক্যাসমেমো ছাড়া আর ত কোন—

স্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—ক্যাসমেমোর উল্টা দিক্‌টা উল্টে দেখেছিলে দাদা কি লিখেছিলেন?

স্বীকার করিলাম দেখি নাই কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িলাম না। কর্ত্তব্য বুদ্ধিটাকে সজাগ করিয়া লইয়া এই অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম—দাও ত চাবিটা। চট্ করে একবার ঘুরে আসি।

চাবির আশায় স্ত্রীর দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলাম।

তন্বী শ্যামাঙ্গিণী গৃহিণী কচি কলাপাতা রংএর ব্লাউসটা আমার নাকের ডগার উপর খুলিয়া ধরিয়া বলিল—তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু জিগ্‌গেস্ করি এটা কুড়িয়ে পেয়েছ না কেউ দয়া করে দান করেছে। এত বড় ব্লাউজ আমার গায়ে হয়, না রংটাই মানায়।

একেবারে বসিয়া পড়িলাম।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

(১) বিদেহীর ছায়ামূর্ত্তি

ধরণীর সুকোমল ক্রোড় হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রে মানব কোনও একদিন—শৈশবে, যৌবনে, অথবা বার্দ্ধক্যের শুচি শুভ্র সজ্জায়—পরপারে যাত্রা করে। ইহলোকে সে রেখে যায় তার স্মৃতি; ওপারে তার সাথী হ'য়ে যাত্রা করে আপনার শুভাশুভ কর্ম্ম আর অপূর্ণ বাসনা-কামনা। সেই সূক্ষ্মলোকে জড় দেহের অস্তিত্ব থাকে না সত্য, থাকে বিদেহীর সর্ব্ব অনুভূতি—সুখ-দুঃখ বোধ, প্রেম ও স্নেহ, অনুরাগ বিরাগ, মানব মনের সকল বৃত্তি, সব বৈশিষ্ট্য। শ্রুতি সুদূর অতীতে প্রচার করেছেন—দেহান্তে মানবের অনুগমন করে শুধু তার প্রাণশক্তি নয়, তার যাবতীয় সংস্কার।১ প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকও আজ এই কথাই স্বীকার করে অসংশয়ে বলেছেন—শিক্ষা ও সংস্কার, স্মৃতি ও কৃষ্টি—এ সকলই দেহত্যাগের পরেও মানবের সাথী হ'য়ে অবস্থিতি করে।২

বিদেহী-জনের স্নেহ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে তাই এপার ও ওপারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনা হয়ে যায়। প্রবাসগামী পুত্র যেমন বিদেশে উপস্থিত হ'য়েই, সেখান হ'তে সর্ব্বাগ্রে আপনার কুশল সংবাদ গৃহে আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করে, বিদেহী-মানবও তেমনি পরপারে উত্তীর্ণ হ'য়ে, তন্দ্রাঘোর দূর হ'লেই যখন সে আপনার চৈতন্যময় অস্তিত্বে নিঃসংশয় হয়, তখন উৎফুল্ল আনন্দে তার নব-জাগৃতির বার্ত্তা পরিত্যক্ত পার্থিব প্রিয়জনকে প্রেরণ করতে সচেষ্ট হয়।৩ দেহান্তের পরবর্ত্তী কিছুদিন এরূপ ঘটনা এত

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৪।৪।২

২. ...Memory, culture, education, habits, character and affection—all these, and to a certain extent tastes and interests, for better, for worse, are retained.

Sir Oliver Lodge—Survival of Man. p. 349.

Character, memory, affection, personality, etc., go with the etheric, because they pertain to the etheric body on earth.

Findlay—On the Edge of the Etheric. p. 114.

৩. The first thing that comes into his mind is the question whether it is possible for him to get this wonderful discovery (about his being alive and his faculties being alert) through to those he has left behind.

Owen—Facts and Future Life. p. 161.

সাধারণ যে আমরা তা' কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু বেতার-যন্ত্রের সকল তন্ত্রীতেই যেমন সর্ব্ব দেশের ধ্বনি সুস্পষ্ট ঝঙ্কার দেয় না, পার্থিব মানবের স্থূল অনুভূতিও তেমনি সাধারণতঃ বিদেহীর প্রেরিত এরূপ বহু বার্ত্তারই স্পর্শ লাভ করে না। কর্ম্মব্যস্ত জাগতিক জীবের অতীন্দ্রিয় বস্তুতে একাগ্রতা কোথায়? তবুও, কখনো স্বপ্নে, কখনো তন্দ্রায়, কখনো বা মনের বিশ্রাম অবস্থায় বিদেহীর বাণী আমাদের অন্তর্দ্বারে এসে প্রবেশ করে। একরূপে নয়, নানা ভাবেই তাঁরা আমাদের নিকটে বার্ত্তা প্রেরণ করেন।৪

যাঁরা ওপার হ'তে এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্ত কাতর হন, কোন না কোন প্রকার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাঁদের এখানে সাময়িক প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। পৃথিবীর সব দেশেই পণ্ডিত ও অপণ্ডিত বহু জনেই বিদেহীর এই সব ছায়ামূর্ত্তি—বর্ব্বর যুগ হ'তে বৈজ্ঞানিক যুগ পর্য্যন্ত চিরদিনই দর্শন করেছেন। বিজ্ঞানও আজ এই সকল মূর্ত্তির প্রকাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।৫

প্রশস্ত দিবালোকেও যে এরূপ মূর্ত্তির প্রকাশ দেখা যায় তার কয়েকটি মাত্র প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হ'ল—দু-টি বিদেশী, অপরটি আমাদের বাঙলারই ঘটনা।

(১) পুত্র বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে নিহত হবার পর দুর্ভাগ্য মাতা শোকে ও রোগে প্রায় শয্যাশায়িনী। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির দিন (Armistice Day) কোনও প্রকারে আপনার অশক্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে তিনি স্থানীয় উপাসনা-গৃহে উপস্থিত হলেন। এই গৃহেই যে তাঁর পুত্র যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে সেবকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রার্থনার স্থানে গিয়ে নতজানু হ'য়ে আসন গ্রহণ করা বৃদ্ধার সাধ্যাতীত হ'ল।

এমন সময় কাঁধের উপর কার করস্পর্শ অনুভব ক'রে তিনি মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন—এ যে তাঁর সেই হারানো সন্তান! "মাগো! আমি তোমায় নিয়ে যাই চল" ;—এই কথা ব'লে সেই বিদেহী পুত্র ভগ্নদেহ জননীকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা-বেদিতে অগ্রবর্ত্তী হ'ল এবং জননীর পাশেই নতজানু হ'য়ে বসে প্রার্থনা করেছিল।৬ এ ঘটনা ইংলণ্ডের।

(২) দ্বিতীয় ঘটনা মার্কিণের :—

দুটি সামরিক কর্ম্মচারী—ক্যাপ্টেন্ সেরব্রুক্ আর লেফ্‌টেনাণ্ট্ ওয়াইনিয়ার বেলা ন'টার সময় সিড্‌নে সহরে রেজিমেণ্টের ভোজন-কক্ষে ব'সে কাফী পান করছিলেন, এমন সময় একটি যুবার মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁদের পাশ দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে শয়ন গৃহে প্রবেশ করেছিল। উভয়েই সে মূর্ত্তি দর্শন করেছিলেন।

ওয়াইনিয়ার মূর্ত্তিটি দেখেই ব'লে উঠ্‌লেন—"আরে! এ যে আমার ভাই জন্"। অপর একজন লেফ্‌টেনেণ্টের সঙ্গে তারপর সেই বাড়ীর প্রত্যেক ঘরই অনুসন্ধান করা হয়েছিল, কিন্তু মূর্ত্তিটির আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন পরে ওয়াইনিয়ারের কাছে সংবাদ এসেছিল যে, ঘটনার তারিখে ও ঠিক সেই সময়েই তার ভ্রাতা জনের মৃত্যু হ'য়েছে।৭

(৩) আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন—

মতিবাবু (ঠাকুর পরিবারের এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি) মরবার পরও দেখা দিয়েছিলেন, সে এক আশ্চর্য্য গল্প।...তিনি অসুখে পড়লেন। বড় ছেলে নিয়ে গেল তাঁকে দেশে।...অনেকদিন আর কোন খবর পাইনে।...এক-দিন সকালে বসে আছি বারান্দায়, একটা লোক ধীরে ধীরে বারান্দায় ঢুকল, দেখি মতিবাবু। চাকরদের বললুম—'ওরে দেখ্, দেখ্, মতিবাবু এসেছেন, তামাক টামাক ঠিক রাখ্।' চাকররা ছুটে নেমে গেল নিচে, দেখলে কোথাও কেউ নেই। বললুম, 'আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখলুম দিনের বেলা তিনি বাগান দিয়ে হেঁটে দেউড়িতে আসছেন। নিশ্চয়ই তিনি হবেন, খুঁজে দেখ্, যাবেন কোথায় আর'। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না খুঁজে।

দু-চার দিন বাদে তাঁর ছেলে এসে জানালে মতিবাবুর গঙ্গালাভ হয়েছে।৮

এরূপ বহু বহু ঘটনার সংবাদ সকল দেশ হতেই পাওয়া যায়। সংশয়ীকে নিরাকুল ক'রে, নাস্তিকের কুতর্ককে লাঞ্ছিত ক'রে, দিবসে ও নিশীথে বিদেহী বারম্বার পৃথিবীতে এসে দর্শন দিয়েছেন। জড়বিজ্ঞান পরাভূত হ'য়েছে, সে শাস্ত্র এ সকল অপূর্ব্ব ব্যাপারের কোনও মীমাংসার সন্ধান পায় নি।

পৃথিবীর সংলগ্ন সূক্ষ্মভূমি হ'তে সুদূরবিস্তৃত পারলৌকিক জগতের প্রায় সীমান্ত পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্বগামীগণের অনেকেই আপনাপন সাময়িক কর্ম্ম অনুসরণ করে পরিভ্রমণ করছেন। সুদীর্ঘকাল না হ'লেও এই ভাবে অনেকেই কিছুকাল ব্যাপৃত থাকেন। তাঁদের করুণ, সস্নেহ, নিঃস্বার্থ দৃষ্টি নিয়তই জীব-জগতের প্রতি, পরিত্যক্ত প্রিয়জনের প্রতি, আর্ত্ত

---

৪. In general it appears that the spirits are ardently desirous of making themselves known to the living, and their failures only spur them on to new attempts, They employ for that purpose ways to which they are most inured.

Lombroso—After Death—What ? p. 338.

৫. The result of a critical examination of the evidence left no doubt in the mind of any student that these apparitions are veridical,...and their occurrence was not due to any illusion of the percipient, or chance.

Sir Wm. Barret—Threshold of the Unseen. p. 134.

৬. *Owen*—Facts and Future Life—p. 40-41.

৭. *Lombrose*—After Death—what ? p. 238-239.

৮. রাণী চন্দ—জোড়াসাঁকোর ধারে—পৃঃ ৬১-৬২.

ও হৃদয়ের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। তাই কখনো কখনো আমরা তাঁদের দর্শন লাভে ধন্য হই। পার্থিব জীবনই যে মানব-অস্তিত্বের শেষ সীমা নয়, এ হতে তার শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আর কী হওয়া সম্ভব।

বিদেহী যে কেবল মাত্র ক্ষীণ ছায়ামূর্ত্তিতেই পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তা নয়। সুস্পষ্ট, সুঠাম স্থূল-দেহে,—এই পার্থিব দেহেরই অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে,—তাঁরা বহুবার এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বিশিষ্ট সুধীজনের সভায়, কত বৈজ্ঞানিকের গবেষণা-গৃহে বিদেহীর বার বার অভিযান হ'য়েছে। জিজ্ঞাসুকে সচকিত ক'রে, বিজ্ঞানীকে চমৎকৃত ক'রে, তাঁরা ক্ষণেকে প্রকাশ ক্ষণেকে অন্তর্হিত হয়েছেন; আবার কখনো বা একই পরীক্ষাগৃহে বারম্বার আবির্ভূত হ'য়ে সংশয়ীকে নিঃসংশয় করেছেন। তাঁদের এই দেহগুলি শুধু যে বাহ্যিক সুগঠিত তা নয়; তাঁদের শ্বাসযন্ত্র হ'তে স্পন্দমান বক্ষঃস্থল—সবই পার্থিব মানবের সম্পূর্ণ অনুরূপ; মুখে আনন্দের প্রকাশ, নয়নে প্রীতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টি।

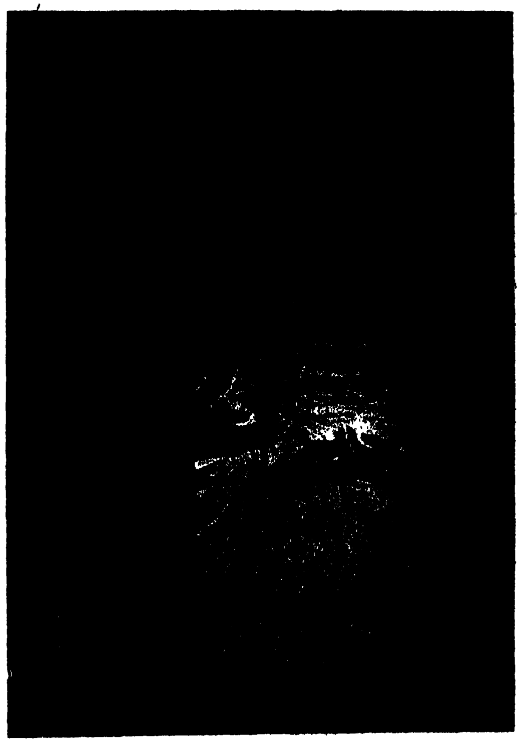
এমনি সুস্পষ্ট ও সুগঠিত এক যুগল মূর্ত্তির বিবরণ স্বনামধন্য ফরাসী অধ্যাপক ডাঃ গেলের গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর টিস্সো এই মূর্ত্তি দুটি দর্শন ক'রে পাশের চিত্রখানি অঙ্কিত করেছিলেন।৯ তিনি বলেছেন,—প্রথমে একটি নারী মূর্ত্তি প্রকাশিত হ'ল; তার বক্ষ হ'তে নীলাভ জ্যোতি বিকীর্ণ হ'চ্ছিল, মাথাটি বেষ্টন ক'রে ক্ষীণ উত্তরীয়, মুখে প্রসন্ন মধুর হাসি। ক্ষণ পরেই সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'ল।

শীঘ্রই তার পুনরাবির্ভাব হয়েছিল, এবার আরও পরিস্ফুট, সম্পূর্ণ জীবন্ত, মুখখানি যেন চন্দ্রালোকিত।...তার দুইখানি করতল বুকের সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে সে ধারণ ক'রে রয়েছিল যেন তড়িতের একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক। হঠাৎ সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অপর একটি মূর্ত্তি এবার প্রকাশ হ'ল; একটি কৃষ্ণকায় পুরুষের মূর্ত্তি; রক্তবর্ণ তার ওষ্ঠ, মাথার উপর ক্ষীণ মস্‌লিনের মত কোন বস্ত্রের উষ্ণীষ, অঙ্গে সেই বস্ত্রেরই আবরণ। তাঁরও হাতে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক, যার আভা তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আলোকিত করেছিল। সেই মূর্ত্তিটি আমার বামদিক অতিক্রম ক'রে সমস্ত গৃহটি পরিভ্রমণ ক'রে, উপস্থিত সকল ব্যক্তির সম্মুখে পূর্ণরূপে প্রকাশ হ'য়ে তারপর গৃহতলে বিলীন হয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সভায় কে একজন ব'লে উঠলেন,—"ঐ দেখুন! দুটি আলোক, দুটি মূর্ত্তি! কি সুন্দর!" ডানদিকে চেয়ে দেখি, যুগল মূর্ত্তি প্রকাশ হয়েছে। আপনাদের কর-ধৃত খণ্ডচন্দ্রের (দুটি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর) আলোকে তাদের অবয়ব আলোকিত হয়েছে। পুরুষ মূর্ত্তিটি ভারতীয়ের



Taken from Geleys' Cloirvoyance
and Metrialisation by permission

মত, নারীটি আমাদের পূর্ব্ব-দৃষ্টা 'বিদেহী কেটী'। আমার মুখ হ'তে আপনিই বাহির হ'ল—"কি সুন্দর! কি মধুর।" ১০

কি ভাবে বিদেহী স্থূল-দেহ ধারণ ক'রে আমাদের দর্শন দিতে সক্ষম হন, আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

(ক্রমশঃ)

---

৯. I add, by way of record, the very curious observation of the painter James Tissot, and his picture from life, of a double materialisation...
Geley—Clairvoyance and Materialisation—p356.

১০. *Geley*—Clairvoyance and Materialisation. p. 356-357.

বিদ্যা ও বিনয়

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বিনয় নম্র মধুর কোমল কথা,
আলোর আড়ালে ছায়া সুষমার মত,

চিত্রকরের তুলীর সুনিপুণতা,—
আভাবে ফুটায় ভাষায় ফুটেনা যত।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

ভারতীয় শিল্পপতিদের সফর

সম্প্রতি ভারত হইতে একদল শিল্পপতি ব্রিটেন ও আমেরিকা সফরে গিয়াছেন। মিঃ বিরলা, মিঃ টাটা, মিঃ শ্রফ, মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় শিল্পনায়ককে লইয়া এই দল গঠিত এবং ইহাদিগকে ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু চিন্তাশীল ভারতবাসীর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তবে সমস্ত সমালোচনার উত্তরে এই শিল্পপতির দল আমাদের জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ভারতের ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্য বিদেশ যাত্রা করিতেছেন এবং ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যাহাতে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পপ্রসারের জন্য সুদক্ষ শিল্পী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মোটের উপর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা এই বিদেশযাত্রার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না একথা ঘোষণা করায় অনেকেই তাঁহাদের সফর সাফল্যমণ্ডিত হইবার কামনা জানাইয়াছিলেন।

কিন্তু শেষপর্য্যন্ত এই শিল্পমিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ব্রিটেন বা আমেরিকা কোথাওই এই শিল্পপতির দল উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পান নাই। তাহারা লর্ড ন্যুফিল্ডের ন্যায় কোটিপতি ব্রিটিশ শিল্পনায়ককে এ বিষয়ে সহযোগিতা করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আবেদনে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায় নাই। ব্রিটেনে বা আমেরিকার সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে কারখানাগুলির সমরপণ্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সংবাদ যতদূর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ব্রিটিশ শিল্পনায়কগণ এবং মার্কিন শিল্পনায়কদের একাংশ নাকি ভারতীয় শিল্পমিশনকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সেই সাহায্যদানের পরিবর্ত্তে তাঁহারা দাবী জানাইয়াছিলেন নবগঠিত ভারতীয় শিল্পের উপর স্থায়ী বখরা। বলা বাহুল্য, সর্ব্বভারতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যে ভারতীয় শিল্পপতির দল এই মিশনের সভ্য হইয়াছেন তাঁহারা এইরূপ অন্যায় দাবী পূরণে রাজী হন নাই। অবশ্য আমেরিকার এক শ্রেণীর শিল্পপতি নিছক ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতির জন্যই ভারতকে সাহায্য করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহন করিতে ব্রিটেন বর্ত্তমানে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশ এখন শিল্পাদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এ সময় ভারতের বিরাট বাজারই যুদ্ধোত্তরকালে রপ্তানী বাণিজ্যজীবী ব্রিটেনের বাঁচিবার একমাত্র আশ্রয়। মার্কিণ শিল্পপতিগণ ব্রিটেনের এই একমাত্র ভরসাস্থলে শিল্পপ্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থ আহত করিতে চাহেন নাই। যাহা হউক, মোটের উপর ব্রিটিশ ও আমেরিকান শিল্পনায়কগণের সাহায্য প্রদানের অনিচ্ছায় শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পমিশনের সফর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আমেরিকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; কিন্তু ব্রিটেন যে এখনও ভারতের শিল্পপ্রসারে সাহায্য করিতে রাজী হইতেছে না, ইহা শেষ পর্য্যন্ত তাহার ভবিষ্যত ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, যে দেশে শিল্পাদি প্রসারিত হয় সে দেশে আমদানী বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হয়।* শিল্পপ্রসারের ফলে জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে অর্থের প্রচলন গতিও বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় শিল্পপ্রসারের পূর্ব্বের তুলনায় অন্তর্দ্দেশীয় পণ্য ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া আমদানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। ব্রিটেন যদি ভারতবর্ষে শিল্পপ্রসারে সাহায্য করে তাহা হইলে ভারতের যুদ্ধোত্তর আমদানী বাণিজ্য প্রসারের সম্পূর্ণ সুযোগ যে কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর শুভেচ্ছাপ্রাপ্ত ব্রিটেনই লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন ভারতীয় অবস্থার সহিত বহুদিনের পরিচয়গত অভিজ্ঞতায় ব্রিটেনের ভবিষ্যত বাণিজ্য-বাজারের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান শিল্পপ্রগতির মুখে ব্রিটিশ শিল্পনায়কগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন অসঙ্কোচে ভারতীয় শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসারের জন্য সর্ব্ববিধ সাহায্য করেন। দুঃখের বিষয় স্যার আলফ্রেডের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির এই উপদেশপ্রদান ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে। আমেরিকার যদিও এ বিষয়ে ঠিক এতখানি স্বার্থ নাই, তথাপি আমেরিকা যদি এখন ভারতবর্ষকে সাহায্য করে তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে বিরাট ভারতের বাজারে আমেরিকাও অবশ্য কতকটা সুবিধা পাইবে। তা ছাড়া মার্কিণ ব্যবসায়ীর পণ্যক্রেতা দেশ হিসাবে ভারতকে সাহায্যদানে এইরূপ অনিচ্ছার কারণ কি? ভারতবর্ষকে দক্ষ শিল্পী বা যন্ত্রপাতি, যাহাই আমেরিকা জোগাক, তজ্জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা মূল্য তো তাহারা অবশ্যই লাভ করিবে। ভারতীয় শিল্পে কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার কথা তাহাদের তো চিন্তা করারই কথা নয়, এমনকি বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এই অন্যায় চিন্তা ব্রিটেনও করিতে পারে না। ভারতবর্ষকে জমিদারীরূপে এতকাল ভোগ করিলেও সেই

---

* ১৩৫১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে 'দুনিয়ার অর্থনীতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জমিদারী বর্ত্তমানে ব্রিটেনের হাতছাড়া হইতে চলিয়াছে ইহাতো ব্রিটিশ শিল্পপতিগণেরও বোঝা উচিত।

তবে ধনতন্ত্রবাদী আমেরিকার বা রক্ষণশীল ব্রিটেনে ভারতীয় শিল্প-মিশন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ভারতের শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে এমন কথাও মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কৃষিজীবনের অসহ্য দারিদ্র্যের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভারতের জনসাধারণ এখন আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে, কাঁচামাল বা শিল্পশ্রমের দিক হইতেও ভারতের সম্পদ পৃথিবীর ঈর্ষ্যার বস্তু, মূলধনেরও ভারতে এখন আর বিশেষ অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং এখন ধীরে ধীরে হইলেও ভারতের শিল্পপ্রসার যে অবশ্যই সম্ভব হইবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া টোরী গভর্ণমেন্টের আমলে ধনতন্ত্রবাদী ইংলণ্ড ভারতকে সাহায্য না করিয়া ফিরাইয়া দিলেও সেই অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে আর দীর্ঘকাল বজায় থাকিবে না। পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের তীব্র পরাজয়ে বিশ্বমানবতার জয় কতকটা সূচিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিলী সরকারের আমলে যে লর্ড ম্যাফিল্ড ব্রিটিশ শিল্পের সাময়িক স্বার্থের সহিত ভারতের শিল্প-প্রসারের প্রশ্ন মিলাইয়া দেখিয়া শিল্পপতিগণকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদানে অসমর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন, শ্রমিক দলনায়ক স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বোর্ড অফ ট্রেডের সভাপতিত্বের আমলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন অবশ্যই আশা করা যায়। টোরি দলের সময়ের রক্ষণশীল ইংলণ্ড অপেক্ষা শ্রমিক দলের আমলের সমাজতন্ত্রমুখী ইংলণ্ড অনেক বেশী উদার মনোভাব অবলম্বী হইবে একথা অনুমান করাই স্বাভাবিক। ফিউডালইজম্ বা সামন্ততন্ত্রবাদের আমলের পৃথিবী অপেক্ষা ধনতন্ত্রবাদের আমলের পৃথিবী বিশ্বমানবতার দিক হইতে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল, আবার এই ধনতন্ত্রবাদের আসন্ন অবসানে সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুত্থানের সহিত সেই পরিবর্ত্তন আরও প্রত্যক্ষ হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। একদা একজন ভাগ্যবান জমিদার লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, এখনও একজন শিল্পনায়কের ব্যাঙ্কের খাতা ভরাইতে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন বিকাইয়া দেয়; কিন্তু যেদিন আসিতেছে সেদিন এই লক্ষ লক্ষ নিরুপায় ও দরিদ্র নরনারীর অবিচ্ছিন্ন দুঃখভোগের ইতিহাসের যবনিকাপাত হইবে। যে মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ শিল্পনায়কদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী এতকাল নির্ব্বিচারে কৃষিজীবনের দারিদ্র্য ভোগ করিয়াছে, তাহাদের চিরকাল জয় হইতে পারে না। ভারতের বিপুল সম্ভাবনা ব্রিটিশ শিল্পনায়ক বা বণিকদের স্বার্থের অজুহাতেই ব্যর্থ থাকিবে এরূপ কথা আগামী যুগে ভাবাও চলিবে না। তবে অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, আজ যাঁহারা শিল্পনায়ক হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন সেদিন তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন ফুরাইবে; কিন্তু ভারতের জনসাধারণ যে শিল্পপ্রগতির সহিত সেদিন মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার অর্জ্জন করিবে, এরূপ চিন্তা আজ আর কল্পনা বিলাসমাত্র নয়।

বাংলায় খাদ্যশস্যের অবস্থা

নয়াদিল্লীর ২৩শে জুলাইয়ের এক সংবাদে দেখিলাম বাংলা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাফল্যলাভ করায় বাংলার নাকি যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য জমিয়া গিয়াছে। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, এখন বাংলায় খুব ভাল ফসল হইতেছে এবং বাংলা সরকারের শস্যসংগ্রহ নীতিও বর্ত্তমানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বাংলায় এখন আর দুর্ভিক্ষের কোন ভয়ই নাকি নাই, বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত এত খাদ্যশস্য বাংলায় জমিয়া গিয়াছে যে, বাংলাকে এখন খাদ্যশস্যের দিক হইতে উদ্বৃত্ত প্রদেশ বলা চলে। উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, বাংলার এই উদ্বৃত্ত চাউল হইতে ২৫ হাজার টন চাউল যুক্তপ্রদেশ সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলা নাকি বিহারকে ১৫ হাজার টন চাউল এবং মাদ্রাজকে কিছু পরিমাণ মোটা চাউল সরবরাহ করিবে।

শুধু এই সংবাদেই নয়, বাংলার গভর্ণর মিষ্টার কেসির গত ৪ঠা জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতাতেও আমরা বাংলার এই শস্য উদ্বৃত্ত হইবার সংবাদ পাইয়াছিলাম। মাননীয় লাট বাহাদুর গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন যে, বাংলায় যখন আর দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি হইবার ভয় নাই এবং এই প্রদেশে যখন বর্ত্তমানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বহু শস্য জমিয়া গিয়াছে, তখন এই উদ্বৃত্ত শস্য হইতে ভারতের ঘাটতি অঞ্চল সমূহে শস্য পাঠান উচিত। বাংলার দুঃখের দিনে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাকে খাদ্যশস্য জোগাইয়া সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া বাংলার এই সুদিনে তাহারও ভারতের অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ভগ্নিপ্রতিমা প্রদেশগুলিকে খাদ্যশস্য পাঠাইয়া সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া মিঃ কেসি মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

অবশ্য বাংলাদেশে যদি সত্যই খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয় এবং ভারতের অন্য প্রদেশের লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়, তাহা হইলে বাংলা হইতে বাড়তি শস্যাদি রপ্তানীতে আমাদের আপত্তি করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু নয়াদিল্লীর সংবাদে বা মিঃ কেসির বক্তৃতায় উদ্বৃত্ত শস্যের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলাসরকারের খাদ্য পরিচালনা নীতি দেখিলে তো সেই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের নিঃসংশয় কোন ধারণা জন্মায় না। এখনও রেশনিং অঞ্চলে ১০৲ টাকা মণ দরে যে চাউল বিক্রীত হইতেছে তাহা মানুষের খাদ্য হিসাবে প্রায় অচল বলা চলে এবং ১৩ টাকা ৪ আনা মণ দরের চাউলেও কাঁকর ও বিভিন্নপ্রকার চাউলের মিশ্রণ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে যেখানে ৫৲ টাকা মণ দরে ভাল চাউল পাওয়া যাইত, সেস্থলে এখন ভাল চাউলের মণ রেশনিং এলাকায় ২৫৲ টাকা। এইভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার জন-সাধারণ যখন যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় এখনও পাঁচ গুণ মূল্যে অন্নক্রয়ে বাধ্য হইতেছে তখন বাংলা সরকারের খাদ্যনীতির সাফল্য বা উদ্বৃত্ত শস্যের সত্যতা আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? সকলেই জানেন যে, দুর্ভিক্ষোত্তর বাংলায় খাদ্যশস্যই একমাত্র অত্যাবশ্যক পণ্য এবং এই খাদ্যশস্যের মূল্য নির্দ্ধারণের উপর বাংলার সাধারণ বাজারের মূল্য রেখায়

তেজী বা মন্দাভাব সকল দিক হইতেই নির্ভর করে। চাউলের দর কমিলে কৃষকদের ক্ষতি হইবার যে বিজ্ঞাপন সাড়ম্বরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও যুক্তিসহ কিনা সন্দেহ। চাউল সস্তা হইলে সাধারণ বাজার সস্তা হইতে বাধ্য এবং তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ হইবে। তাছাড়া দুর্ভিক্ষোত্তর বাংলায় চাউলবিক্রেতা মুনাফাভোগী কৃষক কয়জন আছে যে তাহাদের জন্য এই প্রদেশের অসংখ্য দরিদ্র জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করা চলে? এখন খাদ্যশস্যের মূল্য পাঁচ গুণ বলিয়াই পণ্য-সাধারণের মূল্যস্তর যে কৃত্রিমভাবে চড়া রহিয়াছে একথা তো বলাই বাহুল্য। বাংলার যে সব এলাকায় রেশনিং প্রথা চালু হয় নাই সেখানেওতো এখন যথেষ্ট অধিক দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। মুন্সিগঞ্জের মত শস্যপ্রধান স্থানেও এখন বালাম ও অপেক্ষাকৃত ভাল চাউলের দর প্রতি মণ প্রায় কুড়ি টাকা। এই অবস্থা লক্ষ্য করিবার পর একথা কখনই বলা যায় না যে বাংলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল আছে অথবা উদ্বৃত্ত অঞ্চল বাংলা হইতে জন-সাধারণের অসুবিধা না ঘটাইয়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউল রপ্তানী করা সম্ভব। তা ছাড়া যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বাংলার তুলনায় অনেক কম দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে; বাংলার ১৬ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রীতব্য চাউল একই দরে এই সকল প্রদেশে বিক্রয় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অপর দিকে বাংলার চাউল যদি কোন কোন প্রদেশে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রীত হয়, তাহা কি বাংলার অধিবাসীদের প্রতি অবিচারের পরিচায়ক হইবে না। এবৎসর বর্ষার যে অবস্থা তাহাতে বাংলায় শস্য উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হইবে বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। অবশ্য ভিতরের খবর আমরা ঠিক জানি না, হয়তো বাংলা সরকারের হাতে সত্যই প্রচুর পরিমাণ চাউল জমিয়াছে; কিন্তু চাউল যদি সত্যই হাতে যথেষ্ট থাকে এবং বাংলা সরকারই যদি রেশনিং অঞ্চলে চাউল বিক্রয় করিবার একমাত্র অধিকারী হন, তাহা হইলে এই একচেটিয়া ব্যবসা চালাইবার সময় তাঁহাদের কি উচিত নয় বাংলার দুঃস্থ অধিবাসীদের আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের কথা বিবেচনা করা? পণ্যাভাব ঘটিলেই চাহিদার চাপে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হয়। বাংলা সরকারের এমনিই নিয়ন্ত্রণনীতি চালু করিয়া সেই অন্যায় মূল্যস্ফীতি রোধ করা উচিত। দেশবাসীর প্রতি এই সাধারণ কর্ত্তব্য পালন না করিয়া বাংলা সরকার যদি তাঁহাদের অসহায়তার সুযোগে এবং একচেটিয়া ব্যবসাদারীর মোহে হাতে যথেষ্ট চাউল থাকা সত্ত্বেও চাউল বিক্রয়ে চতুর্গুণ মূল্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মুনাফাখোরদের সাজা দেওয়ার আইন প্রণয়নের এবং সেই আইনের সংবাদ জনসাধারণের নিকট বিশদভাবে বিজ্ঞাপিত করিবার সার্থকতা কোথায়? বিদেশে চাউল রপ্তানীর আগে বাংলায় চাউলের মূল্য হ্রাসের কথা বাংলা সরকার বিবেচনা করিবেন কি?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনা নীতি

অনেকদিন হইতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এদেশে আন্দোলন চলিতেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে যখন ১৯৩৫ সালে নূতন আইন প্রবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন এদেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহের এবং ভারত সরকারের ব্যাঙ্কারের কাজ করা ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়িয়াছিল। এই কাজগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে ভারতের মুদ্রানীতি পরিচালনা করা। টাকার চাহিদা বুঝিয়া নোট ছাপাইবার এবং মুদ্রার মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিবার ফলে ভারতে শিল্পপ্রসারে অর্থাভাব ঘটিবে না, এমন আশাও অনেকে করিয়াছিলেন। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার সংকোচ সম্পর্কেও সকল প্রকার সংবাদ রাখিবার ভার পাইয়াছিল এবং ইহার সাহায্যে ভারতীয় কৃষি বা শিল্প বাণিজ্য অর্থের দিক হইতে কোন অসুবিধা ভোগ করিবে না, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় এমন কথাও এদেশে অনেকে ভাবিয়াছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের ব্যাঙ্কারের কার্য্য করিত, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর আইন অনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা পাইয়াছিল তাহা অবলুপ্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ সালের পর হইতে আইনের চোখে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক একটি বড় ধরণের সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু অনেক আশা ও সম্ভাবনা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলেও এ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কার্য্যকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশের শিল্প বাণিজ্য বা কৃষির কোন প্রত্যক্ষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে নাই। মুদ্রানীতির পরিচালনাভার হাতে পাইয়া এদিক হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছে, কোন সভ্য দেশের আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাসে তাহার তুলনা হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের একটি বিধানে আছে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে সোনার জামিন না থাকিলেও বিলাতী ষ্টার্লিং সিকিউরিটির জামিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ছাপিতে পারিবে। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ক্রীড়নক হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই বিধানটিকে সাধারণ বিধিতে রূপান্তরিত করিয়াছে এবং কাগজী ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে পর্ব্বত প্রমাণ নোট ছাপিয়া ভারতের মুদ্রানীতির ভারসাম্য একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য পণ্যমূল্যের পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্লিং ঋণপত্র প্রদান করিতে শুরু করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের স্বার্থ একেবারে উপেক্ষা করিয়া ব্রিটিশ সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে এবং একদিকে যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পাহাড় জমিয়া উঠিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও গোছা গোছা নূতন নোট মুদ্রাযন্ত্রের অন্ধকার গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসে। এইভাবে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ যখন ছিল ১৭৮ কোটি টাকা মাত্র, সে স্থানে বর্ত্তমানে এই নোটের পরিমাণ ১১৩৮ কোটি ৬৮ লক্ষ

টাকা দাঁড়াইয়াছে (১৭ই জুলাই, ১৯৪০)। ব্রিটেনের কাগজী প্রতিশ্রুতিতে পণ্যভাব সংক্ষুব্ধ ভারতের বাজারে অজস্র নোট ছাড়িবার ফলে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কই বলিতে গেলে ভারতের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির, এমন কি লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কারী তীব্র দুর্ভিক্ষের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি ও শিল্পের জন্য আশানুরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা না দেখাইয়া এবং নিতান্ত অসঙ্গতভাবে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতে গেলে যতদূর সম্ভব ব্যর্থতা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে পক্ষপাতিত্ব দেখান হইতেছে তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে সাধারণ একটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের বড় বড় যৌথ ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা যতটুকু, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা তদপেক্ষা কানাকড়ি বেশী নয়। তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া যেখানে যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেই সকল স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে তাহার এজেন্সি করিতে দিতেছে। এই ভাবে সুযোগ লাভ করিয়া শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এতদিন বৎসরে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা মুনাফা লাভ করিয়াছে। এই বৎসর এপ্রিল মাসে এজেন্সির মেয়াদ শেষ হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন এজেন্ট নিযুক্ত করিবার সুযোগ আসিয়াছিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ভারতীয় গভর্ণর স্যার দেশমুখ অন্ততঃ কোন ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ককে এই এজেন্সি-অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু প্রকাশ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই নাকি মুনাফার হার কতকটা সঙ্কুচিত করিয়া পুনরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছে।

এসব অন্যায় অবিচার সহ্য করা যাইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে তাহার তালিকাভুক্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রতি যেরূপ জুলুম করিতেছে তাহা এই সকল দেশীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বার্থের দারুণ প্রতিকূল বলিয়া আমরা মনে করি। এদেশে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হইলে সরকারী সিকিউরিটি বা হুণ্ডি জামিন রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এই ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুদ গ্রহণ করে। সচরাচর নিয়ম হইল এই যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত এই সুদের হার অপেক্ষা ঋণকারী ব্যাঙ্ক তাহার দাদনের উপর অপেক্ষাকৃত চড়াহারে সুদ আদায় করে। ১৯৩৬ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইভাবে প্রদত্ত ঋণের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ আদায় করিতেছে। অবশ্য যুদ্ধের আগে সাধারণ ব্যাঙ্কের পক্ষে দাদনের উপর বার্ষিক শতকরা ৩ টাকার বেশী সুদ আদায় করা অনায়াসেই সম্ভব ছিল, কারণ তখন গভর্ণমেণ্টই আরও বেশী সুদে জনসাধারণের টাকা ধার নিতেন। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ফাঁপাই টাকার প্রাচুর্য্য হওয়ায় সস্তা টাকার যুগে ঋণের উপর সুদের পরিমাণ অসম্ভবরকম কমিয়া গিয়াছে। এখন যে কোন সাধারণ ব্যাঙ্ক যুদ্ধের পূর্ব্বের শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদের স্থানে এক বৎসরের জন্য জমা স্থায়ী আমানতে শতকরা ২॥০ আনায় বেশী সুদ প্রদানে সক্ষম হইতেছে না। চলতি আমানতে সুদের পরিমাণ বর্ত্তমানে শতকরা বার্ষিক ।০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। লোকের হাতে টাকা আসায় ব্যাঙ্কের পক্ষে লাভজনক ভাবে টাকা খাটানো এখন অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে এবং যদিও টাকা ধার দেওয়া যায়, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই শতকরা বার্ষিক ৩ টাকার বেশী সুদ আদায় করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে এখনও ব্যাঙ্কগুলিকে অসময়ে টাকা জোগাইয়া তাহার বিনিময়ে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদ আদায় করিতেছে ইহাতে নিঃসন্দেহে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ভারতসরকার বর্ত্তমানে শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা ও ২॥০ সুদের ঋণপত্র বাহির করিয়াছেন এবং এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঋণপত্রগুলি বিক্রয় আরম্ভ হইবার অল্পসময়ের মধ্যেই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, এসময় শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদ আদায় করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে দেশীয় ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কগুলির অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের প্রসারের জন্য ইহা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, ইহাই সকলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আশা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাভাবে এ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ক্ষতিগ্রস্তই করিয়াছে।

প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ নাকি স্থির করিয়াছেন যে, শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরোক্ত সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইবে। অনেক দিন অবিচার চালাইবার পর যে এখন কর্তৃপক্ষের মনে এই সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, ইহাও অবশ্যই আশার কথা। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান টাকার বাজারের স্বচ্ছলতা লক্ষ্য করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত শতকরা বার্ষিক ৩ টাকার স্থলে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের অনুকরণে বার্ষিক শতকরা ২ টাকায় সুদের হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া। তবে একথা ঠিক যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকৃতই সুদের হার না কমাইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করা অর্থহীন। গত নভেম্বর মাসেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ কমাইবে বলিয়া বাজারে জোর গুজব রটিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই গুজব সত্যে পরিণত হয় নাই।

ত্যাগী

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাপ আপনারে পঙ্কিল করি'
পুণ্যের দানে মান,

মিথ্যা নিজেরে নিঃস্ব করিয়া
দিল সত্যের প্রাণ

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন

বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বের কমন্স সভায় রক্ষণশীল দলের যে পরিমাণ সংখ্যাধিক্য ছিল, এই নির্ব্বাচনে তাহা অপেক্ষাও শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্য বেশী হইয়াছে। বৃটেনের ভোটদাতাদের মনোভাবের যে এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা শ্রমিক নেতারাও বুঝিতে পারেন নাই; রক্ষণশীলদের পক্ষেও ইহা কল্পনাতীত ছিল।

এই নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল ২১৪টি নূতন আসন অধিকার করিয়াছে; পূর্ব্বে তাহাদের যে সব আসন ছিল, তাহার মধ্যে মাত্র ৪টি আসনে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। রক্ষণশীল দল হারাইয়াছে ১৮২টি আসন; নূতন আসন পাইয়াছে মাত্র ৮টি। নূতন পার্লামেন্টে শ্রমিক দলের সমর্থকের সংখ্যা ৪১৭; তাহাদের বিরোধীদের সংখ্যা মাত্র ২১০। নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য এই যে, চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভার একমাত্র মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ ইডেন্ ছাড়া আর কোন রক্ষণশীল সদস্যই নির্ব্বাচিত হন নাই। একজন নিতান্ত অখ্যাত লোক মিঃ চার্চ্চিলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ১০ হাজার ভোট পাইয়াছেন।

বৃটেনের এই সাধারণ নির্ব্বাচনকে কোন কোন বৃটিশ পত্রিকা "নীরব বিপ্লব" আখ্যা দিয়াছেন। কথাটা আমাদের—ভারতবাসীর কাণে অত্যন্ত বিদ্‌ঘুটে ঠেকে; কারণ বৃটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমরা বিশেষ পার্থক্য দেখি না। জমিদারী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব দলের মনোভাবই যে এক, সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। ম্যাক্‌-ডোনাল্ডের আমলে বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা আমাদের স্মরণ আছে; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জ্বালায় আমরা এখনও জ্বলিতেছি।

বস্তুতঃ শ্রমিক দলের ক্ষমতা লাভই একটা বিরাট ব্যাপার নয়। ইহার প্রধান কারণ—বৃটেনের শ্রমিক দলের নেতৃত্বের বল্গা এখনও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতে রহিয়াছে। প্রগতিমূলক 'শ্লোগান্' তাহাদের অনেকের পক্ষে জনপ্রিয় হইবার মুখোস মাত্র। প্রকৃত প্রশ্ন—বৃটিশ শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে—নেতাদের প্রতি তাহাদের এখন চাপ কতখানি।

এই দিক হইতে বর্ত্তমান বৃটিশ শ্রমিক দল আর ১৯২৪ সালের দল নয়। বৃটিশ শ্রমিক দলের রূপ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বদলাইয়াছে, দলের মধ্যে প্রগতিপন্থীদের প্রভাব অনেক বাড়িয়াছে। প্রগতিপন্থীদের সহিত প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতৃত্বের প্রবল সজ্ঘর্ষ দেখা গিয়াছিল ১৯৪৩ সালের শ্রমিক সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে সমগ্র জার্ম্মান্ জাতিকে শাস্তি দিবার জন্য (তথাকথিত ভ্যান্‌সিটার্টিজমের সমর্থনে) যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, প্রগতিপন্থীরা তাহার প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি সম্মেলনে পাশ হইয়া যায়। তখন সম্মেলন কক্ষের বাহিরে এক বিরাট সভায় তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়। এক বৎসরে এই প্রগতিপন্থীদের শক্তি কতদূর বাড়িয়াছে, তাহার পরিচয় গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৪ সালে) ব্ল্যাক্‌পুলে পাওয়া গিয়াছিল। ব্ল্যাক্‌পুল সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বৃটিশ জনসাধারণ আজ যে শ্রমিক দলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিল, সে দলের রূপ ক্রমেই এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সব চেয়ে বড় কথা, এই নির্ব্বাচনে বৃটিশ জনসাধারণ কতকগুলি লোককে সমর্থন করে নাই—তাহারা সমর্থন করিয়াছে একটা নীতিকে এবং সুস্পষ্ট বিরোধিতা জানাইয়াছে অন্য একটা নীতির বিরুদ্ধে। স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে শ্রমিক দল ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী; তাহারা অবিলম্বে মূলশিল্প, যানবাহন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, কতকগুলি বৃহৎ শিল্প এবং কতক পরিমাণে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়া এই সকলকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে চায়। যুদ্ধোত্তরকালীন পুনর্গঠনের জন্য ইহাই তাহাদের নীতি। পক্ষান্তরে, রক্ষণশীল দল ব্যবসায়ে ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সোস্যালিজমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে না খাইয়া মরিবার ও না খাওয়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা পাকা হইয়াছিল। বৃটিশ জনসাধারণ সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, সেই ব্যবস্থায় তাহারা আর ফিরিয়া যাইতে চায় না। সোস্যালিজমের উদ্দেশে মিঃ চার্চ্চিলের মুখ খিঁচুনি ও দাঁত খিঁচুনি দেখিয়া তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দল গ্রীসের বামপন্থীদের ডাণ্ডা মারিয়াছে, বেল্‌জিয়ামে প্রতিক্রিয়াপন্থীদিগকে উৎসাহ দিয়াছে, যুগোশ্লেভিয়া টিটোকে চোখ রাঙ্গাইয়াছে, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর পিঠ চাপড়াইয়াছে। শ্রমিক দল বরাবর এই পররাষ্ট্র নীতির বিরোধী। সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রমাণিত হইল—বৃটিশ জনসাধারণ রক্ষণশীল দলের এই পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্ত্তন চায়। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষার প্রতিশ্রুতি রক্ষণশীল দল দিয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনের পোলদিগকে সমর্থনে, ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে টিটোর সহিত অসঙ্গত আচরণে, নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি বিধান সম্বন্ধে দীর্ঘসূত্রতায় এবং পরাজিত জার্ম্মানী সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাবই পরোক্ষে কাজ করিতেছিল। মধ্য প্রাচ্যকে সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ রক্ষণশীলদের চক্রান্তও গোপন ছিল না। বৃটিশ জনসাধারণ এই সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাব ও কাজের অবসান ঘটাইবার জন্য সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্ত শ্রমিক দল অঙ্গীকারবদ্ধ। রক্ষণশীল দল চিরদিন এই বিষয়ে টালবাহানা করিয়া আসিয়াছে। নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রক্ষণশীল পাণ্ডারা শ্রমিক নেতাদের সহিত এই সম্পর্কে একটা আপোষ করিয়াছিলেন। এই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করিবার ভার ছিল চার্চ্চিল-আমেরি কোম্পানীর চাঁই লর্ড ওয়াভেলের উপর। এই ব্যক্তি বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনের ১০ দিন আগে ভারতীয় নেতাদের সম্মেলন আহ্বান করিয়া এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন যে, ভারতের ব্যাপারে একটা সাময়িক মীমাংসা আসন্ন বলিয়া সকলে মনে করিল। আমাদের বরেণ্য নেতারা এই ব্যক্তির চাতুরীতে এতদূর বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মিলিটারী লাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন; আর বিবাদ করিতে লাগিলেন নিজেদের মধ্যে। এইভাবে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন যখন হইয়া গেল, তখন মিলিটারী লাট সকল দোষ নিজের কাঁধে লইয়া ভারতীয় নেতাদের বিদায় দিলেন। অবশ্য, তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ভারতের ব্যাপারে অবস্থাটা অনুকূল থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ জনসাধারণ তাঁহার মুরুব্বির দলকে এইভাবে পথে বসাইবে।

বৃটিশ জনসাধারণ শ্রমিক দলের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়া ভারতের ব্যাপারে মীমাংসা চাহিয়াছে। তাহারা অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে যে, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির সহিত তাহাদের নিজেদের যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—চরম দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ভারত-বাসীর ক্রয় ক্ষমতা বৃটেনের শ্রম শিল্পকে সমৃদ্ধ করিতে পারে না; তাই, তাহারা ভারত সম্পর্কে প্রাচীন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন চায়।

এই সাধারণ নির্ব্বাচনে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি এবং ভারতনীতি সম্পর্কে বৃটিশ জনসাধারণের যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বৃটিশ জনসাধারণের মনোভাবের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্রমিক দলের হাতে ক্ষমতা আসাটা "নীরব রাষ্ট্রবিপ্লব" নয়; তবে, বৃটিশ জাতির মনোজগতে যে সত্যই বিপ্লব ঘটিয়াছে, ইহা তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মনোজগতের এই বিপ্লবকে সমাজজীবনের বিপ্লবে রূপান্তরিত করিবার সুকঠিন দায়িত্ব পড়িয়াছে বৃটিশ শ্রমিক দলের উপর। দলের প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতারা যাহাতে জাতির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য হন, তাহার জন্য সতর্ক দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। কেবল ভোট দিয়াই বৃটিশ জনসাধারণের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই—যে উদ্দেশ্যে ভোট দেওয়া হইয়াছে, তাহা যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তাহার জন্ত প্রত্যেক প্রগতিপন্থী বৃটিশকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রমিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি এড়াইবার আর পথ নাই। তাঁহারা বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন; যে কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহাদিগকে আর অন্ত কোন দলের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে না। ১৯২৪ ও ২৮ সালে শ্রমিক দল যখন দুইবার মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করে, তখন তাহাদের এই সুবিধা ছিল না। তখন অন্ত সকল দলের মিলিত শক্তি সহজেই সরকারপক্ষকে পরাজিত করিতে পারিত; উদারনৈতিক দলের অনিশ্চিত সমর্থনের উপর শ্রমিক দলকে নির্ভর করিতে হইত। এবার শ্রমিক দলের বহু প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতা এই ভাবে দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িবার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে দ্বিধা ও সঙ্কোচ দেখা দিবার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক প্রথা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হইতে না পারে, তাহার জন্ত বৃটেনের গচ্ছিত স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী নানারূপ চক্রান্ত করিবেন। প্রগতিবিরোধী শ্রমিক নেতারা স্বেচ্ছায় এই চক্রান্তজালে পা দিতে চেষ্টা করিতে পারেন। ইঁহাদিগকে শ্রমিকদলের বিঘোষিত নীতি অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য করিবার দায়িত্ব বৃটিশ জনসাধারণের এবং শ্রমিক দলের প্রত্যেক প্রগতিপন্থী সদস্তের।

ত্রিশক্তির সম্মেলন

গত ১৭ই জুলাই বার্লিনের নিকটবর্ত্তী পোট্‌সড্যামে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্, জেনারলিসিমো ষ্ট্যালিন এবং মিঃ চার্চ্চিল আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। মিঃ চার্চ্চিল ২৬শে জুলাই বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল জানিবার জন্ত লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি দেখেন যে, রক্ষণশীল দলের ভরাডুবি হইয়াছে। ইহার পর বৃটেনের পক্ষ হইতে নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লি পোট্‌সড্যামে গিয়াছেন।

পোট্‌সড্যামে তিন জন রাষ্ট্রনায়কের আলোচনার গতি ও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই। কাজেই, গবেষণার গঙ্গায় বান ডাকিয়াছিল। এই সব গবেষণা ভিত্তি করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিরাপদ নয়; নেতৃত্রয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্মিলিত বিবৃতি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত।

তুরস্কের নিকট রুশিয়ার দাবী

রুশিয়া দার্দ্দানেলিজ প্রণালীতে কর্ত্তৃত্বের অধিকার চাহিয়াছে এবং তুর্কি সীমান্তের কয়েকটি জেলা দাবী করিয়াছে। এই কথা প্রকাশিত হইবামাত্র সোভিয়েট-বিরোধী ধুরন্ধররা তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমতঃ দার্দ্দানেলিজ প্রণালী। মঁত্র চুক্তি অনুসারে তুরস্ক বস্‌ফোরাস্ ও দার্দ্দানেলিজের রক্ষক। কিন্তু দ্বিতীয় ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় তুরস্ক তাহার এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করে নাই।

যুদ্ধকালীন ঘটনাবলী যাহাদের স্মরণ আছে, তাহারা জানেন—তুরস্ক এই যুদ্ধে নামে মাত্র নিরপেক্ষ ছিল; সে সর্ব্বদা বিজয়ী পক্ষকে খুসী রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়া যখন নিরপেক্ষ ছিল, তখন তাহার সহিত মিলিত হইতে সে চাহে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে সে চুক্তি করিয়াছিল যুদ্ধরত বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ভূমধ্য সাগরে যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্ত সে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে জুন মাসে ইটালী যুদ্ধ ঘোষণা করিলে এবং ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে ইটালী গ্রীস্ আক্রমণ করিবার পরও সে নিষ্ক্রিয় থাকে। তাহার পর, সে জার্ম্মানীকে ক্রোম্ এবং অন্তান্ত সমরোপকরণ সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিয়াছে। জার্ম্মানী যখন দ্রুত সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তুরস্কে সোভিয়েট-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়; সোভিয়েট

আর্মেনিয়াকে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ম সভা ও শোভাযাত্রা হইতে থাকে। জার্মান্ দূত ফন্ প্যাপেনকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে দুইজন রুশ গুরু দণ্ড লাভ করে। রুশিয়ায় বোমা বর্ষণের পর জার্মান বৈমানিকদের, তুরস্কে আশ্রয় পাইবার কথা একাধিকবার শোনা গিয়াছে। সর্ব্বোপরি, তৎকালীন তুর্কি পররাষ্ট্রসচিব মঃ মেনেমেনজেগ্লু মন্ত্রিসভার অজ্ঞাতে ইতালীয় জাহাজকে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পদচ্যুতির অন্যতম কারণ।

এ হেন তুরস্কের হাতে দার্দানেলিজের ভার দিয়া সোভিয়েট রুশিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট দার্দানেলিজের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এত রক্ত ও অশ্রু পাতের পর সোভিয়েট রুশিয়া স্বভাবতঃ সামরিক দিক হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে চাহে।

তাহার পর, তুর্কি সীমান্তের কয়েকটি জেলা সম্পর্কে রুশিয়ার দাবী। এই সম্পর্কিত অবস্থাটা পোল্যাণ্ডের ইউক্রেণ ও শ্বেত রুশিয়া সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবীর মত। রুশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সুযোগে তুরস্ক এই তিনটি জেলা অধিকার করিয়াছিল। ইহার ফলে আর্মেনিয়ান্ জাতির কতকাংশ তুরস্কের অধীন হইয়াছে; অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত; তুরস্কের আর্মেনিয়ান্‌রা তাহাদের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী স্বজাতীয়দের সহিত নিজেদের ভাগ্য গ্রথিত করিবার জন্ম আগ্রহান্বিত। তাহাদের এই আগ্রহের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার দাবীর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। জাতিগত ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাগই গণতন্ত্রসম্মত। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এই গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন করিয়া থাকে। পোল্যাণ্ড সম্পর্কে এই ধরণের একটা বড় অন্যায়ের প্রতিবিধান হইয়াছে। তুরস্ক সম্পর্কেও এই অন্যায়ের প্রতিবিধান হওয়া উচিত।

স্পেনে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

স্পেনে জেনারল ফ্রাঙ্কো জাতে উঠিবার জন্ম নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। রিপাব্লিক্যানদের এড়াইয়া স্পেনের শাসন-ব্যবস্থাকে মিত্রশক্তির গ্রহণযোগ্য করিবার জন্ম তিনি স্পেনে রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার ফন্দী খুঁজিতেছেন। বৃটেনের রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি স্পেনের সিংহাসন সম্পর্কে ডন্ জুয়ানের দাবী সমর্থন করিয়াছিল। ডন্ জুয়ান্ ফ্রাঙ্কোর প্রতি প্রসন্ন না থাকায় তিনি এখন আল্‌ফোন্‌সোর নাবালক পৌত্রকে সিংহাসনের প্রার্থী করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, মিঃ চার্চ্চিল এই ভাবে স্পেনের সমস্যার সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংযোগসূত্রে অবস্থিত স্পেনে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়িতে দেওয়া সাম্রাজ্যবিলাসী মিঃ চার্চ্চিলের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অথচ, যে ফ্রাঙ্কো ফ্যাসিস্ত ইটালী ও নাৎসী জার্মানীর অনুগ্রহে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে এবং যুদ্ধের সময় নানাভাবে মিত্রশক্তির শত্রুদ্বয়কে সাহায্য করিয়াছে—এমন কি পূর্ব্ব রণাঙ্গনে সৈন্যও পাঠাইয়াছে, তাহাকে যুদ্ধোত্তর স্পেনে আর প্রতিষ্ঠিত রাখা চলে না। এই জন্য, "দুই কূল বজায় রাখিবার" উদ্দেশ্যে চার্চ্চিল কোম্পানী স্পেনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। জুলাই মাসে পোট্‌স্‌ড্যামে যাইবার পূর্ব্বে হেণ্ডায়ীতে ছুটি উপভোগ করিবার সময় মিঃ চার্চ্চিল ফ্রাঙ্কোর লোকের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা গিয়াছে। ইহার পরই ফ্রাঙ্কো স্পেনের মন্ত্রিসভা হইতে কয়েক জন ফ্যাসিস্তকে অপসারিত করেন। মিঃ চার্চ্চিল হয়ত জানাইয়াছিলেন যে, বাহিরে স্পেনের ফ্যাসিস্ত রং একটু ফিকা হইলে পোট্‌সড্যামে ফ্যাসিস্ত স্পেন সম্বন্ধে ওকালতি করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে। যাহা হউক, বৃটিশ নির্ব্বাচনের ফল জেনারল ফ্রাঙ্কোকে অত্যন্ত নিরাশ করিয়াছে। ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশক্তির বৃটিশ সমর্থকরা এখন ক্ষমতাচ্যুত। ইতি-মধ্যেই লাভাল স্পেন ত্যাগ করিয়াছেন। এখন মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে স্পেনে ফ্যাসিস্ত প্রভুত্বের অবসান ঘটাইবার জন্ম প্রকৃত চেষ্টা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খাস জাপানে আসন্ন অভিযান

খাস জাপানে অভিযান আসন্ন। অভিযানের পূর্ব্বে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে প্রবলভাবে বিমানের আক্রমণ ও জাহাজ হইতে গোলা বর্ষণ চলিতেছে। জাপান জানাইয়াছিল—সে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে; তবে, বিনা সর্ত্তে নয়। মিত্রপক্ষ বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের জন্য জিদ্ করায় জাপান শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। জাপান আশা করে যে, তাহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মৃত্যুভয়হীন সৈন্য লইয়া সে প্রবল প্রতিরোধ চালাইতে পারিবে। খাস জাপান হস্তচ্যুত হইবার পরও চীনে আসিয়া মাঞ্চুরিয়ার অস্ত্রের কারখানাগুলি আশ্রয় করিয়া বহু দিন যুদ্ধ চালানো যাইবে বলিয়া জাপানী সমরনায়করা আশা করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিলে মিত্রপক্ষ সর্ত্তাধীনে আপোষ করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

৩০।৭।৪৫

ঘন-বরষায়

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

আঁখি-সিন্ধু উথলে আজি ঢেউ লাগিছে তব
হৃদয় কূলে বন্যা-স্রোত জাগে;
অন্তরেতে শুনছি একি অশ্রু-কলরব
প্রেম যে এলো আষাঢ় অনুরাগে।
বর্ষা-বেগে প্রেম-জোয়ার নামল হৃদি-তরী
সিক্ত হয়ে উঠেছে আঁখি-তল;

সজল কালো মেঘের মত রূপ যে সুনিবিড়
ভাসায়ে দেয় নয়ন-শতদল।
এলে কি আজ বর্ষা-রূপে সঘন বরিষণে
আর্দ্র করি প্রাণ-বসুন্ধরা;
উত্তাল তব অধীর তব সজল পরশনে
হৃদয় ছুঁয়ে একি সাগর ঝরা।

সাময়িকী

বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার অবসান দাবী—

মিঃ এ-কে ফজলল হক, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ, সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটিলীর নিকট তার করিয়া বাঙ্গালায় এখনই ৯৩ ধারার অবসান করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যে সম্মিলিত দল সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইঁহারা সেই দলের বিভিন্ন অংশের নেতা। ঐ তারের নকল বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকটও প্রেরণ করা হইয়াছে। যে কারণে বাঙ্গালায় ৯৩ ধারা স্থায়ী করা হইতেছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। বর্ত্তমান গভর্ণর জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী কেন, তাহা তাঁহার প্রকাশ করা উচিত।

মিঃ জিন্না ও মুসলমান সমাজ—

মিঃ জিন্না বার বার বলিয়া থাকেন যে তিনি ভারতের মুসলমান সমাজের শতকরা ৯০ জনের প্রতিনিধি। এ কথা যে ঠিক নহে, তাহা সিমলায় নেতৃ সম্মিলনের সময় মৌলানা আজাদ ও ডাক্তার খান সাহেব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মিঃ জিন্না আবার লীগ-গঠিত মন্ত্রিসভার কথা বলিয়াছেন—উত্তরে তাঁহাকে বলা হইয়াছে, ভারতে কোথাও লীগ-গঠিত মন্ত্রিসভা নাই। সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে মুসলমান প্রধান মন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রিসভা আছে বটে, তবে প্রথমটি কংগ্রেস গঠিত ও দ্বিতীয়টি মিলন-দল-গঠিত। কেহই লীগের ধার ধারেন না। সিন্ধু ও আসামের মুসলমান প্রধান-মন্ত্রীরা লীগ দলীয় বটে, কিন্তু মন্ত্রিসভা রক্ষার জন্য তাঁহাদের কংগ্রেসের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাঙ্গালায় লীগ মন্ত্রিসভা সম্প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব পাইয়া পরাজিত হইয়াছে। কাজেই ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে কংগ্রেসের প্রভাব পূর্ণ বর্ত্তমান, বাকী ৪টির অবস্থা উক্তরূপ। কাজেই মিঃ জিন্নার প্রতিনিধিত্বের দাবী কতটা অমূলক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়—এখন ভারতের জাতীয়তাবাদী সকল মুসলমান দল ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া মিঃ জিন্নার উক্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জামিয়েৎ-উল-উলেমা দলের সভাপতি মিঃ আদামীকে ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মিঃ জিন্না কংগ্রেসকে যতই হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করুন না কেন, তাঁহার উক্তি যে তাঁহার প্রতিনিধিত্বের দাবীর মতই মিথ্যা, তাহা ক্রমে প্রমাণিত হইতেছে। আগামী নির্ব্বাচনের ফলে মিঃ জিন্নার অবস্থা আরও শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইলে তাহাই ভারতের জনমত কি—তাহা সকলকে জানাইয়া দিবে।

বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানী—

বাঙ্গালা দেশে গত দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে চালের মণ ছিল ৪ টাকা—এখন লোককে সেই চাল ১৬।০ মণ দরে কিনিতে হয়। তাহাও লোক পর্য্যাপ্ত পায় না—ফলে অনেক লোককে আধপেটা ভাত খাইতে হয়। এই অবস্থায় বাঙ্গালার গভর্ণর বাঙ্গালা প্রদেশে প্রচুর চাল উদ্বৃত্ত হইয়াছে হিসাব করিয়া এখান হইতে চাউল অন্য প্রদেশে রপ্তানীর আদেশ দিয়াছেন। গত ৩রা আগষ্ট গভর্ণরের এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া কলিকাতায় জনসভা হইয়াছিল ও ১৯শে আগষ্ট বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থার নিন্দা করা হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে অনাবৃষ্টির ফলে আগামী বর্ষে হয়ত আবার চাউলের অভাব হইবে। বাঙ্গালায় চাউলের দাম না কমাইয়াও লোককে প্রচুর চাল পাইবার সুযোগ না দিয়া গভর্ণর এ দেশের চাউল সরাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার জন্য সকল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতেও গভর্ণরের কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু সে কথা কি কেহ শুনিবে?

প্রদান ও গ্রহণ—

সম্মিলিত জাতিসমূহের রিলিফ ও পুনর্বসতি সাহায্য তহবিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে ৮ কোটি টাকা চাঁদা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্য সরবরাহের দ্বারা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে—অবশিষ্ট দেড় কোটি টাকা নগদ দেওয়া হইবে। ভারতগভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত জিনিষ-সরবরাহের ভার লইয়াছেন—

নাম	পরিমাণ (হাজার টন)	মূল্য (লক্ষ টাকা)
লঙ্কা	১	১৫
চা	২॥ লক্ষ পাউণ্ড	২২
তুলা	৫	১২৫
তুলার ছাঁট	৫০০ টন	৩
পাট	১০	৫০
তিসি	৫	১৭॥০
চীনাবাদাম	৭০	২২৫
নারিকেল দড়ি	১৫০ টন	১
পাটজাত দ্রব্য	২০	২০০
	মোট	৬৫৮॥০

উক্ত তহবিল হইতে ভারতকে সাহায্য দান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সার আজিজুল হক জানাইয়াছেন—বাঙ্গালায় যখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল, তখন বাঙ্গালায় সাহায্য প্রেরণের অধিকার উক্ত তহবিলের রক্ষকদের ছিল না—যখন রক্ষকদের ক্ষমতা দেওয়া হইল, তখন আর বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও বাঙ্গালার যে যে জিনিষের (বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি) প্রয়োজন সর্ব্বাধিক, সে সে জিনিষ সরবরাহ করিবার মত অবস্থা ঐ প্রতিষ্ঠানের নহে।

চমৎকার উত্তর—তুই গরু চরা, আমি নিমন্ত্রণ যাই—না হয়, আমি নিমন্ত্রণ যাই, তুই গরু চরা।

পণ্ডিত নেহরুর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ—

গত ৩রা আগষ্ট কাশ্মীর শ্রীনগরে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিয়াছেন—ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র দেশগুলিকে হয় বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হইতে হইবে, নয় ত বৃহৎ দেশগুলি তাহাদের তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। রুসিয়া ছাড়া ইউরোপে একটি প্রকৃত স্বাধীন দেশ নাই। ইংলণ্ডও আজ আমেরিকা বা রুসিয়ার সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না, কাজেই তাহাকে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন বলা যায় না। যতদিন না স্বাধীন জাতিগুলিকে লইয়া একটি বিশ্ব সংঘ গঠন দ্বারা বিশ্ব সমস্যার সমাধান হয়, ততদিন যুদ্ধ চলিবে। ভারতবর্ষকে যদি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়, তবে উহার অবস্থা ইরাক বা ইরাণের মত হইবে। ইরাক বা ইরাণ নামে মাত্র স্বাধীন, বৃহৎ শক্তিগুলি ঐ দুইটি দেশে খুশী মত শক্তি পরীক্ষা করিতে পারে। ভারতবর্ষ ঐরূপ নামে মাত্র স্বাধীন হইতে চাহে না। ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, আফগানিস্থান, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ লইয়া একটি দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা উচিত। তাহা একটি বিরাট শক্তিশালী স্বাধীন দেশে পরিণত হইতে পারে। পণ্ডিত নেহরুর মত আন্তর্জাতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এই প্রস্তাব ফ্রিস্কো সম্মিলনের শান্তিকামী কর্ত্তাদের মনঃপূত হইবে কি না কে জানে? পণ্ডিতজীর গভীর পাণ্ডিত্য পৃথিবীর সকল দেশে এখন স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত 'জগতের ইতিহাস' সকল সভ্য দেশে পাঠ্য পুস্তকে পরিণত হইতেছে। কাজেই আজ তিনি যাহা প্রস্তাব করিতেছেন, সকল দেশ ক্রমে সে কথা স্বীকার করিয়া লইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ—

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ সম্বন্ধে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যে তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়, কলিকাতায় যে পরিমাণ দুধ সরবরাহ হওয়া উচিত তাহার মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ দুধ সরবরাহ হয়। লোক তাহাদের চাহিদার তিন ভাগের মাত্র এক ভাগ দুধ পাইয়া থাকে। যে দুধ বর্ত্তমানে সরবরাহ হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ১০০ নমুনার মধ্যে ৭৯টি নমুনায় দুধ জলপূর্ণ। গত দুর্ভিক্ষের সময় এত বেশী গরু ও মহিষ খাদ্যাভাবে মারা গিয়াছে যে বাঙ্গালায় বাহিরের প্রদেশগুলি হইতে গরু ও মহিষ আমদানী না করিলে সহরে আর দুধ পাওয়া যাইবে

না। কলিকাতার মত সহরে, যেখানে বহু ধনীর বাস, সেখানেই দুধের এই অবস্থা, কাজেই বাঙ্গালার মফঃস্বলের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—গভর্ণমেণ্ট অবহিত থাকিলে কলিকাতার মত সহরে কখনও এরূপ অবস্থা আসা সম্ভব হইত না।

খাদ্যাভাব ও পচা মাল—

এক দিকে লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য না পাইয়া তিলে তিলে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতেছে ও আর এক দিকে সরকারী গুদামে মাল পচিয়া নষ্ট হইতেছে। ২২শে জুলাই ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে খবর আসিয়াছে, তথায় সরকারী গুদামে প্রায় ৩ হাজার বস্তা আটা পচিয়া গিয়াছে। হয় ত ঐ আটা সস্তা দরে কোন ব্যবসায়ী কিনিয়া লইয়া ভাল আটার সহিত তাহা মিশাইয়া রেশনের দোকানের মারফত তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন—রেশনের দোকানে জিনিষ ভাল কি মন্দ—ক্রেতাকে তাহা পরীক্ষা করিবার অধিকার দেওয়া হয় না—কারণ সপ্তাহের খাদ্য না কিনিলে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হয়। কাজেই ক্রেতা ঐ পচা মাল খাইয়া রোগে ভুগিবে—ইহা দেখিবার কেহ কোথাও নাই।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পরিচয়—

বিলাতে বহু ভারতবন্ধু ইংরাজ আছেন, প্রবীণ সাংবাদিক মিঃ এচ-এন-ব্রেল্‌সফোর্ড তাঁহাদের একজন। তিনি বর্ত্তমান শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত পরিচয় লাভের জন্য গত ২৯শে জুলাই ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের তিনটি কাজ করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন—(১) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন পুনঃ প্রবর্ত্তন (২) সমস্ত রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি-দান ও (৩) কংগ্রেসের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।—তাহার পর প্রায় এক পক্ষ কাল অতীত হইতে চলিল—এখনও ইহার কোনটি সম্বন্ধে আমরা কোন খবর পাই নাই।

লাট-পাদরীকে সম্বর্দ্ধনা—

ডক্টর ফস্ ওয়েষ্টক্ট ভারতের লাট পাদরী বা মেট্রপলিটন অফ ইণ্ডিয়া ছিলেন। তিনি ২৬ বৎসর বয়সে ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। ৫৬ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতের জন্য বহু মঙ্গলজনক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে গত ১০ই শ্রাবণ কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। উপযুক্ত লোককেই সম্মান দেওয়া হইয়াছে।

সাংবাদিক সম্মানিত—

'বোম্বাই সেন্টিনেল' পত্রের সম্পাদক মিঃ বি, জি, হর্ণিমান খ্যাতনামা সাংবাদিক। গত ২৬শে জুলাই তাঁহার স্বর্ণ-জুবিলী উৎসব উপলক্ষে বোম্বায়ের অধিবাসীরা তাঁহাকে ৩১ হাজার টাকাপূর্ণ একটি থলি উপহার দিয়াছেন। সম্বর্দ্ধনা সভার সভাপতি সার চিমনলাল শীতলবাদ বলিয়াছেন—মিঃ হর্ণিমান ইংরাজ হইয়াও ভারতকে নিজ মাতৃভূমিরূপে সেবা করিয়াছেন। তিনি গত ৫০ বৎসর ধরিয়া যে ভাবে নানা অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া ভারতে সাংবাদিকের জীবনযাপন করিয়াছেন, তাহা অনুকরণের যোগ্য।

বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য দান—

বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) কোম্পানী ভারতে ন্যাশানাল সায়েন্স ইনিষ্টিটিউটে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে মাসিক ৪শত টাকার কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হইবে—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানের গবেষকগণ ঐ বৃত্তি পাইবেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে বিরাট লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে এই বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইল। ভারতীয় লিমিটেড কোম্পানীগুলিও বর্ত্তমান যুদ্ধে কম লাভ করে নাই—তাহাদের এই আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

বিলাতে ভারত কমিটী—

এতদিন ভারত সচিব বিলাতে বসিয়া ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতেন। নূতন শ্রমিক মন্ত্রিসভা ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ভারত কমিটী গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—ঐ কমিটী বড়লাটকে পরিচালনার জন্য নূতন নির্দ্দেশাবলী প্রস্তুত করিবেন। প্রধান মন্ত্রী, ভারত সচিব, সহকারী ভারত সচিব ও সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ঐ কমিটীতে থাকিবেন। দেখা যাউক, নূতন ব্যবস্থায় আমাদের কি লাভ হয়।

রাষ্ট্রপতি ও বড়লাট—

গত ২৮শে জুলাই রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটকে এক পত্র লিখিয়া সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তিদান করিতে ও যে সমস্ত রাজনীতিক পরোয়ানা জারি হয় নাই সেগুলি বাতিল করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যে সকল রাজবন্দী এখন অসুস্থ, তাহাদের জন্য উন্নততর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে বলা হইয়াছে। সিমলায় বড়লাটের সহিত রাষ্ট্রপতির এ সকল বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছিল—বর্ত্তমান পত্র সেই আলোচনার ফল। আমাদের বিশ্বাস, মৌলানা আজাদের এই আবেদন নিষ্ফল হইবে না।

রাজবন্দী শরৎ বসুর স্বাস্থ্য—

বাঙ্গালার জনপ্রিয় কংগ্রেস-নেতা ব্যারিষ্টার রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, শরৎবাবুর স্বাস্থ্যের জন্য আশঙ্কার কারণ নাই। তাহার পর গত ১লা আগষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা শরৎবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। শরৎবাবুর দেহের ওজন অনেক কমিয়া গিয়াছে, চিকিৎসা সত্ত্বেও বহুমূত্র রোগ কমে নাই, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি খুব কমিয়া গিয়াছে—এই সকল সংবাদ সত্য কি না, জনসাধারণকে তাহা জানানো কি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না?

চাউল রপ্তানী—

বর্ত্তমান আগষ্ট ও আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালা দেশ হইতে ২৫ হাজার টন চাউল যুক্তপ্রদেশে, ১৫ হাজার টন চাউল বিহারে ও ঐরূপ প্রচুর পরিমাণ চাউল মাদ্রাজে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ঐ চাউল বিদেশে পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন—ইহার পর যখন ১৩৫০ সালের মত আমরা পথে পড়িয়া না খাইয়া মরিব, তখন গভর্ণমেণ্ট শুধু তাহা দেখিবে—তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিবে না। ইহাই পরাধীনতার মহাপাপ।

অষ্টি-চিমুর সংক্রান্ত আপীল বাতিল—

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে অষ্টি-চিমুরের যে ৭ জন বন্দীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহারা বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে যে আপীল করিয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী হইতে ভারতের সর্ব্বসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই আবেদন করিয়াছিলেন—কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সরকার কোন কথায় কর্ণপাত করে নাই। এখনও কি তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না?

শ্রীনগরে দাঙ্গা—

ভারতের একদল মুসলমান শুধু সিমলা বৈঠক নিষ্ফল করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। গত ১লা আগষ্ট কাশ্মীর শ্রীনগরে যখন মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে লইয়া এক মিছিল বাহির হয়, তখন তাহারা সেই মিছিলের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে একজন নিহত ও বহু আহত হয়। এই মুসলমানদল কাহারা, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মৌলানা আজাদ, সীমান্ত গান্ধী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের উপর এইরূপ জঘন্যভাবে যাহারা আক্রমণ করে, তাহারাই নিজেদের ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজের একছত্র নেতৃত্বের দাবী করে। ইহাই আশ্চর্য্য!

নূতন ভারত সচিব—

মিঃ পেথিক লরেন্স নূতন বিলাতী মন্ত্রিসভায় ভারত-সচিব বা ইণ্ডিয়ার ষ্টেট্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর—তাহাকে ব্যারণ উপাধি দিয়া লর্ড সভায় স্থান দেওয়া হইবে। ১৯৩১ সালে তিনি ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সাল হইতে এডিনবরার পূর্ব্ব নির্ব্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি লর্ডসভায় যাইলে ঐ কেন্দ্রে উপনির্ব্বাচন হইবে। যিনিই ভারত সচিব হউন না কেন, নূতন শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারত শাসননীতি পরিবর্ত্তন না করিলে আমাদের কোন লাভালাভ নাই।

খাঁ বাহাদুর খুড়ো প্রভৃতির অব্যাহতি—

সিন্ধু দেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সকে হত্যা করার অভিযোগে ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর খুড়ো, তাহার ভ্রাতা ও অপর ৩ জনের সুক্কুরের দায়রা আদালতে বিচার হইয়াছিল। সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে। সিন্ধু দেশে হত্যাকাণ্ড একটা নিত্য ঘটনা—প্রধান মন্ত্রী হইলেও তাহার রক্ষা নাই।

ইউরোপে অন্ন-বস্ত্রের অভাব—

ইউরোপে যুদ্ধ থামিয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর সঙ্কট এখনও যায় নাই। আমেরিকার সমর দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, সত্বর নানা দেশ হইতে ইউরোপে অন্ন ও বস্ত্র প্রেরণ করা না হইলে আগামী শীতে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে মারা যাইবে। গত ৬ বৎসর ইউরোপে ক্রমে ক্রমে শস্যের চাষ কমিয়াছে—কারখানা-সমূহও সমরসম্ভার ছাড়া অন্য কিছু প্রস্তুত করে নাই। কাজেই আজ এই অবস্থা আসা স্বাভাবিক। যাহারা ইউরোপরক্ষার ভার লইয়াছে, সেই ত্রিশক্তি কি এই অবস্থার প্রতীকারে অগ্রসর হইবে না ?

গ্রেপ্তার ও মুক্তি—

পাঞ্জাবের আটক জেলার পুলিস সহসা গত ২৫শে জুলাই সীমান্ত নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তিনি তখন ঐ জেলার মধ্য দিয়া হাজরা জেলায় গমন করিতেছিলেন। সিমলায় নেতৃ-সম্মিলনের পর এই গ্রেপ্তারে সারা ভারতে চাঞ্চল্য দেখা দেয় ও পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট পরদিনই তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। বড় কর্ত্তাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইলেও অনেক সময় ক্ষুদে-কর্ত্তাদের তাহা হয় না—এই গ্রেপ্তার ও মুক্তি তাহার অন্যতম উদাহরণ।

আগষ্ট আন্দোলন ও জহরলাল—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কাশ্মীরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সহিত ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যার গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালের পর ১৯৪২ সালের আন্দোলন হইতেছে, দেশের স্বাধীনতা লাভে দেশবাসীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।"

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও পণ্ডিতজী—

কাশ্মীরে বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলিয়াছেন…"সরকারী বিবরণ অনুযায়ী বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কথাই যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও সেই সময় মুনাফাকারীরা প্রতি মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে এক হাজার টাকা হারে লাভ করিয়াছে।" এই কথার তাৎপর্য্য কি মুনাফাকারীদের মনে দাগ দিবে ?

মাদারীপুরে বিমান দুর্ঘটনা—

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের নিকট টেকেরহাট নামক স্থানের বাজারে গত ১১ই জুলাই এক বিমানপোত ভাঙ্গিয়া পড়ায় শতাধিক লোক নিহত ও বহু লোক আহত হইয়াছে। নদীর উপর বিমানখানি পতিত হওয়ায় প্রায় একশত নৌকা তখনই ভস্মীভূত হইয়াছে। বিমান-চালক ও কয়েকজন আরোহীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছে। পল্লী-গ্রামের মধ্যে এই ঘটনা ঐ অঞ্চলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্যতার পাপের ইহাও একটি নিদর্শন।

ট্রাম কোম্পানীর উদাসীনতা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও কলিকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ মহম্মদ ইসমাইল এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া যাত্রীদের সুখ সুবিধা সম্বন্ধে ট্রাম কোম্পানীর উদাসীনতার কথা সকলকে জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জনসাধারণ জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে ট্রাম কোম্পানী গাড়ীতে প্রচণ্ড ভিড় কমাইবার জন্য গাড়ীর সংখ্যা বাড়ান নাই বরং তাহা কমাইয়াছেন। পূর্ব্বে গাড়ী খারাপ হইয়া ডিপোতে যাইলে কারখানার সকলের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিয়া তাহা মেরামত করানো হইত। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মাত্র কয়েকজনকে কাজ দেওয়া হয় ও বাকী লোক বসিয়া থাকে। ফলে কারখানায় অনেক অচল গাড়ী জমিয়া থাকে। গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায়—শ্যামবাজার লাইনে ৪৮ খানা গাড়ী চলিবার কথা ছিল, কিন্তু মাত্র ২৭ খানা গাড়ী চলিয়াছে। গাড়ী মেরামত হয় না বলিয়া ঐ সপ্তাহে বৌবাজার লাইনে ২০ খানার স্থলে ১২ খানা গাড়ী বাহির হইয়াছে। গত ১৮ই ও ১৯শে জুলাই বৌবাজার লাইনে মাত্র ৮ খানা গাড়ী চলিয়াছে। গালিফ ষ্ট্রীট হাওড়া লাইনে ৩৮ খানা গাড়ী চলিবার কথা—কিন্তু ২।৩ সপ্তাহ ঐ লাইনে মাত্র ৩২ খানা গাড়ী চলিয়াছে। হ্যারিসন রোড (হাইকোর্ট) লাইনেও ১২ খানা স্থলে কয় সপ্তাহ মাত্র ৮ খানা গাড়ী চলিয়াছে। গাড়ী মেরামতের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে একখানা গাড়ীও বসিয়া থাকিত না ও যাত্রীদের এত ভিড় সহ্য করিতে হইত না। ৩০ খানা নূতন গাড়ীর সরঞ্জাম আসিয়া

পড়িয়া আছে, সেগুলি প্রস্তুতের জন্তও কোন তাড়া দেখা যায় না। কোম্পানী দেখিতেছেন, কম গাড়ী চালাইয়াও যখন প্রচুর লাভ হয়, তখন বেশী গাড়ী চালাইবার দরকার কি? এ বিষয়ে দেখিবার বা বলিবার কি কেহ নাই?

বিহারে নূতন মামলা—

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে আন্দোলনের সময় দারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, সারন ও পাটনা জেলায় নিখিল ভারত কাটুনি সমিতির বহু জিনিষপত্র লুঠ করা হয়, পোড়াইয়া দেওয়া হয় ও সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ঐ ক্ষতির জন্ত নিখিল ভারত কাটুনি সমিতি ১৬টি মামলার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও সে জন্ত নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। বিহার গভর্ণমেণ্ট, পাটনা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার, পুলিশের ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল, হাজারীবাগের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সারনের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিংহভুমের ডেপুটী কমিশনার প্রভৃতির বিরুদ্ধে মামলা করা হইবে। ৬৫ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইবে। কয়েকজন খ্যাতনামা উকীলকে মামলার পক্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে এই ধরণের মামলা এই প্রথম হইবে।

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও আম্বেদকর—

ডাঃ আম্বেদকর যে ভারতের তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রকৃত নেতা নহেন, তাহা নিখিল ভারত তপশীলভুক্ত সমিতির সভাপতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বিরাটচন্দ্র মণ্ডল এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে উক্ত দলের ১৫১টি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি আছেন—তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ৪ জন ও বোম্বায়ের ১১ জন মাত্র ডাঃ আম্বেদকরের দলভুক্ত। বাকী ১৩৬ জন তাঁহার বিরুদ্ধ দল—নিখিল ভারত তপশীলভুক্ত সমিতি, নিখিল ভারত তপশীলভুক্ত লীগ, স্বতন্ত্রদল প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত। মহাত্মা গান্ধী এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে—ডাঃ আম্বেদকর তাহা অস্বীকার করিলেও সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক সেজন্ত গান্ধীজির নিকট কৃতজ্ঞ।

বিলাতে আপীলের ফল—

নিম্নলিখিত ৮জন দেশকর্ম্মীকে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারায় আটক করা হইলে তাঁহারা কলিকাতা হাইকোর্টে ডিভিসনাল বেঞ্চে আপীল করে—বিচারে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। দিল্লীতে ফেডারেল কোর্টে সরকারপক্ষ বিফল-মনোরথ হন ও পরে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা হয়—প্রিভি কাউন্সিল গত ১৭ই জুলাই মুক্তির আদেশ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম (১) শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এল-এ (২) বিজয় সিং নাহার, কর্পোরেশন কাউন্সিলার (৩) দেবব্রত রায় ছাত্র (৪) নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (৫) ননীগোপাল মজুমদার (৬) নীহারেন্দু দত্তমজুমদার এম-এল-এ (৭) ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ও (৮) প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার গত কনভোকেশনে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বীরবল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর পত্নী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দানের জন্যই ইহা দেওয়া হয়। পূর্ব্বে ১৯৩৫ সালে ৺মানকুমারী বসু, ১৯৩৮ সালে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী ও ১৯৪১ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ঐ পদক লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ১৮৯২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। তাঁহার লিখিত 'নারীর কথা' সর্ব্বজনসমাদৃত।

যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য—

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ভারতীয় সৈন্যের এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে; নিহত—১৫২৯১, আহত—৫০৭০৫, নিখোঁজ—১০৩৭১, যুদ্ধবন্দী—৫১৮০২, যুদ্ধবন্দী বলিয়া অনুমিত—২১০৫৬—মোট ১৪৯২২৫। তাহা ছাড়া হংকং ও সিঙ্গাপুরে ৫৮৩৫ হতাহত হইয়াছে। মোট সংখ্যার মধ্যে শুধু মালয়ে ৬২১৭৫ ও ব্রহ্মদেশে ৪০৪৫৮ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। ইহার পরিবর্ত্তে ভারত কি পাইয়াছে?

সার গজনভীর আহ্বান—

সার আবদুল হালিম গজনভী খ্যাতনামা মুসলমান ব্যবসায়ী ও কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলমান সমিতির সভাপতি তিনি গত ৪০ বৎসরকাল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক। তিনি গত ১২ই জুলাই এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সিমলায় নেতৃ সম্মিলনে মিঃ জিন্নার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন—এ অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে (যাঁহারা লীগের লোক নহেন) কংগ্রেসে যোগদান

করাই সঙ্গত। মিঃ জিন্নার অন্যায় জিদ যে একদল মুসলমানকে কংগ্রেসের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত করিবে, তাহা আদৌ বিচিত্র নহে।

কলিকাতা প্রেস-ক্লাব—

কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্টারগণ গত ৬ই শ্রাবণ রবিবার এক সভায় সমবেত হইয়া 'প্রেসক্লাব' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে—সভাপতি শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন (ষ্টেট্স ম্যান)। সহঃসভাপতি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (অমৃতবাজার) ও শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত। সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) সহঃসম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (এ-পি)। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর)। তাহা ছাড়া শ্রীঅমল দাশগুপ্ত, বি-সান্যাল, কালীপদ বিশ্বাস, ডি-এন ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, পবিত্রমোহন গুপ্ত, আর নন্দী, রাধাগোবিন্দ সেন ও মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইয়াছেন। সভায় ৪০ জন রিপোর্টার উপস্থিত ছিলেন।



কলিকাতায় প্রেস ক্লাব

ইঁহারা কলিকাতার সকল সংবাদ, ছবি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী—

গত ১৪ই জুলাই যখন যুক্তপ্রদেশে মিঃ রফি আহমদ কিদোয়াই প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে মুক্তির আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই দিনই শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর আটককাল আরও ৬ মাস বাড়াইবার আদেশ জারি হইয়াছে। বক্সী মহাশয় বহুদিন বিবিধ রোগে ভুগিতেছেন, তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না—এ অবস্থায় তাঁহাকে মুক্তি দিলে কি ক্ষতি হইত জানি না। জেলে এই ভাবে বহুদিন রোগ ভোগের পরিণাম যে ভয়াবহ সে কথাও কি কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন না?

কম্যুনিষ্ট দল ও মহাত্মা গান্ধী—

নিখিল ভারত কম্যুনিষ্ট দলের নেতা মিঃ পি-সি যোশীর সহিত কম্যুনিষ্ট দলের দেশপ্রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকে কি জন্য "জনযুদ্ধ" বলা হয়, গান্ধীজি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রুসিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদান করার পর কি কারণে কম্যুনিষ্টদল যুদ্ধ সমর্থন করেন, তাহাও গান্ধীজি বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। গান্ধীজির মতে একদল কর্ম্মী ভুল বুঝিয়া কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সততা সম্বন্ধে গান্ধীজির হয় ত সন্দেহ নাই।

দামোদর উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ—

দামোদর, অজয় প্রকৃতি নদীর বন্যা নিবারণের জন্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, গত জানুয়ারী মাসে ভারতগভর্ণমেণ্ট এবং বিহার গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়াছেন। উহা কার্য্যে পরিণত করিতে ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন। বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের শেষভাগে প্রতিনিধিরা পুনরায় মিলিত হইয়া পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করিবেন।

বাঙ্গালী মহিলার সম্মান—

হুগলী জেলার ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে ডি-এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। মাথা ধরার প্রতিষেধক রাসায়নিক



কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায়

দ্রব্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গবেষক। ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী মহিলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্ সি উপাধি পান নাই।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অশোকচন্দ্র এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অশোকচন্দ্রের দুই অগ্রজ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান অনিলচন্দ্র ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান অরুণচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র।

বাঁকুড়ায় হিন্দু আন্দোলন—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে গত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে বৈশাখ বাঁকুড়া সহরে দোলতলায় হিন্দু সম্মেলন ও বৈদিক যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর কুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা দুই দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদিগকেও যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে দেওয়া হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বাগদী, বাউরী, ছত্রী, কুর্ম্মী, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্য জেলার নানাস্থানে ২৫টি মিশন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিদেশে বাঙ্গালী ডাক্তার সম্মানিত—

হাজারীবাগনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার ইন্দুবরণ মল্লিক গত ১৯৩৭ সাল হইতে



ডাঃ ইন্দুবরণ মল্লিক

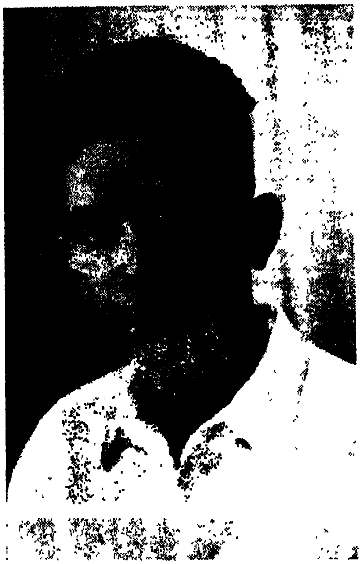
আই-এম-এস এ যোগদান করিয়া বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি স্মৃতি ভাণ্ডার—

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ (ইনি পূর্ব্বাশ্রমে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন) জীবিত কালে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ হাসপাতাল স্থাপনের কামনা করিয়াছিলেন। ঐরূপ একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সমাধি ক্ষেত্র বর্দ্ধমান জেলার আমাদপুরে একটি দেবায়তন স্থাপনের জন্য তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ এক স্মৃতি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে জন্য প্রয়োজনীয় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে। সাহায্য-অর্থ স্বামী সচ্চিদানন্দ স্মৃতি সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা কোষাধ্যক্ষ কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীমান্ অরুণকুমার দত্তগুপ্ত—

ঢাকা জৈনসার নিবাসী শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণকুমার এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষাতেও সপ্তম স্থান



শ্রীঅরুণকুমার দত্তগুপ্ত

অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। অরুণকুমার ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরা শ্রীকাইল কলেজের ছাত্র ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের এই কলেজের প্রতি যত্ন ও সে বিষয়ে সুব্যবস্থা কলেজটির এই সাফল্যের অন্যতম কারণ। আমরা অরুণকুমারের দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করি।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

আরিয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ ভাণ্ডারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি দিবসে ভাণ্ডারে এক উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর পুত্র লেপ্টেনান্ট বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে দিনের উৎসবের সকল ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। সে দিন বহু অনাথকে ভাণ্ডারে অন্ন বস্ত্র দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি জনৈক কর্ম্মীর চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে স্বর্গতা বিনোদিনী দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থ ভাণ্ডারে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের একটি অভাব দূর করিতেছে। ভাণ্ডারের বহুমুখী কার্য্যব্যবস্থা ক্রমে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতেছে।

শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মিত্র—

কানপুর প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মিত্র সংখ্যা-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য সম্প্রতি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করিতেছেন। তিনি ঐ বিষয়ে



শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মিত্র (কানপুর)

গবেষণা করিয়া ও সে বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ভারতবর্ষেও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি অধ্যাপক আইন-ষ্টাইন, আলডুস হাকস্‌লী প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা—

বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২১শে জুলাই একটি 'ঠাকুর ইনিষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষা করা হইবে। অধ্যাপক সি-ই-রাভেন ঐ ইনিষ্টিটিউটের সভাপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুব্রতরায় চৌধুরী উহার সাধারণ সম্পাদক, সমরেন সেন সহযোগী সম্পাদক ও ডাঃ সি-সি দাশগুপ্ত কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডোনোভান, পশ্চিম আফ্রিকার আসেম, চীনের চাঞ্জে, সাইপ্রাসের সুধীর ও দিলীপ সেন কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইয়াছেন। বহু বৈদেশিক অধ্যাপক সমিতির সহ-সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বাঙ্গালায় বস্ত্র বণ্টন—

বাঙ্গালায় নানা আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে ৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত এক গভর্ণিং বডি বস্ত্র বণ্টন করিবেন

ও ২৫ জন সদস্যের এক কার্য্যকরী সমিতি গভর্ণিং ব্যক্তিকে সাহায্য করিবেন। সার বদ্রিদাস গয়েঙ্কা, সার আদমজী হাজি দাউদ, সার আবদুল হালিম গজনভী, মিঃ বি-এম বিরলা, মিঃ আর-এল নোপানী, মিঃ এম-এ ইস্পাহানী, ডাঃ এন-এন-লাহা ও মিঃ জে-কে মিত্র গভর্ণিং বডির সদস্য হইবেন। গভর্ণিং বডির সদস্যগণ কার্য্যকরী সমিতির সদস্য থাকিবেন; তাহা ছাড়া ১৭ জন সদস্যের মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের ২ জন, মুসলেম চেম্বার অফ কমার্সের ২ জন, ন্যাসানাল চেম্বার অফ কমার্সের ২ জন, সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৮ জন ও গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ৩ জন সদস্য থাকিবেন। সূতী বস্ত্র ও তুলা নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বা বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত এই সমিতির অস্তিত্ব থাকিবে।

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত—

তক্ষশীলা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ মণীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত গত ১২ই জুলাই সহসা নিজ অফিসে কাজ করার সময় পীড়িত



৺মনীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত

হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯১ সালে তাহার জন্ম হয় ও ১৯২১ সাল হইতে তিনি তক্ষশীলার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রকেই সাদর যত্ন করিতেন—সেজন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর জ্যোতিষচন্দ্র সেন—

ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর জ্যোতিষচন্দ্র সেন গত ৬ই মে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে



রায় বাহাদুর জ্যোতিষচন্দ্র সেন

পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে কার্য্যগ্রহণ করেন ও তথায় ১৯৩২ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটী সেক্রেটারী রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র সেন, বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁহার ৫ ভ্রাতা ও তিন পুত্রই কৃতী।

মুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায়—

'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক মুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ই জুলাই মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল—তাঁহার ২ পুত্র ও ১ কন্যা বর্ত্তমান। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি সাংবাদিকের জীবন আরম্ভ করেন ও বহু সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক 'স্বদেশ' পত্রেরও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

খেলাধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

এ বছরের আই এফ এ শীল্ড খেলায় মোট ৩৮টি টীম যোগদান করে। আগন্তুক দলের মধ্যে কোন শক্তিশালী মিলিটারী বা ভারতীয় টীম ছিল না। আগন্তুক দলের মধ্যে একমাত্র বগুড়া জেলা এসোসিয়েশনই শীল্ড খেলার চতুর্থ রাউণ্ডে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করে। তারা ৩-১ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে হেরে যায়। তৃতীয় রাউণ্ডে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে দু'দিন গোলশূন্য ড্র করে তৃতীয় দিনের রিপ্লে খেলাতে ২-০ গোলে পরাজিত হয়। সেমি ফাইনালের চারটিই স্থানীয় দল উঠেছিল। তাদের নাম যথাক্রমে মোহনবাগান ও ক্যালকাটা; ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১-০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়ে ১৯৪৫ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে তারা উপর্যুপরি চারবার শীল্ড ফাইনালে খেলেছে এবং এই তাদের দ্বিতীয় শীল্ড বিজয়। ১৯৪৩ সালের ফাইনালে পুলিশকে হারিয়ে তারা প্রথম শীল্ড পায়। এ বছরের শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাবের দুর্ভাগ্য নয় যে, তারা হেরেছে বরং বলা চলে ইষ্টবেঙ্গলের; তাদের কে দত্ত এবং পি দাশগুপ্ত অসুস্থতার জন্য ফাইনালে খেলতে পারেননি এবং মন্দ ভাগ্যের জন্যই আরও বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হতে পারেনি। মোহনবাগান ক্লাবের একমাত্র ডি সেন ছাড়া ঐ দিনের কারও খেলা চোখে পড়ার মত হয়নি। সত্যি বলতে কি গোলে ডি সেন ভাল না খেলে



১৯৪৫ সালের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব — ফটো: শীতল ষ্টুডিও

যদি দলের অন্ত খেলোয়াড়দের মত নার্ভাস হয়ে পড়তেন তা হলে মোহনবাগান আরও বেশী গোলে পরাজিত হ'ত। ১৯৪০ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটত।

ইষ্টবেঙ্গলের দু'জন নিয়মিত ভাল খেলোয়াড় খেলতে না নামায় ইষ্টবেঙ্গলের উপর দর্শকেরা খুব বেশী আস্থা রাখতে পারে নি। সমর্থকরাও হতাশ হয়েছিল। খেলার প্রথম দিকে তাদের গোলরক্ষককে বেশ বিচলিত হ'তে দেখা যায়। কিন্তু অপর খেলোয়াড়রা একটুও বিচলিত হয় নি। তুলনায় ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রাই তিনগুণ ভাল খেলেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাদের জয়ী হতে দেখে নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেই খুশী যেমন হয়েছে তেমনি হতাশ হয়েছে ফাইনাল খেলার নিকৃষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড দেখে। মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গলকে এ বছরের অন্যতম ফুটবল টীম বলা চলে; সুতরাং এই দুই দলের কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের খেলা আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর খেলা দেখতে হবে বলে আমরা আশা করি নি। লীগের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলার মতই মোহনবাগান খেলেছে। রিটার্ণ ম্যাচের খেলা তারা একেবারে ভুলে যায়। মোহনবাগানের হাফ-লাইনের লেফ্‌ট হাফ্‌ ডি সেনের খারাপ খেলা পীড়াদায়ক হয়েছে। এবং তার ফলেই সমস্ত হাফ লাইন স্বাভাবিক খেলা দেখাতে পারে নি। কি আক্রমণে এবং আত্মরক্ষায় মোহনবাগানকে বড় বেশী অসহায় হতে দেখা যায়। আক্রমণ ভাগের খেলার সুনাম কোন দিনই ছিল না এবং ঐ দিনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাদের খেলা আলোচনা এবং দেখারও অযোগ্য। একমাত্র বুচিকে খেলার প্রথম দিকে পরিশ্রম করে খেলতে দেখা যায়। আহত অবস্থায় খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে তিনি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। প্রায় দেখা গেছে এবারের অন্য সব খেলাতে মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডরা গোলের বহু সুযোগ নষ্ট ক'রে তবে জিতেছে কিম্বা খেলা ড্র করেছে, এমন কি হেরেছে। ফাইনাল খেলায় গোলের একটাও সহজ সুযোগ কেউ পায় নি। ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান প্রদানের অক্ষমতার অভাব বেশী করে চোখে পড়ে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কৃতিত্ব যে, তারা খেলায় জয়লাভের জন্য অদম্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে খেলার সূচনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত খেলেছে। পাগ্‌সলি দলের বিজয়সূচক গোলটি দেন।

ইষ্টবেঙ্গল কি ভাবে শীল্ড বিজয়ী হ'ল:

বরিশালকে ২-০, হায়দ্রাবাদ পুলিশকে ০-০, ০-০ ও ২-০, বগুড়া টাউনকে ৩-১, কালীঘাটকে ২-১ এবং ফাইনালে মোহনবাগানকে ১-০ গোলে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

ইষ্টবেঙ্গল: এ মুখার্জি, এন গুহ এবং পি চক্রবর্ত্তী; ডি চন্দ, কাইজার এবং মহাবীর; টি কর, আপ্পারাও, পাগ্‌সলি, এস ঘোষ এবং নায়ার।

মোহনবাগান: ডি সেন; এস দাস এবং এস মান্না; এ দে, টি আও এবং ডি সেন; এন চ্যাটার্জি, বুচি, বি বোস, এন বোস এবং এন মুখার্জি।

ফুটবল লীগ:

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগের শেষ খেলায় ভবানীপুরকে ২-০ গোলে হারিয়ে এ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১৯৪২ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম লীগ পেয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে কয়েক বছর অল্পের জন্যে তারা লীগ হাতছাড়া করেছে। লীগের শেষ খেলায় এরিয়ান্স এবং কাষ্টমস্‌ দলের সঙ্গে শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়ে তারা দু বছর লীগ পায় না; ঐ সময় এরিয়ান্স এবং কাষ্টমস দলের স্থান লীগের নীচের দিকে ছিল। এ বছর লীগের শেষ খেলার সময় সমান খেলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব দু' পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। ভবানীপুর ক্লাব লীগের প্রথম খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়। তা ছাড়া দল হিসাবে ভবানীপুর ক্লাব বেশ শক্তিশালীই ছিল। লীগের প্রথম ভাগে খুব ভাল খেলে ভবানীপুর ক্লাব বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং অনেকদিন লীগ তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে। ভবানীপুরের রক্ষণভাগের খেলা এবার লীগের সমস্ত দলের খেলাকে নিষ্প্রভ করেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে লীগের শেষ খেলায় সেই রক্ষণভাগের নিয়মিত খেলোয়াড় গোলে ইসমাইল, ব্যাকে তাজ মহম্মদ এবং ডি পালকে অনুপস্থিত দেখা গেল। এ ছাড়া তাদের আরও চারজন লীগ এবং শীল্ডের নিয়মিত খেলোয়াড়কে

নামতে দেখা গেল না। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় একটি দলের নিয়মিত এগার জন খেলোয়াড়দের মধ্যে সাত জন কি কারণে হঠাৎ অনুপস্থিত হ'ল তার কারণ জানা যায় নি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কে দত্ত এবং পি দাশগুপ্ত যে অসুস্থতার জন্য খেলতে পারবেন না এ খবর কারও অজানা ছিল না। মোটের উপর যাঁরা একটি ভাল খেলা দেখার লোভে মাঠে পয়সা খরচ করে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মোটেই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড দেখে খুশী হতে পারেন নি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জয় যে ঐ দিন ন্যায় সঙ্গত হয়েছে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। তারা আরও অধিক গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করলেও কারও কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু ভবানীপুর ক্লাবের এতগুলি নামকরা খেলোয়াড়ের হঠাৎ অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে মাঠে যে সব আলাপ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে তা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। খেলার পূর্ব্বে বা পরে কোন নামকরা খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতির কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে এতগুলি খেলোয়াড় সম্বন্ধে কোন খবরই বের হয়নি বলেই লোকের সংশয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্বন্ধে Amrita Bazar Patrikaর কথা উদ্ধৃত করলাম :

'The reasons for their (Ismail & Taj) non-availability, according to the rumour was something unusual. It was reported that they were sick, but it was again heard that both of them were found on the ground apparently all right. Football in Calcutta is city's pride and Bengal has reasons to feel that she leads the rest of India in this game, but with this football ugly stories are associated. Time has now come for purging, to quote a political term much too common in totalitarian countries. Football in Calcutta needs a clean up. The I. F. A. from its privileged position should not only sit content by staging spectacular matches and tournaments, but it must see that it is clean all round.

It will not be irrelevant as well to ask the Bhowanipur Club to explain why they fielded such an indifferent side in such an important match, for which so many thousands had paid at the turnstiles. It will be said, perhaps that it is nobody's concern, but people have not yet forgotten that when Mohun Bagan had lost to the Aryans years ago in a crucial league match, the I. F. A. almost was on the point of suspending the Mohun Bagan Club. Was not a famous French Lawn Tennis star brought to notice when it was alleged that he allowed a leading Indian tennis player to win a match by design? Peoples have not yet forgotten that little over ten year's ago Mr. Hilton, the then I. F. A. Secretary on his own took some positive steps when almost similar things had happened in the football league which had a salutary effect."

এই প্রসঙ্গে বিলেতের ফুটবল খেলার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৯২৫ সালের ১২ই মে তারিখে নিউক্যাসল ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবকে ৭৫০ পাউণ্ড অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল এই কারণে যে,তারা ভাল খেলোয়াড় থাকা সত্বেও দুর্ব্বল টীম নামিয়ে বিখ্যাত এভারটোন এবং আরসেনাল ফুটবল টীমকে লীগে উঠা নামা (relegation) থেকে রক্ষা করেছিল।

খেলায় খেলোয়াড়চিত মনোভাব বজায় রেখে চললে খেলার মাঠের আবহাওয়া দূষিত হয় না এই আমাদের অভিমত।

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ঃ

একই বছরে লীগ এবং শীল্ড নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের ফুটবল খেলার ইতিহাসে যে প্রথম গৌরব লাভ করেছে তার জন্য আমরা ক্লাবের খেলোয়াড় এবং পরিচালক মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রথম তিনটি ক্লাব লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	১৬	৭	১	৫৬	৭	৩৯
মোহনবাগান	২৪	১৬	৬	২	৪৫	৯	৩৮
ভবানীপুর	২৪	১৪	৭	৩	৪০	১৪	৩৫

আই এফ এ ঃ

এ বছরের আই এফ এ শীল্ডের খেলার তালিকা প্রস্তুত ব্যাপারে আই এফ এ-র শীল্ড সাব-কমিটির যে ত্রুটী দেখা

গেছে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। শীল্ডের ফিক্‌চার প্রস্তুত করার প্রচলিত পদ্ধতি নামকরা টীমগুলিকে সমানভাবে ভাগ ক'রে পরে বাকিগুলিকে লটারি করে দেওয়া। বিলাতের এফ এ কাপে এই ভাবের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এর উদ্দেশ্য সব ভাল দলগুলিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে চতুর্থ এবং সেমিফাইনাল থেকে খেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় জানতাম। কিন্তু এ বছরের ফিক্‌চার দেখে আমাদের সে ধারণা বদলে গেছে। লীগের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী দল এবং পূর্ব্ব বৎসরের শীল্ড বিজয়ী দলকে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর দল বলে ধরা যায়। এই ভাবের প্রথম শ্রেণীর দলকে সিডেড্ টীম বলে। আমরা এবারের শীল্ড-ফিক্‌চারের উপরের দিকে সিডেড্ টীম হিসাবে মোহনবাগান, বি এণ্ড এ রেল দল, ভবানীপুর এবং ক্যালকাটার নাম পাই। নীচের দিকে আছে ইষ্টবেঙ্গল, হায়দ্রাবাদ এবং মহমেডান স্পোর্টিং।

লীগের খেলায় মহমেডান দল এবার পঞ্চম স্থানে আছে। তারা এবার খুব শক্তিশালী ছিল না। এবং হায়দ্রাবাদ পুলিসও প্রথম শ্রেণীর টীম নয় যদিও তারা শীল্ডের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে দু'দিন গোলশূন্য ড্র করেছিল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সৌভাগ্য যে, তাদের দিকে শক্তিশালী দল পড়ে নি। কিন্তু উপরের দিকে মোহনবাগান, বি এণ্ড এ রেল, ভবানীপুর এবং ক্যালকাটা এই চারটি দলকে পরস্পরের শক্তিশালী বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে খেলতে হয়েছে। শীল্ড তালিকার উপর দিকে এতগুলি শক্তিশালী দল এবং নীচের দিকে তুলনায় কম দলের স্থান কি বিচার-বুদ্ধিতে পেল আমাদের যে একেবারে ধারণায় আসে না এমন নয়। যথার্থ কি পদ্ধতিতে শীল্ড-ফিক্‌চার তৈরী হয়েছে আই এফ এ জনসাধারণকে জানায় নি। যদি পরিচালকমণ্ডলী প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিডেড্ টীমগুলি প্রথম বাছাই ক'রে নিয়ে পরে বাকীগুলি লটারী করে দিয়েছেন তা হলে আমাদের কথা যে, সিড্‌ডে টীম সম্বন্ধে তাঁদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধির খুব প্রশংসা করতে পারি না। একদিকে অনেকগুলি শক্তিশালী দল পড়েছে আর অপরদিকে সেই তুলনায় অনেক দুর্ব্বল দলের স্থান হয়েছে এর ফলে সেই দিকের খেলার আকর্ষণ কম হয়েছে। আর যদি তাঁরা লটারী করেই তালিকা প্রস্তুত করে থাকেন তাহলে তাঁরা কি ভুল পন্থা অবলম্বন করেন নি?

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত নাটিকা "রাজকন্যার ঝাঁপি"—২৲
প্রতিভা বসু প্রণীত গল্পগ্রন্থ "সুমিত্রার অপমৃত্যু"—৪৲
শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত "নীল আকাশের অভিযাত্রী"—১৷৹, "ছোটদের বেতার"—১৲
এম্. আকবর আলী প্রণীত "চাঁদ মামার দেশ"—১৷৹
বন্দে আলী মিয়া প্রণীত "হাদিসের গল্প"—৷৷৹
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "যারা ছিল দিগ্বিজয়ী"—১৸৹
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব"—৷৵৹
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ প্রকাশিত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (২য় ভাগ)—৬৲
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "রক্ত-তিলক"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "আব্রাহাম লিন্‌কন্"—১৲
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রাত যখন সাতটা"—১৲
ইন্দিরা সরকার প্রণীত "French Stories from Alphonse Daudet"—৪৲
অমল দাশগুপ্ত অনূদিত "কবে পোহাইবে রাতি"—২৷৹
আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ"—৬৲
গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "মাদাম কুরী"—২৲
শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়" ১ম ভাগ—১৷৹, ২য় ভাগ—১৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী - শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত　　**শারদশ্রী**　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু



আশ্বিন—১৩৫২

প্রথম খণ্ড	ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

হিন্দুধর্ম্ম ও সংগঠন

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি

(১)

মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ কর্ত্তৃক হিন্দু সংগঠনের যে বিরাট কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা আজ পঁচিশ বৎসর ঐকান্তিক সাধনার পর অনেক প্রসার লাভ করিয়াছে। আজ হিন্দু নিজ মরণশীলতা উপলব্ধি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন বুঝিয়াছে। শতধা-বিচ্ছিন্ন, জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত হিন্দু-সমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ আজ কিয়ৎপরিমাণে জাগ্রত হইয়াছে। প্রণবানন্দজীর তিরোভাবের পরেও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও অগণিত ভক্ত-অনুরাগীর চেষ্টায় তাঁহার আদর্শ ম্লান বা সঙ্কল্প শিথিল হয় নাই। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও কর্ম্মীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিপুল উৎসাহে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্য চালাইয়া হিন্দু-সমাজের সুপ্ত বিবেক ও আত্মজ্ঞানের পুনরুদ্বোধন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ফল যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা মোটের উপর আশাপ্রদ। প্রত্যেক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর হইতেছে অনুকূল জনমত গঠন ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার, উপযুক্ত পরিমণ্ডল রচনা। হিন্দু-সংগঠনের এই প্রাথমিক স্তরের কর্ম্মোদ্যম যে অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা ন্যায্যভাবেই দাবী করা যায়। এইবার আরও দুরূহ অনুশীলন সম্মুখে—এইবার আন্দোলনকে বাহিরের উন্মাদনা ও চাঞ্চল্য হইতে অন্তর্মুখীনতার দিকে লইয়া যাইতে হইবে। যাহাতে ইহা মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে ও অন্তরের গভীর স্তরে কার্য্যকরী হয়, সেই বিষয়ে উপায় চিন্তার সময় আসিয়াছে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সমস্যা সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

এ কথা স্বীকার্য্য যে আজ হিন্দু যে জাগরণের লক্ষণ দেখাইতেছে তাহা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতের বাস্তব প্রয়োজনে, কোন উচ্ছ্বসিত ধর্ম্মভাবের অন্তরপ্রেরণায় নহে। আজ হিন্দু দেখিতেছে যে সে জীবনযুদ্ধে পদে পদে পর্য্যুদস্ত, তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত। জীবনধারণের সমস্ত পথই এক কৃত্রিম রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলে তাহার নিকট অবরুদ্ধ। এমন কি তাহার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্ম্মজীবনের স্বাধীনতাও বিপন্ন। আজ ক্ষুধার জ্বালায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। যতদিন উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা ছিল, চাকরীর পথ নিরঙ্কুশ ছিল, জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল, ততদিন সে সম্ভাবিত বিপদের প্রতিকারকল্পে কোন দূরদর্শিতার পরিচয় দেয় নাই। এখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি

করিতেছে যে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে তাহাকে উপবাসে মরিতে হইবে। তাই এই অবশ্যম্ভাবী মরণ ঠেকাইবার জন্যই সে আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করিতে, নিজ দুর্ব্বলতার অসংখ্য রন্ধ্রপথ বন্ধ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বা আর্য্যসমাজের অভ্যুদয়ের পিছনে যে একটা সত্যকার ধর্ম্মগত প্রেরণা, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা ও ব্যাকুল ভাবোন্মত্ততা ছিল, বর্ত্তমান আন্দোলনে তাহার অনুরূপ কিছু লক্ষ্যগোচর হয় না। বর্ত্তমান সংগঠনপ্রয়াসের মূলে আত্মরক্ষার প্রবল তাগিদের অতিরিক্ত কোন উচ্চতর আদর্শবাদের প্রভাব আছে কি না সন্দেহ।

অবশ্য আত্মরক্ষার প্রয়োজন যে সর্ব্বাগ্রগণ্য তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। মুমূর্ষুর কাণে হরিনাম শোনাইলে তাহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে লৌকিক ইষ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সর্পদষ্ট রোগীর জন্য পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা একটু অসাময়িক বলিয়াই ঠেকে। আগে তাহার সাংঘাতিক নিদ্রালুতার প্রতিবেধ করিতে হইবে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতগ্রস্ত জড়তা নিবারণ করিতে হইবে, তবে তাহার অন্য প্রয়োজনের কথা ভাবিতে হইবে। হিন্দুকে নিজ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্য্য বুঝিয়া লইতে হইলে তাহাকে আগে বাঁচিতে হইবে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারে সে যদি বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল না হয়, সুস্থ ও ভদ্রভাবে বাঁচিয়া থাকার যদি সে উপায় করিতে না পারে, তবে তাহার অধ্যাত্মসম্পদ ছায়াবাজির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। উপবাস-ক্লিষ্ট দেহ, জড় শিথিল মন ও জীবনযুদ্ধে পরাভবের গ্লানি লইয়া বেদ-উপনিষদ-গীতার চর্চ্চা এক হাস্যকর অভিনয় মাত্র। কাজেই তাহার সর্ব্বপ্রথম সাধনা হইবে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই মর্ম্মান্তিক সত্য পরাধীন হিন্দু উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাণতা সত্ত্বেও সে আজ সর্ব্বনাশের গহ্বরমুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংগঠনকার্য্য যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করে, যে পর্য্যন্ত হিন্দুর সামাজিক বিবেক-বুদ্ধি ও ঐক্যবোধ পূর্ণভাবে উদ্দীপ্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত সে আপনার ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার আর অন্য চিন্তার অবসর নাই।

(২)

তথাপি আন্দোলনের যাঁহারা নেতা ও পরিচালক, তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল আপাত-প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধার প্রতি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। নিছক প্রয়োজনমূলক প্রচেষ্টার ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে—ইহাতে শক্তিমত্তা ও দৌর্ব্বল্যের বীজ একসঙ্গে নিহিত। প্রয়োজনের তাগিদে, আশু ফললাভের প্রলোভনে মানুষ শীঘ্রই উত্তেজিত হয় ও নিজ সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিবার প্রেরণা লাভ করে। সুদূর ভবিষ্যতের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতার অস্পষ্ট ছবি তাহাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। এক অনিশ্চিত, অনাগত শতাব্দীতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাহার কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনা যোগায় না। আবার পক্ষান্তরে প্রয়োজনের তাগিদে যে কাজে নামা যায়, প্রয়োজন ফুরাইলে সেই কর্ম্মোদ্যমও নিঃশেষিত হয়। খাদ্য রন্ধনের জন্য যে আগুনের উদ্ভব, তাহার শিখায় পবিত্র হোমানল প্রজ্বলিত হয় না; আশু প্রয়োজন মিটাইবার পর ভস্মাবশেষেই তাহার অবলুপ্তি। স্বার্থপ্রণোদিত প্রচেষ্টা আদর্শবাদের সর্ব্বোত্তম সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়—সাংসারিকতার স্তর হইতে সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইবার বিপুল ভাবাবেগ ইহার মধ্যে সঞ্চিত থাকে না।

সুতরাং আশু বর্ত্তমান ও সুদূর ভবিষ্যৎ—উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংগঠন আন্দোলনকে পরিচালিত করিতে হইবে। সংঘবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত ঐক্য এই বিরাট হিন্দুসমাজের মিলনের প্রকৃত ভিত্তি তাহার মূলে জল-সেচন করিতে হইবে। প্রয়োজনের বন্ধনকে নাড়ীর টানে রূপান্তরিত করিতে হইবে। হিন্দুর পরাধীনতার বহু শতাব্দীর মধ্যে খুব অল্পস্থলেই আমরা প্রয়োজন-প্রণোদিত সংঘবদ্ধতার দৃষ্টান্ত পাই—বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেও হিন্দুর সংহতি-শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ কদাচিৎ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক অবসাদের যুগগুলিতেও হিন্দুর সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল—ইহাই তাহার সমাজসংহতি ও আধ্যাত্মিক সত্তাকে প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অসংখ্য রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব, বর্গীর হাঙ্গামা ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রবল বিপর্য্যয়েও তাহার এই মূলগত ঐক্য বিধ্বস্ত ও উন্মূলিত হয় নাই। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগেও পল্লীসমাজে প্রয়োজনমূলক সহযোগিতার উদাহরণ একেবারে বিরল নহে। কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে কতক আত্মরক্ষা, কতক পরোপকার-প্রবৃত্তির তাগিদে পাড়া-পড়শীরা আগুন নিবাইতে সমবেত হয়। কৃষি-কার্য্যের ব্যাপারেও অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ চাষীরা নিজ একক শক্তির অপ্রাচুর্য্য বুঝিয়া একটা সাময়িক সমবায় সমিতি গঠন করে। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক সহকর্ম্মিতাকে ভিত্তি করিয়া সত্যিকার প্রতিবেশী-সুলভ সহৃদয়তা ত গড়িয়া উঠে না। কাজেই মনে হয় যে শুধু বাহিরের প্রয়োজনের উপর নির্ভর না করিয়া হৃদয়ের যে গভীর স্তরে স্নেহপ্রীতি সৌহার্দ্য সমাজসেবা প্রভৃতি বৃত্তিগুলির মূল প্রসারিত সেইখান পর্য্যন্ত আমাদের আবেদন পৌঁছাইতে না পারিলে স্থায়ী ফললাভের আশা করা যায় না। হিন্দুর ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনধারাও এই সত্য সমর্থন করে।

(৩)

রাজনৈতিক অধঃপতন ও স্বাধীনতালোপের মধ্যে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অক্ষুণ্ণ অস্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা। গ্রীস, রোম ও মিসরের প্রাচীন সভ্যতা আজ নিশ্চিহ্নভাবে বিলুপ্ত। গ্রীস ও ইটালি এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করে; কিন্তু তাহাদের জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক আদর্শ ধরাপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া গিয়াছে। আধুনিক গ্রীস ও ইটালির অধিবাসীরা তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। গ্রীসে মানবিকতার যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-বিকাশ ও সুসমঞ্জস পরিণতির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শ গৃহীত হইয়াছিল, রোমে যে দৃপ্ত

তেজস্বিতা ও অনমনীয় কর্ত্তব্যবোধ ও ন্যায়পরতা জীবনযাত্রার মেরুদণ্ড ছিল, তাহাদের আধুনিক বংশধরের রক্তধারায় তাহাদের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য। কেবল ভারতবর্ষেই প্রাচীন আদর্শ এখনও জীবনের উপর ক্রিয়াশীল—এখনও কেবল তাহা শুষ্ক গবেষণার বিষয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই সনাতন আদর্শ এখন রাজ্য-পারচালনা, দেশশাসন প্রভৃতি বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রের এই পরিধি-সঙ্কোচে ইহার জীবনীশক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে তাহা নিশ্চয়। আজ আর বড় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না বলিয়াই ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিনিষেধ ও অন্ধ সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া যান্ত্রিক অচেতনতার সহিত নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। তথাপি সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে ইহা এখনও বাঁচিয়া আছে—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিয়দংশ ছাড়া দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব এখনও অপ্রতিহত। বিংশ শতাব্দীর হিন্দুর সহিত বেদ-উপনিষদের যুগের হিন্দুর যোগসূত্র এখনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। আজ যদি কোন ঋষি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন, তিনি বোধ হয় সুদীর্ঘ শতাব্দীপুঞ্জের বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাঁহার বংশধরকে চিনিতে পারিবেন। এই অঘটন-ঘটন কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাই ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

এই অসাধ্য-সাধনের মূলে আছে হিন্দুর সংগঠন-প্রতিভা, তাহার জনশিক্ষা ও আদর্শপ্রচার কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ্যতার বেড়াজালে আচ্ছন্ন—ইহার মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু তথাপি ইহার মূলতত্ত্ব ও প্রেরণা দেশের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বকে সাধারণ মনের অধিগম্য করিয়া তোলার পিছনে কি অক্লান্ত অধ্যবসায়, কি গভীর লোকচরিত্র-জ্ঞান, কি অদ্ভুত চিত্তরঞ্জিনী শক্তির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে! ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে সমস্ত দেশ উঠিয়া পড়িয়া এই লোকশিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া, হস্তলিখিত পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ও হিন্দুধর্ম্মের জীবনাদর্শ ও ভক্তিতত্ত্ব সকলের মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত করিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচালী, কথকতা, যাত্রাগান, কীর্ত্তন, কবি প্রভৃতির সহযোগিতায় এই অমৃত-প্রবাহিনী স্রোতস্বতী, অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বাহিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর ভিতর দিয়া বিতরিত হইয়া, নিতান্ত মূঢ় অশিক্ষিতেরও চিত্ত-ক্ষেত্রকে উর্ব্বর ও সরস করিয়াছে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত মিলাইয়া অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আশ্চর্য্যরূপ তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও সময়োপযোগিতা জ্ঞানের পরিচয় দেয়। বৈদিক ও উপনিষদ যুগের মানস স্বাধীনতা, উদার মতবাদ ও শিথিল সমাজ-বিন্যাসের সহিত তুলনায় পরবর্ত্তী যুগের প্রস্তর-কঠিন ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার চেষ্টা প্রতিফলিত হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম, সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিক রুচি ও প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, উপকরণ-বহুল, শিল্প-সৌন্দর্য্যে মনোরম, আতিথেয়তার আমন্ত্রণে সহৃদয়, ভক্তির উচ্ছ্বাসে পূত, সামাজিক মানুষের সুস্থ কামনার আবেগে প্রাণবান শক্তিপূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কত অনার্য্য দেবতা যে এই বাস্তব প্রয়োজনের প্রভাবে আর্য্যদেব-মণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছে, কত প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার সুকৌশলে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। হিন্দু-ধর্ম্ম কোথায়ও অনার্য্য প্রথা ও অনুষ্ঠানকে উচ্ছেদ করে নাই, শোধন করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। যেখানে অন্ধ কুসংস্কার মূঢ় ভক্তির ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে, যেখানে আদিম মানুষ সাপ, গাছ পাথরের নিকট ভীতিমিশ্রিত আরাধনার অর্ঘ্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সেখানেই হিন্দুধর্ম্ম এই প্রাথমিক, স্বতঃউৎসারিত হৃদয়-বৃত্তিকে নিজ উচ্চতর আদর্শ ও পরিকল্পনার একাঙ্গীভূত করিয়া নিজের বহিঃপ্রসার ও অন্তর-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। হিমালয়-নিঃসৃত জাহ্নবীর ন্যায় এই হিন্দুধর্ম্ম বেদ-উপনিষদের আধ্যাত্মিক সাধনার তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াও যাত্রাপথে অনেক ক্ষুদ্র অখ্যাত শাখানদীকে কুক্ষীগত করিয়া সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে ও চারিদিকের দৃশ্যাবলীতে এক স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রী ও শস্যসম্পদ বিকীর্ণ করিয়াছে।

অবশ্য এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা যে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস তাহা দাবী করা যায় না। যে ধর্ম্ম লৌকিক মনোরঞ্জনের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যগ্র তাহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি অনিবার্য্য কারণে হ্রাস পায়। বারংবার রূপান্তর-সাধন-প্রক্রিয়ার ফলে ইহার নিগূঢ় গন্ধসার অনেকাংশে ক্ষীণ হয়। যেখানে ধর্ম্মসাধনার উচ্চ ও নিম্ন স্তর পাশাপাশি বর্ত্তমান সেখানে অপ্রতিরোধনীয় মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রায় সকলেরই সাধনামার্গ নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়ে—খাঁটি সোনা অপেক্ষা খাদ মিশানো সোনারই বাজারে বেশী চল্‌তি হয়। নিরাকার, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম অপেক্ষা রূপ ও রংএ গড়া প্রতিমার আকর্ষণ অনেক বেশী—দুরূহ ধ্যান-ধারণার অধিগম্য সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর প্রসন্নহাস্যময়ী, বরাভয়দাত্রী মাতৃমূর্ত্তির অন্তরালে আত্মগোপন করেন। মোহাবেশহীন নিষ্কাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে 'ধনং দেহি, পুত্রান্ দেহি, যশো দেহি' প্রভৃতি প্রাকৃত মানুষের কাম্যতম আকাঙ্ক্ষা ভগবদারাধনার মন্ত্রের ছদ্মবেশে তাহার গভীরতম হৃদয়-কন্দর হইতে উৎসারিত হয়—প্রবৃত্তি ধর্ম্মের নামাবলী গায়ে দিয়া পরিতৃপ্তির অবাধ ছাড়-পত্র পায়। সমস্ত সজীব ধর্ম্মের একটা নিগূঢ় শক্তিকেন্দ্র আছে—এই শক্তিকেন্দ্রে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণের উৎস হইতে অধ্যাত্ম-শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকার অপব্যাখ্যা, বিকার ও লৌকিক অপকর্ষ হইতে রক্ষা করিয়া ইহার মৌলিক, বিশুদ্ধ প্রেরণাটি অক্ষুণ্ণ রাখেন তাঁহারাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এই কেন্দ্রবিকীরিত অধ্যাত্মশক্তি আধারের যোগ্যতা অনুসারে সমাজের সমস্ত স্তরে সক্রিয় হইয়া ইহাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সমাজ-হিত-তৎপর ও ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জনোন্মুখ করে। যখন কোন ধর্ম্মের লৌকিক সংস্করণ ইহার উচ্চতর আদর্শকে অভিভূত করে, যখন মাত্র আচার-নিষ্ঠা ও নির্দ্দেশের নিখুঁত অনুসরণ অধ্যাত্ম স্বচ্ছ দৃষ্টির স্থান অধিকার করে, তখন ইহার শক্তিকেন্দ্রে নূতন শক্তি-সঞ্চার বন্ধ হইয়া যায় ও ইহা dynamic

হইতে static অবস্থায় নামিয়া আইসে। অত্যন্ত ধর্ম্মসংস্কার, যতই আন্তরিক ও ভক্তিপ্রণোদিত হউক না কেন, নূতন প্রাণশক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, মূলধন বাড়ায় না। কাজেই ইহার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার মূল উৎসের সহিত সংযোগহীন হইয়া, ক্রমশঃ রিক্ত ও শূন্য হইয়া পড়ে ও কর্ম্মক্ষেত্রে কোন মহৎ আত্মোৎসর্গ ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রেরণা যোগায় না। তাই আজ হিন্দু সমাজের শক্তিপূজা কেবল রাজসিক আড়ম্বরে পরিণত হইয়া ইহার আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছে—ইহা ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন না করিয়া কেবল পশুবলির ক্লীব, অক্ষম আত্মপ্রসাদ জাগায়। ইংরেজ-শাসন দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্ব্বেকার অরাজকতার যুগে ডাকাতের দল কালীপূজা করিয়া দস্যুবৃত্তির উপযোগী ধর্ম্মোন্মাদ ও সাহস অর্জ্জন করিত—তখনও শক্তিপূজার সহিত শক্তির একটা বিকৃত, অস্বাভাবিক সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু সেই দেবমন্দির আক্রান্ত হইলে মূর্ত্তি রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়ার সঙ্কল্প তাহারা ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা হইতে লাভ করে নাই। অর্থাৎ সমজাতীয় একটা উচ্চ ও অপর একটা নিম্ন শ্রেণীর প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বিতীয়টা ধর্ম্মের প্রশ্রয় পাইয়াছে ও প্রথমটা ইহার সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য রাজনৈতিক পরাধীনতা ও তজ্জনিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্মের এই অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। তথাপি ইহা নিশ্চিত সত্য যে ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিরই অপচয় না হইলে ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত আচরণের এরূপ অসঙ্গতি ঘটিতে পারিত না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

(নাটক) (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযামিনীমোহন কর

মল্লিকা। সুবোধবাবু ওঁকে যে কি বলেছেন কে জানে?

প্রতুল। কিছু নাও তো হতে পারে।

মল্লিকা। বিনা কাজে পুলিশের লোকরা কখনও আসে না।

প্রতুল। অন্য কোন কাজ··· খগেন দত্তর প্রবেশ

খগেন। নমস্কার স্যর। আমার নাম খগেন দত্ত।

প্রতুল। নমস্কার। বসুন।

মল্লিকা। আমায় চিনতে পারছেন খগেনবাবু?

খগেন। মিস্ বসু! আপনাকে এখানে দেখব আশা করিনি।

মল্লিকা। আমি তো পুলিশের লোক নই। বিনা কাজেও অনেক সময় লোকদের বাড়ী যাই। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কাজে—

খগেন। এমন কিছু কাজ নয়। নিরঞ্জনের প্রবেশ

প্রতুল। খগেনবাবু, ইনি আমার বন্ধু ডাক্তার নিরঞ্জন গুপ্ত। নিরঞ্জন, ইনি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর খগেন দত্ত।

নিরঞ্জন। নমস্কার। আপনাকে দেখে পুলিশের লোক বলে মনে হয় না।

মল্লিকা। ঐখানেই তো মুস্কিল ডাক্তার গুপ্ত। ওর কথাবার্ত্তা চেহারার চেয়েও মোলায়েম, কিন্তু···

খগেন। (মল্লিকার কথা যেন শুনতে পারনি এই ভাবে) নমস্কার ডাক্তার গুপ্ত। গ্ল্যাড টু মীট হউ।

নিরঞ্জন। (মাইক্রস্কোপে একটা স্লাইড দিয়ে দেখতে দেখতে) কিছু মনে করবেন না খগেনবাবু আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলুম—

খগেন। নট অ্যাট অল। আপনার কাজের সময় বিরক্ত করতে এলুম বলে ভারী দুঃখিত।

মল্লিকা। কিন্তু লোককে বিরক্ত করাই আপনাদের কাজ। আজ সকালে বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

খগেন। হ্যাঁ। আমি আপনাদের বাড়ী গিছলুম—

মল্লিকা। সেখানে ডাক্তার সুবোধ রায় আপনাকে মিষ্টার চৌধুরীর সম্বন্ধে কিছু বলেন যে জন্য—

খগেন। না, না, আমি সে জন্য আসিনি। মিষ্টার চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন ছিল—

মল্লিকা। এটা কি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলার ভনিতা?

খগেন। না মিস্ বসু, আই ডিড্ নট মীন ইট।

মল্লিকা। ইউ ডিড। যাই হোক, আমি এমনিতেই যাচ্ছিলুম।

প্রতুল। চল, আমি তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

মল্লিকা। আপনাকে যেতে হবে না—ইন্সপেক্টরের অমূল্য সময় নষ্ট হবে—

খগেন। আমি বসে আছি। একটু অপেক্ষা করতে কোন আপত্তি নেই।

মল্লিকা। শুনে সুখী হলুম। নমস্কার। নমস্কার, ডাক্তার গুপ্ত।

নিরঞ্জন। নমস্কার, মিস বসু। প্রতুল ও মল্লিকার প্রস্থান

খগেন। (ঘরের চারিধারে দেখে) মিষ্টার চৌধুরীর কেমিষ্ট্রিতে খুব ইণ্টারেষ্ট আছে দেখছি।

নিরঞ্জন। (নিজের কাজ করতে করতে) হ্যাঁ।

খগেন। (নিরঞ্জনের টেবিলের কাছে এসে) এবং ডাক্তারীতেও। ব্লডগ্রুপ টেষ্ট করছেন?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। আপনারও ডাক্তারীতে খুব ইণ্টারেষ্ট আছে দেখছি।

খগেন। যৎসামান্য। (ঘরের কোনে কয়েকটা জারের দিকে দেখিয়ে) অনেক এসিড রয়েছে।

নিরঞ্জন। তা আছে। অনেক কাজে লাগে।

খগেন। মিষ্টার চৌধুরী কোন নতুন রীসার্চে ব্যস্ত আছেন বুঝি? ওঁর কি সাবজেক্ট...

নিরঞ্জন। তাকে প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন। কেন?

খগেন। এমনি, কিউরিওসিটি—মানে কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করছিলুম—

নিরঞ্জন। এমনি প্রশ্ন করাতে আপনার খুব ইণ্টারেষ্ট আছে দেখছি?

খগেন। গোপন করবার কিছু না থাকলে সাধারণত লোকে বিরক্ত হন না।

নিরঞ্জন। কিন্তু কাজের সময় বাজে কথা বললে সাধারণত লোকে বিরক্তই হয়ে থাকেন। প্রতুলের প্রবেশ

প্রতুল। আই অ্যাম সরি, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম। চা আনতে বলব?

খগেন। আজ্ঞে না, ধন্যবাদ। আমি অলরেডী সকাল থেকে তিন কাপ চা খেয়েছি। আপনাদের কাজের সময় বাজে কথা বলে বিরক্ত করব না। সোজা কাজের কথাই পাড়া যাক্। আপনি বহুদিন যাবৎ কলকাতায় ছিলেন না।

প্রতুল। না।

খগেন। আপনি মাস কয়েকের জন্য এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন?

প্রতুল। মাসখানেক হ'ল নিয়েছি। তবে কতদিন থাকব সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না।

খগেন। আমি আপনার ভালর জন্য একটা কথা বলছি। এখানে আব্দুল রেজা বলে আপনার এক চাকর আছে—

প্রতুল। আছে। আমার কোন চাকর থাকাতে পুলিশের আপত্তির কি থাকতে পারে?

খগেন। সে জেল-ফেরত আসামী—

প্রতুল। তাতে কি? আমার কিছু সে চুরি করে নি—

খগেন। সে যে জেল-ফেরত আপনি জানতেন?

প্রতুল। হ্যাঁ, কিন্তু সে জেলে গিছ্‌ল বলেই আর কখনও ভাল হতে পারে না তা আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া এ সব বাজে প্রশ্ন করে আপনার কি লাভ? সবই তো ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে আপনি শুনেছেন।

খগেন। আমি কেবল আমাদের রুটীন ফলো করছি—

প্রতুল। কিন্তু তাতে আমাদের রুটীনে বিলক্ষণ বাধা পড়ছে।

খগেন। এর কোন পুরোনো বন্ধুবান্ধব দেখা টেখা করতে আসে কি?

প্রতুল। জানি না। চাকরদের সম্বন্ধে এত বেশী কৌতূহল আমার নেই। দরকার মনে হলে এসব কথা তাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

খগেন। (একটা ছবি পকেট থেকে বার করে) এই লোকটা কি কখনও এখানে আসে?

প্রতুল। (ছবি হাতে নিয়ে) জানি না। দেখি নি।

খগেন। তা হলে ঠিক আছে। রেজার ও এক পুরোনো সাথী।

প্রতুল ছবিটার এক কোন ধরে সন্তর্পণে খগেনের হাতে দিল

প্রতুল। ছবিটা খুব সাবধানে একটা কোনে ধরুন।

খগেন। (বিস্মিত ভাব দেখিয়ে) কেন?

প্রতুল। আমার আঙুলের ছাপ পড়েছে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

খগেন। আঙুলের ছাপ!

প্রতুল। আজ্ঞে হ্যাঁ। যে জন্য আপনি কষ্ট করে অধীনের কুটীরে পদার্পণ করেছেন এবং এতক্ষণ এত কষ্ট করে অবান্তর কথা কয়েছেন।

খগেন। না, না, এ কি বলছেন। এই আমি মুছে দিচ্ছি।

সন্তর্পণে ছবির ওপর দিয়ে রুমাল বুলোলে যাতে ছাপ মিটে না যায়

প্রতুল। দেখবেন ছবিতে যেন রুমাল না ঠেকে। খগেনবাবু, আপনারা কি মনে করেন যাঁরা পুলিশে কাজ করেন তাঁরাই কেবল বুদ্ধিমান।

খগেন। সব সময় তা মনে করলে ঠকতে হয়।

ছবি কাগজে মুড়ে পকেটে রাখলে

প্রতুল। আমার আঙুলের ছাপে আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি কি?

খগেন। এ কথা বলছেন কেন স্যর?

প্রতুল। ডাক্তার রায়ের কথায় আপনি এখানে এসেছেন তা কি আপনি অস্বীকার করছেন?

খগেন। না। তবে এসেছিলুম রেজার উদ্দেশ্যে।

প্রতুল। কিন্তু রেজার সঙ্গে দেখা না করে আমার সঙ্গে দেখা করাই অধিক প্রয়োজন মনে করলেন—

খগেন। মানে আপনি যখন বললেন সে শুধরে গেছে তখন আর তার সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করলুম না।

প্রতুল। ওঃ আই সী। তবু একবার তার সঙ্গে দেখা করুন। নিজের মনের সন্দেহ ভঞ্জন করে নেওয়া ভাল। এও একটা অফিশিয়াল রুটীন বই তো নয়। (কলিং বেল টিপল)

খগেন। আপনি যখন কলকাতা থেকে যাবেন রেজাকেও কি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?

প্রতুল। না টেম্পরারী কাজ। আমার এক এক্সপেরিমেণ্টে ও সাহায্য করতে ভলাণ্টিয়ার করেছে—অবশ্য এ সব কথাই আপনি জানেন।

খগেন। একটু আধটু শুনেছি বটে— রেজার প্রবেশ

রেজা। আমাকে ডাকলেন স্যর।

প্রতুল। হ্যাঁ, খগেনবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রেজা। কেন?

খগেন। প্রতুলবাবুর কাছে এসেছিলুম, তোমাকেও দেখে গেলুম।

রেজা। আমার বিরুদ্ধে কিছু—

খগেন। না, না। মিষ্টার চৌধুরীর মুখে শুনলুম তুমি এখন ভাল হয়েছ। আচ্ছা, আমি চলি। নমস্কার।

প্রতুল। নমস্কার। রেজা, ওকে পৌঁছে দাও। খগেন ও রেজার প্রস্থান

নিরঞ্জন। লোকটি অত্যন্ত ধড়িবাজ।

প্রতুল। তাইতো মনে হলো।

নিরঞ্জন। রেজাকে দেখতে আসা একটা ছল মাত্র।

প্রতুল। সে তো বটেই। এ ডাক্তার সুবোধ রায়ের কীর্ত্তি। ওদের সন্দেহ—

নিরঞ্জন। নিজের চোখে দেখে ভঞ্জন করতে এসেছিল। তোমার সম্বন্ধে একটু বেশী আগ্রহ—

প্রতুল। নিবৃত্তি হয়ে গেছে বলেই তো মনে হয়।

নিরঞ্জন। কোথাও কোন ভুল চুক চলবে না।

প্রতুল। তা জানি, সেই জন্যই আমাকে এত সাবধানে থাকতে হয়।

নিরঞ্জন। ও লোকটা সাধারণ পুলিশের চেয়ে বুদ্ধিমান।

প্রতুল। ভয়ের কোন কারণ দেখি না। টেষ্ট কমপ্লীট করেছ?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। রেজাকে দিয়ে চলবে না।

প্রতুল। আর ইউ শিওর?

নিরঞ্জন। তুমি নিজেই দেখ। ফাইনাল স্লাইড ফিট করা আছে।

প্রতুল। (মাইক্রস্কোপে দেখে) তাই তো। এখন উপায়?

নিরঞ্জন। অন্য লোক দেখতে হবে। রেজার প্রবেশ

প্রতুল। রেজা—

রেজা। আজ্ঞে। (একটু পরে ভয়ে ভয়ে) উনি কি আমার খোঁজে এসেছিলেন?

প্রতুল। হ্যাঁ। কিন্তু সেজন্য তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। দেখ রেজা, তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না।

রেজা। কেন স্যর! উনি এসেছিলেন বলে কি—

প্রতুল। না, সেজন্য নয়। তোমার গ্ল্যাণ্ডে কাজ হবে না।

রেজা। তা হলে আমার—

প্রতুল। তোমার টাকা পাবে। এর জন্য তো তুমি দায়ী নও।

রেজা। আমার স্বাস্থ্যের জন্য—যদি বলেন তো আর একজন লোক আমার হাতে আছে—

প্রতুল। এ সম্বন্ধে পরে কথা বলব—

রেজা। যদি হুকুম দেন তো তাকে আজই নিয়ে আসতে পারি—

প্রতুল। আজ থাক, পরে বলব। তুমি এখন যেতে পার।

রেজার প্রস্থান

নিরঞ্জন। ভারী মুস্কিল হ'ল।

প্রতুল। তাই তো দেখছি। ও খুব ইচ্ছুক ছিল—

নিরঞ্জন। কিন্তু ওকে দিয়ে কাজ একেবারেই চলতে পারে না। অসম্ভব। ক'দিনের মধ্যে দরকার?

প্রতুল। বেশী দিন অপেক্ষা করতে পারব না। একমাস, বড় জোর দেড় মাস—তার বেশী চলবে না।

নিরঞ্জন। তাই তো! ডাক্তার রায় কিন্তু এ কাজে আর হাত দিতে রাজী হবেন না।

প্রতুল। তাই তো মনে হচ্ছে।

নিরঞ্জন। অন্য কোন ভাল সার্জ্জন জানা আছে?

প্রতুল। দু'একজনের নাম জানা আছে। চেষ্টা করে দেখতে হবে।

নিরঞ্জন। যদি তারা রাজী না হয়—

প্রতুল। তবে অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে। বম্বে—

নিরঞ্জন। সেই ভাল। এখানে মিস বসুর জন্য তোমায় বিপদে পড়তে হবে।

প্রতুল। তার কি দোষ।

নিরঞ্জন। তাঁর দোষ না থাকলেও তাঁর জন্য এই বিপদ এই কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না। ডাক্তার রায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি করলেন হিংসায়—পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল জেলাসী। কিন্তু তার পর পুলিশ ইত্যাদি নিয়ে যা হাঙ্গামা দাঁড়াচ্ছে—প্রতুল, মিস বসুকে তোমার মন থেকে দূর কর। আগেও বলেছি এখনও বলছি দু'নৌকায় পা দিও না। ইট ইজ ডেঞ্জারাস।

প্রতুল। আমার মনে হয় তাকে দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে—

নিরঞ্জন। আমার মাথায় তো আসছে না—

প্রতুল। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে ওকে নিয়ে আমি অন্য দেশে—

নিরঞ্জন। এখন তা অসম্ভব।

প্রতুল। অসম্ভব নাও তো হতে পারে।

নিরঞ্জন। প্রেম, বিবাহ এ সব তোমার সাজে না। তোমার চিরযৌবন, কিন্তু মিস বসু কিছুদিন পরে বৃদ্ধা হয়ে যাবেন, তারপর মৃত্যু—

প্রতুল। যদি সেও বৃদ্ধা না হয়, তারও অনন্ত যৌবন থাকে—

নিরঞ্জন। (কিছুক্ষণ প্রতুলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে) প্রতুল, তুমি কি ক্ষেপে গেছ?

প্রতুল। কেন? আমি কি অসম্ভব কিছু বলেছি?

নিরঞ্জন। তাকেও তুমি তোমার মত করে নেবে?

প্রতুল। হ্যাঁ। এ তো করা যায়—

নিরঞ্জন। তা যায়।

প্রতুল। তা হলে আমাকে আর একা থাকতে হয় না।

নিরঞ্জন। ওঁর ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করবে?

প্রতুল। হ্যাঁ। তাহলে আমার সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

নিরঞ্জন। তা হয়ত' হবে, কিন্তু তার দাম অনেক বেশী দিতে হবে এবং শেষ অবধি তাকে পাবে না।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। ঐ ঘরের ব্যাপার—ঐ বাথটব—

প্রতুল। এ সব কথা সে জানতে পারবে না।

নিরঞ্জন। যে নারী ভালবাসে তার কাছ থেকে কোন জিনিষ বেশীদিন লুকিয়ে রাখা শক্ত।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। কারণ নারীর ভালবাসার পিছনে ভালবাসার বস্তুকে

সম্পূর্ণরূপে পাবার এবং ধরে রাখবার অদম্য ইচ্ছা থাকে। তা ছাড়া মেয়েদের সাধারণত একটু বেশী কৌতূহল। আরও ভাল করে ভেবে এ কাজে হাত দিও প্রতুল।

প্রতুল। বেশ।

নিরঞ্জন। আগে নিজের মন ঠিক করে নাও। ঝোঁকের বশে প্রথমেই তাঁকে কিছু বলে বস না।

প্রতুল। আমি জানি সে রাজী হবে…

নিরঞ্জন। আমিও তাই মনে করি। তবু ভাল করে ভেবে দেখো। (হাতঘড়ি দেখে) এইবার তোমার ওষুধটা খাবার সময় হয়েছে।

প্রতুল বাক্স খুলে একটা ওষুধ বার করে গেলাসে ঢাললে

নিরঞ্জন। তোমাকে পরীক্ষা করা এখনও আমার বাকী আছে।

প্রতুল। (ওষুধ খেয়ে) হ্যাঁ, পরীক্ষাটা শেষ করে ফেল।

নিরঞ্জন। মিস বসুকেও এই ওষুধ খেতে হবে। রেডিয়াম মিশ্রিত—এর এফেক্‌ট আছে তো !

প্রতুল। এর খারাপ এফেক্ট আমি শোধন করে নিয়েছি।

নিরঞ্জন। সেইটাই তো এই কাজের সফলতার গোড়াকার কথা। কিন্তু এর রিফালজেন্স—তাকে তো জয় করতে পার নি।

প্রতুল। সময়ে তাও করব।

নিরঞ্জন। তুমি যে তা পারবে তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এখন ? প্রতুল জান, তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে যেন আগুন বেরোয়—

প্রতুল। জানি…(একটু থেমে) মিলিও দেখেছে।

নিরঞ্জন। এবং শুধু চোখ নয়—শরীর দিয়েও—

প্রতুল। (তীব্রভাবে) আলোতে তা দেখা যায় না। আমি অন্ধকারে কখনও কারো সামনে বার হই না।

নিরঞ্জন। কিন্তু তিনি—যদি তাঁকে বিবাহ কর, তাকে নিয়ে ঘর কর—তখন তিনি দেখতে পাবেন—

প্রতুল। সেদিন তার কাছে আমার গোপনীয় কিছু থাকবে না।

নিরঞ্জন। তা হয় ত' থাকবে না।

প্রতুল। তবে—

নিরঞ্জন। এখন আমাকে একবার সব আলোগুলি নিভিয়ে দিতে হবে।

প্রতুল। কেন ?

নিরঞ্জন। অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে তোমার চোখ পরীক্ষা করতে হবে—

প্রতুল। কিন্তু…

নিরঞ্জন। কি ?

প্রতুল। অন্ধকার আমি পছন্দ করি না। ভয় হয়—

নিরঞ্জন। এখানে আর কেউ নেই—

প্রতুল। পৃথিবীতে কেউ আমার অন্ধকারের রূপ দেখে, তা আমি চাই না—এমন কি তুমিও নয় !

নিরঞ্জন। আমার কাছে আপত্তি করবার তো তোমার কিছু নেই।

প্রতুল। তা নেই জানি। তবু, তবু—জান নিরঞ্জন, এই আমার একটা সীক্রেট, যা আমি জগতের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। আমার অন্ধকারের জ্বলন্ত রূপ—হা হা হা— (উচ্চ হাস্য)

নিরঞ্জন। প্রতুল, শান্ত হও, অধীর হোয়ো না—

প্রতুল। না, না, আমি অধীর হইনি—

নিরঞ্জন। বোসো।

প্রতুল। (বসে) আমি ঠিক আছি। আলো নিভিয়ে দাও।

নিরঞ্জন একে একে সব আলো নিভিয়ে দিলে। ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে প্রতুলের দেহের নগ্নাংশ—হাত এবং মুখ আগুনের মত জ্বলতে লাগল। যে গেলাসে ওষুধ খেয়েছিল তা থেকে যেন আগুন বেরোতে লাগল।

নিরঞ্জন। আমি দু' মিনিটে আমার কাজ শেষ করে ফেলব। আমার দিকে চাও—

প্রতুল। নিরঞ্জন দেখছ ?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। তোমার শরীরের রেডিয়াম—

প্রতুল। এক এক সময় আমার নিজেরই ভয় হয়—

নিরঞ্জন। ওদিকে মন দিও না—

প্রতুল। এ যেন একটা অভিশাপ ! মানুষের মধ্যে থেকেও আমি যে মানুষ নয়, তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।

নিরঞ্জন। প্রতুল সাহস হারিও না। তুমি তো সাধারণ মর-জগতের মানুষ নয়। তুমি অমর !

প্রতুল। এই কি অমরত্ব, না আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—

দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রতুল টেবিলের ওপর মাথা রাখল। মনে হ'ল যেন কাঁদছে। নিরঞ্জন পুত্তলিকাবৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল

(ক্রমশঃ)

সে কথা কহিতে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল

সে কথা কহিতে প্রিয় কত না মাধুরী জাগে,
আঁখির কাজলে-লেখা যে কথা অরুণ রাগে !
যে কথা কহিতে কত সাহসিকা নীপশাখে বাঁধে ঝুলনা,
"বৌ কথা কও" কহে অনিবার, আজিকার নিশি ভুল না।
যে কথা কহিতে নীরবে নিয়ত আশা দোলে অনুরাগে।

যে কথা ভ্রমর কহিতে চাহিয়া চামেলীর কাণে কাণে,
মাধবীকুঞ্জ মঞ্জরি' তোলে গুঞ্জন কলতানে !
যে কথা পাপিয়া কহিতে চাহিয়া "চোখ গেল" বলি কাঁদে।
যে কথা চকোরী কহিতে না পারি' খুঁজিছে গগনে চাঁদে।
যে কথা কহিতে চিরদিন রাধা কানু পদরেণু মাগে।

মহাযুদ্ধ ও বিশ্বসভ্যতা

রায় বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

একটা গল্প আছে, ইংরাজ ফরাসী জার্ম্মান ও রুশ এই চার জাতীয় চারজন পণ্ডিত হস্তী সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে বসলেন। ইংরেজ তার কার্য্যকরী জ্ঞান প্রয়োগ করে লিখলেন, বিভিন্ন কাজে হাতীর ব্যবহার আর্থিক হিসাবে কিরূপ লাভজনক হতে পারে। ফরাসী প্রেমিক পুরুষ—হাতীর প্রণয় ব্যাপার হল তার প্রবন্ধের বিষয়। পেটুক জার্ম্মান ঐ বিশাল জন্তুর প্রচণ্ড পরিপাকক্রিয়া নিয়ে গভীর গবেষণা সুরু করলেন। আর মনীষী রুশ হঠাৎ এক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করলেন—হাতী আছে কি? মায়া নয় ত? মানবসভ্যতার ওপর সংগ্রাম ও শান্তির দূরপ্রসারী ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে, আমরা যদি স্ব স্ব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেবলমাত্র জয় পরাজয় লাভ ক্ষতিকে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের চুড়ান্ত মানদণ্ডরূপে খাড়া করি, তাহলে ঐ বিজ্ঞ চতুষ্টয়ের মত আমরাও একটা বিরাট হস্তিমূর্খতার পরিচয় দেব—যে সব কঠিন সমস্যা মানবজাতির সামনে এসে দেখা দিয়েছে তার কোনটিরই সুচারু মীমাংসা করতে পারবো না। কেন না, আজকের ঘনঘটাচ্ছন্ন জগতের বিপুল অসি-ঝঞ্ঝনা মানবাত্মার গভীর তীব্র আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি—তার মর্ম্মক্ষতে প্রলেপ দিয়ে দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে হলে শুধু যুদ্ধ জয় করলেই চলবে না, শান্তিকেও জয় করতে হবে।

জগতে যুদ্ধ কিছু নূতন নয়, অনন্তকাল ধরে চলে এসেছে দেবাসুরের সংগ্রাম। এ কথাও হয়ত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত যে প্রাণীজগতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ জীবনতত্ত্বের একটা নির্ম্মম প্রয়োজন। ঐ জীবনযজ্ঞে কত প্রাণী দিয়েছে আত্মবলি, প্রকৃতির রক্তাক্ত নখদংষ্ট্রা মানুষকেও ক্ষত-বিক্ষত করেছে। যে সুসম্বদ্ধ প্রাকৃতিক ধারা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতর পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল, সেই অগ্রগতির প্রধান সহায় হয়েছে—সংগ্রাম। অবনমিত যে, তার বশ্যতাকে ভিত্তি করে মানব-সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রগতির রথ টেনে নিয়ে চলেছে, অস্পৃশ্য শূদ্র! এ শুধু জাতিভেদজর্জ্জরিত আমাদের দেশের কলঙ্ক নয়, সারা জগতের কুখ্যাতি। দক্ষিণ য়ুরোপ পশ্চিম এসিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনাকীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর রোমান সাম্রাজ্যের সুবিশাল সৌধটি দাঁড়ালো একদিন নির্লজ্জ দর্পের মত,—আর সেদিন তা জগৎবাসীর সশ্রদ্ধ বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল, কারু সৌন্দর্য্য শিল্প সাহিত্য আইন শৃঙ্খলার বেদীরূপে। সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইসলাম আরোহণ করেছিল সেই দিন, যেদিন তার কাস্তে চাঁদ ও তারায় সবুজ পতাকা অসংখ্য জাতির বক্ষপঞ্জরের ওপর মৃদু পবন হিল্লোলে আন্দোলিত হচ্ছিল। কঠোর জীবনসংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এমনই কত জাতি উঠেছে, আবার পড়েওছে—অনন্তকাল সমুদ্রে বুদ্বুদের মত। ইতিহাসের চরম সত্যরূপে কোন জাতি তার প্রভুত্ব ও সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ কালপ্রবাহের উর্দ্ধে স্থায়ী মঞ্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় নি। বরঞ্চ এটাই প্রতিপন্ন হয়েছে জাতির সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্ব সভ্যতার ইতিহাসে কখনো শেষ কথা বলে গ্রহণ করা চলে না—কেন না তাহলে মনুষ্য জীবন দেবানুগৃহীত না হয়ে অভিশপ্তই হয়ে উঠবে, হবে দানবের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

মানুষের বিশেষত্ব এই যে সে শুধু পশুর মত অন্ধ সংস্কার ও সংগ্রামের দ্বারাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয় নি—তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রজ্ঞা, ধী ও উদ্ভাবনী শক্তি। অনেক পশু মানুষ অপেক্ষা বলবান, কিন্তু মানুষ তাদের সকলের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। মানুষের এই শক্তির মূল বাহুবল নয়—প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞান, উদ্ভাবনী ও ধীশক্তির প্রভাবে সে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করতে পেরেছে, তাই সে শক্তিমান—উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে, সুখ সমৃদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতিসাধন করেছে। তার ধী-শক্তি গতানুগতিক অপরিবর্ত্তনীয় ধারা বয়ে অগ্রসর হয় নি। মাকড়শার জাতিগত সংস্কার তাকে শুধু জাল বুনতে শিখিয়েছে, পাখীর সংস্কার তাকে শিখিয়েছে বাসা বাঁধতে, কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান তাকে তার চিরাচরিত পথ থেকে টেনে এনে নূতন পথের সন্ধান দিয়ে চলেছে—কোথায় গঠনের পথ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইষ্টবৃদ্ধির পথ, বিশাল মানবতার পথ।

কিন্তু সুখস্বাচ্ছন্দ্য মানবতা নয়—বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রগুলি ধ্বংসের পথটিও এমন পরিষ্কার বাঁধিয়ে দিয়েছে ও কাজটি মানুষ শুধু নখদন্তের সাহায্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে কখনো পেরে উঠতো না। এ কথা সত্য, মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভার অপপ্রয়োগ করেছে অনেক ক্ষেত্রে—এবং সেই সম্ভাবনা ছিল বলেই ইহুদির ঈশ্বর একদিন তাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। মানুষ যে সে কথায় কর্ণপাত না করে যুগযুগান্তের অভিযান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে চালিয়ে এসেছে, এ তার এক মহান কীর্ত্তি। অধ্যাত্ম সম্পদ থেকে বঞ্চিত, বস্তুতন্ত্রের অবৈধ সন্তান এমনই সব বিতর্ক তুলে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে আমাদের একটা অন্ধ গলির মধ্যে প্রবেশ করা হয় মাত্র—মানবের জীবন-কথার মর্ম্ম, তার সভ্যতার স্বরূপ বোঝা যায় না। বস্তুতন্ত্র কি, আর বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কতখানি সে আলোচনা না করলেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ইহলোকে মানুষ চায় সুখ, শান্তি, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্তি, স্বাধীন জীবনযাপন ও মানসিক স্ফূর্ত্তি—এবং ঐ সব ইষ্ট-সাধনকল্পে বিজ্ঞানের দান অকিঞ্চিৎকর নয়, বরঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলতে হবে।

না জানি এ কেমন বিধিলিপি—বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে আজ রুদ্রবেশে, নটরাজরূপে। তার উদ্দাম তাণ্ডব দক্ষিণে বামে উর্দ্ধে অধোদেশে মৃত্যুর উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, নৃত্যের ছন্দে রাশি রাশি কঙ্কাল

অট্টহাসি করে উঠছে। নটরাজ কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়, সারা জগতের হলাহল আকণ্ঠ পান করে নিজে হলেন নীলকণ্ঠ, আর জগতকে করেছিলেন নির্বিষ। তেমনই এই প্রলয় নাচনের অবসানে বিশ্বের সমাজকে ও সভ্যতাকে কষিত কাঞ্চনের মত পরিশুদ্ধ দেখতে পাব, নবপ্রবর্ত্তিত বিধান সকল দ্বন্দ্ব বিরোধের অবসান করে মানুষকে সৌভ্রাতৃত্বের স্বেচ্ছাকৃত নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেবে—এরূপ আশা আমাদের মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সুখ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। জগতে যারা শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিচিত আজ হয়ত তারা বিগত মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির কথা ভুলে গেছেন—ভাবতেও পারছেন যে, ক্রূর প্রতিহিংসাকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে, অন্ধ প্রভুশক্তিকে যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হয়, যদি কোন বিশ্বজনীন উদার আদর্শের অনুপ্রেরণা জঘন্য আদিম প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে মহাজাতিগুলিকে তুলে ধরতে না পারে, তা হলে এই দ্বন্দ্বের ভৈরবী চক্র কখনো শেষ হবার নয়, ভবিষ্যতে যুদ্ধও একপ্রকার অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যুদ্ধ শুধু যুদ্ধমান দল বা মুষ্টিমেয় সৈন্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের নিষ্করুণ সর্ব্ব-ধ্বংসকারী আকার ধারণ করেছে। গত পঁচিশ বছর ধরে চিন্তাশীল মনীষিগণ—কি আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র, কি সমাজ ব্যবস্থা—সকল বিষয়ে জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ বা ত্যাগের ওপর ভিত্তি করে ন্যায়সঙ্গত উদার পন্থা অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির মত পণ্ড হয়ে গেছে। জনগণের অধিনায়ক যারা, যাদের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করে দেশের সর্ব্বসাধারণ সকল ভয় ভাবনা, গভীর চিন্তা থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি দিয়ে এসেছে, তাদের অদূরদর্শিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা উপর্য্যুপরি যুদ্ধের বীজ বপন করে মানব-সভ্যতাকে ক্রমাগত বিপন্ন করে তুলেছে। তাই আজ বিশ্বমানবের মনে এমনই পরিপ্রশ্ন জেগে উঠেছে: বিজ্ঞানের বজ্র কি সভ্যতার লঙ্কাদহনের জন্য চিরকাল ব্যবহৃত হবে? না, সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থার ফলে চিরন্তন বিরোধের মূলোচ্ছেদ করে মানুষ তার জীবনের আদর্শ সত্যকে বিচিত্র শোভায় পুষ্পিত করে দেবে?

বাঁচবার ইচ্ছা, শক্তিপ্রসারণের চেষ্টা প্রাণধর্ম্ম, কিন্তু মানুষের মধ্যে কতগুলি বিশিষ্ট গুণের বিকাশ হয়েছে যা মানবধর্ম্ম বলা চলে। সত্যের শিবের সুন্দরের আকর্ষণ ক্রমান্বয় মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার দিকে—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং—আধুনিক দার্শনিক যার ভিতর Theopsyche বা Dietyর পরিচয় পেয়েছেন। জীবন-দেবতার ঐ কল্পরূপ চিরদিন মানুষকে আদর্শের সন্ধান দিয়েছে—তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানবধর্ম্ম বা Theopsycheর এক মনোরম অভিব্যক্তি, সত্য শিব সুন্দরের বিচিত্র স্ফুরণ। এক হিসাবে এ কথা সত্য যে গণ-মন দেশ-কাল ভেদে পরিবেশের অনুরূপ বিভিন্ন চিন্তাধারার অনুকরণ করে এবং সেজন্য সংস্কৃতির বাহ্যরূপ বিভিন্নই দেখা যায়—কিন্তু ঐ ভেদ বিভেদগুলিকে জাতীয় সভ্যতার মূল প্রকৃতি বলে ধরে নিলে সঙ্কীর্ণ ভ্রমের মধ্যে পড়তে হয়, আর তাই থেকে যত অনর্থের সূত্রপাত। ইতিহাসের যে শিক্ষা সব চেয়ে উদার, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তা এই যে—সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বমানবের, ওর ওপর কোন জাতির একাধিপত্য নেই। বাইবেলে আছে—There is no new thing under the sun. Is there a thing whereof it may be said, Sir, this is new? It hath been long ago, in the ages which were before us. প্রাচীন সভ্যতাগুলির সামাজিক চিন্তার ধারা ও পদ্ধতির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে এমন লোকের কাছে এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য সহজে ধরা পড়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের উদ্যমে মিশরে যে-সব অমূল্য রত্ন উদ্ধার করা হয়েছে, তার মধ্যে 'মৃতের পুস্তক' (Book of Dead) অন্যতম—আমেন-এম-আপ্‌ট্ (Amen-em-Apt) ও টা-হটেপ (Ptah-hotep) যে সারগর্ভ নীতি-কথার অবতারণা করেছেন তা পড়লে আধুনিক ব্যক্তির মনেও অতিমাত্র বিস্ময় জেগে ওঠে। সুদূর অতীতে প্রাচীন মিশরে সেই যে সভ্যতার দীপ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, উত্তরকালে তা ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, পরে গ্রীসের হাতে এসে পড়েছিল এবং ঐ সভ্যতা পরিশেষে রোমক ও ইসলামিক সভ্যতারূপে পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষেও দেখতে পাই প্রাগ্-আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে আর্য্য সংস্কৃতির মিশ্রণ—এবং ইস্‌লামিক সভ্যতার সংস্পর্শে তার রূপান্তর। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই যে পরিবর্ত্তন এখানে ঘটেছে, তার প্রমাণ উর্দ্দু ভাষায়, কলা-শিল্পে, স্থাপত্যে ও সঙ্গীত-বিদ্যায় বিলক্ষণ পাওয়া যায়। ফলকথা সব দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাচীন সভ্যতা-সমূহের উত্তরাধিকারী। গ্রীসের Olympic খেলায় যেমন একজন বাহক ছুটে গিয়ে অন্য বাহককে হাতে মশাল তুলে দিত, সে দিত আবার সেটি অপরকে চালান করে, তেমনই সভ্যতার বর্ত্তিকা পর পর জাতিসমূহের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়েছে, প্রত্যেক জাতি ওর আধারে তেল ঢেলে বহ্নিশিখা অধিকতর সমুজ্জ্বল করেছে।

আমরা ভুল করি এই ভেবে যে সভ্যতা শুধু কতকগুলি আচার, বিচার, বেশভূষা, আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক রীতিপদ্ধতি—কিন্তু এগুলি তার বহিরাবরণ, অসার খোলস মাত্র। সভ্যতার সিংহাসন জ্ঞানের ভিত্তির ওপর মানবতার যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মনুষ্যত্ব নেই আছে দুর্নীতি, যেখানে অজ্ঞান জ্ঞানকে আবৃত করে বিদ্যমান, সভ্যতার প্রসার সেখানে সম্ভব নয়। বেশভূষা, ভাষা, ধর্ম্ম, সামাজিক আচারপদ্ধতি যত পৃথক হোক না কেন, একমাত্র মানবতার মিলনক্ষেত্রে জাতীয় সভ্যতাগুলির সমন্বয় ঘটতে পারে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে জাতিমাত্রই নিজের বিশিষ্ট সভ্যতা গর্ব্বে এমনই অন্ধ যে সকল সভ্যতার মধ্যে অনুবিদ্ধ একই সূত্রটি তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—বহমান নদীস্রোত থেকে জল তুলে এনে স্বতন্ত্র কুম্ভে ভরে রাখে সে তীর্থবারি, যেন ঐ কুম্ভগুলির বিচিত্র গঠনই একমাত্র সত্য, গঙ্গার পুণ্যোদক যে সব ঘটেই পবিত্র এই সহজ কথাটি তার মনেও জাগে না।

যুগযুগান্ত ধরে সভ্যতার প্রবাহ স্রোতস্বিনী নদীর মত অনবরত বয়ে চলেছে। ওর দুকূল প্লাবিনী বারিরাশি কত মাঠ, কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর অতিক্রম করে যেখানকার যা—কঙ্কর, বালু, কর্দ্দম, সব সংগ্রহ করে এগিয়েছে—সকলেই ওর বক্ষে তরী ভাসিয়েছে, দেখেছে ওর জলে

প্রতিফলিত চাঁদের ঝিকিমিকি, ভেবেছে ও তাদের নিজস্ব সম্পদ—আর উল্লাসভরে গান গেয়ে উঠেছে,

'এত স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় ।'

ক্ষুদ্র জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে সভ্যতাকে এমনি করে আটক করে মানুষ চিরদিন ঘোরতর অনিষ্ট বাধিয়ে এসেছে, ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় আমরা তার পরিচয় পাই। উন্নত সভ্যতা গর্ব্বে এক জাতি চায় অন্য জাতিকে পদানত করে রাখতে, তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে নিজেকে নানামতে সমৃদ্ধ করে তুলতে। ঐ সভ্যতার প্রেতমূর্ত্তি একদিন মানুষকে ক্রীতদাসরূপে হাটে বাজারে বিক্রয় করতেও লজ্জাবোধ করে নি। কিন্তু সত্য একদিন জাগ্রত হয়ে উঠলো—ঐ দাস-প্রথা বন্ধ করবার জন্য আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বেধেছিল, সে বেশী দিনের কথা নয়। তেমনই আজ যদি শৃঙ্খলিত মানবের মর্ম্মব্যথা সার্ব্বজনীন বিবেককে ঘা দিয়ে ঐ দুর্নীতির মুখোস উদ্‌ঘাটন করে, সর্ব্বজাতির সহযোগিতার ফলে সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ঘটে, তা হলে এই মহাযুদ্ধ অনাগত মানবের কাছে সত্যকার ধর্ম্মযুদ্ধরূপে দেখা দেবে। কেন না, যে সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধের নামে জাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে এসেছে, দুর্ব্বলের স্বাধীনতার ওপর সবলের হস্তক্ষেপ নির্ব্বিরোধে চলেছে, সাহচর্য্য ও সহযোগিতার স্থলে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব ভাগ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে—ঐ স্বার্থদুষ্ট অনিষ্টকর ব্যবস্থাগুলির আমূল পরিবর্ত্তন করে ন্যায়ানুগ নূতন বিধানের প্রতিষ্ঠা হবে মানব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পরিণতি, সভ্যতা বৃক্ষের অম্লান পারিজাত। সৌভাগ্যক্রমে আজ প্রচলিত রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির কুফল চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন—তাই মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কারণ বোধকরি তেমন নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটি ভুললে চলবে না যে মানুষ স্বভাবত রক্ষণপন্থী, সূচ্যগ্র মেদিনীও সে কখনো বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেয় নি এবং তার ঐ মূলগত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নেই।

দেশ-কাল ভেদে সংস্কৃতির রূপ যা-ই হোক, মানব-সভ্যতাকে বিশ্বজনীন করে তুলতে হলে কোন জাতিকে স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্বর্ণ বা লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ রাখলে চলে না—কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ প্রগাঢ় ও গভীর। সভ্যতার সম্যক স্ফূর্ত্তি স্বাধীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে, তেমনই পরাধীন জাতি বিশ্ব-সভ্যতার অন্তরায়রূপে জগতের সর্ব্বমুখী অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়ায়। দেশ কালের ব্যবধানকে হ্রাস করে পৃথিবী আজ গোষ্পদের মত ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে—জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ এখন জ্ঞাতিত্বেরই নামান্তর। আজ যদি ব্যোমচারী মঙ্গল গ্রহের কোন দিব্য অধিবাসী পৃথিবীর এই স্বার্থসম্ভূত জাতিবিরোধ, আত্মঘাতী ধ্বংসকাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করতেন, তাহলে তাঁর মনে হয়ত এই ভাব জেগে উঠতো যে, প্রবৃত্তির তাড়নায় এখানকার লোক শুধু বর্ত্তমান সুযোগ-সুবিধার অন্ধ দাসরূপে নিজেকে পশুভাবাপন্ন করে রেখেছে, অতীতের ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতা ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি কিছুই তার চোখে পড়ে নি—বিজ্ঞান বলে কালের ব্যবধানকে হ্রাস করেছে—সে কালের হাতে পরাজিত হবে বলে। মঙ্গলগ্রহের ঐ নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হয়ত আরও আশ্চর্য্য হত এই ভেবে যে মানুষ চায় জগৎ-শান্তির প্রতিষ্ঠা, অনাগত কালের ওপর আধিপত্য, যা শুধু সম্ভব বিশ্বমানবের মনে একাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠলে—কিন্তু সে তার মনের কল-কব্জাগুলিকে ঐ পরম উপলব্ধির উপযোগী করে গড়ে তুলতে এখনো পারে নি; পক্ষান্তরে কৌটিল্য দর্শনের কুটিল মতি-গতি তাকে জগৎশান্তির দিকে নয়, এক বিপদসঙ্কুল পর্ব্বতের ভৃগুস্থানে চোখ বেঁধে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। ইতিহাস বার বার পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে যে শক্তিলিপ্সা, পরাধীন জাতির ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখবার প্রবৃত্তি বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, কিন্তু এ সত্ত্বেও উদার সহনশীলতা, সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির শোচনীয় অভাব-হেতু বলদৃপ্ত জাতিগুলি শোষণনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে হাবুডুবু খেয়ে মরেছে—তাতে দুর্ব্বল জাতিগুলির ওপর নিষ্পেষণ ও নির্য্যাতন বেড়ে চলেছে যেমন, ঠিক সেই পরিমাণে বিশ্ব-সভ্যতাকেও বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। সকল জাতির নীতিধর্ম্মে আছে ব্যক্তিজীবনের একটি মহৎ আদর্শ—ত্যাগ, পরার্থপরতা, সমগ্রের জন্য ব্যষ্টির ক্ষতি স্বীকার। জাতির সঙ্কীর্ণ সীমামধ্যে ঐ নীতির সার্থকতা মেনে নিয়ে যদি বা বলা হয়, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" —পররাষ্ট্রক্ষেত্রে কিন্তু ঐরূপ কোন উদার মহানুভবতার ছায়াটুকুও পড়ে নি, বরঞ্চ দস্যুতা, পরস্বাপহরণ, ছল. কপটতা, মিথ্যাচার প্রভৃতি নীতি-বিগর্হিত কার্য্যগুলি রাজনৈতিক যাদুদণ্ডের স্পর্শে দেশ-প্রেমের মায়ামৃগে রূপান্তরিত হয়েছে—নব জাগরিত জাতিগুলিকে যা নিরন্তর প্রলুব্ধ করেছে এক ভ্রান্ত আদর্শের অনুসরণ করতে। এই বিস্ময়কর নির্বুদ্ধিতার কারণ খুঁজতে হয়ত অধিক দূর যেতে হবে না, এটুকু বললে যথেষ্ট হবে, আন্তর্জাতিক বিশ্বস্বার্থের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলবার মত, ওর মধ্যে জাতীয় স্বার্থকে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বমানবকে পূর্ণতর করে তুলবার মত ত্যাগ-বুদ্ধি শক্তির উপাসক, পরস্বলোলুপ, অর্থগৃধ্নু জাতিগুলির মনে এখনো দেখা দেয় নি—যদিও এ এক পরম সত্য যে নীতিধর্ম্মে যাকে বলা হয় ত্যাগ, রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাই হয়ে ওঠে বুদ্ধি-দীপ্ত স্বার্থ—**Enlightened self interest**—কেন না, কালের আবর্ত্তনে পরার্থপরতা অনুকূল স্বার্থে পরিণত হয় আশ্চর্য্যরূপে।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি গুটিপোকার মত নিজের চারিধারে জাল বুনে আপন ফাঁদে আটকে গেছে, শুধু তা কেটে বেরিয়ে এলেই সমস্যার সমাধান হবে না—সুতোগুলির জট ছাড়িয়ে শিল্পীর নিপুণ হস্তে বোনা রেশমী কাপড়ের ওপর বিচিত্র নমুনা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই মহান্ আদর্শ—জাতির ও বিশ্বসমাজের যুগপৎ হিতসাধন—কার্য্যকরী হতে পারে শুধু জাতিগুলির পরস্পর সাহচর্য্য ও সহযোগিতার ফলে এবং আমাদের ঐ সমবেত চেষ্টায় হয়ত জগতে একদিন বিভিন্ন সংস্কৃতির মনোরম উদ্যান রচিত হয়ে উঠবে। হয়ত এ স্বপ্ন, হয়ত বা মায়া—বা হয় মতিভ্রম। কিন্তু তবু বলবো বিশ্ব-সভ্যতাকে মহাযুদ্ধের ধ্বংস-স্তূপ

থেকে উদ্ধার করে প্রগতির সোপানে চড়িয়ে দিতে হলে, পৃথিবী ও বিশ্ব-মানবের একত্ব—Wendoll Wilkie যা তার O..e World বই-এতে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন—জগতের অখণ্ড সমগ্রতাকে সকল রাষ্ট্রিক আচার ব্যবহার, ধ্যানধারণা ও কার্য্যকলাপের মধ্যে পরম সত্যরূপে গ্রহণ না করে মানুষের উপায় নেই। তাই আজ পৃথিবীতে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের—যা মানব-সভ্যতার প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে। ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মনুষ্য জাতির সর্ব্ববিধ সঙ্গত স্বাধীনতা রক্ষা করা—চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা, অভাব-মুক্তির স্বাধীনতা, ধর্ম্মের স্বাধীনতা, দেশ-শাসনের স্বাধীনতা। অধুনা-লুপ্ত জাতি-সংঘ—League of Nations-এর মত ঐ প্রতিষ্ঠান যদি কতিপয় পরাক্রান্ত জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় মাত্র হয়ে ওঠে, তাহলে ওর কোন সার্থকতা থাকবে না, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় এ শিক্ষা আমাদের হয়ে গেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যেমন রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে খর্ব্ব হতে হয়, তেমনই বিভিন্ন জাতিগুলি যখন রাষ্ট্র-স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক বিধানের মধ্যে সংযত করে রাখবে, যখন দুর্ব্বল সবল, কৃষ্ণ শ্বেত পীত সকল জাতির পরস্পরের মধ্যে স্বার্থমূলক বিরোধের মীমাংসার ভার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত হবে, যখন জাতি-চেতনা মহা-জাতি চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে বিশ্ব-সভ্যতার প্রতিভূরূপী মহাজাতিসংঘকে কর্ত্তৃত্ব বলে শক্তিমান করে তুলবে—তখন হবে জাতীয় বিরোধের অবসান, সর্ব্বদেশের সর্ব্বমানবের শ্রীবৃদ্ধি।

বিশ্বসভ্যতা আজ এক কঠিন পরীক্ষাস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে পারবে কি না—এ সেই অগ্নি-পরীক্ষা। ভাগ্য-বিধাতা জগতকে কোন পথে পরিচালিত করবেন জানি না, কিন্তু পথ-নির্দ্দেশ দেবার ভার যাদের ওপর, সেই সব রাজনৈতিক কর্ণধারগণকে বিশেষভাবে সতর্ক করবার দিন এসেছে। এতকাল তারা শুধু জাতীয় স্বার্থকে পণ করে অক্ষক্রীড়া চালিয়েছেন, সমগ্রভাবে বিশ্বের কল্যাণ ছিল তাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত—নিজেদের ও জগৎকে প্রতারিত করেছেন তারা এই মনে করে যে, বিশ্বমানবের ঊর্দ্ধে জাতীয় জয়ধ্বজা তুলে ধরা প্রকৃত বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়। তাদের ঐ মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন যদি আজও ঘটে না থাকে, তাহলে জগতের ভাবী অধিবাসীগণকে এর জন্য এক অসম্ভব রকম বৃহৎ মূল্য দান করতে হবে—এমন কি সমগ্র বিশ্ব সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। তাই এই মহা দুর্য্যোগে, ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দরিয়ায় বিশ্ব-যাত্রী-বাহী নৌকাখানি যাতে বানচাল হয়ে না যায়, সে-জন্য সর্ব্বদেশবাসীকে সজাগ থাকতে হবে, রাজনীতির মোহজাল কাটিয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিতে হবে—কাণ্ডারী হুসিয়ার !

"দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার !
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, কার আছে হিম্মত ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।"

রণতাণ্ডব

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

উন্মাদ যুদ্ধের নর্ত্তনে আজ
উদ্দাম পশ্চিমে দৈত্যের সাজ।
দুর্দ্দম লোভী যেন ব্যাঘ্র ভয়াল
ক্ষুধাতুর মেলিয়াছে দংষ্ট্রা করাল।
কম্পিত ধরণীর শঙ্কিত বুক ;
নির্দ্দয় নরে তার চূর্ণিছে সুখ।
বহ্নির লেলিহান ধ্বংস-শিখায়
ভস্ম যে গৃহদ্বার শ্মশানের প্রায়।
স্বার্থ ও বিত্তের রাক্ষসী রূপ
শান্তি ও সত্যেরে করে নিশ্চুপ।
ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ সে সৈন্যের দল
হত্যায় রক্তিম করে ধরাতল।

পিষ্টা সে মাতা কাঁদে ক্লিষ্টা অশেষ ;
ক্রন্দন করে শিশু ভরি' নভদেশ।
ভগ্ন-ভবন কত শান্ত সুজন
ভিক্ষুক প্রায় করে অশ্রুমোচন।

লুপ্ত রে কৃষ্টির চিত্র শোভন।
ধূল্যবলুণ্ঠিত বিদ্যায়তন।
দীর্ণ ও জীর্ণ রে মন্দির, মঠ ;
তৃপ্তি কোথায় ওরে কোথা ছায়া-বট ?

আর্ত্তের কে দূরিবে দুঃখ ও শোক ?
প্রাণ যায়, গুঁড়া হয়, মর্ত্ত্যের লোক।

প্রেম কই, কৃপা কই, কল্যাণ নাই।
মিত্র সে শত্রু যে, নাহি জ্ঞাতি, ভাই।
প্রীতিস্নেহ লোপ, বন্ধুর লোপ,
হিংসার অগ্নি ও জ্বলে শুধু কোপ।

বিশ্বের স্রষ্টার সৃষ্টিতে আজ
দুঃশীল-নরে ছোঁড়ে ধ্বংসের বাজ।
জাগ্রত হও—আজি সত্যস্বরূপ !
ন্যায়ধাতা জাগো ওগো বিশ্বের ভূপ !

মঙ্গল দাও, ওগো, শান্তি অভয়।
শক্তির জয় নয়, সত্যের জয়॥

দেহ ও দেহাতীত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

অমল স্টেসনে নামিবার কিছু পরেই সূর্য্যোদয় হইল। এখান হইতে চার মাইল দূরে—তিনটি মাঠ অতিক্রম করিয়া তবে তাহার বাড়ী। সোজা রাস্তা গিয়াছে, তিন মাইল—মাঠের ভিতর দিয়া একটু রাস্তা সংক্ষেপ করা যাইতে পারে—

স্যুটকেশটাকে হাতে ঝুলাইয়া সে রওনা দিল—

রাস্তার দু'ধারে গ্রাম, তাহাতে সবে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, রাস্তার উপর ক্ষুধার্ত্ত ঘুঘু ও শালিক খাদ্য অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘাসের উপর রাত্রির সঞ্চিত শিশির তখনও শুকায় নাই—কৃষক গৃহের বধূগণ উঠান ঝাট্‌ দিতে দিতে সলজ্জ কৌতূহলী দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিতেছে। অমল কোনদিকে না চাহিয়াই চলিয়াছে—

দুঃসংবাদকে মনে মনে সে বড় করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিমর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—যদি বাড়ী যাইয়া দেখে সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে? অমল আর ভাবিতে পারে না, চোখ দুইটি ঝাপসা হইয়া যায়। পথ চলিতে চলিতে হোঁচোট খায়।

রাস্তা ছাড়িয়া অমল মাঠের সোজা পথ ধরিল—গ্রামের সামনেই দেখা যায় আম বাগান। তাহার ফাঁকে তাহাদের পৈতৃক দালানের এক অংশ দেখা যায়। আম বাগানের পথের উপরে পা দিতেই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল যাইয়া কি দেখিবে কে জানে। স্বল্পান্ধকার ঘরে তাঁহার জীর্ণদেহের পঞ্জরে কি এখনও হৃদপিণ্ডটি ধুকধুক করিয়া চলিতেছে।

সদর উঠানে পা দিয়া অমল দেখিল বৈশাখের কাঠফাটা রৌদ্রে উঠানের মাটি চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। অমল শঙ্কিত হইল, এই বিদীর্ণ পাষাণ মৃত্তিকা ভবিষ্যতের কোন অমঙ্গল সূচিত করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে!

দালানের সামনে একটি রক। ভিতরের উঠানে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, তাহার মা বালিশ হেলান দিয়া সেখানে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া অমল ভাবিল, যাহা হউক মা বাঁচিয়া আছেন।

স্যুটকেশটাকে ফেলিয়া, সে মায়ের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—কেমন আছ মা!

মাতা চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—কি অমল, তুই চলে এলি যে!

—আস্‌বো না, কেমন আছ?

—ভালই, আজ ভাত খেতে বলেছে কিন্তু আজ ত একাদশী; কাল খাবো—এই দ্যাখ বাবা অসুখ হ'লে এই জন্যেই লিখি না।

—কে জল দেয়, পথ্যি দেয় বল, না এসে পারি কেমন ক'রে?

—আমার পথ্যি আর অষুধ দিতে ভগবান আছেন, তোর ভাবনা কি? রাত্রিতে ত ঘুম হয় নি এখন চা খাবি ত?—দাঁড়া।

অমল মাতার দেহটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সে কি, তুমি উঠ্‌বে নাকি?

—না, না। না উঠ্‌লে খাবি কি ক'রে?

—সে কি! দশ বার দিন রোগের পর মানুষ উঠ্‌তে পারে নাকি! আমি তৈরী ক'রছি, তুমি ব'সো—

অমল কাপড় জামা ছাড়িয়া, প্যাকাটি দিয়া উনান ধরাইয়া একটি কড়ায় জল তুলিয়া চা তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গেল। মা প্রশ্ন করিলেন—দুধ কোথায়?

—দাঁড়াও জোগাড় করি। অমল বাটি চিনি চা প্রভৃতি গোছাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখে কে একটি মেয়ে মায়ের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—কৈশোর পার হইয়া সবে যৌবনে পদার্পণ করিতে পা বাড়াইয়াছে—বৈশাখের নূতন পাতার মত সজীব সুন্দর। সমস্ত মুখে গ্রামের সরলতা, স্বাস্থ্যের লালিত্য। খুব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নহে, তবুও গৌর। বয়সের ধর্ম্মে, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে বর্ণ কমনীয়, সুন্দর—সমস্ত দেহ নিটোল মর্ম্মর মূর্ত্তির মত মসৃণ, সুগঠিত। সপ্রতিভ সকৌতুক দৃষ্টিতে তাহার পানে একবার চাহিয়া মাতার আদেশ শুনিতে লাগিল। মা বলিলেন—একটু দুধ এনে দিতে পারিস্‌ অমলকে?—গৌরী।

গৌরী চলিয়া গেল, অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমন ও চলন-ছন্দ দেখিতেছিল—অপর্ণার চলন আভিজাত্যপূর্ণ, এর চলিবার ভঙ্গি সাবলীল, চঞ্চল।

দুধের অপেক্ষা না রাখিয়াই অমল, তিক্ত চা একটু একটু পান করিতেছিল। গৌরী দুধ আনিয়া তাহার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল। অমল দুধ মিশ্রিত চা লইয়া মায়ের নিকট আসিয়া বসিল—কৌতূহল হইয়াছিল, গ্রামের মেয়েকে সে চিনিল না ইহা কি সম্ভব!

গৌরী দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। মা বলিতেছিলেন—গৌরীকে চিনিস্‌? ওই মুখুজ্জে বাড়ীর ছোটঠাকুরপো, মহেশ,

তার মেয়ে। পোষ্টাফিসে চাকুরী করতো কখনও ত বাড়ী আসে নি, এখন পেনসন নিয়ে বাড়ী এসে বসেছে—তার মেয়ে। ওরা ত এ গাঁয়ে আসে নি কখনও, চিনবি কি ক'রে! ওই আমাকে বাঁচিয়েছে, পথ্যি দেওয়া, জল দেওয়া সব করেছে, একটিবারও উঠ্‌তে দেয়নি। এই সকালে এসে বিছানা ক'রে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন—ওর গুণ আর শোধ দিতে পারবো না—

অমল মনে মনে কৃতজ্ঞ হইল। তাহার নিরুপায় অসহায় রুগ্না মাতাকে যে এমনি অযাচিতভাবে সেবা যত্ন করিয়াছে তাহাকে মনে মনে অমল কৃতজ্ঞতাই জানাইল। তাহার দান ভুলিবার নহে—কিছু বলিবে ভাবিয়া দরজার পানে চাহিল কিন্তু পূর্ব্বে যে শাড়ীর আঁচলটা দেখা যাইতেছিল এখন আর তাহা দেখা যায় না। গৌরী হয়ত চলিয়া গিয়াছে—

মা প্রশ্ন করিলেন—তুই খাবি কোথায়?

—কোথায় আবার খাব? বাড়ীতে—আমি বেঁধে নেব যা হয়।

—তুই কি পারবি? কোনদিন—

—কেন, সেবার তোমার অসুখের সময়ত রেঁধে খেয়েছি—তুমি ভেব না। এখন ঘরে কিছু আছে, না বাজার ক'রবো সেইটে দেখি। কিন্তু আজ কি তুমি কিছুই খাবে না, একটু মিছরির সরবৎ, কি—

—ছিঃ, ও কথা ব'ল্‌তে নেই। আজ যে একাদশী। কাল পথ্যি ক'রবো, একদিনে কি হবে?

অমল জানে কোন মতেই মাকে কিছু খাওয়ানো যাইবে না। বৃথা চেষ্টা না করিয়া সে ঘর দোর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল।

দুপুর বেলায় ক্লান্ত দেহেই সে মায়ের বোগ্‌নোয় করিয়া আলো চাল ও কিছু আলু বেগুন সিদ্ধ করিবার জন্য উঠাইয়া দিল। মা'কে সযত্নে সে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছে, মা হয়ত একটু বিশ্রাম করিতেছেন। উনানের সামনে বসিয়া অমল নানা কথা ভাবিতেছিল—

অমল আপন মনেই হাসিল,—এই তাহার গৃহ, এই তাহার সমাজ, এই জীর্ণ বাড়ী খানার সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের অত্যাচার শত চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার মাঝে ওই অপর্ণার উপস্থিতি ও স্থিতি কেবলমাত্র বেমানানই নয়, হাস্যকরও। অপর্ণা যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও আসে তবে ইহার মধ্যে তাহার স্থান কোথায়? আপনার অসংযত কল্পনা ও বিশৃঙ্খল লুব্ধ প্রকৃতির কথা ভাবিয়া সে আপন মনেই বার বার হাসিতেছিল।

কাঠের উনুন নিভিয়া ধোঁয়া উঠিতেছিল। অমল পুনরায় কিছু কাঠ ও কুটা দিয়া, বহু ফুঁ দিয়া ধরাইয়া দিল।

পাড়ার চক্রবর্ত্তী বাড়ীর খুড়িমা ঝঙ্কার দিয়া অমলের মাতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—দিদি, একবেলা কি আমি অমলের ভাত দিতে পারতুম না। অমল হাত পুড়িয়ে খাচ্ছে, সে কি?

মা যেন কি একটা জবাব দিলেন বোঝা গেল না। অমল বলিল—এতে আর কষ্ট কি খুড়ীমা!

—ওমা, পুরুষ ছেলে কি ওই পারে? আচ্ছা দাঁড়া, আমি তরকারি ডাল দিয়ে যাবো'খন।

খুড়ীমা ঘাটে চলিয়া গেলেন। অমল ভাত টিপিয়া দেখিল বেশ নরম হইয়াছে—অর্থাৎ সিদ্ধ হইয়াছে। অমল বেড়ী দিয়া বোগ্‌নো নামাইয়া ফেলিল কিন্তু সরা নাই; কিরূপে এই ভাত হইতে ফেন নিষ্কাষিত করিতে পারা যায় তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হাঁড়িতে সে দু' একবার রাঁধিয়াছে তাহার ফেন নিষ্কাষণ পদ্ধতি সে জানিত, কিন্তু এই বোগ্‌নো হইতে কিরূপে ফেন নির্গত করা সম্ভব। ক্যাজামিয়াঁর রারিকেটের ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে এ সমস্যার সমাধান নাই, নিউটনের ক্যালকুলাসেও নাই। অমল বেড়ীর সাহায্যে একবার এ কাত, আর একবার ও কাত করিয়া দেখিল কিন্তু উত্তপ্ত পাত্র হইতে হয় সবই পড়ে, না হয় কিছুই পড়ে না। অমল একটা সরা লইয়া আসিবে স্থির করিয়া উঠিতে যাইতেছে হঠাৎ দেখে গৌরী একটা খুঁটি হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে—

অমল বিস্মিত লজ্জিত দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া থাকিতেই গৌরী বলিল—আপনি পারবেন না, আমি মাড় গেলে দিচ্ছি।

অমল সাহায্য গ্রহণ করাকে সম্ভবতঃ অপৌরুষেয় মনে করিয়া বলিল—না, আমি পারবো, একটা সরা, না হয় বাটি নিয়ে আসি।

গৌরী প্রতিবাদ করিল—বাটি, সরা কিছুই লাগবে না। সরুন্—

মা প্রশ্ন করিলেন—কি হ'ল রে গৌরী।

গৌরী জানাইল যে সে ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পাত্রের ভাত গুলির দিকে চাহিয়া একটু সকৌতুক হাসির সহিত বলিল—ভাত ত সিদ্ধই হয় নি।

অমল পুনরায় অপ্রস্তত হইয়া বলিল—হ'য়েছে, টিপে দেখেছি—

গৌরী আর একবার হাসিয়া উঠিল—অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক এই হাসিটুকু অমলকে যেন এক মুহূর্ত্তে অপ্রস্তত করিয়া দিল। অমল পুনরায় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল···হাসছো যে!

—ভাত সিদ্ধ হয় নি।

—না, হয় নি, দেখলাম এত ক'রে।

—কিছুতেই সিদ্ধ হয়নি। কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গৌরী একটা ভাত পরীক্ষা করিয়া বেড়ীর সাহায্যে বোগ্‌নোটা পুনরায় উনুনের উপর চাপাইয়া দিল। অমল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কেবলমাত্র উত্তপ্ত সফেন ভাতই নয়, গৌরীর কৌতুক-উজ্জ্বল কমনীয় সরল মুখখানি। গৌরী অমলের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার কাজ নয়, যান্ জেঠিমার কাছে।

অমল অত্যন্ত অপ্রতিভের মত এক পায়ে দুই পায়ে মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিল। অপর্ণা ও রমলাকে সে কথার জালে জড়াইয়া তিরস্কার করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্তু কোনদিন এমনি করিয়া পরাজিত হয় নাই—দ্বিধায়, নিজের অক্ষমতায় এমনি অপ্রস্তুত সে কোনদিন হয় নাই অথচ এই ছোট গ্রাম্য মেয়েটি তাহাকে এক নিমেষে অপদার্থ প্রমাণ করিয়া দিল। নিজের অক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও মানুষ অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয় না, অমলও হইল না বরং মনে মনে এই চঞ্চল মেয়েটির সাবলীল ব্যবহারকে সে সাধুবাদ দিল।

অমলকে দেখিয়া মা বলিলেন—গৌরীই নামিয়ে দেবে, আমার জন্মে এতই ত ক'রেছে; একটু রেঁধে দেওয়া তাও সে পারবে। আর জন্মে নিশ্চয়ই ও আমার কেউ ছিল। নইলে এমনি ক'রে না ব'লতেই ও আমার জন্মে এত করবে কেন? কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল, ক্ষণিক পরে বলিলেন,—ওর বাবা ত দু'পয়সা ক'রেছে, আমরা গরীব, আমার ক'রে এ যত্নআত্তি ক'রতে ও আসবে কেন—ওর বাপ মাও কিছু বলে না, বরং দুবেলা খোঁজ নিতে পাঠায়।

অমল মনে মনে মাতার সাশ্রু নেত্রের নিষ্প্রভ অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইল—যদি কোন দিন সুযোগ আসে তবে সে ইহার প্রতিদান অবশ্যই দিবে।

কিছুক্ষণ পরে গৌরী আসিয়া জানাইল ভাত হইয়া গিয়াছে। অমল বাহির হইয়া দেখে—সমস্তই প্রস্তুত বেগুন ভাতে, আলু ভাতে মাখা, খুড়িমা তরকারী ডাল দিয়া গিয়াছেন, এমন কি মুখ ধুইবার জল পর্য্যন্ত। অমল এতখানি প্রত্যাশা করে নাই, গৌরীর উদ্দেশ্যে বলিল—এত কি দরকার ছিল? এ সব আমিই ক'রতুম—

গৌরী আবার একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, নমুনা ত দেখলাম।

—আলু বেগুন মাখ্‌তে পারতুম না।

—না, মুনে পুড়তো। সবাই কি সব পারে! গৌরী পুনরায় হাসিল।

এই হাসি ও ব্যঙ্গ গ্রামের একটি মেয়ের পক্ষে প্রগল্‌ভতা। সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে একথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু [illegible] হাসি কোন প্রগল্‌ভতা নয়। হাসিলেই গালে টোল দেখা যায় তাই মনে হয় ও সর্ব্বদাই হাসিতেছে—অমল এই ব্যঙ্গ ও প্রগল্‌ভতাকে অন্ততঃ অশোভন মনে করিল না।

ক্ষুধার্ত্ত অমল যাহা খাইতেছিল তাহাই অতি সুস্বাদযুক্ত মনে হইতেছিল তবুও ওই মেয়েটিকে জব্দ করিবার জন্মেই বলিল—এ আলু ভাতে ত মুনে পুড়েছে।

—কখখ্‌নও নয়।

—নিশ্চয়ই—আমি খাচ্ছি আর তুমি বল্‌বে মুনে পোড়েনি। পুড়েছে—

—মিথ্যাকথা। ওটুকু আন্দাজ আমার আছে।

—মিথ্যাকথা!

—হুঁ। যতই বলেন, আপনার চেয়ে ভাল রাঁধতে পারি। কথাগুলি অতি দ্রুত উচ্চারণ করিয়া সে ততোধিক দ্রুতপায়ে দালানে গিয়া উঠিল। অমল তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল—নারীসুলভ মন্থরগতির ছন্দ আজও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, কৈশোরের চঞ্চলতা অতিক্রান্ত-কৈশোরেও রহিয়া গিয়াছে।

আহারান্তে অমল ভাবিতেছিল—এঁটো থালা বাসন কি হইবে, সে উচ্ছিষ্ট কুড়াইতেছিল। ভাবিল এ কাজটি অবশ্যই তাহাকে করিতে হইবে, কিন্তু গৃহ হইতে ক্ষীণকণ্ঠে মাতা বলিলেন—ও রেখে যা অমল।

মা যেরূপভাবে শুইয়া আছেন তাহাতে অমলকে দেখা সম্ভব নয়, গৌরী নিশ্চয়ই তাহাকে বলিয়াছে। অমল তবুও বলিল—না পারবো মা, এ আমি খুব পারি—

গৌরী আবার আসিয়া বলিল—থাক্ হ'য়েছে। ওতে এঁটো লেগে থাক্‌বে যে!

অমলের মনে মনে রাগ হইয়াছিল, বার বার এই মেয়েটি তাহাকে অপদার্থ প্রমাণ করিবেই। অমল গম্ভীরভাবে বলিল—থাক্‌বে না।

থালা বাটি গোছাইয়া প্রস্তুত হইতেই গৌরী বোগ্‌নোটা দেখাইয়া বলিল—ওটার কি হবে।

অমল সদর্পে সেটাকেও থালার উপর উঠাইয়া লইল। গৌরী এবার একান্তই অশোভন ভাবে হাসিয়া বলিল—ওটা মাজতে তেঁতুল লাগে যে। তাই জানেন না তার—

—তেঁতুল আন্‌ছি।

—দু' হাতই ত এঁটো, তেঁতুল আন্‌বেন কি ক'রে! সব যে এঁটো হ'য়ে যাবে?

অমল পরাজিত হইয়া একান্ত হতাশার সুরে বলিল—তবে কি হবে!

গৌরী একটু হাসিতে অমলকে একেবারে পরাজিত করিয়া দিয়া সাজানো বাসন লইয়া ঘাটে চলিয়া গেল। অমল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া দেখিল,—এই মেয়েটি যে বার বার তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া দিয়াছে তবুও সে দুঃখিত হয় নাই কেন।

মায়ের ঘরে বসিয়া অমল প্রশ্ন করিতেছিল—তুমি কাল কি দিয়ে ভাত খাবে?

মা কিছুই বলেন না, বারবার কেবল বলেন—আমাদের আবার কি লাগ্‌বে। অবশেষে অমলের জিদে বলিলেন—বেতাগের ঝোল ও হিঞ্চে শাক ভাতে তিনি পছন্দ করেন।

অমল বেলা পড়িতেই দাও লইয়া বাহির হইয়া পড়িল—বেতাগ সংগ্রহ করা কঠিন হইল না কিন্তু পাঁচটি এঁদো পুকুর ঘুরিয়া কোনমতে কিছু হিঞ্চে শাক জোগাড় করিয়া হৃষ্ট মনেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বারান্দায় সেগুলিকে নামাইয়া রাখিয়া সে সগর্ব্বে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মা কাল আমি তোমার রান্না ক'রে দেব। কেমন?

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, গৃহের মধ্যে অন্ধকার বেশ ঘনীভূত। সেই অন্ধকার হইতে গৌরী টিপ্পনী করিল—আজকার মত আ-সিদ্ধ ভাত ত?

মা ব্যস্ততার সঙ্গে বলিলেন—ভাত কি সিদ্ধ হয়নি রে অমল।

—হুঁ হয়েছিল মা।

ম্যাচ জ্বালাইয়া লণ্ঠন ধরাইতে ধরাইতে গৌরী বলিল—না জেঠিমা, একেবারে কাঁচা চাল, আমি শেষে সিদ্ধ ক'রে দি। ফেন গাল্‌তে ত ভেবেই অস্থির—

মাতা তাহার রুগ্ন মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া বলিলেন—ও কি রেঁধেছে যে পারবে—

গৌরী মুখ টিপিয়া বলিল—সে কথা স্বীকার ক'রলেই ত হয়।

অমল ছেলেমানুষের মত বলিয়া উঠিল—ও মেয়েলি কাজ কে না পারে!

—তাই ত ছিষ্টি এঁটো হচ্ছিল আর কি?

ঘরের কোণে অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ একটি জীর্ণ টেবিল ছিল। গৌরী তাহার উপর লণ্ঠনটা রাখিয়া দিল। অমল প্রশ্ন করিল—শোবো কোন খাটে মা?

গৌরী আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওখানে।

ঘরের বিপরীত দিকে আর একটি খাট ছিল, তাহার উপর শয্যা রচনা করা হইয়া গিয়াছে। অমল দেখিয়া বিস্মিত হইল। মাতা প্রশ্ন করিলেন—রাত্রে কি খাবি?

—খিদে নেই, কিছু খাবো না।

গৌরী চট্ করিয়া উত্তর দিল—রাঁধার ভয়ে জেঠিমা। মা বলেছে আমাদের বাড়ীতে খেতে।

মা প্রশ্ন করিলেন—তোর মা জানে?

—হ্যাঁ, আমি ব'লগুম দুপুরের কাহিনী, মা ব'ললে কেন খেতে বল্‌লি নি এখানে—

অমল 'কাহিনী' কথাটা ব্যবহারে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সে গৌরীকে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—এবার মার চিঠি কি তোমার লেখা!

মা জবাব দিলেন—হ্যাঁ, ওই লিখেছে। অসুখের কথা লিখতে বারণ করলুম তা শুনলে না।

—তুমি কতদূর পড়েছ?

গৌরী একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল—কতদূর আবার?

মা বলিলেন—ইস্কুলেই ত পড়েছে, পাঁচ বছর, তার পর বাড়ীতে এসে পড়া বন্ধ হ'য়ে গেছে—কোন্ ক্লাস ত মা?

—ক্লাস সেভেন। জেঠিমা রাত্রি হ'য়ে গেছে, যাই। রাত্রে ডাকতে আস্‌বো?

মা বলিলেন—না আমিই পাঠিয়ে দেব. আবার ডাক্‌তে লাগবে কেন?

গৌরী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে অমল মৃদু লণ্ঠনের আলোকে বসিয়া পত্র লিখিতেছিল—

অপর্ণা যখন মায়ের কুশল সংবাদ স্বেচ্ছায় জানিতে চাহিয়াছে তখন তাহাকে জানানই উচিত। অপর্ণা এ ব্যস্ততা না দেখাইলেও পারিত; তাহার মায়ের মত কত দুঃস্থ দরিদ্র শীর্ণ রুগ্ন মাতা অসহায় অবস্থায় রোগ শয্যায় কাটায় সে কথা ভাবিবার বা জানিবার অবসর ও ইচ্ছা তাহার না থাকাই সম্ভব। সে ধনী কন্যা, শিক্ষা-গর্ব্বে উদ্ধত ও সহানুভূতিহীন হইলেও অশোভন হইত না. কিন্তু তাহার সাহচর্য্যই তাহাকে এই সমবেদনা জানাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ভাষাকে যথেষ্ট সংযত রাখিয়া সে পত্র লিখিয়া ফেলিল। পরিশেষে কেবলমাত্র শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাইয়াই শেষ করিল।

মা প্রশ্ন করিলেন—কি করিস্—অমল?

অমল বলিল—পত্র লিখ্‌ছি ওখানে বন্ধুবান্ধব সকলে তোমার অসুখের জন্য ব্যস্ত আছে, তাদের জানাচ্ছি।

মা ক্ষীণ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—আমার জন্যে? সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়া থাকিবেন—যে দিন অকস্মাৎ বৈধব্য তাহার আশা

আকাঙ্ক্ষাকে নির্মম ভাবে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল সেই দিন হইতে অমল বড়-না-হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তাহার জন্যে ব্যস্ততা প্রকাশ করে নাই, আজ যদি অমলের বন্ধুরা করিয়া থাকে তবে সে তাহার ভাগ্য। অমলের যদি বন্ধু জুটে তবে সে ও ভাগ্য। মাতা প্রশ্ন করিলেন,—যার কাছে পত্র লিখ্‌লি তার নাম কি ?

অমল মিথ্যা কথা বলিতে পারিল না। মিথ্যা কথা সে প্রয়োজন হইলে বলে, কিন্তু মায়ের সামনে বসিয়া মুখোমুখি মিথ্যা কথা বলা তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। সে বলিল—অপর্ণা রায়—

—মেয়ে ?

—হ্যাঁ, খুব বড় লোকের মেয়ে, আমার সঙ্গে পড়ে। সে নিজেই আলাপ ক'রলে, তাদের বাড়ীতে নিয়ে তার বাবা মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

মা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিলেন—আমরা গরীব তা তিনি জানেন ?

'তিনি জানেন' কথাটা মায়ের মুখে শুনিয়া অমল ব্যথিত হইল—এই সমীহ বিশেষতঃ তাহার মায়ের মুখে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হইল—বার বার কাণের কাছে ওই কথা দুইটি প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাকে যেন বলিতে লাগিল—তোমার দারিদ্র্য ও অক্ষমতা তুমি ভুলিলেও আমি ভুলি নাই—

অমল বলিল—সম্ভবতঃ না।

মা বলিলেন—নিজের অবস্থার কথা গোপন করা পাপ। এবার যেয়ে সব বলবি—

অমল ব্যথিত চিত্তে ভাবিয়া চলিল—আজ যদি সে ভাল ভাবে পাশ করিয়া অন্ততঃ একটা প্রফেসারীও পায় তবে কি অপর্ণাকে লইয়া এই দৈন্যাহত মাকে লইয়া গৃহরচনা করা যায় না। অপর্ণা কি অন্তর হইতে ঐশ্বর্য্যকে বেশী ভালবাসিবে ? অপর্ণার মধ্যে এই মানসিক সংকীর্ণতা সে ভাবিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

মরণের ঠিক পরে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কথা-নাট্য

[স্থান—কলিকাতা। কাল—১৯৪৫ খৃঃ অঃ]

খাটের উপরে এক বৃদ্ধ অন্তিম শয্যায় শায়িত ; ঘর ভরা লোক। বৃদ্ধের চার পুত্র, দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র, পাড়ার দুইটি যুবক খাট বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান, সকলের মুখে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার গভীর রেখা। জানালায় মুখ রাখিয়া পুরনারীরা দাঁড়াইয়া আছেন। মস্ত বড় ডাক্তার—বিধান রায় হইবেন—পরীক্ষা করিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর ডাক্তারের পানে চাহিলেন। বলিলেন, চলো।

গৃহচিকিৎসক কহিলেন, (খুব নিম্নকণ্ঠে)···টা একবার দিয়ে দেখবো ?

বড় ডাক্তার, (তাচ্ছিল্যভরে) দেখতে পারো।

ভাবটা, কেন আর ! চলিতে চলিতে বলিলেন, ওটা পাবে কি ?

ডা। হ্যাঁ স্যার, বাথগেটে একটামাত্র আছে শুনেছি। আনিয়ে নিয়ে একটা ইঞ্জেকসান দিয়ে দেখি-না। (লিখিলেন)

পাড়ার একটি যুবক বলিল, আমি নিয়ে আসছি এখনই। [প্রস্থান

বড় ডাক্তার। দেখতে পারো। [প্রস্থানোদ্যত

গৃহিণী জানালায় ছিলেন ; জ্যেষ্ঠপুত্র অমরেশের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, অমর, ডাক্তার বাবুদের বল্, আর ফুঁড়ে ফুঁড়ে কষ্ট যেন না দেন।

বড় ডাক্তার। হ্যাঁ। [প্রস্থান

গৃহিণী পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; সঙ্গে দুই কন্যা ও দুই পুত্র বধূ আসিল। মুমূর্ষু চক্ষু চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, বড় বৌ ! গৃহিণী কাছে গিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইলেন।

মুমূর্ষু অত্যন্ত কষ্টে কহিলেন, বড় বৌ, তুমি আমার মনের কথা বলেছ। আর ফোঁড়াফুঁড়ি করতে দিও না। (আর বলিতে পারিলেন না ; হেঁচকি উঠিতে লাগিল। আজ ৮ দিন কেবলই হেঁচকি উঠিতেছে, বিরাম নাই। এখন মনে হইতেছে এই হেঁচকির সঙ্গেই প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে। গৃহিণী বুকের কাছে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। দুই পুত্রবধূ দুইটি পা, এক কন্যা একটি হাত, অপরা কন্যা পিতার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।)

মুমূর্ষু। সরস্বতী এসে পৌঁছতে পারলো না, না ? তবে আর তার সঙ্গে দেখা হলো না বুঝি।

সরস্বতী কনিষ্ঠা কন্যা। গয়ায় স্বামীর কাছে থাকে। পরশ্ব 'তার' গিয়াছে, এতক্ষণে আসা উচিত ছিল। গৃহিণী বাষ্পাকুলনেত্রে দণ্ডায়মান পুত্রগণের মুখের পানে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিলেন।

মুমূর্ষু। রাণু কৈ ! বৌমা, দিদিমণিকে দেখছি না কেন মা ?

পুত্রবধূ। ঘুমুচ্ছে, বাবা।

মুমূর্ষু। তুলে নিয়ে এসো মা ; আমার কাছে বসুক।

পুত্রবধূ চলিয়া গেল।

মুমুর্ষু চক্ষু মেলিয়া অমরেশ, কুমারেশ, অপরেশ, সমরেশ চারি পুত্র; বীরেশ ধীরেশ দুই ভ্রাতুষ্পুত্র; গঙ্গা যমুনা দুই কন্যা, একবার করিয়া সকলকে দেখিয়া লইলেন। তার পর স্ত্রীকে বলিলেন, বড় বৌ, সরস্বতীকে দেখবো বলেই বোধ হয় প্রাণটা এখনও বেরোচ্ছে না। সে কি আসতে পারলে না?

পুত্রবধূ পৌত্রী রাণুকে লইয়া উপস্থিত হইলে, মুমুর্ষু একটি হাত আস্তে আস্তে তুলিয়া তাহার মাথায় রাখিয়া বলিলেন, দিদিমণি আমি যাচ্ছি ভাই। রাণু কি-যেন বলিতে গেল, বলিতে পারিল না; কাঁদিয়া উঠিয়া দাদুর বুকের উপরে মুখ রাখিল। এই যাওয়ার কথাটা কয়দিন হইতেই শুনিতেছিল সে।

একজন ঝি দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল, মা, ছোটদিদিমণি এসেছেন গো। বলিতে বলিতেই সরস্বতী ও তাহার স্বামী ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

মুমুর্ষু। সরস্বতী, আমার কাছে আয় ত মা!

সরস্বতী বাপের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেঁচকিতে খুবই কষ্ট হইতেছিল, অনেকক্ষণ কথা বাহির হইল না। কিয়ৎ পরে—

বড় বৌ, আমি চললুম। তুমিও বেশি দেরী করো না। তুমিও এসো। তোমায় ছেড়ে কখনও থাকি নি—যাট বছর এক সঙ্গে—কথা শেষ হইল না।

সুরেশ্বর মিত্র পরিণত বয়সে পত্নী পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যু ধীর শান্তপদে সুখনিদ্রার আবেশে তাঁহাকে চিরশান্তির রাজ্যে লইয়া গেল। তাহার গৃহের নাম ছিল, সুখ-নীড়। সকলেই বলিল, ইহাকেই বলে সুখ-মৃত্যু।

২

দিকে দিকে লোক ছুটিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী ব্যক্তিবৃন্দকে খবর দেওয়া—ফুল, মালা, ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করা—খই, তামার পয়সা জোগাড়; কীর্তন-দল ডাকিয়া আনা; খাট কিনিয়া আনা—মোটর লইয়া, বাইসাইকল লইয়া দিকে দিকে লোক ছুটিল। পাড়ার একজন মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন, অমরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছাদনের কাপড় আনা হয়েছে?

না ত!

মাতব্বর। যাও, যাও, ওয়ার্ড কমিটি থেকে পারমিট নিয়ে—কত বাজল? এঃ, দশটা বেজে গেছে যে! সব ত বন্ধ হয়ে গেছে।

ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেশ বলিল, তা হোক, কমিটির লোকদের আমি জানি, আমরা যাচ্ছি।

মাতব্বর। শোন বাবা, ঐসঙ্গে তোমাদের অশৌচের কাপড়ের পারমিটও নিয়ে নিও। খাটেই ত সেগুলো দরকার হবে কি না।

ধীরেশ। যে আজ্ঞে। [প্রস্থানোদ্যত

মধ্যমপুত্র কুমারেশ বলিল, ধীরু, টাকা—ধীরেশ কহিল, টাকা আমার কাছে অনেক আছে মেজ দা'।

ধীরেশ ও তাহার একজন বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

৩

মাখনবাবু কমিটির মেম্বর; ধীরেশের সঙ্গে ভাব ছিল। তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া শুনিল, তিনি জনাইয়ে বরযাত্র গিয়াছেন; কখন ফিরবেন, স্থিরতা নাই! ১৭ নম্বর গোলাম রব্বানী রোডে অশ্বিনী ঘোষ থাকেন, তিনিও মেম্বর। তাহারা সেই পথ ধরিল। অশ্বিনীবাবু শুইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক হাঁক ডাকের পর উঠিলেন। জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি চাই?

ধীরেশ বক্তব্য ব্যক্ত করিল।

অশ্বিনী। ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ এনেছেন? আনেন্ নি! চালাকি পেয়েছেন, বটে। আপনাদের বাড়ীতে, সত্যি মড়া মরেছে আমি জানবো কেমন করে?

ধীরেশ। আমরা মিথ্যে বলে মড়ার কাপড়ের পারমিট্ নিতে এসেছি, এই আপনার মনে হোল? আমার জ্যাঠামশাই সুরেশ্বর মিত্র—

অশ্বিনী। সুরেশ্বরই হোক আর ষাঁড়েশ্বরই হোক্, রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেট না আনলে পারমিট হয় না। সার্টিফিকেট্ নিয়ে কাল সকালে আসবেন; রাতে জ্বালাতন করবেন না, যান্—জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

বন্ধু। চ ভাই, ডাক্তার ত বাড়ীতে রয়েছেনই, একখানা সার্টিফিকেট নিয়ে আসি।

ধীরেশ। (ম্লানমুখে) তাই চল্, উপায় কি আর।

উভয়ে চলিতেছে আবার বাড়ীর দিকে। অপরদিক হইতে দু'জন লোক ব্রীজের কল্ সমস্যা লইয়া তুমুল গলাবাজি করিতে করিতে আসিতেছে।

১। আমার থ্রি হার্টসের ডাকের পরে তোমার নো ট্রাম্‌স—

২। আরে, আমার হাতে হার্টস যে অষ্টরম্ভা—

তাহারা মৃগেন ও রমেন। এক পাড়ার লোক, সামনাসামনি হইতেই – ধীরু, নলীন, তোমরা?

ধীরেশ। জ্যাঠামশাই—আর বলিতে হইল না।

মৃগেন ও রমেন। আমরা চট ক'রে দু'টো খেয়ে আসছি, কি বল? তোমরা যাচ্ছ কোথায়?—ধীরেশ ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

রমেন। অশ্বিনী ঘোষটা ছোটলোকের বেহদ্দ। চামার বললেই হয়! চলো, চলো, কাছেই বিশ্বেস সাহেবের বাড়ী, পারমিট করিয়ে আনি।

বিশ্বাস সাহেব নৈশভোজন করিতেছিলেন, রমেনকে বলিলেন, রমেন, তোরা ভাই ফরমগুলো লেখ ততক্ষণ, আমি আসছি।

রমেন। (ধীরেশকে) জ্যাঠামশাইয়ের দেহের আচ্ছাদন, ১ খানা, পাঁচ গজ। আর কি কি চাই বলো ত ধীরু।

ধীরেশ। জ্যাঠাইমার থান, ২ খানা; দুই বৌদির লালপাড় শাড়ী, ৪ খানা; তিন দিদির ২ খানা করে, শাড়ী ৬ খানা; রাণুর ৮ হাত শাড়ী, ২ খানা। তারপর দাদাদের কাছা ধুতি ২ খানা ক'রে, আট দু'গুণে ষোলখানা।

রমেন লিখিতে লাগিল। বিশ্বাস সাহেবের প্রবেশ।

বিশ্বাস (সবিস্ময়ে)। ও কি কাণ্ড করছিস রে রমেন। মোটে ত ১৫ গজ পাবি—শবের ৫ গজ ছাড়া।

সকলে। সে কি! কাছা—দোছোট্—মেয়েদের—

বিশ্বাস। সে ত জানি রে। কিন্তু আইনে বরাদ্দ মোটমাট ২০ গজ। এই দেখ্‌না। তিনি সার্কুলার, নোটিশ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন।

রমেন। ওতে ত কিছুই হবে না দাদা! কিছুই না! ভালো বিপদ ত দেখি; কিন্তু উপায়?

বিশ্বাস। উপায়—বুঝতেই পারছ!

রমেন ও মৃগেন। ব্ল্যাক্‌মার্কেট্‌। গভর্ণমেণ্টই ব্ল্যাক্‌মার্কেট ক্রিয়েট ও মেনটেন্ করছে; অথচ কাগজে কলমে লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপন ঝাড়ছে, ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর—ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার উচ্ছেদ কর। হাম্বাগ্‌!

বিশ্বাস সাহেব প্রবীণ ব্যক্তি (সুবোধ ও সুধীর)। দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, ভাইরে! যে সময় পড়েছে, যে অবস্থা চলেছে, তা'তে সেই রকম ক'রে মানিয়ে চলতে হবেই ত রে!

রমেন। আহা! তা'না হয় বুঝলুম। কিন্তু এর কোন্‌টা বাদ দেওয়া যায় দাদা, আপনিই বলুন? চার ছেলে, কাছা নেবে না? বিধবা স্ত্রী থান পরবেন না? দু'টি পুত্রবধূ, তাঁরা অশৌচাবস্থায় সৌখীন কাপড় পরে থাকবে? তিনটি মেয়ে—

বিশ্বাস। সবই বুঝিরে ভাই, সবই বুঝি। কিন্তু আইন যে!

রমেন ও মৃগেন। আইনের মাথায় মুড়ো খ্যাংরা মারুন।

বিশ্বাস সাহেব বিশ গজের পারমিট লিখিয়া দিয়া, রমেনকে কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। রমেন তদ্‌স্বরে কহিল, তা ছাড়া আর উপায় কি! তাই করি গে যাই।

আচ্ছা, ভাই, শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি।

৪

পান-বিড়ির দোকানীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কাপড়ের দোকানের মালিকের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেল। দোকানীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জানা গেল, দোকানীর স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা; দোকানীর মাথার ঠিক নাই, এখন দেখা হইবে না। দোকানের একজন কর্ম্মচারী রিক্সায় চাপাইয়া একটি ধাত্রী লইয়া আসিয়া ইহাদের উদ্দেশ্য জানিয়া লইয়া কহিল, বিশ বচ্ছর চাকরী করছি মশাই; কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করে না! আমাকে চাবী দিলে অক্লেশে আপনাদের কাপড় দিতে পারি; তা' প্রাণ থাকতে চাবী দেবে না। আপনারা বরং একটা কাজ করুন, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বেঙ্গল ক্লথ ষ্টোর্সের মালিক নফর বাবুর বাড়ী যান। ভদ্রলোক নিজে হোক্, লোক পাঠিয়ে হোক, আপনাদের যা যা দরকার নিশ্চয়ই দেবেন।

রমেন। তাঁর ঠিকানাটা—

কর্ম্মচারী। ঠিকানা জানিনে, তবে বাড়ীটা জানি। ঐ যে মহানন্দ রোড আছে, জানেন ত! সেইটেতে ঢুকে বাঁ দিকে প্রথম যে রাস্তা, সেইটেয় যাবেন; খানিকটা গিয়ে ফের বাঁ দিকে যে বড় গলি, তারমধ্যে—পয়লা, দোসরা, তেসরা বাড়ী, ডানদিকে। সামনেটা এক তালা, রোয়াকটা ভাঙ্গা—

রমেন। কি নাম বললেন?

কর্ম্মচারী। নফরবাবু—নফর পাড়ুই। নফরবাবু বলে ডাকবেন, তা'হলেই হবে।

রাস্তায় পড়িয়া, ধীরেশ বলিল, আমরা ত প্রায় আড়াই ঘণ্টা বেরিয়েছি, কখন ফিরতে পারা যাবে তার ঠিক নেই, বাড়ীতে ওঁরা আবার আমাদের জন্যে আটকে পড়লেন না ত?

তাহার বন্ধু বলিল, না, না, বেরোতে অনেক দেরী হবে। শ্যামবাজার থেকে তোর পিসীমায়া আসবেন, চেতলার মাসীরা, বাদুড়বাগান থেকে তোর বাবা-মা'রা—বেরোতে বারোটা একটা হবেই।

আসল কথা, ধীরেশ খালি পায়ে আর হাঁটিতে পারিতেছে না। মাঝখানে একটা গর্ত্তে পা পড়িয়া মুচড়িয়া গিয়াছিল; আবার এইমাত্র একটা বড় পাথরে ঠোক্কর লাগিয়া মাথাপর্য্যন্ত ঝন্‌ঝন্ করিতেছে; বোধ হয় রক্তও পড়িতেছে। এ সব কথা ত বলা যায় না। তাহার জ্যেষ্ঠতাতকে তাহারা দেবতার মত ভক্তি করিত। আলাদা পাড়ায় ভিন্ন গৃহে বাস করিলেও দুইটি পরিবারে অন্তরঙ্গতার আদৌ অভাব ছিল না। একবার একটা আলোর নীচে দাঁড়াইয়া পড়িয়া ধীরেশ দেখিয়া লইল, ডান পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুল হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে! একটু আইডিন পাইলে, সে আর এখন কোথায় পাওয়া যাইবে! থাক্। নফর পাইড়ুয়ের গৃহের উদ্দেশে চলিতে লাগিল। ব্ল্যাক আউট উঠিয়া গিয়াছে ঠিক! আউট-টা আউট হইয়াছে, ব্ল্যাক্ অক্ষয়রূপে বিদ্যমান।

পাড়ুই মহাশয় ভাঙ্গা রোয়াকে বসিয়া হরিনামের মালা জপিতেছিলেন। এতগুলি ব্যক্তির আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, হরিনামের ঝুলিটি বারম্বার মাথায় ঠেকাইয়া, ভাঙ্গা কাঁসরের মত আওয়াজে ডাকিলেন, ভজা! ভজা! ওরে ভজা! ভজারে!

সাড়াও নাই, শব্দও নাই। থাকিবার কথাও নয়। ভজহরি পাড়ুই নফর পাড়ুইয়ের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছে, ব্যাঙ্কে নগদ একটি লক্ষ তিনটি হাজার টাকা স্থায়ী-জমা আছে। বছরখানেক হইল ভজহরির বিবাহ হইয়াছে। সারাদিন দোকানপাট করিয়া, একটু আগে আসিয়া, কাণে মুখে ভাত গুঁজিয়া শয্যাশ্রয় লইয়াছে; পার্শ্বে সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। কোনও বৃদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিবার সময় এটা নয়। ভজহরি বলিল, আঃ! সপ্তদশী কহিল, চুপ। বুড়া আবার ডাকিতে লাগিল, ভজহরি! ও ভজহরি! বাবা, ক'টি ভদ্রলোক—। ভজহরি বলিল, জ্বালালে বাবা! ভজহরিভার্য্যা কহিল, চুপ ক'রে থাক না তুমি। কিন্তু অনেকটা পথ, নফরপাড়ুই বুড়া হইয়াছে, কোমরে কটীবাত, চোখেও ভাল দেখে না। ভবার্ণবে ভজহরিই ভরসা। লক্ষ টাকার মালিক নফর খট্ খট্ করিতে করিতে দ্বিতলে উঠিতেছে, একমাত্র ওয়ারিশ ভজহরি স্ত্রীকে বলিল, নিশ্চয় কোথাও মড়া মরেছে। ভজহরি-জায়া কহিল, মরবার আর সময় পায় না মড়ারা। ভজহরি দরজা খুলিল। বাপের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে চোখ পাকাইয়া কহিল, চলুন দেখি। পার্মিট আছে ত? আচ্ছা।

ভজহরি ভদ্রলোক, দেরী করিল না বটে কিন্তু দেরী হইয়া গেল।

বাহিরে দণ্ডায়মান লোকগুলি ছটফট্ করিতে লাগিল ; তাহা করা ছাড়া তাহাদের অন্য কাজ ত দেখি না। পাশের বাড়ীর ঘড়িটা বারোটা বাজাইয়া দিল ; বাজাই তাহার কাজ, কে ঠেকাইবে? ধীরেশ মৃগেনের মুখের পানে চাহিয়া বাজাটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিল। রমেন কিছু কর্কশ-কণ্ঠ, অন্ধকারের পানে চাহিয়া হাঁকিল, নফরবাবু মশাই, আর কত দেরী হবে?

ভজহরি অদৃশ্যস্থান হইতে ততোধিক কর্কশকণ্ঠে জবাব দিল, দাঁড়ান না মশাই, জামাটা গায়ে দিতে হবে না।

ভজহরির স্ত্রী বলিল, ঘোড়ায় জিন্ কষে এসেছে।

নফর পাড়ুই বৈষ্ণবজনসুলভ কণ্ঠে আগন্তুকদের উদ্দেশে কহিলেন, ঐ যে আসছে।—পুত্রের রুদ্ধদ্বারকক্ষের উদ্দেশে কহিলেন, বাবা ভজ, আর দেরী করো না বাপ।

সেই ঘড়িটায় আবার একটা ঘণ্টা বাজিল।

দোতালার জানালায় নারীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল, বেতারে বার্ত্তা আদান প্রদান হইল কিনা কে জানে। ভজহরি তুফান এক্সপ্রেসের স্পীডে পা চালাইয়া দিল। আর সকলে যেমন তেমন—ধীরেশ সকলের পিছনে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিল। পথে রমেন ভজহরিকে ভজহরি 'বাবু' বলিয়া, এত রাত্রে বিরক্ত করার দরুণ দুঃখপ্রকাশ ও মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়া, গোপন কথা জুড়িয়া দিতেই, ভজহরি দাঁড়াইয়া পড়িয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, নফরপাড়ুই চোরা কারবার করে না মশাই। সে সবের দরকার হয়, ঘটি বেটার দোকানে যান্—বলিয়াই ভজহরি ফিরিতে উদ্যত হইল। সপিতা ভজহরি পাড়ুই বাঙ্গাল, ফরিদপুরের আমদানী। বাঙ্গাল্ বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব, গৌরব ও বাহাদুরী অনুভব করে এবং যাহারা বাঙ্গাল্ নয় তাহাদিগকে গায়ে পড়িয়া ঘটি, লোটা ইত্যাদি বলিয়া পরম আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। পাড়ার কতকগুলা ঘটি-যুবক তাহাকে ঠোকন্ দেবে বলিয়া শাসাইয়াছে। ইহার পর হইতে পাড়ায় সাবধান হইয়াছে। বেপরোয়া ঘটি চালায়। রমেন তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, রাগ করেন কেন ভজহরিবাবু, আমাদের দরকার, দরকারই বা বলি কেন, দায়। লোকের বিপদে আপদে উপকার করা ত ভদ্রলোকেরই কাজ! আপনারা নামকরা ভদ্রলোক!

হঃ, বলিয়া ভজহরি পরমানন্দে আবার পথ চলিতে লাগিল। দোকান অনেকদূর পথ!

ভজহরিবাবু সর্ব্বাগ্রে তালাগুলি পরীক্ষা করিলেন ; পরে পর্য্যবেক্ষণ ; তারওপরে নিরীক্ষণ, সর্ব্বশেষ 'অনুবীক্ষণ' করিয়া, একটির পর একটী তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সুইচ টিপিয়া আলোক প্রজ্বালিত করিলেন। প্রকোষ্ঠে রক্ষিত গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্ গণেশ ঠাকুরের মৃন্ময় ও মাল্যবিভূষিত মূর্ত্তির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া অনেক মন্ত্র পাঠ ও অনেকবার নমস্কার প্রণাম ইত্যাদি করিয়া, মিনিটখানেক চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। এই সময় ইহারা চারজনেই দোকানে ঢুকিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, ভজহরি পরম ক্রোধাবিষ্টস্বরে কহিল, আরে মশায়, ভিড় করেন কেন! একজন আসেন—রমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনি আসেন। রমেন আসিল, অপর সকলে নামিয়া গেল।

ঢং ঢং করিয়া দোকানের ঘড়িতে ২টা বাজিল।

ধীরেশ বলিল, ৮টায় আমরা বেরিয়েছি।

বন্ধু। ৮টা বাজতে ১০ মিনিট দেরী ছিল তখনও।

পারমিটখানাকে সোজা করিয়া, উল্টা করিয়া, কাৎ করিয়া, উপুড় করিয়া, আলোয় ধরিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নাকের সামনে আনিয়া (ঘ্রাণ লইল নাকি?) দেখিয়া, ভজহরি খাতা বাহির করিল ; দোয়াত টানিয়া, কলম লইয়া, আর একবার শ্রীশ্রীগণেশজীকে দর্শন করিয়া, খাতার সাদা পাতায় "শ্রীশ্রী১০৮ সিদ্ধিদাতা গণপতিদেবের আশীর্ব্বাদাৎ" করতঃ নিম্নকণ্ঠে কহিল,হঃ! আর কি কি দরকার বলছিলেন যে! দেখি ফর্দ্দটা।

দেখুন দয়া ক'রে, বলিয়া রমেন বাহিরে গিয়া ধীরেশের নিকট হইতে ফর্দ্দটা লইয়া আসিল। ভজহরিবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া তাহার নির্গমন ও পুনরাগম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ফর্দ্দ না দেখিয়াই ভজহরি কহিলেন, টালিগঞ্জে এক জায়গায় যেতে পারলে কিন্তু সবই পেতে পারেন।—বলিয়া খাতায় রুল টানিতে মনঃসংযোগ করিলেন। গুটিকয়েক রুল টানিয়া বলিলেন, পড়েন ত, ফর্দ্দয় কি লেখা আছে দেখি।

রমেন। শাড়ী, ১২ জোড়া লাল পাড়।

ভজ। ৩০ টাকা জোড়া—৩৬০৲ তারপর—

রমেন। থান, ১ জোড়া।

ভজ। ২২ টাকা। তিনশ বিরাশি টাকা।

রমেন। কাছা তিনজোড়া—তার মধ্যে পারমিট ১৫ গজে ১ জোড়া—দেড় জোড়া—না, ও এক জোড়াই ধরুন, বাকী ২ জোড়া—২ জোড়া চাই।

ভজ। ২ জোড়া? ২০ টাকা ক'রে ৪০ টাকা। হলো চারশ বাইশ—চারশ' পঁচিশ ধরেন। টাকা আছে?

রমেন 'দেখছি' বলিয়া বাহির হইয়া গেল ; ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চারশ' পনেরো টাকা আছে ; দশটাকা কম পড়ছে।

ভজ। আর এই বিশগজের—

মৃগেন বাহির হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, রমেন, বেশী টাকার দরকার হলে বলিস্ আমার পকেটেও শ'খানেক আছে।

ভজহরি। (রাগতভাবে) আঃ, অত চেঁচাচ্ছেন কেন, মশায়! আমার শুদ্ধ হাতে দড়ী দেবেন নাকি।—(খাতা লিখিয়া, পারমিট মিলাইয়া, ক্যাসমেমো তৈরী করিয়া)—এই পারমিটের টাকাটা আগে দিন ত দেখি। (টাকা লইয়া বাক্সে রাখিয়া) ঐ চারশ পঁচিশটা দিন। (বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে) আপনারা ভদ্রলোক, দায়ে ঠেকেছেন, এতরাত্রে কোথায় আবার টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ ক'রে বেড়াবেন, আমিই ওটার জোগাড় জাগাড় দেখছি। লোকের দায়ে অদায়েই যদি না করবো—কি বলেন মশায়? কৈ—টাকাটা! আঃ এই দিকে একটু সরে এসে গণেন্ না ম'শায়।

রমেন। ভজহরিবাবু, ব্ল্যাক্‌মার্কেট প্রাইসগুলো একটু বেশী বেশী ব্ল্যাক্ হচ্ছে না?

ভজ। (অগ্নিশর্ম্মা হইয়া) ও সব মাল আমার নাকি ম'শায়! তাই' ভেবেছেন বুঝি! আপনারা ভদ্রলোক, দায়ে পড়েছেন—কাজ কি মশায়, আপনারা নিজেরা দেখুন গে—(বলিয়া ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দে খাতাপত্রাদি বন্ধ করিতে লাগিল)

রমেন। (অনুশোচনা ভরে) না, না, কথার কথা বলছি বৈ ত নয়। আপনি রাগ করলেন—এই নিন, চারশ' পঁচিশ—

ভজ। (টাকা লইয়া) আমাদের একটি সিকি পয়সাও এতে নেই মশায়। (গণনা করিয়া, নোটগুলো আলোকে পরীক্ষা করিয়া) তা, আপনারা কোন্ ঘাটে যাচ্ছেন?—(বলিয়া সাড়ে বেয়াল্লিশখানা নোট হইতে বারো খানা রমেনের অলক্ষ্যে রমেন অবশ্য দেখিতে পাইল, পকেটে ফেলিল: বাকাগুলো গেঁজেতে পুরিয়া, বলিল) যান্, পারমিটের কাপড়গুলো নিয়ে আপনারা চলে যান্—ওকে দাঁড়িয়ে? বেটা পাহারালা নাকি? (সভয়ে দেখিতে দেখিতে) না, বেটা মুস্কিল-আশান্—এই বেটারাই চোর, বুঝলেন ম'শয়।

মুস্কিল্। ইয়া পীর—

ভজ। না, না এখানে পীর টীর হবে না; সরে পড়।

মুস্কিল। যাঁহা মুস্কিল, তাঁহা আসান—

ভজ। বেটা জ্বালালে। দিননা ম'শয়, পকেটে একটা ডবল থাকে ত ফেলে দিন্ না, বেটারা পুলিশের স্পাইও হতে পারে।

রমেন। (পয়সা দিয়া) যাও বাবা, যাও।

মৃগেন। তাহ'লে কাপড়গুলো দিন এইবার।

ভজ। (বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া) এই ত বল্লাম মশয়, ঘাটে পৌঁছে দোব। এক কথা কতবার বলবো বলুন তো! কলিকাল কি-না, কারও ভাল—নিন্ মশয়, দোকান বন্ধ করি।—বলিয়া পকেটে রক্ষিত ১২ খানা নোট্ আর একবার গোপনে পরীক্ষা করিয়া, দোকান হইতে বাহির হইয়া, ঝপাঝপ্ দরজা বন্ধ করিতে লাগিল। ঐ নোটগুলো স্থানবিশেষে কম্‌পেন্সেশান্‌দিতে হইবে, সপ্তদশবর্ষটা বিষম কাল।

রমেন। (হতভম্ব ভাবে) তাহ'লে শানগর ঘাটে?

ভজ। হ হ ম'শয়, হ। যান্ ত দেখি।

৫

বাড়ীতে। কান্নাকাটি থামিয়া গেলেও, থম্‌থমে ভাবটা জাঁকিয়া রহিয়াছে। ধীরেশ প্রভৃতির প্রবেশ।

সকলে। এত দেরী? চারটে বেজে গেছে যে! তোদের জন্যই আমরা বেরোতে পাচ্ছি না।

ধীরেশ। যা কাণ্ড বড়দা'—(জনান্তিকে ঘটনা বিবৃত করিল)

মাতব্বর। কাপড় ঘাটে পৌঁছে দেবে বলেছে ত? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা তাই করে। তাহ'লে আর দেরী নয়। ঠিক পৌঁছে দেবে, কিছু ভাবনা নেই। চল।

বল হরি হরি বোল্।

বল হরি হরি বোল্।

৬

শানগর ঘাট। চিতা জ্বলিতেছে। পুরুষেরা একদিকে, মেয়েরা অন্যদিকে বসিয়া আছে। অনেক লোক—পাড়া খালি করিয়া সব ঘাটে আসিয়াছে। সুরেশ্বর মিত্র পাড়ার মাথা ছিলেন; সকলে ভালবাসিত; তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন।

একজন লোক আসিয়া রমেনবাবুর সন্ধান করিতে লাগিল। ধীরেশ তাহার কাছে গিয়া দেখিল, কিন্তু ভজহরি নয়; বলিল, কেন, তাঁকে কি দরকার?

আগন্তুক। তাঁর শ্বশুরবাড়ী থেকে পরবার কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।

পুঁটলী খুলিয়া দেখা গেল, ভজহরি কথা রক্ষা করিয়াছে।

পাড়ার একজন যুবক কহিল, এই ব্ল্যাক্‌মার্কেটিয়ারদের পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।

মাতব্বর। কিন্তু উপকারটা অস্বীকার করবে কি ক'রে বলো ত বাবা! ওরা না থাকলে কি উপায় হত বল দেখি! কৃতজ্ঞতা অস্বীকার মহাপাপ।

এই নীতিবাক্য সকলেরই অনুমোদন লাভ করিল।

রমেন বলিল, দেখা হ'লে থ্যাঙ্ক্‌স্ দোব।

সন্ধ্যামালতী

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

সন্ধ্যামালতী, বলিতে পারিস্ কে তোরে বাসিত ভালো?
দিনের অন্তে সাজাতিস্ তুই কার কুন্তল কালো?
মুখখানি তার ছিল হাসিভরা, চাহনি তাহার ছিল প্রাণ-হরা,
রঙ্ ছিল তার অমল ধবল— যেমন চাঁদের আলো!
সন্ধ্যামালতী, বলিতে পারিস্ কে তোরে লইত তুলি',
পাপ্‌ড়িতে তোর বুলাত কে তার চম্পক-অঙ্গুলি?

যৌবন তার ললিত অঙ্গে কেলি করি' সদা ফিরিত রঙ্গে,
সে যে স্বরগের—পাপের ধরায় এসেছিল পথ ভুলি'!
সন্ধ্যামালতী, সে ছিল আমার তন্বী কিশোরী প্রিয়া,
মরণ-আঁধারে চিরদিন তরে গেছে সে যে হারাইয়া!
তার লাগি' আজ করি' হাহাকার, ফেলিতেছি বসি' নয়ন-আসার,
সে গিয়েছে চলে ভেঙ্গে মোর বুক— দগ্ধ করিয়া হিয়া!

আচার্য্য বলদেব ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

যে অল্প কয়েকটী সন্তানের জননী বলিয়া ভারতভূমি বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে, বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহাদের অন্যতম। বলদেবের গৃহস্থ-জীবনের অনেক কথাই এখনও যবনিকার অন্তরালে। কে তাঁহার পিতা, কে তাঁহার মাতা—তাহা হয়তো আমরা জানি না। সে সংবাদ না জানিয়া আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। ভক্ত বলদেব, ভক্ত সমাজের বন্দনীয়, পরম ভক্ত, ইহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। যে মাতা-পিতার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় বেশীদিন থাকিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। অপরাপর বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীগণ যেমন গৃহের বাহিরে আসিয়া শ্রীধামের অভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, বলদেবের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বলদেব যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তথাকার 'শ্রী' আগের মত আর ছিল না। ষড়-গোস্বামিগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন-বিহারীও আপন মহিমা গোপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের শিষ্য-মণ্ডলীর অনেকেই এ পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার যবনের অত্যাচার-ছলে শ্রীবিগ্রহসমূহও একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব অনুমান ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মথুরায় উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির ধ্বংস করেন। এই মন্দির বুন্দেলরাজ বীরসিংহ কর্তৃক বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীমন্দির এইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে কেশবজীকে লইয়া গিয়া উদয়পুরের নাথদ্বারে রক্ষা করা হইল। বিপদ উপস্থিত দেখিয়া শ্রীধামের প্রহরীগণ গোকুল, মহাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে অপরাপর শ্রীবিগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রজধাম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, শ্রীগোপীনাথ, মদনমোহন, গোবিন্দ, রাধাবিনোদ, রাধাদামোদর প্রভৃতি ব্রজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যে বৃন্দাবনের গৌরব একদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃকই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে-স্থানের শ্রী-সম্পদ লুপ্ত হইতে থাকিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রভাবও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। শ্রীধামের এবংবিধ অবস্থা তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভাগ্য বিপর্য্যয়-সন্দর্শনে, একজন বাঙালী বৈরাগী আবার সমুদয় পুনর্গঠনে ব্রতী হইলেন। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথ একাকী সমস্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়া সময় সময় অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় একজন সঙ্গী হইলে ভাল হয়। কিন্তু কে তাঁহার সাহচর্য্য করিবে, কর্ম্মী উপযুক্ত না হইলে, তাহার সাহচর্য্য বিড়ম্বনারই নামান্তর। কিন্তু ব্রজের ঠাকুর বুঝি বিশ্বনাথের অভাব পূরণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একজন বৈরাগী আসিয়া জুটিল। ইনি শিক্ষা-দীক্ষা—সমস্ত দিক হইতেই বিশ্বনাথের যোগ্য সহচর হইবার উপযুক্ত। ইঁহারই নাম—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ।

বলদেব ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় বিশ্বনাথ আবার অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রজমণ্ডলে গোস্বামি-শাস্ত্রের প্রচার করিয়া লুপ্তশ্রী পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনাদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, রূপ-সনাতন ও তাঁহাদের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব যে অনন্য সাধারণ কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারা জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি যাঁহাদের পতাকা বহন করিয়া সাধারণো প্রেম সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই অমিয়-ধারাই আবার পুনঃপ্রবাহিত হইল এই দুই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈরাগী দ্বারা—বিশ্বনাথ ও বলদেব।

বিশ্বনাথ ও বলদেবের সমবেত চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অচিরেই ব্রজধামের পূর্ব্ব শ্রী ফিরিয়া আসিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাব আবার পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন হইল। বলদেব বৈষ্ণব দর্শনের অধ্যাপনা-মানসে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহার মধ্যে প্রমেয়-রত্নাবলী, সিদ্ধান্ত-দর্পণ, ছন্দঃ কৌস্তুভঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রমেয়-রত্নাবলী' মধ্বমতানুযায়ী গ্রন্থ। ইহাতে নয়টি প্রমেয় বা সিদ্ধান্ত আছে, যথাঃ—(১) "ব্রহ্মই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব। (২) ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি, অথবা শাস্ত্রই ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র উপায়। (৩) জগৎ সত্য। (৪) ব্রহ্ম ও জগৎ প্রপঞ্চের ভেদ সত্য। (৫) জীব সত্য ও ভগবৎ কিঙ্কর। (৬) জীবগণ পরস্পর ভিন্ন ও শ্রেণী ভেদে উচ্চাবচ। (৭) ভগবৎ প্রাপ্তিই-মোক্ষ। (৮) ভগবদুপাসনা মোক্ষের একমাত্র সাধন। (৯) প্রমাণ তিনটী—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভর যোগ্য।" সিদ্ধান্ত-দর্পণে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক সাংখ্যাদি নাস্তিকমত নিরসন করিয়া গ্রন্থকার বেদান্তের দুরূহ সিদ্ধান্তসমূহকেও অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছেন।

এইরূপে পঠন-পাঠনের সুবিধা তথা গোস্বামি-গ্রন্থের বহুল প্রচার দ্বারা বলদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু এত চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও বোধহয় একটু ত্রুটি রহিয়াও গিয়াছিল। তাই সকলের অলক্ষ্যে আবার বিবাদপাতের সূচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভক্তিবাদ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি প্রাচীন, কিন্তু ইহা কোন সময় হইতে কিরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় দেখা যায় না। রামায়ণ মহাভারত যুগের পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে ৭০০—৬০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দেও যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজার পূর্ব্বেও যে গয়ায়

বিষ্ণুপাদের পূজা প্রচলন ছিল, তাহা বায়োদ্ধৃত ঊর্দ্ধবাতের "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়াশিরসীত্তোর্ণবাতঃ" বচন হইতে স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রাচীন শিলালিপিগুলিতেও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। লুডার্স প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন, নানাঘাট ও ঘোশুণ্ডির শিলালিপি খৃঃ পূঃ ২ শতক পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের উল্লেখ আছে। ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় সেগুলি পরিপূর্ণ। আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনাকাণ্ডের উপরই ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। কাজেই রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্ত দর্শনের ভক্তিবাদিগণ উপনিষদকেই মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-প্রণয়ন দ্বারা তাঁহাদের মতবাদ গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিধায় তাহাদের ব্যাখ্যা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। এই চেষ্টার ফলস্বরূপই সূত্রব্যাখ্যা বা ভাষ্যের উৎপত্তি। ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের হাতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের সময় নবতমরূপ ধারণ করিয়া নিরক্ষর ও নির্ম্মলহৃদয় ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। এই সময় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে 'শ্রী' উজ্জ্বল করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া সকলকেই আলিঙ্গন দান করিলেন। সকল বেদের সার 'প্রেমধর্ম্ম' শ্রীচৈতন্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিতরণ করিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, জগতে যাঁহারা ধর্ম্মমত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রচলিত ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা দ্বারা এক একটি মতবাদ গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য এ সব কিছুই করেন নাই। তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন! যে প্রেম তাঁহার হৃদয়-মথিত, প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল প্রতিপাদ্য, তাহা কি কখনও বই লিখিয়া বুঝানো যায়? ভাষ্য রচনায় প্রকাশ পায়? শাস্ত্র, ভাষ্য—সমস্তই যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যাহা হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চির-লিখিত, যাহা মানুষকে আত্মহারা, পাগলপারা করিয়া তুলে; সেই চির-নির্ম্মল সর্ব্বসাধারণ প্রেমধারাকে অনুভূতির রসে গুলিয়া নিজের জীবনকে রাঙ্গাইয়া তুলিতে হয়। ভক্তিবিহীন, প্রেমলেশহীন আর্ত্ত, ক্লান্ত নর-নারীর সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শখানি তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহার সম্মুখে কোন গ্রন্থ, ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী স্থান পাইতে পারে না। প্রেম যেখানে পাগলা-ঝোরার মত শত সহস্র ধারায় ছুটিয়া পড়িয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যায় সেখানে সংশয়-চিত্ত লোকের তর্ক-বিতর্ক কি করিবে? রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু এক নূতন অবতার—এ প্রেমের অবতার। তিনি প্রেমের ঠাকুর। এমন অবতারের কথা পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, কিন্তু প্রেমিক। প্রেমিক কখনও সন্ন্যাসী হইতে দেখা যায় না। কিন্তু গোরা কখনও প্রেমে অজ্ঞান, কখনও বিরহে ব্যাকুল।" এই যে চিত্র ইহার সম্মুখে স্বকীয়া, পরকীয়ার কথা উঠিতে পারে না, শুচি-অশুচির প্রশ্ন স্থান পাইতে পারে না। এখানে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বাদ-বিতর্ক, দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের কল-কোলাহল—সমস্তই অচিরে নিরস্ত হইয়া পড়ে।

কিন্তু জগতে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা সমস্ত বুঝিয়াও আবার কিছুই বুঝিতে চান না, আত্ম-প্রাধান্য বজায় মানসে অপরের উৎকৃষ্টতর জিনিস আমলে আনিতে দেন না। দর্পহারী ভগবান সকলের দর্পই চূর্ণ করিয়া থাকেন। বুঝি ভগবৎ-নির্দ্দেশেই এক শুভ্র শুভ মুহূর্ত্তে জয়পুরাধিপতির সভায় গিয়া কতকগুলি 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এক গোলযোগ করিয়া বসিলেন। রুদ্র ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ন্যায় 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার পূজাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করেন। চৈতন্য-পূর্ব্ব সময়ে কেবল নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই উপাস্য দেবতা ছিল—"রাধাসমন্বিত গোপাল-কৃষ্ণ।" কাজেই জয়পুরে গোবিন্দজীর সহিত শ্রীরাধাকে দেখিয়া 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তাঁহারা মহারাজকে বুঝাইলেন, প্রথমে শিলারূপী নারায়ণের পূজা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা অবৈধ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপকন্যা শ্রীরাধাকে এক সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করাও অনুচিৎ, কেন না প্রাচীন পুরাণাদিতে রাধার নাম মাত্র নাই। অতএব রাধাকে ফেলিয়া দেওয়া হউক। তৎকালে যে সমস্ত বাঙালী পূজারী গোবিন্দজীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের নিকট পরাজিত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে মহারাজ জয়সিংহ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এতদিন ভগবান-জ্ঞানে যে রাধার তিনি পূজা দিয়া আসিয়াছেন, আজ হিন্দু হইয়া কোন প্রাণে তিনি সেই রাধাকে ফেলিয়া দিতে পারিবেন? নানারূপ চিন্তার পর শেষে স্থির করিলেন যে, অন্য গৃহে রাখিয়া তিনি শ্রীরাধার পূজার ব্যবস্থা করিবেন। অচিরে এই সংবাদ বৃন্দাবনে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তবে কি 'মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর' ব্যথা ও বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মকথা—সমস্তই কবির কল্পনা! মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্যপুরাণে শ্রীরাধার নাম নাই। এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের "অনয়ারাধিতো" শীর্ষক শ্লোক হইতে বৈষ্ণব-দর্শনীতে এবং সারার্থ-তোষণীতে রাধার নাম আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও কি সনাতন এবং বিশ্বনাথের কষ্ট কল্পনা?

গোস্বামিগণের সকলেই একে একে ব্রজধামের নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ব্রজবাসীগণ কি করিবেন, কাহার নিকট গিয়া দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন,—"শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাওয়া যাক্—যদি তাঁহার দ্বারা কোন প্রতিকার সম্ভব হয়?" বিশ্বনাথ তখন বার্দ্ধক্যদশায় জরাজীর্ণ, স্থানান্তরে যাইতে অক্ষম। তিনি বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রীরাধার মান হইয়াছে, সেইজন্য এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। যাহা হউক, আমি তো যাইতে অক্ষম, তোমরা বলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে লইয়া যাও। রাধাকৃষ্ণের চরণপ্রসাদাৎ, তাঁহার

দ্বারাই তোমাদের মনোরথ সফল হইবে।" বলদেব তখন অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভেক লইয়া গোবিন্দদাস নাম গ্রহণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের কোন গুহায় ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন, কেহই তাঁহার সন্ধান জানেন না। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল। জয়পুরে গিয়া তিনি বিরুদ্ধপক্ষীয় বৈষ্ণবগণকে তর্কে পরাস্ত করিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে যেরূপভাবে পুজাকার্য্য চলিতেছিল, সেইরূপভাবে আবার সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, বিতাড়িত বাঙালী পূজারীগণ আবার আপন আপন পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী আচার্য্যগণ যেমন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া আপনাপন মতকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বলদেবকেও আবার সেই পন্থা অবলম্বন করিতে হইল। এই চেষ্টার ফলেই আমরা আর এক নবতম ভাষ্যের দর্শনলাভ করিলাম। ইহারই নাম—"গোবিন্দ-ভাষ্য।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্য যে প্রেমের পরিমলে পাগল হইয়া কখনও অজ্ঞান, কখনও ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন—

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোনার অঙ্গ ধূলায় লুটায়

তাহা কখনো ভাষ্য রচনায় বুঝানো যায় না। কিন্তু তবুও দরকারের খাতিরে, সত্যপ্রতিষ্ঠামানসে, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আবার অনেক কিছুই করিতে হয়। বলদেবকেও এই নীতি অনুসরণ করিয়া আবার কলম ধরিয়া প্রচার করিতে হইল—'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। কথিত আছে, তিনি ইহা কৃষ্ণের আদেশানুসারে প্রকাশ করেন।

জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন হইয়াও যে অভিন্ন, ইহা সত্যের এক অচিন্ত্য-স্বরূপ। শ্রুতিতে আছে, পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আনন্দানুভব করিবার জন্য বহু হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, পূর্ণ ও অখণ্ড আত্মায় আনন্দানুভূতি হইতে পারে না। আনন্দানুভব করিতে হইলে আরও অনেক আত্মাকে সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। যিনি এক হইয়াও বহু হইতে পারেন, তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অতীত। তিনি একও নন, বহুও নন—যুগপৎ এক এবং বহু। আমি একদিকে যেমন সসীম, আর একদিকে তেমন অসীম, এই সসীমত্ব ও অসীমত্ব যুগপৎ আত্মার মধ্যে আছে বলিয়াই তাহা আনন্দরসপানে সমর্থ। যাহা পরিপূর্ণ তাহাই রস। জীবভৃঙ্গ তাহাই পানের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। "যিনি পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড ব্রহ্মানন্দরস, তিনিই আবার রস-পান-পিপাসু অপূর্ব্ব খণ্ডাকৃতি জীবভঙ্গ।" এই রসানুসন্ধান, রসাস্বাদনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রহস্য। এই জন্যই গোরা-রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত"। বলদেব এই তত্ত্বেরই রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া জগজনকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া লইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্বে যে সংসারের আর্ত্ত, ক্লান্ত নর-নারীর আশা ও আনন্দের অভয়বাণী নিহিত রহিয়াছে, বলদেব তাহাই ভাষ্য জাল বিস্তারিত করিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রেম-ময়ের নিত্য লীলা যে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কাহাকেও বাদ দিয়া হয় না, তাই তিনি সকলের জন্য ব্যাকুল। ভারতীয় সমস্ত দর্শন, সমস্ত তত্ত্ব হইতে এইখানেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মর্ম্মকথা এক গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সমস্তকে ছাড়িয়া প্রেমকে পরম বাঞ্ছনীয়রূপে লাভ করিবার পন্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এক নূতন অবদান। ইহা আমাদিগকে সেই অদ্বয়-তত্ত্বে পৌছাইয়া দেয়—যেখানে ভেদ শুধু কাল্পনিক, লীলারসের পরিপোষক। নিত্যপ্রেম, নিত্যবিলাস এবং সেই প্রেমসমুদ্র হইতে যে তরঙ্গধারা উত্থিত হয়, তাহা আবার সেই সমুদ্রেই মিশিয়া যায়। আস্বাদন মাধুর্য্যের জন্য শ্রীরাধা তাঁহারই সত্ত্বা হইতে রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আবার বিলাসের মাহাত্ম্যে, লীলার আতিশয্যে তিনি তাহাতেই বিলীন। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসিনী শ্রীরাধা অচিন্ত্যভেদাভেদের এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে।

এই তত্ত্বেরই স্ফূরণ হইয়াছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায়। সেই 'রম্যাকাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা' শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে আবেগ ও অনুপ্রেরণায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সাধকের মানস-বৃন্দাবনচারী শ্রীরাধা যেন দেহ ধরিয়া সুরধনী তীরে আসিয়া দেখা দিলেন—"অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু সুরধনী তীরে উজোর।"

পৃথিবী এযুগে রণ-ভেরীর তীব্র নিনাদে বধির হইয়া গিয়াছে। কে জানে, কোন যুগে এই অমিয়-ধারা জগতের প্রতি-স্তরে বহিত হইয়া স্বর্গ-রাজ্যের সৃষ্টি করিবে! হে মহাভাগ, তুমি কে, কেনই বা শচী-দুলালরূপে একবার বাংলার বুকে আসিয়া দেখা দিয়াছিলে? যোগীরা যাহাকে ক্ষণেকের তরে পাইয়া, আবার পাইবার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে, তুমি কি সেই তপস্যার মহাধন? সংসারে তো সকলে কেবল 'আমার' 'আমার' করিয়াই কাঁদিয়া থাকে, সন্ন্যাসীরা তোমাকে খুঁজিবার জন্য পথে পথে ফিরিয়া বেড়ায়, সিদ্ধ পুরুষেরা তোমাকে পাইতে চেষ্টা করিয়া কেবল কতকগুলি অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার মত, কে, কবে, কোথায় ভগবানের জন্য এমন করিয়া কাঁদিয়াছে? তোমার অশ্রুসজল চক্ষে যাঁহার ছায়া পড়িয়াছিল, তাঁহাকে তোমার মধ্যদিয়াই ভারতবাসী একবার মাত্র দর্শন করিয়াছে; আর সেই রূপ-মাধুরীর তত্ত্বকথা এখনও বিধৃত আছে—বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে।'



উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলরাম ঘরে ফিরিলেন। কিছুই বোঝা যাইতেছে না—কেমন একটা অনিশ্চয়তায় ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে মন। কেন এই যুদ্ধ? মানুষ এমনভাবে কিসের জন্য লড়াই করিয়া মরে? বোমা আর কামানের মুখে ঘর বাড়ি উড়াইয়া দেয়, রক্তে ভাসাইয়া দেয় মাটি? দেশ আর গ্রাম শ্মশান হইয়া যায়। কাই বা হয় যুদ্ধে একটা বিরাট জয়লাভ করিয়া? যে জিতিল, মড়ার হাড়ের উপরে সিংহাসন বসাইয়া এমন কোন্ অপূর্ব স্বর্গসুখটা সে ভোগ করে?

কে যুদ্ধ চায়? বলরাম চান না—মণিমোহন চায় না, চর ইসমাইলের কেউ চায় না, এমন কি নির্বোধ রাধানাথ পর্যন্ত চায় না। তবু কেন এই যুদ্ধ?

সমস্ত ব্যাপারটাকে সমাধানহীন একটা বিরাট গোলকধাঁধার মতো মনে হয় তাঁহার। কিছুদিন আগে এই প্রশ্নটাই তিনি করিয়াছিলেন মণিমোহনকে।

অত্যন্ত করুণাভরে মণিমোহন হাসিয়াছিল। অনেকগুলি কথাই সে বলিয়াছিল—উপনিবেশ, বাণিজ্য বিস্তার, আর্থিক একচেটিয়া সুবিধা—বলশেভিক বিনাশ, গণতন্ত্রের প্রসার ও রক্ষা এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন ব্যাপার।

বলা বাহুল্য, বলরাম কিছু বুঝিতে পারেন নাই। চরক সংহিতা, ভেষজ বিজ্ঞান, নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা অথবা নিদান তত্ত্বে এর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। ছাগলাদ্য-ঘৃত তিনি নির্ভুলভাবে তৈরী করিতে পারেন, সহস্রবার পারদকে জারিত করিয়া লইবার প্রক্রিয়া তাঁহার জানা আছে, রস-সিন্দুর আর মকরধ্বজের তফাৎটা বলিয়া দিতে পারেন একবার চোখ দিয়া দেখা মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ-বিজ্ঞান নিদান তত্ত্বের চাইতেও কঠিন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।—তা ছাড়া, মণিমোহন হাসিয়া শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিল, যুদ্ধটা হচ্ছে একটা জৈবিক প্রয়োজন—দার্শনিকদের এই মত।

বলরাম হাঁ করিয়াই ছিলেন। বলিলেন, তাই নাকি? তা বেশ। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছে না তাদের এত কষ্ট দেওয়া কেন? ভাত নেই, কাপড় নেই—

—তারও দরকার আছে। একজন ডাচ্ দার্শনিক—ডাচ্ বোঝেন, ওলন্দাজ?

বলরাম বোঝেন না। তবু মাথা নাড়িতে হইল।

—স্টিনমেৎস্ তাঁর নাম। তাঁর বই আছে একটা—ফিলসফি অব্ ওয়ার। তাতে তিনি বলেছেন যুদ্ধের সময় অসামরিকদের খুব বেশি করে কষ্ট দাও খেতে দিও না—শুধু চোখ দুটো রেখে দাও জল ফেলবার জন্যে। কেন, জানেন?

—কেন?

—যাতে তারা মনে করতে পারে যে তাদের এই দুর্গতির জন্যে শত্রুরাই দায়ী। ফলে শত্রুপক্ষের প্রতি তাদের মন বিদ্বেষ ও হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আর তা হলেই যুদ্ধ জয় অনিবার্য। মুসোলিনীও এই কথাই বলেছেন! বুঝলেন তো?

বলরাম বুঝিলেন না। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও লাভ নাই। যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব অনুকূল নয়। কোনো একটা জিনিসকে তাহারা সহজ করিয়া বুঝাইতে পারে না। কোথা হইতে শক্ত শক্ত ব্যাপার আমদানী করিয়া আগাগোড়া সব কিছুকে দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য করিয়া তোলে। যুদ্ধ কেন হয়, তাহার পিছনে এই যে বিরাট তত্ত্ব আর তথ্যের অরণ্য লুকাইয়া আছে একথা কোনোদিন বলরামের কল্পনাতেই আসিয়াছিল নাকি!

কিন্তু সেই হইতে মণিমোহনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা তিনি ছাড়িয়াই দিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যে কাগজটা তিনি পড়েন, তাহার পাতায় পাতায় প্রতিদিন দেখা দেয় অস্পষ্ট আর রহস্যময় রাশীকৃত খবর। পৃথিবীতে এত জায়গা, এত বিচিত্ররকমের নাম আছে, এও কি কোনোদিন কল্পনায় আসিয়াছিল। কোনো কোনো নাম এমন উৎকট যে উচ্চারণ করিতে গেলে মানুষের আক্কেল দাঁত অবধি খট খট শব্দে নড়িয়া ওঠে এবং দুইটা বছরে বিরাট দুনিয়ার ভূগোলটা বলরামের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান ভাণ্ডার যে পুরাদমেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবে কে?

কিন্তু কী যে হইবে! জ্ঞান বাড়িতেছে বাড়ুক, দৈনন্দিন সমস্যার কোনো সমাধানই তো চোখে পড়িতেছে না। যুদ্ধটা যেন বাধিয়াছে প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে। কামানে বন্দুকে মানুষ মরিতেছে না, মরিতেছে চাল, ডাল নুন, আটা, তেল, কয়লা আর কুইনিন।

ভাবিয়া বলরাম আর থই পান না। চুলকাইতে চুলকাইতে টাকের উপরে খানিকটা রক্তপাতই করিয়া ফেলিলেন তিনি। অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন মুখে তাকিয়াটায় তিনি ঠেসান দিয়া বসিলেন। দেওয়ালের গায়ে কাঁচভাঙা ঘড়িটা স্তব্ধ হইয়া আছে—একটা বড়সড়ো টিক্‌টিকি পোকার সন্ধানে পেণ্ডুলামটার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই সেটা যেন কুম্ভকর্ণের মতো অকস্মাৎ যুগনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিরক্তভাবে মিনিট খনিক কটাকট্ শব্দ করিয়া এলোমেলো খানিকটা সময় জানাইয়া দিয়া আবার অনন্ত নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল ঘড়িটা।

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন বলরাম। বড় একটা হাই তুলিয়া তাকিয়া হইতে পিঠ খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলেন। যেন কী একটা ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া হাঁক দিলেন, রাধানাথ ?

—যাই বাবু, বাহির হইতে সাড়া দিয়া রাধানাথ প্রবেশ করিল। বৃহদাকার একটা কাদামাখা মাগুর মাছ তাহার হাতের মধ্যে ছটফট্ করিতেছে। মুখটা বিকৃত করিয়া কহিল উঃ, কাঁটা দিয়েছে শালার মাছ।

—মাছ ধরছিলি বুঝি ? বাঃ, বেশ, বেশ।—বলরাম খুসি হইয়া উঠিলেন: খুব বড় মাগুর মাছ তো। পেলি কোথায় রে ?

রাধানাথ বলিল, কাঁঠাল গাছে।

—কাঁঠাল গাছে ?

—তা ছাড়া আবার কি ? শালারা কি এমন জাত যে ধরা দেবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে ? এ ঘরের মাছ।

দপ করিয়া বলরামের উৎসাহটা নিবিয়া গেল।

—ঘরের মাছ ? তা হলে বাইরে গেল কেমন করে ?

—তা আমি কি করব বাবু ? রাধানাথ নিজেকে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইল একটা: আমার কি দোষ ? পরশু দিন এক কুড়ি কিনে হাঁড়িতে জীইয়ে রেখেছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি দুটো না তিনটে রয়েছে। হাঁড়ির ঢাকা উলটে ফেলে রাতারাতি চম্পট দিয়েছে সব। তারই একটাকে অনেক খুঁজে-পেতে ধ'রে আনলাম।

—বটে, বটে! রোষে বলরাম বিকচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন: মাছগুলো আকাশ থেকে পড়ে, তাই না ? পয়সা দিয়েই ওগুলোকে কিনতে হয় না, না ? দেখছি তুই ব্যাটাই আমাকে ফতুর করবি।

—তা কি হবে! বক বক করলে তো মাছ আসবে না। নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে প্রস্থানের উপক্রম করিল রাধানাথ।

—যাচ্ছিস্ কোথায় ? সর্বনাশ যা করবার তা তো করেছিস, এখন এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা হতভাগা।

—গালমন্দ করবেন না, সেজে এনে দিচ্ছি—গজেন্দ্র গমনে রাধানাথ বাহির হইয়া গেল। পাজী, বদমাস। নিজের মনে গালিবর্ষণ করিয়া বলরাম ক্রোধটাকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনো লাভ নাই ওকে গালিমন্দ করিয়া। চাকর বাকর লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলে এ সমস্ত ক্ষতি অপরিহার্য। কোনো জিনিসের জন্য দরদ নাই, গৃহস্থের জন্য মায়া নাই এতটুকুও। প্রাণ ভরিয়া চুরি চামারি করিতেছে নিশ্চয়।

তবু রাধানাথ না থাকার অবস্থাটাও কল্পনা করা চলে না। বিশ বছর ধরিয়া ওরই সঙ্গে সংসার করিয়া আসিতেছেন মানাইয়াও লইয়াছেন একরকম। মুখে মুখে উত্তর করে—ওই ওর দোষ; তবু বলরামের ধাতটা একরকম চিনিয়াছে, যেমন করিয়া হোক চালাইয়া লয়। মাঝখানে শুধু ছেদ পড়িয়াছিল দিন কয়েক, শুধু কয়েকটা মাস পারিবারিক জীবনের একটা স্নেহ-মধুর আস্বাদন পাইয়াছিলেন তিনি। তার পরেই—

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার চমক টনটন করিয়া উঠিল। শুধু মানসিক নয়—শারীরিকভাবেও কয়েক বছর ধরিয়া এই একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। একি আসন্ন মৃত্যুর সংকেত ? বয়স বাড়িতেছে, তাই কি অন্তিমের আহ্বান আসিয়া বুকের মধ্যে তাহার দাবীটাকে জানাইয়া দিয়া যায়।

—বাবু, তামাক।

—রেখে যা।

ফরসীতে তামাক পুড়িতেছে। নলটা মুখে করিয়া বলরাম ভাবিতে লাগিলেন একটা কথা। এতদিন ভাবিয়াও সে কথার কোনো উত্তর মেলে নাই তাঁহার কাছে। কেন চলিয়া গেল মুক্তো ? সজ্ঞানে কি অপরাধ তিনি করিয়াছিলেন যাহার জন্য সমাজ ধর্ম সব ছাড়িয়া মুক্তো এমন একটা অস্বাভাবিক জীবনকে বাছিয়া লইল ? জাতি ছাড়িল, সমাজ ছাড়িল, বিগতযৌবন মুলগাজীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল ? অপরাধ তিনি হয়তো করিয়াছিলেন, কিন্তু সেজন্য কোনো দায়িত্বই কি মুক্তোর ছিল না ? তা ছাড়া সে অপরাধের এমনি করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত হইল ? মুক্তোই কি সুখী হইতে পারিয়াছে ?

ডি সিলভার ছেলে ডিক্রুজা সংকুচিত হইয়া ঘরে ঢুকিল। ভাবনার জালটা ছিঁড়িয়া বলরাম তাহার দিকে তাকাইলেন।

—কি রে কি খবর ?

—আজ বাবাকে দেখতে যাবেন না একবার ?

—কেন, কি হয়েছে আবার! জ্বর ছাড়ে নি ?

ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া ক্রুজা বলিল, না।

ফরসীর নল দিয়া পেশাদারী ভঙ্গিতে খানিকটা ধূমোদ্গীরণ

করিলেন বলরাম: জ্বর ছাড়ল না. তাই তো। তা পাঁচনটা খাইয়েছিলি ঠিক মতো?

—হুঁ।

—আর পথ্য? সাবু?

—না, সাবু পাইনি।

—তা তো পাবিই না—নিরীহ ডি-ক্রুজার উপরে বলরাম সমস্ত ক্রোধ এবং বিরক্তি একবারে বর্ষণ করিয়া দিলেন: বাপের জন্য এতটুকু দরদ বা মায়া আছে তোর! মরে যাবে নাকি লোকটা?

—কি করব. কোথাও তো পাচ্ছি না?

—যা. আবার খোঁজ গিয়ে। পথ্য নেই. কিছু নেই. খালি খালি ওষুধেই কারো জ্বর সারে নাকি কখনো? যা. আমি যাবো বিকেল বেলায়। আর সাবধান. মুরগীর ঝোলটোল খাওয়াসনি, তা হলে বাপ কিন্তু সোজা মেরীর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছুবে. এই বলে রাখলাম।

* * *

নৌকাটা থামিতেই গঞ্জালেস্ তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর গ্রামের দিকে আগাইতে গিয়াই সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এই তো চর ইসমাইল। দশ বছর আগে সে যাহাকে পেছনে ফেলিয়া গিয়াছিল—একটা তীব্র অপমান বোধ এবং প্রতিশোধের কঠিন সংকল্প লইয়া। মরা রক্তে সেদিন বিদ্রোহী প্রাণের বান ডাকিয়া গিয়াছিল। পর্তুগীজদের মেয়েকে, তাহার ভাবী স্ত্রীকে কতগুলা বর্মী আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল! কিছু করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্, শুধু পাথরের মূর্তির মতো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আর চিত্র করা পুতুলের মতো দুইটা বিস্ময় বিহ্বল চোখ মেলিয়া শুনিয়াছিল সেই অসহ্য লজ্জা আর অপমান মেশানো পরাজয়ের কাহিনী।

ডি সুজা পাগল হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঘোলা চোখ যেন রক্ত দিয়া মাখানো বন্য জন্তুর মতো দুর্গন্ধ নিশ্বাস ফেলিতেছে। অকারণে হা হা করিয়া উঠিয়াছিল খানিকটা। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এর শোধ নিতে পারবে, লিসিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তুমি?

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের তীব্র চমক খেলা করিয়া গিয়াছিল গঞ্জালেসের। এক চুমুক বিষাক্ত হুইস্কি পান করিলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনই। মনে পড়িয়া গিয়াছিল দিগ্বিজয়ী পূর্ব পুরুষদের। যাহাদের পায়ের নীচে হাজার হাজার বুনো ঘোড়ার মতো সমুদ্র গর্জাইয়া উঠিতেছে—নোনা ফেনার রাশি গড়াইতেছে তাহাদের মুখ হইতে; আর সেই ঘোড়ার যাহারা আসোয়ার, তাহাদের মাথায় কালো চামড়ার টুপি তাহাদের চোখের দৃষ্টি শকুনের চাইতেও তীক্ষ্ণ এবং দূরগামী। বজ্র কঠিন হাতের মধ্যে ক্ষুধার্ত বন্দুক শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে দূর সীমান্তরেখায় বকের মতো পালের সারি উড়াইয়া বাণিজ্য বহর দেখা দিবে। তাহাদের জাহাজের ডেকের উপরে লোহার কামান গলা বাড়াইয়া আছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল তাহাদের পালে ড্রাগনের বিকট মুখাকৃতি।

ঠিক তাহাদের মতোই সংকল্প লইয়া. মনের মধ্যে তাহাদের মতোই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া গঞ্জালেস্ ভাসিয়া পড়িল লিসির সন্ধানে। চট্টগ্রাম, আরাকান, বর্মা। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মানুষ, এত অসম্ভব কোলাহল আর কলরব। যে একবার হারাইয়া যায় ডাকিলে সে আর শুনিতে পায় না—কলরব-মুখর জনতায় লিসিও হারাইয়া গিয়াছে।

চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছিল ডি সুজা। কিন্তু গঞ্জালেসের মনের মধ্যে যে আঘাত বাজিয়াছিল. সেটাকে তো সে ভুলিতে পারিল না। জীবন যে পথে চলিতেছিল, তাহাতে সুর কাটিয়া গেছে। কি যেন নাই, কিসের অভাবে নিজেকে একান্তভাবে ব্যর্থ আর অভিশপ্ত বলিয়া মনে হয়। সেই মানসিক অস্বস্তিটার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্যই যেন গঞ্জালেস প্রাণপণে মদ ধরিল—একান্তভাবে তলাইয়া গেল উদ্দাম একটা মত্ততার মধ্যে। তার পরের দিনগুলি সব অস্পষ্ট—কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না—যেন এক সারি ছায়া মূর্তির মিছিল চলিয়াছে। যুদ্ধ আসিল, বোমা পড়িল. গঞ্জালেস্ চোখের সামনেই দেখিল রক্ত আর আগুনের ধ্বংস লীলা। তারপরে হঠাৎ কি যে হইয়া গেল, কথা নাই. বার্তা নাই. হঠাৎ একদিন নৌকা ভাসাইয়া গঞ্জালেস্ আসিয়া দর্শন দিল চর ইসমাইলে।

কিন্তু চর ইসমাইলে কেন আসিল সে? দশ বছর পরে দিগন্ত বিস্তীর্ণ নদীর পঙ্কস্তরের উপর দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল: কোন্ খেয়ালে সে দূর সমুদ্রের মোহানার মুখে এই অখ্যাত-অজ্ঞাত দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল? অথচ যদি সে কলিকাতায় যাইত তাহা হইলে একটা আশা ভরসা ছিল জীবিকার, সবদিকের একটা বিলি-ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু এখানে আশ্রয় পাইবে কোথায়, চলিবেই বা কেমন করিয়া? আর সব চাইতে দরকারী কথা এই: হুইস্কির সদাব্রত এখানে মিলিবে কোথা হইতে?

এখানে আসিবার কি দরকার ছিল তাহার? লিসির স্মৃতি? সে স্মৃতি কি এতই মনোরম—যে জন্যে এখানে না আসিলে রাত্রে তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল? আসল কথা—সেই রাত্রের বিভীষিকা আর নেশার মাদকতা একটা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার স্নায়ুতে, তাই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই সে সোজা চর-ইসমাইলের উদ্দেশ্যেই নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এখন কোথায় যাইবে সে, কী করিবে?

গঞ্জালেস্ নিজের মনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিস্ দিতে লাগিল। এমন সময় তাহার দেখা হইল ডি-ক্রুজার সঙ্গে।

চোখের দৃষ্টি সংকুচিত করিয়া গঞ্জালেস্ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিল ডি ক্রুজাকে। তারপর ডাকিল, এই ছোকরা শুনে যা, আয় ইদিকে।

বিচিত্র সম্ভাষণে ক্রুজা চমকিয়া দাঁড়াইল। মুখের উপরে বিদ্রোহ ঘনাইয়া তুলিয়া বলিল, আমাকে ডাকছ?

—তা ছাড়া আর কাকে ডাকব? ওই সুপুরী গাছটাকে নাকি?

—কেন, কি দরকার?

—তোদের বাড়ি কোথায়?

—জানি না—উদ্ধতভাবে ক্রুজা ফিরিবার উপক্রম করিল।

—এই, দাঁড়া—খপ করিয়া একটা থাবা মারিয়া তাহার কাঁধটা চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্: বেশি বগামি করিস্ তো এক চাটিতে চোয়াল উড়িয়ে দেব। চিনিস আমাকে?

ডি ক্রুজা চেনে না। কিন্তু গঞ্জালেসের আরক্ত চোখ এবং প্রকাণ্ড একখানা হাতের স্পর্শে চিনিতে তাহার বেশিক্ষণ সময় লাগিল না। ক্ষীণস্বরে বলিল কি করতে হবে?

—আমি তোর মামা বুঝলি? তোদের বাড়িতে বেড়াতে এলাম।

ক্রুজা হাঁ করিয়া রহিল।

—অমন করে তাকিয়ে আছিস কি? নে নৌকো থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ফেল সব, তারপর নিয়ে চল তোদের বাড়ীতে। ভয় নেই, তুইও বাদ পড়বি না।

পকেট হইতে একটা চকচকে নতুন টাকা বাহির করিল গঞ্জালেস্। আঙুলের উপরে সেটাকে বার কয়েক নাচাইয়া টং টং করিয়া বাজাইল। বলিল দেখেছিস?

ক্রুজা কী ভাবিল কে জানে তারপর নিঃশব্দে নৌকার দিকে অগ্রসর হইল।

দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে নদীর বিশাল জলরাশি তখন জ্বলিতেছে।

(ক্রমশঃ)

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস্-এস, এফ্-আর্-ই-এস্

১৫

প্রাদেশিক কনফারেন্স

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নাটোরের মহারাজার কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে উমেশচন্দ্র নাটোরে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে নাটোরে প্রাদেশিক কনফারেন্সও আহূত হইয়াছিল, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও তথায় গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববৎসর কৃষ্ণনগরে যে কনফারেন্স হয়



উমেশচন্দ্র (৫৫ বৎসর বয়সে)



মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

তাহাতে মনোমোহন ঘোষ নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক প্রস্তাবের সমর্থনে অন্ততঃ একজন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। নাটোরের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উক্ত ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করিয়া কেবল বাঙ্গালায় সম্মেলনের কার্য্য পরিচালিত করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজা তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত অভিভাষণের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের ইংরাজী অভিভাষণ পাঠ করিবার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালাতেই বক্তৃতা করেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র যখন আসিয়া বলিলেন "একি ছেলেখেলা নাকি? ইংরাজদের অবগতির জন্য প্রত্যেক প্রস্তাবের অনুকূলে অন্ততঃ একটি বক্তৃতা ইংরাজীতে হওয়া আবশ্যক," তখন সকলেই তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই কনফারেন্সের সময়েই ভীষণ ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। স্যর শঙ্করণ নায়ার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি



স্যর শঙ্করণ নায়ার

ছিলেন গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দে। প্লেগের সময় নানা অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া এক অভিযোগ হইয়াছিল এবং সেই সম্পর্কে আন্দোলন করার জন্য নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে এক অতি প্রাচীন আইনের সাহায্যে আটক করা হয়। বালগঙ্গাধর তিলকও রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হন। গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ সূচক একটি প্রস্তাবের ভার উমেশচন্দ্রের প্রতি অর্পিত হয় এবং তিনি গভীর আইন জ্ঞানের ও সূক্ষ্ম তর্কশক্তির পরিচয় দিয়া নবপ্রবর্ত্তিত বিদ্রোহবিষয়ক আইনের সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেন।

কংগ্রেসের চতুর্দ্দশ অধিবেশন

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতির ভাষণে গ্লাডষ্টোনের মৃত্যুর জন্য শোক



বালগঙ্গাধর তিলক

প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উমেশচন্দ্র গ্লাডষ্টোনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গ্লাডষ্টোনের জন্মদিন ও তাঁহার জন্মদিন একই দিন—২৯শে ডিসেম্বর। তিনি বলিতেন প্রতি বৎসর তাঁহার নিজের জন্মদিনে গ্লাডষ্টোনকে তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করিতেন। স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু লিখিয়াছেন, "যদি উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তিনি লর্ড চ্যান্সেলর হইতে পারিতেন।" হয়ত গ্লাডষ্টোনের প্রতিভা তাঁহার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু তাহা প্রস্ফুটিত হইবার উপায় ছিল না। উমেশচন্দ্র বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিতে গেলে প্রায়ই ছাত্রগণকে গ্লাডষ্টোনের চরিত্রের অনুকরণ করিতে বলিতেন। বাস্তবিক এরূপ চরিত্র দুর্লভ।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে উমেশচন্দ্রেরই পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁহার ভগিনী মোক্ষদা দেবীর স্বামী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেন এবং এই ঘটনায় উমেশচন্দ্র বিশেষ শোকান্বিত হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন

রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্যচর্চ্চার জন্য অকালে সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে রমেশচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচিত করা হইল। বংশীলাল সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। রমেশচন্দ্রের অভিভাষণ পাঠ করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন একটি প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন,—

"সম্প্রতি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতির একজন অপক্ষপাতী সমালোচকের একটি চমৎকার বক্তৃতা পাঠ করিলাম। তিনি সরলভাবে



রমেশচন্দ্র দত্ত

ও অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অনেক উপকার হইয়াছে এবং উহা জনহিতকল্পে পরিচালিত হইয়াছে কিন্তু তিনি



স্যর নারায়ণ চন্দ্রবরকর

একটি নূতন পরিবর্তন ইচ্ছা করেন, ভারতগবর্ণমেণ্ট শুধু দেশবাসীর জন্য নহে, দেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।"

রমেশচন্দ্র পরে একটি বক্তৃতায় লর্ড জর্জ হ্যামিণ্টনের প্রশংসাসূচক অভিমতের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে একেবারে ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। উমেশচন্দ্রও স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না এবং তৎকালীন অবস্থায় (কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়) জানিতেন

"একত্রে ওদেরি সাথে উত্থান পতন।"

রমেশচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী টাউনহলে কলিকাতাবাসী এক বিরাট সভায় রমেশচন্দ্রকে একটি বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। এই সভায় উমেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন

১৯০০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেবারে নারায়ণ চন্দ্রবরকর সভাপতি ছিলেন এবং বাবু কালীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর অভ্যর্থনা



স্যর দীনশা ওয়াচা

সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই অধিবেশনে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিবার সংকল্প করা হয়। প্রস্তাবগুলিতে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পার্থক্যসাধন এবং দুর্ভিক্ষজনিত প্রজাদের ভীষণ দারিদ্র্যের প্রতিকার-চেষ্টার কথা ছিল। নিম্নলিখিত প্রতিনিধিকে লর্ড কার্জনের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে স্মারকপত্র প্রদানের ভার প্রদত্ত হয়:—

মাননীয় ফিরোজশাহ মেটা, মাননীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় আনন্দ চার্লু, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মুন্সী মাধো লাল, মিঃ আর এন মুধোলকার, মিঃ রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী ও লালা হরিকষণ লাল।

কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বীডন উদ্যানে কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন দীনশা ঈদলজী ওয়াচা এবং অভ্যর্থনা

সমিতির সভাপতি ছিলেন নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়। এই সভাতে সরলা দেবীর রচিত ও তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত ৫৮জন গায়ক



সরলা দেবী (তরুণ বয়সে)

দ্বারা সে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত 'অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণি' গীত হয়, সরলা দেবী তদীয় জীবন স্মৃতিতে এই গীত রচনার বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ "নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানর ভার" লইয়াছিলেন।

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি ! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান' !
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ পূরিত সেই নাম গান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর,
নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান্।
হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান" !
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্য গান !
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্য গান !
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সজ্ঞে, লক্ষ্যে কায় মনঃপ্রাণ।
বঙ্গ বিহার ইত্যাদি—
সকল-জন-উৎসাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !
উঠাও কর্ম্ম নিশান ! ধর্ম্ম বিষাণ ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ !
বঙ্গ বিহার ইত্যাদি।

এই অধিবেশন উপলক্ষে রসরাজ অমৃতলাল বসু 'নবজীবন' নামক "মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা" প্রণয়ন ও অভিনীত করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালায় প্রথম সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাতে ৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারত মাতা' নামক একটী একাঙ্ক নাট্যলীলা অভিনীত হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশপ্রেমোদ্দীপনের ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। প্রপীড়িতা ভারতমাতা যেখানে মর্ম্মস্পর্শিনী স্বরে ভগবানকে এবং তাঁহার পরলোকগত সুসন্তান গণকে—হিন্দুপেট্রিয়টের স্বদেশবৎসল সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং 'স্বদেশরক্ষার ভীম' বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষকে "কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, কোথা রামমোহন, কোথা রামগোপাল" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছা যাইতেন, সে দৃশ্য দর্শকগণের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ তুলিত। অমৃতলাল এই "ভারতমাতা" হইতে প্রেরণা লইয়া "নবজীবন" রচনা করেন। উহার একস্থানে যখন একজন সন্ন্যাসী "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গীতটি গাহিলে ভারতমাতা বলিয়া উঠিলেন,—

"কে রে—কে রে ?—চুপ কর্—আর বলিসনে, নির্ব্বাণ আগুন জ্বেলে আমার প্রাণ আর দগ্ধ করিসনে ; তারা গেছে— যারা আমার সুসন্তান ছিল, সব গেছে ! কে আর আমার দুঃখ মোচন করবে ? কে আর আমার মুখপানে চাইবে ?"—তখন ভারত সন্তান বলিতেছেন…"মা, আমরা আছি,—আমরা আছি। তুমি পুত্রহীনা নও মা।" এবং একজন বলিতেছেন—

"মা ! ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে, এই যে জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপিত হয়েছে—বড় ক্ষুদ্র অঙ্কুর মা ! কিন্তু তোমার উর্ব্বর মৃত্তিকা আর ইংলণ্ডের বারি সিঞ্চন বিফলে যাবে না। * * * বোম্বাই মান্দ্রাজ পশ্চিম পঞ্জাব দাক্ষিণাত্য মধ্যদেশ আজ অনেক সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেছেন ; বঙ্গে বিদ্যাসাগর, (১) হরিশ, (২) গিরিশ, (৩) কৃষ্ণদাস, (৪) রামমোহন, (৫) মনোমোহন, (৬) রামগোপাল, (৭)

(১) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি-আই-ই

(১) 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৩) 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলীর' প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(৪) 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক রাজনীতি বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল সি-আই-ই

(৫) যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়

(৬) দীনবন্ধু মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার-এট-ল

(৭) 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনীস' রামগোপাল ঘোষ—

নবগোপাল, (৮) রাজেন্দ্রলাল (৯) আদি গেছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, (১০) উমেশচন্দ্র আছে, (১১) রমেশচন্দ্র আছে, (১২) আনন্দমোহন আছে, (১৩) সুরেন্দ্রনাথ আছে ; (১৪) গুপ্তভাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধীজন আছেন ; তোমার পূজার জন্য জীবনবলিদানও তাঁরা তুচ্ছ করেন ! আশীর্ব্বাদ কর মা—তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হন, তাদের প্রাণের এই উৎসাহ, এই মাতৃভক্তি যেন প্রদীপ্ত থাকে। তা হলে এই ইংরাজরাজ্যে আবার তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখ্‌বো, আবার সকলে একমনে একতানে বঙ্কিমের সেই মধুর গাথা "বন্দেমাতরম্‌" গাইবো !"

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে ভগ্নস্বাস্থ্য উমেশচন্দ্র শেষ যোগদান করেন। বহুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল এবং প্রতি বৎসর বিলাতে কয়েক মাস করিয়া অবস্থান করত নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি হাইকোর্টের অসাধারণ প্রসার প্রতিপত্তি পরিহারপূর্ব্বক শেষ জীবন ইংলণ্ডে বাস করিতে এবং তথায় প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল যে অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় মোকদ্দমার আপীল বিচারের জন্য প্রিভি কৌন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটিতে ভারতীয় ব্যবহারজীবগণকে নিযুক্ত করা উচিত। হয়ত তাঁহার দেশবাসীর জন্য এই অধিকার লাভের ইচ্ছাও তাঁহার প্রিভি কৌন্সিলে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

(৮) হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক, 'ন্যাশন্যাল পেপার'-সম্পাদক, নবগোপাল মিত্র—

(৯) প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই

(১০) 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ—

(১১) বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার-এট-ল

(১২) সুপণ্ডিত ও সুলেখক রমেশ দত্ত সি-আই-ই

(১৩) শিক্ষাসুহৃদ্‌ আনন্দমোহন বসু ব্যারিষ্টার-এট-ল

(১৪) 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক বাগ্মী স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নঞ্‌তৎপুরুষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বনফুল

২

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। অসম্ভব রকম গরম পড়েছে। সেদিন পুরন্দরবাবুকে ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে খুব, পায়ে হেঁটে গাড়ি চড়ে'—সবরকমে। কর্পোরেশনের নামজাদা মেম্বার এবং উকীল বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছেন না তাঁকে। শেষে ঠিক করেছেন সন্ধে-বেলা বালিগঞ্জে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অতর্কিতে ধরবেন। ছটার সময় একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। রোজই ঢোকেন। রোজই প্রায় টাকা দেড়েক খরচ হয়ে যায়। আগে—যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল—দশ টাকার কম হত না। এখন দেড় টাকায় কুলিয়ে নিতে হয়। অবস্থা খারাপ হয়েছে—উপায় কি ! খেতে বসে যদিও রোজ মনে হত এসব অখাদ্য খাওয়া যায় না—খেতে আরম্ভ করলে কিন্তু শেষ করে' ফেলতেন সব—কিছু পড়ে' থাকত না। বরং এমন গোগ্রাসে খেতেন যেন কতদিন উপবাসী আছেন। তৃপ্তিও যে না হত তা নয়। নিজের এই বুভুক্ষা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যেতেন। ভাবতেন—"দুষ্টু ক্ষিধে এ। স্বাভাবিক নয়। হতেই পারে না !"

সেদিন হোটেলে যখন ঢুকলেন তখন মনটা খিঁচড়ে আছে। চেয়ারটা সশব্দে টেনে বসলেন, টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসেই রইলেন খানিকক্ষণ। খোশমেজাজে থাকলে তিনি শিষ্টতার চরম করতে পারেন—কিন্তু এখন মনের অবস্থা এমন যে সামান্যতম কারণে চীৎকার চেঁচামেচি করে' প্রলয়কাণ্ড করে' বসাও অসম্ভব নয় কিছু। অকারণে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে হুকুম করলেন—এই কাটলেট্‌ দিয়ে যা ! কাটলেট্‌ দিয়ে গেল…ভেঙে খেতে যাবেন…হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে গেল…ভগবান জানেন কি করে'—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেন তিনি তাঁর অবসাদের মূল কারণটা আবিষ্কার করে' ফেললেন। বিশেষ করে' এই ক'দিন থেকে যে অনির্দ্দিষ্ট অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাটা তিনি ভোগ করছিলেন—এক মুহূর্ত্তের জন্য যা নিস্তার দেয় নি তাঁকে—হঠাৎ যেন তার কারণটা বুঝতে পারলেন তিনি। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্ত।

"সেই লোকটা !"…একটু উত্তেজনাভরেই অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন তিনি —"বেঁটে রোগা সেই লোকটা ঠিক !"

ভাবতে লাগলেন এবং যতই ভাবতে লাগলেন ততই যেন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মনটা। অসাধারণ অদ্ভুত লোকটা ! কিন্তু না, অসাধারণই বা কেন, অদ্ভুতই বা কি আছে এতে। বেঁটে রোগা লোক তো কত আছে !

প্রায় দিন পনের আগে—ঠিক মনে ছিল না তাঁর, কিন্তু পনের দিনই

হবে—কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের চৌমাথাটায় লোকটাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। বেঁটে রোগা লোকটা। খুর খুর করে' চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পুরন্দরবাবুর মনে হল মুখটা যেন চেনাচেনা। কোথায় যেন দেখেছেন। তখনই আবার মনে হল "জীবনে কত সহস্র মুখই তো দেখেছি—সব মনে রাখা সম্ভব না কি!" এগিয়ে গেলেন এবং প্রায় ভুলেই গেলেন তার কথা। কিন্তু মনের অবচেতনলোকে ছাপটা লেগেই রইল এবং ক্রমশঃ যেন একটা নাম-হীন বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। এখন, পনের দিন পরে সমস্তটা স্পষ্ট মনে পড়ছে আবার, এ ক'দিনের বিরক্তির কারণই যে ওই তাও বুঝতে পারছেন এখন। আগে ধরতে পারেন নি…আজও সকালে দেখা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে—তাই সমস্ত দিন মনটা খিঁচড়ে আছে। আগে একেবারেই এটা মাথায় ঢোকে নি তাঁর।

বেঁটে লোকটা কিন্তু ভোলবার অবসর দিলে না তাঁকে। তারপর দিনই আবার দেখা হল রাস্তায়—ওই হ্যারিসন রোড কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়েই। ঠিক তেমনি করে থমকে দাঁড়াল, ঠিক তেমনি করে' একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। "চুলোয় যাক্"—পুরন্দরবাবু ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। এক একটা লোককে দেখলে এমন বিতৃষ্ণা হয়!

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর আবার মনে হল—"এর আগে লোকটাকে কোথাও দেখেছি"—সমস্ত সন্ধ্যেটা মেজাজ খারাপ হয়ে রইল। রাত্রে একটা দুঃস্বপ্নও দেখলেন। এর কারণও যে ওই লোকটা হতে পারে তা মনে হ'ল না তাঁর। সন্ধ্যেবেলা তো তার কথা একবারও ভাবেন নি তিনি। আর তা ছাড়া ওই রকম একটা অপদার্থ লোক যে তাঁর মনকে এতটা অধিকার করে' থাকবে তাঁর মেজাজ খারাপ করে' দেবে, এ কথা স্বীকার করাও যে লজ্জাকর! দু'দিন পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হল একটা ভীড়ের মধ্যে। মনে হল লোকটা তাঁকে চিনতে পেরেছে যেন। তার দিকে এগিয়েও আসছিল, কিন্তু ভীড়ের জন্য পারলে না, নমস্কার করবার জন্য হাতও তুলেছিল। চীৎকার করে' ডাকলে নাম ধরে' মনে হল…পুরন্দরবাবু এটা অবশ্য ঠিক শুনতে পান নি। রাগ হল তাঁর—"কে লোকটা! আমাকে যদি চিনেই থাকে কাছে আসছে না কেন! এমন ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার মানেটা কি?" একটা গাড়ি ডেকে তাতে চড়ে' বসলেন। খানিকক্ষণ পরেই মামলা নিয়ে উকীলের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করলেন খুব। সন্ধ্যেবেলা কিন্তু মন আবার অবসন্ন হয়ে পড়ল—অদ্ভুত রকম একটা অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, "লিভারটাই খারাপ হয়েছে সম্ভবত। শরীরে জুৎ পাচ্ছি না কিছুতে…"

এই তৃতীয় সাক্ষাৎ। এর পর উপর্যুপরি আর দেখা হয় নি পাঁচদিন। তবু কিন্তু মন থেকে দূর হয় নি সে। পুরন্দরবাবু একথা আবিষ্কার করে' চমকেই গেলেন একদিন—"লোকটার জন্যই শরীর খারাপ হচ্ছে না কি! অদ্ভুত তো! কি করছে ও কোলকাতায় এতদিন ধরে'। আমাকে চিনতে পেরেছে? কিন্তু, আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না তো। উস্কো-খুস্কো চুল, করুণ চোখের দৃষ্টি। করুণ দৃষ্টি হবার মানে কি! কাছে গিয়ে ভাল করে' দেখলে চিনতে পারব বোধহয়…"

বিস্মৃতি-সাগরে তরঙ্গ উঠল যেন দু'একটা—মনে আসছে আসছে, কিন্তু আসছে না। অনেক সময় একটা নাম বা কথা যেমন মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না, তেমনি। নাগাল পেয়েও যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

"অনেক দিন আগে…ঠিক কোথায় যেন…ও…না-না—চুলোয় যাক। কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছি…"

ভয়ঙ্কর রাগ হল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ মনে পড়ল যে সকালে রাগ হয়েছিল এবং 'ভয়ঙ্কর' রাগ হয়েছিল। মনে হতেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন…যেন কোন দুষ্কার্য্য করছিলেন ধরা পড়ে গেছেন। শুধু আশ্চর্য্য নয়, কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কি যে ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাগ হবার কারণ কি!

"নিশ্চয়ই হেতু আছে কোন…তা না হলে কোথাও কিছুই নেই… আশ্চর্য্য!" এর বেশী আর ভাবনা এগোল না সেদিন।

তার পরদিন আরও বেশী রাগ হল এবং মনে হ'ল যে রাগ হবার সঙ্গত হেতুও আছে, রাগ করে' কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি তিনি। একি কাণ্ড! চতুর্থবার দেখা হয়েছিল বেঁটে লোকটার সঙ্গে। লোকটা এবার হঠাৎ যেন আবির্ভূত হল—মাটি ফুঁড়ে বেরুল যেন। কর্পোরেশনের মেম্বার নামজাদা উকীল বিশ্বম্ভর বোসের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল…বালিগঞ্জে এঁরই বাড়িতে অতর্কিতে সন্ধ্যেবেলা যাবেন ভেবেছিলেন…ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না…কিন্তু মকোর্দ্দমার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন। অপরিহার্য্য ব্যক্তিটি কিন্তু ক্রমাগতই পুরন্দরবাবুকে এড়িয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তারই সঙ্গে রাস্তায় দেখা! পুরন্দরবাবু কথা কইতে কইতে তাঁর পাশে পাশে হাঁটছিলেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন তাঁকে বাগাতে। আর কিছু নয় একটা ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গেও ভদ্রলোক যদি দু'একটা কথা ফাঁস করে' ফেলেন—ওই দু'একটা কথা জানতে না পারলে পুরন্দরবাবুর মামলার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কিন্তু চতুর বৃদ্ধ উকীল ঘাড় নেড়ে মুচকি হেসে আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন ক্রমাগত। পুরন্দরবাবুও ছাড়বার পাত্র নন। নানা যুক্তি বিস্তার করে' তিনিও জড়াবার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোককে, ঠিক এই সময়ে সামনের ফুটপাথে হঠাৎ বেঁটে লোকটা আবির্ভূত হল। তাদের দুজনের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে…মনে হল তার চোখেমুখে একটা বিদ্রূপও ফুটে উঠেছে যেন।

উকীল ভদ্রলোককে তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে পুরন্দরবাবু ভাবলেন—আঃ, কি পাপের ভোগ! ওই অপয়াটার জন্যই সব মাটি হয়ে গেল বোধ হয়। একটি কথাও বার করতে পারা গেল না! লোকটার উদ্দেশ্য কি? গোয়েন্দা নয় তো! মনে হচ্ছে পিছু নিয়েছে! কেউ লাগিয়ে দিয়েছে হয় তো…কিম্বা…কিন্তু না, ওর চোখে মুখে একটা

ব্যঙ্গ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে মনে হল যেন। কাকে ব্যঙ্গ করছে? আমাকে? চাবুকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব ব্যাটার। আজই একটা হাণ্টার কিনতে হবে। না, এর বিহিত করা দরকার অবিলম্বে। কে লোকটা? জানতেই হবে, জানতেই হবে যেমন করে' হোক…।

এই চতুর্থ সাক্ষাতের তিন দিন পরে উপরোক্ত হোটেলে পুরন্দরবাবু সত্যই অত্যন্ত বিচলিত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রবল অহঙ্কার সত্ত্বেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। আগাগোড়া সমস্ত পর্য্যালোচনা করে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে গত পনর দিনের সমস্ত অবসাদ, সমস্ত হতাশা, সমস্ত মানসিক বিকারের একমাত্র কারণ ওই রোগা বেঁটে লোকটা! "হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়েছে"—তাঁর মনে হল—"হয়তো তুচ্ছ একটা জিনিসকে বড় করে দেখছি…কিন্তু 'হয় তো'র ওপর নির্ভর করে এটাকে কল্পনা-বিলাস বলে' উড়িয়ে দিয়েও তো লাভ নেই! কি সুবিধে হবে তাতে! রাস্তার যে কোন বদমাস যদি এমনভাবে বিপর্য্যস্ত করে' ফেলতে পারে আমাকে—তাহলে তো… মানে তাহলে তো…"

এই পঞ্চম সাক্ষাৎটা—যা এত বিচলিত করেছিল পুরন্দরবাবুকে—ওই বেঁটে লোকটির দিক থেকে বিচার করলে খুব যে আপত্তিকর তা নয়। পুরন্দরবাবুই বরং অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলেন। বেঁটে লোকটি বিশেষ কিছু করে নি। পুরন্দরবাবুর পাশ দিয়ে একটু দ্রুতবেগে সে চলে গিয়েছিল কেবল। তাঁর দিকে তাকায় নি, তাঁকে যে সে চিনতে পেরেছে এমনও কোন ভাব প্রকাশ করে নি, বরং চোখ নীচু করে' কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে' যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই চলে গিয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই, শুনছেন মশাই, পালাচ্ছেন কেন—শুনুন শুনুন—কে আপনি…"

এ রকম প্রশ্ন (বিশেষতঃ ওই চীৎকারটা) খুবই অশোভন হয়েছিল। পুরন্দরবাবু পরে সেটা হৃদয়ঙ্গমও করেছিলেন। বেঁটে লোকটা তাঁর চীৎকার শুনে একবার ঘুরে দাঁড়াল, মনে হল যেন হকচকিয়ে গেছে, তার পর হাসল একটু, পরমুহূর্ত্তেই মনে হল কি যেন বলতে চাইছে, দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দু' এক সেকেণ্ড, তার পর হঠাৎ ঘুরে ছুট দিল উদ্ধশ্বাসে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাবলেন—"মনে হচ্ছে ও নয় আমিই যেন গায়ে-পড়ে' আলাপ করতে চাইছি। আমার অদ্ভুত আচরণ থেকে তাই বোঝায় অন্ততঃ—"

হোটেলের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি বালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে। কর্পোরেশনের সেই উকীল ভদ্রলোককে ধরতেই হবে যেমন করে' হোক। গিয়ে দেখেন তিনি বাড়ি নেই। শুনলেন ধর্ম্মতলায় কোথায় যেন নিমন্ত্রণ খেতে গেছেন কার জন্ম-তিথি উপলক্ষে। কখন ফিরবেন ঠিক নেই, রাত্রে না-ও ফিরতে পারেন। ঠিকানাটা জেনে নিলেন পুরন্দরবাবু,—একবার মনে করলেন ধর্ম্মতলায় গিয়েই ধরবেন তাঁকে। কিন্তু একটু পরেই মনে হল অনিমন্ত্রিত যাওয়াটা অনুচিত হবে সেখানে। রাগ হল ভয়ানক! গাড়িটা ছেড়ে দিলেন—সুরু করলেন হাঁটতে। শ্যামবাজার অনেক দূর—হোক দূর—হেঁটেই যাবেন তিনি। শরীরটা চালনা করা দরকার। যেমন করে' হোক অনিদ্রাটা দূর করতে হবে, আজ রাত্রে অন্ততঃ ভাল ঘুম হওয়া নিতান্ত দরকার…সমস্ত দেহ মন এমন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে…ক্লান্ত না হলে ঘুম আসবে না। হাঁটতে লাগলেন। বাড়ি এসে পৌঁছলেন রাত এগারোটায় এবং সত্যিই তখন অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি।

যে বাসাটা পুরন্দরবাবু ভাড়া করেছিলেন—যদিও অহরহ তার নানারকম খুঁত তাঁর চোখে পড়ত—যদিও তিনি রোজ অন্তত পঞ্চাশ বার বলতেন যে লক্ষ্মীছাড়া মকোর্দ্দমাটার জন্যে তাঁকে এই হতচ্ছাড়া বাসাটায় বাধ্য হয়ে বাস করতে হচ্ছে—বাসাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ ছিল না। দোতলায় খান-দুই চমৎকার ঘর—বাথরুম—তা ছাড়া আর একটি ছোট ঘর। পুরন্দরবাবু এটাকে নিজের পড়ার ঘর বানিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ সেখানে একটা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার, টেবিলের উপর খবরের কাগজ, বইপত্র ছড়ানো থাকতো। পুরন্দরবাবু যে ঘরটায় শুতেন—সেটা বেশ বড় ঘর—ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের কোণে একটা সোফা ছিল তাতেই শুতেন তিনি। ঘরের আসবাবপত্রগুলিও নেহাত খেলো নয়, যখন অবস্থা স্বচ্ছল ছিল তখনকার দিনের শৌখীন জিনিসও ছিল দু'চারটে। ভাল চীনেমাটির বাসন কিছু, ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি কয়েকটা, ভাল একখানা কার্পেট, ভাল ছবি গোটা দুই…কিন্তু সবই মলিন, ধূলিধূসরিত, এলোমেলো। তাঁর চাকর রামা বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে চারদিক আরও যেন অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। রামা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। দারোয়ানের ভাই হরির তার বদলে কাজকর্ম্ম করে দেওয়ার কথা। সেই আশায় তিনি যখন বাইরে যান, ঘরের চাবি দারোয়ানের কাছে রেখে যান। হরি কিন্তু মাইনেটি নেওয়া ছাড়া আর কিছু করে না। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ছোঁড়ার হাতটানও আছে সম্ভবত। কিন্তু সবই তিনি সহ্য করেন—যা হয় হোক! বেশ তো আছেন একা একা! একা কিন্তু থাকারও একটা সীমা আছে। মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হত। বিশেষতঃ ঘরে ফিরে যখন দেখতেন—চতুর্দ্দিক অপরিচ্ছন্ন, বিছানা অগোছালো, টেবিলে, চেয়ারে, ছবিতে, আয়নায় ধুলো জমে আছে।

সেদিন কিন্তু এসব কিছু হ'ল না। জুতো জামা খুলেই সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুমুতে হবে…বাজে চিন্তা করে' সময় নষ্ট করা হবে না…। বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমিয়েও পড়লেন। এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা গত এক মাসের মধ্যে ঘটে নি।

তিন ঘণ্টা ঘুমোলেন তিনি। গভীর ঘুম কিন্তু নয়। স্বপ্ন দেখলেন নানারকম। অদ্ভুত সব স্বপ্ন—লোকে জ্বরের ঘোরে যেমন স্বপ্ন দেখে অনেকটা তেমনি। যেন তিনি একটা দুষ্কর্ম্ম করে লুকিয়ে আছেন—লোকে তা জানতে পেরেছে…দলে দলে তাঁর দিকে আসছে সব। প্রকাণ্ড ভীড় জমে গেছে একটা। কিন্তু আসছে, ক্রমাগতই আসছে। ঘরের কপাট বন্ধ করা যাচ্ছে না…ভীড়ের মধ্যে তিনি কিন্তু একদৃষ্টে একটি লোককেই দেখছিলেন কেবল—তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন, অনেকদিন আগে মারা গেছে…এ হঠাৎ এল কি করে! আর সব চেয়ে বিব্রত বোধ করছিলেন তার নাম মনে না করতে পেরে। কিছুতেই নামটা

মনে পড়ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল খুব ভালবাসতেন তাকে। সমস্ত জনতাও যেন তারই মুখের দিকে চেয়েছিল—সেই যেন ঠিক করে' দেবে পুরন্দর দোষী না নির্দোষ···সবাই যেন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে টেবিলের ধারে চুপ করে' বসেছিল। কিছুতেই কথা বলবে না। গোলমাল বাড়তে লাগল, অস্থির হয়ে উঠছে সবাই··· সে কিন্তু নির্ব্বাক। এ নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল পুরন্দরবাবুর পক্ষে··· তিনি উঠে ঠাস করে' একটা চড় মারলেন তাকে চুপ করে থাকার জন্ম। আর মেরে যেন উপভোগ করলেন সেটা। ভয় হল, দুঃখ হল, যা করলেন তার জন্যে শিউরে উঠলেন মনে মনে—কিন্তু শিহরণটাও উপভোগ করলেন যেন। উত্তেজিত হয়ে—আবার মারলেন তাকে, আর একবার, আর একবার, আর একবার···রাগে, ক্ষোভে, আতঙ্কে যেন বুঁদ হয়ে গেলেন, শেষে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, উন্মাদনার অন্তরালে অদ্ভুত একটা আনন্দও যেন শির শির করে' বইতে লাগল শরীরের শিরা-উপশিরায়··· ক্রমাগত মেরে যেতে লাগলেন···যেন থামতে পারছেন না। মনে হতে লাগল নিঃশেষ করে ফেলি সব—চুরমার করে ফেলি সমস্ত। হঠাৎ বিপর্য্যয় ঘটে গেল একটা। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে খোলা দরজাটার দিকে ছুটল কিসের প্রত্যাশায় যেন···আর সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। তিন বার বাজল···ঝন-ঝন ঝন-ঝন ঝন-ঝন··· ঝনাৎকারের চোটে আকাশ ভেঙে পড়বে যেন। পুরন্দরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল···তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটলেন তিনিও। ইলেকট্রিক বেলটা স্বপ্ন নয়—তাঁর মনে হল—সত্যিই এসেছে কেউ। এমন তীক্ষ্ণ প্রবল ঝনৎকার স্বপ্ন হতে পারে না কিছুতে···।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এটাও স্বপ্ন। দরজাটা খুললেন, সিঁড়ির কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন পর্য্যন্ত। কোথাও কেউ নেই। আশ্চর্য্য লাগল বটে, কিন্তু আরামও পেলেন মনে মনে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন, তার পর মনে হল কপাটে খিল দেন নি। ফিরে দেখলেন একবার, না খিল দেন নি, ভেজান আছে। আগেও অনেকবার রাত্রে ফিরে ঘরে খিল দিতে ভুলেছেন তিনি। কি আর হবে—থাক। ঘড়িতে আড়াইটে বাজার শব্দ হল।···তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন তাহলে।

স্বপ্ন দেখে মনটা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে আর শুতে ইচ্ছে হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। জানালার কাছে গিয়ে পরদাটা সরিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মকালের রাত্রি শেষ হয়ে এল প্রায়—ভোরের আভাস দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নটা কিন্তু কিছুতেই তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। ওই লোকটাকে তিনি যে মেরেছেন—মারা যে সম্ভব হল তাঁর পক্ষে—এই অনুভূতিটাই কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না।

"ও রকম লোক নেই, কেউ ছিল না, থাকতে পারে না—ওটা শুধু স্বপ্ন। কেন মাথা ঘামাচ্ছি এ নিয়ে!"

যতই নিজেকে বোঝাতে লাগলেন ততই উত্তেজনা বাড়তে লাগল, ততই যেন মনে হতে লাগল তাঁর সমস্ত কষ্টের মূল কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয়···আসন্ন একটা বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে।

ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন এ কথা ভাবলে কষ্ট হত তাঁর। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেলে নিজেকে আরও কষ্ট দেবার জন্ম নিজের বার্দ্ধক্য এবং দৌর্ব্বল্যকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতেন তিনি।

"জরা"—মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি—"হ্যাঁ জরাই। জরা ছাড়া আর কি। শরীরে শক্তি নেই—স্মরণ শক্তিও নেই···তাছাড়া ভূত দেখছি...অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছি···স্বপ্নে ঘণ্টা বাজছে! চুলোয় যাক ···চুলোয় যাক···একটা অসুখ করবে আর কি···অসুখেরই পূর্ব্বলক্ষণ এ সব। ওই বেঁটে লোকটাও স্বপ্ন সম্ভবতঃ কাল যা ভাবছিলাম, আমিই তার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, সে কিছু করে নি...সবই আমার সৃষ্টি। নিজেই ভূত সৃষ্টি করছি, নিজেই তার ভয়ে টেবিলের তলায় লুকোচ্ছি। আশ্চর্য্য—তার উপর রাগই বা হচ্ছে কেন, ছোটলোকই বা বলছি কেন তাকে মিছিমিছি! হয় তো খুবই ভদ্রলোক সে আসলে। দেখতে ভাল নয়। বেঁটে—তাতে হয়েছে কি···পোষাক-পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মতই। কিন্তু লোকটার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা আছে···ওই, আবার শুরু করেছি। তার কথা বার বার ভাববার দরকার কি। তার চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তা আবিষ্কার করে' কি হবে আমার ঘোড়ার ডিম! ও ছাড়া কি আর ভাববার কিছু নেই!···"

হঠাৎ একটা কথা ভেবে মনের ভেতরটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। হঠাৎ তাঁর বিশ্বাস হল ওই বেঁটে লোকটা তাঁর পূর্ব্বপরিচিত—শুধু পূর্ব্বপরিচিত নয়, তাঁর জীবনের কোন গোপন কথা জানা আছে ওর, তাই দেখা হলেই চোখে ওই দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

জানালাটা ভাল করে' খুলে দেবার জন্যে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকুক একটু, আর— হঠাৎ আপাদমস্তক শিউরে উঠল তাঁর···মনে হল অসম্ভব একটা ব্যাপার চোখের সামনে ঘটছে যেন।

জানালাটা তখনও ভাল করে' খোলেন নি তিনি। চট্ করে' সরে' এসে জানলার একধারে লুকিয়ে পড়লেন। ঠিক জানলার সামনে ওদিকের শূন্য ফুটপাথে সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জানলার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পায় নি বোধ হয় তাঁকে, ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে কি যেন···ভাবছে কিন্তু ঠিক করতে পারছে না···হাতটা তুলে কপালে বুলিয়ে নিলে একবার। আর দ্বিধা রইল না···ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে একবার, তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে রাস্তাটা পার হতে লাগল। হ্যাঁ, এই বাড়িতেই ঢুকছে। গলিটার দিকে গেল···

"আমার কাছেই আসছে"—চকিতে মনে হল পুরন্দরবাবুর এবং তিনিও পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। ভেজান দরজাটার সামনে শুধু উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন···সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে এখনই।

বুকের ভিতর এমন কাঁপছিল। লোকটা পা টিপে টিপে যদি আসে কোন শব্দই শুনতে পাবেন না হয়তো। কি যে হচ্ছিল তা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছিলেন না একটুও, কিন্তু শতগুণ অনুভব করছিলেন সমস্ত সত্তা দিয়েই। স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে। পুরন্দরবাবু সাহসী

লোক। অনেক সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি—লোকের কাছে বাহাদুরি পাওয়ার জন্যে নয়—নিজেকে পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু এখন যা হ'ল তাতে সাহস ছাড়া আরও কিছু ছিল। যিনি একটু আগে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ভুগছিলেন তিনি সহসা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। অন্য লোক যেন! একটা নীরব অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়েই তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

"ওই আসছে, এসে পড়ল, চারিদিকে চেয়ে দেখছে, কান পেতে শুনছে কি যেন দম বন্ধ করে'—উঠছে এইবার···ওই। কপাটের কড়াতে হাত দিয়েছে···"

তিনি যা ভাবছিলেন ঠিক তাই হয়েছিল, দরজার ওপারে সত্যিই একজন দাঁড়িয়েছিল এসে, কড়াতে হাতও দিয়েছিল নিঃশব্দে। পুরন্দরবাবু আর থাকতে পারলেন না, কেমন যেন অদ্ভুত উন্মাদনা একটা পেয়ে বসল তাঁকে। হঠাৎ কপাটটা খুলে ফেললেন। সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার তামসিক সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এস্-সি

ঘটনাগুলির সময় হয়ত ঠিক মনে আসিতেছে না—যুদ্ধ, বোমাবর্ষণ, বিতাড়ন বা পলায়ন, ঘূর্ণাবর্ত্ত, বন্যা, কালীপূজার প্রমোদশালার শ্মশানীভূত অবস্থা—ইত্যাদি নানা দুর্ঘটনা বাঙ্গালার বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—বস্ত্রহরণপর্ব্ব তখনও ঘটে নাই। এমন দিনে এক বন্ধু—পণ্ডিত, প্রফেসার ও বৈজ্ঞানিক—বলিলেন, আহা হা কি চমৎকার লিখিয়াছে, কি সুন্দর ভাষার জোর এবং তর্কের বিস্তার। লেখক যেমন পণ্ডিত তেমনই সুসাহিত্যিক, তিনি দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম লেখক কি ধ্বংস নিবারণের কোনও উপায় দেখাইয়াছেন। শুনিলাম—না। বলিলাম—তাহা যদি হয় এ সাহিত্য তামসিক সাহিত্যের অন্তর্ভূ'ত। যাহাতে মনে মোহ, দুঃখ, দৈন্য, বিষাদ ও নৈরাশ্য আসিয়া উপনীত হয় তাহা তামসিক সাহিত্য। উহা লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করে।

দুর্ভিক্ষের সময় একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পের নায়ক দিল্লী অঞ্চলে বড় চাকরী করিতেন। পল্লীগ্রামে এক সম্পর্কীয়া আত্মীয়াকে (কতকগুলি ছেলেমেয়েসম্পন্না) মাসিক কিছু সাহায্য করিতেন। দুর্ভিক্ষের কয়েক মাস পরে একদিন তাহার মনিঅর্ডার ফিরিয়া আসিল, মালিকের সন্ধান হইল না বলিয়া। কয়েক মাস তাহাদের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যাহা জানিলেন তাহাতে বিষাদগ্রস্ত হইলেন। তাহারা ভদ্রঘরের পক্ষে অনামকর কলুষিত জীবন যাপন করিতেছে।

ঐ গল্প এবং ঐ প্রবন্ধ তামসিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। উহাদের পাঠে মনে যে বৃত্তির উদয় হয়—তাহা নৈরাশ্য, বিষাদ বা ভয়। উহা দ্বারা জগতের উপকার হয় না বরং অপকারই হয়।

রাজসিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত এই যুদ্ধে দেখিতেছি। জার্ম্মান জাতি হিটলার সাহিত্য দ্বারা উত্তেজিত হইয়া জগৎকে জ্বালাইয়াছে এবং এখন নিজেরা জ্বলিতেছে। রুসো, ভলটেয়ার প্রভৃতি বিপ্লব-পূর্ব্ব লেখকদিগের জ্বালাময়ী লেখা রাজা ও অভিজাতবর্গের উপর লোকের উৎকট বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টি করে। লেনিন প্রভৃতির লেখাও এই জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভূ'ক্ত। ঐ সকল রাজসিক জ্বালাময়ী লেখা রাশিয়ার ও ফ্রান্সের সম্রাট ও অভিজাতবর্গের ধ্বংসের প্রধান কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্র নব্য লেখকদিগের প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন "যদি এমন মনে বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" ইহাই সাত্ত্বিক সাহিত্য—যাহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানবৃত্তি বা কার্য্যকরী বৃত্তি বিকাশ পাইবার সুবিধা পায়।

তামসিক সাহিত্যের ফলে কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে তাহা বলিতেছি। দুর্ভিক্ষের সময় সকলেই ক্ষুধার্ত্তকে কিছু কিছু অন্ন দিয়াছি। কিন্তু এখন মনে বিষাদ হয়,—আরও সাহায্য দিয়া কতক লোককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না। বিষাদপন্থীরা ক্রমাগত প্রচার করিতে লাগিলেন—সব রসাতলে গেল, বাঙ্গালা নিঃশেষ হইবে, এ বৎসর দরিদ্রেরা গেল, আর বৎসর মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হইবে। চালের দাম যখন দশ হইতে পনর কুড়ি তিরিশ চল্লিশে উঠিল তখন ঐ সকল প্রচার ফলে লোকের মোহ হইল। চল্লিশ টাকা মণ চাল কিনিয়া কি প্রকারে পোষ্যবর্গকে বাঁচাইয়া রাখিব ইহা ভাবিয়া লোকের দানবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাহা না হইলে আরও অনেক লোক বাঁচিত।

লেকের অশ্বত্থতলা ক্লাবের অনেক বৃদ্ধ বলিলেন, এই যুদ্ধ বহুকাল চলিবে, আমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না এইরূপ বলিয়া নিজেদিগকে আশঙ্কিত করিয়াই যেন আনন্দ পাইতেন। আমি—যুদ্ধ শীঘ্রই মিটিবে এবং আমাদের দুর্দ্দশারও অবসান হইবে এইরূপ বলিতাম। একদিন এক বন্ধু বলিলেন আপনি এরূপ বলেন কেন? বলিলাম—এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী—ওয়েলস্, চিনে গণৎকার, ইজিপ্টদেশী গণৎকার, বাগচীর পাঁজী এবং সেই পাঞ্জাবীটি যে ভবিষ্যৎবাণী লিখিয়া এবং তাহা প্রচার

করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে—কাহারই মেলে নাই—অতএব আমারও না মিলিলে দুঃখিত হইব না। যখন সবই অনির্দ্দিষ্ট তখন মন্দটা ভাবিয়া দুঃস্বপ্ন দেখার চেয়ে ভালটা ভাবিয়া সুস্বপ্ন দেখাটা কি ভাল নয়?

রাজসিক ও তামসিক সাহিত্যে মিশাইয়া কিরূপ বীভৎস সাহিত্য লিখিত হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত কিছুকাল হইল দেখিয়াছিলাম। লেখক আমার সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় একজন অধ্যাপক। গল্পটি একটি পোল বা ঐ জাতীয় গ্রন্থ হইতে অনুবাদ। 'এক বৃদ্ধ ও তাহার তিন কন্যা নিজ দেশ হইতে বাহির হইয়া পাহাড় উৎরাইয়া অপর দেশের দিকে যাইতেছে। কন্যাগুলি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। পথিমধ্যে চুরি করিয়া কিছু উপকরণ লাভ। পরে চুরি ও হত্যা। মেয়েগুলি চৌর্য্যকার্য্যে ও হত্যাকার্য্যে দক্ষ হইয়া উঠে। অনেকগুলি হত্যার বিবরণ আছে। পাহাড়ের গুহায় ডাকাতির মাল অনেক জমিয়া উঠে। শেষে এক হত্যা ও ডাকাতীর পর গ্রামবাসীরা তাহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া অনুসরণ করিতে থাকে। ক্রমশঃ সকলে ফিরিয়া যায়। কেবল একটী যুবক দূরে থাকিয়া অনুসরণ করে। ডাকাত ও ডাকাতনীরা হঠাৎ যুবককে বন্দী করে। মেয়েরা তাহাকে সেইখানেই হত্যা করিতে উদ্যত। বৃদ্ধ থামায়। বলে উহাকে দিয়া মুটিয়ার কাজ করা হইবে। তারপর মারিয়া ফেলিলেই হইবে। হস্তপদবদ্ধ যুবক তাহাদের গুহায় আনীত হয় এবং মেয়েগুলি তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া শুইয়া পাহারা দিতে থাকে। বৃদ্ধ পথের সন্ধানের জন্য বাহিরে যায়। এই সময় সেই যুবককে অধিকার করিবার জন্য মেয়েগুলির মধ্যে বীভৎস বিরোধ। পরে একটি মেয়ে ভগ্নিদের উপর রাগ করিয়া যুবককে ছুরী মারিয়া হত্যা করে। এমন সময় পিতার আবির্ভাব। অতঃপর বৃদ্ধ অধ্যাপক এই গল্পটি কেন অনুবাদ করিতে গেলেন তাহা বুঝিতেছি না।

প্রবন্ধটী এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জনেক সাহিত্যিক বলিলেন—ঘটনার স্বরূপ বর্ণনা (realistic) করাও সাহিত্যের কর্ত্তব্য। স্বরূপ বর্ণনাকারী সাহিত্য সম্বন্ধে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বের এক ঘটনা তাহাকে বলিলাম। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক মাসিকপত্র প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং একজন স্বরূপ বর্ণনাকারী লেখকও এই পত্রে লিখিতে লাগিলেন। তাহার যথাযথ বর্ণনা প্রণালী তৎকালীন নব্যদলের হৃদয় আকর্ষণ করিল। তৎকালীন বৃদ্ধগণ অবশ্য নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিলেন। উক্ত লেখক কয়েক মাস পরে এক বেশ্যা গৃহের এমন বর্ণনা করিলেন যে একজন হাইকোর্টের জজ (এরূপ একটী গল্প সেই সময় রটিয়াছিল) কাগজ খানিকে সম্পাদকের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া আর কাগজ পাঠাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। একটি যুবকসঙ্ঘে বিচারকের ঐ কার্য্যের বিচার চলিতেছিল। একজন বলিলেন—হাউপ্টম্যান প্রভৃতি বড় লেখক এর চেয়েও অনেক কুচিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। আমি বলিলাম—কাব্য এবং কথাসাহিত্য অনেক পরিমাণে যে বাজীকরণ গুণসম্পন্ন (reotic) তাহা অস্বীকার করা যায় না। বড় লেখক আর ছোট লেখকে পার্থক্য এই যে, ছোট লেখকের লেখায় শুধু এই বাজীকরণ গুণই থাকিয়া যায়। বড় লেখকরা কিন্তু পরে আরও উচ্চ শ্রেণীর ভাবসমূহ, করুণা, লোক-হিতৈষিণা প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ করিয়া থাকেন। বার্ণার্ডশ ও ব্রিয়ে প্রভৃতির লেখা ইহার উদাহরণ। আজ বহুকালের পর ইহা বলা যাইতে পারে—যে লেখকের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল তিনি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠনামা হইতে পারেন নাই। এখনকার খুব কম লোকই তাহার নাম পর্য্যন্ত জানে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে বিয়োগান্ত নাটক বা কাব্য বা উপন্যাস দোষার্হ। ইহারাও তামসিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বিয়োগান্ত গল্পের পাঠের পর পাঠকের মনে যে ভাব স্থায়ী হয় তাহা শোক ও বিষাদময়—তমোগুণ হইতে উদ্ভূত। বহুকালের একটি গল্প মনে পড়িতেছে। নদীয়া জেলার বিখ্যাত অধ্যাপকের ঠাকুর দালানে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এক প্রসিদ্ধ যাত্রা দল আসে এবং একদিন পালা গাওনাও হয়। এই যাত্রাদল অভিমন্যুবধ পালা গাহিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। যুবকদল এই পালা শুনিবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব ছিল, কিন্তু অধ্যাপকের ভয়ে তাহাদের মনবাসনা পূর্ণ হয় নাই। কারণ তিনি বিয়োগান্ত যাত্রা বাটিতে হইতে দিবেন না। যুবকরা যাত্রাদলেরসহ ষড়যন্ত্র করিয়া অধ্যাপক নিদ্রা গেলে তাহার ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া গভীর রাত্রে ঐ পালা যাত্রা আরম্ভ করিয়া দেয়। পরে অধ্যাপক উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন ও হাঙ্গামা করেন। বর্ত্তমান যুগের মনস্তত্ত্ববিদ্যার কুয়েইজম্ (Couism) এর সাহায্যে আমরা পণ্ডিতের ও প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মনোভাব বুঝিতে পারি।

মেসমেরিজমের সাহায্যে অনেক লোকের রোগ সারিয়া যায়। মেসমেরিষ্ট রোগীর সামনে হস্তের বা অন্য পদার্থের বিবিধ গতি-ভঙ্গি করিয়া রোগীকে বলেন তোমার রোগ সারিয়া যাইতেছে। ইহাতে অনেকের রোগ সারিয়া যায়। প্রথম প্রথম লোকে ভাবিত—মেসমেরিষ্টের শরীর হইতে কোনও অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ—জান্তব চুম্বকার্ষণ (animal magnetisim) রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়া রোগ আরোগ্য করে। এখন জানা গিয়াছে রোগীর নিজের কল্পনা বা ভাবনাই রোগ আরোগ্য করে। মেসমেরিষ্ট শুধু সেই আরোগ্যের বার্ত্তা বা মন্ত্র (suggestion) রোগীকে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মন্ত্র গ্রহণ করিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন। কল্পনাশক্তি কাহারও বেশী, কাহারও কম। সম্মোহন কর্ত্তার বা মন্ত্রদাতার ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য করে। রূপ, কুরূপ, দাড়ি জটা বেশভূষা নানাভাবে লোকের অবচেতন মনের (subconscious self) উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কুয়ে নামক ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ দেখিলেন, কোন কোনও লোকের মন উল্টা ভাবে কাজ করে। তাদের যদি বলা যায় তোমার রোগ আরোগ্য হইতেছে তাহা হইলে তাহারা কল্পনা করিতে থাকে বোধহয় আমি খারাপই হইয়া যাইতেছি। এই সকল লোকের মন কু গাহিতেই যেন ভালবাসে। কুয়ে তাহাদের রোগ আরোগ্য করিবার জন্য এক প্রণালী আবিষ্কার করেন, তাহা কুয়েইজম্ নামে খ্যাত। তাহার প্রণালী এইরূপ :—"আমি প্রত্যেক দিন সর্ব্বভাবেই আরোগ্য হইতেছি" এই

মন্ত্রটি প্রত্যহ নিদ্রার পূর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধসুপ্তভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করিবে। আবৃত্তি খুব দ্রুত করিতে হইবে—অনেকটা আমাদের মন্ত্র পড়ার মত। আমি আরোগ্য হইতেছি—বলিয়া একটু সময় অপেক্ষা করিলে—মন হয়ত সেই সময় গাহিবে না, আমি কোথায় ভাল হইতেছি—মন্দই ত হইতেছি। মন যাহাতে ঐরূপ কু গাহিবার সময় না পায় সেই জন্যই দ্রুত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হইবে। ঐরূপ আবৃত্তির ফলে অবচেতন মন অনেক সময় কল্পনায় অভিভূত হইয়া শরীর-যন্ত্রগুলিকে এমন নিয়ন্ত্রিত করে যে রোগ আরোগ্য হয়।

মনস্তত্ত্বের ঐ সকল অংশের আলোচনা করিয়া আমরা অধ্যাপকের বিয়োগান্ত অভিমন্যুবধ নাটকের উপর বিরাগের কারণ পাই। ছেলেমেয়ে যুবকযুবতী যাত্রা শুনিতেছে। অভিমন্যুর অদ্ভুত বীরত্ব। ষোল বছরের ছেলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি রথীর সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে। যাত্রার techniqueএ রথীগণ হারিয়া পলায়ন করিতেছে—অভিমন্যু তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। যুদ্ধের সময় অসির উপর অসি পড়িয়া ঝঞ্ঝনা শব্দ হইতেছে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে—রণবাদ্য বাজিতেছে। সকলই লোককে মুগ্ধ করে। পরে শেষ যুদ্ধ সপ্তরথী বেষ্টিত আহত অভিমন্যুর পতন ও মৃত্যু। তার পর রোদনপর্ব্ব। কঠোর বীর বৃকোদর কাঁদে, যুধিষ্ঠির কাঁদে। দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা কাঁদে। সর্ব্বশেষ বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিদারুণ বিলাপ।

এই সাহিত্যের ফলে কোন কোন কল্পনাপ্রবণ কুমার বা কুমারী, যুবক বা যুবতীর মনে অভিমন্যুত্ব লাভ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে; বাপ কাঁদিতেছে, মা কাঁদিতেছে, আত্মীয়স্বজন কাঁদিতেছে—আমি মৃত্যুপথে যাইতেছি—এইরূপ একটা চূড়ান্ত কামনা অবচেতন মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিয়োগান্ত কাব্যের সূচনা করিতে পারে। তাই প্রাচীন আলঙ্কারিক আমাদের অধ্যাপক বিয়োগান্ত সাহিত্যের বিরোধী।

চোর

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

দেশে তখন গৌরীদান প্রথা।

মাত্র আট বৎসর সাত মাস বয়সের সময় মনোরমা শ্রীমাধবকে তার স্বামী বলে জানল। ঐ জানার মধ্যে কতটুকু তার মন তখন জেনেছিল কে জানে? শ্রীমাধব কিন্তু বিয়ে ক'রবে কি!—সে তখন বিশ-বাইশ বছরের ষোলআনা পুরুষ। বাঁ পাশে অতটুকুন ছোট্ট মেয়ে এসে দাঁড়াবে এ যেন তার কাছে কেমন ধারা লাগ্‌ল, মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, রাত্রে আবার তো খেলাঘরের পুতুলের জন্য কেঁদে উঠ্‌বে না?

বছর চলে যায়, ছাপ রেখে যায় মনোরমার দেহে। মনোরমার তখন কত আনন্দ! বিয়ের প্রথমবারে যখন শ্রীমাধবের কাপড়ের আঁচলে নিজের আঁচল জড়িয়ে স্বামীর বাড়ীতে আসে, বুক ফেটে তখন মনোরমার কত কান্না! মনে হয়েছিল, বিয়ে আবার কি?—এই আঁচলে আঁচল মিলনের মধ্যে এবং পুরুতঠাকুরের অং বং কয়েকটা মন্ত্র আওড়ানোর মধ্যে এমন কি না-দেখা জোর আছে যা' নাকি তাকে তার বাপমায়ের এবং ভাইবোনের কাছ হতে দূরে ছিনিয়ে আনে। তার মত নিরীহ বালিকার উপর ওটা যেন একটা বড় অত্যাচারের সামিল। সে ক্ষেপে উঠ্‌ল। এ বাঁধন সে তখনই ছিঁড়ে ফেল্‌বে—শ্রীমাধব তো আগে আগেই চল্‌ছে, সে-ই তো পেছনে। আস্তে বাঁধন মুক্ত করে চলে যেতে তার একটুও আট্‌কাবে না; আর দিদি যে দুষ্টু, যদি তেমনই শক্ত করে বেঁধে দিয়ে থাকে তবে তো নিরুপায়—তার ছোট ছোট দু'টী চোখের জলে অত বড় একটা পুরুষের মন ভেজাতে সে কিছুতেই পারবে না।—এ কথাগুলো ভাব্‌তেও এখন মনোরমার অনেক লজ্জা হয়। ছিঃ ছিঃ, আঁচল ছিঁড়ে গেলে কি কেলেঙ্কারীই না হ'ত, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে নিজেকে বঞ্চিতা করে রাখত।

একটী করে বছর কালের চাকায় গড়িয়ে যায়, আর শ্রীমাধব মনোরমাকে মনে করিয়ে দেয় তার এই ষোল—এই সতের। বছরগুলোকে মনোরমার তখন বেশ ভাল লাগে। অতটুকু ছোট্ট বালিকা হ'তে বছরের কোলে ভেসে ভেসে সে তখন জীবনের স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু এই বছরগুলোই যে আবার তার যৌবনকে চুরি করে কবরের পথে টেনে নেবে, তাও আবার তা'কে বৃশ্চিকের মত দংশন করে।

বছরটী আমার জীবনের বাঁ পাশে চলে যায়, আর আমার মন ভরপুর হ'য়ে ওঠে—বছর গুলোকে আমি, তোমাকে যা' ভালবাসি তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি—মনোরমা বল্ল শ্রীমাধবকে।

কিন্তু এই বয়সই তোমাকে একদিন বুড়িয়ে দেবে। তখন কিন্তু সকলের চেয়ে আমাকে মধুর লাগবে—আমি ছাড়া নান্য পন্থা! হেসে হেসে শ্রীমাধব উত্তর করল।

—না কিছুতেই না। কিছুতেই আমি বুড়িয়ে যাব না। যদি যাই তো তোমার অসাবধানতায়।

তার মানে?

অতি সহজ!—আমি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকব বছর-চোরের ভয়ে। সেখানেই আমার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। স্ত্রীলোকের

রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা স্বামী—এ সত্য তুমি কি অস্বীকার করবে?—মনোরমা প্রশ্ন করল।

শ্রীমাধব কি উত্তর করবে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারল না। স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্ত্তা যে পুরুষজাতি, এতবড় সত্যটাকে এমন কোন মিথ্যা নেই যা' দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে বছরের চোখের আড়ালে রেখে সর্ব্বাঙ্গে যৌবনটাকে অটুট ভাবে লাগিয়ে রাখবে তাও কারুর ইচ্ছার আয়ত্তের মধ্যে নয়। কি আর তখন বলে শ্রীমাধব, অথচ স্ত্রীর কাছ হতে আসা এমন একটা জটিল এবং আব্‌দার-মাখানো প্রশ্নের উত্তরে একেবারে কিছু না বল্‌লে নিজের পরাজয় হয় এবং মনোরমাও মনঃক্ষুণ্ণ হয় বৈ কি।

তোমার যৌবনের বিচারক তো আমিই মনোরমা। মনকে আমি তোমাকে সুন্দর দেখবার জন্য ঠিক রঙিণ করে রাখবই। নিতান্তই যদি নিরস তরুবর হয়ে পড়ি, না হয় তুমি একটু রঙিণ সুরা হাতে করে সাকী হ'য়ে আমার জীবনে এসো—আমার তোমাকে যেমনটী দেখ্‌লে তুমি সুখী হও তেমন কাঁচ আমার চোখে লাগিয়ে দিও—শ্রীমাধব হঠাৎ বল্‌ল।

সুখের সংসার তাদের এম্‌নি ভাবে একটানা চ'লেছে। কোথাও থামছে না তাদের মনের লীলায়িত গতি। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, সবগুলো একত্রিত হয়ে যুগও চলে যায়; কিন্তু কেউ তাদের সংসারে এলো না। মনোরমা দু'এক সময়ে দুঃখ করে বলত, বাড়ীটা যেন একেবারে খাঁ খাঁ করে। ঘরে দোরে ছেলেমেয়ের এলোমেলো চীৎকার, হঠাৎ কান্না, অকারণে হাসি—এ সমস্তর অভাবে মেয়েদের অন্তর একদিকে শূন্য হ'য়ে থাকে। সেই শূন্যস্থান অপূর্ণ থাক্‌লে সৃষ্টি হয় এক মানসিক অশান্তির পাথার।

মনোরমা 'মা' ডাক শুনছে না—এটা তা'কে মাঝে মাঝে পীড়া দিত। সেনিজে যতটা না বেশী ভাবত,ততটুকু ভাবিয়ে তুলত পাড়াপ্রতিবেশীনীরা। তাদের যেন কত দরদ! মনোরমা দু'এক সময় ঠিকই বুঝত যে, পানসুপারী চিবানোর জন্য এ কথাগুলো তাদের গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও মন না মানে মানা; বিশেষ করে মেয়েমানুষের মন।

বুভুক্ষু মন মনোরমার। মা হওয়ার সাধ আর সকল মেয়েদের যেমনটী থাকে, মনোরমারও থাক্‌তে দোষ কি, ছিলও। কিন্তু সেই ডাক কানে শোনা তার ভাগ্যে হ'য়ে ওঠে নি। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে সুখের সংসার বয়ে চল্‌ছিল, হঠাৎ মনোরমার বিয়োগ ব্যথায় তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ভগবান কি নিষ্ঠুর! দু'জন যেখানে পরমপ্রীতিতে এক হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে, সেখান হ'তে যদি কেউ নেয় বিদায়—চিরবিদায়—তবে যে রয়ে গেল—সে যে শুধু বাকী জীবন কাঁদ্‌তেই রয়ে গেল—এই সিদ্ধান্ত ছাড়া এর মধ্যে ভগবানের আর কোন্ মঙ্গল ইচ্ছার নিহিত সন্ধান পাওয়া যেতে পারে? শ্রীমাধবের সম্বল এখন শুধু ভবিষ্যতের বুকে ফেল্‌তে কয়েক ফোটা চোখের জল; তাও কতদিনে ধারা হারিয়ে যায়, কে জানে?

শ্রীমাধবের পেটের ক্ষুধা তার চোখের জল ছাপিয়ে উঠ্‌ল। ক্ষুধা কোন বাঁধা মানে না; পেট নিয়ে মানুষের তাই যত যন্ত্রণা। ক্ষুধার তাড়া যদি না থাকত তবে সে এখন সন্ন্যাসী হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে পারত। চোখদু'টা তাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যেত সেদিকে যেতে তারও কোন ওজর আপত্তি থাক্‌ত না। সে যেত, নিশ্চয়ই যেত। কি তার এদিকে এমন ঠেকা আছে, যা নাকি তাকে এখন এখানে ধরে রাখ্‌বে? তার আপন বলার মত এ সংসারে কেউ নেই; নিতান্ত প্রয়োজনেও যে এক গ্লাস জল তার তৃষ্ণার্ত্ত ঠোঁটের কাছে এগিয়ে ধরবে তেমন লোকটী পর্য্যন্ত নেই। আশ্চর্য্য হয়ে শ্রীমাধব ভাবে।—পৃথিবীর যে দিকে তাকায়,ভর্ত্তি দেখে লোকে—অথচ সেই অগণিত লোকের মধ্যে কি তার আপন বলার মত একটী লোকও নেই!

সে ঠিক করল তার ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, আর এখানে থাকবে না। এ যায়গা ছেড়ে না গেলে, প্রতিদিন প্রতি পদে মনোরমার স্মৃতি তাকে ব্যথা দেবে, তাকে কাঁদাবে। মনকে সে ঠিকই করে ফেললো। ঘরে গেল শ্রীমাধব। হঠাৎ আবার ঠিক করলো তার যাওয়া হবে না,—কিছুতেই না। কাচ-লাগানো আল্‌মারীর ভেতরে রাখা মনোরমার নানান বয়সের ছবিগুলো যেন যুগপৎ তার দিকে চেয়ে আছে—ফটোর চাহনি তার পথের বাধা হ'য়ে দাঁড়াল। মনোরমার ঐ চাহনিতে যেন কত প্রার্থনা, কত আকুলতা—প্রত্যাখ্যান করে শ্রীমাধবের সাধ্য কি? তা' ছাড়া মনোরমা তার সাজান ঘর-দোর স্বামীর ওপরে রেখে চলে গেছে। শ্রীমাধব এখন কাকে আবার দিয়ে যাবে, তাই স্মৃতির ব্যথা বুকে করেই স্মৃতিকে বাড়িয়ে চলবে। আলমারীর মধ্যে সাজানো মনোরমার কয়েকখানা ফটো, বাপের বাড়ীর ও শ্রীমাধবের দেওয়া মনোরমার মনোমত অনেক রকম গয়না এবং শ্রীমাধবের জন্য নিজ হাতে সেলাই করছিল সেই অসমাপ্ত রুমালখানা আজও মনোরমার হাতের কোমল পরশ নিয়েই প্রাণবন্ত রয়েছে। শ্রীমাধব নিজে তা ছোঁয় না, অপরকেও ছুঁতে দেয় না; ছুঁলেই যেন মনোরমা তখনও যতটুকু বেঁচে আছে সেটুকুনেরও মৃত্যু হয়ে যাবে—এই তার ভয়। সাম্‌নে একটা টেপয়ে সে রোজ সন্ধ্যায় মনোরমার উদ্দেশ্যে দেয় ধূপ-দীপ, আর প্রত্যেক বার ৺পূজার সময় দেয় একখানা করে নূতন শাড়ি। শাড়িগুলো মেঝেতে জমা হয়ে আছে—অনেকগুলো।

শ্রীমাধবের সংসার তখন অনেক বড়। কতকগুলো অনাথা মেয়ে ও ছেলে শ্রীমাধবের জিম্মায়। শ্রীমাধব নিজের হাতে তাদের মানুষ করে। স্নান করে এক সঙ্গে, পাছে কেউ বেশী জল গায়ে মেখে জ্বর না আনে। নিজেই লেখাপড়া শেখায়, নিজেই আবার খেলার সাথী হয়। মনোরমা একদিন কথায় কথায় তার মনের দৈন্য জানিয়েছিল, ঘরে দোরে ছেলেমেয়ে না থাকলে সত্যিই একেবারে শূন্য মনে হয়। শ্রীমাধব তাই অবুঝের মত মনোরমার ফটোর কাছে গিয়ে তাকে আবার আসতে আহ্বান জানায়, বলে, "মনোরমা! তোমার ঘর এখন ছেলেমেয়েতে ভর্ত্তি, একটীবার তুমি কি এসে দেখে যাবে না?"

একটী একটী করে শ্রীমাধবের কাছে অনেক অনাথা মেয়েছেলে স্রোতের মত চলে এসেছে। এতগুলো ছেলেমেয়ে সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে যে শ্রীমাধবের যা' নাকি বিত্তপসারের আয়, তার সাহায্যে তখন আর তার সংসার চল্‌তে পারে না। চল্‌তে পারে না বলে এই অজুহাতে

শ্রীমাধব নূতন আস্তে চায় এমন কোন ছেলেমেয়েকে ফিরিয়ে দেয় না এবং কোনদিন ফিরিয়ে দেয়-ও নি। নিজের অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকায় অনেকের কাছে শ্রীমাধবের হাত পাত্‌তে হয়েছিল এবং তার এই প্রচেষ্টা যাতে ফলবতী হয় এই জন্য রিক্ত হাত কারুর কাছ হতে ফিরিয়ে আন্‌তে হয় নি।

দশজনের মাসিক সাহায্যে ও শ্রীমাধবের যা' কিছু ছিল তা' দ্বারা শ্রীমাধবের সংসার তথা অনাথ-আশ্রমটি বেশ ভালই চল্‌ছিল—যতদিন পর্য্যন্ত না বাধা পেল একটা নির্ম্মম দুর্ভিক্ষের কাছ হ'তে। নির্ম্মম দুর্ভিক্ষ! এমন দুর্ভিক্ষ যা' প্রকাশ করতে লেখনী থেমে যায়, চোখের জলে বুক ভেসে যায়—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোন্ ছার্। সমস্ত দেশখানি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর লেলিহান জিহ্বার অগ্রে। কেউ কাউকে সাহায্য করতে তখন পারে না। যার যা' কিছু আছে ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানে না খেয়ে জমা রাখে।

শ্রীমাধবের সংসার তখন আর কি করে চল্‌বে। অচল সংসার, কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য শ্রীমাধবের ভালবাসা সচল। নিজের যা' ছিল সমস্তই একটী একটী করে শেষ হয়েছে—আছে শুধু মনোরমার সেই গয়না কয়েকখানা। জমিজমার আয় যা দুর্ভিক্ষের আগমনে প্রজারা ঠিক রাজভক্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে নি—ভবিষ্যতে আরও দুর্দ্দিন আস্‌তে পারে এই আশঙ্কায় কৃষক শ্রেণী ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য রাজভাগ না দিয়ে গোটাটাই নিজের গোলায় তুলেছে। মরণ মধ্যবিত্তদের।

পালক-পিতা শ্রীমাধবের দিন তখন আর কাটে না। দুর্ভিক্ষের দিন বড় লম্বা। সোনায় সোহাগা হ'ল দুর্গাপূজা নিকটে এসে। শ্রীমাধবের তখন নূতন আর এক চিন্তা এসে মাথায় ঢুক্‌ল। হাতে একটা পয়সাও নেই, তার উপর যুদ্ধের দরুণ একখানা কাপড়ের দাম বৃদ্ধি হয়ে স্বাভাবিক অবস্থার চারগুণ হ'য়েছে। কিন্তু হায়! বালক বালিকারা দুর্ম্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য বল্‌তে কিছু বোঝে না। তারা জানে শুধু চাইতে, না পেলে কাঁদতে—অভিভাবককে কাঁদাতে।

"৺পূজার সময় নূতন কাপড় জামা ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে বেশী আনন্দ দেয়, আর যারা পায় না তারা শুধু কাঁদে"—এই কথাটাই শ্রীমাধবকে তখন বেশী ভাবিয়ে তুলেছে। একটী নয়, দু'টী নয়—অতগুলো ছেলে মেয়ে তার সামনে কাঁদবে ৺পূজার দিনে—সে কি করে তা সইবে? সাহায্য আসার তারিখ পেরিয়ে গেছে, কারুর কাছ হতে একটী পয়সাও এলো না। ২৮শে আশ্বিন আনন্দময়ীর সপ্তমীপূজো।

চব্বিশে আশ্বিনের রাত। রাত তখন দুপুর। সকলেই ঘুমিয়েছে, ঘুমায়নি শুধু শ্রীমাধব। তবু শ্রীমাধবের সন্দেহ যদি কেউ জেগে থাকে। আস্তে আস্তে তাই নাম ধরে দু' একজনকে সে ডাক্‌ল—কোন উত্তর এলো না।

চুপি চুপি সে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছে। হাত তার কাঁপছে থর্‌থর্ করে, বুক কাঁপছে, চোখে আস্‌ছে অঝোরে জল। তবুও চোখের জলকে সে ফোঁটা কাটতে দেয় না—বাঁ হাত দিয়ে মুছে ফেলে।

পা টিপে টিপে শ্রীমাধব মনোরমার ফটো রাখা সেই আলমারীটার কাছে এসে দাঁড়াল। চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখ্‌ল, শেষ মুহূর্ত্তে তাকে কেউ দেখ্‌ছে কিনা। অতি যত্নে রাখা চাবিটী একটা ব্যাগের গহ্বর থেকে তুলে শ্রীমাধব আলমারীটার বুক চিরল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো মনোরমার গায়ের গন্ধ তার বহু ব্যবহৃত গয়নাগুলো থেকে—শ্রীমাধব চিন্‌ল সে গন্ধ। কোনদিন যা' আলমারী থেকে বের করবে না—নিজের মৃত্যু দিনেও মনোরমার হাতের ছোঁয়া জিনিষ নিজে না ছুঁয়ে জীবিত রেখে যাবে বলে ঠিক করেছিল; শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমাধবের সে আশা কোথায় উড়ে গেল। তার পর বেছে বেছে কয়েকখানা গহনা তুলে নিজের আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে অদৃশ্য করে দিল!

ফেরার পথে শ্রীমাধবের মনে হ'ল মনোরমা তার দিকে চেয়ে আছে, আর সামনে যেন দেখ্‌তে পেল ৺পূজার দিনে নূতন জামা কাপড় নিয়ে তার পালিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে কত আনন্দের হৈ-চৈ!

মর্ত্ত্যের মায়া

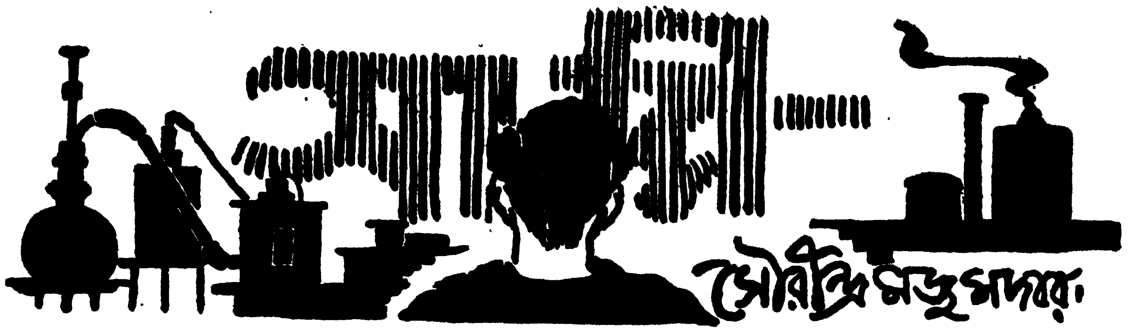
শ্রীনীলরতন দাশ বি-এ

যুগ যুগ হ'তে এ ধরার সাথে আছে মোর বন্ধন,
তরুলতা তৃণে আমার পরাণে জাগে তার স্পন্দন।
　　নভে রবি শশী তারকার আলো—
　　প্রাণ দিয়ে সবে বাসিয়াছে ভালো,
সবার সঙ্গে হ'য়ে গেছে মোর মাখামাখি জানাজানি,—
আমারে ঘিরিয়া নিখিল ভুবন করে কত কাণাকাণি!
নিত্য নূতন দৃশ্যে শোভিত বিশ্বের চারিধার,
এই ধরিত্রী চির পবিত্র আমার মোক্ষদ্বার।
　　হেরি' ধরণীর ঋতু-উৎসব
　　হৃদয়ে আমার ওঠে কলরব;
বসুন্ধরার এত শোভা এত গন্ধবরণ গান—
ছাড়িয়া এ সবে চাহে না মরিতে মোর তনু মন প্রাণ।

সুন্দরী চিরউৎসবময়ী জননী পৃথ্বী মম
চিত্তের ক্ষুধা নিত্য মিটায় স্বর্গের সুধাসম।

　　অমৃতের সাথে আছে হলাহল,
　　আজ জীবনের দুখ-কোলাহল;

তবুও চিত্ত এ মহাতীর্থে মুগ্ধ দিবসযামি,—
মর্ত্ত্যের মায়া মোহ কাটাইয়া স্বর্গ চাহি না আমি!



আমি ?

আমি কী—কে ?

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের উত্তাপ ও জলবায়ুর নানাপ্রকার অবস্থায় যে সকল মলিকুল এবং তার ভগ্নাংশ এটম—প্রোটন, ইলেক্‌ট্রোন, নিউট্রোন, পজিট্রোন ও মেসোট্রোনের বিভিন্ন রেডিএ্যামনের ভিতর অসংখ্য যোগবিয়োগে আকস্মিকভাবে যে প্রাণে হল পরিণত, আমি কি শুধু তারই সুসংস্কৃত শ্রেষ্ঠ সংস্করণ মাত্র। শেওলা আর মানুষ তার ভেতর রয়ে গেল লতা, বৃক্ষ, জন্তু। ক্রমিক ধারায় উন্নীত হল মানব। এর বেশি আর কিছু নয়। এর চেয়ে আরও উন্নততর কোন রহস্যময় সত্য আর নেই ?

অন্তহীন অনন্ত আকাশে ঘুরে বেড়ায় কোটি কোটি তারা আর সুস্পষ্ট ওই সূর্য। কোন এক শুভ মুহূর্তে কোন এক নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে এল নিজের বৃত্তি রেখা ছেড়ে সূর্যের বৃত্ত রেখার নিকটে। সূর্যের উত্তপ্ত গ্যাসে উঠল ঝড় আর অগ্নিময় তরল পদার্থে ডাকল জোয়ার। নক্ষত্রটি এলো আরও নিকটে। আশ্চর্য ! হল না সংঘর্ষ ; হঠাৎ সোঁ করে গেল ছুটে ফিরে। আকর্ষণে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ গেল ভেঙ্গে এবং খানিকটা বেরিয়ে এল সূর্য থেকে। টুকরো টুকরো হয়ে ঘুরতে লাগল বিভিন্ন শক্তির আকর্ষণে। ধীরে ধীরে স্থান করে নিল সূর্যের চতুঃপার্শ্বে। অগ্নিময় তরল পদার্থ জ্বলে জ্বলে জমাট বাঁধল লক্ষ লক্ষ বছরে। বিভিন্ন উপগ্রহের একটির নাম হল পৃথিবী। ধীরে ধীরে হল জল, পলিমাটি জমে জমে হল দৃঢ়। মাটির নীচে চাপা পড়ল জমাট বাঁধা ধাতু, কোথাও বা মাটি হল পাথরে পরিণত, আবার কোথাও ওৎ পেতে বসে রইল আগ্নেয়গিরি। নিয়মিত হল গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। তারপর পৃথিবী হল প্রাণধারণের অনুকূল। প্রথম জীবন্ত কোষ, তার পর শেওলা, তার পর লতা, বৃক্ষ, পোকা—জন্তু—মৎস—বানর। আশ্চর্য লক্ষ লক্ষ বছরের রেডিএ্যাশনে ও বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে বানর হল মানুষে উন্নীত। এই ত আমি—আর কোন নেই ইতিহাস ?

তবে শুধুমাত্র আকস্মিক সংযোগের পরিণতি মাত্র আমি। ভগবান কি নেই—কোন প্রয়োজনই কি তাঁর ছিল না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কোন প্রয়োজনই কি হল না—শুধু মাত্র কল্পনাবিলাস ভিন্ন ! যদি তিনি থাকেন তবে তিনি কি জড়পদার্থ মাত্র। নইলে নেই কেন কোন কিছুর পরিবর্তন। সবই কেন চলেছে বিজ্ঞানের কঠোর নিয়ম কানুন মেনে। যদি তিনি থাকতেন তবে সখ করেও কি অপরিবর্তনীয় ফরমুলার পরিবর্তন ঘটাতেন না।

কে জানে, হয়ত কোটি বছরের খেলা তাঁর কয়েক মুহূর্তের এক্সপেরিমেণ্ট মাত্র। সবই অদ্ভুত সবই অনুমানের খেলা মাত্র।

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে দাঁড়াল পথের ধারে। ঈশান কোণে তখনও রয়েছে জেগে দু একটি তারা—অস্ফুট তার আলোক, সূর্যের রশ্মিতে হয়নি নিষ্প্রভ। এও অদ্ভুত। কত ছোট ওই তারাটি অথচ কত বড় ! হয়ত ওই তারাটিই পৃথিবীর সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী, দূরত্ব প্রায় আড়াই আলোক বৎসর। ওর আলোক পৃথিবীতে পৌঁছতে আড়াই বৎসর লাগে। আলোকের গতি ১৮৬০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। নিরর্থক ! কেন রয়েছে কোটি কোটি তারা উপগ্রহ—কী প্রয়োজন তাদের ? কি উদ্দেশ্যে ওরা যুগ যুগ ধরে অনাদি অনন্ত কাল ব্যাপী কল্পনাতীত সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডে একই নিয়মে ঘুরে বেড়াচ্ছে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে ? প্রথম কি একটি মাত্রই তারা ছিল ? কে জানে ?

অনুসন্ধিৎসু মনের শেষ কোথায় ?

এ সকল প্রশ্নের নিকট কোথায় তলিয়ে গেল মালবিকা, কোথায় চাপা পড়ে যায় ঘর সংসার, সমাজ রাষ্ট্র। এখানে নেই নেপোলিয়ান, নেই হিটলার, ষ্টালিন, নেই চার্চিল—রুজভেল্ট। মানুষ ত মানুষকে জানে না, চিনেনা—তবে কেন হিংস্রতা, শঠতা, শোষণ ও পীড়ন।

অদ্ভুত মানুষের মন। অর্থহীন এত বিরাট রহস্য তাকে স্তব্ধ করে দেয় না, জ্ঞানের অফুরন্ত অন্ধকার কক্ষের চাবি খুলে দেয় না।...

জয়ন্তর চিন্তাধারা আবার হুঁচোট খায়। মনে হয় এর শেষ কোথায় ? লক্ষ লক্ষ বছরে মানুষ যে এতদূর এগিয়ে এল, হয়ত কোটি বছরে আরও অনেক দূর পৌঁছে যাবে—তার পর ? রেডিয়্যামনে রেডিয়ামান সূর্য যাবে মরে, পৃথিবী হবে হিমশীতল, সবই যাবে জমাট বেঁধে—কোন প্রাণই থাকবে না বেঁচে। কিংবা যেমনি করে হয়েছে পৃথিবীসৃষ্টি, তেমনি করে হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী জ্বলে জ্বলে হবে অগ্নিময় তরল আর বিষাক্ত গ্যাস। তখন থাকবে না অতীত। আর এত বছরের সাধনা, এত জীবনপাত, এত সৃষ্টি, এত কীর্তি, এত গবেষণা—সব যাবে অন্ধকারে মুছে। এত বছরের যে এত বড় ইতিহাস তার একটি অক্ষরও থাকবে না বেঁচে। আবার যদি তারায় তারায় সংঘর্ষের ফলে নতুন কোন পৃথিবী সৃষ্টি হয় কোটি কোটি বছর পরে, তখন সে নতুন পৃথিবীর মানুষ কোটি বছরের সাধনায়ও জানবে না যে পুরাতন পৃথিবী ছিল।

আজ যদি সত্য সত্যই ভগবান থাকতেন এবং সবজানার শেষ মিলত তবে ?...

আমি যে আমাকেই জানি না। আমি যদি আমাকেই না জানিলাম না চিনিলাম, তবে যে এ জীবনের কোন সার্থকতাই হয় না।

আমি কি শুধু বিভিন্ন অনুপরমাণুর গতানুগতিক জীবন্ত কমপাউণ্ড মাত্র? আমি কি তবে ভগবানের অংশ বিশেষ নই। লক্ষ লক্ষ মুনিঋষির জীবনব্যাপী সাধনা কি ভ্রান্ত আত্মোপলব্ধি মাত্র। হয়ত হবে। নইলে আমিই যদি ভগবানের অংশ মাত্র তবে কেন আমার পৃথক সত্তা, পৃথক অনুভূতি। ভগবান ত' জল স্থল, আকাশ বাতাস, গ্রহ তারা, সৃষ্টি ধ্বংস, চিন্ত্য-অচিন্ত্য আমির অভঙ্গুর অপরিবর্তনীয় সমবায়—তবে আমি কে—এ প্রশ্ন কেন জাগে, কেন শেষ জানা যায় না?

জয়ন্ত পুনরায় চলতে সুরু করল। সুমুখে তার শেষ প্রশ্ন, পশ্চাতে তার—

জয়ন্ত সমাজ জীবনে নিজেই একটি প্রশ্ন। স্বাভাবিককে ব্যতিক্রম করে গেলে বাহাদুরী হয়না, ষ্টাইলও হয়না, কারণ আধুনিক সমাজে ইহাই অনুকরণীয় ফ্যাসন। জয়ন্তর জীবনে ফ্যাসন নেই, ষ্টাইল বল্‌লেও ন্যায় মর্যাদা দেওয়া হয়না।

জয়ন্তর বাপ দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টর, সমাজ জীবনে জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত। জয়ন্ত একমাত্র পুত্র। ভবিষ্যতে সে একাই হবে বড় বড় মিল ফ্যাক্‌টরীর লক্ষপতি মালিক। কাজেই য়ুরোপে দশ বছর বিদ্যার্জনের পর বিদ্যাচর্চা করে দেশে ফিরে কোন বড় চাকরী না গ্রহণ করলে, কিংবা পৈতৃক সম্পত্তির খপদ্দারী না করলে গতির অগতি হয় না, জীবনছন্দের ব্যতিক্রমও হয় না। অর্থসংকট যেখানে সেখানে তার স্বচ্ছলতার বাড়াবাড়ি। অথচ অর্থের প্রতি রয়েছে ঔদাসিন্য। বন্ধুরা বলে বোকা। জয়ন্ত কোন প্রতিবাদ করে না, কারণ ওরা মনের স্তরের বন্ধু নয়। অর্থ যদি মনের দিক থেকে সহজ না হয় তবেই মানুষ অর্থ কামনা করে, লক্ষ টাকাকে কোটিতে পৌঁছানোর জন্য মানুষ অর্থ উৎপাদক জন্তুতে পরিণত হয়, জীবন থেকে হয় বঞ্চিত। কিন্তু মনের মাঝে যদি অর্থ সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করে তবে সহজলভ্য অর্থ সহজ হয়েই থাকে, ভ্রান্ত কামনার উদ্দামস্রোত জীবনকে অজীবনের পথে ঠেলে নেয় না।

বুদ্ধিমান বন্ধুরা বলে, লাখো লাখো টাকা রয়েছে ক্রমোন্নতির পথে, তাই জয়ন্তর অর্থ বৈরাগ্য চাল। অত্যধিক ডিগ্রীর গর্বে মনে লেগেছে বিদ্যার নেশা, ব্যবসায়ী মনটা পড়েছে চাপা। সহজ কথায় বলতে গেলে, এ যেন চাষার গ্র্যাজুয়েট ছেলের বাপের চাষ করা শস্যের প্রতি স্বাভাবিক অবহেলা।

কথাগুলি জয়ন্তর উদ্দেশ্যে বলা—কাজেই কানে পৌঁছানো হয়। খোঁচা দিয়ে বলা, অথচ খোঁচা লাগে কি লাগে না, কিছুই বোঝা যায় না। কাজেই শেষটায় বন্ধুদের হার মানতে হয়।

পিতৃ-বন্ধুরাও কম চিন্তিত নয়, বিশেষ করে যারা জামাতা করবার আশা পোষণ করেন। তারা বলেন, যে ছেলে ডি-এস্‌সি ডিগ্রী নিয়ে পি-এইচ-ডি উপাধি নেবার জন্য স্কুল পরীক্ষার্থীর মত নাওয়া খাওয়া ভুলে লেখা পড়া করে, তাকে তখনই সামলান উচিত ছিল।

জয়ন্তর পিতা রাধাকান্ত বলেন, যা রেখে যাব তা ক্ষয়ের পথে নয়, বেড়েই যাবে—ছেলে যখন আমার উড়নমুখী নয়।

রাধাকান্তর বিশেষ বন্ধু অটলবিহারী বলেন, সেইটাই ত' ভয়ের কারণ। যে ছেলে উড়ে না, অথচ টাকার উর্ধ কিংবা অধঃ গতির প্রতি উদাসীন, সে ছেলে আপন নয়।

রাধাকান্ত বলেন, যারা লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীর পুজো করে তাদের কি বাধা দেওয়া যায়—বিশেষ করে মাতৃহীন সন্তানকে।

কিন্তু বয়স?

রাধাকান্তবাবু ভাবনায় পড়েন, বলেন, তাইত অটল! বয়সটা যে এখন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অনাসক্তির জন্যই ত' বিলেতে এত বছর রাখলাম, ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করিনি। য়ুরোপে শিক্ষা ও সভ্যতার অঙ্গ হল নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে দৃষ্টি জ্ঞান লাভ। য়ুরোপে এত বছর থেকেও যে নারীর প্রতি কৌতুহল জাগবে না, তা' আমি ভাবতেই পারিনি।

অটলবিহারী বল্‌লেন, জয়ন্ত সৃষ্টিছাড়া মানুষ। এখনও সময় আছে, রঙের খেলা সুরু করাও।

রাধাকান্ত বল্‌লেন, প্যারীর মত স্থানে যে ছেলের চোখ ফুটল না, দিব্যদৃষ্টি খুলল আদর্শের—

অটলবিহারী বাধা দিয়ে বললেন, কথার প্যাঁচ থাক্‌। কোন উপায় খুঁজে বের কর। ও ছেলে তোমায় দুঃখ দেবে, নিজে দুঃখের মাঝে শেষ হবে কল্পনার মরীচিকায় ধাওয়া করে।

জয়ন্তর কোষ্ঠিতে নাকি লেখা আছে, দুঃখের চরম আনন্দে জয়ন্তর সার্থকতা ও চরম পূর্ণতা।

তাই ত' দেখা যাচ্ছে। যে ছেলে বৈজ্ঞানিক হয়ে সাহিত্য পড়ে, ইতিহাস পড়ে, দর্শনশাস্ত্র পড়ে, অর্থনীতি পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে মেতে উঠল তার পরিমাণ ভীষণ।

জ্ঞানলাভ ত গৌরবের।

জয়ন্ত গৌরবের উর্ধে। জ্ঞানলাভের জন্য জয়ন্ত পড়ে না, ও পড়ে জ্ঞানের এ্যানাটামী। এ ভয়ংকর নেশা। এ নেশা এসেছিল ভগবান বুদ্ধের, এসেছিল শ্রীচৈতন্যের, আর এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের।

এমনি ভাবেই আলোচনা চলে, কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন অটলবিহারী এসে বল্‌লেন, ভায়া, আমি মীমাংসা পেয়েছি।

রাধাকান্ত উৎসাহিত হয়ে বলেন, কি মীমাংসা?

মালবিকাকে যদি পুত্রবধূ করতে আপত্তি না থাকে তবে আমি চেষ্টা করতে পারি।

মালবিকা রমেশের মেয়ে ত'?

হাঁ।

বিয়ে দিতে চাও দিতে পার, কিন্তু বিয়ের পর না ঘর ছেড়ে পালায়।

এ আধুনিক যুগ। মেরুদণ্ডহীন যুবকরা বিয়ে করে বউ ত্যাগ করে কিংবা দুর্ব্যবহার করে সত্য, কিন্তু আদর্শ কিংবা ধর্মের জন্য কেউ তার স্ত্রী ত্যাগ করে না। আমি বিয়ে দেব না, এখন পোষ মানাব প্রথম।

জয়ন্ত মেঘভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল।

মালবিকা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, কাপটি টেবিলের উপর রেখে বলল, অত দেখছ কি ? মেঘের খেলা ?

না।

তবে ?

ভাবছি। মেঘকে নয়।

অত ভাব কেন ?

ভাবায় বলে ভাবি। ভাবব বলে ভাবিনে, তাই ত' অত ভাবতে হয়।

মেঘ তোমায় ভাবায় না, আশ্চর্য ! যে মেঘ ময়ুর ময়ূরীকে নাচায়, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় দেয় আনন্দের দোলা, মনের রঙিণ মসৃণ কোমল পাখায় তোলে হিল্লোল—

আবার কাব্য জুড়ে দিলে।

জীবনটাই ত' কাব্য—দেহটা তোমার বিজ্ঞান হতে পারে কিন্তু মনটা সম্পূর্ণ কাব্য। আমি তুমি, এ নিখিল বিশ্ব সবই ত' কাব্য। ফুল ফুটে কেন, পাখী কেন করে কলতান, ভরা নদীতে কেন আসে জোয়ার। সে কথা যাক, এখন চল বেড়াতে।

কোথায় যাবে ?

যাব প্রকৃতির মাঝে—সেখানে শুধু আমি আর তুমি।

কিন্তু—

কিন্তু নয়। জীবনটা পণ্ডিতদের গ্রন্থশালা নয়।

গ্রন্থশালা আমিও চাইনে। আমি চাই চির জীবনরস—**elixir of life.**

মালবিকা চমকে উঠে বলল—মানে ? আধ্যাত্মিক কিছু নয় ত ?

জানিনে—অনুভূতি এখনও ধরা দেয়নি স্পষ্ট হয়ে।

মালবিকা হাঁফ ছেড়ে বলল, এবার চল, বেলা যে শেষ হতে চলল।

জয়ন্ত চাদরটা নিতে গিয়ে চমকে দাঁড়াল। সোজা মালবিকার দিকে তাকিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বলল, এর মানে অনুভব করতে পার ?

মালবিকা বলল, পারি। আমার যে বেলা তাকে যদি পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ না করতে পারি তবে তাকে চিরকালের জন্য হারাই।

জীবনের জয়রথ চলে মৃত্যুর রাজদ্বারে শান বাঁধান স্বচ্ছ সরল পথে।

তার ধ্বনি বাজে প্রতিনিয়ত আমার কর্ণে, তাই ত' আমি চাই এ জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে।

জয়ন্ত মালবিকার হাত ধরে বলল, এ শুধু কথার কথা, না অন্তরের বাণী ?

মালবিকা জয়ন্তর চোখে তুলে ধরল উত্তেজিত চোখ দুটি, পুলক আবেগে মুদিত হয়ে এল—জয়ন্ত চিনলে না তার ভাষা।

মালবিকা জয়ন্তর হাত ধরে মোটরে এসে উঠল। সহর ছাড়িয়ে তারা এল খোলা মাঠে। নিকটে কোন জনবসতি নাই। শ্যামল মাঠ, ঝাড়-ঝোপ, বাঁশ ও কাশবন, বনতুলসী, বঁইচি, ধুঁতরা, বন্য করবী—সম্পূর্ণ শ্যামল ধরণী।

মালবিকা প্রথম নামল, হাত ধরে নামাল জয়ন্তকে। হাত ধরে তারা চলল আল ধরে। ধানের শিষ, চোরকাঁটা হেলেদুলে এসে পড়তে লাগল তাদের শাড়ি আর ধুতির কোঁচায়।

মালবিকা বলল, ভালবেসে পেয়েছি তোমায়, তাই সুন্দর এ পৃথিবী, পূর্ণ করে তুলতে চাই জীবনকে। তোমায় পেয়েছিলাম বাল্যে তখন তুমি ছিলে খেলার সাথী, এল কৈশোর, লজ্জার মাধুর্যে বন্ধুত্ব হয়ে উঠল মধুময়—তারপর যৌবনের প্রারম্ভে প্রাণ যখন চাইল রচনা করতে প্রাণের মন্দির, বিরহ করে তুলল মৃত্যুযাতনা-আনন্দময়।

জয়ন্ত বলল, আমরা পেলেই কি তোমার জীবন হবে পূর্ণ ?

তা' নয়ত' কি। তোমায় পাওয়া ত' সহজ পাওয়া নয়, তোমায় পাওয়া মানে চরিত্র, জ্ঞান, যশঃ, অর্থ আর পৌরুষের আদর্শকে পাওয়া। কুমারীত্বের সীমা থেকে যে করেছি তোমারই তপস্যা।

ভুল করেছ মালবিকা। জীবন বলতে তোমার অনুভূতি করে ছবি মনের পটে আল্পনা করে ?

জন্ম ও মৃত্যুর আঁধার পথে যে দীপ শিখা তাইত' জীবন।

এ ত' তোমার কথা নয়, তোমার বিশ্বাস নয়।

না, এ আমারও কথা, আমার বিশ্বাস। এ শিখায় আমি দেখেছি প্রকৃতির রূপ। আমি জেনেছি, যে কোন মুহূর্তে দীপশিখা যেতে পারে নিভে—তারপর দু'পাশের চির-অন্ধকার দু'পাশ থেকে এসে এমনি ভাবে চেপে ধরবে যে, আমাকে আর কোথায়ও পাবে না খুঁজে আর কখনো—চির-আঁধারেই যাব মিলিয়ে চিরকালের জন্য।

এই যদি তোমার সত্য বিশ্বাস তবে ভুলের বন্ধনে কেন বাঁধ নিজেকে। জীবনমৃত্যুর মাঝে যে মৃদু তরঙ্গ তাকে করে তোল উদ্বেলিত। চির নিরন্ধ্র যে অন্ধকার তাকে করে তুল আলোকিত জ্ঞানের আঁধার চির তমসারাত্রি অজ্ঞানের।

সেই অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলবে তোমাদের বিজ্ঞান ?

না, বিজ্ঞান বিশ্বাস করবার কারণ পায় না।

তবে ?

দর্শন।

শেষটায় ধর্মশাস্ত্র নিয়েও মেতেছ ? কিন্তু মিথ্যে মরীচিকার পিছু ধাওয়া—কল্পনায় রঙ্ ফলান যায়, কিন্তু ছবি তোলা যায় না। যা সত্য সত্যই আঁধার, তা' সত্যই আঁধার।

এই তোমার সত্য বিশ্বাস ?

হাঁ, সত্যকে সত্য বলেই আমি মানি, কাব্য কিংবা দর্শনশাস্ত্র ভারাক্রান্ত করি না, জীবনের বহির্সীমানার অকাল অনন্ত শূন্যতা স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও দেহহীন অলীক কল্পনামাত্র। একে চলে না পরীক্ষা করা, বিশ্লেষণ করা, বিচার করা। যা কোন দিন ছিল না, নেই এবং কখনও হবে না তাকে নিয়ে দর্শনশাস্ত্র রচনা করা চলে, ধর্মোপদেশ দেওয়া যায়, কাব্য রচনা করা চলে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রবেশ হয় না, বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না।

গঙ্গার তীরে এসে তারা দাঁড়াল। ওপারে দেখা যায় বোটানিক্যাল গার্ডেন। কুয়াসার মত অন্ধকার এসে ঝরে পড়ছে ঝাড়ঝোপ। অস্ত-

রবির শেষ রশ্মি সুউচ্চ গাছের ডালে, শাখায় পাওয়া হালকা হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা গাছের নীচে তারা এসে বসল। মালবিকা আঁচল দিল বিছিয়ে জয়ন্তের আসন করে।

মালবিকা বলল, আমি যা বললাম তা' ত' তোমারই প্রতিধ্বনি মাত্র। তুমি এখন দর্শনশাস্ত্র পড়তে সুরু করেছে,তাই হারিয়ে ফেলেছ দৃঢ় বিশ্বাস।

জয়ন্ত বলল, মালবিকা!

মালবিকা মুখ তুলে তাকাল। চঞ্চল আঁখি তারকায় হারাণ চাঁদ হেসে উঠল।

জয়ন্ত খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, মালু!

মালবিকার চোখ উঠল ঝলসে, বলল, এ নদী, এ বন, এ মাঠ, গাছপালা, আকাশ বাতাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সম্পদ সবই ত' আমার।

জয়ন্ত মালবিকার হাত দুটি হাতের মুঠায় নিয়ে বলল, সংশয় আমার জ্ঞানের মন্দিরে, তুমি বল, আমি শুনি।

এ ত' তোমারই কথা।

না, সে আমাকে আমি ফেলেছি হারিয়ে। তুমি বল আমি শুনি। এ পৃথিবী কি সত্যই আমার?

মালবিকা জোর দিয়ে বলল, এ পৃথিবী ত' শুধু আমার। আমি যখন ছিলাম না তখন এ পৃথিবী ছিল না, আমি যখন থাকব না তখন এ পৃথিবী থাকবে না। আমিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আমিই অতীত, আমিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।

তুমি ত' শুধু মাত্র বর্ত্তমান। তুমি ত' আর কিছু মান না।

আমি শুধু মাত্র বর্ত্তমান। বর্ত্তমানের ভূমিকা অতীত, সার্থক মৃত্যু ভবিষ্যতে। আমার জন্যই আমি রচনা করেছি এ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যাহা কিছু দৃশ্য-অদৃশ্য, যাহা কিছু পাওয়া না পাওয়া সবই ত' আমি—আমার জন্যই সব। আমি যখন থাকব না তখন কোন কিছুই থাকবে না। আমার নিকট, যেমনি আমি যখন ছিলাম না তখন কোন কিছুই ছিল না।

তোমার কথাগুলি স্বাভাবিক হচ্ছে না। তর্ক ঝংকার হচ্ছে।

তুমি হিন্দু দর্শন মান—মান তুমি তার শেষ ও মূল কথা? যদি মান তবে আমিই ত' ভগবান। যদি আমিই ভগবান হই তবে কিসের জন্য এ নিয়মকানুন, বিধিব্যবস্থা, কিসের জন্য পাপপুণ্য, দুঃখ সুখ, কিসের তরে লাজলজ্জা, ভয়অনুতাপ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি, কিসের জন্য জপতপ, ধর্মাধর্ম—তবে কেনই বা এত অনুসন্ধিৎসু ও পৃথক সহানুভূতি?

তোমার কথাগুলি জাগিয়ে তোলে মনে সংশয়—মনে হচ্ছে শব্দব্রহ্ম।

তার কারণ তোমার বস্তুতন্ত্র মনকে দ্বিধাসংশিত করে তুলেছে ধর্ম। ধর্মের পরশ বড় মারাত্মক নিষ্পাপ সরল মনে। তোমার মিথ্যে খোঁজা চিরজীবনরস বাস্তবজীবনকে ব্যর্থ করে। ফিরে এসো, উছল হয়ে উঠ জীবনানন্দে, পূর্ণ করে তোল প্রতি মুহূর্ত।

এই কি জীবন?

হাঁ, এই জীবন। যে পরব্রহ্মকে জানিনে, জানব না, কেউ জানেনি তাকে কল্পনায় পূর্ণ করে তুলবার জন্য বাস্তবজীবন তিলে তিলে কৃচ্ছ সাধনে পণ্ড করাই যে চরম সার্থকতা এর প্রমাণ ত' তুমি পাবেনা, কেউ পায়নি। ভগবান? সে ত' আরও ফাঁকি। এ বাণী ত' তুমিই একদিন আমায় শুনিয়েছিলে।

এ কি আমারই কথা ছিল। ধর্ম নয়, সাধনা নয়, শুধু আনন্দোৎসবই জীবন? শুধু ভোগবিলাস, আর কিছু নয়?

জীবনানন্দে ত' সাধনার পথ রুদ্ধ নয়। শুধু মাত্র বৈরাগ্য সাধন-জীবন নয়। তুমি বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে এগিয়ে চল—জগতের কল্যাণের জন্য।

তবে তাই হোক মালু।

মালবিকা আনন্দে জয়ন্তকে জড়িয়ে ধরল, বলল, তা' হলে তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে। কাকাবাবুকে বলব, তোমার বিয়েতে মত হয়েছে। ফাল্গুনের মধুময় দোলপূর্ণিমায় মিলন হবে মোদের।

তাই বলো। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নেবার দুর্বলতা সংস্কার আমার নেই। সংসারের সুখ দুঃখের মাঝে আমরা মিলিত ভাবে জীবনানন্দে পূর্ণ হয়ে উঠব—বিজ্ঞানের সাধনায় তুমি হবে আমার সহায়।

মালবিকা বলল, তোমার জীবন জয়যাত্রায় আমি হব সাথী।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে। বোটানিক্যাল গার্ডেনটা অস্ফুট আলোকে রহস্যময় হয়ে উঠল।

মালবিকা জয়ন্তর হাত ধরে বলল, এবার চল।

বিবাহ বাসরে সানাই বাজে করুণ সুরে। মঙ্গলময় আনন্দোৎসবে কেন এই করুণ ক্রন্দন? এ কি পিতামাতার অন্তরের বিরহ বেদনা? আনন্দের মাঝে যে শাশ্বত করুণ বেদনা নিঃশব্দে ও অলক্ষ্যে অন্তরে বাজে তাকেই কি ফুটিয়ে তোলে সানাই।

সানাই বাজছে। জয়ন্ত আর মালবিকার হবে শুভ পরিণয় কাল দোল পূর্ণিমার মঙ্গল লগনে। চারিদিকে চলছে উৎসব-আত্মীয়স্বজন; বন্ধুবান্ধবের কলহাস্যে, নৃত্যসঙ্গীতে দিগন্ত হয়েছে মুখরিত।

যে বৈজ্ঞানিক মনকে ধর্মের আকর্ষণে করেছিল বৈরাগী তাকে মালবিকার যৌবনচাঞ্চল্যে, কথার মাধুর্যে ঘুরিয়ে এনেছে সংসারের ছককাটা পথে। তাই আনন্দোৎসব স্বাভাবিককেও গেছে ছাড়িয়ে।

জয়ন্তর গাম্ভীর্য হয়েছে আরও কঠিন পর্বতের মত বিরাট, তাতে দেখা দিয়েছে নতুন উপসর্গ চাঞ্চল্য। এ পরিবর্ত্তন লোকের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাদের ধারণা পরিণত বয়সে আকস্মিক বসন্তের প্রভাব।

রাত্রি শেষে শিশির পরশে শ্যামল শোভা হয়ে উঠেছে অপরূপ। জয়ন্ত জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। সানাই বাজছে। সানাইএর করুণ সুর জয়ন্তর মনকে চঞ্চল করে তুলল।

এই কি জীবন? জীবনের এই কি শেষ কথা? মালবিকা নেই পাশে, কে দেবে এর জবাব। য়ুরোপ, আমেরিকায় মানুষ পেয়েছে ঐশ্বর্য, পেয়েছে স্বাধীনতা, হয়েছে সংস্কার মুক্ত, কিন্তু ওরা ত' জীবনানন্দ পেলে না। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি করেও ত' জীবনকে চিনলে না, সুখ

শান্তি দিতে পারলে না—জীবনটাকে করে তুলল প্রাণহীন যন্ত্র। এত ঐশ্বর্য, এত শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানের কল্যাণে এত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও মনের অশান্তি, চাহিদার উঞ্ছবৃত্তি, কৃত্রিম জীবনের দুর্ভিক্ষ, হিংসাদ্বেষ, জিঘাংসা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনধারাকে করে তুলেছে অশান্ত, জাগিয়ে তুলেছে হিংস্র পশুবৃত্তি—পরিণামে আজও বিভিন্ন জাতি রয়েছে পদানত, হচ্ছে নিপীড়িত, শোষিত এবং হিংস্র পাশবিক মনোবৃত্তির জন্য সর্বমানবজাতি হারিয়েছে মনুষ্যত্ব, হারিয়েছে সুখ, শান্তি ও স্বস্তি।

জয়ন্ত অশান্তিতে ছট্‌পট্ করতে লাগল, মানসিক বিপ্লবে সারা কক্ষময় ঘুরতে লাগল অস্থির পদক্ষেপে।

বিছানার পাশেই বই-এর একটা ছোট র‍্যাক্। তাতে দর্শনশাস্ত্রের জটিল পুস্তকগুলি রয়েছে এলোমেলোভাবে। একটা বই টেনে নিল—ভগবৎগীতা! আব্‌ছা আঁধারে পড়তে পারল না, এগিয়ে চলল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নিশির ডাকের সম্মোহনগ্রস্তের মত। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে ল্যাবোরেটরীর দরজার পাশে। দরজাটা বন্ধ, একটি জানালা ভুল করে রয়েছে খোলা। জয়ন্ত খোলা জানালা দিয়ে একবার তাকালে।

ওইখানে সে কত দিনরাত্রি তন্ময় হয়ে কত গবেষণা করেছে। চির-জীবন রস আবিষ্কার করবার জন্য যখন সে গবেষণায় ডুবেছিল তখন এসেছিল মালবিকা। তারপর—তারপর কী যে হল, কোথায় গেল গবেষণা, কোথায় গেল ধর্মের বৈজ্ঞানিক সাধনা। বস্তুতন্ত্র, দর্শন বিজ্ঞান সব—সব মিলে কি যে হল—জয়ন্ত বুঝতে পারছে না। স্মৃতি, বুদ্ধি, জ্ঞান—সমস্তই যেন লোপ পেয়েছে।

সে কি তবে পাগল হল? মালবিকা কি শেষ পর্যন্ত তাকে পাগল করে দিল। হয়ত হবে। এ অবস্থাকেই হয়ত লোকে বলে উন্মাদনা।

জয়ন্ত একটু হাসল, বোধহয় পাগল হবার জন্যই একটু হাসল। তারপর চলতে সুরু করল।

বিজ্ঞান নয়, সমাজ নয়, ঐশ্বর্য নয়, যশঃ নয়, সংসার নয়, রাষ্ট্র নয়, দেশ নয়, জীবন নয়, ধর্মও নয়—শুধু আমি। আমি কে? আমি কে এর জবাবই যদি না মিলল তবে কিসের জীবন।

জয়ন্তর চলার হল না বিরাম। এ চলার শেষ সেখানে, যেখানে শেষ প্রশ্নের শেষ জবাব আর পাওয়া যায় না।

সানাই-এর স্বর অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে কখন যেন থেমে গেছে।

নিষ্কৃতি ও বড়দিদি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নিষ্কৃতি—ইহা একটি বড় গল্প—প্রথম শ্রেণীর রচনা। গল্পটি নারী-চরিত্র প্রধান। নারীর পরেই ইহাতে বালক-বালিকার স্থান। পুরুষ-চরিত্র গিরীশ গল্পের একপ্রান্তে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই চরিত্রই তিলেষু তৈলবৎ, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ন্যায়, সমস্ত গল্পের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া বর্ত্তমান আছে। সমগ্র গল্পের মাধুর্য্য গিরীশচরিত্রকেই আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—গিরীশের বাৎসরিক আয় অন্ততঃ ২৫ হাজার টাকা। ইহাতে গিরীশের পরিবারকে ধনীপরিবারই বলিতে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই পরিবারটিকে মধ্যবিত্ত পরিবারেরই রূপ দিয়াছেন। হিন্দু-মধ্যবিত্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের বধূদের মধ্যে যে কলহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য—তাহাই গল্পটির প্রধান উপজীব্য। এই ধরণের বিবাদ-বিসংবাদের কথা শরৎচন্দ্রের মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে ইত্যাদি বড় গল্পেও আছে। বিন্দুর ছেলে ও মেজদিদিতে এই মনোমালিন্য একটি বালককে অবলম্বন করিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। এই গল্পের কলহ-পর্ব্বটাও একটি বালককে অবলম্বন করিয়াই আরব্ধ বটে, কিন্তু ইহার মূলে আছে মেজ-গিন্নীর হীন স্বার্থ ও হিংসা। হিন্দুর একান্নবর্ত্তী সংসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার, সমাজ ও অঞ্চল হইতে বধূরা আসে। তাহাদের স্বভাব, প্রকৃতি, আদর্শ ও প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। এক পরিবারের মধ্যে সন্তানসন্ততি লইয়া সংসার-যাত্রা করিতে হইলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বাধে। যেখানে সুযোগ্যা গৃহকর্ত্রী থাকে না, সেখানে কলহ-বিবাদ চলিতে থাকে—শেষ পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙিয়া যায়। হয় সন্তান সন্ততি লইয়া—নয় স্বামীদের আয়ের বৈষম্য লইয়া হয় কলহের সূত্রপাত।

হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের এই বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া এই বড় গল্পটিতে বালকবালিকাদের মনস্তত্ত্ব অতি চমৎকার ভাবে রসমূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

হরিশ ও নয়নতারা এই গল্পের মুখ্য চরিত্র নয়—এই দুটি চরিত্র রস-সৃষ্টির উপাদান নয়—উপকরণ মাত্র। সিদ্ধেশ্বরী ও গিরীশচন্দ্রের চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এই দুটির আবির্ভাব হইয়াছিল। তবু এই দুটি চরিত্রও মুখ্যচরিত্রগুলির মত বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছে।

এই গল্পের গিরীশ চরিত্রই অভ্রভেদী গিরীশের মত দাঁড়াইয়া আছে—ইহাকে অচল ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়। ইহারই পাদমূলে কত দ্বন্দ্ব—কত সংঘর্ষ। কিন্তু ঐ অচল নির্বিকার অভ্রভেদী চরিত্রের হৃদয় হইতে বিগলিত বাৎসল্যের প্রপাত ধারায় সকল দ্বন্দ্ব—সকল শফরীলীলা ভাসিয়া গেল।

এইরূপ চরিত্র শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদের কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র নয়—তিনি

এ চরিত্র নিশ্চয়ই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—আমরাও বাল্যকালে আমাদের এই ভাগীরথী মণ্ডলেই এইরূপ চরিত্র দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী জীবনে এরূপ চরিত্র আর দেখি নাই। যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে হিন্দু-গৃহকর্ত্তাদের আদর্শ বদলাইয়া গিয়াছে—তাঁহারা এখন অনেকটা হিসেবী ও সতর্ক হইয়াছেন।

আপনার কর্ম্মজীবনে একেবারে তন্ময়, অর্জ্জনে একনিষ্ঠ—সঞ্চয়ে উদাসীন—বর্জ্জনে মুক্তহস্ত ও অকাতর, তুচ্ছ ক্ষুদ্রতার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত—অন্তঃপুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্যমনা—এইরূপ চরিত্র এখন আর দেখা না গেলেও একদিন ছিল। প্রশ্ন হইতে পারে, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল নিজের ব্যবসায় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে এত উদাসীন, এত অন্যমনস্ক হয় কিনা? ইহা স্বাভাবিক কিনা? জ্ঞান-চর্চ্চায় তন্ময়—অধ্যাপকের জীবনই সাধারণতঃ এইরূপ হয়। একালে এই চরিত্রকে একটু অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ইহা অস্বাভাবিক ছিল না। যে কোন ব্রতে মানুষ তন্ময় হইলেই তাহার মনের এইরূপ অবস্থা ঘটে।

শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন—অর্জ্জনের শক্তি যাহার অপরিসীম—বর্জ্জনের শক্তি তাহারই অপরিসীম হইতে পারে। একই মানুষ অর্থার্জ্জনে একনিষ্ঠ ও তন্ময় এবং অর্থে নিস্পৃহ দুইই হইতে পারে। একই পৌরুষ শক্তি অর্জ্জনে সহস্রবাহু অর্জ্জুন এবং বর্জ্জনে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন হইতে পারে। অর্থই তাহার কাছে বড় নয়—অর্জ্জনে ও বর্জ্জনে পৌরুষ শক্তিটাই বড়।

অন্যমনস্ক ও উদাসীন গিরীশের মুখের কথাগুলি আমাদের হাস্যের উদ্রেক করে। ঐগুলিই এই বড় গল্পটির রঙ্গরসিকতার অভাব পূরণ করিয়াছে। কিন্তু এই রঙ্গরসটুকু সেই শ্রেণীর রঙ্গরস, যাহা আমরা প্রাচীন সাহিত্যে উপভোগ করিয়াছি—শিবের আচার আচরণে।

অবশ্য গিরীশচন্দ্রের অন্যমনস্কতা ও ঔদাসীন্য দেখাইবার চেষ্টায় শরৎচন্দ্র একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন—একটু বেশি রঙ চড়াইয়াছেন। ইহাতে আংশিক ভাবে অপূর্ব্ব রস পাইয়া সমগ্রতার দিক হইতেও এই রঙ্গাতিশয্যজনিত অঙ্গহানি আমরা বিস্মৃত হইতে পারি।

বৈয়াকরণরা বলেন—ভাই+শ্বশুর, সংক্ষেপে ভাশুর।

কিন্তু সংস্কৃতে ভাস্+ঘুরচ্—ভাস্বর শব্দটি নিষ্পন্ন।

এই ভাস্বর কথাটির অর্থ দীপ্যমান—ভাস্বর। বঙ্গসাহিত্যে এই ভাস্বরকে কেহই স্থান দেন নাই। শরৎসাহিত্যে ভাশুর—ভাস্বররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই ভাস্বর শুধু স্থান লাভ করে নাই—স্বকীয় দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া অন্বর্থনামকতা লাভ করিয়াছে। বিন্দুর ছেলেতে যে ভাশুর সন্তানের অভিনয় করিয়াছে—নিষ্কৃতিতে সেই ভাশুরই করিয়াছে পিতার অভিনয়।

শরৎচন্দ্র হিন্দু-নারী চরিত্রের সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহার সুন্দর ও কুৎসিত দুইদিকই পাশাপাশি উদ্ঘাটিত করিয়া অপূর্ব্ব কলা-কৌশলে রস সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ শরৎচন্দ্র রসসৃষ্টির জন্য বিভিন্ন নারী চরিত্রের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ও তাহাদের হৃদয়বৃত্তির যথাযথ বিকাশকেই উপাদান উপকরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। হৃদয় বৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘর্ষকে রসে পরিণত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর নারীচরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মেজো বৌ ও ছোট বৌ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের নারী—তাহাদের মাঝে পড়িয়া ব্যক্তিত্বহীন বড়বৌকে সকল আঘাত প্রত্যাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।

হিন্দু পুরুষগণ চিরদিনই অন্তঃপুরের নারীগণের আচার আচরণ ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উদাসীন—অন্তঃপুরের শাসন-শৃঙ্খলা-রক্ষা করিবার দিকে তাহারা দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না। বর্ত্তমান যুগে পুরুষদের বাহিরের কাজ এত বেশি—নানাদিকে তাহাদের মনোযোগ এতই ব্যাপৃত যে তাহাদের এই ঔদাসীন্য আরো বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, গৃহে তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীশাসিত হইয়াই পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্র পুরুষদের এই ঔদাসীন্য ও স্ত্রৈণতাকে অন্তঃপুরের বিশৃঙ্খলতার একটি কারণ বলিয়াই ধরিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র এ কথাও বলিতে চাহিয়াছেন—আমাদের পারিবারিক জীবনে নিষ্কৃতি ও বড়দিদি—পুরুষ পুরুষের মতই নির্ব্বিকার—শিবের মত ভূমিশয়ান। নারী প্রকৃতির মতো চিরচঞ্চলা—কত মায়ামোহজালেরই না সে সৃষ্টি করে। পুরুষ একবার হুঙ্কার করিয়া উঠিলেই সব মায়াজাল অপসৃত হইয়া যায়।

আমাদের সমাজে একটা সংস্কার প্রচলিত আছে—যেখানে তিন ভাই, সেখানে বড় ভাই হয় উদার মহান্ ও স্বার্থত্যাগী—মেজো হয় কুটিল ও স্বার্থপর এবং ছোট সাধারণতঃ কতকটা মা-বাপের আদরে কতকটা ভাইদের আদরে হয় অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য ও গলগ্রহ। শরৎচন্দ্র নিষ্কৃতি উপন্যাসে এই প্রচলিত ধারণার অনুসরণ করিয়াছেন। বধূদের বেলাতেও এই ধারণাধারাই অনুসরণ করিয়াছেন—তবে ছোট বৌ সম্বন্ধে অন্যথা হইয়াছে। ছোট বৌকে তিনি করিয়াছেন বুদ্ধিমতী, কর্ম্মদক্ষা, তেজস্বিনী ও প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী। অক্ষম স্বামীর ভার্য্যা হওয়ার যে দুর্ব্বলতা নিজের গুণাতিশয্যে সে দুর্ব্বলতার ক্ষতি-পূরণ করিয়া সে সংসারের অধীশ্বরীই হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্তের বিরুদ্ধেই সে সংগ্রাম করিতে পারিত কেবল হিংসা ও হীন স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অস্ত্র তাহার ছিল না। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—এই চরিত্রের মধ্যেও গৃহবিবাদের বীজ ছিল। তাহার চরিত্রের অসহিষ্ণুতা, ক্ষমাহীন দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠতা একান্নবর্ত্তী পরিবারের গাঢ়বদ্ধতার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়।

বড়বৌ সিদ্ধেশ্বরীর ছিল স্বাভাবিক মহত্ত্ব, উদারতা ও অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্য—কিন্তু সৎশিক্ষা ও বুদ্ধিবলের দৃঢ়ভিত্তির উপর তাহার এই উদার চরিত্রটি গড়িয়া উঠে নাই। সে ছিল নির্ব্বোধ, অশিক্ষিত ও মেরুদণ্ডহীন। ভিত্তি দৃঢ় ও সুগঠিত না হইলে সোনার সৌধও স্থায়ী হয় না। তাই সিদ্ধেশ্বরী তাহার চরিত্রের উদারতা রক্ষা করিতে পারিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণময়ী ছোটবধূর প্রভাবে তাহার চরিত্র মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব ছিল না বলিয়া মেজোবৌএর আবির্ভাবে, প্রভাবে ও প্ররোচনায় তাহা অধোমুখী হইয়া গেল। এরূপ চরিত্রের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর ধাতুগত চরিত্র মেজো-বৌএর হিংসার মেঘজালে আচ্ছন্ন মাত্র হইয়াছিল—একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। তাই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ইন্দুকিরণচ্ছটার মত তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য

ও ঔদার্য্য মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষে সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে যার যা মুখে এল তাই ব'লে গাল দিল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইএর চেয়ে কত বড়—সে কথা আজ যেমন আমি বুঝেছি—এমন কোনদিন নয়।

শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বড়দিদি—ইহাও একটি বড় গল্প। ইহাতে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় নাই। যে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি ও আবেষ্টনীর জন্য শরৎচন্দ্রের রচনা অনন্যসাধারণ—সে ভিত্তি বা আবেষ্টনী ইহাতে নাই। ইহাতে যে Romanceটুকু ফুটিয়াছে—তাহা অন্য পাঁচজনের রচনাতেও আছে। এই গল্পটির চিত্রে বহুস্থলেই রঙ অত্যন্ত গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের তুলিকায় দরিদ্র গৃহের চিত্র যেরূপ জীবন্ত ও স্বভাবসুন্দর হইয়া ফুটে ধনী গৃহের চিত্রটি তেমন হয় না। ধনীগৃহের যথাযথ আবেষ্টনী ফুটে না—ধনীর সন্তানগুলি রক্তমাংসে জীবন্ত না হইয়া ভাববিগ্রহ মাত্র হইয়া পড়ে। যে কবিত্বের সুর রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গল্পগুলিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে—সে সুরও ইহাতে ধ্বনিত হয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের মত মেরুদণ্ডহীন চরিত্রের পক্ষে শিশুর মত সরল হওয়া যেমন স্বাভাবিক, ইয়ার বন্ধুদের প্রভাবে উৎসন্নে যাওয়াও তেমনি স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে স্বর্গীয় শুচিতায় মণ্ডিত করিয়া শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র প্রথমটা দেখাইয়াছিলেন—তাহার শোচনীয় পরিণতি (অতি অল্প পরিসরের মধ্যে) পাঠকচিত্তকে ক্ষুব্ধই করে। শরৎচন্দ্র এই ক্ষোভ দূর করিবার জন্য রূপকথার রাজপুত্রের মত সুরেন্দ্রনাথকে অশ্বপৃষ্ঠে উন্মত্তের ন্যায় ছুটাইয়াছেন এবং এই Romantic অনুধাবনের পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহার প্রাণোৎসর্গে। শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্র-চরিত্রের শোচনীয় পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবেন বলিয়া গ্রন্থারম্ভে যথেষ্ট কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় সুরেন্দ্র-চরিত্রের কলাসম্মত উন্মেষসাধনে ও তাহার পরিণতির বিবৃতিতে ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে এবং সঙ্গতি ও সংহতিতে যুক্তিমূলক পরম্পরায় শিথিলতা আসিয়াছে।

গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা একজন যুবকের পক্ষে সমস্ত-জীবন ধরিয়া এরূপ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হওয়া স্বাভাবিক কিনা এবং উচ্চশিক্ষিত অভিজাতবংশীয় যুবক ভূস্বামীর পক্ষে পল্লীগ্রামের ইতরশ্রেণীর বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্যে ও প্রভাবে উৎসন্ন যাওয়া স্বাভাবিক কিনা এ প্রশ্নও মনে উদিত হয়। এ প্রশ্ন উদিত হইয়া মনের রসভঙ্গ করিয়া দেয়। এই প্রশ্নের উদয়পথ কলাকৌশলের দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে পারিলে বোধ হয়—রসসৃষ্টির দিক হইতে সুসঙ্গত হইত।

জ্ঞানচর্চ্চায় তদগত অথবা কর্ম্মজীবনে তন্ময় পুরুষেরা সাধারণতঃ বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অন্যমনস্ক এবং সামাজিক ও সংসারিক জীবন এমন কি দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া থাকে—ইহা সত্য! এই সত্যটি বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা একটি Conventionএ দাঁড়াইয়াছে। এই চরিত্রের একটা নিজস্ব মাধুর্য্য আছে কিন্তু এই চরিত্র পারিবারিক জীবনে একটা বিপর্য্যয় ঘটায়। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরেও রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ে ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। শরৎ-চন্দ্রের দত্তায় নরেন্দ্রনাথ এবং নিষ্কৃতিতে গিরিশচন্দ্র এই শ্রেণীর চরিত্র। শরৎচন্দ্র এই দুইটি চরিত্রের উদারতা ও সরলতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ চরিত্রের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধার অবধি নাই।

শরৎচন্দ্র বড়দিদিতে একটি নূতন সত্যের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—এইরূপ চরিত্রই আবার অতি সহজেই নীতিভ্রষ্ট ও ব্রতভ্রষ্ট হইয়া কেবল পারিবারিক জীবনে বিপর্য্যয় ঘটায় না, নিজেরও সর্ব্বনাশ করে। সুরেন্দ্র-চরিত্রের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা সূচিত হয় নাই বটে, তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দরদ হইতে সুরেন্দ্রনাথ বঞ্চিত হয় নাই। সকল প্রকার দুর্ব্বলতার প্রতিই শরৎচন্দ্রের দরদ অপরিসীম। যে বিষয়েই দুর্ব্বলতা থাকুক, তরুণ-তরুণীর চরিত্র কখনও শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

মাধবী চরিত্রে অসঙ্গতি কিছু নাই। ইহাতে প্রাকৃত সত্যই সাহিত্যের সত্যে পরিণত হইয়াছে। মাধবীর চরিত্রাঙ্কনে রসজ্ঞ বিচারকদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। কেবল মনোরমা-মাধবী প্রসঙ্গটা অবান্তর বলিয়া মনে হয়। এ প্রসঙ্গ রসসৃষ্টির অনুকূল হয় নাই—বরং রসাভাস ঘটাইয়া দিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুনীল শতাব্দীর তুহিন শীতল দেহে কে ফোটালো প্রাণ শতদল,
অতীন্দ্রিয় প্রতীক্ষায় দুর্গতি দুর্গম ঘরে ভালবেসে কেবা জ্বালে আলো,
কে এলো কুয়াশা ভেদি, কার রুদ্র বিষাণের ডাক শুনে জীবন চঞ্চল,
নবারুণ প্রীতিরাগে' সপ্তঘুমভাঙ্গা জাতি কার পায়ে প্রণতি জানালো!

দুঃখের দারুণ দিনে পর্ব্বতের বাধা পেয়ে ফিরিয়া গিয়াছে ভগবান,
ক্ষুধিত শিশুর তাই একচোখে ঝরে জল, আর চোখে আগুনের শিখা,
বেদনার সিংহদ্বারে কুণ্ঠিত জীবন স্বপ্ন এতদিনে হ'ল সমাধান,
মরণ পাথার মথি কে নব নাবিক এলো হাতে তার বিজয় লিপিকা।

তোমার চারণ-কণ্ঠে, স্বপ্নময় তব চোখে, বাঁচিয়াছে সোনার ভারত,
দিগন্তে সাগর পারে সুন্দরের মুক তীর্থে রুদ্ধ আশা লভিয়াছে বাণী,

আমরা রয়েছি বেঁচে, আমাদেরি মুখ চেয়ে জেগে আছে দীর্ঘ রাজপথ;
এসব পুরানো কথা, তোমারি পূজার ফুল হোক আজ তোমার প্রণামী।

মাটির দেহের মায়া এ মাটি মায়ের সাথে তোমারে কি ভুলাবে না আর,
আমরা কি রব জেগে, জাগিবে প্রহরী চাঁদ, জেগে রবে রাতের আঁধার?

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

জাপানের আত্মসমর্পণ

জাপান আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মিত্রপক্ষের সৈন্য এখন খাস জাপানে অবতরণ করিতেছে এবং বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাহারা জাপানী সৈন্যকে নিরস্ত্র করিতেছে।

প্রাচ্যে জাপান ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া প্রাচ্যে যথেচ্ছ প্রভুত্ব করা চলিত না; তাহাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভাগ দিতে হইত। পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কৌশলে অপসারিত করিয়া প্রাচ্যের সকল মধু নিজে পান করিবার জন্য জাপান সর্ব্বদাই ফন্দী খুঁজিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দারুণ বল্‌শেভিক্ আতঙ্কের সুযোগে জাপান চীনে সাম্রাজ্য প্রসারে মন দেয়। ১৯৩১ সালে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে, তখন বলশেভিক্ আতঙ্কগ্রস্তদের নিকট হইতে সে পরোক্ষে উৎসাহ পাইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে চীনে জাপানের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করিয়াছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে জাপানের সামরিক শক্তি বল্‌শেভিক্ রুশিয়ার বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হইবে।

১৯৩৯ সালে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের বল্‌শেভিক-বিরোধী নীতির জালে নিজেরা জড়াইয়া পড়ে। তখন প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী জাপান মনে করে—ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট সুযোগ। তখন হইতে সে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করিয়া প্রাচ্যে একাধিপত্য স্থাপনের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহার পর ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে এক গভীর রাত্রিতে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে অতর্কিতে আঘাত করে।

জাপানের হিসাবে ভুল হয় নাই। প্রাচ্য অঞ্চল হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদীদিগকে তাড়াইবার জন্য সে যে সময়টি নির্ব্বাচন করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা উপযুক্ত সময় আর হইতে পারে না। তবে, জার্ম্মানীর মত সে-ও ভুল করিয়াছিল সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তি সম্পর্কে। সে আশা করিয়াছিল—নাৎসী বাহিনী লালফৌজের প্রতিরোধ ভেদ করিয়া মধ্য প্রাচ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অক্ষশক্তির সামরিক সহযোগ সম্ভব হইবে।

এই সহযোগ সম্ভব হইলে অক্ষশক্তি পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে—অন্ততঃ আগামী কিছু কালের জন্য—অজেয় হইয়া উঠিতে পারিত। প্রাচ্যের কাঁচা মাল যদি অবাধে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে অক্ষশক্তির শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগান দিতে পারিত, তাহা হইলে অক্ষশক্তি সত্যই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিত। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা প্রকৃতপক্ষে শিল্পশক্তি ও সংগঠন শক্তির সজ্ঘর্ষ। ১৯৪১ সালে ইউরোপের প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠান অক্ষশক্তির হাতে আসিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান-গুলির দুয়ার পর্য্যন্ত প্রাচ্যের অফুরন্ত কাঁচা মাল পৌঁছিবার পথ যদি নির্ব্বিঘ্ন হইত, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ শিল্পশক্তির সহিত অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত যুঝিবার ক্ষমতা অক্ষশক্তি লাভ করিত। এই পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছিল লালফৌজ; সেই প্রাচীরে আঘাত করিতে যাইয়া নাৎসী বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়।

এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত বলা যায় যে, ১৯৪২ সালে ভল্গার তীরে অক্ষশক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ের ডিক্রীতে অদৃষ্ট হস্তের স্বাক্ষর পড়িয়াছিল; ১৯৪৫ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে অক্ষশক্তির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাখা সম্পর্কে সেই ডিক্রী কার্য্যকরী কাজ হইয়াছে। ইউরোপীয় অক্ষশক্তি শিল্পে ও সংগঠনে কতকটা প্রবল হইলেও ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ শিল্পশক্তির সমকক্ষ তাহারা নয়। আর অক্ষশক্তির প্রাচ্য অংশ ঐ তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় শ্রমশিল্পে অত্যন্ত অনুন্নত। কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে ইহার কোন অংশেরই বেশী দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়।

আমরা শুনিয়াছি—এটম্ বোমা জাপানের পরাজয়ের আশু কারণ। আশু কারণ যাহাই হউক না কেন, প্রকৃত কারণ শ্রমশিল্পে তাহার এই দৌর্ব্বল্য। সুপারফোর্ট্রেসের মত বিমান উৎপাদনের ক্ষমতা জাপানী শ্রমশিল্পের নাই, টাইগার ট্যাঙ্ক জাপান উৎপন্ন করিতে পারে না, আমেরিকার সহিত জাপানের নৌশক্তি বৃদ্ধির ক্ষমতার তুলনাই চলে না, প্রতি মাসে মিত্রশক্তির কারখানায় যে পরিমাণ বিমান উৎপন্ন হয়, জাপানের কারখানায় হয় তাহার এক নগণ্য ভগ্নাংশ। মিত্রশক্তির এই বিশাল যন্ত্রশক্তির সম্মুখে জাপানের একাকী বেশী দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। তবে, রণচাতুর্য্যের দ্বারা এবং জাপানী সৈন্যের ধর্ম্মোন্মাদ মৃত্যু-ভয়হীনতার জন্য আরও কিছু দিন যুদ্ধ টানিয়া চলা হয়ত তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। গত আগষ্ট মাসে হঠাৎ ইহা অসম্ভব করিয়া যুদ্ধে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে প্রাচ্যে রুশিয়ার সামরিক সক্রিয়তা এবং এটম্ বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি।

রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

এটম্ বোমা সম্পর্কে অত্যধিক হৈ চৈ করিয়া রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার গুরুত্ব হ্রাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের দেশের দুই একজন গণ্ডমূর্খ অশিষ্ট সাংবাদিক এইরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, এটম্ বোমার আঘাতে জাপানের পরাজয় আসন্ন বুঝিয়া প্রাচ্য অঞ্চলে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুশিয়া ব্যস্ত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই যেন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন যে, এটম্ বোমার কথা জানিবার বহু পূর্ব্বে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য রুশিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল; মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর তিন মাসের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে

রুশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়া মঃ ষ্ট্যালিন ইয়াল্টায় কথা দিয়াছিলেন।

এটম্ বোমার গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছি না। তবে, উহা জাপানের পরাজয়ের অন্যতম আশু কারণ—একমাত্র কারণ নয়। জাপান ইচ্ছা করিলে মিত্রশক্তিকে এটম্ বোমার ব্যবহারে কতকটা সংযত হইতে বাধ্য করিতে পারিত। জাপান ঘোষণা করিয়াছিল যে, এই বোমার ব্যবহার আন্তর্জ্জাতিক রণনীতির বিরোধী। ইহার পরই সে বলিতে পারিত—মিত্রপক্ষ যদি উহা ব্যবহারে সংযত না হন, তাহা হইলে সে-ও আন্তর্জ্জাতিক রণনীতি লঙ্ঘন করিয়া শ্রমশিল্প কেন্দ্রগুলিতে মার্কিন যুদ্ধ-বন্দীদিগকে রাখিয়া দিবে। তখন এটম্ বোমার আঘাতে সহস্র সহস্র মার্কিন সৈন্যের জীবন-নাশের আশঙ্কায় মিত্রশক্তি কতকটা সংযত হইতে বাধ্য হইতেন। বস্তুতঃ মিত্রশক্তি কেবল এই বোমা দিয়া জাপানকে নতজানু করিবার আশা পোষণ করেন নাই। পোটস্‌ড্যাম্ হইতে যখন এটম্ বোমা ব্যবহারের (অবশ্য নাম গোপন রাখিয়া) হুমকী দেওয়া হয়, তখনও ট্রুম্যান ও চার্চ্চিল প্রাচ্যের যুদ্ধে রুশিয়ার সমরশক্তি প্রয়োগের জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়া কম্যাণ্ডের অধিনায়ক মাউন্টব্যাটেন্ এটম্ বোমার ভয়ে জাপান আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া বিশ্বাসই করেন নাই।

উত্তর চীনে জাপানের সমরায়োজনের কথা জানা না থাকার জন্য রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার গুরুত্ব বুঝিতে অসুবিধা হয়। উত্তর চীনে জাপানের ৪০ ডিভিসন উৎকৃষ্ট সৈন্য সন্নিবিষ্ট ছিল। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানের অস্ত্রের কারখানাগুলি ছিল সম্পূর্ণ অটুট; এই অঞ্চলে মিত্রপক্ষের একটি বোমাও পড়ে নাই। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনে মিত্রপক্ষের যে সামরিক সাফল্য সম্পর্কে উচ্চ রবে ঢাক পিটানো হইয়াছিল, সে সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ—রুশিয়ার বিরুদ্ধে সাবধান হইবার জন্য জাপান তাহার সমরশক্তি উত্তর চীনে সন্নিবিষ্ট করিতেছিল।

সম্প্রতি খাস জাপান অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠে; ওকিনাওয়া অধিকার করিয়া মিত্রপক্ষ খাস জাপানে অভিযান চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ফিলিপাইনসের লুজন্ হাতে আসায় দক্ষিণ চীনে মিত্রপক্ষের অভিযানের সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হয়। মার্কিন বিমানের প্রচণ্ড আঘাতে খাস জাপানের শ্রমশিল্প প্রায় পঙ্গু হইয়াছিল; বহির্জ্জগতের সহিত খাস জাপানের সংযোগ প্রায় ছিল না।

কিন্তু ইহাও সত্য যে, উত্তর চীনে জাপানের একটা বিশাল সমরশক্তি অটুট ছিল। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার অস্ত্রের কারখানা এবং এই সেনা-বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া জাপান এশিয়াখণ্ডে বহুদিন যুদ্ধ চালাইতে পারিত। এ কথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, শেষ মুহূর্ত্তে জাপানের সম্রাট ও জাপ গভর্ণমেণ্টকে চীনে স্থানান্তরিত করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার পরিকল্পনা জাপানের ছিল। সোভিয়েট রুশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাপানের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছে; ১০ দিনের মধ্যে উত্তর চীনের বিশাল সমরায়োজন সে চূর্ণ করিয়াছে। বস্তুতঃ জাপানের সমর-শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার আঘাতে; জাপানের সামরিক পরাজয় ঘটাইয়াছে রুশিয়ার লাল পতাকা-বাহিনী। এটম্ বোমার আতঙ্ক সামরিক পরাজয় নয়।

প্রাচ্য অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার রাজনৈতিক গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধোত্তর রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলিবার পূর্ণ অধিকার সে এখন লাভ করিল। প্রাচ্য অঞ্চল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ক্ষেত্র; এই অঞ্চলের রাজনীতি সম্পর্কে শোষণ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়ার কথার মূল্য অত্যন্ত অধিক। প্রাচ্যের শ্রমশিল্পে অনুন্নত ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির সহিত সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধ খাদ্যখাদকের; এই সব রাজ্যের প্রকৃত উন্নতি উহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী। কাজেই উহারা কখনও এই সব রাজ্যের মিত্র হইতে পারে না। অনুন্নত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির একমাত্র মিত্র শোষণ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়া। এই মিত্র প্রাচ্যের যুদ্ধোত্তর রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বড় অংশ গ্রহণ করিবে।

এটম্ বোমা

এটম্ বোমার আঘাতে জাপানের হিরোসিমো ও নাগাসাকি নামক দুইটি সহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। দুই লাখ লোক হতাহত হইয়াছে; আশ্রয়হীন হইয়াছে তাহারও বেশী।

এটমের অসীম শক্তি কাজে পরিণত করিতে সমর্থ হওয়া যে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাফল্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্তি প্রথম ব্যবহৃত হইল নির্ব্বিচারে শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও পঙ্গুদিগকে হত্যার অমানুষিক কাজে!

জাপানে এটম্ বোমা ব্যবহারের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন মিত্রপক্ষের প্রায় প্রত্যেক রাজনীতিক; এমন কি রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের মুখ দিয়াও ইহার সমর্থক কথা বাহির করা হইয়াছে। এটম্ বোমার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি—ইহার ব্যবহারে যুদ্ধ সংক্ষেপ হইয়াছে; মিত্রপক্ষের সৈন্যক্ষয় কমিয়াছে। স্বপক্ষের সৈন্য ক্ষয় কমাইবার জন্য নির্ব্বিচারে বেসামরিক জনসাধারণকে হত্যা করা যদি সমর্থনযোগ্য হয়, তাহা হইলে মানবতার আদর্শ, যুদ্ধ পরিচালন সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক বিধান প্রভৃতি ভ্যাকামোর দরকার কি? বস্তুতঃ মিত্রপক্ষের রাজনীতিকদের এই ধরণের যুক্তিতে তাঁহাদের ভণ্ডামী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুক্তি হইতে সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সৈন্যক্ষয় কমাইবার জন্য বিষবাষ্পের ব্যবহারেও মিত্রশক্তির রাজনীতিকদের আপত্তি নাই। তাঁহারা উহা ব্যবহার করেন না এই কারণে যে, পাল্টা বিষবাষ্প ব্যবহার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা শত্রুপক্ষের আছে। এটম্ বোমা সম্পর্কে তাঁহাদের যুক্তির তাৎপর্য্য—"শত্রুর হাতে এই অস্ত্র নাই সুতরাং উহা ব্যবহার করিব; তাহার হাতে উহা থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক রণনীতির দোহাই দিতাম।"

এটম্ বোমা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিকরা খুব পাঁয়তাড়া কষিতেছেন। তাঁহাদের ভাবটা এই—ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ব্যবহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র তাঁহাদের হাতে; সুতরাং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করিবার প্রকৃত ক্ষমতা কেবল তাঁহাদেরই। এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাঁহারা প্রাচ্যে চীন এবং ইউরোপে ফ্রান্স, বেল্‌জিয়াম্ প্রভৃতি রাষ্ট্রকে

প্রভাবিত করিতে চাহিতেছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা যেন ইহাদিগকে বলিতে চান যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মিত্র-নির্ব্বাচনের জন্য আর সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে চাহিও না; এখন আমাদের শক্তির তুলনায় তাহার সামরিক শক্তি নগণ্য।

এই সম্পর্কে বলা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে এটম্ বোমাকে যদি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন করা না হয়, তাহা হইলেও উহা বেশী দিন বৃটেন্ ও আমেরিকার একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক কাহারও একচেটিয়া নয়; অদূর ভবিষ্যতে অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকরাও এটমের শক্তি কাজে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ প্রধান প্রধান দেশের বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয়ে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

সোভিয়েট-চীন চুক্তি

ত্রিশ বৎসরের জন্য চীন ও সোভিয়েট রুশিয়ার চুক্তি হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া যে প্রাচ্য অঞ্চলে কোনরূপ অন্যায় সুবিধা চাহে না, তাহা এই চুক্তিতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট রুশিয়া চুংকিং গভর্ণমেণ্টকে চীনের একমাত্র গভর্ণমেণ্ট বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। রুশিয়ার সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য কেবল চুংকিংএই পৌঁছিবে। ইহা ছাড়া, পূর্ব্ব চীন ও দক্ষিণ চীনের রেলপথে ৩০ বৎসরের জন্য রুশিয়া ও চীনের সম্মিলিত কর্তৃত্ব থাকিবে; তাহার পর উহা চীনের হইবে। চীনা গভর্ণমেণ্ট ডাইরেণকে স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষণা করিবেন। পোর্ট আর্থার ৩০ বৎসরের জন্য রুশিয়া ও চীনের সম্মিলিত পোতাশ্রয় থাকিবে।

এই চুক্তির সবচেয়ে বড় কথা—সোভিয়েট রুশিয়া চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশের অর্ব্বাচীনের দল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, চীনের কমুনিষ্টদের ক্রিয়া কলাপ যে সোভিয়েট রুশিয়া সমর্থন করে না, ইহা তাহারই প্রমাণ। আবার কোন কোন উর্ব্বর মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সোভিয়েট রুশিয়া চীনের কমুনিষ্টদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই—সোভিয়েট রুশিয়া বুঝিয়াছে যে, চীনের ব্যাপারে বাহিরের কোন শক্তি যদি হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে চুংকিং গভর্ণমেণ্টকে গণতান্ত্রিক দাবীগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার শক্তি কমুনিষ্টদের আছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা চিরদিন আভ্যন্তরীণ বিরোধে উস্কানি দিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া নিজে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে সরিয়া থাকিতে চাহিয়া প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদীদিগকে পরোক্ষে জানাইয়াছে—"তোমরাও সরিয়া থাক।" বস্তুতঃ বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সহযোগিতা ব্যতীত চীনে আধা-ফ্যাসিস্ত শাসন চালাইবার শক্তি চিয়াং ও তাঁহার কুয়োমিটাং দলের নাই। সোভিয়েট রুশিয়া এই সহযোগিতা বন্ধ করিতে চায়। মাঞ্চুরিয়া, ডাইরেণ, পোর্ট আর্থার প্রভৃতি সম্পর্কে উদার মনোভাব অবলম্বন করিয়া এবং সর্ব্বোপরি চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে সরিয়া থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সোভিয়েট রুশিয়া চীনের জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছে। এখন কুয়োমিণ্টাঙ্গের ধুনা সোভিয়েট বিরোধীরা চীনে আর পাত্তা পাইবে না।

জাপান আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইবার পর মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ কমুনিষ্ট সেনাপতি চু-তের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্যরা যেন জাপানীদের নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ না করে। চু-তে স্বভাবতঃ এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে সম্মত হন না। তাঁহার সহজ যুক্তি—যে সব সেনাবাহিনী শত্রুর সহিত লড়িয়াছে, শত্রুর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিবার অধিকার তাহাদের নিশ্চয়ই আছে। ইহার পরই মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ কমুনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুংকে চুংকিংএ আসিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে মাও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। পরে, চিয়াংএর আগ্রহাতিশয্যে তিনি দুই একজন পরামর্শদাতা সঙ্গে লইয়া চুংকিংএ আসিয়াছেন; সেখানে এখন দুই পক্ষের আলোচনা চলিতেছে।

কমুনিষ্টদের সহিত মীমাংসা করিবার জন্য চিয়াংএর এই আগ্রহের চারিটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, চিয়াং বুঝিয়াছেন যে কমুনিষ্টরা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক দাবানো আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, কমুনিষ্টদিগকে দাবাইবার জন্য বৈদেশিক শক্তির সাহায্য পাইবার কোন আশ্বাস হয়ত চিয়াং পান নাই। তৃতীয়তঃ, বিচক্ষণ রাজনীতিকরূপে চিয়াং হয়ত উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নানারূপ ষড়যন্ত্রের সহিত চীনকে লড়িতে হইবে। বৃটেন হংকং ফিরাইয়া দিতে মোটেই রাজী নয়; বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতারা শাসনক্ষমতা হাতে পাইবার পর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতি মোটেই ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন না। সাংহাইকে আবার আন্তর্জ্জাতিক অঞ্চলে পরিণত করিবার জন্য ধুয়া উঠিয়াছে। এই সব বৈদেশিক চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একতা যে একান্ত প্রয়োজন, ইহা চিয়াংএর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব। চতুর্থতঃ কমুনিষ্টরা যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি দাবী করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই চীনের জাগ্রত জনগণের দাবী। যুদ্ধের সময় একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় সে দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হইলেও শান্তির সময় তাহা যে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না, তাহা চিয়াং বুঝিয়া থাকিবেন।

বার্লিনের নিকটে পোট্‌স্‌ড্যামে ষ্ট্যালিন-ট্রুম্যান-এট্‌লির (চার্চ্চিলও প্রথম দিকে উপস্থিত ছিলেন) সম্মিলনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর সে সম্পর্কে নানাবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্প পঙ্গু করিয়া উহাকে কৃষি প্রধান দেশে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। পোট্‌স্‌ড্যাম্ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচার কার্য্যের ফলে এইরূপ ধারণার সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ নাৎসী আমলে যুদ্ধের জন্য জার্ম্মানীর শ্রমশিল্প শতকরা ৭০ ভাগ বেশী প্রসারিত হইয়াছিল। জার্ম্মান শ্রমশিল্পের সামরিক উদ্দেশ্যে প্রসারিত এই অংশ সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা পোট্‌স্‌ড্যামে হইয়াছে; জার্ম্মানীর নিজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্প সঙ্কুচিত করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। ৩১।৮।৪৫

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ঋণ ও ইজারা নীতির অবসানে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়া

সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধসংক্রান্ত সকল বিধি-ব্যবস্থার অবসান ঘটিতেছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই সামরিক বিভাগ সঙ্কুচিত করিয়া ও সমরসংক্রান্ত সাময়িক বিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া দেশের আর্থিক ভারসাম্য-রক্ষার নানাবিধ পরিকল্পনা তৈয়ারী হইতেছে। সঙ্গতিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত চার বৎসর যাবৎ ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী বহু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, ভোগ্যপণ্য বা খাদ্যসামগ্রী জোগাইয়া মিত্রপক্ষীয় যুধ্যমান দেশগুলিকে সাহায্য করিতেছিল, জাপানের সহিত যুদ্ধাবসানের এক সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও ইজারা নীতি বাতিল করিয়া এই পণ্যসরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার এই সংবাদে ব্রিটিশ সরকারের মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিপুল ব্যয় বহনে ব্রিটেন আসিয়া পৌঁছাইয়াছে রিক্ততার চরম স্তরে। অন্তর্দেশীয় আর্থিক অবস্থা তাহার এত শোচনীয় যে, যুদ্ধজয়ের বিরাট আনন্দ পর্য্যন্ত এখন তেমন ভাবে উপভোগ করা ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। ব্রিটিশ ট্রেজারীর ঘাড়ে চলতি নোট ও ঋণপত্রের বোঝা, ভারতের নিকট প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণ, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত ও মিত্রদেশগুলির নিকটও ব্রিটেনের অগাধ দেনা জমিয়া গিয়াছে। ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশগুলির নিকট ব্রিটেনের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ শত কোটি ডলার, অথবা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে বড় কথা, ব্রিটেন এই যুদ্ধের সময় আমেরিকার নিকট হইতে যে বিরাট পরিমাণ পণ্য ধারে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মূল্য পরিশোধ করা ব্রিটেনের পক্ষে এখন দীর্ঘকাল সম্ভব হইবে না। তবে একমাত্র ভরসার কথা, আমেরিকার নিকট হইতে ব্রিটেন ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী পণ্যাদি ধার করিয়াছে। ঋণ ও ইজারা নীতির সুবিধা হইতেছে এই যে, অবস্থায় না কুলাইলে এই দেনা শোধ করিবার বাধ্যবাধকতা নাই এবং পণ্যাদি গ্রহণের পরিবর্ত্তে নগদ মূল্য না দিয়া পণ্য দিয়াই দেনা শোধ করিতে হইবে। যুদ্ধের মধ্যে এই ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী ব্রিটেন আমেরিকা হইতে বহু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, বিমান প্রভৃতি ছাড়াও নানাপ্রকার ভোগ্যপণ্য এবং প্রচুর খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া সমগ্র বৃটিশ জাতির প্রাণ ধারণের সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী ব্রিটেনকে জোগান দিয়াছে মোট ৩১৯ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পণ্য। ইহার মধ্যে ৮০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য ছিল।

এই ঋণ ও ইজারা নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পশ্চাতে ব্রিটেনের আর্থিক অসঙ্গতির একটি করুণ ইতিহাস আছে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কখনই ভাল হয় নাই এবং নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ব্রিটেন গত ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিলে প্রথম প্রথম ব্রিটেন নগদ দামে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় পণ্যাদি ক্রয় করিতে থাকে, কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষ নাগাদ তাহার সমস্ত ডলার সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবার ফলে তাহার পক্ষে আমেরিকা হইতে মালপত্র আমদানী একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সময় জার্ম্মানীর উপর্য্যুপরি জয়লাভ দেখিয়া এবং প্রাচ্যে জাপানের ভাবগতিক সন্দেহ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের যুদ্ধজয় কামনা করিতে থাকে এবং ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রপতি রুজভেণ্ট ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ঋণ ও ইজারা নীতি নামক বিচিত্র নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রিটেনকে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে পরিশোধের সর্ত্তে ধারে পণ্যাদি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন। ব্রিটেনকে এইভাবে সাহায্য করার পিছনে আমেরিকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্দ্ধমান ফ্যাসিষ্টশক্তি ধ্বংস করা। পাছে ব্রিটেনে পণ্যরপ্তানীকে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃপক্ষের অকারণ বদান্যতা বলিয়া ভুল করে, এইজন্য মার্কিন সেনেটে ঋণ ও ইজারা বিল উত্থাপনের সময় সরকার পক্ষ হইতে সেকথা বলা হয়; কাজেকাজেই দেখা যাইতেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একান্ত নিজস্বার্থেই যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই ঋণ ও ইজারা নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, সুতরাং যুদ্ধশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির কার্য্যকারিতার শেষ হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকে না।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মার্কিন প্রেসিডেণ্টের এই সিদ্ধান্ত মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গত ২৮শে জুন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লিমেণ্ট এ্যাটলি এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ও বর্ত্তমান বিরোধী দলের দলপতি মিঃ চার্চ্চিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই ঘোষণার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রিটেনের বর্ত্তমান দুঃসময়ে ব্রিটিশ সরকারকে প্রস্তুত হইবার সময় পর্য্যন্ত না দিয়া যুক্তরাষ্ট্র এই যে পণ্যসরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল, ইহা কিছুতেই তাহার শ্রেষ্ঠ মিত্রের প্রতি কর্ত্তব্যহিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনকে এখন আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে বাহির হইতে শিল্পসংগঠনের উপযোগী কাঁচামাল আগেই আনিতে হইবে, কারণ শিল্পজীবী ব্রিটেন যদি যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে পারে, তবেই তাহার পক্ষে অন্তর্দেশীয় সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান নীতি বজায় রাখা সম্ভব। এই কাঁচামালের জন্য এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিতে যে নগদ মূল্যের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করা এখন ব্রিটেনের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় বিচলিত হইয়া ব্রিটিশ সরকার প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনেস, ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হালিফ্যাক্স এবং অন্যান্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট

ট্রুম্যানকে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাইতে আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরেও ঋণ ও ইজারা নীতি চালু না থাকিলে ব্রিটেনের গৃহাদি নির্ম্মাণ ও পুনর্গঠন সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এদিকে তাঁহার সিদ্ধান্তের ফলে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার কার্য্যের সপক্ষে সুদৃঢ় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই বলিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হওয়ায় যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাতিল করিতে তিনি বাধ্য। যখন এই নীতি প্রবর্ত্তিত হয় তখন তিনি ছিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কিন্তু তখনই তিনি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, জাপানী যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবেন।

এইভাবে ঋণ ও ইজারা নীতি সংশোধিত না হইলে ব্রিটিশ সরকার যে চূড়ান্ত আর্থিক অসুবিধায় পড়িবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ বিলাতী পত্রিকা 'ইকনমিষ্ট' মার্কিন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, এই ঋণ ইজারা ব্যবস্থার অবসানের চেয়ে আমেরিকা মিত্র দেশগুলির এত বেশী ক্ষতি আর কিছুতেই করিতে পারিত না। ব্রিটেনের টোরী সরকার আমেরিকার নিকট হইতে বৎসরে প্রায় ৮শত ডলার মূল্যের পণ্যাদি ঋণস্বরূপ লাভ করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইতে না হইতেই যুক্তরাষ্ট্র এইরূপ ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ব্রিটেনে শ্রমিকদলকে কঠোর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শ্রমিক দলের মুখপত্র 'ডেইলী হেরল্ড' সম্ভবতঃ অত্যধিক দুঃখে হতাশাগ্রস্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, লর্ড কিনেস প্রমুখ ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ যদি শেষ পর্য্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পুনর্বিবেচনায় সম্মত করাইতে না পারেন, তাহা হইলে ব্রিটেন বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে পাল্টা আঘাত হানিবে। মার্কিন সেনেটের ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য মিঃ ইমানুয়েল সেলার ইতিমধ্যেই অভিযোগ করিয়াছেন যে, ব্রিটেন নাকি ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে মার্কিন বাণিজ্য ব্যাহত করিবার জন্য অপচেষ্টা শুরু করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্র যে ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমরপণ্য উৎপাদন হইতে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় না দিয়াই ব্রিটেনকে এরূপ আর্থিক অসুবিধায় ফেলিল—তাহার পশ্চাতে অবশ্যই আমেরিকার বহির্বাণিজ্যের প্রশ্ন জড়ানো আছে। যুক্তরাষ্ট্রে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিতে হইলেও আমেরিকাকে তাহার বর্ত্তমান রপ্তানী বাণিজ্য অন্ততঃ দ্বিগুণ করিতেই হইবে, অথচ তাহার পণ্য বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র ভারতবর্ষ প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি। এই সকল দেশে বাণিজ্য চালাইবার আপেক্ষিক সুবিধা লাভের বিনিময়ে আমেরিকা যদি ঋণ ও ইজারা নীতির অনুরূপ কোন নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রিটেনকে ধারে পণ্য জোগাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। অবশ্য এখনও আমেরিকা তাহার মনোভাব প্রকাশ করে নাই, বরং স্পষ্টভাবেই বলিতেছে যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর ঋণ ও ইজারা নীতি চালু থাকিতে পারে না। মার্কিন বৈদেশিক অর্থনীতি বিভাগের পরিচালক মিঃ লিও ক্রাউলি বলিয়াছেন যে, আমেরিকা এখনও ব্রিটেনে মাল ও মজুর পাঠাইতে প্রস্তুত তবে আগে যেরূপ ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী ইহা করা হইত এখন তাহা হইবে না, এখন নগদ অথবা ধারে মাল লইতে হইবে।" কিন্তু ব্রিটেনের বর্ত্তমান শোচনীয় আর্থিক অবস্থায় মিঃ ক্রাউলির কথামত মার্কিন পণ্য গ্রহণ করা অসম্ভব। পণ্যের পরিবর্ত্তে সুবিধামত পণ্য দিয়া দেনা শোধ করা ব্রিটেনের পক্ষে হয়তো সম্ভব, কিন্তু নগদ দাম দিয়া অথবা পরে নগদ দাম দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্রিটেন এখন আর মার্কিন পণ্য গ্রহণ করিতে পারে না। মোটের উপর অবস্থা এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার আমেরিকাকে হাতে রাখিবার মত কোন ব্যবস্থা এখনই স্থির করিয়া না ফেলিলে ব্রিটেনের পুনর্গঠন যেমন অসম্ভব হইয়া উঠিবে তেমনি অনিশ্চিত হইয়া উঠিবে তাহাদের স্থায়িত্ব। শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করিতে টোরি দলের সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করিয়া ব্রিটিশ সরকারকে অকস্মাৎ বিপদে ফেলিয়াছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার অবসানের নির্দ্দেশ প্রদানের কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যাও করিতেছেন।

মোট কথা ঋণ ও ইজারা নীতি বাতিলের প্রতিক্রিয়া ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ কি ভাবে বিপন্ন করে, তাহা অবশ্যই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সরকারী প্রেসনোটেই যখন শস্য কম হইবার সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছে তখনও কি মাননীয় গভর্ণর মিঃ কেসি গত ৪ঠা জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতায় বাংলাকে উদ্বৃত্ত প্রদেশ ঘোষণা সংশোধিত করিবেন না? চরম দুর্ভাগ্যের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া বদান্যতার এ মোহ কর্ত্তৃপক্ষ আর কতদিন আঁকড়াইয়া থাকিবেন?

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত অসংখ্য লোকের কর্ম্মসংস্থান অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু সামরিক বিভাগে নয়, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ প্রভৃতিতেও বহু লোক নিয়োজিত আছে; অতঃপর ভারতসরকার যে ইহাদের অধিকাংশকেই ছাড়িয়া দিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া যোগানদার ও ব্যবসাদার প্রভৃতি যাহারা এই যুদ্ধের সুযোগে করিয়া খাইতেছিল তাহাদের ভবিষ্যতও হইয়া পড়িয়াছে অনিশ্চিত। এইভাবে অতি শীঘ্রই ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের কর্ম্মহীন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং এই ৬০ লক্ষ লোকের বেকার হইবার ফলে একজন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপর গড়ে নির্ভরশীলের সংখ্যা পাঁচজন হইলে অন্ততঃ দেড়কোটি ভারতবাসীর আর্থিক স্বার্থ শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

তবু যদি ভারতবর্ষে যুদ্ধকালে শিল্পাদি প্রসারিত হইত, তাহা হইলেও এই সকল বেকার ব্যক্তির অনেকেই সেই সব সম্প্রসারিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থান লাভ করিতে পারিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী ঔদাসীন্যে এই

ব্যবস্থাও সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধের আমলে অধিকাংশ কাজকর্ম সহর অঞ্চলে হওয়ায় অসংখ্য গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া সহরে ভিড় বাড়াইয়াছে, এখন সহরগুলিতে যে জনবাহুল্য দেখা দিয়াছে তাহা একান্তভাবে কৃত্রিম। যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে যাহারা বেকার হইবে তাহারা কতকটা নিরুপায় হইয়াই দিনকতক সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ক্ষতবিক্ষত চিত্তে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। তারপর সারা ভারত জুড়িয়া শুরু হইবে দুঃসহ মন্দাবাজার। সহরগুলির কর্ম্মচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া দেশের অন্তর্দেহে সেই সম্ভাব্য ক্ষয় চক্ষুগোচর না হইলেও ক্রমে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রাম বাঁচিবার জন্য চরম আকাঙ্খা সত্ত্বেও নিঃস্বতার রিক্তপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইবে এবং ফলে অবশেষে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর মৃত্যু ও অপমৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

অবশ্য এখনও যদি ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রসার হইত, তাহা হইলেও এই দুর্ব্বিপাক হইতে এ দেশকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে সরকার লজ্জাকর ঔদাসীন্য দেখাইয়া সহস্র সুযোগ সম্ভাবনা ব্যর্থ করিয়া দিলেন, যুদ্ধের পরেই যে তাঁহারা হঠাৎ কল্পতরু হইয়া আমাদের সমস্ত অভাব মিটাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিবেন, এ কথা মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। সম্প্রতি ভারত হইতে যে শিল্পপতির দল ভারতের শিল্পপ্রসারের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি এবং কুশলী শিল্পী সংগ্রহের চেষ্টায় সফরে গিয়াছিলেন, তাহারা নিষ্করুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহার পর আর যাই করা যাক, আশু শিল্পপ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের আকাশ-কুসুম কল্পনা করা আর শোভা পায় না। এ সময় আমাদের যেটুকু আশা আছে তাহা সরকারী করুণাবিন্দু ও বেসরকারী কয়েকজন শিল্পপতির উৎসাহের উপর নির্ভর করিতেছে। অথচ এই আশা পূর্ণ হইলেও তাহার ফল এত সুদূরপ্রসারী হইবে না যাহাতে আমাদের দেশজোড়া সমস্যা মিটিতে পারে। তবে এই অপ্রচুর উৎসাহ উদ্যমের ব্যবহার যদি এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর দিয়া হয়, তাহা হইলেও অবশ্য দেশের অনেক কল্যাণ হইতে পারে।

গ্রামে যখন লোক বাস করে অনেক বেশী এবং গ্রামের সংখ্যা যখন সহরের বহুগুণ, তখন ভারতের গ্রামগুলিকে শিল্পের দিক হইতে উন্নতিশীল করিয়া তুলিতে পারিলে বিভিন্ন স্থানীয় অভাব মিটিয়া যাইবার ফলে ক্রমে ক্রমে সারা দেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সরকারী সাহায্য বা বেসরকারী উদ্যমকে এই দিকে টানিতে হইলে প্রয়োজন গ্রামগুলির সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিষ্কার হিসাব-নিকাশ এবং উপযুক্ত কারিগরী ও সঙ্ঘবদ্ধতা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের দ্বারা গ্রামবাসীকে এই সংস্কারের যোগ্য করিয়া তোলা। সম্প্রতি 'গ্রামাঞ্চলে শিল্পীকরণ' বা village Industrialisation সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন' কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার এম বিশ্বেশ্বরাও এই পুস্তিকার লেখক। এই পুস্তিকায় লেখক পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলিকে কয়েকটি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিতে না পারিলে এবং এই সংঙ্ঘবদ্ধ গ্রামগুলির সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হইলে গ্রামাঞ্চলের সত্যকার সংস্কার কিছুতেই হইতে পারে না। এইভাবে শিল্পীকরণের দ্বারা গ্রামাঞ্চলের উন্নতি-সাধিত হইবে বলিয়া কৃষি, যানবাহন প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের প্রাণস্বরূপ ব্যবস্থাগুলিতে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইবে না, একথা অবশ্যই পুস্তিকাখানিতে বলা হয় নাই। স্যার বিশ্বেশ্বরাওয়ের বক্তব্য হইতেছে এই যে, সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে সারা ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণকর কোন কাজ করিতে হইলে এত বেশী টাকার প্রয়োজন যাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বর্ত্তমানে জোগান সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে যদি গ্রামাঞ্চলসমূহ স্বচ্ছল হয়, তবেই এই ব্যবস্থা সম্ভব করিবার মত টাকা এই দেশে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

স্যার বিশ্বেশ্বরাও এই পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচনা করিয়াছেন যাহা কার্য্যকরী হইলে গ্রামসমূহের সর্ব্বপ্রকার সংখ্যাতত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। প্রধানতঃ তিনি পরিকল্পনাটির দুইটি প্রাথমিক স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি চাহিয়াছেন গড়ে ১৫ হাজার গ্রামবাসী সমন্বিত ১০টি গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রামসঙ্ঘ গঠন করিতে, এই সঙ্ঘগুলির অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের সকলপ্রকার উন্নতিসাধন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তিনি এই সঙ্ঘগুলির প্রত্যেকটি পরিকল্পনার জন্য গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক গড়ে ১২ জন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার কথা বলিয়াছেন। এই সদস্যগণ গ্রামের সুযোগ সুবিধা, গ্রামবাসীদের আর্থিক সঙ্গতি, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়, গ্রামসমূহের সাধারণ ও কারীগরী শিক্ষার সকল ব্যবস্থা করিবেন। তা ছাড়া তাঁহারা প্রতি বৎসর গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে আরও সংখ্যাতত্ত্বের সকল সংবাদ এমনভাবে সরবরাহ করিবেন যাহাতে নির্ভুলভাবে এই দেশের মাথাপিছু আয় নির্দ্ধারণ করা যায়। পরিকল্পনাকার আশা করেন যে, এই সকল সদস্য এমনভাবে দেখাশুনা করিবেন যাহাতে মাত্র ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে গ্রামগুলির কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন অন্ততঃ দ্বিগুণ হইয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া তাঁহারা এমন সব ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে অন্ততঃ দুই বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রামগুলিতে সঞ্চিত থাকে। মোটের উপর স্যার বিশ্বেশ্বরায়া এই কমিটিগুলিকে যে ভাবে কাজ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা প্রতিপালিত হইলে দেশের জননেতাগণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষিত হইবে এবং তাহারা সজাগ হইয়া গ্রামগুলির উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ দিলে গ্রামসমূহের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের চেহারা ফিরিয়া যাইবে। ২৯।৮।৪৫



সাময়িকী

সুভাষচন্দ্র বসু—

২৩শে আগষ্ট লণ্ডন হইতে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাইবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ১৮ই জাপানের হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। এই সংবাদ ভারতে আসার পর দেশের সর্ব্বত্র শোকসভা হইতেছে ও দেশের নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও দেশ-সেবার কথা বর্ণনা করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের কি ছিলেন ও কে ছিলেন, তাহা আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। যদি কোন দিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, সে দিন ভারতবাসী সুভাষ-চন্দ্রের মত একজন নির্ভীক, অক্লান্তকর্ম্মী দেশপ্রেমিকের কথা আলোচনার সুযোগ লাভ করিবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার লোক পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের এই মৃত্যু সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না—ভারতের অধিকাংশ লোক—পূর্ব্ববারে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ যে ভাবে মিথ্যা বলিয়া রটিত হইয়াছিল—এবারও তাহাই হইবে বলিয়া মনে করে। সুভাষচন্দ্রকে দেশসেবার ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য শুধু বৃটীশ শাসকদের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই, দেশবাসীর দ্বারাও তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইয়াছিল। আজ সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া আমরা বেদনা বোধ করিতেছি। অধিকাংশ দেশবাসীর সহিত একমত হইয়া আমরাও প্রার্থনা করি, সুভাষচন্দ্রের এই মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হউক এবং সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার ২৫ বৎসরের সাধনার ফল স্বাধীন ভারতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হউন। সুভাষচন্দ্রের জীবনী ও গুণাবলী আলোচনার সময় এখনও আসে নাই—ভারতবাসী শত শত বৎসর ধরিয়া তাঁহার মত একজন দেশ-সেবকের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী—

গত ২২শে আগষ্ট মুরীতে এক জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু শত্রুদলের সহিত ধৃত ভারতীয়গণের প্রতি সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মদেশ ও মালয়-প্রবাসী বহু ভারতীয় স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। তাহা নানা কারণে বিপথে পরিচালিত হইয়াছিল। অন্যায় পথে পরিচালিত হইলেও তাহারা বীর সৈনিক। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় তাহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। বৃটীশ সরকার যদি শাস্তির দ্বারা তাহাদের জীবননাশের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা হইবে। যবনিকার অন্তরালে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই অজ্ঞ।" পণ্ডিতজীর এই কথা তাঁহার দেশবাসী সকলেই সমর্থন করে। জাতীয় বাহিনী ধৃত হওয়ার পর তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেশবাসী সকলকে তাহা জানানো সরকারের কর্ত্তব্য।

দামোদর পরিকল্পনা—

দামোদর প্রভৃতি কয়েকটি নদীর বন্যায় বাঙ্গালা ও বিহারের বহু জেলা প্রায় প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সে বিষয়ে ডক্টর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বহু বিশেষজ্ঞকে লইয়া এক জনহিতকর পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। সে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে সাক্ষাৎভাবে ৫০ লক্ষ লোক ও পরোক্ষভাবে আরও বহু লোক উপকৃত হইবে। সে বিষয়ে গত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় এক আলোচনা সভা হইয়াছিল। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ডক্টর বি-আর-আম্বেদকর সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালা ও বিহার গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা তথায় উপস্থিত হইয়া সত্বর ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে

পরিণত করার কথা বলিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশ বহু বিষয়ে লাভবান হইবে।

৯৩ ধারার অবসান দাবী—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১২০ জন সদস্য একযোগে ভারতসচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্সকে এক তার করিয়া বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার অবসান দাবী করিয়াছেন। ঐ তারের নকল বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটিলী, মিঃ আর্থার গ্রীণউড, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স, মিঃ রেজিনাল্ড সোরেন সেন, অধ্যাপক ল্যাস্কি ও মিঃ বিভানের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের মোট ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন বর্ত্তমানে মৃত ও ৯ জন কারারুদ্ধ, একজন স্পীকার পদে প্রতিষ্ঠিত। বাকী ২৩৭ জনের মধ্যে ১২০ জনকে অবশ্যই সংখ্যাধিক বলা যায়। কারারুদ্ধ ৯ জন মুক্তিলাভ করিলে দলের সদস্য সংখ্যা ১২৯ জন হইবে। ২৫ জন শ্বেতাঙ্গও সকল সময়ে সংখ্যাধিক দলে থাকেন। কাজেই এখনও কেন বাঙ্গালা দেশে বেআইনি ও অন্যায়ভাবে গভর্ণর ৯৩ ধারা জারি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইবেন।

বড়লাটের বিলাত যাত্রা—

বিলাতের মন্ত্রিসভার আহ্বানে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল গত ২৪শে আগষ্ট পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে শাসন পরিষদের সম্পাদক রাও বাহাদুর ভি, পি, মেনন গিয়াছেন। তাঁহাকে দুই সপ্তাহকাল লণ্ডনে থাকিতে হইবে। বিলাতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সমস্যার সমাধান কি ভাবে করিতে চাহেন তাহা লর্ড ওয়াভেলের প্রত্যাগমনের পর বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে অধিক আশারও যেমন কারণ নাই, নৈরাশ্যেরও সম্ভাবনা নাই। লর্ড ওয়াভেলের এ বিষয়ে আন্তরিকতায় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতির বিশ্বাস আছে। কাজেই আমরা ভারতীয় সমস্যার সমাধানের—তাহা সকলের সন্তোষজনক হওয়া সম্ভব নহে—প্রত্যাশা করি।

সুদান-ইরিত্রিয়া যুদ্ধ—

১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে ১৯৪১ সালের ২৭শে নভেম্বর পর্য্যন্ত সুদান-ইরিত্রিয়া অঞ্চলে ইটালীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহা পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই যুদ্ধে নিহত সৈন্যের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তথায় ৪৯৮৪ জন ভারতীয়, ১৫৮২ জন বৃটীশ ও ৬৯৫ জন সুদান সৈন্য নিহত হইয়াছে। এই জীবন দানের পরিবর্ত্তে ভারতীয়গণ ঐ অঞ্চলে কি অধিক কিছু সুখ-সুবিধা লাভ করিয়াছে?

চাউল রপ্তানী—

সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে সা ওয়ালেস কোম্পানীর জাহাজে করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে ৩৮১১০১ টাকা মূলের ১৯৯৯ টন ভাঙ্গা চাউল এবং ২৪৪৯৯৯৪ টাকা মূল্যে ৬ হাজার টন সিদ্ধ চাউল বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের অভিজ্ঞতার কথা আমরা এখনও বিস্মৃত হই নাই। বর্ত্তমান বৎসরেও বাঙ্গালার কোথাও ভাল ধান হইবে না—কাজেই এইভাবে চাউল রপ্তানীর ব্যবস্থায় বাঙ্গালা দেশকে যে আবার বিপন্ন হইতে হইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি

বেকার সমস্যা—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সকল বিভাগীয় কর্ত্তাদের নিকট ইস্তাহার প্রেরণ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, যুদ্ধের কাজের জন্য যে সকল কর্ম্মচারীকে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাদের সকলকে যেন সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিনে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। যে সকল লোকের কাজ বিশেষ প্রয়োজনীয়, শুধু তাহাদের চাকরীই আরও কিছু দিন চলিবে। এইভাবে যাহারা বেকার হইবে, তাহাদের জন্য কি কোন ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না?

যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্য—

বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙ্গালা দেশ হইতে মোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার যুবক সাধারণ সৈন্য, নৌসেনা ও বিমান সেনারূপে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। ভারতের মোট সৈন্যসংখ্যার ইহা শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গালা হইতে যুবকগণ যাইয়া বিমান সেনা বিভাগের শতকরা ১০০টি কাজই গ্রহণ করিয়াছিল—কিন্তু পরে তাহা কমিয়া যায়। সৈন্যবিভাগে প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২ জন নির্ব্বাচন বোর্ডের পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। এ দেশে শিক্ষার অভাব ও যুদ্ধ কার্য্যের জন্য বাল্যকাল হইতে প্রস্তুতির অভাবই এই অসাফল্যের প্রধান কারণ।

যুদ্ধের বিবরণের মূল্য—

১৯১৪ সালের আরব্ধ যুদ্ধের পর তাহার বিবরণ লিখিয়া তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড লয়াড জর্জ্জ প্রকাশকের নিকট ৭০ হাজার পাউণ্ড মূল্য পাইয়াছিলেন। এবার একজন মার্কিন প্রকাশক মিঃ চার্চ্চিলের লিখিত যুদ্ধের বিবরণের জন্য আড়াই লক্ষ পাউণ্ড মূল্য দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আরও অধিক অর্থপ্রাপ্তির আশায় মিঃ চার্চ্চিল এখন পর্য্যন্ত কাহারও সহিত শেষ কথা বলেন নাই। সংবাদটি এ দেশের লোককে অবশ্যই চমৎকৃত করিবে।

নির্ব্বাচন যেন বিলম্বে হয়—

গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির সাধারণ নির্ব্বাচনের আয়োজন আরম্ভ করায় সে সম্বন্ধে গত ২১শে আগষ্ট শ্রীনগর হইতে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ বড়লাটকে এক তার করিয়া জানাইয়াছেন—সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে এখনও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নাই এবং সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে এখনও মুক্তি দান করা হয় নাই। এ অবস্থায় নির্ব্বাচনের আয়োজন আরম্ভ করায় কংগ্রেসের পক্ষে নির্ব্বাচন পরিচালন করা বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে। গভর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করিতেছেন বটে, কিন্তু বহু বিনাবিচারে আটক নিরাপত্তা-বন্দীকে এখনও মুক্তি দানের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কবে যে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন কিনা, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক দলকে নির্ব্বাচনে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখাই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

দিল্লীতে হিন্দুমহাসভা—

হিন্দুমহাসভার নিখিল ভারত কমিটীর অধিবেশন গত ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার অবসান দাবী করা হয়, 'সত্যার্থ-প্রকাশ' বন্ধের বিরুদ্ধে আর্য্য সমাজ কোন আন্দোলন করিলে তাহাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যুদ্ধের পর দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইবে ভাবিয়া তাহাদের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সেপ্টেম্বর মাসেই হিন্দুমহাসভার পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করার আশ্বাস দিয়াছেন।

কণ্ট্রোল এখন থাকিবে—

যুদ্ধের সময় এ দেশে সকল জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোল করিয়া দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। তাহাতে ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা এখন আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। সে বিষয়ে আমাদের যে বহু নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র এখনও লোক বুঝিয়া থাকে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর কণ্ট্রোল প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইত বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার-জেনারেল শ্রীযুক্ত সি সি দেশাই জানাইয়াছেন—চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইলে ক্রমে কণ্ট্রোলপ্রথা তুলিয়া দিয়া সাধারণ অবস্থা ফিরাইয়া আনা হইবে। কিন্তু কবে তাহা করা হইবে তাহা বলা হয় নাই। কণ্ট্রোল প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে একদল লোক লাভবান হইয়াছে—তাহারা উহা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে। কাজেই এ বিষয়ে বারবার গভর্ণমেণ্টকে অবহিত করাও প্রয়োজন।

কুচবিহার কলেজে হাঙ্গামা—

গত ২১শে আগষ্ট সকালে কুচবিহার কলেজের এলাকার মধ্যে পথের উপর দুইখানি সাইকেলে সংঘর্ষ হয়—একখানিতে ২ জন সৈনিক ও অপরখানিতে একজন সহরবাসী যাইতেছিলেন। সৈনিকদ্বয় সহরবাসীটিকে প্রহার করিলে কলেজের ছাত্রগণ তথায় যাইয়া উপস্থিত হয় ও সৈনিকদের সাইকেলখানি কাড়িয়া লইয়া পুলিসে জমা দিবার ব্যবস্থা করে। তাহার পর সৈনিকদ্বয় চলিয়া যায় ও একদল সৈনিক সঙ্গে আনিয়া ছাত্রদের উপর মারপিট আরম্ভ করে। তাহার ফলে ৪৫ জন ছাত্র ও ২ ছাত্রী সাংঘাতিক আহত হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরিত হয়। প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপক আহত হইয়াছেন। গবেষণাগারের বহু আসবাবপত্র নষ্ট করা হইয়াছে। সৈন্যগণ কলেজ গৃহ, স্কুল গৃহ ও ছাত্রাবাস সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়া শুধু মারপিট করে নাই, জিনিষপত্র তচনচ করিয়াছে। ঘটনাটি এমনই মর্ম্মন্তুদ যে এ বিষয়ে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সভা হইতেছে এবং ছাত্রগণ একদিন হরতাল করিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপরাধীদের শাস্তির বিধান অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ভারত-রক্ষা-আইন—

যুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় ভারত রক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। *এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কাজেই তাহা আর থাকা উচিত নহে।* আইনেও আছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণার পর ঐ আইন আর ৬ মাসের অধিক বলবৎ রাখা চলিবে না। কিন্তু দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আরও এক বৎসর পরে গভর্ণমেণ্ট স্বাভাবিক অবস্থা প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ ঘোষণা করিবেন—কাজেই ঐ আইন আরও ১৮ মাসকাল থাকিবে। কিন্তু ঐ আইনের বিধিনিষেধগুলি ততদিন বজায় রাখিয়া আমাদের সাধারণ জীবনযাপনে বাধা দান করা হইবে কি ?

কলিকাতা এলাকায় কাপড় সরবরাহ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতা এলাকায় কাপড় সরবরাহ আরম্ভ হইবে। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে খাদ্য-রেশনের দোকান হইতে সে জন্য কুপন বিলি করা হইবে। শেষ পর্য্যন্ত পূজার পূর্ব্বে সকলেই কাপড় পাইবেন কি না তাহা জানা যায় নাই। পূজা ও ঈদ বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব—তাহাতে যদি বাঙ্গালী নূতন কাপড় পরিতে না পায়, তবে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ হইবে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে সে কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

দামোদর পরিকল্পনার ব্যয়—

দামোদর নদের বন্যা নিবারণ করিয়া ঐ জল নানাভাবে জনহিতকর উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতায় গভর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ও বিহার গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইবেন।

বাঙ্গালার দুর্গতি—

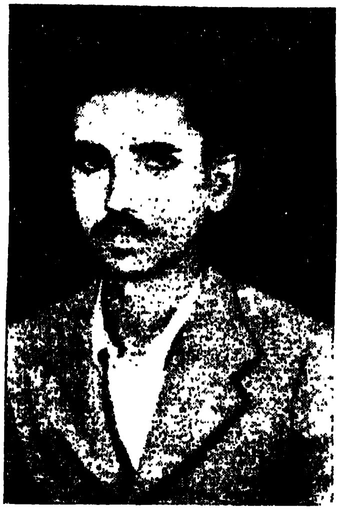
এবার বন্যায় বাঙ্গালা দেশের ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়াছে। ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার অধিকাংশ স্থানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় অতি বৃষ্টির ফলে শস্য নষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি জেলায় বৃষ্টির অভাবে ধানের গাছ মাঠে শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা নাই। লোক ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের পর এখনও নিজেদের শরীর ঠিক করিতে পারে নাই—তাহার উপর এই ব্যাপক বন্যা যে সকল লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করিল, তাহাদের রক্ষা করা সুকঠিন হইবে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট চাউল অধিক আছে বলিয়া বিদেশে চাউল পাঠাইয়া দিতেছেন, আর বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার বহু স্থানের বাজারে এখনই দারুণ ভাবে চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ লোকই বর্ত্তমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, কাজেই এই বিপন্নদিগকে কে সাহায্য দান করিবে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালায় শতকরা ৩০ ভাগ ধানও উৎপন্ন হইবে না এবং তাহার ফলে শীঘ্রই আবার এ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অবহিত হইয়া আবশ্যক ব্যবস্থায় মন দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। নচেৎ সরকারী অব্যবস্থার ফলে ১৩৫০ সালে আমাদের যে অবস্থা হইয়াছিল, আবার তাহারই পুনরাভিনয় হইবে।

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসি—

মুঙ্গের জেলার পিপরা গ্রাম নিবাসী মহেন্দ্র চৌধুরী ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ৭ই আগষ্ট ভোরে ভাগলপুরে তাঁহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ফাঁসি স্থগিত রাখিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সকল রাজনীতিক নেতা সম্রাট হইতে বড়লাট পর্য্যন্ত সকলকে বার বার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বংশীবিলাস মুখোপাধ্যায়—

বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুরের নিকটস্থ নডিয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত দয়াময় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান বংশীবিলাস মুখোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি মেডিসিন



শ্রীবংশীবিলাস মুখোপাধ্যায়

ও গাইনোকলজিতে প্রথম হন ও সর্ব্বাধিক মোট-নম্বর পান। গত কনভোকেসনে সে জন্য তিনি ২টি স্বর্ণপদক ও ৫টি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। কারমাইকেল কলেজ হইতে অস্ত্রোপচার বিদ্যায় প্রথম হওয়ায় তিনি আরও একটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক পাইবেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ সাফল্যমণ্ডিত জীবন কামনা করি।

৯৩ ধারা স্থায়ী করার ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার গভর্ণর গত ১৮ই আগষ্ট হইতে বাঙ্গালা দেশে ৯৩ ধারার শাসন স্থায়ী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ৫ জন সিভিলিয়ান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর বিভিন্ন বিভাগের শাসন ভার প্রদান করিয়াছেন—(১) মিঃ এইচ-এস-ই-ষ্টিভেন্স (২) মিঃ এ-ডি-সি-উইলিয়ম্স (৩) মিঃ এজ-আর- থাকাস (৪) মিঃ ও-এম-মার্টিন ও (৫) মিঃ আর-এল-ওয়াকার। গত সাড়ে ৪ মাস কাল গভর্ণর পরামর্শদাতা নিযুক্ত না করিয়া নিজেই শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ভারতীয়গণের প্রতি শাসন কর্ত্তাদের মনোভাব কিরূপ তাহা এই ৫ জন সিভিলিয়ান নির্ব্বাচন হইতেও বুঝা যায়। একজনও দেশীয় সিভিলিয়ানকে বিশ্বাস করিয়া পরামর্শদাতার পদ দেওয়া হয় নাই।

শরৎচন্দ্রের মুক্তির দাবী—

রাজবন্দী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এখন বন্দীনিবাসে অসুস্থ হইয়া আছেন। তাঁহাকে মুক্তি দিবার দাবী করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সভাসমিতি হইতেছে এবং সকল স্থানের সকল দলের নেতারা আবেদন জানাইয়াছেন। গত ১৭ই আগষ্ট লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মিলনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই, সে জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর তাঁহার মুক্তির জন্য আন্দোলন করা উচিত।

অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায়চৌধুরী 'ঘোষ ট্রাভেলি' ফেলোসিপ' পাইয়া মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়াছিলেন; মিশরে তিনি প্রাচীনতম সংস্কৃতি কেন্দ্র আল-আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি মিশর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যসংস্কৃতির অধ্যাপক



শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

নিযুক্ত হন। তিনি আরব সংস্কৃতি গবেষণা উপলক্ষে প্যালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক-সীমান্ত ও উত্তর আরব ভ্রমণ করেন। তিনি সিরিয়ার মরুভূমি ও সুদানের প্রান্তদেশ পর্য্যটন করেন। তিনি তাঁহার

অভিজ্ঞতা লিখিতেছেন। তাহা আগামী মাস হইতে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ঘোষ—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী মিঃ এস-কে-ঘোষ এম-এ (ক্যাণ্টাব) সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের



শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

অতিরিক্ত সহকারী ডিরেকটার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে চাকরী জীবনে সাফল্য লাভে সমর্থ করিয়াছে দেখিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ সকলেই আনন্দিত হইবেন।

প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব—

মধ্য প্রদেশের অষ্টি ও চিমুর থানায় ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭ জনের উপর প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের ফাঁসি বন্ধ করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হয় এবং তাহার ফলে গত ১৫ই আগষ্ট বড়লাট তাঁহাদের প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা হওয়ায় দেশবাসীমাত্রই স্বস্তি বোধ করিবেন।

ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবার পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিম্নতম শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে সকল পরীক্ষায় বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি গত ২২ বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন।

দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডার—

উত্তর কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের নাম ও কার্য্য বর্ত্তমানে সর্ব্বজনবিদিত। গত দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে ভাণ্ডারের কর্ম্মীবৃন্দের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ১৮ই আগষ্ট ভাণ্ডারের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত উহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত প্রভৃতি ৪ জন সহ-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভাণ্ডারের পুরাতন বাটীর পার্শ্বের নূতন জমীতে নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ভাণ্ডার বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা নিবারণের ও চিকিৎসার জন্য যাহা করিতেছেন তাহা অনন্যসাধারণ বলা যায়। আমাদের বিশ্বাস, ভাণ্ডারের কার্য্যে সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হইবে না।

সুভাষচন্দ্রের গৃহ বিক্রয়—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর এলগিন রোডস্থ গৃহ বাঙ্গালা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ঐ গৃহ নীলামে বিক্রয় করিবার জন্য ২বার চেষ্টা হইয়াছে—ঐ গৃহে সুভাষচন্দ্রের ৩ ভ্রাতার যে অংশ আছে, তাহাও তাঁহারা বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু উভয় দিনই কোন ক্রেতা পাওয়া যায় নাই। এ সংবাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

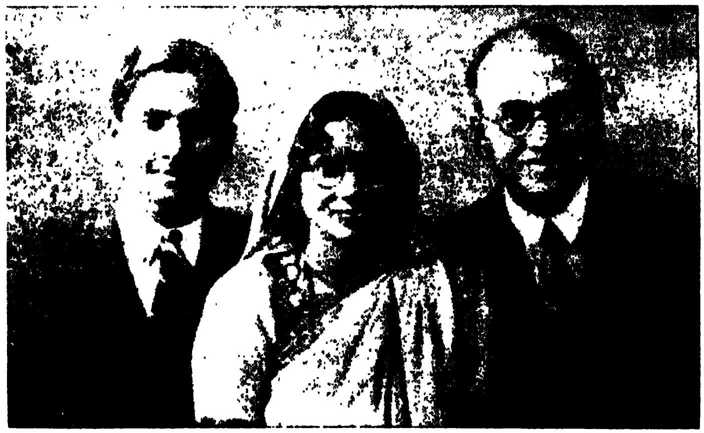
বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার বিবরণ—

বাঙ্গালার সম্মিলিত দলের নেতা মৌলবী এ-কে-ফজলল হক গত ১৮ই আগষ্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার দুর্দ্দশার বিষয়ে সকলকে অবগত করিয়াছেন। ভারত সরকারের খাদ্যসদস্য সার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে বাঙ্গালায় ২ কোটি মণ চাল জমিয়া আছে। মিঃ হক ঐ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এত অধিক চাউল থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট লোককে ১৫ টাকার কমে চাল দেন না। ইহার সার্থকতা বুঝা যায় না। বাঙ্গালার খাদ্য দ্রব্যের

মূল্য ৫ গুণ বাড়িয়াছে। বাজারে মাছের সের ৪ টাকা হইতে ৮ টাকা, মাংসের সের ৩ টাকা হইতে ৪ টাকা, ডিমের ডজন ২ টাকা, দুধ ত পাওয়াই যায় না, পাওয়া গেলে এক টাকায় এক সের। এই অবস্থায় লোক অর্দ্ধাহারে ও কদাহারে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কি ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন না?

দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের গৃহদান—

কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনিষ্টিটিউট অফ কালচারের নাম সর্ব্বজন পরিচিত। ঐ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গৃহ না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। সম্প্রতি কর্ণেল ডি-এন ভাদুড়ী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী তাঁহার একমাত্র স্বর্গত পুত্র দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতা ১১১নং রসা রোডের সুবৃহৎ চারিতল বাড়ীটি মিশনকে ইনিষ্টিটিউটের জন্য দান করিয়াছেন। বাড়ীটির মূল্য দেড়লক্ষ টাকারও অধিক। দেবেন্দ্রনাথ মাতার সহিত ইংলণ্ডে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করেন—লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি-এস্‌সি পাশ করার পর গবেষণাগারে হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক্তিতে তাঁহার জীবনান্ত হয়। ১৯৩৮ সালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই ইনিষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। ইনিষ্টিটিউটে বর্ত্তমানে সাপ্তাহিক বক্তৃতা, প্রাত্যহিক আলোচনা সভা এবং গ্রন্থাগার, কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও একটি চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। ১৯৪১ সালে স্বর্গত খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহ ইনিষ্টিটিউট পাইয়াছেন। পরে আরও অনেকে বহু গ্রন্থ দান করিয়াছেন। যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, আমরা তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।



পুত্র ৺দেবেন্দ্রনাথ ও পত্নী হিমাংশুবালাসহ কর্ণেল ডি-এন-ভাদুড়ী

চাউলের মূল্য হ্রাস—

গভর্ণমেণ্ট এখন রেশনের দোকান মারফত ৩ প্রকার চাউল বিক্রয় করিতেছেন—১নং চাউল ২৫ টাকা মণ, ২নং ১৫ টাকা ও ৩নং ১০ টাকা মণ। ২নং চাউলই অধিকাংশ লোক ব্যবহার করিয়া থাকে—৩নং চাউলকে অখাদ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি ২নং চাউলের দাম ১৬৷৹ মণের স্থলে ১৫ টাকা মণ করা হইয়াছে। বাড়িবার সময় ৩ টাকা মণের চাল ১৬৷৹ হইয়াছিল—আর কমিবার সময় সেরে মাত্র ২ পয়সা কমান হইল।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তর্পণ—

গত ৭ই আগষ্ট ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামে ও সহরে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসি ও তাঁহার পত্নী রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর গৃহে যাইয়া যে ঘরে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তথায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে অর্থ ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহাতে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার সে ভার গ্রহণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই মোট ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এবার রবীন্দ্র মৃত্যু-তিথিতে লোক শুধু বাচনিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন নাই, প্রায় প্রত্যেকে স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থ দান করিয়া নিজেদের ধন্য করিয়াছেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—

ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব আইন সদস্য, কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আইনজ্ঞ পণ্ডিত সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৭শে শ্রাবণ ৬৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার এলগিন রোডস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। সার নৃপেন্দ্রনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান সহজসাধ্য নহে। তিনি রাজনীতিতে মডারেট হইলেও সারাজীবন বহু সৎকার্য্যের সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই তাহার সদ্ব্যয় করিতেন। তাঁহার দানের কথা বহুলোকবিদিত। নৃপেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ প্যারীচরণ সরকার খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং পিতা নগেন্দ্রনাথ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে কাজ করিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ১৮৯৪ সালে তিনি ডবল অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন ও রসায়নশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া দ্বিতীয় হন। ১৮৯৭ সালে তিনি বি-এল পাশ করেন ও ১৮৯৬ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রথম জীবনে তিনি ৫ বৎসর ভাগলপুরে ওকালতী করিয়াছিলেন—পরে মুন্সেফের চাকরী লইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। ১৯০৫ সালে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বিলাত গমন করেন ও ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ৫০ গিনি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন—অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৮ সালে তিনি বাঙ্গালার এডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হন ও ১৯৩১ সালে সার উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁহাকে কে-সি-এস-আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি শেষ জীবনে 'হিন্দুস্থান কোয়াটার্লি' পত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিতেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার লেখা পাঠ করিত। ১৯৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি বাঙ্গালার হিন্দুদের প্রতিনিধিরূপে গমন করেন। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীতেও তিনি প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সাল হইতে ৫ বৎসরকাল তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন সদস্য ছিলেন। সে সময়ে তিনি 'কোম্পানীর আইন' ও 'বীমা আইন' নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ করেন। তিনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ব্যবস্থা পরিষদে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তিনি কিছুকাল শাসন পরিষদের সহ-সভাপতি ও ব্যবস্থা পরিষদের নেতা ছিলেন। ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত দিল্লীতে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও উভয়ে প্রত্যেকের প্রতি আকৃষ্ট হন। সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেন। তিনি আর কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টাররূপে যোগদান করেন নাই বটে, কিন্তু মামলা লইয়া অন্যান্য প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে গমন করিতেন। রেওয়া তদন্ত কমিটীতেও তিনি পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতার খেলা-ধূলা ও অন্যান্য বহু সামাজিক ব্যাপারের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখিতেন। সে জন্য তাঁহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে হইত। যে কোন বিবাদ বিরোধ মিটমাটের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তখনই সে সকল সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইতেন ও সকলের মন সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মিঃ আর-এন ব্যারিষ্টার, মিঃ বি-এন নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেকটার, মিঃ এস-এন ছোটনাগপুর মাইকা কারখানার ডিরেকটার ও মিঃ ডি-এন 'অলকা' পত্রের সম্পাদক। সার নৃপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

সরলা দেবী চৌধুরাণী—

খ্যাতনামা লেখিকা ও রাজনীতিক নেত্রী সরলা দেবী গত ১৮ই আগষ্ট শনিবার কলিকাতা আলিপুরে তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীমান্ দীপক চৌধুরীর গৃহে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভগিনী খ্যাতনামা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতা জানকীনাথ ঘোষাল কংগ্রেসের প্রথম যুগে উহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সরলা দেবী ১৭ বৎসর বয়সে বি-এ পাশ করেন ও সেই সময় হইতে বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। তিনি ১২ বৎসর কাল 'ভারতী' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে স্বদেশী জিনিষ প্রচারের চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবের জমীদার পণ্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ সময় হইতে তিনি ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে মন দেন। লাহোরে তিনি স্বামীর সহিত 'হিন্দুস্থান' নামক একখানি উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্র চালাইতেন। পরে উহা ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। জালিয়ানওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁহার স্বামী নির্ব্বাসিত হন—সে সময়ে সরলা দেবীর পত্র পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ 'সার' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে তিনি সভানেত্রী হইয়াছিলেন ও এলাহাবাদে উক্ত সম্মিলনের সঙ্গীত শাখায় সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার 'ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি'র সভানেত্রী ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক আছে। সম্প্রতি তাঁহার আত্মজীবনী 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল।

সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা পাণিহাটী নিবাসী সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে মীরাটে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা অভয়াচরণ কলিকাতা কালীঘাট হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৫ সালে সরকারী চাকরী লইয়া সুধীরচন্দ্র ১৯১৪ সালে সরকারী কার্য্যে বিদেশে যান এবং প্যারী, রোম, লণ্ডন প্রভৃতি ঘুরিয়া ১৯১৭ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯২৭ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর পাণিহাটী গ্রামের মঙ্গলজনক বহু কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৩ সাল হইতে তিনি মীরাটে পুত্রদের নিকট বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্রনাথ সামরিক বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।

চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়—

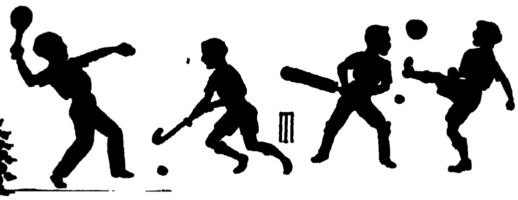
কাশী প্রবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৫শে জুলাই ৮৪ বৎসর বয়সে



চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়

কাশীধামে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৮৮৪ সালে বি-এ পাশ করিয়া তিনি শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন ও গত ৬০ বৎসরকাল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই কাশীর এংলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত 'গীতার কথা' প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তিনি চিরকুমার ও দেবচরিত্র ছিলেন।

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল ঃ

ফুটবল খেলায় যে পরিমাণ উত্তেজনা দর্শকদের মধ্যে দেখা যায় সে পরিমাণ অন্য কোন খেলায় দর্শকেরা অনুভব করে না। আমাদের দেশেও এ উত্তেজনার অভাব নেই। এখনও অনেকের মুখে ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার উত্তেজনার ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এফ এ কাপে ডালউইচ হ্যামলেট বনাম সেণ্ট এ্যালবান্সের ফুটবল খেলাটি যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা পাওয়া এক রকম দুর্লভ। এই একটি খেলার গোল সংখ্যা রেকর্ড হয়ে আছে এবং ব্যক্তিগত গোলদাতা হিসাবে সেণ্ট এ্যালবান্সের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ডবলউ মিণ্টারের নাম এফ এ কাপের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই খেলাটি কি ভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তারই খবর বলি। প্রথম দিন ৩-৩ গোলে খেলাটি ড্র হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলাটাও ড্র হ'ল ৫-৫ গোলে। তৃতীয় দিনের খেলাতে ডালউইচ হ্যামলেট দল ৮-৭ গোলে জয়ী হ'ল। এই শেষ খেলার বিশ্রাম সময়ের ফলাফল ৩-৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলাটি ৬-৬ গোলে শেষ হ'ল। অতিরিক্ত সময়ে ফলাফল দাঁড়াল ৮-৭। সব থেকে মজার ব্যাপার, সেণ্ট এ্যালবান্সের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ডবলউ মিণ্টার একাই দলের হয়ে প্রথম খেলায় তিন গোল, দ্বিতীয় খেলায় পাঁচ গোল এবং শেষ খেলায় সাত গোল দেন।

* * * *

এফ এ কাপ ফাইনাল উইনিং মেডেল সব থেকে বেশী পেয়েছেন জে ফরেষ্ট (ব্লাকবার্ণ রোভার্স), লফ্‌টহাউস (ঐ), এ কিন্‌নারার্ড (ওণ্ডারার্স) এবং সি ওয়ালাষ্টোন (ঐ)। এই চারজনেই পাঁচবার এফ এ কাপ উইনিং মেডেল পেয়েছেন।

* * * *

ওল্ডহাম দলের ব্যাক ডেভিড উইলসন পর্য্যায়ক্রমে ছ'টি ফুটবল মরসুমে ২৬৪টি খেলায় যোগদান করে রেকর্ড করেছেন। ব্রিষ্টল রোভার্সের গোলরক্ষক জে হোয়াটলি ১৯২২-২৮ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ৬টি ফুটবল মরসুমে দলের হয়ে খেলেছিলেন, কোন খেলাতেই অনুপস্থিত ছিলেন না। ১৯২৮ সালের ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি মোট ২৪৬টি খেলায় যোগ দিয়েছিলেন।

* * * *

আমাদের দেশে বি এণ্ড এ রেলদলের সামাদ ১৯১২-৪২ জো গ্যালব্রেথ ১৯০৮-৩৭ এবং মোহনবাগান ক্লাবের জি পাল ১৯১২-৩৫ সাল পর্য্যন্ত ফুটবল খেলেছিলেন। তবে সেটা খেলা অবিরাম নয়, মাঝে মাঝে খেলার মাঠে তাঁদের দেখা যায়নি।

* * * *

ইংলিস ফুটবল খেলায় প্রেসটন নর্থের রেকর্ড উল্লেখযোগ্য। এই দলটি কোন পয়েণ্ট না হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় এবং কোন গোল না খেয়ে এফ এ কাপ বিজয়ী হয়।

ক্যালকাটা ফুটবল খেলায় রয়েল আইরিশ দলেরও অনুরূপ রেকর্ড আছে। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ দল লীগের কোন খেলায় না হেরে, কোন গোল না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। এ ছাড়া ঐ বছরই একটাও গোল না খেয়ে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়। তাদের এ রেকর্ড আজও কোন দল ভাঙতে পারে নি।

* * * *

মাত্র একজন খেলোয়াড়ের জন্তে সব থেকে বেশী Transfer fee উঠেছিল ১০,৩৪০ পাউণ্ড। বোলটন ওয়াণ্ডার্সের ডি বি এন জ্যাকের জন্তে আরসেনাল দলকে এই টাকা দিতে হয়েছিল। নিউ ক্যাশ্‌ল ইউনাইটেডের হিউজ গ্যালাচারের transfer fee ১০,০০০ পাউণ্ড দিয়েছিল চেলশা ক্লাব।

আমাদের দেশে এ সবের বালাই নেই ; তবে শোনা যায় খেলোয়াড়রা টাকার লোভেই এক ক্লাব ছেড়ে অন্য ক্লাবে যায়। কাজটা গোপনেই হয়, সব খবর জানার উপায় নেই।

* * * *

এসোসিয়েশন ফুটবল খেলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Lord Kinnaird, Messrs. W. Mc Gregor, T. C. Clegg, Charles Cramp, John Lewis, J. J. Bentley, John Kevan M'Dowell এবং T. M'Kenna. জন্ কেভেন এম'ডোয়েলের সব থেকে বেশীদিনের কাজ করার রেকর্ড আছে। তিনি ৪৬ বছর স্কটিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিন থেকেই সম্পাদক ছিলেন।

* * * *

১৮৭৮ সালে নটিংহাম ফরেষ্ট ময়দানে প্রথম রেফারীর বাঁশী বাজে। রেফারীর বাঁশীর পরিকল্পনা করেছিলেন এস উইডাউশন। ভুল ভ্রান্তির জন্য উত্তেজক দর্শকদের হাতে কোন রেফারী প্রথম লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তার নাম পাওয়া যায় না।

১৮৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত শেফিণ্ড ক্লাবই এসোসিয়েশন ক্লাবের মধ্যে প্রাচীন। এই ক্লাবের ১৮৫৭ সালের Minute Book আজও অক্ষত রয়েছে।

* * * *

ফুটবল খেলার ইতিহাসে সব থেকে বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্কটিশ এফ এ কাপে আরব্রোথ দল। এই দলটি ৩৬-০ গোলে বন একর্ডকে হারিয়ে এই রেকর্ড করেছিল। ঐ দিনই ডানডি দল ৩৫-০ গোলে এবার্ডিন দলকে হারায়। আরব্রোথের পেট্রি একাই ১৩টী গোল দেন, তার মধ্যে ৩টে হ্যাটট্রিক। এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অক্টোবরে প্রেসটন নর্থএণ্ড ২৬-০ গোলে হাইড এ্যাথলেটিককে হারিয়ে দেয়।

প্রথম বিভাগ লীগ

১৯১৫-১৯৪৫	মোটখেলা	জয়	ড্র	হার
মোহনবাগান	৬০	২৬	১৭	১৭
ক্যালকাটা	৬০	১৭	১৭	২৬
১৯৩৪-১৯৪৫	মোটখেলা	জয়	ড্র	হার
মোহনবাগান	২৩	৭	৯	৭
ইষ্টবেঙ্গল	২৩	৭	৯	৭
১৯৩৪-১৯৪৫	মোটখেলা	জয়	ড্র	হার
মোহনবাগান	২৪	৫	১২	৭
মহমেডান স্পোর্টিং	২৪	৭	১২	৫
১৯৩৪-১৯৪৫	মোটখেলা	জয়	ড্র	হার
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	১৩	৭	৪
ক্যালকাটা	২৪	৪	৭	১৩
১৯৩৪-৪৫	মোটখেলা	জয়	ড্র	হার
ইষ্টবেঙ্গল	২৩	৬	৬	১১
মহমেডান স্পোর্টিং	২৩	১১	৬	৬
১৯৩৪-৪৪	মোটখেলা	জয়	ড্র	হার
ক্যালকাটা	২১	২	৪	১৫
মহমেডান স্পোর্টিং	২১	১৫	৪	২

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ১৯১১

মোহনবাগান—২ : ইষ্টইয়র্কস—১

এস ভাদুড়ী এবং অভিলাষ ঘোষ মোহনবাগানের পক্ষে গোল করেন।

১ম রাউণ্ড : মোহনবাগান (এস ভাদুড়ী—২ ; অভিলাষ ঘোষ—১) ৩ : সেণ্টজেভিয়ার্স—০

২য় রাউণ্ড : মোহনবাগান (বি ভাদুড়ী—১, এস ভাদুড়ী—১)—২ : রেঞ্জার্স—১

৩য় রাউণ্ড : মোহনবাগান (বি ভাদুড়ী—১)—১ : রাইফেল ব্রিগেড—০

সেমিফাইনাল : মোহনবাগান (বি রায়—১)—১ : মিডলসেক্স—১

সেমিফাইনাল রিপ্লে : মোহনবাগান (সরকার—১, এস ভাদুড়ী—১ এবং রায়—১) ৪—০ : মিডলসেক্স—১

২য় রাউণ্ড : ইষ্টইয়র্কস—০-৩ : রয়েল স্কটস্—০-২

৩য় রাউণ্ড : ইষ্টইয়র্কস—৭ : মুসলীম—১

সেমি-ফাইনাল : ইষ্টইয়র্কস—১ : ক্যালকাটা—০

প্রথম বিভাগ লীগ

মোহনবাগান—ক্যালকাটা—ইষ্টবেঙ্গল—মহমেডান স্পোর্টিং

	১৯১৫		১৯১৬		১৯১৭		১৯১৮		১৯১৯		১৯২০		১৯২১		১৯২২		১৯২৩		১৯২৪		১৯২৫	
	১ম খেলা	২য় খেলা	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়
মোহনবাগান	০	০	১	১	০	০	১	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	০
ক্যালকাটা	০	১	১	৬	০	০	৩	৪	০	৪	১	০	১	০	১	৫	১	০	০	০	০	০

	১৯২৬		১৯২৭		১৯২৯		১৯২৯		১৯৩০		১৯৩১		১৯৩২		১৯৩৩	
	১ম খেলা	২য় খেলা	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়
মোহনবাগান	০	২	২	১	৩	০	০	১	×		১	০	১	১	১	০
ক্যালকাটা	১	১	০	২	২	০	১	১			০	১	০	১	০	০

	১৯২৫		১৯২৬		১৯২৭		১৯২৮		১৯৩২		১৯৩৩	
	১ম খেলা	২য় খেলা	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়
মোহনবাগান	০	১	১	০	০	০	২	০	০	২	২	১
ইষ্টবেঙ্গল	১	০	২	০	০	০	১	০	১	৩	২	১

	১৯৩৪		১৯৩৫		১৯৩৬		১৯৩৭		১৯৩৮		১৯৩৯		১৯৪০		১৯৪১		১৯৪২		১৯৪৩		১৯৪৪		১৯৪৫	
	১ম খেলা	২য় খেলা	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়
মোহনবাগান	৩	০	০	৩	১	০	১	২	০	১	১	১	১	০	১	৩	৬	৪	১	২	৪	২	৩	১
ক্যালকাটা	০	৪	৬	০	০	০	৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১	১	১	০	২	০
মোহনবাগান	২	১	০	১	০	০	১	১	১	১	২	×	০	০	১	০	২	০	০	২	১	২	০	০
ইষ্টবেঙ্গল	০	১	০	১	৪	০	১	০	১	১	১	×	১	০	২	২	১	২	১	০	০	০	২	০
মোহনবাগান	১	১	০	০	০	০	০	৩	১	০	০	০	২	০	০	০	২	০	০	০	১	১	০	০
মহমেডান স্পোর্টিং	১	১	৩	১	১	০	২	২	১	০	০	০	০	২	১	০	১	২	০	০	০	০	০	০
ইষ্টবেঙ্গল	৪	০	১	২	১	১	১	৫	০	০	১	০	১	০	২	৬	৫	৬	২	২	৪	৩	১	০
ক্যালকাটা	১	২	৩	০	১	৪	০	০	১	০	১	০	১	০	০	২	০	০	০	১	০	০	০	০
ইষ্টবেঙ্গল	০	১	০	১	০	০	০	৪	২	০	২	×	০	০	০	৩	১	০	২	১	০	০	০	১
মহমেডান স্পোর্টিং	১	১	২	২	২	১	২	২	০	২	০	×	০	৩	২	২	২	০	০	০	২	০	০	১
ক্যালকাটা	১	২	০	০	০	০	২	১	০	০	১	×	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	২	১
মহমেডান স্পোর্টিং	৪	১	০	১	৩	০	২	২	৪	১	২	×	৪	০	৩	২	৮	২	১	০	১	৫	৪	০

প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় মোহনবাগান, ক্যালকাটা, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এই চারিটি প্রধান দলের যোগদানের তারিখ থেকে পরস্পরের খেলার ফলাফল দেওয়া হ'ল। ['ফুটবল লীগ-শীল্ডখেলার ইতিহাস' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগিরিবালা দেবী প্রণীত উপন্যাস "খণ্ডমেঘ"—২৲

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বর্গাদপি গরীয়সী" (২য় খণ্ড)—৪৲

বিমলকুমার বসু ও রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক লুই ফিসার-এর গ্রন্থানুবাদ "গান্ধীজীর সহিত এক সপ্তাহ"—২॥০

অমলা দেবী প্রণীত উপন্যাস "চাওয়া ও পাওয়া"—৩৲

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "গহন গিরির সন্ন্যাসী"—১।০

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত সংক্ষিপ্তাকারে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"—১৲

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত শিশু-উপন্যাস "সাংগ্রিলার মঠে"—১৲

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রথের ঠাকুর"—১৲

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ঝড়ের প্রদীপ"—১৲

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত শিশু-উপন্যাস "মহিম ডাকাত"—২৲

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "প্রেম ও ছন্দ"—১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "শতাব্দীর প্রতীক"—২৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সেকেণ্ড হ্যাণ্ড"—২৲

শ্রীঅনাথগোপাল সেন প্রণীত "জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজির অর্থনীতি"—১॥

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অরসিকেষু"—৩৲

শ্রীপ্রভাত হালদার প্রণীত নাটিকা "মায়াস্বপন"—।৵০

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অনুবাদ-চতুষ্টয়"—॥০

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "যুদ্ধ তখনো হয় নাই শেষ"—।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণি গাঙ্গুলী | পাণিহার | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার"—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রবন্ধের ছবি



বিদেহা আলেক্‌জান্দ্রের সুগঠিত মূর্ত্তি (পৃঃ ২৯১,





মিডিয়ামের দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে ectoplasm নিঃসরণ (পৃঃ ২৯৩)
From Notzing's —Phænomena of materialisation (By Permission)



কার্ত্তিক—১৩৫২

প্রথম খণ্ড	ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

ভক্তিবাদ ও শ্রীমদ্ভাগবত

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, রায়-বাহাদুর

ভক্তিবাদ অতি প্রাচীন। বর্ত্তমানে যে সকল ধর্মমতের প্রতি লোকের আস্থা দেখা যায়, তাহার সবগুলির মধ্যেই ভক্তিবাদ অল্পাধিক মিশ্রিত আছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন ভক্তিবাদ লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইয়াছিল। ভগবদ্গীতায় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে :

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ ॥

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, তিনি পূর্বে এই অব্যয় যোগ সূর্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সূর্য তাঁহার পুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে এই যোগ অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালবশে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আজ আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগের কথা বলিতেছি।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ গীতা ৪র্থ অঃ

অর্জুনের মনে সংশয় হইল। তিনি বলিলেন, তুমি ত আধুনিক অর্থাৎ এখন বর্ত্তমান, বিবস্বান্ (সূর্য) প্রাচীন কালের লোক ; তুমি কি প্রকারে তাঁহাকে এই যোগ শিক্ষা দিলে ?

তাহার উত্তরে ভগবান বলিলেন যে, আমি অজ হইয়াও বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমিও তাই। আমি সে সব রহস্য জানি, তুমি অবিদ্যার অধীন বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছ।

যাহা হউক, গীতারও বহু পূর্বে যে এই ভক্তিতত্ত্ব ভারতে সুবিদিত ছিল, তাহা বুঝা যায়। গীতার রচনা কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জ্যাকোবি প্রভৃতির মতে গীতা মহাভারতের অংশ হইলেও উহাতে প্রথমে কোনও ধর্মতত্ত্ব ছিল না। গীতার যে সমস্ত শিক্ষা সভ্যজগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে, উহা নাকি পরবর্ত্তী কালের যোজনা ! এরূপ মতবাদের সারবত্তা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, ভক্তিবাদ যে খ্রীষ্ট জন্মেরও পূর্ব হইতে ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

ভক্তিবাদের প্রধান প্রচারক ছিলেন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়। মহাভারতের শান্তি পর্বে যে 'হরিগীতং পুরাতনং' আছে, তাহা এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়েরই মত। শান্তিপর্ব এবং অন্তর্গত মোক্ষধর্ম ও নারায়ণীয়

পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ প্রক্ষেপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অবশ্য সুদুষ্কর। কিন্তু দেখা যায় অনেক স্থলে এরূপ মতবাদের ভিত্তি নিতান্তই শিথিল। দক্ষিণ দেশের একজন আলওয়ার (তিরুমজই) বলিয়াছেন যে বিষ্ণু ভগবান্ নারদকে এই ভক্তিধর্ম প্রথমে অর্পণ করেন। পরে উহা নর ও নারায়ণ কর্ত্তৃক জনসমাজে প্রচারিত হয়। নর ও নারায়ণ বিষ্ণুর পুত্র, তাঁহারা বদরিকাশ্রমে ঋষি ছিলেন।১

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
'জয়' অর্থ মহাভারত বা ধর্মশাস্ত্র

'পাঞ্চরাত্র' শব্দের সহজ অর্থে যাহা পাঁচ রাত্রি ধরিয়া উপদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ মত যে ঐ আকস্মিক ঘটনা হইতে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিত্যপ্, তেজ মরুৎ ব্যোম), পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত—এই পাঁচটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা এই মতে আছে বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম পাঞ্চরাত্র হইয়াছে। বেদে যে একায়ন শাখার উল্লেখ আছে, পাঞ্চরাত্র তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ সাত্বত পৌষ্কর ও জয়াখ্যসংহিতায় যে ধর্মমতগুলি পাওয়া যায় একায়ন বেদ তাহার ভিত্তি। এই একায়নবেদ সমস্ত বেদের সার বা মূল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত পুরাণের সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে ইহা সমস্ত বেদ এবং ইতিহাসের সার (সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সমুদ্ধৃতম্)।

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ আছে। ইহার মধ্যে অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। এই সকল গ্রন্থে প্রধানতঃ ভক্তিবাদই প্রচারিত হইয়াছে। 'পরম সংহিতা' নামক গ্রন্থের সহিত গীতোক্ত ভক্তিবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।২ রামানুজাচার্য এই পরম সংহিতার প্রমাণ তাঁহার শ্রীভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে এরূপ বহু সংহিতার সন্ধান পাওয়া যায় যথা ঈশ্বর সংহিতা, পদ্ম সংহিতা, অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ইত্যাদি। এই সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে ভগবদ্গীতা যে বিশিষ্ট মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আকস্মিক নহে, ইহা এক বহু বিস্তৃত ও প্রাচীন ভক্তিবাদের চরম অভিব্যক্তি। ভক্তিবাদ যাঁহারা অনুসরণ করিতেন, তাঁহাদের সাধারণ নাম ছিল 'ভাগবত'। এই ভক্তিনিষ্ঠ ভাগবতদের গ্রন্থই যে শ্রীমদ্ভাগবত সে কথা বলা বাহুল্য। শাণ্ডিল্য এই ভক্তিবাদীদের মধ্যে একজন প্রধান ঋষি ছিলেন। জয়াখ্যসংহিতায় আছে যে, একদিন বহু মুনিঋষি গন্ধমাদন পর্বতে শাণ্ডিল্য ঋষির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন। শাণ্ডিল্য বলেন যে, 'পরতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়; এই তত্ত্ব বিষ্ণু প্রথমে নারদকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষা যে সকল শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা গুরুর উপদেশ ব্যতীত জানা যায় না।' শাণ্ডিল্য ভাগবতধর্মের একজন অতি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থকার বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

এই সকল আলোচনা করিলে মনে হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ ভারত ভক্তিধর্মের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আলবার নামে এক শ্রেণীর ভক্ত বা ভাগবত দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে ভক্তিধর্মের যে প্রবল উন্মাদনা দেখা যায়, তাহার তুলনা প্রাচীন যুগে আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। আলবার শব্দের অর্থ যাঁহারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা তামিল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃতেও ইঁহাদের কিছু কিছু গ্রন্থ আছে। আলবাররা তাঁহাদের এই দেশীয় ভাষায় যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাহা দেবভাষার সম্মান লাভ করিয়াছে। এখনও মন্দিরে মন্দিরে এই তামিল ভাষার পদাবলী স্তোত্ররূপে গীত হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে যে ভক্তিবাদের প্রবাহ দেখা যায় তাহার একমাত্র তুলনাস্থল বোধ হয় উত্তর ভারতের পদাবলী। এই সকল তামিল দেশীয় ভক্তকবি খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হন বলিয়া জানা যায়। ইঁহাদের ভক্তিবাদ দ্রবিড়াম্নায় নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার এক অংশ দ্রবিড় সামবেদ নামে কথিত। শঠারি, শঠকোপ বা নম্মা আলবার এই সামবেদের রচয়িতা। নম্মা আলবার সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌন ছিলেন। এই সময়ে তিনি এক বকুল বৃক্ষের তলে বসিয়া থাকিতেন এবং ভগবান অনেক সময়ে তাঁহাকে দর্শন দিতেন। ষোল বৎসরের পর তিনি যখন লোকসমাজে প্রকাশ হইলেন তখন লোকে দেখিল যে তাঁহার দেহে নানা অলৌকিক ভাব প্রকটিত হয়। অশ্রুকম্পপুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ দেখা দিল। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন। এই সমস্ত দেখিয়া লোকে তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিল। কেহ কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নম্মাআলবারের শিষ্য মধুর কবি নামক আলবার বলিয়াছেন যে, ব্রজরমণীগণের যে ভাব ছিল শ্রীকৃষ্ণে, শঠারি মুনিরও সেই সকল ভাব দেখা যাইত।

ভাগবতেও আমরা অনুরূপ ভাবের বর্ণনা পাই:

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মত্তবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ভাগবত ১১।২।৪০

তামিল দার্শনিক কবি বেদান্ত দেশিকাচার্য 'তাৎপর্য রত্নাবলী' নামক গ্রন্থে শঠারি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রজরমণীগণের রীতি অবলম্বনে ভগবানকে আস্বাদন করিয়াছিলেন:

ব্রজযুবতীগণ খ্যাতনীত্যাংস্বভুংক্ত।

---

১ এই জন্যই ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যার পূর্বে ইঁহাদিগকে প্রণাম করিবার রীতি প্রচলিত আছে:

২ Dr. Krishnaswami Aiyengar—Antiquity of Pancharatra

অর্থাৎ ব্রজযুবতীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছিলেন, ইনি (শঠারি) সেই বিখ্যাত নীতিতে ভগবানকে উপভোগ করিয়াছিলেন। এখানে আমরা মধুর ভাব বা কান্তাভাবের উপাসনাপদ্ধতির সর্বপ্রথম পরিচয় লাভ করিতেছি।

আলবারদিগের মধ্যে ১২ জন খুব বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের শেষ ব্যক্তি তিরুমঙ্গই আলবার খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। অন্যান্য আলবাররা ইঁহার পূর্বে পাঁচ কি ছয় শত বৎসর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নম্মা আলবার এই দ্বাদশ জনের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণ ভারতের এই ভক্তিধর্মের অভ্যুত্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে ভাগবতধর্ম সারা ভারতবর্ষে কি অদ্ভুত প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ইহা হইতে, গ্রীক্ দূত কর্ত্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাসুদেবের নামে দাক্ষিণাত্যে বেসনগর স্তম্ভ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, কবি ভাস শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া বালচরিতম্ লিখিলেন, মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে, শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যামরূপের উল্লেখ করিলেন—এ সমস্ত ব্যাপারই বুঝিতে পারা যায়। কুরল নামে দাক্ষিণাত্যের একজন কবি শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি তামিল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দশশতকের মধ্যে।

ভক্তিধর্মের অভ্যুত্থানের যে অদ্ভুত ইতিহাস আমরা দক্ষিণ ভারতে পাই অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। পরবর্ত্তীকালে বাংলায় যে প্রেমভক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল, পাঞ্জাবে এবং উত্তর পশ্চিমে যে ভক্তিধর্মের ধারা নানকজি, মীরাবাই প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাই, তাহার মূল উৎস অনুসন্ধান করিলে দক্ষিণ ভারতেই যাইতে হইবে। পূর্বে যে আলবারদের কথা বলিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, তাঁহার নাম আণ্ডাল। এই মহিলা আলবারের পিতা পেরি আলবারও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আণ্ডালের এই অভিমান ছিল যে শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহার স্বামী। এই হেতু তাঁহার পিতা আণ্ডালের বিবাহ দেন নাই। আণ্ডালের বিগ্রহ এখনও শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে পূজিত হয়। মীরাবাই আণ্ডালেরই যেন প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ মনে হইবে। এই দুই মহিলার চরিত্রে এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে, একই উৎস হইতে উভয়ের অনুপ্রাণনা আসিয়াছিল—এরূপ মনে না করিয়া উপায় নাই।

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ একখানি ভক্তিগ্রন্থের রচনার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন তাহা দক্ষিণ ভারত ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কাব্য দর্শন ইতিহাস ও ধর্মের এরূপ অপূর্ব সমন্বয় বিশিষ্ট গ্রন্থ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীচৈতন্যের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ঠিক কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কুলশেখর পেরুমাল নামে একজন আলবার ৮ম শতাব্দীতে তাঁহার মুকুন্দমালা নামক গ্রন্থে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।* রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। রামানুজাচার্য দক্ষিণ ভারতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১০১৭-১১৩৭) এবং ভক্তিবাদের প্রথম দার্শনিক প্রবর্ত্তক তিনিই। নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যও দক্ষিণ ভারতের লোক। কাহারও কাহারও মতে নিম্বার্কই দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বপ্রথম বৈষ্ণব মত প্রচার করেন।১ নিম্বার্ক সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং সনকাদি সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া কথিত হন। জয়দেব গীতগোবিন্দে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ রামানুজ তাঁহার পূর্বগামী। আনন্দতীর্থ স্বামী এবং মুগ্ধবোধ প্রণেতা বোপদেব ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্ত্তী নহেন। ইঁহারা উভয়েই দক্ষিণ ভারতের লোক এবং উভয়েই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, একাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, আর দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় আচার্যগণ ভাগবতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত আচার্যগণ কিন্তু এমন কোনও আভাস দেন নাই যে তাঁহারা কোনও সাম্প্রতিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেছেন।

রামানুজাচার্য ভাগবত হইতে কেন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য হইলেও এই মূল্যবান্ গ্রন্থ যে ভক্তিধর্মের মণিমঞ্জুষা, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে ইহার রচনা এরূপ কোনও সময়ে হইয়াছিল যখন ভক্তিধর্মের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। এই জন্যই মনে হয় যে যখনই ভাগবত রচিত হইয়া থাকুক, দক্ষিণ ভারতেই উহা সম্ভব। কারণ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতে ভক্তিধর্মের সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোনও আন্দোলন দেখা যায় না। ভাগবত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে বহু বিষ্ণুভক্ত দক্ষিণ দেশে আবির্ভূত হইবেন—

তাম্রপর্ণী নদীযত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥ ইত্যাদি

ভাগবত ১১।৫

এই বর্ণনার মধ্যে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। এই সকল নদী ও স্থান আলবারদের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাম্রপর্ণী নম্মা আলবারের দেশ, কৃতমালা রঙ্গনাথ-সেবিকা আণ্ডালের দেশ। পয়স্বিনী (পলর) অপর কয়েকজন আলবারের দেশ; কাবেরীর তীরে তিরুমঙ্গই আলবার, এবং কুলশেখর পেরুমাল মহানদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২

* সার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার বলেন কুলশেখর ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ছিলেন এবং তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

১ Hinduism—Monier Williams, Sir George Grierson Encyclopaedia of Religion & Ethics এ ভক্তিমার্গ নামক প্রবন্ধে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

২ History of Indian Philosophy vol III. Dr. S. N. Dasgupta.

'প্রপন্নামৃতে' আলবারদিগের বর্ণনায় যে ভক্তি-ভাবের ধারা আছে তাহার অনুরূপ ভক্তিভাবের ব্যাখ্যা উত্তর ভারতের কোনও গ্রন্থে বিরল। সেই জন্ম পদ্মপুরাণান্তর্গত ভাগবত-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তিদেবী দ্রাবিড় দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামে তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কর্ণাটকে গেলেন এবং সেখানে সমৃদ্ধিশালিনী হইলেন। পরে মহারাষ্ট্র ও গুর্জরে প্রবেশ করিয়া জর্জরিত হইলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও ঘোর কলির প্রভাবে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইল। শেষে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া ভক্তিদেবী আবার নবীনতা প্রাপ্ত হইয়া সুদর্শনা হইলেন।

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে যে পরিবেশের চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহার অনুরূপ কোনও পরিবেশ আমরা সেই প্রাচীনকালে আর কুত্রাপি পাই না। সেইজন্য এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত দক্ষিণ ভারত হইতেই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। *

দক্ষিণ ভারতের এই অবদান স্বীকার করিলে উত্তর ভারতের গর্ব খর্ব হইবার আশঙ্কা অমূলক। কারণ উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বহু কাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার মত দৈন্য যেন কখনও আমাদের মনে না আসে। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব যে এক সময়ে দক্ষিণ ভারতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারতের বিপুল সাহিত্য। ভক্তিবাদের বহুগ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত যে দক্ষিণ দেশ হইতেই আমরা পাইয়াছি, ইহা সকলেই জানেন। দক্ষিণ ভারতেই রামানুজাচার্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন, নিম্বার্কও দক্ষিণ ভারতের বেলারি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজের শ্রীবৈষ্ণব ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সুদর্শন মত, বাংলার বৈষ্ণবেতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মধ্বাচার্যও দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের পূর্বগামী বটে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যের গুরুপরম্পরায় মধ্বাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়—যদিও শ্রীচৈতন্য যে মত প্রচার করিয়া-ছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত। এই মতে যে 'গোপবেশ বেণুকর নবকৈশোর নটবর' নন্দনন্দনের ভজন প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা দক্ষিণ ভারতে বিরল। দক্ষিণ ভারতের প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথস্বামী নারায়ণ; অতল শয়নে নারায়ণ, লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবায় রতা, অনন্ত তাঁহার শয্যা, অসংখ্য ফণা তাঁহার ছত্র—এই বিগ্রহই বেশীর ভাগ মন্দিরে। শ্রীরঙ্গম্, শ্রীরঙ্গপত্তন, মহাবলিপুরম্, চিদম্বরম্ প্রভৃতি বিখ্যাত মন্দিরগুলিতে ঐ নারায়ণ বা মহাবিষ্ণুমূর্ত্তিই দেখিয়াছি। সুতরাং বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে যে নূতনত্ব আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যেরই অবদান। কিন্তু এখানেও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য যে কান্তাভাবের ভজন প্রবর্তন করিলেন, তাহারও মূল অনুসন্ধান করিলে দক্ষিণ ভারতেরই কথা মনে হইবে। গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত সংলাপের পূর্বে বঙ্গদেশে এই রাধা-ভাবের ভজনের কোনও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না একথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি।১ গীতার শরণাগতি বা প্রপত্তিও দক্ষিণ ভারতের তামিল গ্রন্থ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্ম-নিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

অহির্বুধ্ন্য সংহিতা

এই শরণাগতিরও পরের কথা হইল—প্রেম। ইহা শুধু ভগবানের কৃপাভিক্ষায় পর্যবসিত নহে। ভগবানকে আমাদের বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ভাবে উপাসনা, ইহাই হইল শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মের সারকথা। তাঁহার অন্ত্যলীলায় যে দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি মহাভাবের বিকাশ দেখিতে পাই, তাহা বাংলারই অমূল্য সম্পদ, অন্য কোনও প্রদেশের নহে।

* আমার সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকায় আমি বলিয়াছি... "আমার মনে হয় ভাগবত পুরাণ খুব সম্ভব দক্ষিণ ভারতেই রচিত হইয়াছিল।" ঐ পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় "দেশ" পত্রিকায় (৩০শে আষাঢ়, ১৩৫২) সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উপরি উদ্ধৃত যুক্তিসমূহ প্রণিধান করিলে সম্ভবতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের (মদ্‌ভাগবত নহে?) উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে সংশয়ের কিছু নিরসন হইতে পারে।—লেখক

১ বাংলার প্রেমধর্ম—উদয়ন, কার্ত্তিক, ১৩৪১



শশধরের নূতন দাঁত

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সুশীল সেন :

"ঐ যে মেয়েটি গেল হাসিতে হাসিতে
সঙ্গিনীর পানে চেয়ে—লোহিতে ও পীতে
একখানি অফুরন্ত গীতিকাব্যসম—
লাবণ্যে অপরিমেয়, বর্ণে নিরুপম !
দেখিলে তাহারে ?   তন্বী হেসেছিল বেশ—
কুসুমিত করে' গেছে একটি নিমেষ !
দেখেছি ত' কত হাসি কতশত মুখে,
বিকচ প্রফুল্ল হাসি সুখে ও কৌতুকে···
এ-হাসি তেমন নয়, নহে সাধারণ,
সকল হাসিতে নাই অমৃতক্ষরণ ;
এ হাসি হাসির যেন পরম প্রকাশ,
পরম রসের রূপ !   জন্মিল উল্লাস ।
এখনি দেখা সে-হাসি অদৃশ্য এখন—
সূর্য্যাস্তের পর রক্ত-দীপ্তির মতন
সুক্ষ্ম প্রতিচ্ছায়া তার অজস্র অক্ষয়
লেগে' আছে প্রাণে ।   কেন এমনটি হয় !
কোথায় ফুটিল হাসি !   সমগ্র আননে—
নয়নযুগলে, কিম্বা গণ্ডে কি দশনে !"

সুবোধ রায় :

"দেখেছি সে হাসি ; হাসি অতীব মধুর—
উজ্জ্বল মানসরাগ ফুটেছে প্রচুর ;
কিন্তু যদি প্রশ্ন করো, ফুটেছে কোথায় ?
সরল উত্তর তবে দে'য়া হবে দায় ;
আমি মনে করি, হাসি তুলেছে উচ্ছ্বসি'
সমগ্র যৌবন তার—রূপসী ষোড়শী ।
হেসেছে বয়স তার, হেসেছে তনুটি,
দাঁত নয়, ওষ্ঠ নয়, নহে চক্ষু দু'টি ।
অদ্যাপি অনবগত কবি বৈজ্ঞানিক :
কি কারণে কোন্ স্থান হাসে সমধিক !
শিশুর উলঙ্গ মূর্ত্তি না হেসেও হাসে—
সর্ব্ব অঙ্গ ব্যেপে তার হাসিটি বিকাশে ।
তবে এ স্বীকার করি, দাঁত নাই যার
তার হাসি স্বাদহীন ; দৈর্ঘ্য ও বিস্তার
পাবে তা'তে ; কিন্তু নাই গভীরতা, আলো
নাই তার আবেদন ; মোটেই জোরালো
নহে তা' ; সে রূপহীন নিকৃষ্ট ব্যাপার—
সোহাগটা ফোটে খালি বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দার ।
অন্ধের হাসিও দেখো, অসম্পূর্ণ হাসি—
বিকিরিত দীপ্তি চোখে ওঠে না বিকাশি' ।
সে যা ' হো'ক্, দাঁত আর ঠাকুর্দ্দার নামে
মনে প'লো ঘটনা যা' ঘটেছিল গ্রামে ।
শোনো যদি বলি তবে অপূর্ব্ব আখ্যান :
দাঁত কেন মানুষের রহিল পরাণ" ।

থামিল সুবোধ রায়, ছাড়িল নিঃশ্বাস—
কহিল : "মানুষ মাত্র নিয়তির দাস ;
অহরহ দৃষ্টান্তের পেতেছি সাক্ষাৎ :
আজিকার বনস্পতি কাল ধূলিসাৎ ।
সে কি তার শক্তি, তার, সে কি কলেবর—
তখনো, যখন তার বয়স সত্তর ।
নাম ছিল শশধর, শশধর ঘোষ,
ছ'ফুট দু'ইঞ্চি দেহ, নির্ব্যাধি নির্দ্দোষ ;
অতিশয় মিষ্টভাষী, প্রফুল্ল সর্ব্বদা···
আমাদের সকলের 'শশ ঠাকুরদা' ।
বার্দ্ধক্যেও দেখে তার শক্তি অসম্ভব
দুষ্টজনে নাম দিল 'দ্বিতীয় পাণ্ডব' ;
উপরটা যত বড়ো তেম্‌নি ভিতর—
অনুপাতে ততখানি গভীর গহ্বর,
তিনটি লোকের খাদ্য খাইতে সক্ষম,
হজমশক্তিতে নহে কারো চেয়ে কম ;
দু'সের মাংসের সঙ্গে মাছ দুধ ভাত
সাপটি' নিঃশেষ করে না থামিয়ে হাত ;
চিবিয়ে পাঁঠার হাড় করে গুঁড়ো গুঁড়ো···
লোকে বলে : 'শশধর হ'ল নাকো বুড়ো' ।

কিন্তু কথা টিকিল না ; ক্রমে গেল দাঁত ;
চর্ব্বণে ঘটিল বিঘ্ন, অস্বস্তি নেহাত্ ।
বার্দ্ধক্যের সে-ক্ষতিটা করিতে পুরণ
নিতে হ'ল বৈজ্ঞানিক মিথ্যার শরণ ;
দু'পাটি সুন্দর দাঁত, ধবল মসৃণ,
মুখে নিয়ে শশধর এল একদিন ;
বাষট্টি টাকার দাঁত হাসে ঝিক্‌মিক্—
কিন্তু মূল কাজটাই হ'ল নাক্কো ঠিক্ ।
মাড়ি ত' নকল নয় ! রক্ত মাংস তার
নকল দাঁতেরে নিতে করি' অস্বীকার
বাধাইল ল্যাঠা ; মাড়ি কোমল জিনিস—
সেখানে জনমে দ্রুত যন্ত্রণার বিষ ;
রাখা যায় একটানা আধ ঘণ্টা জোর,
তা'পর অসহ্য হয় যন্ত্রণা প্রখর ।—
খুলে রেখে' দাঁত করে আহার্য্য ভক্ষণ···
অভ্যাস ক্রমশঃ হ'বে যন্ত্রণাদমন—
আশা করে' থাকে ; কিন্তু, দিন যায়—
টাকার সে-দাঁত তার হ'ল না সহায় ;
যন্ত্রণা চলিল বেড়ে' । কিছুদিন পর
'ক্লাইম্যাক্স্' দিল দেখা অতি ভয়ঙ্কর :
একদিন দন্তস্পর্শ সহিল না মাড়ি
এক মুহূর্ত্তও ; দাঁত খুলে' তাড়াতাড়ি
আর্ত্তনাদে তোলপাড় করিয়া সংসার
শশধর প্রকাশিল যন্ত্রণা তাহার···
অতিকায় লোকটার কাতর চীৎকার
শুনা'লো ভীষণ, যেন সীমা নাই তার···
ছুটিয়া আসিল লোক ; কহিল সকলে :
'বিষাক্ত এ দাঁত শীঘ্র ফেলে দাও জলে ;
বিষাক্ত পদার্থ দিয়া নির্ম্মিত এ-দাঁত
দিয়েছে তোমারে, ইহা কহিনু নির্ঘাত্ ;
হাজার হাজার লোক লাগাইয়া দাঁত
হাসিতেছে দিব্য—নাই কোনোই উৎপাত !
উল্টো কাণ্ড কেন হবে তোমার বেলায়,
দুনিয়া আঁধার দেখা দাঁতের জ্বালায় !
যাও তুমি কলিকাতা ; দন্তচিকিৎসকে—
'ধাপ্পাবাজ সেই চোরে, ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকে,
শিক্ষা দিয়ে এস' । উহা শুনি শশধর
উপরন্তু অর্দ্ধশোকে বকিল বিস্তর···
ব্যাগে নিয়ে দাঁত, আর, দুধ খেয়ে খালি,
ক্ষুধার উত্তাপে স্ত্রীকে দিয়ে গালাগালি
গেল চলে' ।···সেখানে সে পাবে কি না ত্রাণ
করিল দেশের লোক বহু অনুমান ।

কি কহিল চিকিৎসকে, কি পেলে উত্তর,
জানি না বিশেষ ; তবে এসে শশধর
যা' কহিল তাহা শুনি' শত্রুমিত্রগণ,
নর আর নারী, হ'ল বিস্ময়ে মগন ।
হাসি' হাসি' শশধর কহিল খবর :
'আমার অদৃষ্ট দেখি তেজালো জবর !
যা' কখনো শুনি নাই, করি'নি কল্পনা
ডাক্তারের মুখে সন্ত তা-ই গেল শোনা !
আমার নকল দাঁত বিষাক্ত ত'নয় ।
ডাক্তার কহিল দেখে, 'শুনুন্, ম'শয়,
বাঁচিনা অজ্ঞের এই ঘৃণ্য অবিচারে—
বেচিনা বিষাক্ত দাঁত, তুলে' দি' তাহারে ।
বেদে' কি সাপুড়ে' নই, জানিনে ম্যাজিক্,
দাঁতের ব্যাপার মহা কাণ্ড বৈজ্ঞানিক—
চালাকি কি ফাঁকি'নাই, পড়ে' শুনে' শেখা ;
দেহের রহস্য আজো বিস্তর অদেখা,
মানুষের ; আপনার আরও অজানা—
ক্রোধ প্রকাশিতে আমি করিতেছি মানা ।

দাঁতের কসুর নাই । অদ্ভুত ব্যাপার
ঘটিতেছে ধীরে ধীরে হোথা আপনার ;
হেন অসাধারণত্ব দেখা গেছে কম—
হইতেছে আপনার নবদন্তোদ্গম'···
ডাক্তারের কথাগুলি কহি' শশধর
উদ্গম-আনন্দভরে হাসিল বিস্তর ।
শুনি' কথা শশব্যস্তে লাফাইয়া উঠি'
'দেখি' 'দেখি' রব তুলি' এল লোক ছুটি'···
উৎসুকে নিরস্ত করি' বৃদ্ধ শশধর
সুখভরে পুনরায় হাসিল বিস্তর—
কহিল : 'দেয়নি' দেখা, আসেনি' বাহিরে,
আসিছে দাঁতের সারি অতি ধীরে ধীরে ;
সময়ে দেখিতে পা'বে, দেখাইব ডেকে'—
দিবস গণিতে থাকো সবে আজ থেকে' ।

হাসিল সে বটে ; কিন্তু দুই চার দিন
না যেতেই হ'ল তার হাসাও কঠিন।
শৈশবে যখন ওঠে দুধের সে দাঁত
শিশুরা অসুস্থ হয়, কাঁদে দিনরাত।
বিধাতার নিয়মটি বুঝি নাকো মোটে—
দাঁত কেন অনিবার্য্য ব্যথা দিয়ে ওঠে !
মা ষষ্ঠীর শিশু পায় অল্পেই রেহাই ;
কিন্তু যদি বুড়োকালে দাঁত ওঠে, ভাই,
সে কি কাণ্ড ঘটে ! তার পোক্ত ঝুনো মাড়ি
ক্রমাগত ঠেলে', সেই দুর্ভেদ্যে বিদারি',
পর পর এলে দাঁত কি কঠিন হয়
সে যন্ত্রণা ! পরিমাণ বলিবার নয়।
অন্তর্হিত হ'ল তার উদ্গম-উল্লাস—
দৌড়াইল শশধর গলে নিতে ফাঁস ;
চীৎকারে দাপটে যেন ক্রুদ্ধ ব্যোমকেশ,
নিকটে ঘেঁষে না কেহ—করে' দেবে শেষ !
যে-কথা সে জানে বলে' কেহ জানিত না
সেই কথা তার মুখে গেল বহু শোনা—
সে কথা আসিলে কানে খাড়া হয় চুল ;
ভগবানে করিল সে সবংশে নির্ম্মূল
গা'ল দিয়া দিয়া।...তার পত্নী পতিব্রতা
কাঁদিয়া আকুল হ'ল শুনি' বিশ্রী কথা।

সে যা' হোক্, বহু কষ্ট দিয়া ক্রমে ক্রমে
দাঁত ওঠা শেষ হ'ল তিন চার দমে—
উঠে' এল সব ক'টি পাঁচ ছয় মাসে...
দেখা'য়ে দু'পাটি দাঁত শশধর হাসে ;
সুদৃশ্য সুদৃঢ় দাঁত পূর্ণ-আয়তন—
আসল জিনিস, ঠিক্ আগের মতন ;
প্রকৃতির এ খেয়াল হ'ল জানাজানি—
লোকে তা' দেখিতে এল ; অনেক বাখানি'
কাগজে বেরলো বার্ত্তা ; ছবি হ'ল ছাপা ;
গৌরবে উদ্গম-স্মৃতি পড়ে' গেল চাপা।

যদি করি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নির্ণয়
দেখা যাবে, দাঁত যায় হিতার্থে নিশ্চয় ;
যে-শিশু মায়ের বুকে করে স্তন্যপান—
দেন্ নাই দাঁত কিন্তু তারে ভগবান্,
কারণ, দাঁতের তার নাহি প্রয়োজন—
সে শুধু চুষিয়া খায়, করে না চর্ব্বণ।
ঘুরিছে নিয়মচক্র অব্যর্থ গতিতে—
ব্যতিক্রম ঘটে যদি হবে দণ্ড নিতে।
দুধ ছেড়ে' যা' খায় তা' ক্ষুদ্র দাঁতে চলে...
কঠিন কঠিন বস্তু পিষিয়া সবলে
খেতে হ'বে বলে' ওঠে আরো শক্ত দাঁত...

তারপর বৃদ্ধকালে ঘটে দন্তপাত—
আর তা' ওঠে না ; তার উদ্দেশ্য ইহাই :
চর্ব্ব্য ছেড়ে' লেহ্য পেয় খেয়ে থাকো, ভাই ;
সহজে হজম হবে, সুস্থ রবে দেহ—
নিয়ম লঙ্ঘন কভু করো যদি কেহ
শাস্তি পাবে হাতে হাতে। কিন্তু শশধর
ভুলে' গেল, পায়নি' সে নূতন উদর ;
দাঁতই নূতন ; কিন্তু অতি পুরাতন
যন্ত্রপাতি, যারা করে শরীরে পোষণ ;
ভুলে' গেল, এ কালে যা' না-থাকা নিয়ম—
পেয়ে তাহা বিধির সে মহা ব্যতিক্রম...
লেগে' গেল দাঁতের সে শক্তি পরীক্ষায়—
নির্ব্বিচারে শক্ত বস্তু বেছে' বেছে' খায়
চিবায়ে পাঁঠার হাড় গুঁড়ো করি' গেলে ;
বলে, 'খেতে পারি আমি হাতী মোষ পেলে'।
মানে না নিষেধ কারো—নিষেধ করিলে
চটে গিয়ে যা' তা' বলে ঢোক গিলে' গিলে'।

কিন্তু যেথা ঘুরিতেছে নিয়মের চাকা
সেখানে চলে না কভু জিদ্ ধরে' থাকা
তাহার বিরুদ্ধে ; কিন্তু হুঁশ তার কম—
ফুরাইল একদিন উত্তেজনা, দম্ ;
উদরে হ'ল না সহ্য, হ'ল আমাশয় ;
তিনদিনে শশ যেন সে-মানুষ নয়—
এমনি চেহারা হ'ল ; সে-দেহ বিরাট
নিল শয্যা ; শুকাইয়া হয়ে গেল কাঠ...
তারপর একদিন যবনিকাপাত—
কহিল সকলে : 'শশ নিয়ে গেল দাঁত ;
দাঁত তারে নিয়ে গেল। হিত ও অহিত
কিসে ঘটে, সে-বিচার করাই বিহিত'।"

চিত্রধর্মের গোড়ার কথা

শ্রীইন্দু রক্ষিত

২

নূতন করিয়া, চিত্রকলায় পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রচনা হইতে ভাবসংযোগের আদর্শকে প্রাধান্য দিয়া "নূতন পন্থার" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এদেশে কিছুকাল আগে। ভারতের শিল্প যে কখনই বাস্তবিকতার আদর্শকে গ্রহণ করে নাই ইহাই বারংবার বহু বিশেষজ্ঞের মারফৎ আমরা জানিয়াছিলাম। তাহা নির্ণীত সত্য বলিয়া গ্রহণ করাও গিয়াছিল। কড়া সমালোচক ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেবও ভারতীয় শিল্পে এই রকম কিছু বিশেষত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পারসিক শিল্প এদেশের ভাবধারার অনুপন্থী ছিল বলিয়া বেশ মিশিয়া যাইতে পারিলেও গান্ধারের হেলেনিক শিল্প এদেশের ধাতে সহে নাই। তাহাকে অচিরে বিদায় লইতে হইয়াছে।(১) ভারতের এই বিশেষত্বের দাবীকে অগ্রাহ্য করা বুঝি সম্ভব হয় নাই। সেই কারণে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে নজীর বা উদাহরণ সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যায়।

মূলতঃ বাস্তবের অনুকৃতিই শিল্পসৃষ্টির গোড়ার ইতিহাস তাহা স্বীকৃত হইয়াছে এই প্রবন্ধে একাধিকবার। বাস্তবের সাদৃশ্য রচনার অনুমোদন শাস্ত্রে মিলিবে তাহাও সত্য। অতএব বিচার্য হইবে অনুকৃতি ভিন্ন অপর কিছুরও অনুমোদন শাস্ত্র করে কিনা, অথবা তাহারও নির্দেশ দেয় কিনা। শিল্পশাস্ত্রে যে ষড়ঙ্গের উল্লেখ আছে তাহাতে সাদৃশ্য ছাড়াও আরও পাঁচটি গুণের সমমর্যাদা স্পষ্ট করিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাকে ঠেলিয়া ভারতীয় শিল্পও বাস্তববাদী—এই যুক্তির প্রতিষ্ঠা সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তিতে হইবার নহে। চিত্র এবং চিত্রকার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসভরা অনেক কল্পকথা, অনেক অলৌকিক গল্পগাথা এযুগেও বিরল নহে, সম্ভবতঃ সেযুগেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। রচনাকে সরস করিতে আখ্যান-ভাগকে জমকালো করিয়া তুলিবার আগ্রহে অনেক সময়ই একটু আধটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইত। নতুবা সেকালের চিত্রকলায় বাস্তব প্রতিচ্ছবির এমন কোনও নিদর্শন আমাদের চোখে পড়ে নাই বা বাস্তব সৃষ্টির এমন কোনও প্রচলিত পদ্ধতির সন্ধান আজও মিলে নাই যাহার বলে বুঝিয়া উঠিতে পারা চলে যে পটে অঙ্কিত শকুন্তলার সহিত যথার্থ আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার দৃষ্টিবিভ্রমকারী সাদৃশ্য সংঘটন সম্ভব ছিল এবং বিদূষকের নিকট সেই পটের শকুন্তলা—বিশেষ করিয়া দুষ্মন্তের মত অ্যামেচার আর্টিষ্টের অঙ্কিত শকুন্তলা আসল রক্তমাংসের শকুন্তলার হইয়া ঠিক মত proxy দিতে পারিয়াছিল। উত্তররামচরিতের উদাহরণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইবে। তথায় রামসীতার ভাবাভিভূত উক্তিই লক্ষ্মণ অঙ্কিত পটের বাস্তবিকতার যথেষ্ট প্রমাণ কি? সেই চিত্র কয়েকটি অতীত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর চিত্রিত প্রতিরূপ এবং তদ্দর্শনে দর্শকের মনে বাস্তবানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। তবুও সেই কারণেই সেই চিত্র যে বাস্তবের দৃষ্টিবিভ্রমকারী অনুকৃতি ছিল এমন মনে করিলে ভুল করাই হয়তো হইবে। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মনের একটি অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন "apperceptive mass" বা বা চিন্তাসমষ্টি। কোনও বস্তু শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ, এ বলিতে যাহা আমাদের নিকট কোনও মূল্য দাবী করে না বা যাহার মধ্যে কোনও সম্পূর্ণতা নাই, অতীতের কোনও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাই আবার বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া বসে। ইহা ছোট একটি সূত্র ধরিয়া অতীত জীবনের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া মনে নানা অনুভূতির সৃষ্টি করে। রামসীতার মনোরাজ্যে এই স্মৃতির আলোড়ন উপস্থিত করিতে উল্লিখিত পটে তুলির টানের সামান্য দু'একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। সেই ইঙ্গিতসূত্রাবলম্বনই অতীত ঘটনার সবটুকু স্মৃতি সর সর করিয়া নামাইয়া তাঁহাদের মানসপটে চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিত। এই স্মৃতির সহযোগিতা না ঘটিয়া থাকিলে সে যুগের চিত্রকলায় বাস্তবানুকৃতির যতটুকু পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা দ্বারা এতটা বিভ্রমবিহ্বলতা ঘটাইতে পারিত না—কেবল যাহারই আবেশে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া বসিতেন—"প্রত্যাবৃত্তঃ পুণরিব মম জানকী বিপ্রযোগঃ।"

অতএব সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য এ বিষয়ে প্রামাণিক নহে। আপাততঃ বলা চলিবে হয়তো যে উক্ত কাব্যোল্লিখিত চিত্র যথার্থ বাস্তবানুকৃতি না হউক বাস্তবিকতাই যে সেকালের আদর্শ ছিল উক্ত কাব্যাংশ তাহার কতক প্রমাণ সূচিত করে। কিন্তু আপাততঃ বলা চলিলেও তাহা শেষ অবধি গ্রাহ্য হইতে পারিবে না। এই কল্পিত আদর্শের অঙ্কিত নিদর্শন কোথায়? ভূরি ভূরি এমন নিদর্শন না হয় নাই মিলিল—যাহা আদর্শে পৌঁছিতে পারিয়াছিল কিন্তু এমন দু'একটি উদাহরণও ত পাওয়া দরকার যাহা অন্ততঃ আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছাইয়াছিল? অবশ্য সে চেষ্টাও হইয়াছে। অজন্তার উল্লেখ হইয়াছে, ওস্তাদ মনসুরের উল্লেখ হইয়াছে। মনসুর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বেশি বলিবার প্রয়োজন হয় না। শুধু অজন্তা। বিশেষজ্ঞ সমাজে এই রকম একটি সুরের গুঞ্জরণ হালে

---

(১) "The Persian style of painting, being congenial to Indian taste, readily admitted of certain modifications which may be reasonably regarded as improvements, whereas the ultimate models of the Gandhara sculptors having been the masterpieces of altic and Ionic art, alien in spirit to the art of India were usually susceptible of modifications by Indian craftsmen only in the direction of degradation...."—

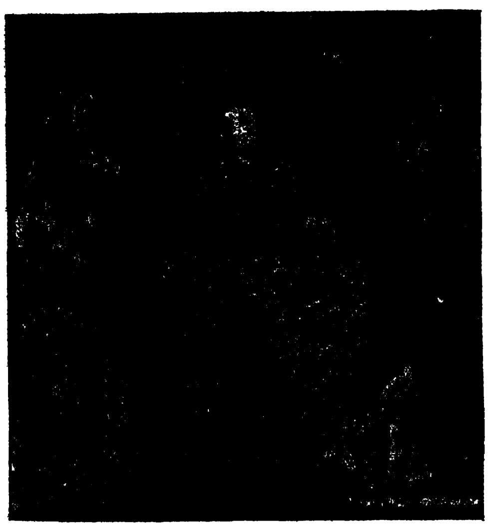
—History of Fine Art in India & Ceylon—V. Smith.

প্রকাশ পাইতেছিল যে অজন্তার চিত্রশিল্প বাস্তবধর্ম্মী এবং তাহাতে "লাইট এণ্ড শেড" রহিয়াছে। এই আধুনিকতম মন্তব্য সেই সুরেই তান লয় সহযোগে একফলি গাহনা। কিন্তু জুড়ির দল ঐক্যতান জুড়িবার আগে সুরটিকে যাচাই করিয়া দেখিতে চাহিবে তাহার তাল মাত্রা ঠিক আছে



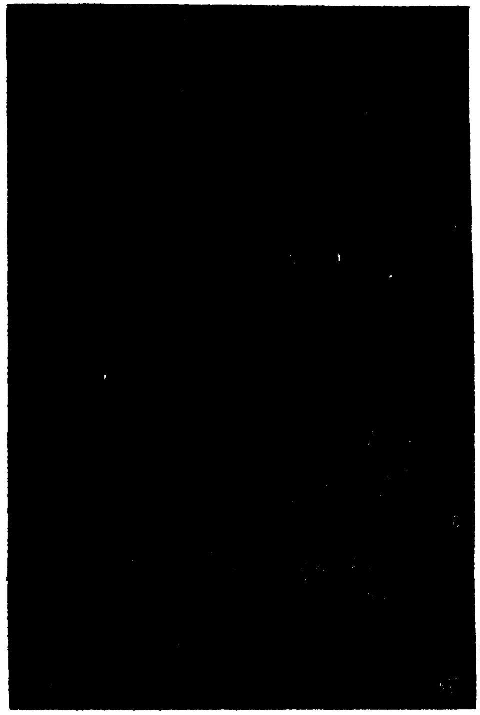
'বৃষ'—পল পটার

কিনা। যদি অজন্তা বাস্তবধর্ম্মীই হয় তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যে অজন্তাকে আমরা এতাবৎকাল গৌরবের সামগ্রী মনে করিয়া আসিয়াছি তাহার স্থান খুব উচ্চে নহে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দি হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক অবধি ধার্য হইয়াছে অজন্তার সৃষ্টিকাল। জগতের অন্যান্য অংশ

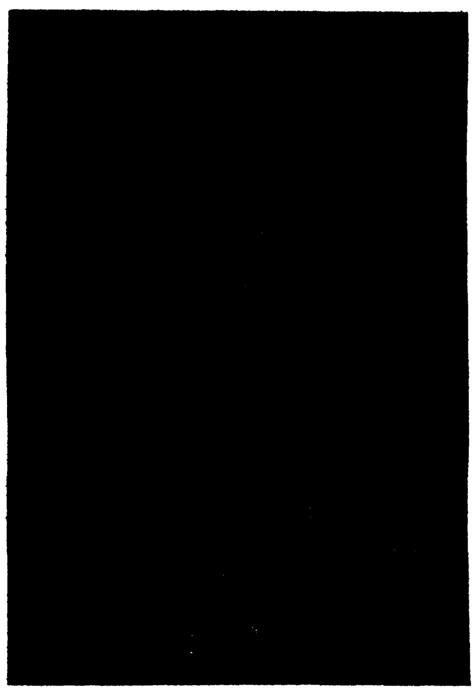


পম্পেই দেওয়াল চিত্র

এই সময়কালের মধ্যে শিল্পসৃষ্টি হইতে বিরত থাকে নাই। অধুনালুপ্ত পম্পেই নগরে প্রাপ্ত কিছু প্রাচীন চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পম্পেই নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকতার আদর্শে অজন্তা হইতে উচ্চে স্থানলাভ করিবার যোগ্য সন্দেহ

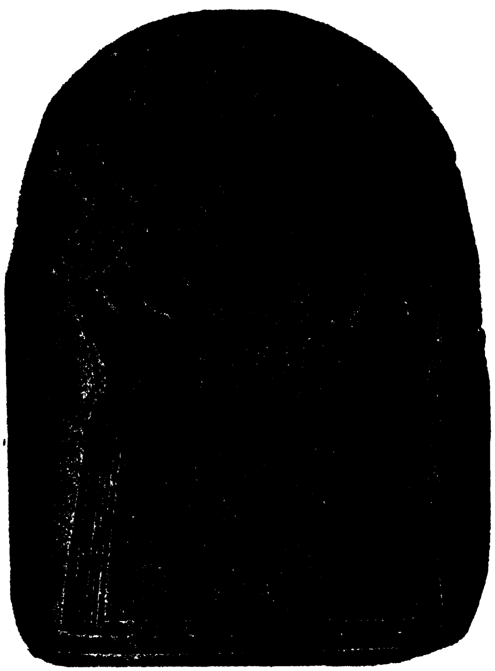


কাঠবিড়ালী শিকার—মনসুর



প্রসাধন—অজন্তা দেয়াল চিত্র

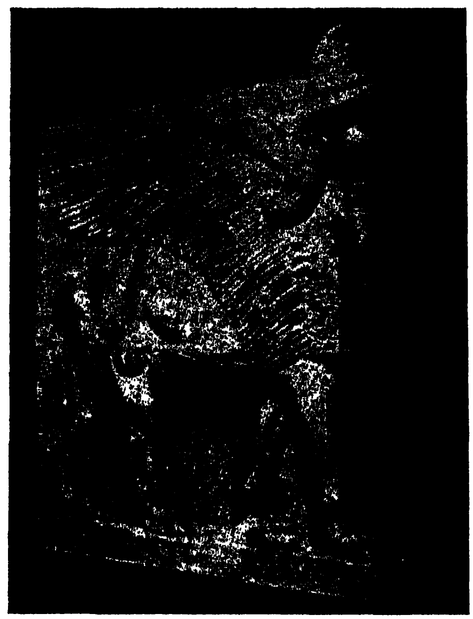
নাই। এমন কি খৃঃ পূঃ পঞ্চম (পোলেগ্নোতস্ ও তাহার শিষ্যবর্গের) ও *প্রথম শতকের গ্রীক* প্রাচীর-চিত্রও উচ্চতর আসন দাবী করিবে বাস্তবিকতার বিচারে। পোলিগ্নোতস্এর ছাত্র খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের মিকোন (Mikon) অঙ্কিত "হেরাক্লেস-এর বীরকীর্তি" (Exploits of Herakles) চিত্রে (মূলেত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা) অ্যানাটমি ড্রয়িং যেরূপ দেখা যায়, অজন্তা তাহা কল্পনা করিয়াছে কিনা সন্দেহ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দির পম্পেই, অষ্টিয়া (Ostia) চিত্র যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার **light & shade** ইঃ বাস্তবিকতার মাত্রা অজন্তার বহু উর্দ্ধে। অজন্তার মহিমা ওদিক দিয়া মিলিবে না। আমাদের দেশের সমালোচকের যদি **Ruskin**এর মত হাতে কলমে চিত্রবিদ্যার কিছু শিক্ষা থাকিত তাহা হইলে কেবল "**light & shade**" (?) দেখিয়াই অজন্তা'কে বাস্তবধর্মী



ব্যাবিলনীয় ফলক

বলিয়া গোল পাকাইয়া ফেলিতেন না। অজন্তা, সিগিরিয়া বাঘ প্রভৃতি চিত্রে যে তথাকথিত আলোছায়ার প্রয়োগ দেখা যায় তাহা পাশ্চাত্য শিল্পনীতিতে light & shade বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নহে। ইহা গঠনভঙ্গিমা, বিশেষ করিয়া দেহছন্দকে আরও একটু স্পষ্ট করিয়া তোলার উপায় মাত্র। যদি বলা যায় **light & shade**এর উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করিয়া দেখানো—তবে ইহাও বুঝিবার দরকার হইবে যে যেখানে হুবহু বাস্তব সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য সেখানে আলোছায়ার প্রয়োগ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার প্রয়োজন। অজন্তার শিল্পী যে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন, কেবল পম্পেই শিল্পীর পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই এমন বলিলে অন্যায় প্রস্তাব করা হইবে। দেখা যাইবে অজন্তার যে ড্রয়িং তাহা শিল্পীর সৃষ্টি যে বাস্তবিকতায় অনুগমনে প্রয়াসী তাহার বিন্দুমাত্রও নির্দেশ দেয় না। অজন্তার এই দোহাই বৃথাই পাড়া হইয়াছে। অজন্তার ১৯নং গুহার 'প্রসাধন' চিত্র কোন দিক দিয়া বাস্তবধর্মী? তাহার **light & shade**এর প্রয়োগ হইতে কি তাহা সূচিত হয়? তাহার ড্রয়িংই কি বাস্তবধর্মী? বিশেষ করিয়া পদযুগলকে নিরীক্ষণ করিলে "পদপল্লব" না বলিয়া বাস্তবের যথাযথ প্রকাশ বলিবার কোনও অবকাশ পাওয়া যাইবে কি?

স্বভাবানুকৃতিকে প্রাধান্য না দিয়া বা বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া চিত্র রচনার নীতি পশ্চিমে হালে দেখা দিলেও এদেশের মাটিতে উহা নূতন নহে। অনুকৃতিকে প্রধান অবলম্বন না করিয়া ভাব বা কতক পরিমানে কাল্পনিকতার অলঙ্কার সজ্জায় সজ্জিত করিয়া অনুভূত



আসিরীয় দেবতা

রসকে প্রকাশ করিবার রীতিই ছিল এদেশের। অন্ততঃ ধর্মবিদ্বেষ বহ্নিতে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিবার পূর্বপর্যন্ত তাহা বলবৎ ছিল। পশ্চিমে হালে যাহা দেখা দিয়াছে তাহার অনেকটাই যে দীর্ঘকালের বাস্তবোপাসনার প্রতিক্রিয়া এমন মনে করিলে ভুল করা হইবে না। অনেক এইরূপ "ism" বা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে মনের অরুচির ফলে, নূতন কিছু করিবার উন্মাদনায়। পশ্চিমের দেখাদেখি যাহা এদেশে চলিতে সুরু করিয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় ভাবধারার কোনও যোগাযোগ নাই তাহার পিছনে রহিয়াছে পশ্চিমকে অনুকরণ করিয়া অতি আধুনিক সাজিবার অধুনা পরিব্যাপ্ত অতি সাধারণ মনোবৃত্তি। শিল্পে এই অতি আধুনিকতার এদেশীয় অনুকরণকারিদের মধ্যে এমন অনেককে পাওয়া যাইবে যাঁহারা প্রাচ্যের এই বাস্তবাতিক্রমকারী ভাবপ্রবণতার রীতিকে বরাবর উপহাস ও কটুক্তিতে জর্জরিত করিয়া আসিয়াছিলেন; পরে

সাগর পারের হাওয়া গায়ে লাগিতে নিজেকে আধুনিক মনে করিতে পারায় আত্মপ্রসাদলাভের আশায় হঠাৎ বিদেশের এই বাস্তববর্জন নীতিকে নত হইয়া সেলাম ঠুকিয়াছেন; ফান্-গোখ্ (Van Gogh) গগাঁ (Gauguin) নাম গাহিয়া গগাইয়া উঠিয়াছেন। এতাবৎকালের পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকিতে হইলে অনুশীলনের শ্রম অনেকটা স্বীকার করিতে হয়। ভারতীয় বা নব্য ভারতীয় রীতিতেও যথার্থ শিল্প সৃষ্টি করিতে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয় ততোধিক। কিন্তু এই অতি আধুনিকতার সৃষ্টিতে বা তাহার নামের আড়ালে অনেক অক্ষমতা সাফল্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিবার স্ফূর্তি পায়। সেই নামের গুণে অনেক 'অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়' এবং 'বধিরও শুনে'।

নব্য ভারতীয় রীতি কোনও প্রতিক্রিয়াপ্রসূত উন্মাদনা নহে। ইহা যথার্থ জাগরণ। তবে দীর্ঘকালের অচৈতন্য ইহার পূর্ণ সজীবতা প্রাপ্তিতে কিছু বিঘ্ন ঘটাইতেছে। এদিক দিয়া সন্দেহ কতকটা ঠিকই। অহেতুক নহে। নব্য ভারতীয় রীতির অনুকরণকারদের অনেকে সত্যই যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। ইহাও ঠিক যে এই নামেরও আড়ালে অনেক অকৃতকর্মা আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক (?) ভারতীয় এই ভাবপ্রবণতার নীতি কোন ক্রমেই নিন্দার্হ নহে। শিল্প সৃষ্টি মারফৎ তাহা রস প্রকাশের প্রকৃষ্টতর পন্থা। বিভিন্ন পরদেশী রীতি-নীতির সংস্পর্শে আসিয়া ইহার কিঞ্চিৎ রূপ বদল হইতে পারে, হইবে এবং হইয়াছেও, কিন্তু ইহার মর্মে প্রোথিত ধর্মের ভিত্তি পাকা হইয়া রহিয়াছে। এই ভিত্তিকে টলাইবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজনের, তাহার ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য এত আবেদন নিবেদনের কোনও প্রয়োজন ঘটিয়াছে মনে হয় না।

আর একটি কথা বলিয়া এই নিবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। ক্রিটিকে ক্রিটিকে যে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার লইয়া তর্ক, তাহার মূল্যবোধ সাধারণ চিত্র দ্রষ্টার নিকট যেমন সামান্য, আসল চিত্রস্রষ্টার পক্ষেও তেমন সেই সূক্ষ্ম দার্শনিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার অবসর কম। স্রষ্টার কারবার মূলতঃ অনুভূতি লইয়া। অতএব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে তর্ক তাহা তাঁহাদের বিচার প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক হইলেও তাহা দ্বারা প্রকৃত রসসৃষ্টির সহায়তা সামান্যই হইয়া থাকে। নানা মুনির নানা মত। রসতত্ত্বকে ঘেরিয়া বহুবিধ যুক্তি জমা হইয়াছে। একটি স্বপক্ষীয় যুক্তি যাহা খুব সজীব মনে হইতেছে ঠিক তাহারই বিপরীত এমন যুক্তির অভাব হইবে না যাহা পূর্ব যুক্তিকে নির্জীব করিয়া দিবার শক্তি রাখে। এইরূপ তার্কিক আলোচনায় শুধু দেখা যায় আরও নূতন নূতন মত লইয়া নূতন নূতন মুনির আবির্ভাব হইতেছে। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী যুক্তি ও মত ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইয়া এমন স্তূপ গড়িতে দেখা যাইতেছে যে তাহার অন্তরালে পড়িয়া প্রকৃত রসসৃষ্টির সৌন্দর্য সুষমার অরুণিমা বুঝি দৃষ্টির অগোচরেই থাকিয়া যায়। যদি শিল্পের উন্নতি সাধন কাম্য হয়, তবে বিশেষজ্ঞকে বিশেষজ্ঞীয় ভাষায় সহযোগী বিশেষজ্ঞের কানে কিছু না শোনাইয়া সহজ স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি আসল শিল্পীর সাথে মুকাবালা করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞরা ইহা বুঝিবেন কি না বলিতে পারি না যে যেখানে তাঁহারা রসতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া তর্কের ইন্দ্রজাল বুনিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি আদায় করিতে থাকেন সেইখানে সেই জালের জটিলতায় জড়াইয়া শিল্পীর শিল্প সজীবতা হারায়, জড়ত্বপ্রাপ্ত হইবার সামিল হয়। যে সকল সৃষ্টি (?) কেবল নূতন কিছু করিবার উন্মাদনা হইতে উদ্ভূত বেপরোয়া ভাব-বিলাস তাহাদের বিষয় কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বহুবিধ মতের অস্তিত্বের পরেও এইরূপ ঘন ঘন, নিত্য নূতন হইতে নূতনতর মতসৃষ্টির ফলে অনেক সুকুমার প্রতিভা সন্দেহ সংশয়ের দোলায় প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারে না। পরিণামে তাহার গতি প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া আসে। রূপগুণহীনা-পরুষপ্রকৃতি চপলা স্ত্রী আব্রুতা রক্ষায় সর্বদা সচেতন না হইতে পারে; কিন্তু লাবণ্যময়ী ব্রীড়ানম্রমুখী পূর্ণনারীত্বগুণের অধিকারিণী উত্তমা সাধারণতই ভিরুস্বভাবা, স্বল্প কারণেই দ্বিধা সংকোচ তাহাকে ঘেরিবে; সরমভরে বারে বারেই সে অঞ্চল টানিয়া দিবে।

আস্ফালন কেঁদে মরে নিষ্ঠুর পাথরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আস্‌ছে ভাবনা ঠিক যেন আঁধারের ওপর
সরীসৃপের মত পদচারণা করে।
চোখে জল মোর,
কেমন করে চল্‌বে সংসার!
এসেছে দুর্দ্দিন,—মানুষের হাহাকার
যায়না ওরে!

বাঘের চোখের মত দিনগুলো আস্‌তে থাকে,
পশুর মতই মনে হয় রাত্রিটাকে;
আস্ফালন কেঁদে মরে নিষ্ঠুর পাথরে।
শোণিতের স্রোত দোলে ধ্বংসের উতরোলে,
ধূসর ক্লান্তির-ছায়া সব দিকে,—ভাব্‌ছি অভাগার কথা

স্বপ্নের বীজ যা বোনা হয়েছিল, তার কোথায় ফসল!
সব শিখে মন বোবা। কে যে অসুর আর কে যে দেবতা
বুঝ্‌তে পারা গেল না, কিছুই হোলো না সফল।

এ সভ্যতা পাইথনের মত ক্রূর, চেয়ে আছে মোর পানে,
একটি নিমেষ বৃন্তে যে ফুল ফুটেও শাশ্বত হ'তে চায়
সেপেনো সৈনিকের সঙীনের খোঁচা,
আমাকে চল্‌তে হবে পৃথিবীর বেদনার গানে
তবুও চল্‌তে গিয়ে ভাব্‌তে হচ্ছে বিশ্রাম কোথায়!
কোন্ পথ সোজা!

দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, বন্যা, ঝড়, যুদ্ধ মহামারী
আর কত সহ্য হয়, বড় ক্ষুধা, ছিঁড়ে যায় নাড়ী।

জীবন-পূজারী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত গীতাঞ্জলি থেকে একটা মূল সুর উঠ্‌ছে: 'দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।' তোমাকে চাইছি কেন? 'আমার প্রিয়তম তুমি', কারণ, তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে', কারণ

জানি হে তুমি মম জীবনে প্রিয়তম,
এমনজন আর নাহি যে তোমাসম।

কারণ তোমাকে যে পেয়েছে—সে আর কিছু চাইবে না:

'না থাকে তা'র মান অপমান
লজ্জা সরম ভয়,
এক্‌লা তুমি সমস্ত তার
বিশ্ব ভুবনময়।'

আমার জীবনে তুমি প্রেয়তম ব'লে তোমাকেই আমি চেয়ে আসছি:

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে,
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

তোমাকে—একমাত্র তোমাকেই যে আমি চাইছি—এই সত্যই জীবনের গভীরতম সত্য।

আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

একমাত্র তোমাকে আমি চাই ব'লেই যার মধ্যে তুমি নেই, তার মধ্যে আমার আনন্দও নেই:

কী ল'য়ে বা গর্ব্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।

আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ একমাত্র তোমার মধ্যে রয়েছে এবং সেই জন্যই সব কিছুর মধ্যে তোমাকেই খুঁজে খুঁজে ফিরছি—এই উপলব্ধি জীবনে যখন থেকে সত্য হয়ে উঠ্‌লো তখন থেকে ভগবানকে পাওয়ার জন্য অন্তরে জাগ্‌লো কান্না:

'এতদিন তো ছিল না মোর
কোন ব্যথা,
সর্ব্বঅঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিও না গো দিও না আর
ধূলায় শুতো।"

আমার জীবনে তুমি প্রেয়তম, তোমার তুল্য সম্পদ আর নেই···এই উপলব্ধির সঙ্গে আরো একটা উপলব্ধি এসেছে কবির অন্তরে, আর এই দ্বিতীয় উপলব্ধি হ'চ্ছে: জগত থেকে দূরে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মধ্যে উদাসীন হ'য়ে তুমি নেই···সমস্ত মানুষকে, সমস্ত প্রকৃতিকে প্রেমে ব্যাপ্ত ক'রে তুমি আছো।

এই নিখিল আকাশ ধরা
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হ'তে এই কথাটাও
বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।

প্রতিটী মুহূর্ত্তের পরে অসীমের চরণ চিহ্ন, আমার সমস্ত দুঃখে তিনি, সমস্ত সুখেও তিনি।

দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে যে দেয়
পরশমণি।

এই জগৎ তো মায়া নয়। 'জলে স্থলে দাও হে ধরা, কত আকার ল'য়ে।' এই পৃথিবী বিশ্বরূপের খেলা ঘর। তাঁর আনন্দ থেকে এই সৃষ্টি। সমস্ত রূপেরলীলায় অরূপেরই অভিব্যক্তি।

'পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।'

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে কোথাও অস্বীকার করেন নি, জগতকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেন নি। তাঁর কণ্ঠে জীবনের জয়গান।

যাবার দিনে এই কথাটি
ব'লে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।

আমি যে পৃথিবীতে এসেছি জন্মজন্মান্তরের খেয়া বেয়ে—তার কারণ আমার জীবনকে তুমি যে বাঁশি ক'রে বাজাতে চাও।

কত তীব্র তারে, তোমার
বীণা বাজাও হে।
শত ছিদ্র ক'রে জীবন
বাঁশি বাজাও হে।

আমার জীবনকে তুমি তোমার সুরের লীলাতে ভরিয়ে তুল্বে—তারই জন্য কোন্ আদি কাল হোতে আমাকে তুমি জীবনের স্রোতে ভাসিয়েছো।

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

আমার সঙ্গে তুমি যে মিলতে চাও!

আমার মিলন লাগি তুমি
আস্ছো কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্বে কোথায় ঢেকে।

আমাকে একদিকে যেমন তুমি চাইছো—আর একদিকে—তোমাকেও তেমনি আমি খুঁজে খুঁজে ফিরছি।

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আবার জনম হবে মোর।

তুমি যে রাজার রাজা হয়ে আমার জন্য কত মনোহরণ বেশে ফিরছো তার কারণ

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহে
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

আমার দেবতা যে আমার জীবনপাত্রে এত রস নিমেষে নিমেষে ঢেলে দিচ্ছেন তার কারণ আমার দেহপ্রাণকে আশ্রয় ক'রে তিনি আনন্দের অমৃত পান করতে চান। আমার ভিতর দিয়েই স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে আস্বাদন করবার জন্য ব্যাকুল।

আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা,
আমার হিয়ায় চল্ছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।' সেই জন্য আমার জীবনকে এমন করেই গড়তে হবে যেন আমার অনুভূতিতে তিনি সব সময়ের জন্যেই জেগে থাকেন, আমার এবং তাঁর মধ্যে এমন কোন আড়াল যেন না থাকে—যাতে আমার চেতনায় তাঁর অস্তিত্ব নিমেষের জন্যও বাধা পায়।

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে দেখ্তে পাচ্ছি: ভগবান্কে সত্য ব'লে মানতে গিয়ে জগৎকে কোথাও মায়া ব'লে তিনি স্বীকার করেননি। ভগবানকে তিনি বারম্বার মানুষের মধ্যেই স্বীকার করেছেন।

ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরিনে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াইনে তো তোমার সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে।

ভগবান সর্বহারাদের মাঝে 'রিক্ত ভূষণ দীন দরিদ্র সাজে' ফির্ছেন—এ সত্যকে একবার স্বীকার ক'রে নিলে আর্টের মধ্যে ডুবে থেকে কেবল কল্পনাকে নিয়ে বিলাস করা আর চলে না। তাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে:

এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর। ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে।

কবির চেতনার আলো সেখানে ছড়িয়ে গেছে যেখানে

'স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।'

চেতনায় যেখানে শিলাইদহের পদ্মার নিভৃত চর তার চখাচখীর কাকলি-কল্লোল নিয়ে একান্ত সত্য হ'য়ে ছিলো সেখানে যখন ম্লান মুখে শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী নিয়ে নত শির সর্ব্বহারা মানুষ এসে দাঁড়ালো তখন রুদ্রবীণায় নূতন সুরে ঝঙ্কার উঠ্লো:

'কী গাহিবে, কী শুনাবে, বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হ'তে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

কণ্ঠ বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করেছে:

রাখোরে ধ্যান থাক্রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি।
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝ'রে।

সমস্ত মানুষের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হওয়ার সত্যকে একবার স্বীকার করলে কর্ম্মযোগকে স্বীকার না ক'রে আর উপায় নেই। তখন ভগবান সাকার কি নিরাকার—এই তত্ত্ব নিয়ে আমরা ডুবে থাকতে পারি নে, কোনদিন বেগুন খেতে আছে এবং কোন দিন বেগুন খেতে নেই—এ সমস্তাও আমাদের মনকে বিচলিত করে না। চারিদিকের রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র মানুষগুলি তখন নিয়ত আমাদের চেতনায় অবস্থান করে। তখন আমরা শান্তি চাই নে—চাই জীবনের প্রাচুর্য্য, যার মধ্যে হাজার হাজার আধখানা মানুষ আস্ত মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন আমরা বলি :

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

তখন আমাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় :

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি'
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে॥
করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥ [নৈবেদ্য]

রক্তকরবীতে নন্দিনী বলেছে : 'শান্তি যদি পাই, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে।' একথা নন্দিনী বলতে পেরেছে—কারণ নন্দিনীর চিত্তকে বিচলিত করেছে যক্ষপুরীর আধমরা মানুষগুলি, যাদের মাংস-মজ্জা মন-প্রাণ ব'লে কিছু নেই—সব নিঃশেষ হয়েছে যক্ষপুরীর রাজার জন্য ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করতে গিয়ে। প্রেম তো মানুষকে কখনো শান্তির মধ্যে ভাবের ললিত ক্রোড়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেবে না—তাকে ধনুঃশর হাতে জীবনের কুরুক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবে শৃঙ্খলিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত জনসাধারণের অভিশপ্ত অস্তিত্বকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। সমস্ত রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে দুর্জ্জয় অভিমানের ডমরুধ্বনি রবীন্দ্র সাহিত্যের পর্ব্বে পর্ব্বে এর মূলে সেই দৃষ্টি যা ভগবানকে ডেকেছে—জগৎ থেকে দূরে নয়, এই জগতের 'সবার অধম দীনের হ'তে দীন-এর মধ্যে, বেণু বাজিয়ে তিনি আসছিলেন সে পথ সহসা যেখানে পরিসমাপ্ত হোলো সেখানে দেখলেন্

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান।

প্রকৃতির বুক থেকে মানুষের মধ্যে, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে, কল্পনা থেকে কঠিন নির্ম্মল সত্যে, ভাবের বিলাস থেকে কর্ম্মের জগতে এই যে নেমে আসা—এও এক রকমের জন্মান্তর।' এবার ফিরাও মোরে কবিতায় এই জন্মান্তরেরই কাহিনী। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় এই জন্মান্তরের ইতিহাস যেখানে ব্যক্ত হয়েছে সেখানে আছে :

সে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগতো কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্ম্মর,
বিরহী কোকিলের—
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হোতো মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগতো গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইসারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।
সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে—একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিলো
তারের পর নূতন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জন-সমুদ্রতীরে।
*   *   *   *   *
সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠ্‌লো সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো-বা নিতে হোলো ভেরী।
বলাকায় এই ভেরী নিনাদ।
তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নবনব
আঘাত খেয়ে অচল রবো।

এই পৃথিবীরই তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে। মানুষের মধ্যে কবির ডাক পড়েনি যতদিন, ততদিন হাতে তাঁর ছিলো একতারা। সেই একতারা বাজিয়ে

দিনগুলি তাঁর কেটে যেতো কোকিলের গান আর মৌমাছির গুঞ্জনের মধ্যে। মানুষের জগৎ তখনো অনেক দূরে। তার পরে এলো জীবনে আর এক অধ্যায়। পৃথিবীর যত দুঃখ, যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত অশ্রুজল—সমস্ত ভিড় করে এসে দাঁড়ালো কবির চেতনায়।

উঠেচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।

যেমন ভৃঙ্গের মতো কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরসপানে বিভোর ছিল—সে মন কোথায় হারিয়ে গেল। এলো নূতন মন, আর এই নূতন মনকে অধিকার ক'রে বসলো কঠিন বাস্তব। কোথায় গেল মুগ্ধ কোকিলের ডাক, আর কোথায় গেল আমের নবমুকুলের সৌগন্ধ্য! তৃণবিছানো সে পথ দিয়ে

বক্ষে আমার দুঃখে বাজে তোমার জয়-ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥

রজনীগন্ধার পালা শেষ হোলো। কবির কাছে ডাক এলো কঠিন বাস্তবের রঙ্গভূমিতে ভীষণ সুন্দরের পূজায় রক্ত জবার মালা গাঁথবার জন্য। 'মুক্ত করোহে সবার সঙ্গে'—এ প্রার্থনা যার হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে, ভগবানকে যে স্বীকার করেছে সর্ব্বহারা হৃত আসন অপমানিত মানুষের মধ্যে—বিধাতার সৃষ্টির পর্য্যঙ্কে কখনো তাকে শান্তিতে, আরামে জীবন-যাপন করতে দেবেন না, হাতে তরবারি দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেবেন জীবনের রণক্ষেত্রে অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য যে অন্যায় কোটী কোটী মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে…যে অন্যায় দুর্জ্জয় ঔদ্ধত্যের দ্বারা পৃথিবীকে নরকের সামিল ক'রে তুলেছে। তাই দেখি কবি ভগবানকে ভালোবেসে যা পেলেন তা মালা নয়, তা থালা নয়, তা গন্ধজলের ঝারিও নয়, তা ভীষণ তরবারি।

"অরুণ আলো জানলা বেয়ে পড়লো তোমার শয়নছেয়ে।
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে "কী পেলি তুই সারী।
এ নয় মালা- এ নয় থালা, গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি॥"

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

(১৪৪০—১৫৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ)

প্রথম পর্ব্ব

ক্ষুদ্রক চিত্রাঙ্কনে যে সকল শিল্পী কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয়ে তেমন কিছু জ্ঞাতব্য কথা প্রাচ্য লেখকদিগের উক্তি হইতে জানা যায় না। পাওয়া যায় শুধু গোটাকতক নাম আর অতিমাত্রায় প্রশংসার উচ্ছ্বাস। বায়জাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রশংসাবাণী কিন্তু প্রতীচ্য দেশীয় সমঝদারদিগের মতের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। ইঁহাদেরই একজন বলিয়াছেন "পুঁথি-চিত্রণ ও পুঁথিপ্রসাধন (illustration and illumination of Mss.) শিল্পের অনুশীলন প্রসঙ্গে আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ (পারসীক) শিল্পীর হাতের কাজের শুধু টুকরা-টাকরা নমুনার সহিত পরিচিত, তাঁহাদের শিল্পোত্তম বায়জাদেই পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে (১)।

ইতিবৃত্তকার খোয়ান্দামীর—(Khwandamir) তাঁহার হবিব্-উস্-সিয়ার নামক পুস্তকে বলিয়াছেন "অদ্ভুতকর্ম্মা বায়জাদ সত্যসত্যই সে যুগে লোকের মনে বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। জগতের নরপতিগণের উপচিকীর্ষা তাঁহার উপর বর্ষিত হইত এবং ইস্‌লামীয় শাসকবর্গ তাঁহার প্রতি অসীম যত্নপ্রকাশে অবহিত হইতেন।" (২)

(১) Col. V. Goloubiew, Cevants propas to Ars Asiatica Vol XIII p. 6.

শিল্পীর বেলায় বংশানুক্রম অপেক্ষা গুরুপরম্পরার বিচারই অধিক প্রয়োজনীয়, কিন্তু বংশের দিকটাও একবার দেখিতে হয়। "মেনাকিব ই-পুনেরভেরণ" (চিত্রশিল্পীদিগের প্রশংসাবাদ) নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার আলি এফেন্দি লিখিয়াছেন যে বায়জাদ যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে পর পর বহু শিল্পীর উদ্ভব হইয়াছিল। শিল্পীর বংশে শিল্পদক্ষতা বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া থাকে। বায়জাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা যে অনেকাংশে উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বায়জাদ ছিলেন তাব্রিজের বিখ্যাত ওস্তাদ পীর সৈয়দ আহাম্মদের শিষ্য। আরও দুইজন পূর্ব্বাচার্য্যের নাম জানা গিয়াছে। একজন পীর

(২) সম্রাট বাবর বায়জাদের শিল্পের খবর রাখিতেন এবং তাঁহার চিত্রাদির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন মুখমণ্ডল অঙ্কনকালে বায়জাদ সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন নাই, কেবল শ্মশ্রুসমাবৃত মুখই তিনি ভাল করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন।"

সৈয়দ আহাম্মদের গুরু, ওস্তাদ জাহাঙ্গীর এবং অপর জন আচার্য্য জাহাঙ্গীরেরই পিতৃদেব ওস্তাদগুণ (১), যিনি ইরাণীয় শৈলীর প্রবর্ত্তক রূপে পরিচিত।

১৪৪২ খৃঃ অব্দে লিখিত (২) এবং একক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত *নিজামীর খামশা গ্রন্থের একখানি পুঁথিতে (Add. 25900) অন্তর্গত* অজ্ঞাতকুলশীল কয়েকখানি চিত্রের সহিত বায়জাদের নামাঙ্কিত চিত্রগুলির যে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়—তাহা নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণিত করে যে বায়জাদ একলাই একবারে বড় ওস্তাদ বনিয়া উঠেন নাই। গৌরীশঙ্কর মহাশৃঙ্গ হিমাচলের অন্যান্য শিখরগুলিকে উচ্চতায় সহজেই অতিক্রম করিয়াছে বটে কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ভৌগোলিক বৈজ্ঞানিকের নিকট নাম-না-জানা অপর শৈলগুলির গঠনবৈশিষ্ট্য প্রভৃতির অনুশীলন নিতান্ত অপরিহার্য্য। শিল্পোত্তমের সার্থকতার দিক দিয়া শিল্পীর শ্রেয়স্কর পারিপার্শ্বিকের সন্ধান এই সকল চিত্র হইতেই অনুমান করা যায়।



১নং চিত্র

বায়জাদের হাত পাকিতে এবং ওস্তাদী কলমে চিত্র লিখিয়া তাঁহার শক্তিমান ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটাইতে তাঁহার যৌবনসীমা প্রায় অতিক্রম করিয়াছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ণশক্তি যে পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে প্রকাশমান হয় নাই—এইরূপই অনুমিত হইয়াছে।

বায়জাদের শিল্পীজীবন তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) হীরাট শিল্পকেন্দ্রে সুলতান হোসেন বাইকারার রাজত্বকালে—খৃঃ অঃ ১৪৬৮ হইতে ১৫০৬।

(২) উক্তকেন্দ্রেই হীরাটের সিংহাসনে বলপূর্ব্বক অধিষ্ঠিত মহম্মদ খাঁ শৈবানির অধীনে—খৃঃ অঃ ১৫০৭ হইতে ১৫১০।

(৩) পশ্চিম পারস্যে তাব্রিজ কেন্দ্রে সাহ ইস্‌মাইল ও সাহ তামাস্পের শিল্পশালার প্রধান কর্ম্মচারী রূপে—খৃঃ ১৫২১ হইতে ১৫৩৪।

বায়জাদ কিছুকাল চিত্রকর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে সাহরুখ্ প্রতিষ্ঠিত পুস্তকপরিষদের (Academy of Booksএর) সহিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সাহরুখের মৃত্যু ঘটে ১৪৪৬, মতান্তরে ১৪৪৭ খৃঃ অব্দে। বায়জাদ তখন ছয় সাত বৎসরের বালকমাত্র।



২নং চিত্র

পুস্তক পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সুলতান হোসেন বাইকারার সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হোসেন বাইকারা (১৪৮৭-১৫০৬) ছিলেন তৈমুরলঙ্গের ওমান সেখ নামক এক পুত্রের প্রপৌত্র। মুদ্রাযন্ত্র তখন প্রচলিত হয় নাই। হস্তলিখিত পুঁথিগুলি চিত্রণের জন্য উৎকৃষ্ট শিল্পীই নিয়োজিত হইতেন—বিশেষ করিয়া এরূপ একটি সুবিখ্যাত রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে।

আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ অব্দে বায়জাদ সুলতান হোসেনের উজির, একাধারে কবি ও চিত্রকর বলিয়া বিখ্যাত, মীর আলিশীরকে পৃষ্ঠপোষক-রূপে প্রাপ্ত হন। সুলতান হোসেন নিজেও সাহিত্য-প্রেমিক ও রসজ্ঞ সমঝ্‌দার বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাহনামার নূতন সংস্করণ তাঁহারই উৎসাহে ও সহায়তায় সুসম্পূর্ণ হয়। এরূপ একজন প্রিয় চিকীর্ষু অন্নদাতা বায়জাদের ভাগ্যে পূর্ব্বে আর মিলে নাই। ইউসুফ জুলেখা

---

(১) কোনও কোনও গ্রন্থে এ নামটি মূকার্থবাচক 'গুঙ্গ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু ম'সিয়ে সাকিসিয়ান সযত্নে এ ভ্রমের নিরসন করিয়াছেন।

(২) ১৪৪২ খৃঃ অব্দে লিখিত হইলেও পুঁথিখানির চিত্রগুলি যে পরে আঁকা হইয়াছিল এইরূপই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কাব্যরচয়িতা বনামধন্ত কবি জামি বায়জাদের সমকালীন ব্যক্তি এবং উভয়ে যে পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলেন এরূপ অনুমানও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

মেশেদ নগরের বিখ্যাত লিপিকার সুলতান আলি লিখিত একখানি পুঁথিতে বায়জাদ যে চিত্র সংযোগ করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিভিন্ন সমসাময়িক চিত্রিত পুঁথির যে সকল ক্ষুদ্রক চিত্র ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া বায়জাদের শিল্পরীতি আলোচিত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই যে সন্দেহের বহির্ভূত একথা বলা চলে না। এমন কি তাঁহার নামাঙ্কিত ক্ষুদ্রক চিত্রগুলিও তাঁহার স্বহস্তে অঙ্কিত কিনা তাহা লইয়া কয়েক ক্ষেত্রেই সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়াছে। ১৪৪২ খৃঃ অব্দের "খাম্‌সা" পুঁথি ব্যতীত আরও যে কয়খানি পুঁথির চিত্র বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) চেষ্টার বিয়েটী (Chester Beatty) সংগ্রহের অন্তর্গত সেখ সাদী বিরচিত একখানি "বোস্তাঁ" পুঁথির সকল চিত্রগুলিই বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

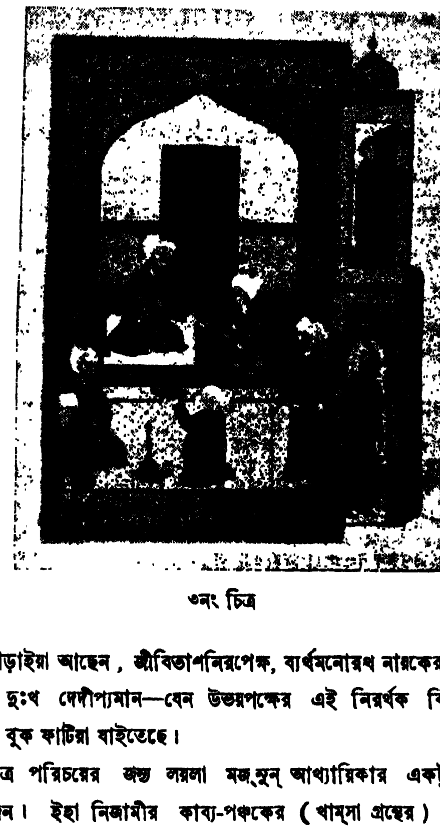
(২) কায়রোর রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি বোস্তাঁ পুঁথির চিত্রও তাঁহারই তুলিকাপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত। এ উক্তি শুধু পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের(১) মতানুযায়ী নয়, আধুনিক সুপণ্ডিত জনৈক পারসীক লেখকেরও(২) ইহাই অভিমত।

(৩) নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম নামক গ্রন্থাগারের সচিত্র "হফ্‌ত পাইকার" পুঁথির চিত্রগুলি বায়জাদের প্রথম বয়সের চিত্র শিল্পের নমুনা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

(৪) বষ্টন মিউজিয়মে রক্ষিত সারফদ্দিন আলি ইয়েজ্‌দি রচিত "জাফর নামা" নামক তৈমুরলঙ্গের সচিত্র জীবনচরিত বিষয়ক পুঁথিখানিতে যে দ্বাদশসংখ্যক চিত্র আছে তাহার সবকয়খানিই যে বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত এ মত একজন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য কোবিদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে(৩)। পূর্ব্বোক্ত পারসীক সমালোচক মোহসিন্ মোঘদামও ইহারই সহিত একমত(৪)।

আমরা যেভাবে পুঁথিগুলির উল্লেখ করিয়াছি সেই পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াই তদন্তর্গত চিত্রগুলির আলোচনা করিব।

পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের "খামশা পুঁথির (Add. 25900) সব কয়খানি চিত্রেই চিত্রকরের নাম লেখা আছে, আর যদি নাও থাকিত তাহা হইলে ওস্তাদ শিল্পীর "কলম" চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইত না। চিত্রগুলির মধ্যে যে তিনখানি বায়জাদের নামাঙ্কিত তাহার মধ্যে একখানি লয়লা মজ্‌নুন্ কাহিনীর(১)। নায়ক ও নায়িকার আপন আপন গোষ্ঠী-ভুক্ত দুই উষ্ট্রারোহীদলের যুদ্ধ-সংঘাতের ইহা একখানি অপূর্ব্ব চিত্র। উভয়পক্ষের বিবদমান যোদ্ধ্‌গণই যে শুধু পরস্পরের প্রতি নির্ম্মমভাবে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত তাহা নহে, তাহাদের বাহন উষ্ট্রগুলিও রোষ-কষায়িত লোচনে প্রতিপক্ষের উষ্ট্রদিগের প্রতি চাহিয়া সবেগে দন্তঘর্ষণ করিতেছে। ক্রুদ্ধ চাহনির চটক বাড়িয়াছে উষ্ট্রগুলির নয়নমণি বেষ্টন করিয়া সোণালী রঙের ব্যবহারে। চিত্রপটের বর্ণাভাস বেশ নয়ন স্নিগ্ধকর, কোথাও চোখে বাধে না। মজ্‌নুন্ এই নির্ম্মম যুদ্ধ ব্যাপারে অবশ্যম্ভাবী নরহত্যা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া



৩নং চিত্র

দূরে দাঁড়াইয়া আছেন, স্ত্রীবিত্তাশনিরপেক্ষ, ব্যর্থমনোরথ নায়কের আননে দুঃসহ দুঃখ দেদীপ্যমান—যেন উভয়পক্ষের এই নিরর্থক বিপৎপাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

চিত্র পরিচয়ের জন্য লয়লা মজ্‌নুন্ আখ্যায়িকার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। ইহা নিজামীর কাব্য-পঞ্চকের (খাম্‌সা গ্রন্থের) অন্যতম। নায়ক ও নায়িকা বেদুইন আরবদিগের বিভিন্ন কৌমে (tribeএ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় কৌমে সদ্ভাব ছিল না। ইহাই যে মিলনের একমাত্র অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইয়াছিল তাহা নহে। কবি বলিয়াছেন প্রকৃত প্রণয়ের পথ বিঘ্নসঙ্কুল না হইয়া যায় না। এক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই। যে প্রেমের সূচনা হয় বাল্যাবস্থায়, বিদ্যালয় গৃহে, মজ্‌নুনের প্রণয়াতিরেকে উন্মত্ততার জন্য পরিণয়ে তাহার পরিসমাপ্তি হইল না। প্রণয়ীর চোখ ছাড়া করার জন্য লায়লীকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে লুকাইয়া রাখা হইল। মজ্‌নুন্ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন বটে

---

(১) M. Charles Huart, Les calligraphes et les miniaturistes Mussalman, p. 326 et seq.

(২) M. Mohsin Moghadam in Cahior Person, Messages d'orient, p. 125.

(৩) V. Goloubiew in Ars Asiatica, Vol XIII, p. 7.

(৪) Cahior Persan, loc. cit.

(১) এই তিনখানি চিত্রই বায়জাদের প্রথম বয়সের অঙ্কন পদ্ধতির নমুনা স্বরূপ।

কিন্তু তাঁহাকে সত্বর সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইতে হইল। মজ্নুন্ দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা সালিম আমিরী ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত দাম্ভিক ব্যক্তি। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তিনি লায়লীর পিতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে দম্ভপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। লায়লীর পিতা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে এরূপ এক উন্মাদের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের কথা তিনি বিবেচনা করিতে অক্ষম, যদি কায়েস্ আরোগ্য লাভ করে তবেই ইহা উত্থাপন করা যাইতে পারে। বলিয়া রাখি, মজ্নুনের প্রকৃত নাম কায়েস্। প্রেমোন্মাদ বলিয়া উন্মাদবাচক মজ্নুন শব্দ তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহার পর অনেক কিছু ঘটিল, মজ্নুন জনহীন প্রদেশে পলায়ন করিলেন। অবশেষে, অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে পাওয়া গেল নিতান্ত অবসন্ন অবস্থায়। এবার তিনি তীর্থ-যাত্রীরূপে মক্কাসরীফে প্রেরিত হইলেন কিন্তু সেখানে গিয়া যে প্রণয় এখন তাঁহার পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে তাহা হইতে মুক্তিলাভের প্রার্থনা না করিয়া বর চাহিলেন যে তাঁহার এ অপার্থিব চিরন্তন প্রণয় যেন আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যেন উহা কদাচ ক্ষুণ্ণ না হয়। বিস্তারিতরূপে এ কাহিনী বিবৃত করা এ স্থানে সম্ভব নয়। মজ্নুন লোকালয় ছাড়িয়া মরু মধ্যে চলিয়া গেলেন। চিত্রী আঁকিয়াছেন বন্যজন্তুপরিবৃত তাঁহার এ মরুবাসের চিত্র। এ চিত্রের কথা পরে বলিতেছি। এই মরু মধ্যেই তিনি প্রত্যাশিতভাবে মিত্রলাভ করিলেন, এখানেই সেখ নওফল নামক একজন হিতার্থীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এক লায়লী ব্যতীত মজ্নুনের প্রার্থনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বন্ধুকে জানাইলেন লায়লীকে লাভ না করিতে পারিলে তিনি আর বাঁচিবেন না। ইহার ফল হইল উল্টা রকমের। নওফল বলপ্রয়োগ করিয়া লায়লীর পিতাকে কন্যাদান করিতে বাধ্য করিবেন স্থির করিলেন। চিত্রকর দেখাইয়াছেন এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া ব্যর্থকাম হতাশাচ্ছন্ন মজ্নুন্ দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। যুদ্ধে নওফল জয়লাভ করিলেন বটে কিন্তু লায়লীর পিতা বরং কন্যার প্রাণনাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন তথাপি এ বিবাহে মত দিলেন না। লয়লার ইবন্ সালাম্ নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইল কিন্তু একনিষ্ঠ লায়লী পবিত্র প্রণয়ের ব্যভিচার ঘটিতে দিলেন না; ইবন্ সালাম্ আয়ানের ন্যায় নামেই স্বামী হইয়া রহিলেন। স্বামী বর্ত্তমানে লায়লীর সহিত মজনুনের আর চাক্ষুষ হয় নাই। তিনি একবার এক দরবেশের কৃপায় সঙ্কেত স্থলে উপনীত হইয়া দূর হইতে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন মাত্র। ইবন্ সালামের মৃত্যু ঘটিলে উভয়ের একবার মিলন হইয়াছিল কিন্তু এ মিলনানন্দের তীব্রতা মজ্নুন্ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। এক সময়ে যে মজ্নুন্ শুধু প্রণয়িনীর দর্শনলাভ মানসে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ছল অবলম্বন করিয়া এক বৃদ্ধার উন্মাদ পুত্র পরিচয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় লায়লীর বস্ত্রাবাসের দ্বারদেশে নীত হইয়াছিলেন (১) আজ তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ক্ষণেকের তরে লয়লাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আবার পরক্ষণেই প্রণয়ের সে হেমশৃঙ্খলের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং উন্মাদের ন্যায় বিকট চিৎকার করিয়া মরু মধ্যে পলায়ন করিলেন। ইহার পর আশাহত লয়লা দেহত্যাগ করিলে উপবাসক্লিষ্ট, ক্ষিপ্ত দেহ, শোকে মুহ্যমান মজ্নুন্ প্রিয়ার সমাধিক্ষেত্রেই মৃত্যু বরণ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন (২)।

(১) পারসিক চিত্রে এ ঘটনার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে।

(২) The poems of Nizami, Laurence Binyon p 13 ff

(ক্রমশঃ)

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২) জড়-দেহে বিদেহীর আবির্ভাব

পৃথিবীর পরপারে মানবের দৃষ্টির অতীত সূক্ষ্ম-জগৎ হ'তে বিদেহী বারংবার এখানে প্রকাশ হ'য়েছেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল বহুরূপে। সূক্ষ্ম অর্থাৎ ছায়া-দেহে, তাঁদের আবির্ভাব বহুজন-বিদিত। স্থূল মূর্ত্তিতে প্রকাশ তত সাধারণ না হ'লেও, সংখ্যায় নগণ্য নয়। আমাদের পূর্ব্বগামী পিতৃগণ আপন-আপন পরিত্যক্ত পার্থিব দেহের সম্পূর্ণ অনুরূপ স্থূল-দেহে,—রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জায় সাময়িক পুনর্গঠিত শরীর অবলম্বন ক'রে, সজীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত ক'রে—আবার কিছুক্ষণের জন্য এ পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের কণ্ঠ হতে অতীতের সেই পরিচিত স্বর বাহির হ'য়েছে; পরিত্যক্ত আত্মজনের প্রতি পুরাতন দিনেরই মত স্নেহ-প্রীতি-অনুরাগ প্রকাশ ক'রে, আশীর্ব্বাণী বিতরণ ক'রে তাঁরা এখান হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

বিদেহীর ছায়ামূর্ত্তি ও স্থূলমূর্ত্তি উভয়ের প্রকাশ মধ্যে প্রভেদ এই যে—সাধারণতঃ ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হয় অনাহূতভাবে। আমরা তাঁদের স্মরণ করি বা না করি, ছায়াময় বিদেহী-মূর্ত্তি আপনিই প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। কিন্তু স্থূল-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হবার জন্য তাঁদের কোন না কোন প্রকারে আবাহন করা অপরিহার্য্য। আবাহনের অনুষ্ঠান অবশ্য সর্ব্ব দেশে একই প্রকার নয়।

ভারতে সাধু ও সন্ন্যাসীরা যোগ-শক্তি প্রভাবে আমাদের পরলোকগত পরিজনকে আহ্বান ক'রে এনে স্থূলদেহে এখানে উপস্থিত করেছেন। পৌরাণিক বা প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করবার প্রয়োজন নাই।

অতি আধুনিক ও একান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ দু-টি ঘটনা মাত্র এখানে বর্ণনা ক'রব।

(১) ভারতের বহু-শ্রদ্ধাস্পদ যোগীপুরুষ স্বামীজি ভোলানন্দ গিরি তাঁর আশ্রিত সন্তান সুপ্রসিদ্ধ গণিত-বিদ্যা-বিশারদ সোমেশচন্দ্র বসুকে দীক্ষা দানের সময় বসু মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তাঁর স্বর্গতা পত্নীকে দীক্ষা-গৃহে সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত স্থূল-দেহে উপস্থিত ক'রে উভয়কে একত্রে দীক্ষা-দান করেছিলেন—এ কথা স্বামীজির সম্প্রতি প্রকাশিত জীবনীতে তাঁর এক সন্ন্যাসী-শিষ্য প্রকাশ করেছেন।১

(২) জ্যাকোলিও ছিলেন এক আধুনিক ফরাসী বিচারক। দাক্ষিণাত্যবাসী এক সন্ন্যাসী শুধু মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রার্থনা ক'রে জ্যাকোলিওর আপন বাস-গৃহে ধূমায়মান অঙ্গারের সন্নিকটে এক পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত বিদেহী ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিকে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—মূর্ত্তির ললাটে ছিল তিলক, কণ্ঠে উপবীত। বিচারপতি জ্যাকোলিও সেই মূর্ত্তির অনুমতি গ্রহণ ক'রে তার করস্পর্শে জীবিত দেহেরই উত্তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তার সঙ্গে বাক্যালাপও করেছিলেন।২

পাশ্চাত্যেও বিদেহীর স্থূল-দেহে আবির্ভাবের জন্য কিছু অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোন যোগী বা সাধুর সম্বন্ধ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, মার্কিন আদি নানা স্থানে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক—কেহ কেহ আপনার নিজস্ব গবেষণা-গৃহেই,—বিদেহীকে স্থূল-দেহে আবির্ভাবের জন্য আবাহন ক'রেছেন এবং শক্তিশালী মিডিয়ামের সহায়তায় অনেক স্থলেই আত্মীয় ও অনাত্মীয় বহু বিদেহীজনের স্থূল-মূর্ত্তিতে আবির্ভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ গেলে দীর্ঘ দিন গবেষণা ও পরীক্ষার পর এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—যখন তাঁরা এই ভাবে আবির্ভূত হন তাঁদের জ্যোতির্ম্ময় মুখে প্রকাশ পায় জীবিত জনের সকল লক্ষণ। শান্ত ও অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যে তাঁরা পরীক্ষকদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন; এ সকল পরীক্ষার গুরুত্ব যে কত, তাও যেন তাঁরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন।৩

সুধী-সমাজে ও বিজ্ঞান-রাজ্যে যাঁদের নাম জগতে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেছে, এমনি কয়েকজনের এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ ক'রব।

(১) সুপ্রসিদ্ধ ইটালিয়ান্ পণ্ডিত সীজার্ লমব্রোসো চক্রে তাঁর বিদেহী জননীর স্থূল-দেহে আবির্ভাব দর্শন ক'রে বলেছেন,—আমার লোকান্তরিতা জননীর অনুরূপ একটি নীতি-দীর্ঘ মূর্ত্তি, অবগুণ্ঠিত মুখে যবনিকার নিকট হ'তে অগ্রসর হ'য়ে এসে ক্ষীণ স্বরে আমায় কয়েকটি কথা বলেছিল। কথাগুলি বেশ শুনতে না পেয়ে আকুল আগ্রহে তার পুনরুক্তি চেয়েছিলাম। মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত ক'রে, "সীজার্, পুত্র আমার,"—এই কথা উচ্চারণ ক'রে তিনি আমার মুখ-চুম্বন করলেন।

তারপর মিডিয়াম ইউসেপিয়ার পরবর্ত্তী বিভিন্ন চক্রে অন্ততঃ বিংশতি বার জননীর মূর্ত্তি প্রকাশ হ'তে দেখেছি; তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'য়েছে—"পুত্র আমার, রত্ন আমার" (My son, my treasure). প্রত্যেকবারই তিনি আমার ললাট ও ওষ্ঠ চুম্বন করেছিলেন।৪

(২) জগৎ-বিখ্যাত সুধী কনান্ ডয়েল বলেছেন,—মিডিয়াম্ কুমারী বেসিনেট্ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সম্মুখে আমি আমার স্বর্গতা মাতৃদেবী ও বিদেহী ভাগিনেয় অস্কার্ হর্নাংকে সম্পূর্ণ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'তে দেখেছি; মূর্ত্তিগুলি এত স্পষ্ট যে আমার জননী-মূর্ত্তির ললাটে বলি-রেখা ও অস্কারের মুখে প্রত্যেকটি চিহ্ন গণনা করা যায়। মিডিয়াম্ ইভান্ পাউয়েলের উপস্থিতিতে আমার পরলোকগত পুত্র প্রকাশ হ'য়ে তার চির-পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রেছে। আমার বিদেহী ভ্রাতা সেনাপতি ডয়েল্ এই মিডিয়ামকে অবলম্বন করেই প্রকাশ হয়েছিলেন এবং তাঁর অসুস্থা পত্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে এক ডেনীশ্ চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভ্রাতা অবশেষে বলেছিলেন—"সত্যই আমি ইনস্ বিদেহী ইনস্, তোমার সহোদর।"৫

(৩) জার্ম্মানীর বিশিষ্ট সুধী ব্যারণ্ নট্‌জিং তাঁর আপন গবেষণা-গৃহে বিভিন্ন মিডিয়ামের সহায়তায় এই ব্যাপারে কয়েক বৎসর অশ্রান্ত সাধনা করেছেন। আধুনিকতম কয়েকটি ক্যামেরা অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সেই গৃহে স্থাপিত হয়েছিল,—যেন পরীক্ষা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। ফ্রান্সের এক বিদুষী মহিলা—শ্রীমতী বিশন্ এই গবেষণায় নট্‌জিং-এর সহকর্ম্মী ছিলেন।

এই সকল গবেষণা পরিচালনার মধ্যভাগে শ্রীমতী বিশনের স্বামী, ফরাসী নাট্যকার আলেক্‌জান্দ্রে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তের কয়েক মাস মধ্যেই আলেক্‌জান্দ্রে একদিন পূর্ণ সুগঠিত দেহে সেই গবেষণা-গৃহে প্রকাশ হন। নট্‌জিং ও শ্রীমতী বিশন্ উভয়েই সেই মূর্ত্তিকে অভ্রান্তভাবে চিনেছিলেন। নট্‌জিং আপন হাতে পাঁচটি পৃথক্ ক্যামেরায় সেই মূর্ত্তির নয়খানি আলোক চিত্র গ্রহণ করেন। বিশন্ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি এই সকল আলোক চিত্র যে আলেকজান্দ্রের, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হন।৬

বিদেহী আলেকজান্দ্রের সুঠিত মূর্ত্তি

কত আকুলতা, কত ঐকান্তিকতা নিয়ে বিদেহী কখনো কখনো প্রিয় সুহৃদ্‌গণের কাছে এইভাবে উপস্থিত হন, সে সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব ঘটনা এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

---

১. ধ্রুবানন্দ গিরি—শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত। পৃঃ ১৩৯-১৪০

২. Jaccoliot-Occault Science in India, p. 266-270

৩. *Lombroso*—After Death—What, p. 68-69.

৪. Not infrequently the faces were self-luminous. The faces were alive; they looked keenly and fixedly at the experimenters. Their looks were grave, calm and dignified. They seemed conscious of the importance of the matter.

Gelev—Clairvoyance and Materialisation, p. 252.

৫. *Sir Wm Merchant*—Survival, p. 104-105.

৬. *Notsing*—Phenomena of Materialisation, p. 167

(৪) সার্ভিয়ার ভূতপূর্ব রাজদূত—এস, সি, মিয়াটোভিচ্‌ (যিনি বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ড, রুমেনিয়া, তুর্ক প্রভৃতি রাজ-সকাশে আপন দেশের প্রতিনিধি ছিলেন) তাঁর একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণন ক'রে পরম বিস্ময়ে বলেছেন—(মিডিয়াম শ্রীমতী রীটের চক্রে সেদিন) যে মূর্ত্তিটি প্রকাশ হয়েছিল সে কোন ছায়া-দেহ বা অপরিস্ফুট মূর্ত্তি নয়; সে আমার পরলোকগত বন্ধু ষ্টেড্‌ (W. T. Stead) স্বয়ং—অভিন্ন ও পরিপূর্ণ ভাবেও *সাধারণ পরিচ্ছদে প্রকাশিত।* (*"...Not the spirit,* but the very person of my friend William T. Stead...in his usual walking costume)। আমার সাথী, ক্রোশিয়ার বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার ডাঃ হিঙ্কোভিচ্‌, বন্ধু ষ্টেডের মাত্র আলোক চিত্রের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনিও সেই মূর্ত্তি প্রকাশ হতেই বল্‌লেন—"এ যে মিষ্টার্‌ ষ্টেড্‌।"

তারপর আমরা তিনজনেই এই কথাগুলি সুস্পষ্ট শুনেছিলাম,—"হাঁ, আমি ষ্টেড্‌, উইলিয়াম্‌ টি, ষ্টেড্‌। বন্ধু মিয়াটোভিচ্‌! মৃত্যুর পরেও যে মানবের অস্তিত্ব থাকে, তার অবিসম্বাদী প্রমাণস্বরূপ আজ নিজেই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। যখন পৃথিবীতে ছিলাম, এ সম্বন্ধে আপনার পূর্ণ বিশ্বাস জাগ্রত করতে সক্ষম হই নি। আজ আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়; আজ আমায় দর্শন ক'রে আপনি অসংশয়ে পরিজ্ঞাত হ'ন—মৃত্যুর পরেও মানবের জীবন একান্ত সত্য" ।৭

ছায়া মূর্ত্তিতেই হোক্‌, অথবা সাময়িক পুনর্গঠিত স্থূল-দেহেই হোক্‌, পৃথিবীতে বিদেহীর আত্মপ্রকাশ তার আপন ইচ্ছাধীন। কখনো শত আবাহনেও আমরা তাঁদের দর্শন পাই না, কখনো বা স্মরণ মাত্রে বা অল্পক্ষণ মধ্যেই যাঁকে স্মরণ করি তাঁর (অথবা অপর কোন বিদেহী জনের) প্রকাশ হ'তে দেখা যায়।

ইহলোকে এসে প্রকাশমান হবার জন্য বিদেহীর কিছু অনুশীলন আবশ্যক। বিনায়াসে তাঁদের পক্ষে এখানে প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয় না ।৮

আমাদের এ পৃথিবীর উপাদান হ'ল স্থূলবস্তু। পর্ব্বত, নদী, বায়ু সকলই স্থূল-বস্তু ভিন্ন সূক্ষ্ম নয়; প্রত্যেকেরই উপাদান স্থূল মিশ্রিত পদার্থ।

এ পৃথিবীর বহির্ভাগে বিদেহী যেখানে নিবাস করেন—সে এক সূক্ষ্ম জগৎ; তাই সে স্থান আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। সেই সূক্ষ্ম জগতের উপাদান কেবলমাত্র সূক্ষ্ম-বস্তু, যাকে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান নাম দিয়েছে —ইথার্‌। এই ইথার্‌ আমাদের এ পৃথিবীতেও পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, সকল স্থূল বস্তুকে বেষ্টন ক'রে এবং তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান সংগ্রহ ক'রে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে।

পৃথিবীর অতীত পারলৌকিক জগৎ, অন্ততঃ তার বিস্তৃত এক অংশ গঠিত হ'য়েছে শুধু ইথার্‌ বস্তু দিয়ে, যার সঙ্গে স্থূলের কোন সম্বন্ধ নাই। *সে জগতের অধিবাসীর দেহের* উপাদানও *এই ইথার্‌*।৯ *সেই সূক্ষ্ম দেহে ঐ সূক্ষ্ম জগতের* নব আবেষ্টনে বিদেহী পূর্ণজ্ঞানে বিচরণ করেন ।১০ তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রকৃতি ও স্মৃতি সবই সেখানে অব্যাহত থাকে ।১১ পরিত্যক্ত স্বজনের প্রতি প্রীতির বন্ধন অটুট থাকে; তাই এ জগতে তাঁদের মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয় ।১২

যে ইথার্‌ বস্তু এই বিরাট বিশ্বের সুদূরতম নক্ষত্রেও বিস্তৃত হ'য়ে আছে,১৩ *যে ইথার্‌ ইহ ও পর-জগৎ* উভয় স্থানেই সমভাবে পরিব্যাপ্ত১৪ তারই প্রসাদে বিদেহীর আবার এ জগতে সাময়িক প্রকাশ কার্য্যতঃ সম্ভব হয়।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বলেছেন—মানবের পারলৌকিক দেহ তার পার্থিব দেহেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ-দর্শন ।১৫ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ।১৬

কিন্তু বিদেহীর শরীর সূক্ষ্মবস্তু নির্ম্মিত, তাই সচরাচর আমাদের দৃষ্টির গোচর নয়। যদি বিদেহী তাঁর সেই সূক্ষ্মদেহে পার্থিব পরমাণুর

---

৭. Usb. *Moore*—The voices. p. 5-6.

৮. There is a certain effort and a certain shyness in manifesting. *Stead*—After Death p. 133.

৯. These bodies must be made either of ether, or something equally as intangible to us in our present condition.

Lodge—Raymond, p. 319.

১০. We continue to exist as seperate thinking units in the etheric world as much as we do to-day, but with new surroundings.

Findlay—On the Edge of the Etheric.

১১. We find that personality and charactar and memory do survive.

১২. *Lodge*—Phantom Walls. p. 99.

১৩. This ether is what interpenetrates all matter; it extends to the farthest star, there is no break in its continuity.

Lodge—Phantom Walls. p. 51.

১৪. The ether of space can now be taken as the one great unifying link between the world of matter and that of spiris.

Findley—On the Edge of the Etperic. p. 39.

১৫. যাদৃশ তস্য মানুষং রূপং আসীৎ পুরাতন।
কিঞ্চিৎ তস্য তু সাদৃশ্যং তত্রাপি প্রতিপদ্যতে ॥

গরুড় পুরাণ—প্রেতখণ্ড

১৬. Our etheric body is in every respect a duplicate of our physical body.

Findley—On the Edge of the Etheric. p. 168.

একটা ক্ষীণ আচ্ছাদন সাময়িক আকর্ষণ করতে সক্ষম হন, তবে এ জগতে ক্ষীণ ছায়ামূর্ত্তিতে তাঁর প্রকাশ সহজেই সংঘটিত হয়।১৭

বিদেহীর স্থুল-দেহে পৃথিবীতে প্রকাশের প্রক্রিয়া কিন্তু অন্যরূপ। জীবিত সকল প্রাণী-দেহের মূলবস্তু হ'ল প্রটোপ্লাসম্ (protoplasm) যাকে বাংলা ভাষায় বলা হয়—জীবনমূল বা জৈবসামগ্রী। জীবের জীবনী-শক্তি, কর্ম্মতৎপরতা দেহের গঠন—সকলেরই ভিত্তি হ'ল—প্রটোপ্লাসম্। এই বস্তু প্রত্যেক প্রাণী-দেহে সুরক্ষিত থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, এমন কোন কোন মানুষ আছেন যাঁকে চক্রকক্ষে মোহিত (hypnotiza) করা হ'লে, তাঁর দেহের বিভিন্ন স্থান (নাসিকা, মুখ, অঙ্গুলিপ্রান্ত প্রভৃতি) হ'তে এই জৈব-সামগ্রী ধূমের মত বা মেঘের মত নানা অদ্ভুদ আকারে নির্গত হ'তে আরম্ভ হয়। এই বস্তুর নাম-করণ হয়েছে—এক্টোপ্লাসম১৮ extraded protoplasm)

মিডিয়ামের দেহ হ'তে নিঃসৃত হবার পর অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই গঠনহীন ধূম-সদৃশ পদার্থটি ঘনীভূত হ'তে আরম্ভ হয় এবং তা হ'তে প্রায় তৎক্ষণাৎ গঠিত হয়ে ওঠে একটি পূর্ণ নরদেহ বা নরদেহের কোন অংশ—হাত, পা, মুখ ইত্যাদি।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ গেলে বলেছেন—এই সকল সদ্য-গঠিত মূর্ত্তির উদ্ভব হয় প্রধানতঃ মিডিয়ামের দেহ হ'তে নিঃসারিত মূল-পদার্থ হ'তে।১৯ প্রকাশ হবার পর এই সকল মূর্ত্তি জীবিত মানবের মতই ক্রিয়াশীল হয়। কোন প্রভেদ থাকে না। আবার অল্পক্ষণ পরেই সেগুলি কোনও অপূর্ব্ব উপায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।২০

এগুলি যে সত্যই বাহ্যিক মূর্ত্তি—কল্পনা বা অবাস্তব নয়, ভ্রান্ত-দৃষ্টি প্রসূত নয়, তার প্রমাণ এই যে বহু জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক,—ক্রুক্স্ লজ্, রীচে, মর্শেলী, নট্‌জিং, ক্রফোর্ড, ওকোরউইজ্, গেলে প্রভৃতি,—পরীক্ষা গৃহে এগুলি স্বচক্ষে গঠিত হ'তে দেখেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকল মূর্ত্তির আলোক-চিত্রও গ্রহণ করেছেন।২১ অনেকেই এই সকল মূর্ত্তির সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, তাদের স্পর্শও লাভ করেছেন এবং অন্যের অজ্ঞাত অতীতের অনেক ঘনিষ্ঠ বার্ত্তাও তাঁদের মুখ হ'তে শুনেছেন।

জীব তার স্থূল দেহের প্রত্যেকটি কণা এ পৃথিবীর পঞ্চভূতকে প্রত্যর্পণ করে পরপারে যাত্রা করে। কি ভাবে আবার সেই দেহকেই পুনর্গঠন করে তার এখানে আবির্ভাব সম্ভব, এ এক দুজ্ঞেয় রহস্য। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক চার্লস রীচে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—এই ব্যাপার বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, কিন্তু তা হ'লেও যে বস্তু সত্য তাকে ত অস্বীকার করবার উপায় কিছু নাই।২২

১৭. When he coats the surface of his body with a film of etheric matter just dense enough to reflect light and become visible, he appears with the same features as when living in his physical body. *Cooper*—Methods of Psychic Development. p. 32.

১৮. Ectoplasm or extruded protoplasm—a temporarily extraneous portion of the organism...It is claimed that by means of this strange material actual materialisation may occur so as to display and bring into the region of matter forms which had previously in the ether.

Lodge—Why I Believe in Personal Immortality. p. 58-59.

১৯. The genesis of materialisation is now well-known : the materialised organs and tissues are produced from a primary substance which proceeds mainly from the medium...

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 213.

২০. The disappearance of materialized forms is as curious as their formation.

Geley—Clairvoyance and Materialisation. p. 189.

২১. The objective reality of these forms is proved by photographs taken by flashlight.

Geley—Ditto. p. 176.

২২. We are dealing with facts as yet inexplicable, and await further elucidation. But there is no reason to deny a fact because it is inexplicable.

Richet—Thirty Years of Psychical Research. p. 476.

(ক্রমশঃ)

রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রাণের পরশ যেথায় পেয়েছি, সেথায় ছুটিয়া যাই,—
কেহ আসে কাছে, দূরে যায় কত—তোমারে ত ভুলি নাই !
প্রেম-চন্দন মাখিয়া অঙ্গে হস্তে বাঁধিব রাখী
মিলিত-হিয়ার গীতি-অনুভব—আঁখিতে মিলায়ে আঁখি।
সারা বরষের গ্লানি মুছে যাক 'বিজয়ার' মধুছন্দে
বাধা-বিপত্তি ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটী মিলনের বাহু বন্ধে।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

চতুর্থ প্রকরণ—অমাত্যোৎপত্তি

অষ্টম অধ্যায়

মূল :—সহাধ্যায়িগণকে (রাজা) অমাত্য করিবেন, যেহেতু (তাঁহাদিগের) শুচিতা ও সামর্থ্য (তাঁহার পূর্ব্ব) দৃষ্ট—ইহাই ভারদ্বাজ (বলিয়া থাকেন)। তাঁহারা ইঁহার বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকেন।

সঙ্কেত :···অমাত্য—রাজ-সহায়; তাঁহাদিগের উৎপত্তি—করণ, স্থাপন, নিয়োগ—এই প্রকরণের বর্ণনীয় বিষয়। বিদ্যাবৃদ্ধ-সংযোগী ও ইন্দ্রিয়জয়ী রাজাও সহায় ব্যতিরিক্ত রাজ্য-পালনে অসমর্থ—এই কারণে সহায়-নিয়োগের প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে (গঃ শাঃ)।

অমাত্যপদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য কাঁহারা—এ সম্বন্ধে ভরদ্বাজাদি সপ্ত আচার্য্যের সপ্তপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রথমে প্রদত্ত হইতেছে। প্রথমে ভারদ্বাজ-সিদ্ধান্ত। দৃষ্টশৌচসামর্থ্যত্বাৎ (মূল) শৌচ—হৃদয়শুদ্ধি (গঃ শাঃ)। ভাবশুদ্ধি honesty (SH); purity of the mind, সামর্থ্য—কার্য্য-নৈপুণ্য (গঃ শাঃ); capacity (SH)। একসঙ্গে অধ্যয়নকালে সহাধ্যায়ীর মানসিক শুচিতা ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশ্বাস্ত—বিশ্বাসযোগ্য। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ ভ্রমাত্মক না হইলেও মূলানুগ নহে।—'as (their) purity (of mind) and ability is known......since they become the object of his confidence'—এরূপ হওয়া উচিত। 'Bhardvaja is perhaps identical with the Kaninka Bharadvaja (i.e., Kaninka, the son of Bharadvaja) who is quoted as an anthority further on (v. 5). Kaninka occurs in the Mahabharata (I. 140) as Kanika, the learned minister of king Dhritarashtra and reputed author of certain maxims on the subject of Polity, which agrees closely with the teachings of Kautilya'—Jolly.

মূল :—না—ইহাই বিশালাক্ষ (বলেন)। একসঙ্গে ক্রীড়া করার ফলে ইঁহাকে (তাঁহারা) অবজ্ঞা করেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা ইঁহার সহিত গোপনীয় সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট তাঁহাদিগকে অমাত্য করিবেন—যেহেতু (তাঁহাদিগের) শীল ব্যসন সমান; (রাজা আমাদিগের) মর্ম্মজ্ঞ এই ভয়ে তাঁহারা উঁহার (প্রতি) অপরাধ করেন না।

সঙ্কেত :—বিশালাক্ষ :—*'The large-eyed', i.e.,* th god Shiva, is in the Mahabharata (XII. 59 mentioned as the author of the Vaishalaksham in which the original treatise of Brahman on th three objects of man, etc., was reduced to 1000 chapters'—Jolly. গুহ্যসধর্ম্মাণঃ—গোপন ধর্ম্ম যাঁহাদিগের সমান গণপতিশাস্ত্রী এস্থলে 'ধর্ম্ম' বলিতে 'শীলচ্যুতি' (দুষ্কর্ম—পরদার-গ্রহণাদি বুঝিয়াছেন; "whose secrets, possessed of in common are well known to him" (SH)—শেষ অংশটুকু (are we known ইত্যাদি) নিষ্প্রয়োজন। সমানশীলব্যসনত্বাৎ—শীল হইতে ব্যসন (চ্যুতি)—ইহাই গণপতি শাস্ত্রীর সম্মত অর্থ। শ্যামশাস্ত্রীর মতে —শীল ও ব্যসন সমান—এই অর্থ—"possessed of habits an defects in common with the king." মর্ম্মজ্ঞভয়াৎ—মর্ম্মজ্ঞ ভয় হেতু; রাজা আমাদিগের মর্ম্ম (গুপ্ত দোষ) জানেন—এই ভয় আ বলিয়া—out of fear that (the king) knows (our secrets; "lest he would letray their secrets" (SH)—ই অনুবাদই নহে। অপরাধ-রাজবিরোধিতা; never hurt him (SH —ইহাও অনুবাদ-পদ-বাচ্য নহে; do not offend him বলাই উচিত।

মূল :—এই দোষ সাধারণ—ইহাই পরাশর (বলেন) তাঁহাদিগেরও মর্ম্মজ্ঞতা ভয়ে (রাজা) কৃত ও অকৃতের অনুবর্ত করিতে পারেন।

সঙ্কেত :—দোষ—দুঃশীলত্ব (গঃ শাঃ); কিন্তু দোষ অর্থে এখা দুঃশীলতা বুঝিলে চলিবে না। বিশালাক্ষ বলিয়াছেন—রাজা গুহ্যসধ বিশিষ্টগণের মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া তাঁহারা রাজার নিকট অপরাধ করি চাহিবেন না। ইহার উত্তরে পরাশর বলিলেন—না, এ দোষ অ পক্ষেও দেওয়া যায়। রাজাও জানেন যে এই অমাত্যগণ আমার মর্ম্মজ্ঞ অতএব তিনি তাঁহাদিগের সুষ্ঠু কৃত ও অসুষ্ঠু কৃত সকল প্রকার কর্ম্মে সমভাবে অনুমোদন করিয়া থাকেন, Fear (SH); flaw বলাই উচিত তেবাং মর্ম্মজ্ঞভয়াৎ—তাঁহারা আমার (রাজার) গোপনীয় মর্ম্ম জানেন—এই ভয়ে। কৃতাকৃতানি—অসুষ্ঠুকৃতানি (গঃ শাঃ); কি কৃতাকৃত অর্থে কেবল অসুষ্ঠুকৃত নহে; কৃত—সুষ্ঠুকৃত; অকৃত—অসুষ্ঠুক good and bad acts (SH)। অনুবর্ত্তেত—অনুবর্ত্তন (অনুমোদ করার সম্ভাবনা (রাজার পক্ষে)—সম্ভাবনায় লিঙ্‌। May foll (SH); may approve বলা উচিত।

মূল :—নরাধিপ যতগুলি লোকের নিকট গোপনীয় (ক

বলিয়া থাকেন, সেই কর্ম্ম-দ্বারা অবশভাবে তত্তগুলি (লোকের) বশীভূত হইয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—এটি সংগ্রহ-শ্লোক। গুহ্য—গোপনীয় কথা—নিজের শীল-ভ্রংশ (গঃ শাঃ); secrets (SH)। বলিয়া থাকেন—প্রকাশ করেন—discloses. অবশ :—অধীর : (গঃ শাঃ); in all humility (SH); 'অবশ'—অর্থে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও যেন দৈবপ্রেরিত হইয়া অবশভাবে ("কৰিষ্যস্যবশো হি তৎ"—গীতা)। অতএব, পরাশর-মতে গুপ্ত-সধর্ম্মাকে মন্ত্রী করা উচিত নহে।

মূল :—যাঁহারা ইঁহার প্রাণঘাতী আপৎসমূহে উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অমাত্য করিবেন। যেহেতু (তাঁহাদিগের) অনুরাগ-দৃষ্ট-(পূর্ব্ব)।

সঙ্কেত :—এ সম্বন্ধে পরাশরের সিদ্ধান্ত এইবার বলা হইতেছে। অনুগৃহ্নীয়ুঃ—এ স্থলে সম্ভাবনায় লিঙ্, নহে—অতীতকালের অর্থ—অনুগ্রহ প্রদর্শন (উপকার) করিয়াছেন। প্রাণাবাধযুক্তাসু—প্রাণের বাধা (অর্থাৎ প্রাণহানি) ঘটিতে পারে এরূপ সম্ভাবনাযুক্ত।

মূল :—না—ইহাই (বলেন) পিশুন। ইহা ভক্তি—বুদ্ধির গুণ নহে। গণনা-বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত যাঁহারা যথাদিষ্ট অর্থ অথবা ততোধিক করিতে পারেন, তাহাদিগকে অমাত্য করিবেন। কারণ, (তাঁহাদিগের) গুণ দৃষ্ট (পূর্ব্ব)।

সঙ্কেত :—পিশুন—নারদ (গঃ শাঃ)। প্রাণহানিকর বিপদে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া রাজাকে রক্ষা করায় প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—উহাতে বুদ্ধিনৈপুণ্যের পরিচয় কোথায়? অথচ অমাত্য হইতে হইলে বুদ্ধিগুণের একান্ত প্রয়োজন। সংখ্যাতার্থেষু কর্ম্মসু—যে সকল কর্ম্মে পরিগণিত দ্রব্য-সংগ্রহ হয় (গঃ শাঃ); financial matters। কেবল রাজস্ব-বিষয়ক কর্ম্ম নহে—ধরুন যে সকল কর্ম্মে পূর্ব্ব হইতে একটা আনুমানিক হিসাব (estimate) করা হয়—এত টাকা আয় হইতে পারে—কিংবা এতসংখ্যক অমুক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে। যথাদিষ্টং সবিশেষং বা কুর্য্যুঃ—"ক্লৃপ্তসংখ্যানূনং ক্লৃপ্তসংখ্যাধিকসংখ্যং বা ভাবয়েয়ুঃ" (গঃ শাঃ)—খুব সম্ভবতঃ শাস্ত্রী মহাশয় 'অন্যূন' বুঝাইতে চাহিয়াছেন—অন্যথা কোন অর্থ হয় না। যতসংখ্যক অর্থ বা দ্রব্য আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া estimate করা হইয়াছিল, ঠিক ততসংখ্যক অর্থ-দ্রব্যাদি বা তাহার অধিক আয় যাঁহারা দেখাইতে পারেন, তাঁহারাই অমাত্য-পদলাভের যোগ্য—ইহাই পিশুনের মত; "Show as much as or more than the fixed revenue" (SH); estimated বলিলে ভাল হইত। "Parashara and Pishuna, 'the informer' i,e., Narada, are also well-known sages of the great epic, and two renowned law-books are attributed to them"—Jolly.

মূল :—না—ইহাই কৌণপদন্ত (বলেন)। যেহেতু ইহারা অন্ত অমাত্যগুণ-দ্বারা যুক্ত নহেন। পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত (মন্ত্রি-বংশধর)গণকেই অমাত্য করিবেন। যেহেতু (তাঁহাদিগের) অপদান দৃষ্ট-(পূর্ব্ব): ইনি অপকার করিলেও তাঁহারা ইঁহাকে ত্যাগ করেন না—যেহেতু (তাঁহারা ইঁহার) সগন্ধ। এমন কি—অমানুষদিগের মধ্যেও ইহা দৃষ্ট হয় যে গোগণ অসগন্ধ গোগণকে অতিক্রম করিয়া সগন্ধগণমধ্যে অবস্থান করে।

সঙ্কেত :—অন্ত গুণ—বিশ্বাস্যত্ব, অনুরক্তত্ব ইত্যাদি (গঃ শাঃ)। পিতৃপৈতামহান্ (মূল)—যে সকল অমাত্যের পিতা-পিতামহ ইত্যাদিও অমাত্য ছিলেন—মন্ত্রিবংশসম্ভূত। অপদান—পূর্ব্ববৃত্ত (গঃ শাঃ); যাঁহাদিগের অপদান (অর্থাৎ পূর্ব্ববৃত্ত) প্রত্যক্ষীকৃত—অর্থাৎ যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের গুণাবলী পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও যে নিশ্চয়ই গুণবান্ হইবেন—এরূপ অনুমান করা বিশেষ অনুচিত হয় না।—ইহাই গণপতি শাস্ত্রীর মত। শ্যামশাস্ত্রী অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—"such persons, in virtue of their knowledge of past events."...অপদান—পরিশুদ্ধাচরণ (আপ্তে); আপ্তে মহোদয়ের মতে—অপদান ও অবদান প্রায় সমার্থক। অবদান—কর্ম্ম, বৃত্ত (আচরণ)—অমরকোষ। দৃষ্টাপদানত্বাৎ—যাঁহাদিগের পরিশুদ্ধাচরণ দৃষ্টপূর্ব্ব। পিতৃ-পিতামহগণের পরিশুদ্ধ আচরণ দৃষ্টপূর্ব্ব হইলে তাঁহাদিগের বংশধরগণও যে শুদ্ধাচরণ করিবেন—এরূপ আশা করা অসঙ্গত হয় না; এই কারণে পিতৃপিতামহ-ক্রমাগত মন্ত্রিবংশধরগণকেই মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করা উচিত। অপচরন্তম্—অপকার করিতেছেন যিনি তাঁহাকে—অপকারী রাজাকে। সগন্ধ—সজাতীয়, আত্মীয়, সম্বন্ধী (গঃ শাঃ)—সর্ব্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি—শাকুন্তলে পঞ্চমঅঙ্ক। অমানুষ—মানুষ-ভিন্ন, পশু প্রভৃতি, dumb animals (S H)—মূলানুগ নহে।

মূল :—না—ইহাই (বলেন) বাতব্যাধি। যেহেতু তাঁহারা ইঁহার সকল সম্যগ্‌রূপে গ্রহণপূর্ব্বক স্বামিবৎ প্রচরণ করিয়া থাকেন। অতএব, নীতিবিদ্ নবীনগণকে অমাত্য করিবেন; আর নবীনগণ তাঁহাকে যমস্থানীয় দণ্ডধর মনে করিয়া অপরাধ করেন না।

সঙ্কেত :—বাতব্যাধি—উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রী (গঃ শাঃ); শুধু মন্ত্রী নহেন—শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্তও ছিলেন উদ্ধব। "Vatavyadhi is another nickname of unknown meaning (wind-disease?)"—Jolly. Wind-disease নহে—Rheumatism, gout—বলা ভাল। হয়ত উদ্ধব বাতরোগগ্রস্ত ছিলেন। সর্ব্বমবগৃহ্য—সকল বিভব আয়ত্ত করিয়া (গঃ শাঃ); শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—"having acquired complete dominion over the king;" having controlled his all—বলা উচিত। প্রচরন্তি—প্রচার করিয়া থাকেন—স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেন—play themselves as the king (SH)—অনুবাদ নহে। এই সকল স্থানের অনুবাদে শ্যামশাস্ত্রী মূলের কোন মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়া চলেন নাই—অত্যন্ত স্বাধীনভাবে চলিয়াছেন। নবীনগণ—বয়সে নবীন না হইতেও পারেন—নবপরিচিত; পূর্ব্ব-সম্বন্ধ-

রহিত (গঃ শাঃ)। বমস্থানে দণ্ডধরং মন্ত্রমামাঃ—রাজাকে যমস্থানীয় (যমতুল্য) উগ্রদণ্ডধারী মনে করিয়া ; শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ যথেষ্ট— who will regard the king as the real sceptre-b arer.

মূল :—না—ইহাই (বলেন) বাহুদন্তী-পুত্র। শাস্ত্রবিৎ (অথচ) অদৃষ্টকর্ম্মার (পক্ষে) কর্ম্মসমূহে অবসাদ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অভিজন প্রজ্ঞা শৌচ শৌর্য্য-অনুরাগ যুক্ত জনগণকে অমাত্য করিবেন—যেহেতু গুণেরই প্রাধান্য।

সঙ্কেত :—বাহুদন্তীপুত্র—"Indra, whose shastra called Bahudantakam, is in the Mahabharata declared to have been on abridgment in 5000 chapters, from the above mentioned composition of Vishalaksha"—Jolly. শাস্ত্রবিৎ—নীতি-শাস্ত্রগ্রন্থে নিষ্ণাত (গঃ শাঃ), possessed of only theoretical knowledge (S H)? অদৃষ্টকর্ম্মা—অধীত বিষয়ের অনুষ্ঠান পরিচয় বিহীন (গঃ শাঃ); having no experience of practical politics (S H)। বিষাদং গচ্ছেৎ—অমাত্য-কর্ম্মসমূহে অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—অর্থাৎ অমাত্যকর্ম্মসমূহের নির্ব্বাহে সমর্থ হন না (গঃ শাঃ); is likely to commit serious blunders (S H); cuts a sorry figure—বলিলেও চলিত। অভিজন—বংশশুদ্ধি (গঃ শাঃ); উচ্চবংশে জন্ম ; high family (S H)। প্রজ্ঞা—বুদ্ধির আতিশয্য (গঃ শাঃ); wisdom (S H)। শৌচ—উপধাশুদ্ধি (গঃ শাঃ); purity of purpose (S H)। শৌর্য্য—উৎসাহশক্তি (গঃ শাঃ); bravery (S H)। অনুরাগ—স্বামিভক্তি (গঃ শাঃ); loyal feelings (S H)—devotion বলা চলিত। মন্ত্রি-নিয়োগে গুণের প্রাধান্যই বিবেচনীয়।

মূল :—সবই যুক্তিযুক্ত—ইহাই (বলেন স্বয়ং) কৌটিল্য। যেহেতু কার্য্যসামর্থ্য-হেতু পুরুষসামর্থ্য কল্পিত হইয়া থাকে। আর সামর্থ্যবশতঃ—

সঙ্কেত :—এই অংশের ছেদ-সন্নিবেশের পার্থক্য-নিবন্ধন অর্থের বিশেষ পার্থক্য ঘটিতে পারে। গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—"সর্ব্বমুপপন্নমিতি কৌটিল্যঃ, কার্য্যসামর্থ্যাদ্ধি পুরুষসামর্থ্যং কল্প্যতে সামর্থ্যতশ্চ"।—তাঁহার মতানুযায়ী ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। সর্ব্ব—শৌচ-সামর্থ্যাদি গুণ, সহাধ্যায়িগণের প্রভুকে অবজ্ঞা করা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দোষ। উপপন্ন ন্যায্য। পুরুষসামর্থ্য—পুরুষের সেই সেই পদযোগ্যতা। কার্য্যসামর্থ্য হেতু—'কার্য্য' বলিতে বুঝাইতেছে সহাধ্যয়ন সহক্রীড়া ইত্যাদি ক্রিয়া ; তদ্বৎ ক্রিয়ার শক্তিবশতঃ। সামর্থ্যতশ্চ—সামর্থ্যহেতু—প্রজ্ঞা শাস্ত্রসংস্কার শৌর্য্যাদি গুণের তারতম্য-রূপ সামর্থ্যহেতু। কার্য্যসামর্থ্যহেতু (সহাধ্যয়নাদিক্রিয়ার সামর্থ্যবশতঃ) ও সামর্থ্যবশতঃ (নিজ গুণসামর্থ্য-বশতঃ) পুরুষের সামর্থ্য কল্পিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। গুণ-দোষ—উভয়ই উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত)—ইহা বলার এই কথাই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে—সহাধ্যায়ী প্রভৃতি হেয় নহেন—কারণ, বিশ্বাস্যত্ব ইত্যাদি গুণ তাঁহাদিগের আছে ; আবার মন্ত্রিপদে নিয়োগের যোগ্যও তাঁহারা নহেন—যেহেতু তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রভুর পরিভবাদি দোষোৎপত্তিরও সম্ভাবনা আছে। অতএব, পারিশেষ্য-ন্যায়ানুসারে—এ সকল ব্যক্তিকে কর্ম্মসচিবপদে নিয়োগ কর্ত্তব্য। দেশ-কালানুসারে তাঁহাদিগের গুণোপযোগী বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োগ করণীয়।

পক্ষান্তরে শ্যামশাস্ত্রীর পাঠ—"সর্ব্বমুপপন্নমিতি কৌটিল্যঃ—কার্য্য-সামর্থ্যাদ্ধি পুরুষসামর্থ্যং কল্প্যতে। সামর্থ্যতশ্চ—(পরের শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে)। ইহার অর্থ অতি সরল বলিয়াই আমরা বুঝিয়াছি। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—

সর্ব্ব—পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার মত—ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি ও বাহুদন্তীপুত্র—এই সাতজন অর্থশাস্ত্রকারের প্রত্যেকের মতই যুক্তিযুক্ত—যে দেশে যে কালে যে কার্য্যে যে মতটি লাগে —সেখানে তাহাই প্রযোজ্য। কারণ, পুরুষের সামর্থ্য কার্য্যের সামর্থ্য দ্বারা কল্পিত (অনুমিত অর্থাৎ নিরূপিত) হইয়া থাকে। শ্যামশাস্ত্রীর ইংরাজী অনুবাদ সর্ব্বাংশে অনুমোদনযোগ্য নহে—"This" says Kautilya, "is satisfactory in all respects. ইহা হইতে বুঝায় যেন কেবল পূর্ব্ব মতটিই কৌটিল্যের অনুমোদিত। বস্তুতঃ তাহা নহে— তিনি দেশ-কাল-ক্রিয়া-বিশেষানুসারে সকল মতেরই (যথায় যাহা প্রযোজ্য তাহার) সমর্থন করিয়াছেন—ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ— "for a man's ability is inferred from his capacity shown in work" (S H).

এইবার 'সামর্থ্যতশ্চ' এই অংশের সহিত অন্তিম সংগ্রহ শ্লোকটির অন্বয় করা যাউক—

মূল :—আর সামর্থ্যানুসারে—অমাত্য-বিভব ও দেশ-কাল আর কর্ম্ম বিভাগপূর্ব্বক ইহারা সকলেই অমাত্য (রূপে) নিয়োজ্য—কিন্তু মন্ত্রি-(রূপে) নহেন॥

সঙ্কেত :—সামর্থ্যানুসারে—পুরুষসামর্থ্যানুযায়ী ; "And in accordance with the difference in the working capcity" (S H) ; difference—অংশটি না বলিলেই অনুবাদ সুষ্ঠু হইত।

অমাত্যবিভব (মূল)—বিশ্বাস্যত্বাদি অমাত্যগুণ-সম্পদ্ (গঃ শাঃ)। বিভাগ-পূর্ব্বক—যে দেশে, যে কালে, যে কর্ম্মে সুনিষ্পত্তির জন্য যে যে গুণের অপেক্ষা, সেই সেই গুণসম্পদের কথা সম্যগ্‌রূপে বিবেচনা করিয়া (গঃ শাঃ) ; শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ চলনসই—"Having divided the spheres of their powers and having definitely taken into consideration the place and time where and when they have to work"—ইহা অনেকটা ব্যাখ্যার মত—যথাযথ অনুবাদ নহে। Having alloted the qualifications of executive officers according to place, time and acts—এইরূপ বলা উচিত। ইঁহারা সকলেই—বিশ্বাস্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট সহাধ্যায়ী প্রভৃতি সকলেই। অমাত্য—কর্ম্মসচিব (গঃ শাঃ), ministerial officers (S H)—executive officers বলিলে আরও ভাল হইত। মন্ত্রী— মন্ত্রণাদাতা—councillors (S H) ; ministers.

ইতি শ্রীকৌটিলীয়ার্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক নামক প্রথম অধিকরণে চতুর্থ প্রকরণে অমাত্যোৎপত্তি-নামক অষ্টম অধ্যায়॥

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

২৭শে সেপ্টেম্বর, '৪৪

শুক্লা একাদশী। বিজয়ার আনন্দোৎসবের রেশ তখনও বাংলার আকাশ বাতাস জুড়ে রয়েছে। রাত্রির অন্ধকার না কাটতেই বন্ধুবর বেঙ্গল কেমিক্যালের মানেজার সত্যপ্রসন্ন সেনের মোটরকার সশব্দে আমাদের যাত্রার ইঙ্গিত জানালে। আমরা বাড়ীর সকলেই প্রস্তুত, ৫ মিনিটের মধ্যেই "গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলের" দিকে যাত্রা করলুম। বি-ও-এ-সি (ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশন) তাদের যাত্রীবাহী মোটরে গ্রেট্ ইষ্টার্ণ থেকে আমাদের তুলে নিলে। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় সমস্ত যাত্রী মোটরের প্রতীক্ষায় বি-ও-এ-সির প্রতীক্ষাগৃহে বসে আছেন। আমাদের যৎসামান্য ৪৪ পাউণ্ড ল্যাগেজ নিয়ে ভারবাহী মোটরলরী এগিয়ে চলল। তারপর আমাদের যাত্রা সুরু! ১১ জন যাত্রী প্রত্যেকেই অপরিচিত। অন্ধকারের অন্তরালে চলেছে আমাদের অতি সুন্দর শব্দবিহীন মোটর। পাশে অভিনন্দন ও বিদায় অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল—বহু আত্মীয়-আত্মীয়া—সকলের মুখেই আশঙ্কার অস্পষ্ট ছায়া। হয়তো বিদায়ের প্রাক্কালে আশঙ্কার আভাস আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। বোধহয় যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে অন্ধকারের আবরণ মনকে দৃঢ় করবার জন্য অধিকতর সুযোগ দিয়েছিল। হয়তো বা কারো কারো চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। ইউরোপের যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। অপরিচিত মিশরদেশ, অনাত্মীয় নির্ব্বান্ধব দেশ, ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলেছি দূরে—অতি দূরে, কোন অলক্ষ্য দেবতার ইঙ্গিতে—কে জানে! চলা যখন সুরু হয়েছে, পশ্চাৎ তখন সম্মুখে।

ছয়টায় আমাদের যাত্রীবাহী মোটর বালীর সেতু পার হয়ে বি-ও-এ-সির "Marine Airbase"এ প্রবেশ করল। নিঃশব্দ নির্জ্জন পথে কোন মানুষ পশু অথবা যানবাহন কিছুরই সাক্ষাৎ পাই নি। বোধহয়, ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গতার অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। মোটর থেকে নেমে দেখলাম আমার সঙ্গে রয়েছে আর দশজন যাত্রী। সকলেই শ্বেতাঙ্গ, আমরা তিনজন অসামরিক যাত্রী। একটি সস্ত্রীক যুবক। তিনজন ক্যানাডিয়ান সামরিক, চারজন ব্রিটিশ, আর একজন কে ঠিক চিনলাম না। আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল মোটর লঞ্চের দিকে। ভারী সুন্দর লঞ্চ। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। মনে হয় যেন এইমাত্র কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বসবার জায়গায় পাশাপাশি কুশন দেওয়া দুগ্ধশুভ্র গদি। দুই শ্রেণী, মাঝে পথ। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছলুম সী-প্লেন (Seaplane)এর পাশে। মাঝিরা আমাদের জন্য সিঁড়ি নামিয়ে দিল। আমরা উঠলাম প্লেনের ভিতরে।

সী-প্লেন এরোপ্লেনের চেয়ে সাধারণতঃ আকৃতিতে বড়। সামনে দুটি ঘর, একটি ক্যাপ্টেনের অপরটি ড্রাইভারের। পেছনে বাথ্‌রুম, ল্যাভেটারি এবং পান্ট্রি (খাবার ঘর)। মাঝখানে পাসেঞ্জারদের জন্য তিনটি প্রকোষ্ঠ। সামনের প্রকোষ্ঠে ৬টি বসবার জায়গা। খুব মোটা পুরু গদি, পেছনে হেলান ইজিচেয়ারের মত। আমরা ঢুকলাম তার পরের কেবিনে। ৮টি বসবার জায়গা। বাম পাশে লম্বা প্রায় শোবার মতন গদি, আসনগুলোর সামনে ছেলেদের পড়ার ডেস্কের মতন সাজান, তার উপরে রয়েছে এক খানা করে Statesman খবরের কাগজ। একটি বড় কাগজের বাক্স। উপরে লেখা B. O. A. C. ব্রেক্‌ফাষ্ট বক্স। শেষের কেবিন ধূমপান প্রকোষ্ঠ—এখানেই শুধু ধূমপান করা যায়, অন্য জায়গায় নয়। সেখানে মাত্র ৪টি বসবার জায়গা। প্রত্যেকটি আসন আলাদা, পাশে কাঁচের জানালা। বাইরের সব দেখা যায়—আকাশ, মাটি ও দিগন্ত।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন এসে দেখিয়ে দিল, কেমন করে বিপদের সময় প্যারাসুট দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। আমাদের লাইফ-বেল্ট পরা শিখিয়ে দিল, প্রত্যেক জানালার কাছে এমন বন্দোবস্ত রয়েছে যে প্লেন-এর যে কোন জায়গা থেকে বিপদের সময় প্যারাসুট অথবা লাইফ বেল্ট পরে লাফিয়ে পড়া যায়। এই সমস্ত কাজ শেষ করতে এক মিনিটের বেশী সময় দরকার হয় না। কিন্তু সত্যি যখন এরোপ্লেনে বিপদ আসে তখন সেই এক মিনিট ও সময় পাওয়া যায় না।

দেখতে দেখতে আমাদের প্লেন বিরাট দৈত্যের মতন গর্জ্জন করতে করতে জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। সে কি বিরাট বিকট! ষ্টীমারের সবচেয়ে জোরে চলার সময় চাকার আলোড়ন যেমন আর্ত্তনাদ করে, তার চেয়েও সহস্রগুণ! প্রায় ২ মিনিট পরে আমাদের প্লেন উপরে উঠছিল বেশ বুঝতে পারছিলাম। আমি বাইরের দিকে অস্পষ্ট আলোকে বেলুড়ের মঠ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রণাম ক'রে যাত্রা আরম্ভ করলাম। ৫ মিনিটের মধ্যে আমার সামনের সিভিলিয়ান ভদ্রলোক ডেস্কে মাথা এলিয়ে দিলেন। বুঝলাম এয়ার সিকনেস্ হয়েছে। আমার ভয় হলো—আমারও তাই হবে। আমি কিছু না ভেবে একটু নেবু মুখে দিয়ে দু'পাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম খানিকটা অনুসন্ধিৎসা, খানিকটা নূতনের মোহ। প্লেন খুব উপর দিয়ে যাচ্ছিল না; বোধ হয় অনভ্যস্ত যাত্রীদের সুবিধার জন্য। ৫ মিনিটের ভিতর আমরা বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে গেলাম, তারপর প্লেন ধাপে ধাপে উপরে উঠছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম উপরেই উঠছি—ধাপে ধাপে যেমন লিফ্‌ট উপরে উঠে। আমার সিক্‌নেস্ হলো না। ক্রমে আধঘণ্টা চলার পরে বুঝলাম—

বীরভূম জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছি—কারণ ঘরবাড়ীগুলি খড়ের চালা পুরণো ধরণের, অট্টালিকা বিরল ; মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ, অসংলগ্ন। আমি শিশুর আনন্দে ও কৌতূহলে নিবিড় করে দু'পাশের বনানী ও সূর্য্যের আলোর খেলা দেখছি। হঠাৎ শব্দ হতেই দেখি পাশের ভদ্রলোক প্রাতরাশের জন্ত ব্রেকফাষ্ট বক্স খুলেছেন। অন্তকে খেতে দেখে আমারও ক্ষিদে হলো। এবার ব্রেক্ফাষ্ট আরম্ভ হলো।

বাক্স খুললাম। প্রথমেই কাগজে মোড়া কাঠের কাঁটা ছুরি, তারপর একটি লেবু, একটি কলা, কয়েকখানি স্তাণ্ডউইচ্, খেতে বেশ। কয়েকখানা বিস্কুট, পেস্ট্রী, রুটির রোল···খুব পুরু মাখন মাখান। মন্দ ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো না। পান্ট্রিতে রয়েছে বিভিন্ন রেফ্রিজারেটারে চা, কফি, লেবন, স্কোয়াস ; কাগজের গ্লাসও রয়েছে। নিষেধ নেই, যার যত ইচ্ছা খেলেই হলো। তার পাশে রয়েছে একটা বড় বাক্স। উপরে লেখা "লাঞ্চ"। কেউ সে বাক্স খুলল না। দুপুরের অপেক্ষা করতে হবে।

কেবিনে ফিরে এসে সবাই Statesman পড়তে আরম্ভ করল। আমি কাগজ পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় সাড়ে নয়টার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। কারণ প্লেন ধাপে ধাপে নীচে নামছিল। পাশে চেয়ে দেখলাম, বিরাট সহর এলাহাবাদ। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে প্লেন নামল। এলাহাবাদ আমার চেনা সহর। ত্রিবেণী সঙ্গম আমার পরিচিত তীর্থ। বিরাট শব্দে প্লেন জলে নামল। মোটর লঞ্চ এগিয়ে এল। তিন জন যাত্রী নেমে গেল, ছয় জন উঠল, পাঁচ জন আর্ম্মি অফিসার একজন সিভিলিয়ান—B. O. A. C.র পোষাক পরা। দশ মিনিট ত্রিবেণী সঙ্গমে বিশ্রাম করে প্লেন আবার গর্জ্জন করে উঠলো। এবার খুব উপরে উঠছি বুঝতে পারলাম। নীচের সমস্ত জিনিষ—ঘর বাড়ী গাছপালা সব একাকার। মনে হল যে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেটে গেছে। আমার বেশ ভালোই লাগ্‌ছিল। আর্ম্মি অফিসাররা কেউ কেউ গা এলিয়ে দিল, বোধ হয় এয়ার সিক্‌নেস্। আবার কাগজ পড়তে লাগলাম। শরীরটা একটু নিঝুম মনে হচ্ছিল। বোধ হয় মানসিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া। যখন একটা বাজে, অনুভব করলাম প্লেন নেমে আসছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম পাশে কালো পাথরের স্তূপ, নীচে নীল জলরাশি। কিছু কল্পনা করবার আগেই ক্যাপটেন্ এসে বললে গোয়ালিয়র। যারা দিল্লীর যাত্রী তারা বামদিকে, যারা করাচীর যাত্রী তারা ডানদিকে।

আমরা মাত্র ছয় জন যাত্রী ডানদিকের লঞ্চে চড়লাম। ক্যাপটেন আমাদের সঙ্গে। বললেন এবার লেক্ ক্রুইস অর্থাৎ শরীরকে একটু সবল করবার জন্ত জলবিহার। দশ মিনিট হ্রদের জলে লঞ্চ ঘুরে-ফিরে আমাদের তীরে নিয়ে এল। সামনে বিরাট অক্ষরে লেখা রয়েছে—রেষ্ট্ হাউস, গোয়ালিয়ার এয়ার পোর্ট—জনমানববিহীন প্রকৃতির একান্তে রচিত অত্যন্ত বিস্ময়কর স্থান। যেন মানুষের হাতে প্রকৃতি তার অপরূপ 'সৃষ্টিসম্ভার' সঁপে দিয়েছে, মানুষ তাকে কাজে লাগাবে। আমরা উপরে উঠে রেষ্ট হাউসে আশ্রয় নিলাম। হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসলাম। সম্মুখে অবারিত মাঠ। দিকচক্রবাল রেখার মতো দেখাচ্ছিল। পশ্চাতে নীল জল, ঊর্দ্ধে নীল আকাশ। শান্ত-সমাহিত নীরব শূন্যতা। কি বিরাট আয়াম। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করবার জন্ত এই বিশ্রামাগার, বিমান-বিহারী যাত্রীদের চিত্তবিনোদনের আয়োজন। আমরা একটু শীতল জল, লেমন স্কোয়াস পান করে আবার চললাম প্লেনের দিকে।

এবার প্লেনে উঠেই বিদ্যুৎগতিতে আকাশের দিকে চলেছি। ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে, মেঘের পর মেঘ ছাড়িয়ে মেঘের দেশে চলেছি দশ মিনিট। নীচে সীমাহীন বালুকা-রাশি, শূন্তে মেঘ, মধ্যে আমাদের আকাশ-যান চলেছে পশ্চিমের পানে। শরীর ক্রমশঃ ভার বোধ হচ্ছিল, নিশ্বাস ঘন হয়ে আসছিল। শীত, সমস্ত শরীর শীতে জাড়ষ্ট। ক্যানাডিয়ান সৈন্তরা তিন জনেই মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। একজন প্যারাস্যুট পরে নিল। আর একজন পায়ের গালিচা গায়ে তুলে নিল। বেচারি। অতি সামান্ত মাত্র আস্তরণ ও আবরণ। ক্যাপটেন্ প্রত্যেক যাত্রীকে একখানা করে খুব পুরু কম্বল দিয়ে গেল, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আমার মাথা যেন খালি, অথচ ভারী বোধ করলাম। প্রায় পনের হাজার ফিট উপর দিয়ে চলেছি। মনে হল এয়ার সিক্‌নেস্ হবে। আমি পান্ট্রিতে গিয়ে লাঞ্চ্ খেয়ে নিলাম। শুনেছিলাম, শূন্ত উদর সী-সিক্‌নেস্ ও এয়ার-সিক্‌নেস্ এর সহায়ক। রেফ্রিজারেটারে রয়েছে পানীয়ের তালিকা, লাঞ্চ্ বক্‌সে রয়েছে খাদ্যের তালিকা—মাংস, রুটি, কেক্, বিস্কুট, মাখন, ফল। আমি খুব পরিপূর্ণ উদর নিয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলাম। সোয়েটার, কোট, তার উপরে জার্ম্মান ওভারকোট জড়ালাম, তবু শীত। তার উপরে কম্বল। সামনে ডেস্কে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। নীচে কি হচ্ছে দেখবার অবসর নেই, শক্তিও নেই, তবু চেষ্টা করলাম। রাজপুতানার মরুভূমির সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ পরিচয় করে নিই। চারিদিকে বাতাস ভারি। আমাদের সামনে কেবিনে মহিলাটি বার বার বমি করছেন। বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু গিয়ে দেখব কি হচ্ছে, সে শক্তিও ছিল না। ক্রমশঃ অবসন্ন দেহে তন্দ্রার আবেশে চোখ বুজে রইলাম। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ক্যাপটেন এসে বললে, করাচী এসেছি।

নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম আকাশচুম্বী অট্টালিকা, পাশে নীল জল, উপরে নীল আকাশ। দূরে নগরের পথ, জলে জাহাজ, পথ জন-বিরল। স্বপ্নোত্থিতের মতন ঠাকুরমার ঝুলির অশোককুমারের রাজপুরীর কথা মনে হল। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা লঞ্চে নেমে এলাম। করাচি হোয়ার্ফ পার হয়ে জাহাজের পথ ধরে এলাম তীরে। সেখান থেকে B. O. A. C.-এর মোটর আমাদের নিয়ে এল এয়ার-বেসে, ঠিক যেমন বালীর এয়ার-বেসের দ্বিতীয় সংস্করণ। একজন এয়ার অফিসার বললেন, আপনারা রেষ্ট হাউসে বিশ্রাম করুন। পরে যাত্রার সময় বলা হবে। রেষ্ট হাউসে বসে একটু বিশ্রাম করতেই একজন B. O. A. Cর officer এসে বল্লেন,—"আপনাদের জিনিষ নিন। কাল করাচী থেকে কোনো প্লেন পশ্চিমে যাবে না। আপনাদের হোটেলে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হচ্ছে।" —একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। বিমানযাত্রার অনিশ্চয়তা। পাঁচ মিনিট পরেই আবার তিনি বল্লেন—অধ্যাপক চৌধুরী সর্ব

ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে থাকবেন, আপনার কার এসেছে। অন্য আর এক কারএ আপনার জিনিষ হোটেলে পাঠান হল।" আমি কারএ উঠছি, পেছন থেকে ডাকছে—মাখনদা! আশ্চর্য্য! এই অপরিচিত স্থানে নাম নিয়ে কে ডাকবে। পেছন ফিরে দেখি, নোয়াখালীর ক্ষিতীশ সেন, বর্ম্মা প্রত্যাগত, অধুনা করাচী B. O. A. Cর অফিসার। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বল্লেন, "কাল ১১টায় নর্থ ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে পাঁচ নম্বর কামরায় দেখা করব। আপনার আগমন সংবাদ কল্‌কাতা থেকে সরকারী পত্রে-এ পেয়েছি।"

ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হোটেলে এলাম। সঙ্গে B. O. A. Cর লোক। হোটেলের কেরাণী আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। B. O. A. Cর লোক বল্লে, আপনার পুনর্যাত্রার সংবাদ যথাসময় আপনাকে দেওয়া হবে।

হোটেলে ৫ নম্বর ঘর। ঘর অর্থাৎ তিনটী কক্ষ। প্রথম বসবার সেলুন, তারপর শোবার ঘর, তার পাশে ড্রেসিং রুম। পশ্চাতে বাথ রুম। সেলুনে রয়েছে ১খানি বড় টেবিল, ৪খানি চেয়ার, ২খানি ঈজি চেয়ার, টানাপাখা, নীচে গালিচা। শোবার ঘরে রয়েছে একখানা ছোট টেবিল, দুইখানি চেয়ার, একখানি ঈজি চেয়ার, একটী ড্রেসিং আলমারী, স্প্রিংএর খাট, ঝকঝকে বিছানা—বেশ নরম। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। বেয়ারা গরম জল দিয়ে গেল। খুব ভাল করে স্নান করলাম। সারাদিনের ক্লান্তি—বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাড়ে দশটার সময় উঠে দেখলাম সব নীরব, নিস্তব্ধ, দরজার সামনে লম্বা গোঁফ-দাড়ীওয়ালা 'বয়' আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমার ডিনার? সে বল্লে—এখানে ডিনার তো দেওয়া হয়েছে। আমি ভাবলাম, সে ঠাট্টা করছে। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম, সত্যিই বেয়ারা বেচারা আমাকে ডেকে গেছে, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করে নি। ঘুমন্ত সাহেবকে জাগানো গুরুতর অপরাধ। হয়তো সেজন্য তার চাকুরীও যেতে পারে। বেয়ারা সে অপরাধই যদি করত, তাহলে যে আশীর্ব্বাদ করতাম। সাহেব সাজার প্রথম শাস্তি উপবাস। জানিনা এটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কি-না। যাক্, অনেক খুঁজে গৃহিণীর দেওয়া কয়েকটি নারকোলের লাড়ু, বিজয়ার সন্দেশ আর জল খেলাম। সমস্তটা নিঃশেষ করলাম না। কারণ, হয়ত পথে আবার লাগতে পারে।

(ক্রমশঃ)

তার পর ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তার পর ?—
এই প্রশ্ন অহরহ জাগিতেছে মনে
জাগিয়াছে সর্ব্বকালে আমারি মতন
একই প্রশ্ন সকলেরি মনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল
বিফল হইয়া গেছে প্রত্যক্ষ জগতে।
বিশ্বমানবের কাছে
ধর্ম্ম ব্যাখ্যা নাচারের,
নিরুপায়ে তাই
ধর্ম্মের দোহাই পাড়ি
বক ধার্ম্মিকের পাঠশালায়
অথবা আকাশ পানে যুড়ি দুই পানি
দ্বিধা-দিগ্ধ অবসন্ন মনে,
ফুট বা অস্ফুট কণ্ঠে বলি সকাতরে
সকলই তাঁহার ইচ্ছা
ইচ্ছাময় ভগবান তিনি।
যত বলি, তার পর ?
উত্তর মিলে না তার কিছু।
শাস্ত্র তার বেড়া জালে ঘিরি
একই কেন্দ্র হ'তে বারবার
নিয়ে যায় পরিধি অবধি
সেই তার সীমাবদ্ধ গতি
তাইত অনধিগম্য শাস্ত্রের বিচার
যুক্তি তর্ক দ্বন্দ্ব সমাহার
অপূর্ব্ব জ্ঞানের সৃষ্টি
নির্ব্বন্ধ যে বিধাতার
মুখরক্ষা, লজ্জা নিবারণ।
তার পর ?—কে দিবে উত্তর তার ?
এ প্রশ্নের নাহি সমাধান
তাইত গীতার ব্যাখ্যা—
সব্যসাচী দেখে বিশ্বরূপ
ধর্ম্ম ক্ষেত্রে কুরু ক্ষেত্রে
সমবেত যুযুৎসু মণ্ডলী
মানুষ নিমিত্ত মাত্র
কালচক্র ঘর্ঘরিয়া চলে
অবিরাম গুঁড়া হয়ে যায়
জন্মমৃত্যু আসে যায় বাঁধাধরা পথে
সুখ দুঃখ সন্তাপ বেদনা
মনের বিকার মাত্র
কাল সিন্ধু নীরে ভাসে
বিন্দু বিন্দু বুদ্‌বুদ্ জীবন।
কী মূল্য সে জীবনের ?
কিবা মূল্য হাসি ও অশ্রুর ?
উষ্ণ রক্তে স্নান করি শুচিশুদ্ধ মন
কুরুক্ষেত্রে কবন্ধে শুধাই—
কিবা আছে অতঃপর ?
নিয়ত আঁধার নামে চোখের সম্মুখেই
সাড়া নাই, শব্দ নাই নিস্পন্দ নিথর।
হায়রে কালের গতি মাহাত্ম্য ধর্ম্মের
দেবতার অপূর্ব্ব মহিমা,
মানুষ নিমিত্ত মাত্র
পাপক্ষয় সুলভ মৃত্যুতে,
ধর্ম্মতত্ত্ব চিরকাল গুহায় নিহিত,
মহাজন পদচিহ্ন চিনিয়া চিনিয়া
দীর্ঘ পথ অতিক্রমি দেখি অবশেষে
যেখানে আরম্ভ যাত্রা সেখানেই শেষ—
তার পর ?—কে দিবে উত্তর ?

হিসেব নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

বিশ ত্রিশ ঘর রোগীদের দেখে, তাদের ব্যবস্থাদি করে ডাক্তার যখন ফিরলেন, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। বিনোদী জল জল, আর ছটফট্ করছে। বৃদ্ধা মা—রামজি রামজি করছে।

ডাক্তার এসেই কোট খুলে, কামিজের আস্তিন গুটিয়ে হাঁটু গেড়ে ইন্‌জেকসন্ দিতে বসে গেলেন। মাণিককে বললেন "steady, আমার হাত কাঁপছে।—জয় মা দুর্গা!"

* * * *

পাড়ায় সহসা সোরগোল। একখানা মোটর এসে ঢুকেছে। ছেলে মেয়েরা ছুটোছুটি করছে।

মাণিক বললে—"বোধ হয় বড় কেউ inspectionএ (পরিদর্শনে) এসেছেন।"

ডাক্তার বিরক্ত ভাবে বললেন—"আসতে দাও, ওদিকে দেখবার দরকার নেই।—যা করছো করো।"

"ডাক্তার সাহেব—ডাক্তার সাহেব" হাঁকতে হাঁকতে, একজন কুল্লা মাথায় পেটি-আঁটা আরদালি, অতিরিক্ত ব্যস্তভাবে এসে হাজির—"বড়া হুজুর আয়ে হেঁ—ডাক্তার সাহাব কো জলদি বোলাতে হেঁ", ইত্যাদি।

মাণিকলাল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বলবেন—। কি বলবো?"

ডাক্তার—"বলবে আবার কি, রুগী মেরে ফেলব নাকি! আসতে হয়—তিনি আসুন—"

পেয়াদার বিরাম নেই—ত্রাহি ত্রাহি ডাক।

ডাক্তার দোরের সামনে পেয়াদাকে দেখে—"চিল্লাতি মত, ভাই গফুর। যাকে কহো—"ডাক্তার সাহেব কাম্‌মে হায়। মরিজকো ছোড়কে নেহিঁ উঠ্‌সেক্তে। জরুরি কুছ রহে তো আপ মেহেরবাণী করকে আসেক্তে।"

আরদালি বললে—"হুকুরকা মেজাজ আপ জানতে হেঁ—বহুৎ বিগড় যায়েঙ্গে।"

শুনে বিনোদের মাথায় আগুন ধরে' গেল। বুঝতে পেরে মাণিক ভীত হয়ে বললে—"আপনি এখন কথা ক'বেন না, কাজ চলুক। যা বলবার আমি বলছি"—

(আরদালির প্রতি)—"যো কাম সুরু হো গিয়া—ছোড়কে কোই উঠনে নেহি সেক্তা ভাই। তুমি বললেই—হুজুর সব সমঝ্ যায়েঙ্গে। পারো তো—হুজুরকে সঙ্গে করকে লাও ভেইয়া। তিনি সচক্ষে দেখকে যান। তোমার কথা" ইত্যাদি।

আরদালি মিঠে কড়া মূর্ত্তিতে চলে গেল।

মিষ্টার A হচ্ছেন ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব। ওজনে আড়াই মোন। দর্শনে revolting—ডিষ্ট্রিক্টের অন্যতম মালিক। তাঁর দাপটে সবাই সশঙ্ক। মেজাজ মিষ্টতাহীন। একান্ত অনিচ্ছায় cholera infected areaয় পা বাড়িয়েছেন বা কলেরা ক্ষেত্রটা মটোর দিয়ে মাড়িয়েছেন। রুমালখানা নাকে চেপে গাড়িতেই বসে আছেন,—হুকুমে কাজ চলছে। আরদালির আওয়াজেই পাড়া মাৎ। হুজুরের হাতে কতকগুলি কাগজ—ডাক্তারের বিপক্ষে দরখাস্ত। দরখাস্তকারীদের ডাক পড়ছে।—সকলেই পেটের ধাঁন্দায় মজুরি করতে বেরিয়ে গেছে—তারা বাড়ি নেই, কেবল রাগ বাড়ছে। শেষ—মহাল্লার মোড়লের ডাক পড়েছে।

আরদালি এসে নিজের অভ্যস্ত ভাষায় খবর দিলে—"ডাক্তার নেহি আসেকেঙ্গে, আপকো তলব কিয়া হুজুর।" অর্থাৎ আপনাকে যেতে হুকুম করেছে।

সপ্তম ছাড়িয়ে "কেয়া" বলেই দপ্ করে' জ্বলে উঠলেন।—"বেহুদা—নালায়েক" বলতে বলতে, infected areaর কথা ভুলে, এক লাফে নেমে পড়লেন,—"হামকো তলব! চলো দেখতে হেঁ"—

দেখে শুনে মালিক প্রমাদ গুণলে—"এখনো যে পাঁচ-সাতটা instalment (দফা) বাকি! সে ডাক্তারকে ঠাণ্ডা করছিল।—"ফাঁকা কথা বইত' নয়, দু'বার Boss বললেই মামলা মিটে যাবে। ঠোকবো কেনো Sir, লোকটা দুটো কথা কয়ে'—'আসলে' হারিয়ে দিয়ে যাবে?" ইত্যাদি।

বিনোদ বুঝলেন, চেপে গেলেন।

Boss (কর্ত্তা) তখন প্রায় সামনেই—৫।৭ গজের মধ্যেই চলে এসেছেন, দেখতেও পাচ্ছিলেন ডাক্তার কাজ করছেন।—"জলদি বাহার আও ডাক্তার, হামারা হুকুম"—

ডাক্তার সে কথার উত্তর না দিয়ে, কেবল বললেন—"পইলে সেলাম তো লিজিয়ে হুজুর, তকলিফ মাফ কিজিয়ে। হাম্

উঠনেসেই Case fatal হো যায়গা মালিক। Saline injectionকে বাত হামসে আপকো আচ্ছাই মালুম হয়। আপকে পাস হাম তো লেড়কাই হায়।—আওর ২।৩ পাইট বাকি Sir"—

লোকটি বোধ হয় স্বনামপ্রসিদ্ধ চেঙ্গেজখার বেভেজাল রক্তের দাবী বজায় রাখতে চায়। খাম্বাজি গলায় বললেন—"কুছ্ দরকার নেহি—চলে' আও, মরণে দেও"—

বিনোদির অন্ধ মা দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন—কাঁপছিলেন। সুমধুর —"মরণে দেও" শুনেই পড়ে' অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মেয়েটি চীৎকার করে' কেঁদে উঠলো।

চেয়ারম্যান সাহেব বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"বুড়িয়া কোন্ হায়? আফং হিঁয়া কেঁও—নিকাল দেও"—

কে একজন পরিষ্কার কামিজ পরা লোক, ছুটে জল এনে বৃদ্ধার মুখে চোখে দিতে দিতে বললে—"রোগীর অন্ধ মা, ওই তার একমাত্র ছেলে।—o-c-র (পল্টনের সাহেবের) personal servant (নিজের ভৃত্য)—তিনি আমাকে বিনোদির খবর নিতে পাঠিয়েছেন।"

শুনে চেয়ারম্যান চম্‌কে—"কেয়া? Commanding সাহেবকা কেয়া?"

"Personal servant হাম যাকে খবর দেনেসে সাহাব খুদ্‌ভি আসেক্তে। ইস্ লেড়কেকো বহুৎ চাহাতে হেঁ। ডাক্তার সাহাবকো ভি বোলায়ে হেঁ"—

শুনে—সহসা সেই ভীমরুলের চাকের প্রতি রন্ধ্রে অভাবনীয় হাসি ফুটে উঠলো। হাসতে হাসতে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন—"দেখলে তো আমার inspection কিরূপ কড়া! আমি এই ভাবেই পরীক্ষা করে' আমার সেরেস্তার staffএর লোক যাচাই করি! আমিই বিনোদকে বাছাই করে' এ কাজে পাঠিয়েছি। ওর কাজ আমি জানি—প্রাণ দিয়ে কাজ করে—ফাঁকি দেয় না। ও যদি এই ইনজেকসন্ ছেড়ে উঠে আসতো, ওর চাকরি থাকত না —কালই অন্য ডাক্তার পাঠাতুম। হাম কিসিকা খাতির নেহি রাখতে।—জান্ সবকা এক হায়, কেয়া গরীব কেয়া রহিম। হামারা যাঁচ বড়া কড়া হায়" ইত্যাদি বলে'—হো হো করে' হাসলেন।

কামিজ পরা লোকটি বললে—"সচ্চা হাকিমের কাজই এই। কড়া না হলে এত বড় এলাকা কেউ এমন সুষ্ঠুভাবে সামলাতে পারে না। তাঁরা যে কি মতলবে কোন্ কথা কন্, সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে বোঝে! বুঝতে বহুদিন যায়। আপনাদের তাঁবেদারিতে থেকে থেকে এখন কিছু কিছু বুঝতে পারি।"

শুনে হুজুর বেজায় খুসি হলেন, বললেন—"তুম্ ঠিক্ সমঝ্ লিয়া। বুড়িয়া মাইকো সমঝা দেনা ভেইয়া।"

পরে ডাক্তারের প্রতি প্রসন্ন কণ্ঠে—"তোমার একনিষ্ঠ কাজে আমি বড় খুসি হয়েছি—I am very much satisfied with your work Doctor—Remember duty first and duty last—Rest assured you will have its return soon on first opportunity—

ডাক্তার একমনে কাজ করে' যাচ্ছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন "মাণিক চেয়ারম্যান সাহেবকে Preventive Tablet আগে দাও, বহুক্ষণ বিবদুষ্ট areaর মধ্যে রয়েছেন—অভ্যস্ত নন। এখনি খাইয়ে দাও, এখানকার জল যেন দিওনা। বলে দাও আর বেশিক্ষণ না দাঁড়ান—কাজের জন্যে না ভাবেন। অতিরিক্ত ভাবাটা ওঁর নেচার"

হুজুরের কানে সব কথাই পৌচচ্ছিল। সচকিত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—"হ্যাঁ আমার অনেক কাজ আছে—দাও।"

ট্যবলেট্ মুখে ফেলে—"বিনোদ যখন রয়েছে, আমি নিশ্চিন্ত।"

বাইরে ফিরে—"মোটার" বলে' হাঁক দিতেই,—সামনে ভূমি স্পর্শ করে' করজোড়ে যুধিষ্ঠির হাজির।

কোন্ হায়, কেয়া চাহতে?

আরদালি বললে—"মহল্লাকে সরদার হুজুর।"

চেয়ারম্যান—যুধিষ্ঠিরের প্রতি—"মহল্লাকে খবর কেয়া হায় কেয়সা হায়?"

যুধিষ্ঠির—"আপকে দুয়াসে বিমারি রোজ সট্ রহা হায় হুজুর। ডাক্তার সাহাব দিনরাত ঘুম রহে হেঁ। দাওয়াই, মিছরি সাবু, সবকো মিল রহা হায়"—

চেয়ারম্যান আশ্চর্য্য হয়ে—"মিছরি-সাবু?

যুধিষ্ঠির—হাঁ হুজুর। সব বড়া গরীব হায় মালিক। বাজার সে মিলনা ভি মুস্কিল হায়। কাঁহা কাঁহা সে মাংওয়া রহে হেঁ। ডাক্তার সাহেবকা হুকুম—মিলনাই চাহিয়ে। সব কোই খুসি হায় হুজুর।—লেকেন এক বাত মে হাম লোক বড়া শোচমে পড়ে হেঁ। আপ মেহেরবাণী করকে ডাক্তার সাহাবকো না হানে-খানে হুকুম দিজিয়ে। আপনা তরফ্ উনকা বিলকুল খেয়াল নেহি হুজুর। কহতে কহতে হাম সব থক্ গেয়ে। ডাক্তার খুদ্, আচ্ছা রহে তব না সব ঠিক্ রহে মালিক।"

চেয়ারম্যান ব'লে উঠলেন—"জরুর, জরুর, বহুৎ ঠিক্ বাত। হাম উনকো কহেকে যাতে হেঁ। তুম্ উনকো মিছরি আওর সাবুকো বিল্ (bill) দেনে কহনা"—

ডাক্তারের প্রতি—Take care of yourself Doctor—I mean your health, I am very much pleased—

Now Good day Doctor-don't forget to see the O-c- নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে কাজ কোরো, পল্টনের o cর সঙ্গে দেখা করতে ভুলনা।"

হুজুর মোটর হাঁকিয়ে লম্বা দিলেন। সঙ্গে আরদালি, তার হাতে এক কুড়ি কই মাছ!

সকলের যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। বৃদ্ধা উঠে বসেছে। হুজুরের কথার মধ্যে যে ভাল উদ্দেশ্য ছিল, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করা হয়েছে।

অজামিলের 'নারায়ণে'র মত o.cর উল্লেখটি Dr বিনোদের ভাগ্যে অভাবনীয় স্বর্গ সৃষ্টি করেছিল।

মাণিকলাল বললে—"গত কয়দিন এই দুর্গ্রহের দুর্ভাবনাই আমাকে দিনরাত পেয়ে বসেছিল Sir-আপনাকে বলতে পারছিলুম না। নিজে কিন্তু একদণ্ড সুস্থির ছিলুম না।"

'ইন্‌জেকসন্' শেষ হয়েছিল। ডক্তোর বললেন—মানুষে কি কিছু করে হে! শুনলে তো আমাদের সত্যরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা? কোথা থেকে এত সত্য জোগালো তা ভেবেই পাই না! সে গেলো কোথায়?

"সে সাফাই সাক্ষী-সেরে, বোধকরি ষ্টেসনে মাল খালাস করতে গেছে।"

ডক্তার বললেন—"কতো পুণ্য থাকলে এ সব মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া যায়। মহাভারতে আর কথকদের মুখেই যুধিষ্ঠিরের পরিচয় পেতুম, আজ তিনি যেন সশরীরে দর্শন দিলেন! সত্য-গুলো শুনলে তো? তা না হলে কেষ্টোর মতো ঘুঘু ছেলেকে বশ করতে পারতেন কি! এও মিশ্রা-সাহেবকে একদম লাড্ডু বানিয়ে দিয়েছে। বেটা সাবু-মিছরি পেলে কোথা?—এখন বিল্ (Bill) বানাও—বলে' ডাক্তার হাসলেন। দেখছি সত্যের বান্ ডেকেছে, কতদূর ভাসিয়ে নেবাবে জানি না!"

মাণিকও হাসলে। বললে—ক'টা মাস ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি! ধর্ম্মপুত্রকে মহাপ্রস্থানের দিকে না টানে।

ডাক্তার বললেন—আসল কাজ করেছেন কিন্তু সেই কামিজপরা লোকটি। বন্ধুটি কে বলো দেখি?

মাণিক। আজ্ঞে তাঁর কথাই ভাবছিলুম। এ দুর্য্যোগ কাটাবার ব্রহ্মাস্ত্র—ওই ও-সির (o.cর) নামটি, তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়ে-ছিল।—একেবারে যেন জোঁকের মুখে নুন দিলে!

ডাক্তার। সেটা আমি খুব লক্ষ্য করেছিলুম। তাতে ক্রুদ্ধ বিষধরের বিষাক্ত চক্ষু একদম ক্যাকাসে মেরে যায়।—"সায়নাইডেও" সময় নেয় হে, কিন্তু পাকা পেসাদার পাপী কেমন সামলালে দেখেছ? আচ্ছা থাক এখন। সে লোকটি কোথায়?

মাণিক। তিনি কি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেন মশাই! তিনি যে o.cর কেরাণী, বিনোদীর খবর নিতে এসেছিলেন। তাঁকে বলে দিয়েছি—বিনোদীর অবস্থা এখন আর তেমন hopeless নয়। আর আপনি বৈকাল পাঁচটায় সময় যাবেন, কারণ—স্নান করে', কাপড় বদলে disinfected না হয়ে যাবেন না,—তাও বলে দিয়েছি।"

ডাক্তার। Thank you, ঠিক করেছে। কিন্তু তিনি আবার ডাকলেন কেন?"

মাণিক। বোধকরি আপনার মুখে সব শুনতে চান। বিনোদীকে খুব ভালবাসেন শুনেছি—

ডাক্তার। তাই হবে। হ্যাঁ—"কেমন বুঝছো বিনোদীর অবস্থা?"

মাণিক। ভাববেন না, ভালই মনে হচ্ছে তো।

ডাক্তার। মা তাই করে' দিন। আমার মাথা ঘুলিয়ে রয়েছে।

দর্শনীয় চেহারা চলে' যাওয়ায়, দেখবার বস্তু আর কিছু ছিলনা, —ছেলেদের ভিড়ও ছিল না। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে আর মেয়েটিকে একটা টাবলেট খাইয়ে দিয়ে—ডাক্তার বললেন—"চলো মাণিক, বেলা অনেক হয়েছে।"

উভয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

—"সবই দেখছি মায়ের বিচিত্র খেলা হে মাণিক। যত ভাবছি —বৈরাগ্যই বাড়ছে" বলে,' ডাক্তার অন্যমনস্ক হলেন।

মাণিক। শুনেছি শ্মশান পার হলে ওটা খসান্ দেয়,—থাকে না। Instalment গুলো আগে এসে যাক মশাই। দেখেন নি—নূতন চাকরে একটা বড় লাফ্ মেরে মনিবের বাহবা পেলে, তাকে ভবিষ্যতের কথা ভুলিয়ে দেয়—একদিন hopeless foolও শুনতে হয়। তখন বৈরাগ্যের পালা সামলাবার সময় আসে। ওটা নিজের হাতেই আছে—তাড়াতাড়ির কি দরকার।

ডাক্তার। সব জিনিসেরি ছুপিট থাকে কিনা, তাইতেই ঘুমিয়ে দেয় হে। কেবল একজনেরি ছুপিঠ নেই, just like বিলিয়ার্ড ball ফুঁপি নেই, ধরতে গেলেই ফস্কে যায়। তাই তাঁর নাম "অধর"। আচ্ছা থাক্।—

বাসায় পৌঁছে গেলেন।

—"তা যাই বলি আর যাই বলো মাণিকলাল, নিজের বাসার চেয়ে আরামের কিছু নেই—তা সে ফুলের চালাই হোক, আর খাপরার ছপ্পরই হোক সেটা স্বাধীকারের স্বাদ রাখে। এ যেন স্বর্গে এলুম। এইবার একটা গোল্ডফ্লেক্ ধরাই—কি বলো?"

মাণিক। আজ্ঞে নিশ্চয়ই। নিজের এলাকা ছাড়া ওর খাঁটি আস্বাদ কারো অট্টালিকার ইজিচেয়ারে বসে' মেলেনা হুজুর।"

ডাক্তার। very true লাখ কথার এক কথা বলেছ মাণিক। পরে স্নানাহার সেরে—"একটু শুই বড় ক্লান্ত হয়েছি" বলে' খাটিয়া নিলেন।

শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে কন্যাদায় বাঙ্গালার বন্যাদায়ের চেয়েও ভীষণ। মধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখ অনেকটা কন্যার বিবাহের উপরই নির্ভর করে। এই কন্যাদায়ের দুঃখদুর্দ্দশার কথা না বলিলে বাঙ্গালী সংসারের অন্তর্লোকের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া যায় না। কন্যাদায় সমাজের পক্ষে একটি গহন ও জটিল সমস্যা। কাজেই এই সমস্যা বাঙলা সাহিত্যের—বিশেষতঃ বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের একটা প্রধান বিষয়বস্তু। অন্য দেশের সাহিত্যে এ বালাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই এই সমস্যা সাহিত্যে স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্র এ সমস্যা লইয়া অবশ্য বেশি মাথা ঘামান নাই। রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, প্রভাতকুমার ইত্যাদি সাহিত্য-রথিগণ এই সমস্যা লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। কন্যাদায়ের দুঃখ-দরদী শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। বাঙ্গালী সংসারের কোন দুঃখই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই—সর্ব্বপ্রধান দুঃখটিই বা এড়াইবে কেন? এই দুঃখ অবলম্বনে তিনি অরক্ষণীয়া নামক বড় গল্পের গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। কোন কোন লেখক কন্যাদায় লইয়া propaganda-সাহিত্যও রচনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া সে শ্রেণীর নয়—ইহা উদ্দেশ্যহীন অবিমিশ্র কথাসাহিত্য, কন্যাদায় ইহার বিষয়বস্তু বা রসোপাদান মাত্র।

অরক্ষণীয়ায় শরৎচন্দ্র যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাই বাঙ্গালী পল্লী-সংসারের অবিকল চিত্র, তাঁহার নিজের চোখে দেখা। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সমাজের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কন্যার বিবাহ দেওয়া সমভাবেই কঠিন হইয়াই আছে বটে। সমস্যা কিন্তু রূপ বদলাইয়াছে, অন্যান্য সমস্যার সহিত মিলিয়া এ সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে পাড়ায় পাড়ায় আজকাল ঢিটি পড়িয়া যায় না, কন্যার হাতের অন্নজল অস্পৃশ্য হয় না, লোকে কন্যার পিতাকে সমাজে একঘরে করে না অথবা কন্যা মৃত পিতামাতার মুখাগ্নির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। কন্যার সমাদরও পূর্ব্বা হইতে বাড়িয়াছে—শুধু সে আজ পালনীয়া নয়, 'শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' উঠিতে বসিতে ১৩।১৪ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যাকে গালাগালি দিয়া কেহ দড়িকলসী ও গঙ্গাগর্ভ দেখাইয়া দেয় না। ৬০।৭০ বৎসরের বুড়াও তৃতীয় চতুর্থ পক্ষে আজ আর বিবাহ করে না। শরৎবাবু যে সময়ের সমাজচিত্র দেখাইয়াছেন—সে সময়ে এই সবই প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকরা কন্যাদায় লইয়া কথাসাহিত্য এখনো রচনা করিতে পারেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অরক্ষণীয়ার ন্যায় অশ্রুঘন সাহিত্য আর তাঁহাদিগকে রচনা করিতে হইবে না!

একটি দরিদ্র ঘরের অবিবাহিতা কন্যার অদৃষ্ট অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন—কিন্তু কাণ টানিলে মাথা আসার মত দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের অন্তস্তলের সর্ববিধ দুঃখ, জ্বালা, হীনতা, ঘৃণ্যতা, পঙ্কিলতা সমস্তই এই উপন্যাসিকাখানিতে আলোক চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী সংসারের ভিতরটাও যেমন ফুটিয়াছে, তাহার বাহিরটা—তাহার প্রাকৃতিক ও মানসিক আবেষ্টনীটিও—তেমনি অবিকল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর গ্রাম্য অন্তঃপুরের চিত্রই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। সে জন্য উপন্যাসিকাখানিতে নারীচরিত্রেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কয়েকটি হতভাগিনী নারীর জীবনযাত্রার কথাতেই পল্লীবাসী বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের ক্ষতবিক্ষত স্বরূপটি দেখানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বাঁশবনে ঘেরা এঁধো পুকুরের ধারের পল্লীকুটীরের এইরূপ চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হইত না। শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন যদি এইরূপ পল্লীসংসারের চারিপাশে না কাটিত, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারাও এই সৃষ্টি সম্ভব হইত না। রসশিল্পীর বাল্যস্মৃতি কেমন করিয়া পরিণত বয়সে রসসৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠে, অরক্ষণীয়া তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সমস্ত নারীচরিত্রগুলিই জীবন্ত। দুর্গামণির জীবন অবিমিশ্র দুঃখের ইতিহাস—জ্ঞানদারও তাহাই—তবে তাহাকে শেষে আশ্বস্ত করা হইয়াছে। স্বর্ণমঞ্জরীর কণ্ঠে বিষের মাত্রা একটু অধিক হইয়াছে—ছোটবউ খুব স্পষ্টরূপে ফুটে নাই। অতি অল্পপরিসরের মধ্যে 'পোড়া কাঠ' খুব উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়াছে। এই 'পোড়াকাঠ' অগ্নিগর্ভ—তাহার স্ফুলিঙ্গগুলি গল্পটিকে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। অরক্ষণীয়ার সকল চরিত্রের কথা ভোলা যাইতে পারে—'পোড়া কাঠকে' ভুলিবার উপায় নাই।

শরৎচন্দ্র যে সমাজের নরনারীর চিত্র এই পুস্তকে অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাদের হৃদয়ের বালাই বড় নাই। তাই কোথাও একটু হৃদয়ের পরিচয় পাইলে রুক্ষশুষ্ক পর্ব্বতগাত্রে—গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় উপভোগ্য হইয়া উঠে। হইয়াছেও তাহাই অতুলের আবির্ভাবে। শেষাংশটুকু বাদ দিলে অতুলচরিত্র যথাযথই মনে হয়। কলেজে-পড়া আজকালকার রোমান্টিক টাইপের ছেলে উত্তেজনাবশে একটি মহত্ত্ব ও উদারতা দেখাইয়া বসে—কিন্তু সে মহত্ত্বের আদর্শ বরাবর অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবে, এমন প্রত্যাশা দুর্গামণিই করিতে পারে—কোন শিক্ষিত বহুদর্শী লোক তাহা করিবে না-প্রথম তৃষিত যৌবনে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কোন প্রতিবেশিনী বালিকাকে তাহার চোখে ভাল লাগিয়া যাইতে পারে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রূপগুণমণ্ডিতা বহু পুরবাসিনী কন্যাকে ফেলিয়া তাহাকে কৃতবিদ্য যুবক বিবাহ করিবে—এমন প্রত্যাশা জ্ঞানদার মত সরলা বালিকাই করিতে পারে। তপঃশুষ্কা বিগতলাবণ্যা গৌরীকে শিব কৃপা করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হন নাই। তপঃপ্রতীক্ষারই মর্য্যাদা তিনি রাখিয়াছিলেন। ইহা প্রেম জগতের চরম্ আদর্শ! গল্পের অতুল শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের সেই দেবাদিদেবের আদর্শই অনুসরণ করিবে ইহা স্বাভাবিক নয়। তবু বলিতে হয়—কলেজেপড়া ভাবালু যুবক

সাময়িক উত্তেজনাবশে কখন কি করে তাহারই-বা ঠিক কি? শরৎচন্দ্র অতুলের মুখের আশ্বাসেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—তাহার বেশি ত কিছু বলেন নাই। আশ্বাসেই গ্রন্থের মত সংকল্পেরও অবসান হইতে পারে। যে অতুলের প্রাক্তন আশ্বাসে আমরা বিশ্বাস করি নাই সে অতুলের এ আশ্বাসেও আমরা বিশ্বাস নাও করিতে পারি।

এই বড় গল্পটির সমস্তটুকুই Realistic, ইহার উপসংহারটুকু কেবল Idealistic. এই Idealismএ গ্রন্থের গৌরব কিছুই বাড়ে নাই। ইহা শুধু নিদারুণ শোকদুঃখের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ-ঘাতে আর্ত্ত চিত্তকে একটু সান্ত্বনা দান। পাঠক ইহাতে আশ্বস্ত হয় না। দুঃখের কাহিনীই সত্য—সান্ত্বনাটা যে মিথ্যা তাহা পাঠক-চিত্ত সহজেই বুঝিতে পারে।

অরক্ষণীয়া নিরবচ্ছিন্ন বেদনারই পরমসত্য কাহিনী। যিনি এ কাহিনী লিখিয়াছেন—তাঁহাকে বলা যায় না—দুই-একটা সুখের কাহিনীও ইহাতে যোগ দিলেন না কেন? সুখে দুঃখেই ত এ সংসার।

তবে ত একথা বলা যায়—যে সকল চিত্রের সহিত সুখদুঃখের কোন সম্পর্ক নাই—আবেষ্টনী-সৃষ্টির অঙ্গীভূত হইয়া এমন কতকগুলি চিত্র ইহার ফাঁকে ফাঁকে থাকিলে পাঠক-চিত্ত মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়িতে পারিত অর্থাৎ একটু ventilation এর ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।

অতি কারুণ্য যতটা অশ্রুজল ঝরায় ততটা রস ঝরাইতে পারে না। রসিকচিত্ত শিরীষ-পুষ্পের মতই সুকুমার।

"পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ পুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।"

অরক্ষণীয়ায় শরৎচন্দ্র সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অরক্ষণীয়ার বেদনার কথা দরদের সঙ্গে বিবৃত করিয়াছেন—কিন্তু কোন মন্তব্য করেন নাই। এই মন্তব্য পরিণীতা গল্পের গুরুচরণের মুখে স্পষ্ট হইয়াছে—

"এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই—না খাই—শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙায় আর গলা চেপে ধরে, সে সমাজ আমার নয়—এ সমাজ বড় লোকের জন্যে।"

শরৎচন্দ্র এই গল্পে যাহাদের কথা লিখিয়াছেন—তাহাদের কথা লিখিবার দিন আজিও ফুরায় নাই। বর্ত্তমান যুগে দুই-একজন ছাড়া তাহাদের কথা লইয়া কেহ আর মাথা ঘামান না। মূল কথা হইতেছে—লেখকদের দরদের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে তাহাদের লইয়া রসসৃষ্টিও সম্ভব নয়। কাজেই লেখকদের ইহাতে কোন দোষ নাই। শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন যে নগরে কাটে নাই—ধনীর সংসারে যে তিনি প্রতিপালিত হ'ন নাই—অতিরিক্ত মার্জ্জিত রুচির আবহাওয়ায় যে তিনি পরিবর্দ্ধিত হ'ন নাই, তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতিই হউক (বলা বাহুল্য, ক্ষতি তাঁহারও হয় নাই, দরদী হৃদয়ের ক্রমোন্মেষ ও অভিজ্ঞতার মূল্যও ত কম নয়।) বঙ্গ সাহিত্যের খুব বড় একটা লাভ হইয়াছে, অরক্ষণীয়ার মত অনেকগুলি রস সম্পদ আমাদের উপভোগে লাগিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৫১ সালের ভারতবর্ষে শ্রীজনরঞ্জন রায় শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দেখা যায়। একটি মত শ্রীধর স্বামী, শ্রীচৈতন্য, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং অসংখ্য মহাপুরুষগণের মত। সে মত এই যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার যে সকল লীলার উল্লেখ আছে তাহা আলোচনা করিলে হৃদয় পবিত্র হয় এবং ভগবদ্ প্রেমের সঞ্চার হয়। আর একটি মত খৃষ্টান পাদ্রিগণের দ্বারা প্রচারিত। সে মত এই যে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে তাহা লাম্পট্য-পূর্ণ অতএব অশ্রাব্য। রাজা রামমোহন রায় শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির মত গ্রহণ না করিয়া খৃষ্টান পাদ্রিগণের মত গ্রহণ করিয়াছেন। জনরঞ্জনবাবু রামমোহন রায়ের মত সমর্থন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে রামমোহন যদি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইতেন। সে উত্তর এই যে, ঈশ্বর এবং আদর্শ মানব উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। মানবের জন্য ঈশ্বর কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিলে মানবের পাপ হইবে, যে ব্যক্তি সেই নিয়মগুলি যত বেশী পালন করিবে সে তত বেশী আদর্শ চরিত্রের হইবে। কিন্তু ঈশ্বর সেই সকল নিয়মের অধীন নহে। অথবা তিনি নিজের জন্য অন্য নিয়ম করিয়াছেন। তিনি নিজের জন্য একটি এই নিয়ম করিয়াছেন যে তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং "যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি।" যাহারা তাঁহাকে সখা বলিয়া ডাকে তিনি তাহাদের সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করেন, যাহারা তাঁহাকে সন্তানরূপে স্নেহ করেন তিনি তাহাদিগকে পিতামাতারূপে ভক্তি করেন এবং যাহারা তাঁহাকে পতিরূপে ভজনা করেন তিনি তাহাদের নিকট পতিরূপেই দেখা দেন। কৃষ্ণোপনিষদে দেখিতে পাওয়া

যায় যে শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন তখন বনবাসী মুনিগণ তাঁহার সর্বাঙ্গসুন্দর দেহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন "আমি যখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব, আপনারা গোপিকা হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিবেন"। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ গ্রহণ কর।" বৃদ্ধমাতার সেবা করা পুত্রের ধর্মকার্য্য। শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরলাভের জন্য সে ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পতিসেবা রমণীর পক্ষে ধর্ম। গোপীগণ সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরলাভের জন্য। এইরূপ সাধনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ পতিরূপেই গোপীদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার অবশ্য আদর্শ মানবের মত হয় নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ত আদর্শ মানব নহে। তিনি ঈশ্বর।

ব্যাপারটা যে অলৌকিক হইয়াছিল,—অতএব লৌকিক নিয়ম অনুসারে ইহার সমালোচনা অন্যায্য—ইহা ভাগবতে বলা হইয়াছে। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিল ইহা তাহাদের স্বামীরা জানিতে পারে নাই,—কারণ তাহারা দেখিয়াছিল তাহাদের পত্নীরা তাহাদের পাশেই রহিয়াছে। গোপীরা দেখিতেছে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস করিতেছে। গোপীদের স্বামীরা দেখিতেছে গোপীরা তাহাদের পাশেই রহিয়াছে। কোন্ গোপী আসল, কোন্ গোপী নকল তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। কিন্তু কথা এই যে penal code প্রয়োগ করিলেও শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডনীয় করা যায় না। ফরিয়াদী কোথায়? যাহাদের নালিশ করা উচিত সেই সকল গোপ বলিতেছে যে তাহাদের পত্নীরা তাহাদের পাশেই ছিল। অধিকন্তু আসামীর বয়স ১১ বৎসর। যাহা হউক,—ফরিয়াদী থাকুক বা না থাকুক, বিচারক অনেক। প্রথম বিচারক—খৃষ্টান পাদ্রিগণ। দ্বিতীয় বিচারক—রাজা রামমোহন রায়। তৃতীয় বিচারক—বাবু জনরঞ্জন রায়। ইঁহাদের সকলেরই রায়—শ্রীকৃষ্ণের দোষ, তিনি পরস্ত্রীর সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং," শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, তিনি "আত্মারাম" নিজের আনন্দেই পরিপূর্ণ, তাঁহার বিষয় ভোগবাসনা থাকিতে পারে না, তাঁহার মধ্যে কামের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীচৈতন্যদেব কাঁদিয়া অশ্রুর বন্যা বহাইয়াছেন—শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়—কিন্তু বিচারকগণ এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা রায় দিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ লম্পট এবং দণ্ড দিয়াছেন দ্বীপান্তর।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এ সকল কথার অর্থ কি যে শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, কামবীজে তাঁহার উপাসনা। ইহার অর্থ এই যে সাধারণ মানবের মধ্যে কামভাব ঈশ্বরীয় সাধনার প্রধান অন্তরায়···সেই অন্তরায় দূর করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করা হয়, —বিষের দ্বারা বিষের প্রতিকার হয়,—তেমন রাসলীলার দ্বারা কামভাব দূর করিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ভজনের পথ সহজ করা হইয়াছে। যাহাদের মনে কামভাব আছে রাসলীলার বিবরণে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, ফলে তাহাদের মন কৃষ্ণচিন্তায় নিবিষ্ট হইবে। * মন কৃষ্ণচিন্তায় নিবিষ্ট হইলে কামভাব চিত্ত হইতে বিদূরিত হইবে এবং সাধক ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন "রাস মহাভারতে নাই। * * * ইহা পরের কল্পনা।" মহাভারত পাণ্ডবদের জীবন বৃত্তান্ত। পাণ্ডবদের জীবনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের যে অংশ সংশ্লিষ্ট মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ৩৭ জীবের অনুগ্রহের জন্য ভগবান নর দেহ ধারণ করিয়া এরূপ ক্রীড়া করেন যাহা শুনিয়া জীব তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন হয়।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদ মেবচ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ভাগবত ১০।২৯।১৫

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বন্ধুত্ব,—যে কোনও ভাবের সাহায্যে সর্বদা ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিলে ভগবৎচিন্তায় তন্ময় হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সেই অংশই বলা হইয়াছে। রাসলীলার সহিত পাণ্ডবদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এজন্য মহাভারতে রাসলীলার কথা নাই। ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী অন্য কবি রাসলীলা কল্পনা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করবার কোনও হেতু নাই।

আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ শ্রুতি বা বেদ। কিন্তু জনরঞ্জনবাবু বলিতেছেন যে বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মনুস্মৃতি। জনরঞ্জনবাবু তাঁহার উক্তির সমর্থনে শাস্ত্র বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বাক্য এই—

"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"

এই বাক্যের অর্থ এই যে শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই বড় হইবে। কিন্তু জনরঞ্জনবাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিই বড় হইবে। ঠিক বিপরীত অর্থ। জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন যে রাজা রামমোহন না কি বলিয়াছেন যে "ভাগবতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে যে ভগবত্ত্বা (ভগবত্তা?) আরোপিত হইয়াছে তাহা মনু-বিরোধী। মনুর বিপরীত বাক্য গ্রাহ্য নহে।" শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার এ কথার সহিত মনু সংহিতার বিরোধ আছে ইহা বড় কৌতুকপ্রদ কথা। রামমোহন কি যুক্তির দ্বারা এই বিচিত্র উক্তি সমর্থন করিয়াছেন জনরঞ্জনবাবুর তাহা তুলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বলা বাহুল্য এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমূলক।

জনরঞ্জনবাবুর আর একটী অদ্ভুত উক্তি "ভারত সংহিতা অর্জুনপুত্র জন্মেজয়ের সর্প সত্রে" বর্ণিত হইয়াছিল। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়। কিন্তু জনরঞ্জনবাবু বলেন অর্জুনের পুত্র জন্মেজয়।

পুনশ্চ তিনি লিখিয়াছেন "বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ ও মহাভারতের যে যে অংশে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কথা আছে সেই সেই অংশ আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত।" যদি প্রক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে ঐ সকল

* অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভাগবত ১০।৩৩।

গ্রন্থের এমন কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যাইত যাহাতে সে সকল অংশ নাই। জনরঞ্জনবাবু কি এমন পুঁথি দেখিয়াছেন? কলিসন্তরণ উপনিষদে আছে

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

উপনিষদে সকলের অধিকার নাই। যাহাতে সকলে এই পরম পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে একজন্য তন্ত্রে ইহার: একটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, দ্বিতীয় অংশ পূর্বে বলিয়া প্রথম অংশ পরে বলা হইয়াছে

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন "[illegible] তোলিয়া দিয়া কৃষ্ণকে বড় করিল।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "কৃষ্ণ স্তু ভগবান্ স্বয়ং।" জনরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন "গৌড়ীয় বৈষ্ণব কৃষ্ণ স্তু ভগবান্ স্বয়ং এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।" যাহা ভাগবতে আছে তাহার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে দায়ী করা হইয়াছে।

ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। কেহ ঈশ্বরকে প্রভুরূপে কেহ পুত্ররূপে কেহ মাতারূপে কেহ পতিরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিতে ভালবাসেন। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সকল রকমেই ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহার যে ভাবে উপাসনা করিতে ভাল লাগে সে সেই ভাবেই উপাসনা করুক। অন্য ভাবে উপাসনাকে নিন্দা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

চোর

শ্রীভবেশ দত্ত

রায় বাহাদুর রমাকান্তবাবু অনেক দিন পর গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। আগে প্রায় বছরে একবার করিয়া আসিতেন কিন্তু ইদানীং মাস তিনেকের বেশী হইয়া গেলো তিনি আর যান নাই। বোধহয় গ্রাম তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, তাই শহরের কোলাহল হইতে একটু নিরিবিলি গ্রাম্য জীবনযাপন করিতেছেন।

সেদিন দারোয়ানের চীৎকারে রায়বাহাদুরের ঘুম ভাঙিয়া গেলো। তিনি বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন দারোয়ান একটা লোককে অবিরাম প্রহার করিতেছে।

তিনি দারোয়ানকে ওপরে ডাকিলেন।

দারোয়ান লোকটাকে ধরিয়া আনিয়া বলিল:—হুজুর আমার রান্নাঘর থেকে এই লোকটা আধ সের চাল চুরি কোরে নিয়ে পালাচ্ছিল।

রায় বাহাদুর লোকটির আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন।

তাহার পরণে জীর্ণ একটা বস্ত্র, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পেটটা বড় হইয়াছে, সারামুখে দারিদ্র্যের চিহ্ন যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনি ধমক দিলেন: ওর চাল চুরি কোরেছিস্?

লোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল: হুজুর কাল থেকে ছেলেমেয়েগুলো কিছু খায়নি, বৌটা জ্বরে বেহুঁস হোয়ে পড়ে আছে।

কাজ কোরে খেতে পারিসনে, জানিস চুরি করা কি ঘৃণ্য কাজ। কি পাপ কাজ আজ তুই কোরেছিস ভেবে দেখেছিস্?

হুজুর—

তিনি আবার ধমক দিলেন: চোপ, শুয়ার, চুরি কোরে পেট ভরানোর চেয়ে গলায় দড়ি দিতে পারিসনে. ওরে হতভাগা তোর যে নরকেও স্থান হবেনা।

লোকটি কাঁদিতে লাগিল।

তিনি লোকটিকে একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন: জানিস্? তোকে আমি জেল খাটাতে পারি।

এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল নীচেয় দারোগা আসিয়াছেন তাঁহার সহিত দেখা করিতে।

রায় বাহাদুরের মুখটা কেন জানি পাংশু হইয়া গেলো।

তিনি একটু কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিলেন: ভালই হোয়েছে. ডেকে নিয়ে আয়, এ বেটাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

দারোগা ও পুলিশ উপরে আসিয়া বলিলেন: রায়বাহাদুর আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার কোরলাম।

তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন: মানে?

মানে, অতবড় নীচ কাজটা কোরে এসে এখানে আত্মগোপন কোরলে কি আর গভর্ণমেন্টের চোখে ধূলো দেওয়া যায়?

কিন্তু—

আচ্ছা বলুন তো কত হাজার কুইনাইনের বড়ি আপনি গ্রামের নামে নিয়ে গোপনে মোটা টাকায় বেচেছেন।

আমি।

হ্যাঁ চলুন তো।

পুলিশ হাতকড়া পরাইয়া দিল।

লোকটি অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রায় বাহাদুর এতদিন পর শহরে চলিলেন।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য—ধর্ম্মকে বাদ দিয়া এ সাহিত্য আলোচনা সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মও খুব প্রাচীন। তবে এই ধর্ম্ম কখন হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বলাও সহজ নহে। রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে কোন তথ্য অবগত হইতে পারা না যাইলেও খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে যে ইহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই সময় ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল এবং ইহার উপাসনায় বিষ্ণুপাদেরই পূজা করা হইত। বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজার পূর্ব্বে গয়ায় যে বিষ্ণুপাদের পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কোদ্ধৃত উর্ণবাভের 'সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ' শীর্ষক বচন হইতে স্বর্গত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল প্রমাণ করিয়াছেন। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের অনেক আগে ত্রি-বিক্রম বাসব বিষ্ণুবাসুদেব বলিয়া পূজাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দামোদর ও গোবিন্দের পূজা ও সাধারণ্যে বেশ প্রচলিত হইয়াছিল—(Buhler S. B. E. XIV)

প্রাচীন শিলালিপিগুলিও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে। লুডার্স প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। আবার খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের বিষয় উল্লেখ আছে। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সেগুলি ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। কাজেই ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং এই বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য। ভারতে ধর্ম্মমতের অন্ত নাই। সকল সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দই সাহিত্য সেবা করিয়াছেন। কিন্তু একথা ভুলিবে চলিবে না যে, বৈষ্ণব মহাজনগণের পূর্ব্বে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সাহিত্যের নিছক লালন কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবগণের অশেষ অনুগ্রহ না হইলে যে বঙ্গ সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে দাঁড় করিতে পারা যাইত না তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগের পালবংশীয় নৃপতিগণের সময় হইতে বঙ্গ সাহিত্যের ধরাবাঁধা ইতিহাস আরম্ভ কি না, নাথ সিদ্ধদিগের ধর্ম্মপ্রচার অথবা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যপ্রচার সে সব সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি না, আমি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়াসী নহি। যোগীপাল, মহীপাল, ডাক খনার বচনের বিষয়বস্তু উল্লেখ করিয়া সুধীজনের মহামূল্য সময় হরণ করিবার দুর্ম্মতিও আমার নাই। আমি কেবল বার বার করিয়া এই কথাই জগজ্জন সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই যে, বঙ্গ সাহিত্যের গভীর পরিণতির সহিত বৈষ্ণব সাহিত্য সর্ব্ববৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, যে মাধুর্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ, সেই মাধুর্য্য, নিষ্ঠা, নিবিড়তার দ্বারা কাব্যলক্ষ্মীকে বাঁধিয়া লইয়া বঙ্গসাহিত্যকে গোষ্ঠের ন্যায় চিররসশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা ইহার রচয়িতা, তাঁহারা একাধারে সাধক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্য রচনা তাঁহাদের নিকট বিলাস মাত্র ছিল না, সাধনারই অঙ্গীভূত ছিল। বৈষ্ণব মহাজনগণ আপনাপন হৃদয়ে নিকুঞ্জলীলা সন্দর্শনপূর্ব্বক যাহা অনুভূতির দ্বারা লাভ করিয়াছেন, তাহাই পদাবলীর ছন্দে রচনা করিয়া জগজ্জনকে উপহার দিয়া গিয়াছেন।

এই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন একদিকে কাব্যলক্ষ্মীর অত্যুজ্জ্বল মণি, তেমনই অন্যদিকে ইহা একাধারে বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-সংহিতা-নীতিশাস্ত্র-ধর্ম্মশাস্ত্র ও বটে। তাহা না হইয়া যদি কেবল কল্পনাপ্রসূতই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে একই কালে দেবতা ও মানবরূপে শ্রেষ্ঠ ভক্তি ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইত না এবং বৈষ্ণবের মর্ম্মকথাও নব নব ভাবের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কালের করাল তলে বিলীন হইয়া যাইত। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য কেবল আকাশেই জালবোনা নহে, এই জন্যই তাহা স্থায়ী হইয়াছে। তাই যুগে যুগে কত সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া গেল, তবুও এ ভাণ্ডার এতটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত হইল না। অবশ্য সেই ধর্ম্ম ও সাধনার বর্ত্তমানে হয় ত কিছু কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু গৃহে গৃহে প্রতি গৃহীর হৃদয়ের পরতে পরতে রাধাকৃষ্ণের অমরমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিল, ইহাই আমাদের লাভ।

আর্য্যকৃষ্টির এই যে আকাঙ্ক্ষা, ইহাই তাহার শাশ্বত পিপাসা। পরিপূর্ণতার প্রতি প্রাণের আকুল আগ্রহ ভারতের চিরন্তন প্রথা। ইহাকে সে আকাশকুসুম বলিয়া উড়াইয়া দেয় নাই। তাই তাহার চিহ্ন বিশ্বসভা হইতে মুছিয়া যায় নাই। প্রাণের এই যে আকুল নিবেদন, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পদাবলীর বৈষ্ণব কবি ভারতের ভক্তহৃদয়কে চিরদিনের মত কিনিয়া লইয়াছেন। আমরা বাহিরে যে রূপটি দেখি, তাহাই শুধু সুন্দর নয়। বাহিরের রূপটি আমাদের অন্তরের স্মৃতিকে জাগরিত করিয়া দেয় মাত্র। আমরা ইন্দ্রিয় বৃত্তির সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি তাহা খণ্ড। কিন্তু সৌন্দর্য্য প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড। যিনি পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড ব্রহ্মানন্দরস, তিনিই আবার রস-পান-পিপাসু অপূর্ণ খণ্ডাকৃতি জীবভৃঙ্গ। বৈষ্ণব সাহিত্য সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে।

তাই যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত জাতির উত্থান পতন হইল, কিন্তু বৈষ্ণব কবি প্রেমপ্রীতির যে অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গেলেন, তাহার আদর্শ জগতের বুক হইতে কোন ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। কৃষ্ণভক্তিতে দেশ আবার ভরিয়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তগমনে নব নব ভাবের আরতী প্রদীপ জ্বালাইয়া আবার প্রেমের ঠাকুর আসিয়া আমাদেরই বাঙ্গালায় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে যে তিনটি রসধারার নির্গম হইয়াছিল, তাহার শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণছায়ায় প্রয়াগ সঙ্গম হইল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতীর রসজীবনে পূর্ণযৌবন আসিল। বৈষ্ণব সকলকেই সাগ্রহে আলিঙ্গন দান করিলেন, শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রী উজ্জ্বল করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন, বাঙ্গালার বাহিরে

অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই নূতন শ্রেণীর স্থাপত্য রচনা করিয়াছিলেন, এবার বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে এক অভিনব, অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা হইল, বৈষ্ণবের রত্নভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। ঘরমুখো বাঙ্গালী গৃহ কোণ হইতে বহির্গত হইয়া গয়া গেল, কাশীগেল, বৃন্দাবন যাত্রা করিল—সমস্ত ভারতের দৃষ্টিপথে এক অভিনব কাব্যসুধা হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইল। বাঙ্গালী পূর্ব্বে যে সমস্ত দেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল, এখন সে সকল স্থানের অধিবাসী বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব শ্রী সন্দর্শনে নতমস্তকে প্রণাম করিল। বাঙ্গালীর সাহিত্য তাহার পূর্ণরূপ পাইল, সমস্ত জাতি এক নবতম আলোকের সন্ধান পাইয়া প্রজ্ঞায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী ছিল অপদেবতার পূজারী ও উপদেবতার উপাসক এখন হইতে হইল দেবতার লীলাসহচর ও দেবকল্প মহাপুরুষের ভক্ত। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা মধুময় ঘটনা আর কি ঘটিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত, চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুত্রয়ের আবির্ভাব এই বাঙ্গালাদেশেই হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে অমিয়-ধারা প্রবাহিত করিলেন, তাহা সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া দিল, নবগঠিত জাতি তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ লাভ করিল। শ্রীবৈষ্ণবদিগের অনুপ্রেরণায় জাতির জীবন বৈষ্ণব ভাবাবেগে রণিত হইয়া উঠিল, তাহাদের হাতের রচনা সমস্তই বৈষ্ণব ভাবোন্মাদনায় রণিত হইয়া পড়িল, বৈষ্ণব সাহিত্য পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়া বহুধারায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। শ্রীপাদরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া একটি ধারা সংস্কৃত ভাষায় প্রবাহ লাভ করিল, আর একটি ধারা কবিরাজগোস্বামী, নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বৈষ্ণবের ভক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় পূর্ব্বক বঙ্গ ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। আর একটি ধারা অবলম্বন করিল—পদাবলী সাহিত্য। পদাবলী সাহিত্য যে কেবল বিশিষ্ট রূপই লাভ করিল, তাহা নয়, বৈচিত্র্যও বাড়িয়া গেল। একটি শাখা লোচনদাস, নরহরি দাস, বাসুদেব প্রভৃতির পরিচালনায় শ্রীচৈতন্যের মহাবেশময় লীলাবৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়া উঠিল। আর একটি শাখা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির পরিচালনায় বৃন্দাবনলীলার অনুসরণে নবদ্বীপ লীলার রচনা করিল। নব নব রসের সমাবেশে কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কেলিকে ছাড়িয়াও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইল। আবার আর একটি ধারা শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতির পরিচালনায় বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদাবলী একত্র সঙ্কলিত হইয়া রসের ক্রম বিবর্ত্তনের ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক বিভিন্ন লীলা রচিত করিয়া তুলিল এবং সেই পালাই গ্রামে গ্রামে রসকীর্ত্তন সঙ্গীতরূপে গীত হইয়া বাঙ্গালার জাতীয় জীবনকে রসজীবন করিয়া গড়িয়া তুলিল।

এইরূপেই বৈষ্ণব সাহিত্য জাতির মর্মে মর্মে গাঁথিয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণব সাহিত্য কেবলমাত্র সাহিত্যই নয়। যাঁহারা সাহিত্য হিসাবে ইহার গ্রাহক হইতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য ইহাতে বিমলানন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত রস কেবল তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যাঁহারা এই সাহিত্যের মধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকেই পরম প্রেমাস্পদ কল্পনা করিয়া তাঁহারই সহিত শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর প্রণয়লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন—কিন্তু চৈতন্য পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ মধুর ভাবে আরাধনার প্রবর্ত্তন ত করিলেনই এবং তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া সমস্ত প্রকার মনের সম্পর্কের ভিতরেই শ্রীভগবানের প্রকাশ ও লীলা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অনুভব করিলেন যে—যাহাকে আমরা ভালবাসি, কেবল তাহার মধ্যেই আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা—প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না। সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না—তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহ তরে
যথাসাধ্য যে যাঁহার ; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তারা
লুটে পুটে নিতে চায় সব। এত গীতি
এত ছন্দ, এত ভাব উচ্ছ্বসিত প্রীতি
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধা স্রোতে।

এই জন্যই বলিতেছিলাম যে সাহিত্যের রূপ ছাড়াও ইহার আর একটি রূপ আছে, যাহা সন্দর্শনে ভক্তহৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। ইহা একদিকে যেমন ধর্ম্মগ্রন্থ, তেমন আবার কাব্যগ্রন্থও বটে ; তাই শুকদেব বলিয়াছেন, 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। শ্রীমদ্ভাগবতের মাধুর্য্য পূর্ণ কাব্যরসকে আশ্রয় করিয়া জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি রসনির্ঝরিণী প্রবাহিত করিলেন—

তাহা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য, চৈতন্য নিত্যানন্দের পরশ প্রাপ্তিতে সমস্ত দেশকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল—

প্রেম বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়ায় কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি। প্রেমের আগ্রহে ও আর্ত্তিতে বিরহে ও মিলনে, বৈষ্ণব সাধনার পঞ্চ প্রণালীকে যেমন তিনি মূর্ত্তিদান করিয়া তুলিলেন, বৈষ্ণবের সাহিত্যও সেই নবপ্রবর্ত্তিত পথে কুল কুল তানে ভাবগীতি গাহিতে গাহিতে পরমানন্দে ছুটিয়া চলিল। এইজন্য এককালে কানু ছাড়া যেমন গীত ছিল না, পরে তেমনই আর গৌরচন্দ্রের চরিত বর্ণনা ছাড়া গীত কল্পনা করা যাইত না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যেমন প্রেমবন্যা প্রবাহিত হইল, তেমনই ছন্দ, গীত, সুর, ভাবধারা দিকে দিকে উৎসারিত হইয়া জগজ্জনকে মোহিত করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রাক্‌চৈতন্য যুগে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির অনুকরণে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, মৈথিলী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতির সংমিশ্রণে 'ব্রজ বুলি, নামে এক সুললিত, শ্রুতিসুখকর বৈষ্ণবীয় ভাষার জন্মদান করিলেন। ভগবৎলীলা মাধুর্য্যপূর্ণ এই যে কাব্য—ইহা বস্তুতই বিশ্বসাহিত্যে অতুল। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা লীলাকে রূপক বলিয়া মনে করেন। এরূপ শ্রেণীর লোকের স্বরূপ যে বৈদেশিক আওতায় নীলাম হইয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন—"যাঁহারা বাঙ্গালার প্রাণকেন্দ্র হইতে ইউরোপীয় বিশ্বসাহিত্যের ঝড়ে শতধা দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্বলীলার জীবন্ত-মূর্ত্তি স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।......কৃষ্ণ বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ বৈচিত্র্যে ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে। মুখস্থ করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—"সেদিন কবির চোখের সামনে কোন একটি মেয়ে ছিল, ভালবাসার কুঁড়ি ধরা তার মন। চোখে কাজল-পরা, ঘাটথেকে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা—সে মেয়ে আজ নেই, আছে সেই শাওন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানে তেমনি।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীবর্গ বৈষ্ণব-কবিতা যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমন খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাঙ্গালীর প্রাণের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বৈষ্ণব কবি যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও উষর চিত্তকে সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে তত্ত্ব অপেক্ষা রসের দিক দিয়া বুঝিলে ঠিক বুঝা যাইবে।

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
নয়ন মেলিয়া তোমা দেখি।

এই ভাব রসে উদ্বেলিত হইয়া যে কাব্য রচিত হইল, তাহার প্রধান আশ্রয় হইল প্রেম। আবার মানবের সূক্ষ্ম অনুভূতি বেদনা যে দিন পরম নিগূঢ় আস্বাদনের বিষয় হইল, সেই দিন তাহার আশ্রয় হইল গীতি কবিতা। বাঙ্গালীর সাহিত্য শিল্প ও চির-প্রচলিত রাজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লী বীথিকার কুসুম শোভিত ললিত বিতানের মধ্য দিয়া গীতি অক্ষরে নৃত্য করিতে করিতে আপনার চলার রাস্তা করিয়া লইল। এ ঝঙ্কার এখনও থামে নাই, বঙ্গ সাহিত্যে গীতি কবিতার প্রভাব এখনও উন্মূলিত হয় নাই। শুধু সাহিত্য সাধনা কেন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন, সামাজিক জীবনযাত্রা প্রণালীতেও ইহার ঢেউ যাইয়া লাগিয়াছে। "এদেশের পাখীর কূজন, অলির গুঞ্জন, নদীর কলধ্বনি, পত্রের মর্ম্মর, শিশুর কাকলী, পশুর কণ্ঠস্বর সবই ছন্দে গাঁথা। এদেশের উপাসনা হইতে ধানভানা পর্য্যন্ত সবই কবিতার ছন্দে। লৌকিক ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, রসতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ—সবই ছন্দ ছড়ায়। বালিকা পুণ্যি পুকুর, সাঁজ-সেঁজুতির ব্রত করে, পল্লীবালা ভাঁজো গায়, সতীলক্ষ্মীরা ব্রতোপাসনা করে, কন্যাদের অনঙ্করী শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যৎ শ্বশুর বাড়ীর আভাস দেয়, শিশুর চোখে সন্ধ্যা বেলায় ঘুম আনে, ভোরবেলায় তার নিদ্রাভঙ্গ হয়, দুপুরবেলায় তাহার দৌরাত্ম্য থামে, সবই কবিতার ছন্দে। ভগিনী ভ্রাতার কপালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ফোঁটা দেয়, জননী সন্তান সন্ততিকে আশীর্ব্বাদ করে, শিশুরা চন্দ্র সূর্য্য ঝড় বৃষ্টি পশু পাখীর সঙ্গে কথা কয়, কামিনীরা বেহাইকে ঠাট্টা করে, ভামিনীরা কলহ করে ছন্দ ছড়ায়। বহুদর্শী গ্রামবৃদ্ধই হোক, বর্ষিয়সী পল্লী মহিলাই হোক, ভূতের ওঝা, সাপের রোজা, নৌকার দাঁড়ী, পথের ভিখারী, পশারিণী, দেয়াশিনী, ফেরিওয়ালা সবারই সম্বল—সবারই পুঁজি কতকগুলি ছন্দে গাঁথা কাব্য কথা। দেশের প্রবাদ প্রবচন, শাসন বচন, অভিজ্ঞতার সকল ফলাফল কবিতার পংক্তিতে রচিত। শোকাতুর পল্লী-রমণীর উচ্চস্বরে রোদনের মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মকথা, মর্ম্মব্যথা, কর্ম্মপ্রথা সবই প্রকাশিত ছন্দে।" বাস্তবিক বাঙ্গালার আদি কবি জয়দেব গোস্বামী যে কি এক অভিনব অত্যুজ্জ্বল পরিস্থিতির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন কে জানে—কোথায় ইহার শেষ। জয়দেব যে পরিস্থিতির অবতারণা করিলেন, যাহার পতাকা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি সগৌরবে বহন করিয়া চলিলেন, তাহারই পটভূমির উপর আবির্ভূত হইল বাঙ্গালার প্রেম সাধনার সিদ্ধবিকাশ, অনন্ত রস ঘনমূর্ত্তি, নদীয়া জীবন ধন শ্রীচৈতন্য। আর সে ধারা আজিও জাতির প্রাণে প্রাণে অমলানন্দের অমিয় ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া বাঙ্গালীকে ভাব-সমৃদ্ধ সহজিয়া সাধক করিয়া তুলিয়াছে, তাহার শুদ্ধ শুভ্র হৃদয়াবেগকে অপূর্ব্ব সাহিত্য কথায় বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ। বাঙ্গালীর যাহা নিবেদন, যাহা তাহার হৃদয় মথিত ধন, তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্য দিয়াই মুক্তিলাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় কেলি বৈষ্ণবের আসল কথা নহে, ইহা প্রেম-সত্যকে অমর করিয়া রাখিবারই উপলক্ষ্য মাত্র। প্রণয় প্রণয়িনীর রুচি বিকশিত

ক্রিয়াকলাপে পৃথিবীর ইতিহাস দোষ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবগণ এক উদ্ভট গল্পের অবতারণা করিলেন—প্রণয়ী প্রণয়িনী তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়াও আরও দিবার আকাঙ্খা হইতে নিস্তার পাইল না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়ে ছিল মনে।

তাহার পর নিজেই তাহার উত্তর দিয়া বলিয়াছেন—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান" নহে—
"—আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ রাখে প্রিয় জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে—কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি—দিই তাই
প্রিয় জনে। প্রিয় জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে। আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির এই যে প্রেমের সন্ধান আমরা পাই, যে প্রেম শ্রীচৈতন্য নদীয়ার পথে পথে সশিষ্যে বিলাইয়া গেলেন, তাহা এক অভূতপূর্ব্ব সামগ্রী—

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।

এই প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ এবং ইহারই প্রভাবে জাতির চিত্ত সরস, সুন্দর, উন্নত, ধর্ম্মানুগত ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই প্রভাবে শাক্ত কবিদিগের শ্যামা সঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে আবার ইহারই প্রভাবের সহিত পাশ্চাত্য ভাবধারা মিলিত হইয়া বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যকে ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আধুনিক কালের কবিগণ এই বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্য্য ও পদ লালিত্যকে লালন করিয়া যুগোপযোগী নব নব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

এই জন্যই কত কাল চলিয়া গেল, কত যুগ পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু যমুনাতীরের সেই বিশ্ব-বিমোহিনী সুর ঝঙ্কার আজও থামিল না। আজ সে শ্যাম নাই, সে বাঁশরী নাই, কিন্তু ভক্ত ভাবুকের হৃদয়ে সে সুর গলিয়া গলিয়া তেমনি বাজিতেছে তাঁহারা তেমনই আকুল, তেমনই ব্যাকুল, তেমনই বিহ্বল!

ভাবের প্রবাহ কে কবে চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছে? ইহা যে আপনি উথলিয়া উঠে। ভক্ত হৃদয়ে প্রেমের পীযূষ প্রবাহ যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তখনই তাহার উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকাল কত যুগযুগান্ত পরে শ্যামসুন্দরের রূপে পাগল হইয়া, বাঁশরী বিতানে আত্মহারা হইয়া কেন্দুবিল্বের কুঞ্জ-কুটীরে কবি-কুল-চূড়ামণি জয়দেব গোস্বামী, নান্নুর পল্লীতে চণ্ডীদাস, মিথিলার নিভৃত কুঞ্জে বিদ্যাপতি, শ্রীখণ্ড গ্রামে গোবিন্দদাস, কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস, যে প্রাণ কাঁদান সঙ্গীত লহরী সৃষ্টি করিলেন, সে কোমল মধুর পদাবলী আজও জাতির প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া রহিয়াছে, একটা অভিনব ভাবগাথা সৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে, গৃহে গৃহে ভক্তি সহকারে পঠিত হইতেছে, অমূল্য সম্পদ রূপে সাদরে রক্ষিত হইতেছে।

এই যে বৈষ্ণব সাহিত্য, ইহা যেন সমুদ্রমুখী নদীর স্রোত—উভয় তীরে মনুষ্য বসতি, পুষ্পবন, গোচারণ মাঠ, শিশুর কাকলী, কত দৃশ্য—কত গন্ধামোদিত উপবন, কত সোনার ফসলে হাস্যময় দিগ্বলয়ে দিগ্বধূদের অকূল লীলা, কিন্তু মোহানায় পৌঁছিবার সময় দেখিবেন, দূরে সুদূর বিস্তৃত অনন্ত সাগর—যেখানে সমস্ত কল কোলাহল থামিয়া যাইয়া রহস্যের নির্ব্বাক ধ্যান মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণব কবিরা সংসারের কাহাকেও বাদ দেন নাই, সেই প্রেমময়ের নিত্যলীলা যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ তাহাকেও বাদ দিয়া হয় না। তাই তিনি সকলের জন্য ব্যাকুল। এইখানেই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। রস রহস্যের সংমিশ্রণে বৈষ্ণব সাহিত্য এই যে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে, এই ভাব পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

জীবনপথের এত ভ্রান্তি এত হাঁটাহাঁটি, এত সুখ দুঃখের পরিণাম কি তাহা আমরা জানি না—কিন্তু এই দুর্গম পথ যে ভবিষ্যতের বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত তাহা আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারি। বৈষ্ণব সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন ছত্র আছে, যাহাতে সেই অনন্তপথের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যই ইহা রসিক পাঠকের কাছে যেমন আদরের তাহা অপেক্ষা অধিক যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের নিকটও তেমনই উপভোগ্য। এই রসধারা মর্ত্ত্য পথ ধরিয়াই চলিয়াছে সত্যে, কিন্তু তবু বলিতে হইবে ইহা বিষ্ণু পদচ্যুত। জয়দেব লিখিয়াছেন—

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসু কলাসু কুতূহলম্
মধুকর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।

যাঁহারা ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনিতে চাহেন, এবং যাঁহারা পার্থিব প্রেমগীতিকা শ্রবণে উৎসুক তাঁহারা—এই উভয় বিধ পাঠকই গীতগোবিন্দ পরমানন্দ লাভ করিবেন।

চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের পদাবলী পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈষ্ণব কবি জগতের মধ্যে জগদীশ্বরকে দেখিয়াছেন, প্রেম মন্দিরে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না জানয়ে তারে,
প্রেমের আরতি যে জন জানায়
সেই সে চিনিতে পারে।

এই প্রেম তীর্থের পথিক আমাদের পরমারাধ্য। এই জন্য বিষ্ণুশর্ম্মা যেমন গল্প শুনাইতে যাইয়া রাজকুমারদিগকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, বৈষ্ণব কবিও তেমনই মাধুর্য্য প্রেম কাহিনী দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া জগজনকে সর্ব্ব কথার মধ্যে যাহা সার তাহাই শুনাইয়া দিতে যাইয়া সরস্বতীর এলাকা ছাড়িয়া সরস্বতীনাথের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কৃষ্ণের রূপ যেমন সর্ব্বত্র ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, কাব্যলক্ষ্মীও তেমনই অপরূপ বেশে সজ্জিতা হইয়া জগজনকে একেবারে তন্দ্রাভিভূত বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছিল নদেরচাঁদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলায়। মানব-দেবতার রূপ ও গুণের আস্বাদন মানসে পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ মধুচক্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছে কি না জানি না।

হে তপস্যার ধন, তুমি কেন একবার নদীয়াতে আসিয়া দেখা দিয়াছিলে, তাহা বলিতে পারি না। সাধকগণ যাহাকে নিমেষ মাত্র ধ্যানে পাইয়া আবার যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যা করিয়া চলে, তুমি কি সেই সাধনার মহাধন? সংসারে ত সকলেই ধন পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার মত কে কোথায় ভগবানের জন্য পাগল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়াছে। তোমার অশ্রুসজল চোখের কোণে যাহার প্রতিকৃতি পড়িয়াছিল, তাহাকে তোমার মধ্য দিয়াই ভারতবাসী বার বার মাত্র দর্শন করিয়াছে, আর সেই প্রেমধারা এখনও প্রবহমান রহিয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যের অমিয় সাগরে।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

শেষ জীবন

(১৬)

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উমেশচন্দ্র কলিকাতা বার হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৬ই জুন হইতে লণ্ডনে প্রিভি কৌন্সিলে জুডিসিয়াল কমিটিতে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এই বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যধন পরলোকগমন করেন এবং এই মৃত্যু-সংবাদে তিনি বিশেষ ব্যথিত হন।



সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যেষ্ঠা কন্যাসহ)

ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্র তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর কেবল প্রিভি-কৌন্সিলে ব্যারিষ্টারীই করেন নাই, ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া ব্রিটিশ জনসাধারণ ও জননায়কগণকে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টবোর্ণ পার্কে একটি সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের কথা অতি বিশদভাবে বিবৃত করেন। উহার কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া কলিকাতায় ন্যাশন্যাল রিডিং সোসাইটীর সদস্যগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক পত্র লিখেন। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাতপুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে উক্ত সোসাইটীর সহকারী সভাপতি ছিলেন। উমেশচন্দ্র এই পত্রের উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :

খিদিরপুর, বেডফোর্ড পার্ক
ক্রয়ডন
২৮শে মার্চ্চ ১৯০৩

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ৫ই তারিখের পোষ্টকার্ডের জন্য আমি অত্যন্ত বাধিত এবং ওয়েষ্টবোর্ণ পার্কের রবিবাসরীয় বৈকালিক সম্মেলনে আমি যে মতামত বিবৃত করিয়াছি তাহা আপনার এবং ন্যাশন্যাল রিডিং সোসাইটীর সদস্য ও অধ্যক্ষ সভায় প্রশংসা লাভ করিয়াছে জানিয়া আপনাকে ও তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য কাজ করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এদেশে পড়িয়া আছে, কিন্তু অর্থ ব্যতীত এদেশে আমাদের প্রচার কার্য্য পরিচালনা করা সহজ নহে—এবং আমাদের অর্থের অভাব। আমরা কি করিতেছি তাহা আপনারা 'ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে দেখিবেন এবং ভারতবর্ষের জাতীয় রাষ্ট্রসভার ব্রিটিশ কমিটিতে আপনাদের

সমাজ যাহা কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন—তাহা তৎকর্তৃক ধন্যবাদের সহিত গৃহীত এবং সাধুভাবে এদেশে ব্যবহৃত হইবে।

শ্রীযুত কৃষ্ণলাল বনার্জী বি-এল | আপনাদের বশংবদ
সহকারী সভাপতি, ন্যাশন্যাল রিডিং সোসাইটী | ডব্লিউ-সি-বনার্জী

তিনি ইংলণ্ডে কংগ্রেসের পার্লিয়ামেন্টারী কমিটীতে মূল্যবান পরামর্শ দিতেন, কংগ্রেসের লণ্ডনস্থিত মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া'র সম্পাদককে নানা তথ্য ও উপদেশ প্রদান করিতেন। হিউম একস্থানে বলিয়াছেন যে সকল সঙ্কটে তিনি পরামর্শ দিতেন ও মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। ভারতবর্ষের সকল সংবাদ তিনি সংগ্রহ করিতেন।

তিনি য়ুরোপীয় বেশভূষা আচার ব্যবহারাদি অবলম্বন করিলেও যাঁহারা তাঁহার স্বদেশের বেশভূষা আচার ব্যবহার নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করিতেন তাঁহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। বোধ হয় আচারনিষ্ঠ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বাহ্যতঃ যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত সেরূপ আর কাহারও সহিত নহে, অথচ স্যর গুরুদাসের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইলে উমেশচন্দ্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ঃ

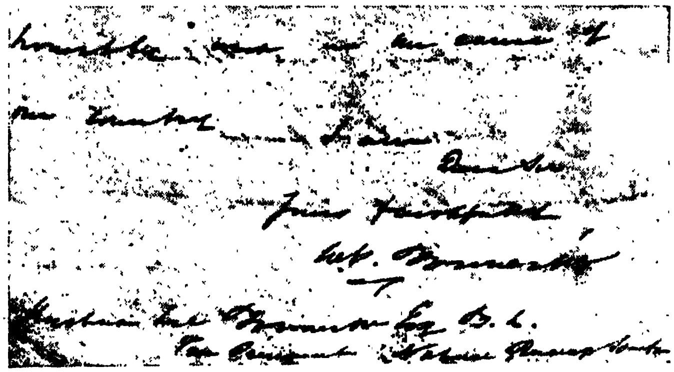
খিদিরপুর, বেডফোর্ড পার্ক
ক্রয়ডন
২৪শে জুন ১৯০৪

প্রিয় স্যর গুরুদাস,

আজ সকালের কাগজে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করিয়া নিজকে সম্মানিত করিয়াছেন দেখিয়া আমি অসীম আনন্দ লাভ করিলাম এবং এই উপলক্ষে আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। যদি আমাকে বলিতে অনুমতি দেন ত বলিতে পারি যে, আপনি যে যে পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহাতেই একনিষ্ঠভাবে যেভাবে দেশের সেবা করিয়াছেন তাহা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না এবং আপনার কর্তব্য-পরায়ণতার তুলনা নাই। যদিও আপনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সাধু, ন্যায়পরায়ণ, অমায়িক ও বিচক্ষণ বিচারপতি ছিলেন, তজ্জন্যই যে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি তাহা নহে। আপনি স্বদেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনচেতা বলিয়াই আপনাকে আমি ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয়, নবীন যুবকগণের মঙ্গল কিসে হয়, ইহাই আপনি অনুক্ষণ চিন্তা করেন। আমি আশা করি আপনার অবসর গ্রহণ করিবার পর আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং আপনি দেশের উন্নতির জন্য কাজ করিয়া যাইবেন। আমাদের বন্ধু রাজনারায়ণ মিত্র,—যিনি গলদেশে অস্ত্রোপচারের পর সম্প্রতি সুস্থ হইয়াছেন,—আমাকে তাঁহার প্রণাম জানাইতে বলিতেছেন এবং আপনার পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকাল সুখভোগের কামনায় আমার সঙ্গে যোগ দিতেছেন।

ভবদীয়
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের 'ব্রাইটস্ ডিজিজ রোগে দৃষ্টিশক্তি অতিশয় ক্ষীণ হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ উড এবং অন্যান্য সন্তানগণ



উমেশচন্দ্রের ইংরাজী হস্তাক্ষর

তাঁহার প্রিভি কৌন্সিলের মোকদ্দমার কাগজপত্র পড়িয়া দিতেন এবং তাঁহার পত্রাদি শুনিয়া লিখিয়া দিতেন। অবশেষে তিনি একেবারেই



স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃষ্টিশক্তিহারা হন, তথাপি জীবনের শেষ দিনগুলি পর্যন্ত তিনি কাজ করিতে বিরত হন নাই। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্বেও তিনি প্রিভি

কৌন্সিলে মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন। মিঃ এস্কুইথ (পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী), লর্ড হ্যালডেন, লর্ড রেডিং প্রভৃতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যেরূপ যোগ্যতাসহকারে মোকদ্দমা করিতেন তাহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয়দের মধ্যে প্রিভি কৌন্সিলের বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হইতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডের বন্ধুগণের অনুরোধে ওয়ালথামষ্টো হইতে উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধিরূপে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন। তিনি নির্বাচিত হইবেন এরূপ আশাও ছিল,



উমেশচন্দ্র ৫৭ বৎসর বয়সে

কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দৃষ্টিশক্তিহারা হওয়ায় তিনি সে প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন।

শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশের জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ৩রা নভেম্বর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে ক্রয়ডন হইতে তদীয় খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :

"স্বদেশী আন্দোলনের সহিত আমার গভীর সহানুভূতি আছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে দেশাত্মবোধ এখনও আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে, আর আমি বিশ্বাস করি, যদি যথাযথরূপে ইহা পরিচালিত হয় ইহাতে আমাদের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে—ভারতীয় ব্যাপারসমূহ এদেশের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে। শুধু ইহাই নহে, আমাদের লুপ্ত শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার হইবে এবং দেশের শিল্পজীবন সঞ্জীবিত হইবে।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ভারতবর্ষে যে সকল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা নির্বাচিত সভাপতির প্রার্থনায় তিনি প্রতি বৎসর তাঁহার মূল্যবান উপদেশপূর্ণ বাণী পাঠাইতেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে যেবারে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেবারে উমেশচন্দ্র সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে একটি দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহার এক-স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি সম্প্রতি এ দেশে আসিয়া সাধারণ সভাসমূহে এবং ব্যক্তিগত-ভাবেও এ স্থানের অধিবাসীদের সংস্পর্শে থাকিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এ দেশের লোকেরা ন্যায় বিচার করিতে অনুৎসুক নহে এবং আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ; আমাদিগকে কেবল দেখাইতে হইবে যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত। কংগ্রেসের সদস্যগণ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত এবং যদি আমরা প্রতিনিয়ত আন্দোলন করিয়া ব্রিটিশ জনসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী ন্যায় ও বিধিসঙ্গত, যে আমরা শাসন-



গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে

পদ্ধতি অবগত আছি এবং পরিচালনে সমর্থ, এবং এই অধিকার প্রদান করিলে আমাদের স্বদেশের এবং ইংলণ্ডের কল্যাণ হইবে, তাহা হইলে অনতিকালমধ্যে আমাদিগকে অধিকার দিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না। স্বরাজলাভের জন্য আমরা যে একান্ত উৎসুক এ ধারণা ব্রিটিশ জন-সাধারণের মনে বদ্ধমূল করিবার জন্য আমাদিগকে দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ বিষয়ক আন্দোলন অবিশ্রান্তভাবে চালাইতে হইবে, কারণ একমাত্র ব্রিটিশ জনসাধারণই আমাদিগের ঈপ্সিত অধিকার আমাদিগকে দিতে পারে। আমাদের দাবী যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ব্রিটিশ জনসাধারণকে দেখাইবার জন্য ভারতবর্ষে কংগ্রেস-নির্দ্দেশিত পথে আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে।"

কংগ্রেসের ইতিহাসে উমেশচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :

"তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তিনি অধিনায়ক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং

শাসকসম্প্রদায়ের বিরক্তি উৎপাদন করে—তিনি সে ভাবে রাজনীতিক আন্দোলনকারী ছিলেন না। তাঁহার সংশ্রব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে একটী দায়িত্বপূর্ণ ও গৌরবময় আসন প্রদান করিয়াছিল যাহা শাসকসম্প্রদায় সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহা হয়ত অন্যথা উহা লাভ করিতে পারিত না। * * *

তিনি কংগ্রেসের জন্মাবধি উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বের প্রভাব ব্যবহারাজীবদিগকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাগ্মিতায় তাঁহার সমসাময়িক কেহ কেহ তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছেন, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁহার সহযোগীদের কেহ কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু ধীর ও শান্তভাবে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যথোচিত উপায় উদ্ভাবন, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনীতি-বিশারদোচিত পরামর্শ ও নির্দ্দেশ প্রদান প্রভৃতিতে তিনি তাঁহার সহযোগীদিগের মধ্যে অতুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় জননায়কের আসন আজিও শূন্য রহিয়াছে। তিনি ইহলোকে নাই—তাঁহার আসন অধিকার করিতে কেহ নাই, এবং বাঙ্গালাদেশ তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অন্যতমটার বিয়োগব্যথা নীরবে বহন করিতেছে!"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই ক্রয়ডনে উমেশচন্দ্র দেহরক্ষা করেন এবং গোল্ডার্স গ্রীণে তাঁহার চিতাভস্ম সমাহিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন "দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি আমাকে বরোদায় লিখিয়াছিলেন যে এক দুরারোগ্য ও সাংঘাতিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি আর অধিককাল বাঁচিবেন না। আমি আশা করিয়াছিলাম উহা সত্য নহে; কিন্তু যখন একমাস পূর্ব্বে আমি ইংলণ্ডে আসিলাম এবং যখন আগমনের পর প্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তখন আমি দেখিয়া মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলাম যে তাঁহার অন্তিমকাল বহুদূরবর্ত্তী নহে। গত শনিবার ২১শে জুলাই ১৯০৬, মাননীয় মিষ্টার গোখলে ও আমি তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে গিয়াছিলাম! কিন্তু তিনি কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না,—প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করা হইতেছিল। সেই রাত্রেই আমরা টেলিগ্রাম পাইলাম যে তিনি আর ইহজগতে নাই!"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই দৌহিত্রী সুষমাকে রমেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "গত শনিবার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গিয়াছেন এবং দাদাভাইয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। গোখলে শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবেন, সুতরাং আমি ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের জন্য কাজ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহশীল, বৎসরান্তে একবার করিয়া ভারতবর্ষে যাইব।" ৩১শে জুলাই তিনি বিহারীলাল গুপ্তকে লিখিয়াছিলেন, "টেলিগ্রামে এখানকার সব খবরই পাইতেছ; মর্লির অতি সহৃদয়তাপূর্ণ বক্তৃতা এবং ভারতবর্ষকে কিছু যথার্থ অধিকার দান এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—যাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম।" রমেশচন্দ্র উমেশচন্দ্রের পরিবারবর্গের প্রায়ই সংবাদ লইতেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তাহার কন্যা কমলাকে লিখিত পত্রে আছে,—

"আমাকে লিভারপুলে মিষ্টার গোখলেকে এবং উমেশচন্দ্র বনার্জীর



উমেশচন্দ্র ৫৭ বৎসর বয়সে

কন্যাকে দেখিতে যাইতে হইয়াছিল, এবং গত কল্য এবং তৎপূর্ব্বদিন লণ্ডনে মিঃ জন মর্লির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হয়। * * *

আমাদের অন্যতম দেশসেবক মিষ্টার আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইলাম। এ দেশে গত দুই মাসের মধ্যে ডব্লিউ-সি-বনার্জী ও বদরুদ্দীন তায়েবজী ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। যাঁহারা বিগত যুগে রাজনীতিক কার্য্যে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে চলিয়া যাইতেছেন, নবীনগণকে এখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত আসন পূর্ণ করিতে হইবে এবং আমি আশা করি তাঁহারা তাহা যথাযোগ্যভাবে পূরণ করিবেন।"

ক্রমশঃ

সতক

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

জীবন জড়ায়ে মৃত্যু হাসিছে
চিত্ত ভাবনা হীন।
নিত্য কামনা জনম লভিছে
ভাঙা গড়া নিশিদিন॥...

জীবন-বীণার তন্ত্রীতে যবে
মরণ আঘাত হানে—
বাসনার ধূপ ধূম উদ্গারী
নির্ঘাস নাহি দানে॥

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

অমল সন্ধ্যার কিছু পরে গৌরীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

গৌরীর বাবা ও মা তাহাকে পরম আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহেশবাবু তাহাকে বারান্দায় মাদুরের উপর বসাইয়া বলিলেন—ইংরিজিতে এম এ পড়ছো—কেমন পড়াশুনো হচ্ছে? ফার্ষ্ট ক্লাস পাবে মনে হয়? আর পাবেই বা না কেন.—ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্সই ত পেয়েছিলে।

অমল বলিল,—এখন পর্য্যন্ত যেরূপ পড়াশুনা হ'য়েছে তা'তে আশা কম।

—কেন, কেন বাবা?

—টিউসনি ক'রতে হয়—টাকাটা ত নিজেই জোগাড় করি, কাজেই সুস্থ মনে পড়া অনেক সময় হয় না।

—যাক্, সামনের বছরটা যেমন ক'রে হোক্ পড়াশুনা ক'রবে, যাতে ফার্ষ্ট ক্লাস হয়।

অমল মহেশকাকার কথার মধ্যে আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়াছিল সন্দেহ নাই, তবুও তাহার মনে হইল এই সমাদর ও সাহানুভূতি নিরর্থক নাও হইতে পারে। গৌরীর সঙ্গে তাহার বিবাহের সামাজিক কোন বাধাই নাই। তাহার জীবনের প্রতি, কৃতকার্য্যতার প্রতি হয়ত সেই কারণেই তাহার এই আগ্রহ।

কাকীমা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে খাইতে ডাকিলেন। গৌরীই পরিবেশন করিবে। কাকীমা অমলকে বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—অমল, আমার কথা তোমার মনে আছে?

অমল কাকীমাকে দেখিয়াছে বটে কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। সে ঘাড় নাড়াইয়া সম্মতি জানাইল মাত্র। তিনি পুনরায় বলিলেন,—ছোটকালে তোমার আড়ি ছিল আমার সঙ্গে। তোমাদের পুকুরে জল আনতে যেতাম, তোমার বয়স হয় ত তখন বড়জোর ছয়। তোমাদের বড় ঘর ও পশ্চিমের পোতার ঘরের মাঝে এতটুকু একটু রাস্তাছিল, তুমি দুই ঘরের দাওয়ায় দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রোজই ব'লতে,—ছুঁয়ে দি ছুঁয়ে দি। মাঝে মাঝে ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে—

অমল হাসিয়া উঠিল,—গৌরীও মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া হাসিল। গৌরী অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে অমলের প্রতি একবার চাহিল।

—শুনলাম, দুপুরে নিজে রেঁধেছ, কি দরকার ছিল? ও গৌরীও নেহাত অবুঝ, আমাকে একটু জানাল না। কাল তুমি এখানেই খাবে, গৌরী তোমার মায়ের রান্না ক'রে দেবে।

অমল খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া বলিল—মার সঙ্গেই আমি খাবো।

কাকীমা একটু হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ত কোনকালেই এমন লাজুক ছিলে না। পুরুষ ছেলে একটু মাছ না হ'লে কি খেতে পারবে?

—ছোটকাল থেকে ত মার সঙ্গেই খাই,—আর মা—

কাকীমা পুনরায় একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—মার সঙ্গে বসে না খেলে ভাল লাগে না—না? বেশ বাবা তাই খাবে; কিন্তু তুমি ত ভুলে গেছ, ছোটকালে তুমি দিবারাত্রি একরকম আমার কাছেই থাকতে—তোমার মা ত তোমাকে দেখতে সময়ই পেতেন না। কত রাত্রি তুমি আমার এখানেই ঘুমিয়েছ—

অমল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলিল,—আমার মনে নেই ত।

—থাক্‌বে কি করে? তখন ত তোমার বয়েস বড় জোর দেড় বছর। তুমি সামনের উপর রান্না ক'রে খেলে তাই কষ্ট পাই—মা তোমার অবশ্য নই, কিন্তু কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ত ক'রেছিলাম—

গৌরী বলিল,—ভাত রাঁধার নমুনা ত দেখলাম—কিন্তু কিছুতেই স্বীকার যাবেন না যে পারি না।

অমল প্রতিবাদ করিল,—তোমার চেয়ে ভাল পারি,—আলু ভাতে ত মুনে পোড়া—

—মিথ্যে দোষ দিলেই ত আর হয় না।

কাকীমা হয়ত মনে মনে হাসিলেন—ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনায়। বলিলেন,—যাক্, কাল তোমরা দুটিতে মীমাংসা ক'রে নিও—তুই কাল দিদির রান্না ক'রে দিয়ে আসিস্—সকাল সকাল দশটার আগে—

—কিন্তু সে কি খাওয়া যাবে!—অমল মিটিমিটি হাসিয়া বলিল।

গৌরী বলিল,—আপনি ত ভারী ঝগড়াটে। দেখবো, জেঠিমা ত কাল খাবেন। তিনি ত মিথ্যা বলবেন না।

কাকীমা হাসিলেন,—মেয়ের এই স্বভাব-সুলভ প্রগলভতা দেখিয়া এবং খুশী হইলেন সম্ভবতঃ তাহাদের নৈকট্যের পরিচয় পাইয়া।

পরদিন সকালে পাড়ার উপর একটু ঘুরিয়া আসিয়া অমল দেখে,—গৌরী পিঠের উপর একরাশ ভিজাচুল ছড়াইয়া সমস্ত শক্তি দিয়া

বাটনা বাঁটিতেছে। শ্রমে মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। ভিজা চুল স্থানচ্যুত হইয়া বার বার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল,—মা, তুমি জল খেয়েছ?

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বেড়া হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—গৌরী থাক্‌তে তোর আর সে ভাবনা নেই।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস নিক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিলেন,—পরের মেয়ে, কবে বিয়ে হ'য়ে কোথায় চলে যাবে! বুড়োকালে যদি ওর মত কেউ কাছে থাক্‌তো তবে ত কোন ভাবনাই ছিল না।

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া গৌরী মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মা পুনরায় বলিলেন,—তোকে বিদেশে পাঠিয়ে কত ভাবনাই ভাবি কিন্তু কি ক'রবো! আমি যদি মরে যাই তুই কি ক'রবি, একটু স্থিতি ভিতি ক'রে দিয়ে যেতে যেন পারি।

অমল বলিল,—ও-সব কি ব'লছো। ক'লকাতায় আমার কোন কষ্ট হয় না। যাক্—কিন্তু—

গৌরী চট্ করিয়া বলিল,—কিন্তু কিন্তু করেন কেন? চা খাবেন ব'ললেই হয়।

অমল ব্যঙ্গ করিল,—তুমি কি চা ক'রতে পারবে?

গৌরী হাসিয়া বলিল,—আমি ত স্বীকার করেছি যে আপনি আমার চেয়ে অনেক ভাল রাঁধ্‌তে পারেন তবে আবার কেন? আমাদের তৈরী চা ভাল না লাগারই কথা—

—কারণ?

—মিস্ অপর্ণা রায়ের মত বিদুষী মেয়েদের হাতে যাঁরা চা খান তাঁদের গেঁয়ো চা পছন্দ হবে কেন?

অমল চিন্তা করিয়া বুঝিল,—টেবিলের উপর লেখা চিঠিখানার ঠিকানা অন্ততঃ গৌরীর চোখ এড়ায় নাই।

মা প্রশ্ন করিলেন,—তুই ত থাকিস্ মেসে, তোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় হল কেমন করে?

অমল বলিল,—আমাদের সঙ্গেই পড়ে যে, নিজেই আলাপ ক'রেছে।

—খুব বড়লোক?

—হ্যাঁ, খুব না হ'লেও বড়লোক।

গৌরী প্রশ্ন করিল,—কেমন দেখ্‌তে?

অমল চট্ করিয়া জবাব দিল,—তোমার চেয়ে সামান্য একটু ভালো।

গৌরী হতাশ সুরে বলিল,—তবে আর চা ক'রে কি হবে! এত খারাপ হবেই।

—হোক্, মাঝে মাঝে খারাপ চা খেতে হয়।

মা হাসিলেন,—গৌরীও হাসিয়া উঠিল। মা অপর্ণার প্রসঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন করিলে, অমল চিঠি লিখিবার কারণ, তাহার সহানুভূতি ও কুশল প্রশ্নের জন্য ব্যস্ততার কথা সকলই জানাইল।

গৌরী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল,—খুব সুন্দরী?

অমল হাসিয়া জবাব দিল,—ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দরী।

গৌরী ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিল,—ও বাবা!

যাহাই হোক মা তাহাকে না খাওয়াইয়া কখনই খাইবেন না। অমল তাই সকাল সকালই খাইতে বসিয়াছিল। খাইতে বসিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—দুই রকমের মাছ, ও নানা তরকারী। সে প্রশ্ন করিল,—মা, মাছ এলো কোথা থেকে?

মা বলিলেন,—গৌরীর মা পাঠিয়েছে।

—এর আবার কি দরকার ছিল! আমি ত মাছ তেমন ভালও বাসিনা।

মা সামনে পিঁড়ির উপর বসিয়া ছিলেন, একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন,—দরকার তোর না থাক্‌লেও তার ত আছে। সেই ত তোর আসল মা,—তুই যখন ছোট, আমি ত ভাসুরপো আর দেওরপোদের জন্তে প্রাণপাত করে দিবারাত্রি কাটিয়েছি, তোর দিকে ফিরে চাইবার অবসরও হয়নি, তখন ওই ত তোকে রাখতো—ওর ছেলেপুলে ত অনেক বয়সে হ'য়েছে তাই—আর তার ত গৌরীই বড় মেয়ে।

অমলের মনে পড়ে, বিধবা হইবার পরে এই সংসারে তাহার মা দিবারাত্রি ধান ভানিয়া, রান্না করিয়া কোন মতে শ্বশুরের ভিটা ধরিয়া পড়িয়া ছিলেন—তখন তাহার সংসারে আদর না ছিল এমন নয় কিন্তু যেদিন তাহার প্রয়োজন ফুরাইল সেদিন সরিকরা সকলেই তাহাকে এখানে নির্ব্বাসিত করিয়া, নিরুপায় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল—অমল নিজের বাহু বলেই আপনার শিক্ষালাভ করিয়াছে। অমল এ সকল জানিত,—তাই গৌরীর মায়ের প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মা ধীরে ধীরে বলিলেন,—যাদের জন্তে তখন আমি তোর দিকে তাকাইনি তারা ত কেউ আমাকে দেখ্‌লো না,—কিন্তু গৌরীর মা সেদিনও ছিল আজও আছে। নইলে আজ তার আর আমাদের মধ্যে কত তফাৎ তবুও সে ত ভুলে যায় নি। যাদের জন্য প্রাণপাত ক'র্‌লাম তারা ত এখন বড় হ'য়েছে, আমরা বেঁচে রইলুম কি না সে খোঁজও ত তারা একবার নেয় না।

অমলের আরও মনে পড়ে, সে যখন স্কলারসিপ পাইয়া ম্যাট্রিক পাশ করিল তখন সকল জেঠতুতু খুড়তুতু ভাইকেই মা অনুরোধ

করিয়া ছিলেন কিন্তু কেহ তাহার ভার লয় নাই—এমন কি বাসায় থাকিতে দিলেও সে পড়িতে পারিত—নানা অজুহাতে তাহারা তাহাও থাকিতে দেন নাই। এমনকি এজমালি সম্পত্তির উপযুক্ত অংশ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। নানা কথা মনে পড়িয়া অমলের মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—দরিদ্র দেখিয়াও যাহারা সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায় তাহারা সত্যই মহৎ। কৃতজ্ঞতায়, করুণায় বিষণ্ণতায় তাহার মন আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

গৌরী প্রশ্ন করিল,—রান্না কেমন হ'য়েছে ব'ললেন না।

অমল মুখ তুলিয়া বলিল,—বেশ হ'য়েছে, সত্যিই তুমি ভাল রাঁধতে পারো।

গৌরী প্রশংসা শুনিয়াও খুশী হইল না—সে এমনি উত্তর আশা করে নাই। অমলের নিন্দার অন্তরালে প্রশংসা থাকিত, আজ তাই তাহার মনে হইল যেন এই প্রশংসার অন্তরালে নিন্দাই রহিয়াছে। গৌরী তাই মুখ ভার করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল পুনরায় হাসিয়া বলিল,—সত্যই ভাল হ'য়েছে। কিন্তু গৌরী তাহা বিশ্বাস করিল না।

খোকার পড়ার ক্ষতি হইতেছে এবং নিজেরও হইতেছে, অতএব অমল তিন চারদিন পরেই কলিকাতা ফিরিয়া আসিল। যে কয়েকটি টাকা টিউসনি হইতে পাইয়াছিল তাহা যাতায়াতে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—মেসের টাকা বাকি। একটি মাস এখনও চালাইতে হইবে, বাড়ী হইতে এই বৈশাখ মাসে কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। নিজের অবস্থার কথা নিরুপায় মাতাকে জানাইয়া কোন লাভ নাই।

যে কয়েকটি টাকা ছিল মেসের ম্যানেজার বাবুকে দিয়া সামান্য কয়েক আনার পয়সা যে নিজের অত্যাবশ্যক খরচের জন্য রাখিয়া দিল। কলেজে যাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না—কেন সে নিজেও বুঝিতে পারে না কিন্তু যাইতেই হইবে। অন্যসূত্রে কিছু একটা উপায় করা প্রয়োজন। রোমাঞ্চকর উপন্যাস প্রকাশক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত তাহার সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচয় হইয়াছিল—হয়ত পরিশ্রম করিলে কিছু করা যাইতে পারে। বিলিতি উপন্যাস ত তাহার কিছু কিছু পড়া আছে, প্রয়োজন হইতে পড়াও যাইতে পারে।

কলেজে যাইয়া অমল দ্বিতলের বারান্দা দিয়া যাইতেছিল,—আগে আগে একদল ছাত্রী যাইতেছেন—অপর্ণা কি যেন বলিতে বলিতে যাইতেছে। অকস্মাৎ সে ফিরিয়া, স্বদল ত্যাগ করিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কখন এলেন?

—আজ সকালে।

—মা পথ্য করেছেন?

অমল লক্ষ্য করিয়াছিল মা'র পূর্ব্বে অপর্ণা 'আপনার' কথাটা বাদ দিয়াছে—সহসা কি যেন ভাবিয়া সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ, পথ্য করেছেন।

—এত সকালেই ফিরলেন যে!

—সেখানে থাকবার প্রয়োজন কিছু নেই, তাই আর রইলাম না।

—তাঁকে একটু সবল ক'রে এলেই ত পারতেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার প্রয়োজন হ'ল না।

অপর্ণা এতক্ষণে প্রশ্ন করিল,—যেয়ে কি রকম দেখ্‌লেন।

—অসুখ সেরেছে, তবে পথ্য করেন নি, খুব দুর্ব্বল—

অপর্ণার জন্যে তাহার বান্ধবীগণ এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু অপর্ণার প্রস্থান করিবার কোনরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া চলিয়া গেল।

অমল হাসিয়া বলিল,—আপনার যথেষ্ট সাহস বেড়েছে দেখছি।

—কেন?

—এত লোক সমক্ষেও আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে আপনার সাহস হ'য়েছে—এটা—

অপর্ণা কটাক্ষ করিয়া কহিল,—ও এই? আপনারা কি বাঘ যে ভয় ক'রবে—

অমল হাসিয়া কহিল,—আয়নায় দেখ্‌লে এ কথা বিশ্বাস হয় না কিন্তু আপনাদের মুখ চোখ ঐ কথাটাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপর্ণা একটু তিরস্কারের সুরে বলিল,—এত দিন পরে দেখা হল, তাতেও ঝগড়া ক'রবার লোভ আপনি সংবরণ ক'রতে পারছেন না! আশ্চর্য্য আপনার মন—

অমল স্বীকারোক্তি করিল,—সত্য কথা ব'লতে কি, ঝগড়া—যদি তাই হয় তাতেই খুব আনন্দ পাই।

অপর্ণা হাসিয়া ব্যঙ্গ করিল,—You are brutally cruel.

একটা ঘণ্টা বাজিল।

অমল বলিল,—চলুন, ক্লাসে।

—ক্লাস হবে না, চলুন লাইব্রেরীতে যাই—না হয় গল্প করি—

অমল অপর্ণাকে অনুসরণ করিয়া চারতলায় একটি শূন্য কক্ষে উপস্থিত হইল। অপর্ণা একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল,—বসুন, আপনার সমস্ত কাহিনী শুনি। আপনার পত্রের জন্যে আমি সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রেছিলাম—যা হোক সংবাদ পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

অমল সমগ্র ঘটনাই বর্ণনা করিল,—তুচ্ছ, তুচ্ছতম সমস্তই

বলিল কিন্তু দুইটা সংবাদ যা অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য তা সে গোপন করিল এবং প্রসঙ্গ ক্রমে এড়াইয়া গেল—একটি তাহাদের দারিদ্র্য এবং অপরটি গৌরীর সম্বন্ধ।

জানালার ফাঁকে দূর দিগন্তের যে অংশটুকু দেখা যাইতে ছিল তাহারই মাঝে ধূসর একখানি নিবিড় মেঘের পানে চাহিয়া অপর্ণা সমস্তই শুনিল। অমল চুপ করিলে ক্ষণিক পরে অপর্ণা বলিল,—মা আমার পত্র দেখে ছিলেন।

—কি ব'ললেন?

—তিনিও আরোগ্য সংবাদে আনন্দিত হ'লেন! অপর্ণা আরও কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল।

অমল তাই প্রশ্ন করিল,—আর কিছু?

—আর আবার কি? আপনি এলেই একবার নিয়ে যেতে বলেছেন।

—ভাল—অবশ্যই যাবো।

—কবে?

—আজই চলুন। ওখানে যেয়েই চা খাবেন।

—বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আপনাকে ক'রতে পারি—নির্ভয়ে?

অপর্ণা হাসিয়া বিদ্রূপ করিল,—আমাদের কাছে ভয়—এত বিনয় আপনার?

অমল বলিল,—এতদিন আপনাদের দলের মাঝে থেকে আমাকে কখনও চেনেন এমন ভাব দেখান নি, কিন্তু আজ যথেষ্ট ব্যঙ্গ সহ্য ক'রতে হবে জেনেও কেন অকস্মাৎ বেরিয়ে এলেন—

—সংবাদটার জন্যেই. আর পূর্ব্বে আসিনি তার কারণ, প্রয়োজন ছিল না। আজ আপনাকে কোন প্রশ্ন না ক'রলে দুঃখ পেতেন হয়ত—

ও আমাকে দুঃখ দিতে চান না তা হ'লে!

—সজ্ঞানে ইচ্ছা করি না,—তবে আপনার মনে এ সুবুদ্ধিটুকু থাকলে সুখী হ'তে পারতাম।

অপর্ণা অকস্মাৎ উঠিয়া গেল। অমল স্থবির, জীর্ণ জড়ের মত তাহার গমন পথের পানে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই অনাগত স্বপ্নের সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

থানার আপিসের Supdt লোকেন চাটুজ্জে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কতগুলি ছবি দেখছে। একটা ফাইল হাতে কনষ্টেবল রামটহল ঢুকল। ঘরে অনেকগুলি চেয়ার টেবিল আলমারি ইত্যাদি

রামটহল। সেলাম হুজুর।

লোকেন। সেলাম।

রামটহল। ইয়ে ফাইল কহাঁ রক্‌খে হুজুর!

লোকেন। এই টেবিলে রাখ। আর আজকের কাগজটা নিয়ে এস।

রামটহল। জী হুজুর। (টেবিলের ওপর ফাইল রেখে রামটহলের প্রস্থান। লোকেন টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফাইল দেখছে এমন সময় ইন্সপেক্টর খগেন দত্তর প্রবেশ)

খগেন। দেখলুম ব্যারিষ্টার দ্বিজেন বসু এসেছেন...

লোকেন। বেশ। আমি প্রস্তুত।

খগেন। কিন্তু ওর মেয়েও সঙ্গে এসেছেন—

লোকেন। মিস্ বসু?

খগেন। হ্যাঁ।

লোকেন। কেন? কেসের সঙ্গে ওঁর কি সংস্রব।

খগেন। প্রেম। আমার মনে হয় মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে মিস্ বসুর একটু—

খবরের কাগজ নিয়ে রামটহলের প্রবেশ

রামটহল। হুজুর আজকা অখবার আউর এক সাহব আয়ে হ্যায় উনকা কার্ড। (লোকেনকে খবরের কাগজ ও কার্ড দিলে)

লোকেন। দ্বিজেন বসু, বার-অ্যাট্-ল, এম-এল-এ।

খগেন। মিস্ বসুকে তো আসতে বারণ করা যাবে না।

লোকেন। ভাল দেখায় না। আর আপত্তি করবার বিশেষ কোন কারণও দেখি না।

খগেন। করে কোন লাভও নেই। বাড়ী গিয়ে মিষ্টার বসু মেয়েকে সব কথাই বলবেন। তার চেয়ে উনি এইখানেই আসুন, তাহলে আর অভদ্রতার দোষ পেতে হবে না—

লোকেন। ইউ আর রাইট। রামটহল, সাব কো সেলাম দেও—

রামটহল। জী হুজুর। রামটহলের প্রস্থান

লোকেন। মিষ্টার চৌধুরীর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ পেয়েছ?

খগেন। না, বিশেষ কিছু নয়…

লোকেন। আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হবে, মিস বসু মিষ্টার চৌধুরীকে গিয়ে এখনই জানাবেন।

খগেন। বন্ধ করতে হবে—

লোকেন। লাভ?

খগেন। বিশেষ কিছু নয়।

লোকেন। ধর মিস্ বসু গিয়ে তাকে সব কথা বললে। সে যদি নির্দোষ হয় তাহলে তখুনি আমাদের কাছে এসে ব্যাপারটা কি খোলাখুলি-ভাবে জানতে চাইবে, আর যদি দোষী হয় তা হলে চুপ করে যাবে।

খগেন। এর উল্টোটা যদি করে তা হলেও তো কিছু অস্বাভাবিক হবে না। দোষী হলেও অনেকে সাধুর ভাণ করে এসে ব্যাপারটা কি খোলাখুলি ভাবে জানতে চায়, আবার অনেক নির্দোষীও হাঙ্গামার ভয়ে চুপ করে যায়।

লোকেন। তা বটে। আসল ব্যাপারটা যে কি তা তো বুঝতে পারছি না আর তুমিও বিশেষ বোঝাতে পারছ বলে মনে হচ্ছে না।

খগেন। তার কারণ ব্যাপারটা যে কি তা আমি নিজেও এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি। আমরা আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে চোর ধরি কারণ আমরা জানি যে পৃথিবীতে কোন দু'জন লোকের আঙ্গুলের ছাপ এক রকম হয় না। এটা সত্য তো?

লোকেন। হ্যাঁ, ধ্রুব সত্য।

খগেন। কিন্তু এই প্রতুলবাবুর কেসে তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। কাল রাত্রে আমি তাঁর আঙ্গুলের ছাপ এনলার্জ করে আমাদের রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়েছি—

লোকেন। কিন্তু প্রতুলবাবুর আঙ্গুলের ছাপ তো আমাদের রেকর্ডে নেই।

খগেন। না। কিন্তু ওঁর ছাপ মিলেছে আর একজনের ছাপের সঙ্গে—একেবারে হুবহু।

দ্বিজেন বসু ও মল্লিকা বসুর প্রবেশ

লোকেন। আসুন মিষ্টার বসু। নমস্কার। নমস্কার মিস্ বসু।

দ্বিজেন। নমস্কার। আমাদের দেরী হয় নি তো।

খগেন। না স্যর। বসুন। (চেয়ার এগিয়ে দিয়ে) বসুন, মিস্ বসু। (উভয়ে বসল)

দ্বিজেন। ব্যাপারটা কি বলুন তো। টেলিফোনে বললেন একটা ভয়ানক দরকারী কথা আছে—

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। মিষ্টার প্রতুল চৌধুরীর সম্বন্ধে—

মল্লিকা। মিষ্টার চৌধুরীর সম্বন্ধে?

খগেন। হ্যাঁ মিস্ বসু। দেখুন মিষ্টার বসু আমরা তাঁর সম্বন্ধে ভয়ানক ধাঁধায় পড়েছি।

দ্বিজেন। কেন? সে কি করেছে?

খগেন। কিছুই করেন নি। সেইখানেই তো মুস্কিল।

মল্লিকা। তবে আপনি তাঁকে জড়াচ্ছেন কেন?

খগেন। আমরা জড়াচ্ছি না, তিনিই আমাদের জড়িয়েছেন—

দ্বিজেন। আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

লোকেন। খগেন, সমস্ত ব্যাপারটা প্রথম থেকে মিষ্টার বসুকে খুলে বল। আমরা ওঁর পরামর্শ চাই।

দ্বিজেন। নথিং অফিশিয়াল?

লোকেন। আজ্ঞে না। এ কাজে হাত দেবার আগে আপনার একটা মতামত দরকার। অবশ্য ইনফর্ম্যালি। আপনি ক্রিমিন্যাল ল-এ এক্স্পার্ট—খগেন, তুমি ওঁকে কেসটা সব খুলে বল।

খগেন। দেখুন মিষ্টার বসু, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিছলুম, রেজার সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন করব বলে। সে জেল-ফেরত আসামী জানেন তো? সেখানে আমি কথায় কথায় মিষ্টার চৌধুরীকে একটা ছবি দেখাই তাতে ওঁর আঙ্গুলের ছাপ পড়েছিল। কৌতূহলবশতঃ—

মল্লিকা। রেজা ছল মাত্র, আঙ্গুলের ছাপ জোগাড় করাই আপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল।

দ্বিজেন। মল্লিকা চুপ কর। আগে সবটা শোনো।

খগেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান লোক। মিস্ বসু যা বললেন তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। আমি তাঁরই সামনে যে ছবিটায় ওঁর আঙ্গুলের ছাপ নিয়েছিলুম তা মুছে ফেলবার ভাণ করি। একটু আধটু মুছেও গিছল, কিন্তু ছবির উল্টো পিঠে তা পরিষ্কার ভাবে পড়েছিল, কারণ প্রিন্টটা আগে থেকেই এইজন্য তৈরী করা ছিল।

মল্লিকা। আউটরেজাস!

খগেন। প্লীজ মিস্ বসু! তারপর সেই ছবিটাকে আমি এনলার্জ করে আমাদের রেকর্ডে খুঁজে দেখি—

মল্লিকা। তাঁর আঙ্গুলের ছাপ আপনাদের রেকর্ডে কোত্থেকে এল?

খগেন। তাঁর আঙ্গুলের ছাপের রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। মিষ্টার বসুর এই আঙ্গুলের ছাপের সিষ্টেম যে নির্ভুল তা আপনি বিশ্বাস করেন?

দ্বিজেন। নিশ্চয়ই করি।

খগেন। আর পৃথিবীতে কোন দু'জন লোকের আঙ্গুলের এক ছাপ হতে পারে না, তাও স্বীকার করেন?

দ্বিজেন। করি। কিন্তু এ সব কথা কেন?

খগেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দিল্লীতে একটা বিখ্যাত ব্যাঙ্ক রবারীর কেস্ হয়েছিল জানেন?

দ্বিজেন। হ্যাঁ সে বিষয়ে কিছু কিছু শুনেছি—

খগেন। সে মিষ্ট্রি সলভ্ড হয়নি। হেড আপিস থেকে ব্রাঞ্চে ভ্যানে করে টাকা নিয়ে যাবার সময় এই চুরিটা হয়। মিনিট দু'তিন পরে ব্যাঙ্কে টাকা গুণে নেবার জন্য ছাপ খোলা হতেই দেখা যায় তাতে শুধু কাগজ আর সীসে। ভ্যানের মধ্যে দু'জন লোক ছিল। একজনের

পায়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে চোট লেগেছিল। সে পথে নেমে গিছল— নিজের ব্যাগ নিয়ে—

দ্বিজেন। সেই চুরি করেছিল—

খগেন। নিশ্চয়ই, কিন্তু পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারে নি। হী সিম্পলি ভ্যানিশ্‌ড।

দ্বিজেন। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার তো।

লোকেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তবে সেই ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর পিছনে আর একজন লোক ছিল যার প্ররোচনায় এবং সাহায্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়। সেই লোকটা একজন কেমিষ্ট। তাকেও তারপর থেকে দিল্লীতে কেউ দেখে নি। পুলিশ তার কোন খোঁজ খবর আজ অবধি পায় নি, কিন্তু তার দোকানে কয়েকটা খালি শিশিতে তার হাতের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিছল। সেইটার এনলার্জড ফটোগ্রাফ প্রত্যেক বড় বড় শহরের থানার রেকর্ডে রাখা আছে।

খগেন। এই ঘটনার সাত বছর পরে করাচীতে ঠিক এই রকমই একটা রহস্যময় চুরি হয়। এও গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পায়ে চোট লাগা, নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমে যাওয়া ইত্যাদি সব সেই আগেকার মত—আর সেই লোকটা যে চুরি করেছিল তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় নি।

লোকেন। এতে কি মনে হয় না এর পিছনেও সেই কেমিষ্ট ছিল—

দ্বিজেন। তা হয় বই কি।

খগেন। আবার প্রায় সাত বছর পরে লাহোরে এই রকম ঘটনা ঘটল। সেই গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পায়ে চোট লাগা, নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমে যাওয়া, সব সেই রকম। সেবারেও চোরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু তার পেছনে যে লোক আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাকে ধরা গেল না। লোকেনবাবু তখন লাহোরে।

লোকেন। আমি তখন সবে চাকরীতে ঢুকেছি। সন্ধান নিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাড়ী আবিষ্কার করলুম। পাড়া প্রতিবেশী এর বেশী কিছু বলতে পারলে না। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না এবং রাত্রে কখনও বাড়ীর থেকে বার হতেন না। তাঁর ঘর থেকে আঙুলের ছাপ জোগাড় হ'ল, আর সেই ছাপ আগেকার রেকর্ডের ছাপের সঙ্গে মিলে গেল।

খগেন। একই রকম চুরি, পিছনে একই লোক, এবং সেই লোকটা কেমিষ্ট—

দ্বিজেন। রিমার্কেব্‌ল বটে!

লোকেন। এবং ক্রমেই ব্যাপারটা আরও রিমার্কেব্‌ল হয়ে উঠতে লাগল।

খগেন। তারপর ছ' সাত বছর অন্তর অন্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সেই একরকমের চুরি হতে লাগল। কখনও রেঙ্গুনে, কখনও মাদ্রাজে, কখনও কাশ্মীরে শ্রীনগরে। শেষ চুরির পর প্রায় সাত বছর হ'তে চলল—

লোকেন। তাই আমাদের মনে হয় শীঘ্রই সেই রকম একটা চুরি হবে।

দ্বিজেন। অতি আশ্চর্য্যের কথা তো!

খগেন। প্রত্যেক বার একই উপায়ে চুরি হয় কিন্তু নতুন নতুন কর্ম্মচারীর সাহায্যে। আর সেই কর্ম্মচারী যে কোথায় উধাও হয়ে যায়. পুলিশ শত চেষ্টা করেও তার সন্ধান পায় না।

মল্লিকা। তারা কোথায় যায়?

খগেন। তা বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয়—

দ্বিজেন। কি সন্দেহ হয়?

খগেন। যে তাদের খুন করে ফেলা হয়।

মল্লিকা। সকলকে।

খগেন। তাই মনে হয়।

দ্বিজেন। কিন্তু লাশ?

লোকেন। কখনও পাওয়া যায় নি। সেইটেই তো সব চেয়ে গোলমাল। কোন সূত্রই মেলে না। আজ অবধি সাতটা এই রকম ঘটনা হয়েছে—সেভেন পারফেক্ট ক্রাইমস্—

খগেন। অ্যাণ্ড সেভেন পারফেক্ট মার্ডার্স। সেই জন্যই পুলিশ রেকর্ডে এটা ক্লাসিক হয়ে পড়েছে।

দ্বিজেন। এবং এই হতভাগ্যদের পিছনে যে লোকটা, সেই সব টাকা আত্মসাৎ করেছে!

লোকেন। হ্যাঁ। পুলিশ তাকে ধরবার চেষ্টার ত্রুটী করে নি, দু'একবার কিছু কিছু এভিডেন্সও পেয়েছে—

খগেন। এবং তার চেয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট, কয়েকবার তার আঙুলের ছাপও পেয়েছে, কিন্তু তাকে পায় নি।

মল্লিকা। এ যেন রূপকথার মত শোনাচ্ছে।

খগেন। তা শোনাচ্ছে, কিন্তু অনেক সময় টুথ ইজ ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

লোকেন। লাষ্ট চুরি ঘটেছে—নাগপুরে। সেখানেও পুলিশ তাকে শত শত চেষ্টা করেও ধরতে পারে নি, কিন্তু আঙুলের ছাপ পেয়েছে। আমাদের কাছেও কপি পাঠিয়েছে।

দ্বিজেন। আগেকারগুলির সঙ্গে মিলে যায়?

লোকেন। একেবারে হুবহু।

দ্বিজেন। তাহলে শেষ বার যখন চুরি হ'ল তখন তার বয়স তো অনেক!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় আশী পঁচাশীর কাছাকাছি!

মল্লিকা। ডিটেক্‌টিভ গল্প হিসেবে ব্যাপারটা খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সবের সঙ্গে মিষ্টার চৌধুরীর কি সম্বন্ধ?

খগেন। আমি তাঁর কথা ভাবছি না, ভাবছি আঙুলের ছাপের কথা।

দ্বিজেন। আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

খগেন। বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ফাইল খুলে কয়েকটা ছবি পাশাপাশি সাজিয়ে) এই দেখুন। প্রত্যেক চুরির তারিখ লেখা, যে কয়েকটা আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি তার এনলার্জড ফটোগ্রাফ আর তার পাশে এইটা মিষ্টার চৌধুরীর আঙুলের ছাপের ছবি। হুবহু মিলে যাচ্ছে না—লাইন, খব, দ্বীপ, উঁচু, নীচু—

দ্বিজেন। তাই তো। সবই যেন একই ছবির কপি—

লোকেন। অথবা একই লোকের আঙ্গুলের ছবি।

খগেন। অথচ দু'জন লোকের আঙ্গুলের ছাপ একরকম হয় না।

দ্বিজেন। তা তো হয়ই না। কিন্তু এও তো অসম্ভব!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মল্লিকা। সেই লোক আর মিষ্টার চৌধুরী এক লোক হতে পারেন না।

দ্বিজেন। প্রতুলের বয়স পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশের বেশী হবে না—

মল্লিকা। আর আপনাদের হিসেব মত তার বয়স পঁচাশীর কাছাকাছি—

খগেন। আপনারা যা বলছেন সবই ঠিক। কিন্তু এই আঙ্গুলের ছাপ নিয়েই হয়েছে মুস্কিল।

লোকেন। কারণ দু'জন ভিন্ন ব্যক্তির একরকম আঙ্গুলের ছাপ হতে পারে না।

মল্লিকা। হতে পারে। তার প্রমাণ এই ছবিগুলিই দিচ্ছে।

লোকেন। অথচ ভুল হওয়া অসম্ভব।

মল্লিকা। কিন্তু পঁচাশী বছরের বৃদ্ধকে পঁয়ত্রিশ বছরের লোক বলে মনে করাও অসম্ভব।

খগেন। তা অসম্ভব স্বীকার করি, কিন্তু আঙ্গুলের ছাপ এক হওয়া আরও অসম্ভব।

দ্বিজেন। আপনারা যা বলছেন তা যেন একটা হেঁয়ালী—

লোকেন। কিন্তু ছবি গুলি তো হেঁয়ালী নয় মিষ্টার বসু। তাদের অবিশ্বাস করব কি করে। যখন আঙ্গুলের ছাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে তখন আমাদের ধরে নিতে হবেই যে সেই লোক আর মিষ্টার চৌধুরী অভিন্ন।

খগেন। তাছাড়া মিষ্টার চৌধুরীও কেমিষ্ট।

মল্লিকা। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।

খগেন। আর যে ছবিটির আর্টিষ্টের সন্ধান পাওয়া যায় নি,—প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে দিল্লী প্রদর্শনীতে এগজিবিট করা হয়েছিল,—তার রঙ, এবং অঙ্কনপদ্ধতি আর মিষ্টার চৌধুরীর রঙ, এবং অঙ্কনপদ্ধতি হুবহু এক।

মল্লিকা। আপনি কি করে জানলেন।

খগেন। আপনাদের ড্রইংরুমে প্রতুলবাবুর আঁকা নৈনীতাল পাহাড়ের একটী ছবি আছে। মিষ্টার বসুই আমাকে এই অদ্ভুত মিলের কথা গল্পচ্ছলে একদিন বলেছেন।

মল্লিকা। আপনারা কি বলছেন! মিষ্টার চৌধুরী সে হতে পারেন না?

লোকেন। খোঁজ করে দেখতে হবে।

মল্লিকা। মানে?

লোকেন। খগেনবাবু যা তথ্য সন্ধান করেছেন তা কতদূর সত্য। যদি সত্য হয়—

মল্লিকা। যদি সত্য হয়...(একটু থেমে) কিন্তু তা যে হতে পারে না।

লোকেন। (যেন মল্লিকার কথা শুনতে পায়নি এইভাবে) যদি সত্য হয় তা হলে মিষ্টার চৌধুরীকে একদিন এখানে নিয়ে আসতে হবে—

মল্লিকা। তিনি না হয় এলেন, কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হবে?

লোকেন। যদি তিনি আসতে রাজী না হ'ন—

মল্লিকা। কেন হবেন না?

লোকেন। কারণ তিনি যদি সেই লোক হ'ন—

মল্লিকা। অ্যাবসার্ড।

লোকেন। রুটীনওয়ার্ক। উপায় নেই। আচ্ছা, নমস্কার মিষ্টার বসু। নমস্কার মিস্ বসু—

দ্বিজেন। নমস্কার। (উঠে দাঁড়াল)

মল্লিকা। কিন্তু এ কি বৃথা চেষ্টা নয়। অনর্থক জেনে শুনে—

লোকেন। তবু করতে হবে। কারণ তিনি যদি সেই লোক হ'ন তা হলে তাঁর বয়স এখন পঁচাশীর কাছাকাছি, আর সাত সাতটী খুনের জন্য তিনি দায়ী। জগতে অসম্ভব কিছু নেই, মিস্ বসু। কেঁচো খুঁড়তে অনেক সময় সাপ বেড়িয়ে পড়ে— ক্রমশঃ

বাঙ্‌লায় পূজা

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

সারা বৎসর পরে
ফিরে কি এসেছে পূজা?
বাঙ্‌লা গিয়েছে ম'রে—
কে পূজিবে দশভূজা?
তুমি নন্দিনী বন্দিতা মাতা,
শক্তি রূপিণী অপরাজিতা,
এলে তিনদিন তরে?
ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার বারি,
লজ্জা-বসন,—সব নিলে কাড়ি,
বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে।
প্রদীপ জ্বলে না শূন্য ভিটায়,
ভরেছে আগুন আগাছা কাঁটায়,—
বুঝি রাঙাপায় ফুটে।
বোধন-শঙ্খ বাজাবার বল
নাই কারো বুকে, নাই সম্বল—
ধূলায় ধূসর লুটে।
কত জন গেছে চ'লে চিরতরে
তুমি একবার ডাক নাম ধ'রে
বল—"উঠ উঠ জাগো!"
অকূলে কোথায় ভেসে গেল যারা,
যারা বেঁচে আজো হ'য়ে সব হারা,—
সাথে লও ডেকে মাগো॥

মরিতে চাহি না আমি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। সকাল থেকে বসে বসে এই কথাটা ভাবছি। একটা পুরাণো চিঠি সামনে খোলা পড়ে রয়েছে, আর একটা চিত্র চোখের সামনে ভাসছে। পাঁচ বছর আগে লেখা বন্ধুর একটা চিঠি, সৈন্য দলে যোগ দেবার আগের রাত্রিতে লেখা চিঠি, আসন্ন বিরহবিহ্বল বাঁচবার বাসনা-ব্যাকুল নব-বিবাহিতের চিঠি। তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর দেশ জার্মান অধিকৃত হয়েছে, নিজের দেশ চারিদিকে মুখরিত জলপ্লাবনের মধ্যে শেষ বৃক্ষটার মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকে কাল প্রত্যুষে সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। সে লিখেছে "আমার চারিদিকে পতনোন্মুখ পৃথিবী, প্রলয়োচ্ছ্বাসের জলকল্লোল কাণে এসে বাজছে, নবপরিণীতাকে পিছনে একা ফেলে রেখে যাওয়া অনন্ত দুঃখের। তবু তোমার দেশের যে কবির বাণী তুমি আমায় প্রায়ই বলতে সেটা আমি আমার এই শেষ চিঠিতে তোমায় শুনিয়ে যাচ্ছি—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" পাঁচ বছর আগেকার নীরব মরণের আহ্বান-রাত্রির ভাষা আজ সকালে আমার কাছে নিবিড় জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে তুলছে। মরিতে চাহি না আমি।

তবুও ত এই ছয়বৎসরে কত মৃত্যুর ও মৃত্যুর চেয়ে বড় ধ্বংসের খেলা ইয়োরোপে অভিনীত হয়েছে এবং কত ব্যাপক ও গভীরভাবে হয়েছে তার পরিমাণ এখনো কেহ জানে না। যুদ্ধ পূর্ব্বের আমার ইয়োরোপো অ'জ সুদূর অতীতের অলীক সুখ স্বপ্নের মত কোথায় হাতছানি দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। স্মৃতির পটে দাগ মিলাতে মিলাতে রণাঙ্গনে, বিপর্য্যস্ত প্রান্তরে ও সন্ত্রস্ত সহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বিচ্ছেদক্লিষ্টের অন্বেষী মন নিয়ে। কিন্তু কোথায় সে ইয়োরোপা যার মোহন মাধুরী ও অনন্ত জীবন অন্তরলোকে নূতন আলোকপাত করেছিল, যার দেওয়া কল্পনামালা ও আনন্দের অলক্তক রণক্ষেত্রের শত ধূম্রজাল সত্ত্বেও অমালিন থাকবে, যার ছোট ছোট ছবি, তুচ্ছ খেয়ালের খেলা, অকারণ আনন্দ ও বিফল বেদনার মুহূর্ত্ত গুলি স্মৃতির আনাচে কানাচে অনন্ত রূপ ধরে বার বার জেগে উঠছে? মিলিয়ে দিতে কি পারবে তাদের এই বিস্মরণের সুদূর প্রভাতের মায়ায় আজকের অচিরস্থায়ী ধ্বংস উৎসব, মানবাত্মার অনভিপ্রেত এই সর্ব্বনাশা মৃত্যু-অভিযান?

চিরচঞ্চলের মধ্যে নিত্যকালের যে আভাস ইয়োরোপ দেখিয়েছে তা হচ্ছে মানবের অনুভব, সুখ দুঃখ ভালবাসার বিচিত্র বিকাশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ বিগ্রহ বিপ্লবের বস্তুতন্ত্রের মধ্যেও ইয়োরোপ মানুষের কথা ভুলতে পারে নি। তাই দশবৎসর আগেকার পুরাণো ছবিগুলিরও শাশ্বতরূপ বার বার দেখতে পাচ্ছি খুব নিকটে। ন্যুরেমবার্গের অপরিচিত পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি দূরের একটা ঐতিহাসিক দুর্গের রহস্য উদ্ঘাটন করে আসার পর। যে ঘরে কয়েদীদের উপর মধ্যযুগের প্রথায় অত্যাচার করা হত ঠিক তার পাশের ঘরেই অতীতের কোন রাজকুমারীর চম্পকাঙ্গুলীর আলাপে অভ্যস্ত বিচিত্রবীণা একটা রাখা ছিল। তাতে কেমন করে লুকিয়ে রূঢ় অঙ্গুলীর আঘাতে সুরগুঞ্জন তুলবার চেষ্টা করছিলাম এবং কয়েকজন দর্শক তা শুনে কেমন করে কৌতূহলী হয়ে ছুটে এসেছিল সে কথা ভেবে বিদেশীজনোচিত গাম্ভীর্য্যের মুখোসের উপরও হাসি যে অসম্ভব ভাবে জেগে উঠছে তা বুঝতে পারছি আর অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে করতে চলেছি। এমন সময় পিছন থেকে কে ডেকে আমায় এই মানসিক বিপদ্ থেকে উদ্ধার করল। একটা বিস্কুটখণ্ডের লোক অর্থাৎ স্কট্‌ল্যাণ্ডের বাহিরের স্কট ছাত্র স্মিতহাস্যে আমায় আহ্বান করল। সে ভেবেছিল যে কোন বিশেষ কারণে আমি কৌতুক অনুভব করছি এবং যদিও আমি অপরিচিত, এই বিদেশে আমিই তার কাছে পরিচিত, কারণ ইংরেজীতে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলাপ করতে পারব। আর আমি যদি অপরিচয়ের ব্যবধান লঙ্ঘন করে তার ডাকে সাড়া দিই তাহলে সে আমার কৌতুকটার অংশ নিতে উৎসুক। এমন লোকের সঙ্গে ভাব না করে উপায় কি? তা ছাড়া জার্মান জীবনের মধ্যে প্রবেশ করবার ভাল চাবীকাঠী নিশ্চয়ই এর কাছে আছে। যে এমন ভাবে বিদেশীয়দের বর্ম্ম ভেদ করে এগিয়ে এসেছে সে নিশ্চয়ই এদেরও মধ্যে মিশে গেছে এবং হয়ত এরও মনের মধ্যে ঘুরছে সেই কবিতাটা—

'কত অজানারে জানাইলে তুমি।'

রাত্রে আমরা দুজনে মাটীর নীচে লুকানো একটা সপ্তদশ-শতাব্দীর পুরাণো 'সেলারে' রাত্রিভোজন করতে গেলাম। সে যুগের ব্যবহৃত পাত্রে যুগোপযোগী পানীয় আছে। দুজনের বাহুর ভিতর দিয়ে পরস্পর বাহু প্রসারিত করে তা পান করতে হয়। কারণ? কারণ খুব সামান্যই বলতে পারা যায়, অথবা বিশেষ অসামান্যও বটে। যে গানটা সবাই মিলে বাজনার তালে তালে ঐক্যতানে গাইছে তার অর্থ হচ্ছে—রাইন নদীর জলধারা সুন্দর, কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর হচ্ছে সে রাইনবালা—যার নয়নে সে জল প্রতিবিম্ব

ফেলে, যার কেশরাশি রাইনধারার মত অংশদেশে সাবলীল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, অতএব তোমরা সবাই 'সার্কলিং রাইন' পান কর। এমন গান, এমন উল্লাস ও পানীয় বিনিময়ের এমন রুচির প্রথা দেখে দেখে আশা মিটে না। রাইনের নামে সবাই বিহ্বল, গানে ও বাজনায় সবাই মুগ্ধ, আর বার্ণসের দেশের বন্ধুটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে যদিও সে খুব আনন্দ পাচ্ছে তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে বিঁধ্ছে। সে কি কারো প্রীতির স্মৃতি? সে কি কারো বিস্মৃত প্রীতি? না সে কি স্মরণে বিস্মরণে আলো আঁধারে জড়ানো আনন্দবেদনার অন্ধ অব্যক্ত অনুভবরাশি যা তার মৌখিক গীতি উচ্চারণের মধ্যে রূপ পাচ্ছে? মনে পড়ল বার্ণসের কবিতা—

My heart is sair
I dare na'tek,"

থাকুক না হয় তার মনে বেদনা। এই বিহ্বল রজনীর আনন্দ-চঞ্চলতা স্রোতের মত সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। দেশী বিদেশীর কোন প্রভেদ নেই; এত শুধু ভোজনশালা নয় এ হচ্ছে চিত্তবিশ্রামের আশ্রম। গীত সুধা ও পীত সুরায় সবারই 'পরাণ হল অরুণ বরণী'। কে বলে ভাঙ্গা কাঁচ ও ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া দেওয়া যায় না? ভাঙ্গার উপর বেদনার উপর ইয়োরোপে নূতন দাবী, নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী ও জীবনকে বহুভাবে নেবার দার্শনিকতা অহরহ প্রলেপ দিচ্ছে। তারই রাসায়নিক প্রক্রিয়া একদিন মনকে স্থিতিশীল ও দুঃখকে সহনীয় করে নেবে। এমনি করেই শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়, দেশ বিশেষ নয়, সমস্ত ইয়োরোপ বারবার বিপর্যস্ত ও যুদ্ধত্রস্ত হয়েও আবার গীতছন্দে আনন্দসম্ভারে প্রাণের উল্লাসে জেগে উঠবে। আজকের বোমারু বিমান নিপীড়িত আকাশের মোহন নীলিমায় লঘুপক্ষ পাখীর মত বিহার করবে মানুষ, ভগ্ন লুণ্ঠিত পুরাতনের জায়গায় তৈরী হবে নূতন পরিকল্পনায় গ্রাম ও সহর। ধ্বংসের মরুর উপর বপন করে নেবে নবশ্যাম তৃণদল।

যুদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল কি হয়েছে সেই জার্মান-ফরাসী নবদম্পতীটার, যারা রাইনবক্ষে আমার সঙ্গে এক জাহাজে জলবিহারে যোগ দিয়েছিল? সে দিনও এমনি ঘনঘটা জার্মানীর ভাগ্যাকাশকে মলিন করে তুলেছিল, আশঙ্কা সংশয়ে দোদুল্যমান ছিল 'সার' বাসী এই দম্পতীর মত। বরটী আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধবে?"

জার্মান বর ও ফরাসী বধূ। যুদ্ধ যদি বাঁধে হৃদয় ও কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব কাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে সে কথা মনে হল। তারা জানত না যে তাদের আগেকার কথাবার্ত্তার অনেকখানিই দ্রুতগামী ষ্টীমারের বাতাসে ভেসে আমার অবাঞ্ছিত কানে এসে পৌঁছিয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম যে শুনতে নেই এদের নিভৃত আলাপন; কিন্তু আমার অবস্থা তখন সেই কালিদাসবর্ণিত, ন যযৌ ন তস্থৌ। সরে যদি যাই এরা বুঝতে পারবে কেন সরে গেলাম; কে জানে তাতে হয়ত এই ক্রৌঞ্চমিথুনের কথোপকথনের যতিভঙ্গ হবে, আর আমার জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করা হবে না! আর যদি বিদেশী বলে কিছুই দেখছি না শুনছি না বুঝছি না এই ভাণ করে জাহাজের রেলিংয়ে ভর দিয়ে রাইনের শোভা নিরীক্ষণ করতে থাকি তাহলে শুধু এদের মধুচন্দ্র যাপনের কোন যতি বা ছন্দ কেন, মানবশাস্ত্রের কোন ব্যাকরণই ভঙ্গ হবে না একটুখানি প্রবঞ্চনা ছাড়া। তা এদের সুবিধার জন্য না হয় নিজে একটু পাপ সঞ্চয়ই করলাম!

বধূ। শোন, যে কথাটা আজ এতক্ষণ মনের মধ্যে ভারী হয়ে আছে। আজকের 'টাগেব্লাটে'র খবরটি ত ভাল নয়। কি হবে বল ত?

বর। কিছুই হবে না। আজ আমরা মধুচন্দ্র যাপনে চলেছি। আজ কিছুই হবে না।

বধূ। আজ ত কিছুই হবে না। কিন্তু পরে ত হতে পারে?

বর। জানি না। যদিবা কিছু হয় আমরা দুজনে ত তেমনি থাকব। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

বধূ। কিন্তু পারবে কি তুমি আমায় তোমার কাছে রাখতে? তোমার দেশ ত আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

বর। না, না, তা হতে পারে না। তুমি ত এখন আর ফরাসী নও, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

বধূ। যুদ্ধ হলে ত তাতেও হবে না। বিদেশী স্ত্রীদের ত গতবার আটক করে রেখেছিল।

বর। না, না, আজ ওকথা ভেবো না।

বধূ। তুমি যে কি বল। আমি কি ওকথা ভাবছি? তোমার কাছে আমি আছি; আমার ভাববার সময় কোথায়?

বর। ঠিক তাই; আমাদের এসব ভাববার সময় নেই।

খানিকক্ষণ সব নীরব। শুধু রাইনবক্ষের ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ ছুটা উন্মুখ উদ্বেল হৃদয়ের প্রতিরূপ হয়ে ষ্টীমারের পিছনটাকে আঘাত করে করে চলে যাচ্ছে। তাদের চিন্তা আমাকেও দোলা দিয়ে যাচ্ছে আর দুধারের গিরিদুর্গগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এসে শত শত আশানাশ ও হৃদয়ভঙ্গের মূক্ সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নবদম্পতীর রূপান্তর হয়ে গেল।

বর। শুনছ, বড় ভাবনা হচ্ছে। কিন্তু যদিই বা যুদ্ধ বাধে তার জন্য ভাবনা করে কি হবে? তার আগের দিনগুলিই

অনন্তকাল। সেই অনন্তকালের আস্বাদ আজ পাচ্ছি; একটুখানি কাছে এস।

বধূ। তুমি ভাবছ কেন? কিছুই হবে না। আমিই মিছিমিছি খবরটার কথা তুলে দিনটা মাটী করে দিলাম।

বর। না, না, তুমি ঠিকই বলেছ। এ সব কথাই আমাদের ভাবা দরকার। তবেই ত আমাদের দেশের জনমত যুদ্ধের বিরুদ্ধে তৈরী করতে পারব।

বধূ। যুদ্ধ যুদ্ধ আর খালি যুদ্ধ! ছেলেবেলায় দেখলাম, আবার এখন হয়ত দেখতে হবে।

বর। কে জানে, আমাদের ছেলেদেরও হয়ত দেখতে হবে।

বধূ। না, তা হতে দেব না। কামানের রসদ যোগাবার জন্য আমাদের ছেলেদের হতে দেব না। আজকাল সব মেয়েরাই এ কথা বলছে। ভবিষ্যতে শান্তি অটুট রাখবে মেয়েরাই। তুমি দেখে নিয়ো।

ভবিষ্যতের এই আশ্বাসে যে বর বর্ত্তমানে বিশ্বাস করল তা মনে হল না। শুধু মেয়েটী আদর্শের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রচ্ছুরিত জলরাশির উপর ফেনার মালার মত ঝলমল্ করতে লাগল আর বরটী এতক্ষণে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হয়ে একটু সরে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধবে?"

সেই নবদম্পতীর যুগলস্বাক্ষর সম্বলিত উপহার রাইনতীরের চিত্রটী আমার কাছে এখনো আছে; নেই হয়ত তাদের আশঙ্কার উপর ক্ষণজয়ী শান্তির নীড়টী; নেই হয়ত তাদের বিবাহের বা মিলনের বন্ধন। রাষ্ট্রতন্ত্র হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তিগুলির উপর ছড়িয়ে দেয় তন্দ্রা, রাজনীতি করে প্রীতিকে নির্ম্মমভাবে নিপীড়ন। মানুষ যেন জন্ম থেকে তাদের জন্যই উৎসর্গীকৃত। তবু তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, রাজ্য ও রাজনীতির ভাঙ্গাগড়া উপেক্ষা করে মানবাত্মা জাগে নূতন মিলন বন্ধনে। নবীন যাত্রাপথের পথিক হয়ে। তাই ইয়োরোপের যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ক্লেশ ও দ্বেষের উপর জয়ী হয়ে নব নব যুগল স্বাক্ষর পড়ে যায় হৃদয়ের নিগূঢ় নিঃসীম প্রতিলিপিতে। ইয়োরোপ ত মরতে চায় না।

আবার একটী চিত্র এগিয়ে আসছে আজকের এই স্বপ্নময় আশ্বিনের শারদ আশ্বাসের আবরণ ভেদ করে। পুরাণো বইয়ের দোকান সর্ব্বদা আমাকে আকর্ষণ করে, আর কল্পনাকে নাড়া দিয়ে যায়। খালি মনে হয় পুরাণো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হয়ত একদিন এমন একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে এসে পড়বে যা আমায় বিখ্যাত, হয়ত বা অমর করে দেবে। ছাত্রাবস্থায় ভাবতাম বহু ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই মূলে রয়েছে আকস্মিক ঘটনা, কে জানে আমিও হয়ত অজ্ঞাতে পুরাণো পুঁথির পথে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলব। বলা যায় না, ওই স্থূলদেহ কুব্জপৃষ্ঠ দোকানদারের আলমারীগুলিতে যে পুরাতন ও হস্তান্তরিত জ্ঞানভাণ্ডার ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে কোন বই থেকে হয়ত একটা গোলাপের শুকনো পাপড়ী অতীতের কোন মিসর রাজকুমারী বা গ্রীক মহিলা কবির স্মৃতি-সুরভিত ইতিহাসই বা বহন করে আনবে। অথবা হয়ত কোন গুপ্তচরের গোপন সংকেত চিত্র যা আজই সন্ধ্যাবেলায় কোন নির্দ্দিষ্ট অথচ অজ্ঞাত আগন্তুকের প্রতীক্ষা করছে তার বদলে আমার কাছেই সহসা প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই পুরাণো বইয়ের দোকান দেখলেই আমি তার ভিতরে যাই। জ্ঞানের আলো বা অভ্যন্তরের অন্ধকার দুই ই আমার মনকে জাগিয়ে দেয়। সে জন্যই প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারে একটা দোকানে গেলাম যার এক কোণে ভূগর্ভে একটা কফিশালাও আছে। সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন্ বিরাট্ তথ্যের প্রান্তসীমায় অজ্ঞাত পদক্ষেপ করেছিলাম তা কি তখন নিজেই জানতাম?

সেই একান্ত নিভৃত কোণে বসে কয়েকজন বিজ্ঞানচর্চ্চায় রত ছাত্র আণবিক শক্তিকে বিস্ফোরণ বা আলোড়ন করা যায় কি না সে তথ্যের ব্যর্থ চেষ্টার পর চেষ্টার কথা আলাপ করছিল; তারা ভাবছিল যে এর মধ্যে যে সৃষ্টির আদিম শক্তি লুকানো আছে তাকে যদি মুক্তি দিতে পারে তাহলে সংসারে অসাধ্যসাধন করা যাবে। সেই লোকগুলি আজ কোথায় গেল? তারা কি শুধু জ্ঞান পিপাসায় বা যুদ্ধোন্মুখ রাষ্ট্রের স্বার্থে এই অনুসন্ধান করছিল, অথবা তাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানের উপর শত্রুর গুপ্তচর সন্ধানী নয়ন রেখেছিল? অথবা তারা কি তাদের যন্ত্রালয়ে জীব কল্যাণের যে রহস্যে নিয়োজিত ছিল তা উদ্ঘাটন করতে পেরেছিল অথবা মঙ্গলের পথচ্যুত হয়ে অশনির মত অমোঘ মৃত্যুর মত নির্ম্মম আণবিক বোমা আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল? আজ সমস্ত পৃথিবী বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করছে, জীবন রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এ কি মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করলে, হে পাশ্চাত্য বস্তু বৈজ্ঞানিকের দল? সংহতির স্থলে এ কি সংহারের পথ খুলে দিলে, হে প্রতীচী, যার ফলে একটা বোমার আচমকা আলোয় বিশ্বের চোখ বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ হয়ে গেল, প্রলয়ের ঘোর রব আমাদের কাণকে জ্ঞানের বাণীর প্রতি বধির করে দিল?

এই যদি শেষ ফল হয় তবে কি হবে এই শ্যামল সুন্দর ধরণীকে নিয়ে, তার প্রেমরসাস্পদ ফলে ফুলে বিকশিত জীবনের বিহারক্ষেত্র প্রিয়গৃহ ও প্রিয়সঙ্গ নিয়ে? এ সব কি আমরা সৃষ্টি করেছি শুধু সংহার করবার জন্য? এত কাব্যগাথা চিত্রভাস্কর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞান, এত হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির উদ্ভব ও স্বীকার, এত কার্য্যকরী বিস্তার

আবিষ্কার ও প্রসার এ সব, সব কি শুধু যে অণুতে মানবের জন্ম সেই অণুতে শুধু তাকে নয়, তার সঙ্গে যুগযুগান্তের সঞ্চিত সৃষ্টি ও সভ্যতাকে নিমেষে নির্ম্মমভাবে ফিরিয়ে দিবার জন্য? কবি বলেছিলেন যে প্রত্যেক মানুষ এক একটা খণ্ড দ্বীপ, তাদের ঘিরে রয়েছে বিরহের লবণসমুদ্র। আমরা সভ্যতা সৃষ্টি করেছি সেই ব্যবধানকে লোপ করবার জন্য; জাহাজ ও বিমান হয়েছে দূরত্বকে কমিয়ে ভাই ভাই একঠাঁই করবার জন্য। আর এখন কি জাহাজ আসবে সমুদ্রপথে শুধু শত্রুবাহিনী বহন করে আনবার জন্য? আকাশপথে আসবে মারণ পক্ষী? শতাব্দীর পর শতাব্দী জ্ঞানান্বেষণের ফল কি এই হল? তা ত হতে পারে না। তাই আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই জনমত উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে যাতে পৃথিবী মানবেরই থাকে, দানবের হাতে বিকিয়ে না যায়।

প্রতীচী তাই স্বার্থ সত্ত্বেও জাগ্রত হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ইয়োরোপে প্রশ্ন উঠেছে যে মানবের শিবসাধনায় যা উৎসর্গ হবার কথা ছিল পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করার জন্য সে বিদ্যাকে কেন নিয়োগ করা হল? অণু বিস্ফোরণের মধ্যে ইয়োরোপ চেয়েছিল শিব; চোখ চেয়ে দেখতে পেল চারিদিকে রাশি রাশি শব। তাই সে বলছে, শুধু শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়াতে শান্তি স্থাপিত হয় নি; মানবাত্মাকে নিজের উপর বিজয়ী হতে হবে। এই চেষ্টা সার্থক হোক্। এই চেষ্টাতেই প্রাচী শতাব্দীর পর শতাব্দী রত ছিল।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্
তেনাহং কি কুর্য্যাম্।

সেই অমৃতের অন্বেষণ শেষ হয় নি যে এখনো। চারিদিকে যখন ধ্বংস ও অশান্তির লীলা চলেছে তখন প্রাচীর প্রাচীন সাধনা ও প্রতীচীর নবীন সন্ধান শান্তি ও কল্যাণের পথ আবিষ্কার করুক। এ দুইয়ের কেহই অপরকে ছেড়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারবে না। পরমাত্মার জ্ঞান ও পরমাণু বিজ্ঞান দুই ই সভ্যতার পরমায়ুর জন্য প্রয়োজন। তা যদি পাই তবেই আমরা পাব মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

৩

নির্ব্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল আরও খানিকক্ষণ নিস্পন্দভাবে। হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে চিনতে পারলেন। সে-ও যেন বুঝতে পারলে যে পুরন্দরবাবু তাকে চিনেছেন। তার চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা গেল তা। হঠাৎ সুমিষ্ট হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার।

"পুরন্দরবাবু আশা করি চিনতে পেরেছেন আমাকে"—গাঢ়কণ্ঠে অত্যন্ত আবেগভরে কথাগুলো বলল সে। কেমন যেন খাপছাড়া শোনাল।

"যুগল পালিত না কি"

পুরন্দরবাবুও একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

"ন'বছর আগে বর্দ্ধমানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, খুব ঘনিষ্ট পরিচয়ই হয়েছিল, মনে আছে আশা করি আপনার"

"হ্যাঁ…নিশ্চয়। কিন্তু এখন রাত তিনটে। আপনি আমার বন্ধ দরজার সামনে দশ মিনিট ধরে' দাঁড়িয়ে আছেন কড়ায় হাত দিয়ে, এর মানেটা বুঝতে পারছি না ঠিক"

"রাত তিনটে! বলেন কি"—পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে যুগল শুধু বিস্মিত নয় একটু আহতও হল যেন—"তাই তো, তিনটেই দেখছি। আমায় মাপ করুন পুরন্দরবাবু, সিঁড়িতে ওঠবার আগে ঘড়িটা আমার দেখা উচিত ছিল। বড় লজ্জিত হলাম, আবার একদিন আসব তখন বলব সব, দু'একদিনের মধ্যেই আসব, এখন যাই"

"সব বলতেই যদি চান এখনই বলুন"—পুরন্দরবাবু তার হাত ধরলেন—"আসুন, ভিতরে আসুন। ভিতরে আসবারই ইচ্ছে ছিল নিশ্চয় আপনার, তা না হলে এত রাত্রে শুধু শুধু এত কষ্ট করে এলেন কেন। কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিলই—বলুন কি সেটা"

তিনি উত্তেজিতও হয়েছিলেন, হতাশও হয়েছিলেন, ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিলেন না। একটু লজ্জাও করছিল…রহস্য, বিপদ কিছুই তো নয়। কল্পনায় যেটাকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিলেন একটু আগে তা কিছুই নয়—নিরীহ যুগল পালিতে পরিণত হল শেষ পর্য্যন্ত! কিন্তু না, এত সরল নয় ব্যাপারটা। একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার হাত এড়াতে পারছিলেন না তিনি।

যুগল পালিতকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে, পাশেই বিছানায় গিয়ে বসলেন তিনি। দুই হাঁটুর উপর হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন। লোকটা কি বলে শোনাই যাক। আপাদমস্তক ভাল করে' দেখলেন আর একবার। ভাল করে মনে পড়ল সব। যুগল পালিত কিন্তু চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলে না। ক্লান্ত সে যে

তার অদ্ভুত আচরণের জবাবদিহি করতে বাধ্য একথা যেন তার মাথাতেই আসছে না। বরং সে এমনভাবে পুরন্দরবাবুর দিকে চাইতে লাগল যেন পুরন্দরবাবুই কিছু বলবেন। হয়তো ভয় পেয়েছিল। ফাঁদে পড়লে ইঁদুর যেমন হকচকিয়ে যায় তেমনি হয়েছিল হয়তো। পুরন্দরবাবু কিন্তু রেগে উঠলেন।

"এরকম করার মানেটা কি! আপনি ভূতও নন স্বপ্নও নন নিশ্চয়, মতলবটা কি খুলেই বলুন না"

যুগল পালিত উসখুস করতে লাগল। তারপর একটু মুচকি হেসে একটু থেমে থেমে বলল—"আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে এ সময়ে এবং এ ভাবে আসাটা অদ্ভুতই মনে হচ্ছে আপনার···যদিও অতীতের কথা মনে করলে কি ভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তা ভাবলে··· এটা অবশ্য ঠিক এ সময়ে আসব ভাবি নি আমি···পাকেচক্রে হয়ে গেল···"

"পাকেচক্রে মানে! জানালা দিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে আপনি পা টিপে টিপে আমার ঘরের দিকে চাইতে চাইতে রাস্তাটা পার হলেন"

"ও, আপনি দেখেছিলেন তাহলে! তাহলে আপনিই তো আমার চেয়ে বেশী জানেন। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করছি বোধহয়···দেখুন তিন হপ্তা আগে আমি এখানে এসেছি, নিজের একটা কাজে। আমি যুগল পালিত আপনি তো জানেনই, চিনতেই তো পারলেন। আমি এখানে এসেছি চাকরির তদ্বির করতে। বদলি হতে চাই আমি। খুব ভাল পোষ্ট খালি হয়েছে একটা, ঢের বেশী মাইনে···কিন্তু সে চাকরি এখানে নয় যেখানে ছিলাম সেখানেও নয়, যদিও···মোট কথা আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—গত তিন সপ্তাহ ধরে' এই কোলকাতা শহরে ঘুরে ঘুরে' বেড়াচ্ছি। কাজটা ওজুহাত মাত্র, ঘুরে বেড়াচ্ছি এইটেই আসল কথা। —চাকরিটা যদি হয়ও খুব যে ধন্য হয়ে যাব তা নয়, তখনও হয়তো এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায় এখন যেমন ঘুরছি। জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি পুরন্দরবাবু। আর দেখুন হারিয়ে ফেলেছি বলে' খুশীই হয়েছি মনে হচ্ছে—মানে আমার যা মনে হচ্ছে তাই বলছি আপনাকে—এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হয়তো মাপ করবেন"

"কি রকম মনে হচ্ছে?" পুরন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

যুগল পালিত নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে। তারপর গাঢ়স্বরে বলল, "সে আর নেই"

পুরন্দরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত্ত। তারপর হঠাৎ তাঁর কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বুকের ভিতরটা মুচড়ে দিলে কে যেন।

"কে! মিসেস পালিত?"

"হ্যাঁ। অপর্ণা গত ফাল্গুন মাসে মারা গেছে···যক্ষ্মা হয়েছিল। দু'তিন মাস ভোগবার পর হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল একদিন। আমাকে ফেলে চলে গেল। কি অবস্থায় ফেলে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন"

হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে যুগল পালিত নিজের বাহুযুগলকে দুধারে প্রসারিত করে' মাথাটা নীচু করে রইল। পুরন্দরবাবু দেখলেন টাক পড়েছে লোকটার।

যুগলবাবুর কথা শুনে এবং ভাব-ভঙ্গী দেখে পুরন্দরবাবু যেন চাঙ্গা হলেন খানিকটা। একটা শ্লেষতিক্ত নির্ম্মম হাসির আভাসও যেন খেলে গেল ঠোঁটে···কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। যে মহিলাটির মৃত্যু সংবাদ এইমাত্র শুনলেন তাকে অনেকদিন আগে তিনি চিনতেন, অনেকদিন আগে ভুলেও ছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদে এতটা বিচলিত হয়ে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

"তাই না কি!"···আমাকে এতদিন খবরটা দেন নি কেন। দেওয়া উচিত ছিল। সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না—"

"আপনার সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সহানুভূতি যে মেকি নয় তাও জানি। যদিও···"

"যদিও?"

"যদিও আপনার সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছে—কিন্তু আপনি আমার দুঃখে যে রকম বিচলিত হলেন কি করে' যে, বিশ্বাস করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভাষা পাচ্ছি না। অন্য বন্ধুদের সম্বন্ধেও আমার ওই এক কথা—ভাষা পাচ্ছি না—এই তো এখানেই পূর্ণ গাঙ্গুলী রয়েছেন—অকৃত্রিম বন্ধু একজন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়—আমি বন্ধুত্বই বলি সেটাকে, আমার স্পর্দ্ধা মাপ করবেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় ন'বছর আগে, তারপর যদিও আপনি আর যান নি আমাদের কাছে, চিঠিপত্রও লেখেন নি···"

লোকটা সুর করে' গান গাইছে যেন। আর সর্ব্বদা চোখ নীচু করে' মাটির দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। সব লক্ষ্য করে চলেছে।

পুরন্দরবাবু ইতিমধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। সকৌতুকে এবং সবিস্ময়ে যুগল পালিতকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি। তার সব কথা শুনছিলেন। হঠাৎ সে যখন থেমে গেল তখন অসংলগ্ন কয়েকটা কথা তাঁর মনে হল।

"আচ্ছা, এর আগে আপনাকে চিনতে পারি নি কেন বলুন তো!"—হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—রগের শিরাগুলো দপ দপ করে উঠল তাঁর—"অন্তত পাঁচবার রাস্তায় দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে"

"হ্যাঁ; আমারও মনে আছে তা। আপনার সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছিল—দু'বার, কিম্বা তিনবার বোধহয় আপনি এসে পড়েছিলেন আমার সামনে"

"আপনিই এসে পড়ছিলেন বলুন। আমি একবারও যাই নি ইচ্ছে করে—"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। যুগল পালিত থেমে গেল, পুরন্দরবাবুর দিকে এক নজর চেয়ে বলল—'আমাকে চিনতে না পারার ঢের কারণ আছে। প্রথমত হয়তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিলেন, ভুলে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়—তা ছাড়া আমার বসন্ত হয়েছিল, মুখে দাগ হয়ে গেছে···"

"ও! বসন্ত হয়েছিল না কি! বসন্ত কি করে—"

"বাগালাম? আরও কত কি হতে পারত। কিছু কি বলা যায়, মশাই। অদৃষ্ট মন্দ হলে সবই হতে পারে—'

"তা বটে, তা বটে। বলুন কি বলছিলেন—"

"আমিও অবশ্য আপনাকে দেখেছিলাম রাস্তায়—"

"আচ্ছা—আপনি হঠাৎ 'বাগালাম' বললেন কেন! আমি কথাটা ঠিক ও রকম ভাবে বলতে চাই নি। আচ্ছা থাক ও কথা, যা বলছিলেন বলুন—" তাঁর মনে প্রসন্নতা যেন ফিরে আসছিল। ধাকাটা সামলে নিয়েছিলেন। উঠে পায়চারি করতে সুরু করলেন।

"যদিও আমি আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, কোলকাতায় আসবার সময়ই যদিও আমি ভেবেছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু সত্যি কথা বলছি, মনটা এমন ভেঙে গেছে…ফাল্গুন মাস থেকে বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সত্যি বলছি—"

"ও—কি বললেন—চুরমার হয়ে গেছে? আচ্ছা এক মিনিট—সিগারেট খান আপনি কি…"

"আপনি তো জানেন, আগে অপর্ণা যখন বেঁচেছিলেন তখন আমি…"

"হ্যাঁ আগে তো খেতেন। ফাল্গুনের পর থেকে ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি"

"এক আধটা খাই কখনও কখনও"

"নিন তাহলে একটা। এই যে দেশলাই—ধরিয়ে নিন। তার পর বলুন—বলে যান—এ যে অত্যন্ত, মানে—"

পুরন্দরবাবু নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন এবং বিছানার উপর বসলেন।

যুগল পালিত চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ।

"আপনি বড় বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছে। আপনার শরীর ভাল আছে তো"

"চুলোয় যাক আমার শরীর"—হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—"আপনি বলে যান"

যুগল পালিত পুরন্দরবাবুকে বিচলিত হতে দেখে একটু যেন খুশী হল। আত্মপ্রত্যয় যেন বেড়ে গেল তার।

"কিন্তু বলবার আর কি আছে? ভেবে দেখুন, আমার সমস্ত জীবনই নষ্ট হয়ে গেল—মানে সমূলে নষ্ট হয়ে গেল। কবিত্ব নয়, ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর উদ্দেশ্যহীন হয়ে এ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো—কোলকাতা শহর নয়—মনে হচ্ছে যেন একটা অরণ্য। সব যেন গুলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল—সব শূন্য। শূন্যতাটাই পেয়ে বসেছে যেন আমাকে। এ অবস্থায় কোন চেনাশোনা লোকের সঙ্গে, এমন কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হলে পাশ কাটিয়ে সরে পড়াটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় আবার অন্য রকম হয়—সব মনে পড়ে যায়, সকলের সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ করে' যে সময় চিরকালের জন্যে চলে' গেছে সেই সময় যারা ছিল তাদের সঙ্গ।…মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করে সেই অতীতকে ফিরে পেতে, সেই অতীতের যারা সাক্ষী ছিল তাদের কাছে যেতে…বুকের ভেতরটা এমন করতে থাকে যে তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। রাত দুপুরেও—হ্যাঁ অন্যায় জেনেও—রাত দুপুরেও বন্ধুর কাছে যেতে তখন বাধে না…রাত তিনটের সময় তার ঘুম ভাঙিয়েও তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করে…সময়টা অবশ্য ঠিক করতে পারি নি…সে বিষয়ে ভুল হয়েছে আমার…কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব বিষয়ে ভুল করি নি আমি। এই যে আপনার সঙ্গে কথা কইছি এইতো যথেষ্ট এইতেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলে মনে করি। সত্যি আমি ভেবেছিলাম বড় জোর বারোটা বেজেছে…এখনও আমার বারোটার বেশী মনে হচ্ছে না। দুঃখের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছি, বুঝলেন—দিগ্বিদিক জ্ঞান আর নেই। ঠিক দুঃখও নয় বুঝলেন…জিনিসটার অভিনবত্ব বিহ্বল করে তুলেছে আমাকে—"

পুরন্দরবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে পড়েছিলেন, কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন—"ভারী অদ্ভুত তো"

"সত্যিই অদ্ভুত হয়ে গেছি আমি যে"

"ঠাট্টা করছেন না আশা করি—"

"ঠাট্টা!" শুধু বিস্ময় নয়, যুগল পালিতের চোখের দৃষ্টিতে বেদনাও ঘনিয়ে এল—"এ কি ঠাট্টা করবার বিষয়। যার মৃত্যুর কথা বলছি—"

"থাক—ও কথা আর বলবেন না"

পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং আবার পায়চারি সুরু করলেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। যুগল পালিত যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই পুরন্দরবাবু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"যাবেন না, বসুন, বসুন, বসুন"।

বাধ্য বালকের মতো যুগল বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। পুরন্দরবাবু হঠাৎ তার সামনে থেমে বললেন…"সত্যি, আপনার কি ভীষণ পরিবর্তন হয়েছে—"

যেন পরিবর্তনটা হঠাৎ এখনই চোখে পড়ল তাঁর।

"ভয়ানক পরিবর্তন হয়েছে। অসাধারণ। অন্য লোক হয়ে গেছেন একেবারে—"

"তা আর বিচিত্র কি। ন' বছরে—"

"না ফাল্গুন থেকে?"

"হি হি"—হাসি চেপে যুগল পালিত বললে—"না, তা নয়। আচ্ছা, জিগ্যেস করতে পারি কি—ঠিক কি পরিবর্তনটা দেখছেন আমার"

"একথা জিগ্যেস করছেন আপনি! যে যুগল পালিতকে আমি জানতাম তিনি বেশ শক্ত সমর্থ সৌখীন লোক ছিলেন, বেশ বুদ্ধিমান… এখন যাঁকে দেখছি তাঁকে তো মনে হচ্ছে একটা ভাঁড় মাত্র!"

পুরন্দরবাবু বিরক্তির সেই সীমায় উপনীত হয়েছিলেন যে সীমায় গম্ভীর লোকেরও রসনার রাশ টেনে রাখা শক্ত হয়।

"ভাঁড়? তাই আপনার মনে হচ্ছে? এখন আর বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আমাকে? সত্যি?"

যুগল পালিতের মুখে ব্যঙ্গ-দীপ্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। মনে হল কি একটা যেন মনে মনে উপভোগ করছেন তিনি।

"বুদ্ধিমান? না,—তবে চতুর মনে হচ্ছে বটে—মানে অতি-চতুর—" বলেই পুরন্দরবাবু ভাবলেন মনে মনে, "অশিষ্টতা হচ্ছে…কিন্তু এ লোকটাও কম অশিষ্ট না কি…রাতদুপুরে এমন—তা ছাড়া এর উদ্দেশ্যই বা কি…"

"ছি ছি কি বলছেন পুরন্দরবাবু, আপনি হলেন পুরোনো বন্ধু একজন"—যুগল পালিতের চোখে মুখে নিখুঁত আন্তরিকতা ফুটে উঠল যেন—চেয়ারে ঘুরে বসল সে।

"কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলুন তো! আমরা কি এখন পৃথিবীতে আছি? সামাজিক গণ্ডী কি এখন বেঁধে রেখেছে আমাদের? আমরা দুজন বন্ধু, অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু, বহুকাল পরে এক সঙ্গে মিলেছি মন খুলে কথা বলছি, আমাদের অমূল্য বন্ধুত্বের যে প্রাণ-স্বরূপ ছিল তার কথাই স্মরণ করছি…"

কথা বলতে বলতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। মাথা নীচু করে' দু' হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে' বসে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। তাঁর সমস্ত চিত্ত ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। কেমন যেন একটা অস্বস্তিও ভোগ করতে লাগলেন তিনি।

"হয়ত ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়"—আবার মনে হল তাঁর—"কিন্তু না। মদ খায় নি তো? না—তাও নয়। কিছু বিচিত্র নয় অবশ্য। মুখটা লাল হয়ে আছে বেশ। মদও যদি খেয়ে থাকে—ব্যাপার একই দাঁড়াচ্ছে। ওর উদ্দেশ্যটা কি? কি চায় ও?"

"মনে আছে আপনার, মনে আছে"—হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে যুগল পালিত আবার সুরু করলে…"সেই যে আমরা একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম মহিম মল্লিকদের জমিদারিতে—সেই বাচ খেলা, হৈ হৈ করা, গান হুল্লোড়—সন্ধ্যের সময় সেই যে আপনি রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে শোনাতেন—নিরুদ্দেশ যাত্রা—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি'—মনে আছে সে সব? আপনার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের কথাটা মনে আছে? আপনি কি একটা বৈষয়িক দরকারেই এসেছিলেন আমার কাছে…বসবার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ করছিলাম আমি—অপর্ণা এসে ঢুকল—বাস্—ঠিক তার দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। সমস্ত পরিবারের বন্ধু হয়ে গেলেন, আর সত্যিকারের বন্ধু। ঠিক এক বৎসর অন্তরঙ্গতাটা বজায় ছিল—ঠিক এক বছর—রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদার অর্জ্জুনের মতো—"

পুরন্দরবাবু মাটির দিকে চেয়ে পদচারণ করছিলেন ধীরে ধীরে। অধীর চিত্তে শুনছিলেন—সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে উঠছিল—তবু শুনছিলেন—হ্যাঁ বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন।

"অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার কথা আমার কখনও মনে হয় ন তো" অপ্রতিভ-ভাবে হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি, "তাছাড়া আপনি এমন চীৎকার করে' কথা বলছেন কেন, আগে তো আপনি এত চেঁচাতেন না…এমন অস্বাভাবিক ভাবাও ব্যবহার করতেন না। এমন করবার মানেটা কি"

"হ্যাঁ, আগে আমি কথা কম কইতাম, মানে গম্ভীর ছিলাম"—যুগল পালিত বলে' উঠল সঙ্গে সঙ্গে—"আগে আমি কথা শুনতেই ভালবাসতাম। সে বলত আমি শুনতাম। আপনার মনে আছে বোধহয় কি সুন্দর কথা বলত সে—কি চমৎকার রস দিয়ে দিয়ে। আর চিত্রাঙ্গদার কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক—আপনার মনে থাকবার কথা নয়—আমাদেরই মনে হয়েছিল—তা নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম, কিন্তু আপনি চলে আসবার পর। অর্জ্জুন যেমন হঠাৎ এল হঠাৎ চলে গেল…"

"কি অর্জ্জুন অর্জ্জুন করছেন" পুরন্দরবাবু মাটীতে পা ঠুকে ধমকে উঠলেন। তাঁর মনে এমন একটা বিশ্রী স্মৃতি জাগছিল!

"আমাদের কিন্তু মনে হয়েছিল অর্জ্জুনের কথা" অতিশয় মধুমাখা কণ্ঠে যুগল পালিত আবার বললে, "বিশেষ করে' পূর্ণবাবু যখন এলেন—আপনি যেভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই এলেন। তিনি পাঁচ বচ্ছর ছিলেন"

"পূর্ণবাবু? মানে? পূর্ণবাবু কে?

পুরন্দরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীরটা জমে' গেল যেন।

"পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী। আপনি চলে আসবার এক বছর পরে তিনিও কৃপা করে আমাদের সাহচর্য্য দান করেছিলেন ঠিক আপনারই মতো"

"ও হ্যাঁ—ঠিক তো—মনে পড়ছে"—পুরন্দরবাবু আত্মসম্বরণ করে' বললেন, "পূর্ণবাবু! ঠিক—তিনি তো বদলি হয়ে গিয়েছিলেন ওখানে"

"হ্যাঁ, বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। কমিশনার সাহেবের অফিসে। এখান থেকেই গিয়েছিলেন। চমৎকার লোক, ভাল বংশের ছেলে—"

যুগল পালিত যেন গদগদ হয়ে পড়ল একেবারে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কি ভাবছিলাম—ও—হ্যাঁ তিনিও তো…"

"হ্যাঁ তিনিও, তিনিও—" পুরন্দরবাবু অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে কথাটা বলে ফেলেছিলেন যুগল পালিত সোল্লাসে তাই পুনরাবৃত্তি করল…"হ্যাঁ তিনিও। তিনি থাকতে আমরা চিত্রাঙ্গদাটা অভিনয়ও করেছিলাম একবার। আমাকে কিন্তু অর্জ্জুনের ভূমিকায় নামতে দেয় নি—অপর্ণাই দেয় নি—"

"কি মুশকিল! আপনার অর্জ্জুন হবার যোগ্যতা কোথায়—আপনি হলেন নিখাদ যুগল পালিত"—বিরক্তিস্বরে রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দর-বাবু—রাগে বিরক্তিতে কাঁপছিলেন তিনি—"ক্ষমা করবেন…ও পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবু তো এখানেই আছেন—তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আমার। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না। যান নি সেখানে?"

"গেছি বই কি। গত পনর দিন থেকে প্রত্যহ যাচ্ছি। কিন্তু দেখা হচ্ছে না। আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছে না কেউ। তাঁর অসুখ, শোনা কথা নয়, নিজে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি তাঁর অসুখ। শক্ত অসুখ। ছ' বচ্ছরের বন্ধু। উঃ—সত্যি বলছি পুরন্দরবাবু মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে ভগবতী বসুন্ধরে দ্বিধা হও—সত্যি বলছি। আবার মাঝে মাঝে অতীতটাকে আঁকড়ে ধরতেও ইচ্ছে করে—অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা ছিল সবাইকে—আবার কখনও কাঁদতে ইচ্ছে হয়, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল খানিকটা হালকা হবার জন্যে…"

"আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন। আজকের মতো অন্তত যথেষ্ট হয়েছে—কি বলেন"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ বলে বসলেন।

"যথেষ্ট, যথেষ্ট"—যুগল পালিত উঠে দাঁড়াল—"চারটে বাজে, স্বার্থপরের মতো আপনাকে এভাবে…ছি ছি…"

"শুনুন, আমি গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে এর পরে। তারপর

আশা করি—আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, সত্যি করে' বলুন, আপনি কি মদ খেয়েছেন ?"

"মদ ? মোটেই না"

"এখানে আসবার ঠিক আগে, কিম্বা তারও আগে মদ খান নি আপনি ?"

"আপনাকে বড্ড অসুস্থ দেখাচ্ছে পুরন্দরবাবু। আপনার জ্বর হয় নি তো—"

"না কিছু হয় নি। কাল দেখা করব আপনার সঙ্গে একটা নাগাদ"

"এসে পর্য্যন্ত আমি লক্ষ্য করছি আপনি কেমন যেন প্রকৃতিস্থ নন" উপভোগ করতে করতে কথাগুলো বললে যুগল পালিত—"সত্যি বড় খারাপ লাগছে আমার, বিবেক দংশন করছে। এরকম সময়ে এসে আপনাকে…আমি যাচ্ছি…শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুমুন একটু—"

"শুনুন, আপনার ঠিকানাটা কি"

"৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট—"

"ও আচ্ছা। যাব আমি—"

"নিশ্চয়। কৃতার্থ হব তাহলে"

যুগল পালিত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

"শুনুন"—পুরন্দরবাবু ডাকলেন আবার—"ঠিকানা বদলে ফেলবেন না তো…"

"ঠিকানা বদলে ফেলব মানে ? কি যে বলেন !"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়েই ঘাড় ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে যুগল পালিত।

কোন উত্তর না দিয়ে দড়াম করে' কপাটটা বন্ধ করে' দিলেন পুরন্দরবাবু। খিল দিলেন। তালা লাগালেন। জানালার কাছে গিয়ে থু থু করে' অনেকবার থুতু ফেললেন, মুখের ভিতর কেমন অশুচিতা অনুভব করছিলেন যেন একটা। নিস্পন্দ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট পাঁচেক। তারপর হঠাৎ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার। (ক্রমশঃ)

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৭

দুপুরবেলা আকাশ কালো করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

নদীর জলে মেদুর ছায়া বিকীর্ণ করিয়া—তাল নারিকেলের বীথিকে ধারা-বর্ষণে স্নিগ্ধ করিয়া এবং তেঁতুলিয়ার কল তরঙ্গে উদ্দাম উল্লাস জাগাইয়া ঘণ্টা দু তিন বেশ এক পসলা ঝরিয়া গেল। কিন্তু আকাশের কান্না থামিল না—থাকিয়া থাকিয়া এক একটা দমকা বহিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে ঝরিতে লাগিল: ঝির ঝির-ঝির—

সন্ধ্যা ঘনাইতেছে অসময়ে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিভ্রান্ত বিহ্বল একদল কাক নারিকেল পুঞ্জের ওপর তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে গোল হইয়া উড়িতেছে—বাতাসের ঝাপটায় ওদের কারো বাচ্চা নীচে পড়িয়া গেছে বোধ হয়। তাণ্ডব-তালে ব্যাঙের কনসার্ট বাজিতেছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত কলরব কোলাহলকে যেমন করিয়া হোক ছাপাইয়া উঠিবার সংকল্প করিয়াছে ওরা।

কর্ম্মহীন অলস দিন। মাসটা যদিও আষাঢ় নয়—তবু এই আশ্চর্য্য জগৎ, সীমানাহীন অন্ধ আকাশ, বিশৃঙ্খল একটা বিরাট নদী, সব মিলাইয়া নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ আর নির্বাসিত মনে হয়, কবিয়া কল্পনা করিতে পারে শাশ্বত বিরহের স্মৃতি-মধুর একটা মীড়-মূর্চ্ছনা যেন। রাণী তো কাছেই, তবু ভাবিতে ভালো লাগে: চঞ্চল ভ্রমরের মতো দুটি চোখের উৎসুক দৃষ্টি দিগন্তে মেলিয়া দিয়া কে দেখিতেছে নবঘন শ্যামশোভাকে—কোন রত্নপুরীতে কে যেন 'মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিত পদং গেয়মুদ্গাতু কামা—' কিন্তু 'তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়ন সলিলৈঃ'—।' কালিদাস কখনো চর ইসমাইলে আসিবার সুযোগ পান নাই, যদি আসিতেন তাহা হইলে রামগিরির চাইতে এটাকে ঢের বেশি অনুকূল পরিবেশ বলিয়াই তাঁহার মনে হইত। কুর্চিফুল নাই ই থাকিল, কিন্তু নাম না-জানা যে মিষ্টি একটা বুনো ফুলের গন্ধ বাতাসে আসিতেছে—

কোথায় রামগিরি—কোথায় কুর্চি—কোথায় বা 'প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বনিতা !' তৈলাক্ত হ্যাট, বিবর্ণ ওয়াটারপ্রুফ, এবং জুতার ওপরে একরাশ কাদা লইয়া মামুদপুর থানার দারোগার ঘটনাস্থলে প্রবেশ। অলকা হইতে যক্ষ নয়, পাতাল হইতে রক্ষ আসিয়া দর্শন দান করিল।

মণিমোহন বলিল, বসুন।

—না স্যার, বসব না। অনেক কাজ, বসবার সময় হবে না। শুধু আপনাকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতে এলাম।

—কোন্ কথাটা ?

—সেই রেইডের ব্যাপারটা।

—ওঃ—মণিমোহনের মনটা চমকাইয়া উঠিল। আর কি দিন ছিল না। আকাশ বাতাস ঘিরিয়া এখন স্বপ্ন ঘনাইতেছিল, এখন সমস্ত শিরা গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিয়া আশ্চর্য একটা অনুভূতির অর্ধ-চৈতন্যের মধ্যে তলাইয়া যাইতে ভালো লাগিতেছিল—বাতাসে নাম না-জানা ফুলের মৃদু মধুর অলস সুরভির মতো মনে পড়িতেছিল কাকে? এমনি একটা সন্ধ্যায় দুটি বাহুর নির্মম পেষণে কোমল বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল কে, কার সুগন্ধি নিশ্বাস মুখের ওপরে ছড়াইয়া পড়িয়া নেশায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল?

দারোগা বলিলেন, জল বৃষ্টি, আপনার একটু কষ্টই হবে স্যার। কিন্তু কী করা যায়—এর চাইতে ভালো দিন আর হবেনা।

—হুঁ।

—অ্যাবসকণ্ডার, ঠিক তো নেই, যখন কোন দিকে রাতারাতি সটকে পড়ে। আমরা অবশ্যি কড়া নজর রাখছি, কিন্তু যা দেশ—বোঝেনই তো সব। কোনো নদী নালা দিয়ে একবার ছুটকে বেরুতে পারলেই গেল। তারপর সমুদ্রের মোহানায় কে কাকে খুঁজে বেড়াবেন বলুন। এতো আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা নয় কিংবা ই বি আরের রেলগাড়ি নয় যে চারদিকে নজর দিলেই—

—বুঝেছি। কথাটাকে মাঝখানেই মণিমোহন থামাইয়া দিল। হঠাৎ আশ্চর্যভাবে মনে পড়িল ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার উক্তি: আমার দেশ শুধু শহর নয়, আমার দেশ শুধু নাগরিক-সমষ্টিও নয়; ভারতবর্ষের প্রাণ ছড়াইয়া আছে অজ্ঞাত অখ্যাত অগণ্য পল্লী জনপদের প্রান্তে প্রান্তে. সেখান হইতেই একদিন বৃহত্তর মহাজীবনের উদ্বেল তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিবে এই—

চকিতে মণিমোহন অনুভব করিল একটা জিনিস—যা এতদিন সে ভাবিতেও পারে নাই। চর ইসমাইল শুধুই কি একটা পাণ্ডববর্জিত দেশ—ভদ্রলোকের কল্পনার বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার ন্যায় একটা আশ্চর্য রহস্যপুরী? অথবা বিরাট এই বাংলা দেশের একটা অলক্ষ্য প্রাণকেন্দ্র—যেখান হইতে একদিন উজান স্রোত বহিয়া জীবনে এবং চিন্তায়, রাষ্ট্রে এবং সভ্যতায় নতুন প্লাবন বহাইয়া দিবে? এতদিন তো শহরই দু হাতে দান করিয়া আসিতেছে, এবার কি পল্লীর সেই ঋণ পরিশোধের পালা দেখা দিল?

নিঃশব্দে একটা সিগারেট বাহির করিয়া মণিমোহন ধরাইল, ধোঁয়ার জালে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া চলিল মেঘম্লান আকাশের দিকে।

—তা হলে আজকেই ঠিক?

—আজকেই।

—শহরের কোনো খবর পেলেন?

—এখনো পাইনি। টেলিগ্রাম অফিস সেই ওপারে—মানে একবেলার পথ। তা ছাড়া যুদ্ধের চাপে লাইন এমন এনগেজড, যে, কখন গিয়ে তার পৌঁছুবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অথচ আর দেরি করাও ঠিক নয়—কখন যে ফসকে হাত থেকে পিছলে যাবে বলা যায় না। তাই বলছিলাম আর দেরী না করে যা পারি আমরাই করে ফেলি।

পিয়ারী আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। বর্ষার দিনে রাণী নিশ্চয় খিচুড়ির বন্দোবস্ত করিয়াছে—পেঁয়াজ আর আধসেদ্ধ মুগের ডালের একটা রোমাঞ্চকর গন্ধ আসিতেছে। আর টেবিলের ওপরে রাখা দারোগার তৈল মলিন টুপিটা হইতে ভাসিতেছে ঘামের দুর্গন্ধ। লণ্ঠনের আলোয় দারোগার চোখের নীচে অত্যন্ত গাঢ় একটা কালিমার রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ক্লান্ত অবসাদ, জোয়াল টানিয়া চলা নির্বোধ পশু বিশেষের অবসন্ন প্রতিচ্ছবি।

মণিমোহন বলিল, ধরতে পারলে আপনার নিশ্চয় কিছু আশা আছে।

—তাতো আছেই।—অত্যন্ত খুশি হইবার চেষ্টা করিয়া দারোগা হাসিলেন: ইনস্পেক্টরী তা হলে এবার হয়ে যেতে পারব স্যার। আর সাত আট বছরের মধ্যেই তো রিটায়ার করতে হবে, এখনো যদি চান্স না পাই ত হলে আর—

—অনেক দিন সার্ভিস তো হয়ে গেল আপনার, এত দিন চান্স পেলেন না কেন?

—কপাল স্যার, কপাল। দারোগা ললাটে করাঘাত করিলেন: কত জুনিয়ার চোখের সামনে দিয়ে টপাটপ টপকে গেল, আমি বসে বসে দেখলাম। কবার তো নমিনেশনও গেল কিন্তু ধোপে টিঁকল না। আসল ব্যাপার কী, জানেন? হিন্দুর আজকাল আর কোনো আশা ভরসা নেই—পীরের দরগায় জাত জন্ম জবাই দিতে না পারলে সরকারী চাকরীতে সুবিধে হবে না। পাকিস্তান পাকিস্তান কী ওরা বলছে স্যার, পাকিস্তান তো হয়েই আছে অনেককাল আগে।

মণিমোহন হাসিল: দেখুন, এই ফাঁকে যদি কিছু করে নিতে পারেন।

—সেইজন্যেই তো এমন করে লেগে পড়েছি স্যার। ঠেলে দিলে ক্রিমিন্যাল এলাকায়, ভাবলাম প্রচুর স্কোপ পাব—গ্যাংকে গ্যাং ধরে দিয়ে একটা পাকাপোক্ত রেকর্ড করে রাখব। কিন্তু এসে যা নমুনা দেখলাম তাতে গ্যাং তো দূরের কথা, এখন পৈতৃক প্রাণটা টিঁকিয়ে রাখতে পারলে হয়। এগুলো তো মানুষ নয়, জানোয়ার।

সত্যিই ইহারা মানুষ নয়। মণিমোহনের মনে হইল: মানুষ নয় বলিয়াই এখনো বাঁচিয়া আছে। পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতির কোঁচা পায়ে জড়াইয়া, ট্রামে বাসে মারামারি করিয়া এবং ডায়বেটিজ ও

ডিস্‌পেপসিয়ার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া যাহারা অতি-মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের চাইতে ইহারা একটু আলাদা বই কি। হিংস্র উন্মত্ত যে পশু শক্তি নিজের প্রচণ্ড বলশালিতায় সমস্ত পৃথিবীর উপর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারে—ইহারা তাহাদেরই দলে। ধুতি চাদরে বিড়ম্বিত মানুষ যেখানে হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিয়া তুলসীর মালা হাতে করিয়া পারত্রিক নিষ্কৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—তখন দেহে মনে অমিত পাশব-শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইহারা জীবন অভিযানের স্বপ্ন দেখিতেছে। জমিরের চোখের আগুনের সেই দীপ্তিটা মণিমোহন কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

দারোগা কহিলেন, যাক—ও নিয়ে আর দুঃখ করে কী হবে। আমিও বামুন স্যার, শাস্ত্র বলে পান্তা চাপা কপাল। পান্তা উড়েই যাবে একদিন—কে জানে এবারেই সে সুযোগটা পেয়ে গেলাম কিনা।

—পাবেন বলেই তো মনে হচ্ছে।

পুলকিত হইয়া ব্রাহ্মণ দারোগা দাঁত বাহির করিলেন: আপনাদের আশীর্বাদ। কিন্তু আজকে রাত্রেই স্যার। আন্দাজ নটা সাড়ে নটা আপনাকে নেবার জন্যে নৌকো পাঠিয়ে দেব। ভালো পানসী নৌকো—আরাম করে যেতে পারবেন, পুরু গদীও দিয়ে দেব।

—তাই দেবেন।

দারোগা উঠিয়া পড়িলেন। নমস্কার স্যার। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—

—সে তো দিলেনই, সেজন্যে আর বিনয় করে কী করবেন। আচ্ছা, আসুন আপনি তা হলে—

খতমত খাইয়া জুতার তলায় কাদার ছপাছপ শব্দ তুলিয়া দারোগা বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি ঝরিয়া চলিয়াছে। ভিজা মাটির গন্ধ বহিয়া 'বায়ু বহত পূরবৈয়া।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতেছে কাজরী গানের একটা পংক্তি: "আয়ি রে গগন মে কারী বদরিয়া—"

কিন্তু কোথায় বা কাজরী গান, কোথায় নীপ-শাখায় দোলনা দুলিতেছে—কদমের রেণু উড়িয়া পড়িতেছে। দুলিতে দুলিতে অধরে অধর মিশিতেছে—মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীতে বাজিতেছে মল্লারের সুর। স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের চাইতেও দূরে—ভাবনা-কামনা-কল্পনার অতীত জগতে।

সামনের চর ইসমাইল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নামিয়াছে। এপারে সুপারি নারিকেল বীথিতে অশ্রান্ত উদ্দাম সঙ্গীত—ওদিকে নদীতে প্রখর কলোল্লাস। কূলভাঙা জোয়ার আসিয়াছে বোধ হয়।

রাত্রি বাড়িতেছে। যাহাকে অথবা যাহাদের ধরিবার জন্য আজ রাত্রিতে তাহাদের অভিযান—সে এখন কী করিতেছে? হয় তো অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে। শৃঙ্খলিত সমস্ত দেশের বেদনা আর জমাট অশ্রু তাহার দৃষ্টির সামনে এমনি করিয়া নিজেকে মেলিয়া ধরিয়াছে বর্ষা করুণ এই তমস্বিনী রাত্রির মতো। থাকিয়া থাকিয়া খর বিদ্যুতের চমকে তাহার দৃষ্টির সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে—ভাবী স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা অনাগত রূপ—জ্বালাময়, আগ্নেয়।

আর এমনি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে কোথায়? আগা খাঁ প্রাসাদের চারিদিকে কি বর্ষার মল্লার গানে নিপীড়িত দেশের কান্না বাজিয়া উঠিতেছে? ভারতের অর্ধ নগ্ন মৌনব্রতী ফকিরও কি কালো আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—এই রাত্রি সত্য নয়, এই অন্ধকারের পরপারে—

ঘর্-র্-র্—

রূঢ় কর্কশ শব্দ। মাথার উপর দিয়া এই বর্ষা রাত্রেও বিমান উড়িয়া চলিয়াছে—আসমুদ্র হিমালয় অতিক্রম করিয়া—অতলান্তিক, প্রশান্ত মহাসাগর, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বাধা-বন্ধনকে অসঙ্কোচে পার হইয়া বিজয়ের অভিযান? ভারতবর্ষের অশ্রুভারাচ্ছন্ন আকাশ কি সে গতিকে বাধা দিতে পারে?

বিদ্যুতের আগুনে দিগ্‌দিগন্ত চকিতে যেন জ্বলিয়া গেল। শুধু অশ্রুভার নয়, বজ্রও বটে। একদিন জ্বলন্ত অগ্নি-বর্ষণে সেও নিজের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবে। কিন্তু সে কবে! এই সরকারী চাকরী, এই নিশ্চিন্ত জীবন—মণিমোহনের পক্ষেও কি সে দিনটি একান্তই বাঞ্ছনীয়?

লঘু পায়ের শব্দ। রাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

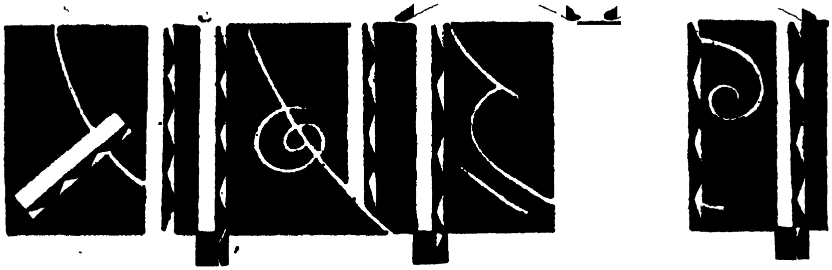
—খিচুড়ি হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

—না, শুয়ে পড়া চলবে না রাণু। বেরোতে হবে।

—বেরোতে হবে? এই রাত্তিরে? কোথায়?

—সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। সরকারী চাকরী, দায়িত্ব বোঝোনা?

বিষণ্ণভাবে হাসিয়া মণিমোহন উঠিয়া পড়িল। রাণী কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইল মেঘ মন্থর দিগন্তের দিকে—তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। (ক্রমশঃ)



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে সিঙ্গাপুরে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁহার পরিবারের অপর কয়জনকে মুক্তি দেওয়া হইবে। বৃটীশ ভারতের রক্ষাকার্য্য ও পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহারা যাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে না পারেন, সেজন্য সরকারী আদেশে তাঁহাদের আটক রাখা হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর শরৎবাবুকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এক পক্ষ কাল পরে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে যে মন্ত্রিসভা ছিল, তাহা শরৎবাবুর মুক্তি ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ভাতা প্রদানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ফলে ১৯৪২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শরৎবাবুর পরিবারের জন্য মাসিক হাজার টাকা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ১৬ই মার্চ্চ তাঁহাকে ত্রিচিনপল্লী হইতে কুর্গের অন্তর্গত মারকারায় আটক রাখা হয়। ১৯৪৩ সালের ২৪শে মার্চ্চ শরৎবাবুর শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহাকে কুন্নুরে স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব্বে আর একবার ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৫ সালের ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত ৩নং আইনে শরৎবাবুকে আটক রাখা হইয়াছিল।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ১১টায় শরৎবাবু মুক্তিলাভ করেন। লালা শঙ্করলাল শরৎবাবুর সহিত কুন্নুরে আটক ছিলেন—তিনিও ঐ সঙ্গে কারামুক্ত হন। ঐ দিনই পাঞ্জাবে তাঁহার পুত্র শিশির বসু এবং দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু ও দ্বিজেন্দ্র বসু মুক্তিলাভ করেন। কুন্নুরে শরৎবাবুকে কংগ্রেস কর্ম্মীরা বিরাট ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। কুন্নুরে শরৎবাবু বলেন—৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই দুইটি কথায় মহাত্মা গান্ধীর মারফত ভারত তাহার অন্তরের বাণী ব্যক্ত করে। ইহা ভারতের পক্ষে উদাত্ত আহ্বান। আর বহির্জ্জগতের পক্ষে সাবধান বাণী। সেই মহান নেতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবনত হওয়া উচিত। তিনি সারা জগতেরও নেতা।'

শরৎবাবু শুক্রবার সন্ধ্যায় কুন্নুর ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ আসেন, সেখানেও তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাহার পর ১৬ই সেপ্টেম্বর পথে বেজওয়াদা ও কটকে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ১৭ই সকাল সাড়ে ১২টায় তাঁহাকে সাঁতরাগাছি ষ্টেশন হইতে মোটরে হাওড়া ময়দানে আনিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেদিন কলিকাতার বহু লোক হাওড়া ময়দানে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে। কয়েক লক্ষ লোক ময়দানে ও কলিকাতার পথে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিল। দেশনেতার প্রতি এরূপ সম্বর্দ্ধনা সাধারণত দেখা যায় না।

মাদ্রাজে তিনি বলিয়াছেন—আটক থাকায় বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ মাত্র দেখিয়াছি। এই সকল সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হয় যে, ১৯৪৩ সালে বাঙ্গালার উপর দিয়া এক চরম দুর্দ্দিন চলিয়া গিয়াছে।

হাওড়া ময়দানে অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন—বাঙ্গালার যুবকরা বৃটীশ বেয়নেট ও বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আমি আশা করি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙ্গালার যুবক আবার বুক পাতিয়া দিতে রাজী হইবে। বাঙ্গালার যুবকরা বলুক—তাহাদের রক্তবিন্দু ভারতের স্বাধীনতার বীজ বপন করিবে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক বলিলেই ধ্বংস হইবে না। যদি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে রাজী থাকেন, তবেই স্বাধীনতা আসিবে, নচেৎ আসিবে না। জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি

বলেন—"মেকী বীরত্বের অভিনয় করিও না—সংগ্রামে প্রকৃত বীর হও।"

১৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে তিনি নিজ গৃহে এক সাংবাদিক সম্মিলনে বলেন—কংগ্রেসের মধ্যে সম্পূর্ণ একতাই হইতেছে বর্ত্তমানের একান্ত জরুরী প্রয়োজন। শুধু আমার প্রদেশেই নহে, পরন্তু অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ একতা সংঘটনের জন্য আমি নিশ্চয়ই আমার সাধ্যায়ত্ত শক্তি প্রয়োগ করিব। যথাসম্ভব সত্বর যাহাতে সমুদয় জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে কংগ্রেসের মধ্যে আনয়ন করা যায়, তদুদ্দেশ্যে আমার যেটুকু করণীয় তাহাও আমি সম্পাদন করার চেষ্টা করিব। কংগ্রেস আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশ্যই অবতীর্ণ হইবে। আমি চিরদিনই সেবক—দশ বৎসর বয়স হইতেই আমি নিজেকে কংগ্রেস সেবক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বোম্বাই অধিবেশনে যোগদানের জন্য শরৎবাবু ১৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার কলিকাতা ত্যাগ করেন।

বড়লাটের ঘোষণা—

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাতে বৃটীশ মন্ত্রিসভার সহিত ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আসিয়া গত ১৯শে সেপ্টেম্বর এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—যতশীঘ্র সম্ভব বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়নকারী সভা আহ্বান করিবেন। ১৯৪২ সালে ঘোষিত বৃটীশ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না, বা অন্য কোন ব্যবস্থা কিম্বা কোন সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত কি না—তাহা স্থির করিবার জন্য বড়লাট নির্ব্বাচনের পরেই বিভিন্ন প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত কথা আরম্ভ করিবেন, এ বিষয়ে তিনি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিতও আলোচনা করিবেন। নির্ব্বাচনের পর তিনি শাসন পরিষদও গঠন করিবেন—পরিষদে ভারতের বড় বড় দলগুলির সমর্থিত লোক গ্রহণ করা হইবে। যতশীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দান করিতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর। বর্ত্তমানে ভোটাধিকার প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না—শুধু নির্ব্বাচন তালিকা সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

বড়লাটের ঘোষণা জানিবার জন্য যাঁহারা উৎসুক ছিলেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের সকলকেই হতাশ হইতে হইবে। এইরূপ ঘোষণা আমরা বহুদিন হইতে শুনিতে অভ্যস্ত—এবং ইহাও জানি, শেষ পর্য্যন্ত পর্ব্বত মুষিক প্রসব করিয়া থাকে। বিলাতের কর্ত্তারা যে আমাদের কিছু স্বেচ্ছায় দান করিবেন না, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব নিজেদের ত্যাগ ও কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে—একথা সর্ব্বদা যেন আমরা মনে রাখি।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র নদীয়া শান্তিপুরের অধিবাসী ও কৃষ্ণনগর আদালতের উকীল। তিনি কেন্দ্রীয়



শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম-এল-এ

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ যেভাবে দেশবাসীর সেবা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদে একটি ছোট দলের (জাতীয় দল) সম্পাদক হইয়াও তিনি পরিষদের সকল কার্য্য অতি নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদন করিতেন ও দেশবাসীর সকল অভাব অভিযোগের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। তিনি শান্তিপুরে বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত চর্চ্চায় যেরূপ উৎসাহ দান করেন, তাহাও এ যুগের পক্ষে অসাধারণ। যাঁহারা পরিষদের নূতন বিরাট গৃহ ও তাহার সংগ্রহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা পরিষদের কার্য্যে মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। আমরা মৈত্র মহাশয়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

সুভাষচন্দ্র বসু—

শ্রীযুক্ত এম্-সি-গুহ সিঙ্গাপুরে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি সম্প্রতি কলম্বোতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—সুভাষচন্দ্র বসু যেমন বৃটিশ বিরোধী, তেমনই জাপানেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং জাপানের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন—জাপানের হাতে খেলার পুতুল হন নাই। শ্রীযুক্ত গুহ সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বোম্বায়ের অধিবেশনে ২১শে সেপ্টেম্বর যখন শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন একজন সুভাষচন্দ্রের জন্য শোক করিতে বলায় কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ তাহাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে তিনি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন না—কাজেই শোক প্রস্তাব করা হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি জাতীয় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং সেজন্য তাঁহাকে জীবনের অধিকাংশ সময় জেলের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে তিনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

সারদাচরণ মিউজিয়াম—

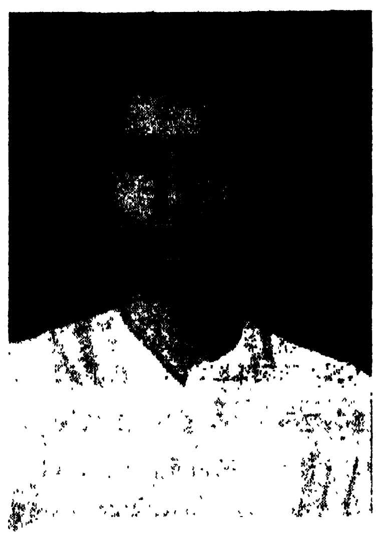
হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী গ্রামে মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে স্বর্গত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের স্মরণার্থ একটি মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল মিউজিয়মের অবৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করিবেন। বহু প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, লিপি ও চিত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এই মিউজিয়মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

রাওলপিণ্ডিতে বাঙ্গালী কালীবাড়ী—

বাঙ্গালা দেশ হইতে দেড় হাজার মাইল দূরে রাওল-পিণ্ডিতে ১৮৫৮ সালে প্রবাসী বাঙ্গালীদের চেষ্টায় বাঙ্গালী কালীবাড়ী স্থাপিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও তথায় প্রায় এক হাজার বাঙ্গালী বাস করিত। কালীবাড়ী সংলগ্ন অতিথিশালাতে প্রতিবৎসর শত শত ভ্রমণকারী বাঙ্গালী আশ্রয় পাইয়া থাকে। কাশ্মীর ভ্রমণকারী বাঙ্গালীরা সকলেই এই কালীবাড়ী দেখিয়াছেন। বর্ত্তমানে রাওল-পিণ্ডিতে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। সে জন্য কালীবাড়ী ও আতথিশালার অর্থাভাবে দুরবস্থা আসিয়াছে। শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানে কালীবাড়ীর সাধারণ সম্পাদক। আমরা বদান্য বাঙ্গালী-দিগকে এই কালীবাড়ী ও অতিথিশালার সংস্কার ও রক্ষা কল্পে অর্থসাহায্য দান করিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালীর এরূপ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হইবে।

বৈজ্ঞানিকের সম্মান লাভ—

ভারত সরকারের রাঁচী লাক্ষা গবেষণাগারের পদার্থবিদ্ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবার কলিকাতা বিশ্ব-



ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ডি-এস্-সি

বিদ্যালয়ের ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পূর্ব্বে আর কেহ এই উপাধি লাভ করেন নাই। গিরীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন গবেষক ছাত্র হিসাবে ও কিছুকাল পরিভাষা কমিটীর সদস্য হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

ডক্টর সুশীলকুমার বসু—

কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার বসু অস্থিপ্রাপ্ত সংযোগ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্.-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং জাপানের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

কমলা বক্তৃতা—

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে ১৯৩৫ ও ১৯৪৩ সালের কমলা বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। এখন তাঁহারা মুক্তিলাভ করায় সত্বর তাঁহাদিগকে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানা যাইবে। মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু শুধু রাজনীতিক নেতা নহেন—অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহারা বিখ্যাত। কাজেই লোক তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবে।

কলিকাতার দুগ্ধ সমস্যা—

কলিকাতা, টালীগঞ্জ, সাউথ সুবার্ব্বান, গার্ডেন রীচ ও হাওড়া মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থানের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ২১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩ শত ৩৬ জন। রেজেষ্টারী করা রেশন কার্ড অনুযায়ী এই হিসাব করা হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ ও অন্যান্য যে সকল লোক রেশন কার্ড রেজেষ্টারী করে নাই, তাহারা এই হিসাবে বাদ পড়িয়াছে। ঐ লোক সংখ্যা অনুসারে কলিকাতায় প্রতিদিন ২১২১১ মণ দুধ প্রয়োজন—জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা কম চাহিদা প্রতিদিন ১০৮৯৮ জন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় মাত্র ৩৬৯৩ মণ দুধ সরবরাহ হয়। যদি চাহিদা মিটাইতে হয়, তবে সরবরাহ তিন গুণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আশানুরূপ-ভাবে প্রয়োজন মিটাইতে হইলে উহার পরিমাণ প্রায় ৬ গুণ বাড়ান দরকার। সহরে প্রতিদিন ২৬৪৪ মণ দুধ উৎপন্ন হয়, রেলে ও হাঁটাপথে ৯৭০ ও ৭৮ মণ দুধ প্রতিদিন কলিকাতায় আসে। সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রতিদিন ৩০০ মণ দুধ প্রয়োজন। সহরে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন ৪০২ মণ দুধ প্রয়োজন। সাধারণ সময়ে বৎসরে ৪০ হাজার গো-মহিষ কলিকাতায় আমদানী হইত। কিন্তু এখন তাহা খুব কমিয়া গিয়াছে। এখন যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে মাসে মাত্র ১০০০ ও ৫০০ গো-মহিষ পাঠাইবার অনুমতি আছে—সেজন্য গরুর দাম পূর্ব্বে ১৫০ টাকা ছিল এখন তাহার দাম হাজার টাকা বা তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। কলিকাতায় দুধ সরবরাহ বাড়ান না হইলে সহরের দুধ আরও কমিয়া যাইবে। সেজন্য একটি পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি ঐ পরিষদ সত্বর কোন ভাল ব্যবস্থা করিতে পারে, তবেই সহরের লোক দুধ পাইবে—নচেৎ কিছুদিন পরে সহরে এক সের দুধের দাম দুই টাকা বা আরও বেশী হইবে।



১১১ নং রসা রোডস্থ গৃহ

(ইহার মালিক সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনকে ইহা দান করিয়াছেন সংবাদ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে)

বোম্বাই কর্পোরেশন ও শিক্ষা—

পরলোকগত দেশ নেতা সার ফিরোজ শা মেটার শতবার্ষিক জন্মোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য বোম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া 'নাগরিক নীতি ও রাষ্ট্রনীতি' বিষয়ে

একজন অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকেও অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। বোম্বাই কর্পোরেশনের এই কার্য্য সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়া উচিত।

কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের বয়স ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় পরিষদের পক্ষ



কুমার শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

হইতে গত ২৬শে আগষ্ট তাঁহাকে বিরাট ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় পৌরহিত্য করেন। সভায় পরিষদের পক্ষ হইতে এক তাম্রফলকে লিখিত অভিনন্দনপত্র তাঁহাকে প্রদান করা হয়। সভায় রবিবাসরের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে উদ্যোগ করিয়া দেশবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মুণীন্দ্রবাবু পীড়িত—সে জন্য তাঁহার কালীঘাটস্থ গৃহেই এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

সিংহল রাজনীতি—

সিংহল রাষ্ট্রীয় পরিষদ একটি বিলে সিংহলের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবী করিয়াছিল ও সিংহল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীলঙ্কা' নাম রাখার প্রস্তাব করিয়াছিল। বৃটীশ উপনিবেশ সচিব ঐ বিল বাতিল করায় গত ১৮ই জুলাই তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক প্রস্তাব ৩১—৭ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। পরাধীন সকল দেশের অবস্থাই একরূপ।

হিন্দু মহাসভা-কর্ম্মীদের ত্যাগ—

ওয়াভেল প্রস্তাবে কংগ্রেস ও মুসলেম লীগের মধ্যে ভারতের স্বার্থ ত্যাগ করার প্রস্তাব করিয়া বড়লাট হিন্দু মহাসভার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে হিন্দু মহাসভা তাঁহার কর্ম্মীদিগকে রাজদত্ত উপাধি ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ফলে দিল্লীতে ১৮ই আগষ্ট স্থির হইয়াছে পাঞ্জাবের ডাক্তার সার গোকুলচাঁদ নারাং, যুক্ত প্রদেশের রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ ও দিল্লীর রায় বাহাদুর হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের উপাধি ত্যাগ করিবেন। আশা করি, এই নীতি ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইবে।

বন্যায় সাহাজাদপুরের অবস্থা—

উত্তর বঙ্গে সর্ব্বত্র বন্যার কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। পাবনা জেলার সাহাজাদপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সাহাজাদপুর বন্যার জলে ভাসিতেছে। অধিকাংশ বাড়ীতে হাঁটু জল। শৃগালের ভয়ানক উৎপাত হইতেছে। এক বাড়ীতে রাত্রিতে ঘরে শৃগাল ঢুকিয়া এক বৃদ্ধাকে জীবন্ত অবস্থায় আহার করিয়াছে। সকালে তাহার মাথার খুলি ও একখানা পা ছাড়া আর কোন চিহ্ন ছিল না।—সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। কে ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবে?

যুদ্ধে ভারতীয় বন্দী—

জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রায় ১২ হাজার ভারতীয় সৈন্য ও নাবিক প্রভৃতি বন্দী করা হয়। তাহাদের মধ্যে ৩০০ জন বন্দীনিবাসে মারা যায় ও ২০০ জন নিখোঁজ হয়। বাকী ১১ হাজার লোককে ইতিমধ্যে ভারতে ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯শে জুলাই লণ্ডন হইতে খবর আসিয়াছে, ১০০ জন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এখনও বিলাতে রহিয়াছে। শীঘ্রই তাহাদের ভারতে প্রেরণ করা হইবে।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবার কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি সোসাইটী হলে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ট্রাম ধর্ম্মঘট সত্ত্বেও সম্মিলনে যথেষ্ট লোক সমাগম হইয়াছিল। বীরভূমবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের ৪টি শাখায় যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (সাহিত্য), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী (দর্শন), সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (কাব্য) ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী (সঙ্গীত) সভাপতিত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়, কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার রায়চৌধুরী কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উভয় দিনই উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন সাংখ্য বেদান্ততীর্থ উভয় দিনই সভার মঙ্গলাচরণ করেন। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস ও শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাসের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। বাঙ্গালার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।



বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ। ফটো —শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

কবি করুণানিধান সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার শান্তিপুরে (নদীয়া) এক বিরাট জনসভায় বাঙ্গালার প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত করুণনিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস, শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাধু প্রমুখ বহু সুধী সভায় যোগদান করেন। শান্তিপুর নিবাসী ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল সভায় পৌরহিত্য করেন। কবি করুণানিধানকে ঐ উপলক্ষে বহু মানপত্র, বহু গ্রন্থ এবং একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগর হইতে কবি নীহাররঞ্জন সিংহও সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান করেন। শান্তিপুর নিবাসী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি করুণানিধানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের লোক দরিদ্র পল্লীবাসী এই বৃদ্ধ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।



শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যিকের মাতৃবিয়োগ—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) মাতৃদেবী গত ১১ই আগষ্ট পরিণত বয়সে ভাগলপুরে স্বামী, ৬ পুত্র ও বহু পৌত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার



বনফুলের মাতাঠাকুরাণী

ভাণ্ডারহাটী গ্রামের কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি সংসারে লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন এবং জীবনে কোন শোক পান নাই। তাঁহার বিশেষ সাহিত্য-প্রীতি ছিল এবং আধুনিক ও প্রাচীন সব লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

সীমান্ত নেতা চারুচন্দ্র ঘোষ—

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশস্থ পেশোয়ার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ১৩ই সেপ্টেম্বর পেশোয়ারে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ অঞ্চলে ভ্রমণে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ডাক্তার ঘোষের আতিথ্য ও দেশ সেবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ছিলেন। প্রথম জীবন হইতে পেশোয়ারে বাস করিয়া তিনি ঐ প্রদেশে যেরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী এখনও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, ডাক্তার চারুচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। সেজন্য তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া আমরা মনে করি।

ডাক্তার শম্ভুনাথ ঘোষ—

২৪পরগণা টাকী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ দীননাথ ঘোষের পুত্র ও রায় বাহাদুর ডাঃ হরিনাথ ঘোষের অনুজ ডাক্তার শম্ভুনাথ ঘোষ সম্প্রতি তাঁহার আগড়পাড়ার বাসভবনে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর কামারহাটী সাগর দত্ত দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়ের প্রধান চিকিৎসক পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর আগড়পাড়ায় বাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছিলেন।



ডাঃ শম্ভুনাথ ঘোষ

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩রা আগষ্ট ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮২ সাল হইতে ৬৩ বৎসর কলিকাতার মেসার্স টার্ণার মরিশন কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ ছিলেন এবং সঙ্গীত চর্চ্চায় খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালায় যে আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমসাময়িক কালের চিত্র পাওয়া যায়।

ভূদেব শোভাকর—

নদীয়া জেলার হরিপুর নিবাসী জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব ভূদেব শোভাকর গত ১৫ই জুলাই লক্ষ্ণৌয়ে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি নিজ চেষ্টায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রথম জীবনে সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়া



ভূদেব শোভাকর

তিনি পরে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি অনুকরণযোগ্য ছিল। তিনি সপ্তপর্ণী ও সপ্তচিরজীবী নামক দুইখানি কবিতা পুস্তক লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি নদীয়া জেলার বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা, গান ও আবৃত্তি শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। কয়েক বৎসর তিনি লক্ষ্ণৌয়ে অধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—

গত ১৯শে আগষ্ট রবিবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ৯০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া সিটি স্কুলে শিক্ষকতা ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি কেশব একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার বহু ইংরাজি ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। স্বাধীন চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার সহজ, সরল ও নিয়মিত জীবনযাপন প্রণালী সকলের অনুকরণ যোগ্য।

পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ—

২৪পরগণা ভাটপাড়ার গুরু বংশের পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ মহাশয় গত ১৩ই আষাঢ় ৮৪ বৎসর বয়সে স্বর্গগত



পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ

হইয়াছেন, তিনি মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল—তিনি সারাজীবন বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

দুর্ভিক্ষ কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট

বঙ্কিমচন্দ্র সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের মাতৃমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ যতই সুফলা এবং শস্যশ্যামলা হউক, এদেশে যত লোক বাস করে তাহাদের পক্ষে বাংলার উৎপন্ন খাদ্যশস্য পর্য্যাপ্ত নয়। ইহার উপর বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের উদাসীন শাসন-ব্যবস্থার জন্য বাংলাকে বাধ্য হইয়া বহুসংখ্যক অতিথির খাদ্যসংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। ১৯৪২ সালে ব্রহ্মদেশ জাপানের হস্তগত হওয়ায় বাংলায় ব্রহ্মদেশ হইতে মোট প্রয়োজনের শতকরা যে ১০ ভাগ চাউল আসিত তাহা বন্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধের সময় খাদ্যাদির প্রয়োজন বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমদানীর অভাবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এই দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারীতে বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ নরনারী অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। এই দুর্ভিক্ষের করুণ বার্ত্তা ক্রমে দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং নানা সমালোচনার চাপে পড়িয়া ভারত-সরকার অবশেষে সার জন উডহেডের নেতৃত্বে সার মণিলাল নানাভাতি, ডাঃ এ্যাক্রয়েড, মিঃ রামমূর্ত্তি ও মিঃ আফজল হোসেনকে লইয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিয়া এবং অনেক পুঁথিপত্র পাঠ করিয়া অবশেষে মানুষের সৃষ্ট এই লোকক্ষয়কারী মহামন্বন্তরের উপর একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টটি প্রকৃতপক্ষে দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ প্রধানতঃ বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ ও ফলাফলের উপর রচিত হয় এবং ইহা প্রকাশিত হয় গত মে মাসে। আমি ভারতবর্ষের গত আষাঢ় সংখ্যায় 'উডহেড কমিশনের রিপোর্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের প্রথমাংশ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এই রিপোর্টের দ্বিতীয়াংশ বা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই অংশে দুর্ভিক্ষ কমিশন বাংলার বিগত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলেন নাই, তবে ইহাতে তাঁহারা সাধারণভাবে ও সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের কারণ এবং প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে নানাবিধ পরামর্শ দিয়াছেন। কি ভাবে ভারতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, এদেশের আর্থিক অবস্থায় কি উপায়ে জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভব, কেমন করিয়া ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা রোধ করা যাইবে—এইরূপ নানা জটিল সমস্যার আলোচনা এই চূড়ান্ত রিপোর্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতসরকার তিনটি দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসময়ে রিপোর্টও প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু ভারতে তেরশো পঞ্চাশের মহামন্বন্তর সংঘটিত হইল। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন এই রিপোর্টটিতে সকল সম্ভাব্য সমস্যাই বিশদভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই তিন শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টটি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছেন, যে এই রিপোর্টের মন্তব্য ও উপদেশসমূহ ভারতের ভবিষ্যত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট হইবে এবং উডহেড কমিশনের পর ভারতসরকারকে সম্ভবতঃ আর কোন দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে না।

ভারতের ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে দুর্ভিক্ষ কমিশন কয়েকটি পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এদেশে শস্যউৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদেশ হইতে শস্য আমদানীর ব্যবস্থাই প্রধান। যদিও ১৯৪২-৪৪ সালে ভারত-সরকারের 'ফসল বাড়াও আন্দোলন (grow more food campaign) আশানুরূপ সার্থকতালাভ করিতে পারে নাই, তবু কমিশন আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, চেষ্টা করিলে এই আন্দোলন ভবিষ্যতে অবশ্যই সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। বিদেশ হইতে এখন কিছুকাল অন্ততঃ ভারতে সুবিধা-মত খাদ্যশস্য আমদানী করিতে কমিশন ভারতসরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন যে, সরকারের উপর আগামী কয়েক বৎসর সমগ্র দেশবাসীকে খাদ্যসরবরাহের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সর্ব্বদা ৫ লক্ষ টন পরিমাণ শস্য হাতে মজুত রাখা। কমিশন মোটামুটি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫১-৫২ সাল নাগাদ ভারতবর্ষ সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে। ইহা ছাড়া দুর্ভিক্ষ কমিশন ভারতসরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন, জনসাধারণের যাহাতে অসুবিধা না ঘটে তজ্জন্য ভারতসরকার যেন খাদ্যবস্তুর দর হঠাৎ খুব পড়িয়া না যায় বা খুব চড়া না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখেন। ভারতবাসীর খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া কমিশন মাছের চাষ বৃদ্ধির সম্ভাবনীয়তা ও প্রয়োজনের উপর খুব জোর দিয়াছেন এবং দরিদ্র এই দেশে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধের অভাব আছে বলিয়া শরীর রক্ষা-কারী খাদ্য হিসাবে আলু, মিষ্টি আলু, কলা প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে বলিয়াছেন। গ্রামোন্নয়নের জন্য তাঁহারা কৃষিকর্ম্মের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন এবং কুটির শিল্প ও গ্রাম সংগঠনের কাজ বাড়াইবার সুপারিশ করিয়াছেন এবং দেশে জলতাড়িত বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা চালিত বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপিত হইয়া যাহাতে গ্রামের অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি সাধন হয় তদ্বিষয়ে সরকার ও শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনুমান করিয়াছেন যে ২০ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমানের ৪০ কোটির স্থলে ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি হইবে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে কমিশন সম্ভবমত প্রসূতিসদন, শিশুমঙ্গল সমিতি ও মহিলা ডাক্তারদের মারফৎ বহু-সন্তানবতী অথবা দীর্ঘকাল অন্তর সন্তান-কামিনী নারীদের জন্মশাসন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য সরকারকে উপদেশ

দিয়াছেন। তাছাড়া কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত যে সব অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশ আছে, সেগুলিতেও ভারতবর্ষের অতিরিক্ত জনসংখ্যার কতকাংশ প্রেরিত হইতে পারে। কমিশনের সদস্য মণিলাল নানাভাতি একটি পৃথক মন্তব্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার আশু অবসানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য ভারতের মত দুর্ভাগ্য দেশের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনা করা এক কথা এবং সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা আর এক কথা। মোটের উপর দুর্ভিক্ষ কমিশন উভয় রিপোর্টেই এদেশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর অনেক কথাই বলিয়াছেন এবং যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সেগুলি পালিত হইলে এদেশ হইতে ভবিষ্যত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা অবশ্যই অনেকটা কমিয়া যাইবে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এবারও হয়তো দুর্ভিক্ষ কমিশনের মূল্যবান মতামতসমূহ শুধু সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্রেরই কলেবর বৃদ্ধি করিবে, কারণ ১৯৪৩ সালের পর এখন পর্য্যন্ত ভারতের খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকার যেরূপ মনোভাব দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন মোটেই লক্ষ্য করা যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে পরিচালনার ত্রুটিতেই ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই বাংলাদেশ পুনরায় দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে।

উডহেড কমিশন ভবিষ্যত দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে ভারতসরকারকে এদেশে ফসল বৃদ্ধির ও বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার যথার্থতা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে বাজারে পণ্যাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা যখন দেখা দেয়, তখনি বাজারের পণ্য দেখিতে দেখিতে বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার বাজার হইতে চাউল এইভাবেই উপিয়া গিয়াছিল। একবার বন্ধুবর যাদুকর পি সি সরকার ম্যাজিক দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার হাতের একটি টাকা বেমালুম আমার পকেটে চালান করিয়া দিয়াছিলেন। কি করিয়া যে টাকাটি আমার পকেটে আসিল তাহা সমবেত সকলের সহিত আমিও বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিতে মিঃ সরকার উত্তর দিলেন 'টাকাটা আপনার পকেটে গেল আপনার পকেটটা ছিল ব'লে।' বলা বাহুল্য উত্তরটি অত্যন্ত হাল্কা, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হওয়ার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা আমার মনে পড়িয়া গেল। ১৯৪৩ সালের প্রথমে বাজারে যেই গুজব রটিল চাউল আর পাওয়া যাইবে না, সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা পরিবার বাঁচাইতে, প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকদের রক্ষা করিতে, এমন কি গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের জন্য হু হু করিয়া চাউল কিনিতে লাগিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা পর্য্যন্ত সামান্য সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া এবং সঞ্চয় না থাকিলে অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া বাড়তি দামে বহু পরিমাণ চাউল ঘরে তুলিয়া তবে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। যাদুকর সরকারের কথায় আমার যেমন পকেট ছিল বলিয়া টাকাটি লোকচক্ষু এড়াইয়া পকেটে চলিয়া আসিল, বাংলার বাজারের চাউলও যাহাদের পকেটে টাকা ছিল, এক নিঃশ্বাসে তাহাদের গুদামে গিয়া আশ্রয় লাভ করিল। এইভাবে সঞ্চিত চাউলের কত যে রক্ষা ব্যবস্থার অভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহার পরি[মাপ] করা যায় না। অথচ হাতে টাকা ছিল না বলিয়া যাহারা সময়ে চা[উল] কিনিতে পারে নাই, তাহারা ক্রমে চাহিদা ও জোগানের অসাম[ঞ্জস্যে] ঘটিত চড়া বাজারে কোনক্রমেই অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিল না [এবং] শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে ৩০।৩৫ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুব[রণে] বাধ্য হইল। দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সত্যই [যদি] দেশে ফসল বাড়াইবার এবং খাদ্য আমদানী নীতিতে শৃঙ্খলা রক্ষার [জন্য] সরকার ৫ লক্ষ টন খাদ্য শস্য হাতে মজুত রাখিবার ব্যবস্থা ক[রেন] তাহা হইলে এই মজুত শস্যের জন্য কোন সময়ে খাদ্য পাওয়া না যাই[বার] গুজব রটিবে না এবং ফলে অর্থবানদের দৌরাত্ম্যে বাজার হইতে [খাদ্য] শস্য উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা কমিয়া যাইবে বলিয়া দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাব[না] কমিয়া যাইবে।

মোটামুটিভাবে যদিও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের এই রিপোর্টটি[তে] আমরা খুসী হইয়াছি, তথাপি একথা না বলিলে নয় যে, এদে[শের] পরিস্থিতির বিচারে রিপোর্টটিতে যেন কিছু কল্পনাবাহুল্য থাকিয়া গিয়া[ছে] এবং বাস্তবক্ষেত্রে ইহাতে সন্নিবেশিত উপদেশগুলির কতগুলি কার্য্যক[রী] হইবে সে বিষয়ে সত্যই আমাদের সন্দেহ আছে। কমিশন প্রথ[মে] বলিয়াছেন যে, গত ১ শত বৎসরের মধ্যে ভারতের শাসকবর্গ স্বীক[ার] করিয়া লইয়াছেন 'দুর্ভিক্ষের ফলে দেশে যাহাতে মহামারী না দেখা [দেয়] তাহা করা গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থার দ্বা[রা] দেশের লোককে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান করিয়া তুলিবার দায়িত্বও [যে] দেশের শাসকবর্গের, তাহা ভারতবর্ষে এখনও পুরোপুরি স্বীকৃত ও গৃহী[ত] হয় নাই।' তাঁহাদের বিবৃতিতেই দেখা যায় যে, স্বাভাবিক সময়ে[ও] ভারতের শতকরা ৩০ ভাগ অধিবাসী পর্য্যাপ্ত আহার পায় না। এ হে[ন] করুণার-পাত্র দেশের প্রতিপালনের দায়িত্ব লইয়াও যে সরকার নিষ্ঠু[র] ঔদাসীন্য বজায় রাখিয়াছেন, উডহেড কমিশন সেই সরকারকে ভারতবাসী[র] স্বাচ্ছন্দ্যবিধান সম্পর্কে এমন সব ব্যাপক উপদেশ দিয়াছেন, বর্ত্তমা[ন] ভারত সরকার কর্ত্তৃক যেগুলির পরিপূরণের আশা আকাশকুসুমকল্প[না] ছাড়া আর কিছু নয়। দুর্ভিক্ষ কমিশনের এই সুপারিশের আগেই ভার[ত] সরকার যদি এদেশবাসীর স্বার্থরক্ষায় সামান্য অবহিত হইতেন, তাহ[া] হইলে ভারতবর্ষের চেহারা সত্যই ফিরিয়া যাইত। ভারতে বৎসরে ৫[০] লক্ষ হিসাবে লোক বৃদ্ধিতে কমিশন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ[ই] বাড়তি লোক সংখ্যা ভারতের আর্থিক ভারসাম্য বিপন্ন করিতে পারে[।] সত্য বটে, বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ হিসাবে[ে] লোক বৃদ্ধি দুর্ভাবনার কথা। কিন্তু অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুলভে[ে] যথেষ্টসংখ্যক শিল্পশ্রমিক সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আজও যে ভারতে এতটুকু শিল্পপ্রসার সম্ভব হইল না, তাহার জন্য তো ভারত[] সরকারের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী। কমিশন বলিয়াছেন, বাড়তি জনগণের একাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত জনবিরল দেশে গিয়া বাস করিলে ভারতের উপর চাপ কমিবে। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি খুব কম এবং সেখানে বহু বাড়তি ভারত[বাসী]

শ্রীশঙ্কর দেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশঙ্কর দেব কাহারো মতে ১৩৭১ শকাব্দায় (১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) আশ্বিন মাসে, আবার কাহারো মতে ১৪০৩ শকাব্দায় (১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে) ফাল্গুন মাসে আবির্ভূত হন। কেহ কেহ ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্কর দেবের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন আসাম নওগাঁ জেলায় কুসুম্বর ভূঞা একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী ছিলেন। কুসুম্বর পুরুষানুক্রমে দেবী পূজক। বহুদিন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি শিব পূজার ফলে পুত্র লাভ করিয়া পুত্রের নাম রাখেন শঙ্কর। শঙ্কর দেবের জন্ম-রাশি অনুসারে নাম গঙ্গাধর। শঙ্কর দেব বাল্যকালেই মাতৃহীন হন। স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে শঙ্করের সংস্কৃত শিক্ষালাভের পর কুসুম্বর পুত্রের বিবাহ দেন। একটী কন্যা জন্মগ্রহণের পরই পত্নী স্বর্গগত হইলে শঙ্কর দেব তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল তীর্থ ভ্রমণের পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। রামচরণ ঠাকুরের মতে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে শঙ্কর দেবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্র হইতে আড়াই মাসের পথ অতিক্রম করিয়া কোন স্থানে (গৌড়ে রামকেলিতে ?) তিনি রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। রামচরণ ঠাকুর বলেন শঙ্কর দেবের সঙ্গে রূপ সনাতন সীতাকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপের পরমাসুন্দরী ভার্য্যার ব্যাকুলতায় শঙ্কর দেব তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। সীতাকুণ্ড হইতে গৃহে ফিরিয়া রূপ সনাতন সংসার ত্যাগ করেন। তীর্থ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয় স্বজন জোর করিয়া শঙ্করের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন। অতঃপর রাজনৈতিক বিপর্যয়ে দেশত্যাগ করিয়া শঙ্কর দেব ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন।

ত্রিহুত নিবাসী জগদীশ মিশ্র নামক কোন পণ্ডিত জগন্নাথ দেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শঙ্কর দেবের সাক্ষাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে আসেন, এবং পাঠান্তে আসামেই স্বর্গগত হন। তাহার পর হইতেই শঙ্কর দেব ভাগবত আলোচনা এবং অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই সময় শঙ্কর দেবের পুরোহিত রামগুরুর জামাতা কাশীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন কালে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃত ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া শঙ্কর দেবকে উপহার দেন। আহোম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন, এই সময় তাঁহার সহিত মাধব দেবের সাক্ষাৎ হয়, মাধব দেব তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন, এই মাধব দেবই শঙ্কর দেবের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। শঙ্কর দেব ও মাধব দেব উভয়েই কায়স্থকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণে আহোম রাজ শঙ্করদেবের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে তিনি কোচ রাজ্যে গিয়া বড়পেটায় বসতি স্থাপন করেন। কোচরাজ নর নারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজের সঙ্গে শঙ্কর দেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হয়, তজ্জন্য রাজ সভায় তিনি প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণ সময়ে শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। শঙ্কর দেব হরিলীলাবিষয়ক ছয় খানি একাঙ্ক নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে সীতাস্বয়ম্বর নাটক সেনাপতি শুক্লধ্বজের আদেশে রচিত। নাটকগুলি "অঙ্কিয়া-নাটক" নামে পরিচিত। শঙ্কর দেব ১৭২টা কীর্ত্তন গীতে সংক্ষেপে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করেন। বাঙ্গালায় পদাবলী যেমন কীর্ত্তন নামে আখ্যাত, আসামেও এই গীতগুলি তেমনই কীর্ত্তন নামেই প্রচলিত। ভাগবতের অনুবাদে তিনি বলিয়াছেন—

> কিরাত কচারি খাসি গারো মিরি
> যবন কঙ্ক গোয়াল।
> আসাম মুলুক রজক তুরুক
> কুবাচ ম্লেচ্ছ চণ্ডাল।
> অন্যে পাপীনর কৃষ্ণ সেব কর
> সঙ্গত পবিত্র হয়।
> ভকতি লভিয়া সংসার তরিয়া
> বৈকুণ্ঠে সুখে চলয়।

অন্যত্র তিনি উপদেশ দিয়াছেন—

> ওবা নরলোক হরির ভজিয়োক
> শরো ইটো উপদেধ।
> এরা আলজাল জীবাকত কাল,
> জরা ভৈল পরবেশ।
> অন্য দেবী দেব ন করিবা সেব
> না খাইবা প্রসাদ তার।
> মূর্ত্তিকো না চাইবা গৃহে না পশিবা
> ভক্তি হৈব ব্যভিচার।

গানে এবং অভিনয়ে তিনি ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে ১৪৯০ শকাব্দের (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) ভাদ্র শুক্লা দ্বিতীয়ায় কুচবিহারে তিনি তিরোহিত হন। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, শঙ্কর দেব আচার্য্য অদ্বৈতের শিষ্য, তিনি জ্ঞানবাদ প্রচার করায় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে ত্যাগ করেন। আচার্য্য অদ্বৈত দীর্ঘজীবী ছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালেই তিনি যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতের জীবদ্দশাতেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে শঙ্কর দেবের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। মহাপ্রভু অপেক্ষা শঙ্কর দেব বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আচার্য্য অদ্বৈত শঙ্কর দেব অপেক্ষাও বয়সে বড় ছিলেন ইহা অনুমান করা চলে। গুরুশিষ্য সমবয়সীও হইয়া থাকেন। ইহাও সেকালে একালে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাঙ্গালার প্রবাদ বিশ্বাস করিলে বিশেষ অসঙ্গতি ঘটে না। মহাপ্রভুর মত শঙ্কর দেব মধুর ভক্তির প্রচারক ছিলেন না। তিনি জ্ঞানমিশ্রাভক্তি প্রচার করেন। আমরা নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি-রত্নাকরে (দ্বাদশ তরঙ্গ) এক শঙ্করের কথা পাইতেছি।

অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞান পক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভাল মতে॥
অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
মনোরথ সিদ্ধ মুঞি কৈনু এ প্রকারে॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা।
তেঁহো না ছাড়ে অদ্বৈত তারে ত্যাগ কৈলা॥

ইনিই আসামের ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীশঙ্কর দেব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। পত্নী বিয়োগের পর তীর্থ পর্য্যটন কালে তিনি বাঙ্গালায় নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে আসিয়া কিছুদিন অদ্বৈতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্য দেবের আসাম ভ্রমণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে অথবা শ্রীবৃন্দাবন হইতে অরণ্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তাঁহার আসামে যাওয়া সম্ভব হইতে পারে। আসামে হয়গ্রীব মাধবের মন্দির বিখ্যাত, মণিকূট পাহাড়ের নীচে একটা গুহা "চৈতন্য গোফা" নামে পরিচিত। শ্রীক্ষেত্রে শঙ্কর দেব ও চৈতন্য দেবের মিলন সম্বন্ধে দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন—

প্রভাতে উঠিয়া নিত্য গমন করন্ত।
কৃষ্ণ চৈতন্যর গিয়া থানক পাইলন্ত॥
পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক।
না করিবা কেহোঁ নমস্কার চৈতন্যক॥
যিটো জনে নমস্কার করু চৈতন্যক।
উলটায়া তেঁহো প্রণমন্ত সিজত্রক॥
মনে নমস্কার তাজ্ঞ করিবা এতেকে।
এহি বুলি শিখালন্ত লোক সমস্তকে॥
কৃষ্ণ চৈতন্য আছা মঠর ভিতর।
ব্রহ্মচারী কহিলন্ত আসিছা শঙ্কর॥
শঙ্করের নাম শুনি কৃষ্ণ চৈতন্যর।
মিলিল আনন্দ বাজ ভৈলন্ত মঠর;
দুয়ার মুখ তরহি আছিলন্ত চাই।
দুয়ো নয়নর নীর ধারে বহি যাই॥
শঙ্কররো নয়নর নীর বহে ধীরে।
পথ হন্তে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে॥
কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্রেম মনে।
পশিলা মঠত গিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে॥
না মাতিলা দুইকো দুই না দিলা উত্তরে।
পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্করে॥

দ্বিজভূষণ কবিও লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্রে আসিলন্ত।
জগন্নাথ ক্ষেত্রে কতো দিন বঞ্চিলন্ত॥
চৈতন্য গোসাঞি তথা ভৈলা দরশন।
দুইকো দুই চাহিলা নহিলা সম্ভাষণ॥
মুহূর্ত্তেক মাত্র দুই চাহি আছিলন্ত।
নিবর্ত্তিয়া আসি বাসা ঘরে পশিলন্ত॥

শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্কর দেব শ্রীমদ্‌ভাগবতের কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ করেন। প্রথম স্কন্ধ ও দ্বিতীয় স্কন্ধ, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্কন্ধের অংশ, দশমের বাল্যলীলা ও একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধের অংশ শঙ্কর দেবের অনুবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অপরাপর অংশ ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। শঙ্কর দেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই। কেলি গোপাল বা রাস-ক্রীড়া নাটকে তিনি শ্রীরাধার অবতারণা করিয়াছেন। এই নাটকে জয়দেবের "রাধা মাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী" শ্লোকের অনুকরণে শঙ্কর দেব লিখিয়াছেন—"রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ যোষিতঃ"।

আসাম জোড়হাটের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ শঙ্কর দেব রচিত কয়েকটী কীর্ত্তন "শ্রীশঙ্কর দেবর বর গীত" নামক সঙ্কলনে প্রকাশ করিয়াছেন।* এই পুস্তকখানি

প্রকাশিত হওয়ায় অসমীয়া ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয় লাভ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য দেবের সম-সময়ে রচিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পদের সঙ্গে আলোচ্য পদ গুলির বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাগ কেদার

ধ্রু,—পায়ে পড়ি হরি করহো কাতরি
প্রাণ রাখবি মোর।
বিষয় বিষধর বিষে জর জর
জীবন না রহে মোর॥
পদ,—অথির ধন জন জীবন যৌবন
অথির এহু সংসার।
পুত্র পরিবার সবহি অসার
করবোঁ কাহেরি সার॥
কমল দল জল চিত্ত চঞ্চল
থির নহে তিল এক।
নাহি ভয়ো ভব ভোগে হরি হরি
পরম পদ পরতেক॥
কহতু শঙ্কর এ দুঃখ সাগর
পার করু হৃষীকেশ।
তুঁহু গতি মতি দেহু শ্রীপতি
তত্ব পন্থ উপদেশ॥

উদ্ধৃত পদ সুপ্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস বিরচিত "ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে" পদটীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রাগ আসাবরি

শ্রীকৃষ্ণের রূপ—
ধ্রু,—বালক গোপালে করতরে কেলি।
উচ্চায়া পাচনী নাচে হাসে গোপমেলি॥
পদ,—নীল তনু পীত পট ধটি লটি লোর।
নব ঘন ঘন যৈচে বিজুলী উজোর॥
শিরে শিখগুক দোলে গলে গজমতি।
কোটি মদন মনোমোহন মুরুতি॥
চরণে মঞ্জীর ঝুরে উরে হেমহার।
শঙ্কর কহ ওহি হরিক বিহার॥

শঙ্কর দেবের একটী পদে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের সন্ধান পাওয়া গেল। কংস কারাগার হইতে সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেব নন্দালয়ে যাত্রা করিলেন। ছয়-পুত্রহারা-দেবকীর সে দিনের দুঃখের কাহিনী কোন কবি বর্ণন করেন নাই। শঙ্কর দেব একটী পদে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন—

রাগ ধানশ্রী

ধ্রু,—হরিকে বয়ন হেরি মাই
কোকায়য় খাস নীর নয়ন ঝুরাই॥
পদ,—আজু জনমি সুত গেয়ো পরদেশ।
কতনা বিহিল বিধি অভাগীক ক্লেশ॥
বিনে তুহো রহব জীবন নাহি মোই।
কহ শঙ্কর কৃষ্ণ বল সব লোই॥

শঙ্কর দেবের উদ্ধব সংবাদের পদে গোপী-বিরহের যে মর্ম্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গেই তাহা তুলিত হইতে পারে।

রাগ তুর বসন্ত

ধ্রু,—কহরে উদ্ধব কহ প্রাণের বান্ধব হে
প্রাণ কৃষ্ণ কবে আবে।
পুছয়ে গোপী প্রাণ আকুল ভাবে
নাহি চেতন গাবে॥
পদ,—বাঁশরী ধ্বনি শুনি গো বৎস দেখি।
লাগে আগি গায়ে উদ্ধব সখি॥
কালিন্দী দেখি সখি ফুটয়ে বুক।
হেথায়ে খেলায়াছিলা সে চান্দমুখ॥
হরিল নয়ন সুখ।
বিরিন্দাবন বৈরী হামারি ভেলি।
দেখিতে না বিছুরোঁ গোপাল কেলি॥
ধ্বজ, বজ্র, যব, পঙ্কজ চায়ি।
তথায়ে কান্দোঁ হামু লোটায়া কায়ি॥
গুণ গোবিন্দ গায়ি॥
কৃষ্ণ সূর্য্য বিনে ব্রজ আঁধার।
নে দেঁখো এ দুখ অম্বুধি পার॥
আর কি পেখবো গোপাল প্রাণ।
কৃষ্ণ কিঙ্কর শঙ্কর এহুঁ ভাণ॥
হরিক হৃদয়ে জান॥

এই ধরণের পদগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীবিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশা গাবো বেণুরবাইমে।
সঙ্কর্ষণ সহায়েন কৃষ্ণে নাচরিত প্রভো॥
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তী নন্দগোপ সুতং বত।
শ্রী নিকেতৈ স্তৎ পদকৈ বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ॥
গত্যা ললিতয়োদার হাস লীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্‌বিস্মরাম হে॥

মিথ্যা কথা বলা

যাদুকর পি-সি-সরকার

অনেকেই আমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে যাদুকরেরা বেশী বেশী মিথ্যা কথা কহে। কথাটা খুবই সত্য! যাদুবিদ্যার ভিত্তিই যে ঐ মিথ্যাভাষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ব্যাপারটাই যে আগাগোড়া ফাঁকি, যে ব্যক্তি একশত টাকার নোট ছিঁড়িয়া, পুড়াইয়া দিতে পারে, সে সামান্য কয়েক টাকার জন্য এত পরিশ্রম করে কেন? যে মুহূর্তে হাজার হাজার টাকা তৈয়ার করিতে পারে, টাকার বৃষ্টি নামাইতে পারে সে সামান্য কয়েক টাকার জন্য খেলা দেখাইয়া বেড়ায় কেন? আসলে ব্যাপারটাই ফাঁকি। যাহা দেখান হইতেছে সবই মিথ্যা। জগতে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতারক ও মিথ্যাবাদীর উপর আমরা চটা, কিন্তু যাদুকর নামক এক শ্রেণীর প্রতারকের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান। এই যাদুকরদের মধ্যেই হয়ত অনেকে শঠশ্রেষ্ঠ হইয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে না। এই মিথ্যা কথা বলারও নানাবিধ দিক আছে—(১) করণীয় কার্য্য সম্বন্ধেই মিথ্যাভাষণ, যেমন গলা কাটিয়া জোড়া দেওয়া ইত্যাদি। এখানে সকল লোকেই জানেন যে গলা কাটিলে মানুষ কখনও জীবিত থাকে না বা থাকিতে পারে না। কিন্তু সমস্ত শিক্ষিত সুসংস্কৃত দর্শকই যাদুকরের ঐ ফাঁকিতে পড়িয়া থাকেন এবং যাহা অসম্ভব তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। (২) প্রদর্শনকালে মিথ্যা কথা বলা—যেমন হাতের পশ্চাতে অথবা আঙ্গুলের ফাঁকে টাকা, পয়সা, তাস লুকাইয়া রাখিয়া দর্শকদিগকে বলা যে এই দেখুন আমার হাত একেবারে খালি! ইত্যাদি। দর্শকগণ সাধারণ দৃষ্টিতে আপাততঃ হাত খালি দেখিয়া বিশেষ করিয়া যাদুকরের উপর নির্ভর করিয়া হাত খালিই মনে করেন এবং পরে বোকা প্রতিপন্ন হন। (৩) যাদুকরের নাম বাসস্থান বা আত্ম পরিচয়েই ফাঁকি। এই ধরণের মিথ্যাভাষণ আমাদের দেশে খুব কমই দৃষ্ট হয় তবে ইউরোপ আমেরিকা অঞ্চলে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমেরিকান যাদুকর রবিনসন সাহেব মুখে রং মাখাইয়া ইউরোপে যাইয়া নাম লইলেন চাইনিজ যাদুকর 'চাং লিং সু'। তিনি তাঁহার বাসস্থান চীনদেশে এবং নিজে প্রকৃত চাইনিজ বলিয়া জগৎ সমক্ষে প্রচার করেন। বলাবাহুল্য পৃথিবীর বহুদেশই তাঁহার এই ফাঁকির ফাঁকে পড়িয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানেন না। যাদুকর করাচী ও তৎপুত্র কাদের নিজেদিগকে ভারতীয় পরিচয় দিলেও আমরা জানি তাঁহারা প্লিমাউথ (Plymouth) নিবাসী ইংরেজ এবং প্রকৃত নাম মিষ্টার ডার্ব্বি। যাদুকর 'ওকিটো'ও তৎপুত্র 'ফু: মানচু' নিজেদিগকে চাইনিজ পরিচয় দিলেও আমরা জানি তাঁহারা ডেভিড ও থিয়োডোর ব্যামবার্গ নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের নিবাস হল্যাণ্ড (Holland)। যাদুর খেলা দেখাইতে এ সমস্তর কতটা প্রয়োজন জানি না, তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকরদিগকেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ মিথ্যার আশ্রয়ে যাইতে দেখিয়াছি। আমেরিকানগণ বলেন প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যবসায়ী যাদুকরদিগের ঐ মিথ্যাভাষণ অন্যায় নহে। (Some concessions must be given to them) তাঁহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া উচিত। আজকাল বিজ্ঞাপনের বাজারে হয়ত ইহা চলন হইতে পারে কিন্তু আমি ইহার আরও কারণ খুঁজিয়া পাই। আমাদের যাদুবিদ্যার গোড়াতেই গলদ। প্রকৃত 'যাদু' বা 'ইন্দ্রজাল' বিদ্যা বলিয়া যাহা খ্যাত অধিকাংশ যাদুকরগণই উহা করেন না—হয়ত কেহই করেন না। আমরা যাহা করি উহা যাদুবিদ্যার অভিনয় মাত্র—"an actor playing the part of a magician." আমরা ঐশ্বরিক অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন যাদুকরের অভিনয় করি মাত্র। বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আগত যান্ত্রিক কৌশল জাত খেলা সম্বন্ধে এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইহা থিয়েটারের কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাদুকর মন্ত্র (?) পাঠ করিতেছেন এবং রঙ্গমঞ্চে একটি জিনিষ আস্তে আস্তে শূন্যে উঠিতে আরম্ভ করিল। দর্শকগণ যাদুকরের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হইয়া করতালি দিতে লাগিলেন। তাঁহারা কেহই জানেন না যে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎ হইতে সুতা টানিয়া যাদুকরের সহকারীই সমস্ত করিতেছে—যাদুকরের নিজের কোন ক্ষমতাই নাই। যাদুকর যে থিয়েটারের অভিনেতার ন্যায় একজন ইহা এখান হইতেই বিশেষভাবে সূচিত হয়।

মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ আমরা সকলেই অপছন্দ করি। কিন্তু এই মিথ্যাই যখন ছদ্মবেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন আমরা ইহাকে চিনিতে পারি না। সিনেমার ছবিতে দুঃখের কাহিনী দেখিয়া কত দর্শককে কাঁদিয়া আকুল হইতে দেখা যায়। মূলতঃ উহা যে ছবি এবং কাল্পনিক ঘটনা আমরা ভুলিয়া যাই। দেবদাসের মৃত্যু ও পার্ব্বতীর করুণ ক্রন্দন আমাদের মনে রেখাপাত করে কারণ আমরা চিত্রবর্ণিত এক একজন নায়ক নায়িকার সমর্থক হইয়া উঠি এবং অন্তরের মিল খুঁজিয়া পাই। এখানে স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হইয়া উঠে—কাজেই ঐরূপ হয়। উন্নতমনা দেশহিতৈষী দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে জুতা ছুড়িয়া মারিবেন বিচিত্র কি? প্রত্যেক মিথ্যাভাষণের পশ্চাতের এইরূপ স্বার্থের প্রশ্ন যে কোন ভাবেই হউক জড়িত আছে। কলিকাতায় যাঁহারা দোতালা বাসে উঠিয়াছেন তাঁহারা বাস কণ্ডাক্টরের বুলি "উপরমে যাইয়ে—একদম খালি হ্যায়!" নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে হয়ত দোতলা অপেক্ষা নীচের তলাই তখন বেশী খালি রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে নীচের তলায় ও সিঁড়িতে ভীড় জমাইয়া নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি না করাই তাহার উদ্দেশ্য। এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আরও বহু মিথ্যাভাষণ

আমাদের নজরে আসে। ট্রেণে একটি কামরায় উঠিতে গেলেই সকলে চীৎকার করিয়া উঠেন—"মশাই, এখানে জায়গা নাই, সামনে কয়েকটা গাড়ীর পর একেবারে খালি কামরা পাবেন।" অপরপক্ষে কেহ যদি বেঞ্চ দখল করিয়া শুইয়া থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুনিতে পাইবেন —হয় তাঁহার শরীর অসুস্থ নতুবা তিনি ভীষণ দীর্ঘপথের যাত্রী. গত কয়েক রাত্রি ঘুম হয় নাই ইত্যাদি। প্রেম ও যুদ্ধের ব্যাপারে মিথ্যার আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সেখানে কিছুই "unfair" নহে, কাজেই অপরপক্ষকে বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করাই শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধের সময় এক পক্ষ যদি আক্রান্ত হয় তখন ক্ষতির পরিমাণ *'সামান্য'* হয় ; কিন্তু নিজেরা যখন আক্রমণ করেন তখন *'ভীষণ'* হয়। ওপক্ষের লোকের মৃত্যু তালিকা রূপ প্রকাশিত হয় অনেক সময় তাহা যোগ দিয়া চলিলে হয়ত জনসংখ্যা সে দেশের বহুগুণ বেশীই প্রমাণিত হইবে। প্রেমের ব্যাপারেও তাহাই—উচ্ছ্বাসের সহিত কত কথাই বলিতে শুনা যায় কিন্তু কার্য্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য খুবই কম। দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা কত মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি তাহার খোঁজই রাখি না। নিজে আলস্যবশতঃ পত্রের উত্তর না দিয়া লিখিতে আরম্ভ করি নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।" বরপক্ষ মেয়ে দেখিয়া আসিবার সময় সকলেই পছন্দ করেন এবং বাড়ীতে যাইয়া মতামত জানাইবেন বলিয়া যান। কিন্তু প্রকৃত সত্য গোপনই থাকিয়া যায়। অফিসের কর্ম্মচারী সাতদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী গেলেন, সেখানে যাইয়া সাংসারিক কাজে ব্যপৃত রহিলেন, তখন বড় সাহেবের নিকট তার আসিল ভীষণ অসুস্থ ছুটির extension চাই।" বাড়ীর চাকর অন্যত্র চাকুরী পাইল অথবা অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন, একটি চিঠি বা টেলিগ্রাম আনিয়া হাজির করিল "মুলুকমে তাহার স্ত্রী বা বিশেষ আত্মীয়ের ভীষণ অসুখ, যাওয়া প্রয়োজন।" ইনকমট্যাক্স দিবার সময় প্রায় সকলকেই দেখা যায় নিজের আয় দেখাইতে চাপাচাপি করেন। সব চাইতে মজা হইল রাজনৈতিক কারণে যখন নেতারা না মরিয়াও খবরের কাগজ মারফৎ পুনঃ পুনঃ মারা যান এবং জীবিত হন। এরূপ দৃষ্টান্তেরও আজকাল অভাব নাই। আজকাল সভ্যসমাজে 'ইলেকসন প্রপাগণ্ডা,' নামে একশ্রেণীর নির্জ্জলা মিথ্যাকথা প্রচারের সুযোগ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কত শ্রেণীর মিথ্যাই ইহার নামে চলিয়া যায় তাহা বাস্তবিকই কৌতুকপ্রদ। দেশ-বিশেষকে স্বরাজ স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি দিবার কথাও কতভাবে শুনা যায় —ইহাও যে কতদূর সত্যভাষণ কালই প্রমাণ করিয়া দিবে। বিশ্লেষণ করিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায় স্বার্থের সঙ্গে মিথ্যাকথা বলার সম্পর্ক যথেষ্ট। আমার এক বন্ধুর গল্প মনে পড়িতেছে। আমার এক বন্ধুকে একজন ভদ্রলোক একটা অচল দুয়ানী দিয়াছিলেন। বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিলেন "ভাই কালে কালে হইল কি? জগত হইতে সত্য কি উঠিয়া গেল? নতুবা একজন দিব্যি ভদ্রলোকের ছেলে আমাকে একটা অচল দুয়ানী গছাইয়া গেল।" আমি কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "দেখি ভাই তোমার অচল দুয়ানীটা"—তখন তিনি বলিলেন "সেটি কি আর রাখিয়াছি নাকি! সঙ্গে সঙ্গে আলুওয়ালার নিকট আলু কিনিয়া চালাইয়া আসিয়াছি।" হাসিয়া ফেলিলাম মুহূর্ত্ত আগে যেটি তাহাকে 'গছান' হইয়াছিল সেটিকে তিনি নির্ব্বিবাদে 'চালাইয়া' আসিলেন। স্বার্থের খাতিরে একই ব্যাপার এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

বাল্যকালে প্রথমভাগে পড়িয়াছিলাম 'কদাচ মিথ্যাকথা কহিও না' এবং 'মিছাকথা কহা বড় দোষ। আজ দেখিতেছি কথাটাই ফাঁকিতে ভরা। আধুনিককালে ফুলের চেয়ে ফুলকপির দাম বেশী—কাজেই "নগদ যা' পাও হাত পেতে নাও,—বাকীর খাতায় শূন্য থাক" নীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুজগতে, রাজনীতিতে, প্রেমে, সংসার পরিচালনায় সর্ব্বত্রই মিথ্যার প্রভুত্ব। স্বার্থ যতদিন প্রবল থাকিবে মিথ্যার প্রচার ও প্রসার ততদিন থাকিবেই। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নমঙ্গলে পড়িয়াছিলাম—"বিশ্বে কভু বিশ্বভেবে হবে না ঠকিতে, সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।...জগতে সকলি মিথ্যা, সব মায়াময়, স্বপ্নশুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।" হিং টিং ছটের ঐ উপদেশ দিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

জিজ্ঞাসা

শ্রীপরেশ ধর এম্-এ

ভগবান, মোরা দয়া চাইনে কো, খেতে যে চাই
আস্তাকুঁড়ের ও দুটি ভাতে কি পেট ভরে?
লেড়ী কুকুরের জ্বালায় তাও তো জোটে না ছাই
জানিনে কো আজ অভিশাপ দেব কার পরে।
ভগবান, তুমি দুনিয়ার কিছু জানো না যে
আকাশে বসে কি মানুষ-কীটের খবর পাও?
মহাশূন্যের আছে মৃদুনীল চাঁদোয়া যে—
এখানে রৌদ্রে, ব্যধিতে, ক্ষুধায় নিদ্ উধাও।
ড্রেনের পাশেই পোকা-কিল্‌বিল্ গলিত ভাত
তারি তরে মোরা করি যে ঝগড়া হানাহানি

কারো নাক নেই, কারো ঠ্যাং, কারো একটি হাত
তুচ্ছ ন্যাকড়া, ভাঁড়, ইট, নিয়ে টানাটানি।
কালো ময়লায় সারা দেহ ঢাকা চামড়া ক্ষয় ;
চোখের ঘোলাটে আলোর কামনা কামনাহীন
তেলছাড়া চুলে জড়াজড়ি জট্-ধুলোর ময়
আঙুলের ডগা কুষ্ঠে খেয়েছে-আয়ু যে ক্ষীণ।
অনুভূতি নেই—শুধু আছে এক ক্ষুধা বিষম!
ভগবান, তুমি আকাশ-প্রাসাদে নাক ডাকাও
দুনিয়াময় ত সোনালি শস্য কত রকম—
শুধু কি মোদের ভাগ নেই তাতে বল্‌তে চাও?

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ঃ

আরসানাল এবং ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ডনিস কম্পটোনের অধিনায়কত্বে সার্ভিস টুরিষ্ট একাদশ ল একটি বিশেষ প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় যোগদান ক'রে াই এফ এ একাদশ দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে। ার্ভিস দলটিতে ডিচবার্ণ (স্পার্স এবং ইংলণ্ড), মেওয়ার্ড ব্ল্যাকপুল এবং ইংলণ্ড) এবং ডেনিস কম্পটোন আরসেনাল এবং ইংলণ্ড) এই তিনজন ইংলণ্ডের ইণ্টার ্শানাল ফুটবল খেলোয়াড় ছাড়া আরও কয়েকজন াতনামা ইংলিস এবং স্কটিশ ফুটবল খেলোয়াড় যোগ য়েছিলেন। এই প্রদর্শনী ফুটবল খেলাটি যাঁদের দেখবার যোগ হয়েছিল তাঁরা আমাদের দেশের ফুটবল খেলার ্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের খেলার পার্থক্যের পরিচয় য়েছেন। ইতিপূর্ব্বেই সার্ভিস দলের খেলার সঙ্গে মাদের পরিচয় হয়েছিল। আলোচ্য প্রদর্শনী খেলায় ই এফ এ দলে এ বছরের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় 'গ দিতে পারেন নি। তার ফলে দল মনোনয়ন খুব ভাল নি। আই এফ এ দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ্য বোঝপড়ার অভাব সব থেকে বেশী চোখে পড়েছে। ক্ষণ খেলার মধ্যে আই এফ এ দল মাত্র দু'বার গোল ার সুযোগ পায় এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে রেনি। রক্ষণভাগে ডি সেনের চমৎকার খেলার জন্যেই লের সংখ্যা কম হয়েছে। ৫টি গোলের জন্ম তাঁকে ী করা যায় না, এর জন্ম দায়ী সমস্ত দল, বিশেষ করে মণ ভাগের খেলোয়াড়রা। গত ৬০ বছরের উপর রা এই বিদেশী ফুটবল খেলা চর্চ্চা করছি এবং আমাদের ার কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের কথা ভুলতে পারি নি। সার্ভিস দলের খেলা দেখে আমাদের অনেক ধারণা বদলাতে হবে তা না হলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোন দিন উন্নত হবে না। কখনও কোন খেলোয়াড় তার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পরিচয় দেবার জন্ম খেলবে না, প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দলের জন্মে খেলতে হবে এবং নিজে গোল দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা না করে দলের অপর খেলোয়াড়কে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ দিতে হবে। নিজের ক্রীড়াচাতুর্য্যের উপর উচ্চ ধারণা রেখে দলের অপর খেলোয়াড়কে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা দলেরই পক্ষে ক্ষতিকর ; আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের এই নীতির জন্মই সমস্ত দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার একান্ত অভাব দেখা যায় ফলে খেলা মোটেই দর্শনীয় হয় না। কেবল দু'চার জন ভাল খেলোয়াড় হলেই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাল হয় না। 'টিম ওয়াক'ই হচ্ছে প্রধান।

সার্ভিস একাদশের খেলায় প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের খেলা লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই সমস্ত দলের জন্ম খেলছে এবং এই খেলার মধ্যেই খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পরিচয় পরিস্ফুট হচ্ছে, নিজের থেকে হাততালি পাওয়ার চেষ্টা নেই। নিখুঁত বল পাশ এবং পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া সমস্ত খেলাটি দর্শকদের উপভোগ্য করে তুলেছিল। বুট পায়ে বল ড্রিবলিং কত দর্শনীয় এবং কার্য্যকরী হতে পারে তার পরিচয় দেন ডেনিস কম্পটোন। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে দিয়ে যেখানে পা দিয়ে বল পাশ করা নিখুঁত হবে না বুঝেছে সেখানে মাথা পেতে দিয়ে দলের খেলোয়াড়কে তারা বল দিয়েছে। খেলায় stereotype পদ্ধতি অবলম্বন না ক'রে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি

অবলম্বন ক'রে দর্শকদের মনে শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা খেলার বিভিন্ন অবস্থায় তৎপরতার সঙ্গে কোন মীমাংসায় পৌছতে পারে না। সার্ভিস দলের খেলোয়াড়দের সুবিন্যস্ত পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়রা কোন রকমে নাগাল পায়নি। ছত্র ভঙ্গ অবস্থায় তাদের মাঠে খেলতে হয়েছিল। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং ক্রীড়াচাতুর্য্য ছাড়া বিদেশী ফুটবল খেলোয়াড়রা দৈহিক-গঠনে আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনায় বহুগুণে উন্নত ছিল। পৃথিবীর ফুটবল খেলায় প্রাধান্য লাভ করতে হলে আমাদের খেলোয়াড়দেরও যে অটুট দেহের অধিকারী হ'তে হবে সেদিন আমরা সর্ব্বক্ষণই অনুভব করেছিলাম।

কিন্তু যে দেশের খেলোয়াড়দের সামান্য বেতনে অফিসের চাকরী করে পরিবার প্রতিপালন করতে হয় সে দেশের খেলোয়াড়দের খেলার উপযোগী দেহ ও মন তৈরী করা যে কতখানি বিড়ম্বনা তা আমাদের অজ্ঞাত নয়। খেলার উন্নতির জন্য খেলোয়াড়ের সময়, অর্থ এবং উৎসাহের প্রয়োজন। যারা খেলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের পক্ষেই এ সব সম্ভব।

ভিক্টরী কাপ ঃ

কলকাতায় ভিক্টরী কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এই প্রথম। যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব সৈন্যদল ভারতে এসেছে তাদের বিভিন্ন আর্মি ফুটবল টিম এবং কলকাতার প্রথম বিভাগের প্রথম আটটি ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। সেই দিক থেকে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

ভিক্টরী কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৪-১ গোলে তাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যালকাটা ক্লাবকে হারিয়ে ভিক্টরী কাপ বিজয়ের প্রথম গৌরব লাভ করে। ফাইনাল খেলাটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। মোহনবাগান এবং ক্যালকাটা উভয় দলই নিজ নিজ স্বজাতির মধ্যে জনপ্রিয় এবং অন্যতম প্রাচীন দল।

একদিকে ভারতীয়দল, বিপরীত দিকে ইংরেজদল। উভয় দলই পরস্পরের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং স্থানীয় ক্লাব। সুতরাং স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের কাছে এই খেলার আকর্ষণ খুবই বড়।

সেমিফাইনালে ক্যালকাটা ১-০ গোলে ১০১ বি মিলিটারী দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। এ বছরের লীগ-শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই ১০১ বি মিলিটারী দলের কাছে ৩-০ গোলে হেরে যায়।

মোহনবাগান ক্লাবকে বি এ্যাণ্ড রেল দল, ভবানীপুর এবং মহমেডানস্পোর্টিং ক্লাব এই তিনটি পুরাতন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে হারিয়ে ফাইনালে যেতে হয়।

ফাইনাল খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব বিজয়ী হয়। বিজন বোস একাই তিনটি গোল করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এবার লীগ এবং শীল্ডের খেলাতেও ক্যালকাটা ক্লাব তার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড ঃ

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ডের ফাইনালে আশুতোষ কলেজ ১-০ গোলে বিদ্যাসাগর কলেজকে হারিয়ে এ বছর শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

ইলিয়ট শীল্ডের ফাইনালে সিটি কলেজ ৩-১ গোলে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজকে হারিয়ে এ বছর ইলিয়ট শীল্ড পেয়েছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ গত দু'বছর পর্য্যায়ক্রমে শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল। সিটি কলেজের বি মুখার্জি একাই দলের ৩টি গোল করেন।

ইংলণ্ড বনাম আয়ারল্যাণ্ড ঃ

এক আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড ১-০ গোলে আয়ারল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

কে এস দিলীপসিং জী ঃ

কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি, সাসেক্স এবং ইংলণ্ডের টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কে এস দিলীপসিংজীকে 'ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবে'র সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়েছে।

ইণ্টার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ফুটবল ঃ

ইণ্টার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হাওড়া ২-০ গোলে বর্দ্ধমানকে হারিয়ে রেঞ্জার্স জুবলী কাপ

পেয়েছে। গত বছরের ফাইনালে খুলনা জেলার কাছে হাওড়া পরাজিত হয়েছিল।

কুচবিহার কাপ ঃ

কুচবিহার কাপের ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে এ বছর কাপ বিজয়ী হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গলের মহাবীর একাই দলের ৩টি গোল করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখকরা যায়, এ বছর এই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তিন দিন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে চতুর্থ দিনের খেলায় ৩-২ গোলে মোহন-বাগানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।

বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ

পঁচিশ বছর আগে আমাদের দেশের যুবকদের খেলা-ধূলায় যেমন উদ্দীপনা ছিল তার একান্ত অভাব গত কয়েক বছর দেখা দিয়েছে। বাঙ্গলা দেশের স্কুল ও কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের ভগ্ন-স্বাস্থ্য বাঙ্গালী জাতির দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলার ব্যবস্থা ক'রে তাঁরা কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন।

সকল ছাত্রছাত্রীই যোগদান করতে পারে এমন ব্যবস্থা কোথাও নেই কিম্বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা খেলা-ধূলায় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা এ পর্য্যন্ত কোথাও করা হয়নি। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সকল ছাত্রদের খেলাধূলায় যোগদানের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে এমন অনেক ব্যায়াম আছে। সে দিক থেকে কোন বাধা নেই। আমাদের মধ্যে শরীর চর্চ্চার উৎসাহ কমে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া বিবেচনা বোধ করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব 'Students welfare Society' আছে। এই সমিতির একটি উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে কিন্তু সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কাজের কোন দৃষ্টান্ত আমরা পাইনা। এই সমিতিরই রিপোর্টে প্রকাশ, ভগ্ন-স্বাস্থ্যহেতু দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বহু। তাছাড়া দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের কারণে আরও আধি ব্যাধি আছে। রিপোর্টে এ খবর প্রকাশ করা যেমন তাঁদের কর্ত্তব্য তেমনি কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের এই অবস্থায় কি ভাবে রক্ষা করা যায়। সেইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।

* * * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নয় কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং তার ফলাফল প্রকাশ করা। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও যথেষ্ট গলদ যেমন রয়েছে তেমনি এই পদ্ধতিই আমাদের ছেলেমেয়েদের ভগ্নস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ হয়েছে। স্তূপীকৃত পাঠ্যপুস্তক উদ্ধার করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেবল অকৃতকার্য্যই হচ্ছে না, অকালে স্বাস্থ্য হারিয়ে জীবন যুদ্ধে পিছিয়ে পড়ছে। যে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে অসাফল্যের সংখ্যা সব থেকে বড় সেখানে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতাই প্রধান কারণ, না শিক্ষাপদ্ধতির গলদ—এ অনুসন্ধান করার দায়িত্ব ছাত্রদের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষাক্ষেত্রে এর থেকে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে। বাঙ্গলা দেশের ছেলেমেয়েদের এই ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক এবং যুবকদের কর্ত্তব্য আছে তেমনি কর্ত্তব্য বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের। সরকারী সাহায্য ছাড়া এরূপ একটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

* * * *

ফুটবল বিদেশী খেলা হলেও আজ বাঙ্গলা দেশের সব চেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং এই ফুটবল খেলাকে জাতীয় খেলা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু বাংলা দেশের কয়েকটি নামকরা ফুটবল প্রতিষ্ঠান গত কয়েক বছর অবাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের দলে খেলবার সুযোগ দিয়ে বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়দের কি ভাবে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে তার পরিচয় নতুন করে দিতে হবে না। শীল্ড এবং লীগ পাওয়াই যেন বেশীর ভাগ ফুটবল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছে। কোন আদর্শ নেই বা কোন গঠন মূলক কাজের পরিকল্পনা নেই। যে কোন প্রকারে জিত হলেই হ'ল।

অবাঙ্গালী খেলোয়াড়দের আমদানিতে বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলাধূলার উৎসাহ কমে যাচ্ছে। অথচ ক'লকাতায় খেলবার সুযোগ পাওয়াতে অবাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে ফুটবল খেলার বেশ একটা আমেজ এসে গেছে। সমস্ত ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলী যদি

খেলোয়াড় আমদানির মনোভাব ত্যাগ না করেন তাহলে নিকট ভবিষ্যতে ফুটবল খেলায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আর কিছুই থাকবে না।

* * * *

বিলেতে সখের এবং পেশাদার এই দুই শ্রেণীতে খেলোয়াড়দের ভাগ করা হয়েছে। বিলেতে নানা দেশ থেকে খেলোয়াড়দের টাকা দিয়েও খেলার জন্যে আমদানী করা হয়। কিন্তু সেখানের ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ভাল খেলোয়াড়দের দিয়ে ভাল খেলোয়াড় তৈরী করা এবং খেলার আর্ট উপভোগ করা। এই দিক থেকে আমাদের এখানে খেলোয়াড় আমদানি করা হয় না।

এখানের ফুটবল মহলে এখনও পেশাদার প্রথার চলন হয়নি। অফিস, সংসার এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সখ করে খেলবার আগ্রহ আর কতদিন থাকে। ফুটবল খেলার উপযোগী শরীর রাখতে হলে পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম এবং বিশ্রাম প্রয়োজন। এ সমস্তই অর্থ ছাড়া পাওয়া যায়না বলেই আমাদের এখানের কোনো খেলোয়াড়ের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেশী দিন থাকে না।

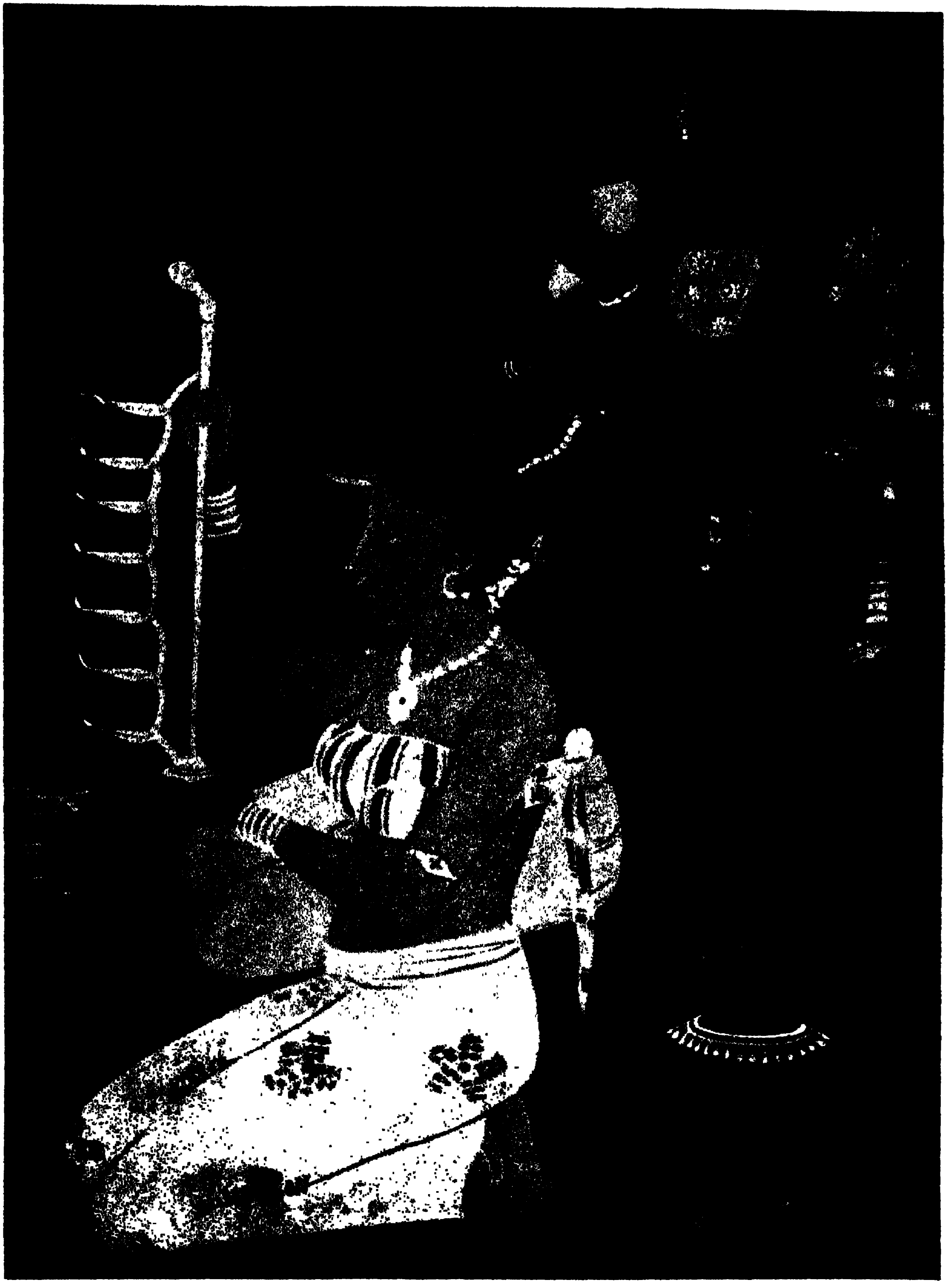
সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান"—৩৲
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মন জানে"—৩৲
মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "মঞ্চে ও নেপথ্যে"—৩৲
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত "ঈশপের গল্প"—৸৹
শিবপদ দাস প্রণীত উপন্যাস "এ মেয়ে, মেয়ে নয়, মানসী"—৩৲
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "টাওয়ার অফ লণ্ডন"—২৷৹
রঞ্জিত সিংহ প্রণীত "ময়নামতীর দেশ"—১৲
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পে বাঙ্‌লার ইতিহাস "সোনার বাঙলা"—২৷৹
মৃগনাভি প্রণীত উপন্যাস "তাজমহলের দেশে"—২৲
শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায় প্রণীত "অভ্রছায়া"—২৲
কানাই বসু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রঙ ছুট"—১৷৸৹
বিষ্টু মুখোপাধ্যায় অনুদিত উপন্যাস "অমর মানুষ"—২৷৹
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত উপন্যাস "মঞ্জুলিকা"—২৲
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রবি-রশ্মি" (২য় খণ্ড)—৬৲
শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত "মরণ মেলার যাত্রী"—১৲
অতনু গুপ্ত প্রণীত "আবৃত্তি-ধারা"—১৷৹
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "চার পুণ্যস্থান"—১৲
শ্রীভৈরবানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীকালিকাকল্পামৃতম্"—২৲
ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত "প্রাচ্যবাণীমন্দির প্রবন্ধাবলী" (১ম খণ্ড)—১
শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "জয়শ্রী"—২৲
গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সাম্প্রতিক শাসন সমাচার"—২৷৹
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ প্রকাশিত "বার্ষিক শিশুসাথী" (১৩৫২)—৩৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "জাতীয়তার নবমন্ত্র"—১৷৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস— "ডাকাত-কালীর জঙ্গলে"—১৲
সুজিতকুমার নাগ ও শান্তি সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "আগমনী"—৷৹
প্রশান্তি দেবী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "তমসাবৃতা"—২৲
শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার প্রণীত "অরণ্যের অঞ্জলি"—১৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী [illegible] আরতী ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্





অগ্রহায়ণ—১৩৫২

প্রথম খণ্ড	ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

ভারতীয় ইতিহাসের সূত্র

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল্

উপনিষদের ঋষি বললেন—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। এই রূপ-বৈচিত্র্যের রস-বৈশিষ্ট্যের ইতিহাসই সত্যকার ইতিহাস, ইতিহাস মানব জীবনের বিভিন্নমুখী প্রকাশের কাহিনী—Life of man in all its manifestations. সাল তারিখ বা শিলালেখ, যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজবংশের তালিকা—এইগুলি ইতিহাস গঠনের মালমসলা বটে. কিন্তু ইতিহাসের যাহা প্রাণ তাহা এইগুলির ভিতর পাওয়া যায় না। ইতিহাস সংস্কৃতির ইতিহাস, ঐতিহ্যের কাহিনী, সৃষ্টি-সংঘর্ষের বিচার। যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে মানবচিত্তের এই যে প্রসার ও উর্ব্বরতা হইয়াছে তাহার প্রতীকই ইতিহাসের উপাদান। সাহিত্য, শিল্প, কারুকলা, ধর্ম্ম, দর্শনের ইতিহাসই সমাজের ও দেশের সত্য ইতিহাস, কারণ তাহারাই নিত্যকালের ইতিহাসে আপনাদের শাশ্বত সনাতন রূপ অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রগঠনে, কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, ধর্ম্মসংগঠনে জাতির অন্তর্নিহিত যে গূঢ় ভাবধারা রূপে ও রসে সঞ্জীবিত হয়ে রূপায়িত হয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে, তার প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতির বাহন। Macherএর ভাষায় "Our culture is what we are, our civilisation is what we use." বিটোফেনের সঙ্গীত, মোজার্টের সুর, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, প্যালিডস্কির গান, নন্দলাল বসুর চিত্র, এমন কি উদয়শঙ্করের নৃত্য আমাদের মনকে নাড়া দেয় সেটা ভিতরকার প্রকাশ, মানুষের সৃজনীশক্তির প্রকাশ।

মাঝে মাঝে কথা উঠে—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় না, কারণ তাহার "পাথুরে প্রমাণ" নাই, কিন্তু এ কথাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। জাতির যাহা সম্যক্ ও সত্য পরিচয়, তাহা তাহার আত্মার প্রকাশের মধ্যেই আছে; বিভিন্ন জাতি বিভিন্নমুখী গতির দ্বারা মানবাত্মার প্রকাশকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। তাম্রশাসন বা শিলালিপি এই গতিশীল সত্যকে কিছুতেই ধরিতে পারে না—শুধু দেশ ও কালের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর সত্যের খণ্ড পরিচয়ই দেয়। "পাথুরে প্রমাণের" উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, শুধু বিশ্লেষণমুখী মনোবৃত্তি সাহায্যে ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণা করিলে, একটা জাতির প্রবহমান ভাবধারাকে ধরা যায় না। যে যুক্তিভঙ্গি ও যে অনুভূতি থাকিলে জাতির অখণ্ড সত্তার সাক্ষাৎ লাভ হয়; তাহা আয়ত্ত করিতে হইবে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে [illegible] [illegible] হইবে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। তবেই সারনাথ,

সাঁচি, অজন্তা বা ইলোরায় ধ্বংসস্তূপগুলি দেখি, যখন পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা বা মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে ভারতের অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা কল্পনা করি, যখন ঋগ্বেদীয়, নাসদীয় সূক্ত পাঠ করি বা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের বাণীগুলির কথা ভাবি, যখন দেখি ভগবান্ তথাগতের ধ্যানী-বুদ্ধমূর্ত্তি—অমরসাধক শিল্পীদের পরম সাধনালব্ধ "সহস্র রম্যহস্তের স্পন্দন" অপূর্ব্ব রসবস্তু, যাহা রূপ ও অরূপের মিলনে ও প্রকাশে অপরূপের সৃষ্টি করিয়াছে; যখন ভাস, কালিদাস বা ভবভূতির কাব্যরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করি, তখন দেখি, একটা বিরাট জাতির ইতিহাস তাহার মধ্যেই মূর্ত্ত ও প্রকট হইয়াছে—সাল, তারিখ, তাম্রশাসন ইহার কাছে শুধু নিরর্থক নহে, নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীনতম কাল হইতে মানবজীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক এক মানবগোষ্ঠী পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ খণ্ডে বসবাস করিতেছিল এবং ঐ ভৌগলিক সংস্থানের ফলে প্রত্যেক বিভিন্ন সমাজ নিজেদের শ্রেণীগত, আচারগত ও কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ট্য গড়িয়া তুলিতেছিল। প্রত্যেক সমাজের চিন্তার ধারা ও সংস্কৃতির স্রোত এই ভাবে ভিন্নমুখী হইয়া উঠে। এইরূপ নীল নদীর তীরে ইজিপ্ট, সিন্ধু ও গঙ্গাযমুনার কূলে ভারতবর্ষ, টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিসের ধারে আসিরিয়া, ব্যাবিলন সংস্কৃতির এক একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়া জাগিয়া উঠে। ক্রীট, মাইকেনিয়ান্, প্রাচীন গ্রীক্, চৈনিক, ইসলামীয় বা পারসিক্ সভ্যতাও এইরূপভাবে গড়িয়া উঠে। এই কথা ঠিক যে প্রত্যেক দেশের সভ্যতা, তাহার মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ সেই সব জনপদের ভৌগোলিক, জাতিগত ও ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের ফল। কিন্তু প্রত্যেক সংস্কৃতিই অপর সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে—যেমন প্রাচীন ইজিপ্টের বাণী ক্রীট ও ব্যাবিলনের ভিতর দিয়া গ্রীসে পৌঁছিল; গ্রীসে তাহাকে আত্মকেন্দ্রস্থ করিয়া নূতন সৌন্দর্য্যসম্ভারে রূপায়িত করিল; ইহাই আবার গ্রীসের নিকট হইতে পাইল রোম এবং রোমের নিকট হইতে পাইল বর্ত্তমান ইউরোপ। রোমের ভাবধারাই প্রথমতঃ রোমান্ চার্চ্চের মধ্য দিয়া ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, আর উত্তরকালে আনিয়াছিল 'রেণাসাঁস্' যুগের নব জাগরণ! আবার অনেক পণ্ডিতের মতে ভারতের প্রাক্-আর্য্য সংস্কৃতি ইজিপ্ট ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ বহুদেশ ও সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল—ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন হোমরীয় ট্রয় ও ক্লসস্ নগরীর ধ্বংসাবশেষের ভিতর। প্রায়ই এ কথা বলা হয় যে নীল নদের পিরামিড এক লুপ্ত সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়; পার্সিপোলিস সুসার ধ্বংসাবশেষ আজ গবেষণার বস্তু; ইজিপ্ট, আসিরিয়া, ব্যবিলোন ও মায়া-সভ্যতা আজ মৃত; গ্রীস রোম গ্রন্থাগারে ও মিউজিয়ামে স্থান পাইয়াছে—এইগুলি অতীতের বক্ষের কঙ্কাল। একথা অনেকাংশে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ইতিহাসকে দেখিতে হইবে সমগ্র ধারাবাহিকতার মধ্যে—পরিণতি হইতে পরিণতিতে। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে সংযুক্ত করিয়া উভয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত থাকিয়াই অসীম কালপ্রবাহের মধ্যে মহাকালের নৃত্য চলিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মিশরীয় প্রত্নবিৎ Breasted বলেন,—ইতিহাসের ধারা এখনও চলমান ও অসমাপ্ত;—"অসমাপ্তবান্"—একটী Unfinished Process. ইহা শুধু অতীত বর্ত্তমানকে লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, ভবিষ্যতের বীজ, অনাগত দিনের রূপও ইহার ভিতর উপ্ত ও প্রচ্ছন্ন আছে। "সনাতনমেনমাহুর্, উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ"—ইনিই সনাতন, ইনিই পুনরায় নূতন। পরস্পরের আদান প্রদানে জন্ম হয় নবজাতকের।

ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনা করিলে এই অন্তর্নিহিত সত্যটি সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নানা চিন্তা ধারায় পরিপুষ্ট; অনেক ভগীরথ এখানে ভাবগঙ্গা বহন করিয়াছেন, এই সভ্যতার বেদীতে অনেক জাতির পুজোপচার আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ প্রাণশক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, বর্জ্জন করে নাই। বহু বিচিত্র চিন্তাধারার পরস্পর বিরুদ্ধতা ভেদ করিয়া একটী ঐক্যসূত্রে সমীকরণের দিকে চলিয়াছে—যাহার মধ্যে বহু সংঘাত সত্ত্বেও বহু জাতি তাহাদের ভাষা, আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া মিলিত হইয়াছে। বহু জাতির মিলন ও সহযোগে ভারতীয় কৃষ্টির বিশাল বটদ্রুম তাহার অগণিত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। সভ্যতার অর্থই হইতেছে একত্র হইবার প্রচেষ্টা, তাহার মন্ত্র, "সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, সংবো মনাংসি জানতাম্"—ভারতীয় সভ্যতা এক বিরাট সমন্বয় ও অন্তর্মুখী সমীকরণকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। সেই সমন্বয়ের কাজ এখন পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে—এটাকে কেউ কেউ বলেছেন যে এটা সরল গ্রহণশীলতা নয়, অক্ষম নমনীয়তা। এখনো ভারতে 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর' সংগ্রহের আয়োজন চলিতেছে। ভারতীয় সাধনার শাশ্বত স্বরূপ ও মৃত্যুঞ্জয় প্রাণশক্তির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—"একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান মনন্‌ধারা, সে বলতে পেরেছিল—আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—সকলে আসুক সকল দেশ থেকে, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে"—শুনুক্ বিশ্বের লোক; বলেছিল, "বেদাহম্' আমি জানি এমন কিছু যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে শোনাবার মত।"

প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন ইজিপ্ট, ব্যবিলোন ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ বহু জাতির ও দেশের নিকট সম্পর্ক ছিল। ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ভারতের আদিম অধিবাসী নিগ্রোবটু, তাহার পর পূর্ব্বদিক হইতে আসে অষ্টিক জাতি; ইহা ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত; কিন্তু ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহের মতে প্রটো-অষ্ট্রলয়েড্ জাতি পশ্চিম দিক হইতে আসিয়াছিল; তাহার পর আসে মেডিটারেনিয়ান্ ও আল্পাইনরা, আর পোষ্ট-মঙ্গোল জাতি। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে সব জাতিসংঘেরই দান আছে;—নিগ্রোবটু দিয়াছে ধনুর্বিদ্যা; প্রটো-অষ্ট্রলয়েড আনিয়াছে নিওলিথিক সংস্কৃতি, মৃৎশিল্প আর মৃত্যু ও মনখের চাবার অনুরূপ ভাবা—যাহার সঙ্গে প্রাচীন সুমেরীয় ভাষা Group এর সাদৃশ্য আছে।

ভারত ইতিহাসের পরের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে যে, দ্রাবিড়ের অভ্যাগম হইয়াছে, তাহার পরে আসেন বৈদিক যুগের আর্য্যেরা;

তাহার পর পোট-মোঙ্গল জাতি ; পরবর্ত্তী রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল আর্য্যশাখার পারসিক, গ্রীক্‌, শক্‌ ও অনার্য্য হূণ ;—সবাই নিজেদের বৈশিষ্ট্য দান করিয়া সত্য ও নিত্যকালের মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছে। তুর্কী, আরব, তাতার ও মোগল, পাশ্চাত্য পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজদের আগমন ত সেদিনকার কথা ;—ইসলাম ও প্রতীচ্য সভ্যতার সমীকরণ প্রভাব আজও পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে "অষ্ট্রিক্‌রা আনিল গ্রাম্য সংস্কৃতি, দ্রাবিড়রা আনিল নাগরিক সভ্যতা, শিল্প ও বিচিত্র রসগ্রাহিতা ; আর্য্যেরা আনিল অপূর্ব্বভাবা, অনুপম কল্পনা, সমাজ ও রাষ্ট্রগত নিয়মানুবর্ত্তিতা, বিচার ও বুদ্ধিশক্তি।" প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে আমরা অষ্ট্রিক-দ্রবিড়-আর্য্য সভ্যতাই বুঝি—যাহাকে পরবর্ত্তীকালে সমৃদ্ধ করিয়াছে ইরাণী, গ্রীক, হূণ, শক, মুসলমান, ও ইংরাজ।

ভারতে আর্য্যরা কেমন করিয়া আসিলেন তাহার সমাধান আজও হয় নাই। অবশ্য ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সুদূর সুমেরু হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সকল স্থানই আর্য্য-সভ্যতার জন্মভূমি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে যে বিরাট সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা মূলতঃ প্রাক্‌-আর্য্য ও অনেক পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন ঋগ্বেদের বহু সূক্তে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় ; হয়ত বা মহেঞ্জোদাড়ো যুগের সৈন্ধবী-দ্রাবিড় সুমেরীয় সভ্যতা ও সপ্তসিন্ধুর তীরে বৈদিক্‌ আর্য্য সভ্যতা পাশাপাশি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া একটি অপরটিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই জলপ্লাবনের কাহিনী প্রাচীন সব দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে প্রাচীনকালে এইরূপ এক বা ততোধিক প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল। কাহারো মতে বৈবস্বত মনু দ্রাবিড়দেশের রাজা ছিলেন এবং মৎস্য পুরাণ অনুসারে তিনি জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পান ও পুনরায় সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করেন। বৈদিকগ্রন্থে ঋক্‌মন্ত্র অপেক্ষাও বহু "নিবিদ" মন্ত্রের উল্লেখ আছে ;—যেগুলির প্রাচীনত্ব ঋক্‌ রচনাকারী ঋষিরাও স্বীকার করিয়াছেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের একটী নিবিদে মনুকে অগ্নি যজ্ঞের প্রথম প্রবর্ত্তক, প্রথম হোতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইসব দেখিয়া কোন কোন লেখক মনে করেন যে যিনি প্রাক্‌-আর্য্য দ্রবিড় সমাজের সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক সমাজের ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি "মনু" নামক কোন জননেতা বা চিন্তানায়ক ছিলেন। তবে এইসব আনুমানিক আলোচনা।

সিন্ধুউপত্যকায় মহেঞ্জোদাড়োকে কেন্দ্র করিয়া যে সভ্যতা বিস্তীর্ণ ভূভাগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা আর্য্য সভ্যতাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। এই সৈন্ধবী সভ্যতার উৎপত্তিস্থান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। Proto-Sumerian বা আদি যুগের সভ্যতা ও প্রাক-আর্য্য দ্রাবিড় সভ্যতা যে একই কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে বেলুচিস্থানের "ব্রহুই" ভাষা, দ্রাবিড় ভাষা এবং প্রাচীন যুগের ভাষা এক পর্য্যায় ভুক্ত। অস্থি কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়াও নৃতত্ত্ববিদ্‌ বলিতেছেন—একই আদিম জাতির বিভিন্ন শাখা ভূমধ্যসাগর তীরে, পারস্য উপসাগরের কূলে ও সিন্ধু উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ভারতের আদি দ্রাবিড়গণ ইহাদেরই স্বজাতি এবং ঘটনা বিপর্য্যয়ে পরবর্ত্তীকালে দক্ষিণ ভারতে গিয়া স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে আদিম যুগের দ্রাবিড় সভ্যতা ভারতেই জন্মলাভ করিয়াছিল এবং তথা হইতে সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া পশ্চিম এসিয়া ও ভূমধ্য-সাগর তীরবর্ত্তী দেশসমূহে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃতির স্রোত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছিল, না পশ্চিম হইতে পূর্ব্বগামী হইয়াছিল—এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা এখনও হয় নাই। মহেঞ্জোদাড়োর শীল-মোহরাদির লিপি এখনও অজ্ঞাত ; সম্পূর্ণভাবে এইসবের পাঠোদ্ধার ও বিচারে সম্ভবতঃ এই সমস্যার বিচার হইতে পারে। আপাততঃ আমরা এক বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপিয়া যে কৃষ্টির সাদৃশ্য ও ঐক্য দেখিতেছি তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। তাহা কিছুতেই আকস্মিক হইতে পারে না ; এই সভ্যতার অন্তঃস্থলে ফল্গুধারার মত একটী প্রাণ-প্রবাহ স্মরণাতীত কাল হইতে বহিয়া আসিয়াছে।

যে আদিসুমের দ্রাবিড় সভ্যতার কথা বলা হইল তাহাতে নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। আধুনিক যুগের মত উচ্চ হর্ম্ম্য, স্নানাগার, সন্তরণবাপী, পয়ঃপ্রণালী মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ত্তবিদ্যা ও স্থাপত্যে প্রাক্‌-আর্য্য জাতি, বিশেষতঃ দ্রাবিড়গণ যে সুনিপুণ ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহাভারতকার আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্র-স্থলে ময়-দানবের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। মৃৎশিল্প এই সভ্যতার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। পৃথিবীর বহুস্থানে মৃন্ময় পাত্র পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঁচবৎ মাটি (Glazed Pottery)র উপর নিপুণ বর্ণবিন্যাস সিন্ধু সভ্যতায় নিজস্ব উপাদান। এইখানে যে সব কারুকার্য্য শোভিত স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, প্রসাধন সামগ্রী ও গৃহসজ্জার উপকরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা ঐ যুগের মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। বয়ন শিল্পও ঐ যুগে অজ্ঞাত ছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে যে তুলার সূতা পাওয়া গিয়াছে তাহা মিশরের শণজাত সূতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল। ভারতবর্ষ যে উত্তরকালে বস্ত্রশিল্পের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিল, ভারতীয় মসলীন যে রোমান্‌ বিলাসিনীদের অতি আদরনীয় হইয়াছিল, তাহার মূলেও বোধহয় সিন্ধু সভ্যতার দান ছিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)



চেঞ্জ

ভাস্কর

১

পূজার ছুটী; অতি প্রত্যূষে দিল্লী এক্‌স্‌প্রেস্‌ শিমুলতলা ষ্টেশনে থামিবামাত্র ইণ্টার ক্লাশের একটি প্রকোষ্ঠ হইতে অনিল তাহার স্ত্রী অলকা, শিশুকন্যা লীলা এবং কতকগুলি জিনিষপত্রসহ হুড়মুড় করিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নামিয়া পড়িল। ট্রেনখানি একটু পরেই যাবার দিকে ছুটিল।

অলকা কহিল, কটা জিনিষ নামল, গুণে দেখ না। অনিল গণিল, এক, দুই, তিন,…একুশ—ঠিক আছে। অলকা কহিল তোমার হাতে ও ছাতাটা কার?

তাই ত! আর কার ছাতার সঙ্গে বদ্‌লে গেছে।

এখন আর ভেবে কি হবে? দেখি, কেমন ছাতা—যাক্‌, ভুমি ঠক নি।

চেঞ্জে এসে প্রথমেই ছাতা-ইণ্টারচেঞ্জ।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল। জিনিষপত্র গরুর গাড়ীতে বোঝাই হইল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌ কোঠী বাবু?

অনিল বলিল, মর্ম্মর কুটীর।

তার পর সে লীলাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং অলকার সঙ্গে ষ্টেশনের পশ্চিম দিক্‌ দিয়া মজিলপুর লজের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়াই অলকা বলিল, এই নূতন জুতোজোড়ায় আমার পায়ে বড় লাগ্‌ছে, একটু যেন ছোট হয়েছে, মনে হয়।

তা হবেই ত। সেবার আমি পায়ের মাপ নিয়ে কিনে দিয়েছিলাম, তাই ঠিক হয়েছিল। এবার স্বয়ং কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়ে কিনে আনা হয়েছে, তাই ছোট হয়েছে।

আচ্ছা, বেশ! উঃ আমি আর হাঁট্‌তে পারবো না।

তবে গরুর গাড়ীতে চড়।

না, সেও হবে না।

তবে জুতাজোড়া খুলে দাও—আমি পকেটে রেখে দি। খালি পায়ে হেঁটে চল। আর ত বেশী দূর নেই।

তাহাই হইল। খানিকদূর অগ্রসর হইতেই বিপরীত দিক হইতে যে যুবকটি আসিয়া অনিলকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার নাম বিমল। সেও কয়েকদিন পূর্বে সস্ত্রীক এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। বিমল কহিল, বাঃ, এখানে আস্‌ছ, তা আমাকে একবার জানালে কি দোষ হত?

তুমি যে এখানে এসেছ, সে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক্‌, তুমি আছ কোথায়?

খাপ্‌রা-প্রাসাদে। এখান থেকে বেশী দূর নয়। বেশ সস্তায় একখানা বাংলো গোছের বাড়ী পাওয়া গেছে। আচ্ছা, এখন আসি—বাজারের দিকে যাচ্ছি—পরে আবার দেখা হবে।

এত সকালে বাজারে যাচ্ছ কেন?

সকালে না গেলে মাছ পাওয়া যাবে না। তুমি যে গাড়ীতে এলে এই গাড়ীতে কিছু মাছ আসে। দশ পনের মিনিটের মধ্যেই সব লুট হয়ে যায়। তুমি উঠ্‌ছ কোথায়?

মর্ম্মর-কুটীরে। তুমি এ বাড়ীটা চেন?

খুব চিনি। আমাদের বাসার কাছেই। আচ্ছা, তুমি এখন গিয়ে ঘরকন্না গোছাও। বিকেলে তোমার ওখানে যাব'খন।

২

বাসাটা অলকার বেশ পছন্দ হইয়াছে। কলিকাতায় অপরিসর গলির ভিতর হইতে এখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বাড়ীর সংলগ্ন বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ—ছোট প্রাচীর দিয়া ঘেরা। তার মধ্যে আম, পেয়ারা, ডুমুর, আমলকী, নিম, করঞ্জা প্রভৃতি নানাপ্রকার গাছ। বাড়ীর সাম্‌নের দিকে দুই সারিতে কতকগুলি বেলফুল ও চামেলীর ঝাড়। গেটের দুই পাশে দুইটি বড় হাস্‌না-হানার ঝোপ।

জিনিষপত্র গুছান হইয়া গিয়াছে। বড় একখানা ঘর শোবার জন্য এবং আর একখানি বসিবার জন্য স্থির হইয়াছে। কোন আস্‌বাব নাই। দুইখানা মলিন চেয়ার, একখানা বেঞ্চ, এই বাড়ীতেই ছিল। বাড়ীর মালীকে বলিয়া কহিয়া একখানা ইজি-চেয়ার এবং একখানা ছোট টেবিল সংগ্রহ করা হইয়াছে। সে তাহার পরিচিত একটি লোককে আনিয়া এ বাড়ীতে চাকররূপে ভর্তি করিয়া দিয়াছে। সে চাকর ও বামুন উভয়ের কাজই করিতেছে। অলকা শুধু তত্ত্বাবধান করিতেছে।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্বে কাপড়-চোপড় পরিয়া টেবিলের পাশে উভয়ে বসিয়াছে। চাকর টিকুয়া চা আনিতে

গিয়াছে। অনিল একটা বিস্কুটের টিন খুলিয়া লীলার হাতে একখানা দিয়াছে এবং আর একখানায় কামড় দিতেছে। এমন সময়ে বিমল বারান্দায় উঠিয়া হাঁকিল, অনিল!

এই যে এসেছ—বেশ। ওগো, এদিকে এস, দেখ কারা এসেছে।

অলকা বিমলের স্ত্রী রেণুকে পূর্বে দেখে নাই। বিমলের বিবাহ হইয়াছে সে সংবাদ জানে, কিন্তু তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ এই প্রথম। রেণু অসামান্যা রূপসী। যেমন দেহের বর্ণ তেমনি চোখ মুখের শ্রী। একখানি চাঁপা রংয়ের ছাপা সিল্কের শাড়ীতে তাহাকে জীবন্ত লক্ষ্মীপ্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছে। অলকা অগ্রসর হইয়া রেণুর দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল—

আসুন, আমার কি সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

আমাকে 'আপনি' বল্‌বেন না অলকাদি, আমি আপনার কত ছোট।

আচ্ছা, তাহলে তুমিও আমাকে 'আপনি' বল্‌তে পাবে না।

সকলেই ঘরে গিয়া বসিল। চেয়ার মাত্র দুখানা, তাই অনিল এবং অলকা বেঞ্চির উপরই বসিল। অনিল হাঁকিল, টিকুয়া, চার কাপ চা ক'রে নিয়ে আয়।

চা আসিল। গল্প চলিতে লাগিল। অনিল কহিল, আচ্ছা বিমল, তোমরা ত প্রায় এক সপ্তাহ এখানে এসেছ, কেমন লাগ্‌ছে বল ত!

মন্দ কি। সহর থেকে এসে এখানে ত বেশ ভালই লাগ্‌ছে।

খুব নির্জন, না?

তা নির্জনই ভাল। মানুষের হট্টগোল ত বারমাসই আছে।

তা বটে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এতটা নির্জনতা ভাল নয়। অন্ততঃ নিজ পরিবারেও লোকজন বেশী থাক্‌লে অনেকটা ভাল লাগে।

কিন্তু ভাই, পিসী, মাসী, কাকী এসব নিয়ে বেড়াতে আসার চেয়ে, মোটে না আসাই ভাল। এরা সব থাক্‌লে এমন অবাধে বেড়ান বা বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সব মাটী। এই দেখ না, যদি মা বা কাকীমা সঙ্গে আস্‌তেন, তাহলে কি আর আমি নিঃসঙ্কোচে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ আলাপ কর্‌তে পার্‌তাম, না তুমিই পার্‌তে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে। একদিনের আলাপে ত নয়ই। একমাসের মধ্যেও হয়ত হ'ত না।

তোমার বাড়ীর লোকেরা বুঝি খুব সেকেলে?

সংসারে যত রকম লোক, তত রকম মত। নাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চা খাওয়া শেষ করে চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

অলকা কহিল, হাঁ, চল, এঁদের সঙ্গেই আজ বেরোনো যাক্। আমরা ত কোন যায়গাই চিনি নে।

বিমল উত্তর দিল এখানে চিন্‌বার বিশেষ কিছু নেই। অতি ছোট জায়গা। দুদিন বেড়ালেই সব দেখা হয়ে যাবে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে—আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, সে আর কি বল্‌ব।

সেটা উভয়তই।

অতঃপর চারজনে বেড়াইতে বাহির হইল। লাল রাস্তা ধরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশনে একখানা ট্রেন আসিয়াছিল। তাহার যাত্রীদের ওঠানামার কলরব শেষ হইল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। যাঁহারা এখানে নামিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়টি ছেলে, কয়টি মেয়ে, তাহাদের লাগেজ কম কি বেশী, মেয়েরা সুন্দরী কি না, ইহারা চাকুরে না উকিল, ব্যারিষ্টার না জমিদার, প্রভৃতি নানা প্রকার অনুমান ও গবেষণা করিতে করিতে রেল লাইন পার হইয়া দোকানগুলির পাশ দিয়া, পুকুরের পাড় ধরিয়া, লেভেল-ক্রসিং পার হইয়া চাকাই রোড ধরিয়া খানিকটা হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিল। পথিমধ্যে পরস্পরের সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপ হইল। বন্ধুপত্নীর সহিত বিমল বেশ মিষ্ট দুই চারটি রসিকতাও করিল। রেণু তাহাতে একটু বিরক্ত হইলেও মুখে হাসি ও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

উভয়ে বিদায় লইবার সময়ে স্থির হইল, আগামী শনিবারে হল্‌দি ঝরণায় চড়ুইভাতি হইবে। দুপুরে সেখানে যাইবে এবং সন্ধ্যায় ফিরিবে।

অনিল ও অলকা বাসায় ফিরিয়া দেখিল, লীলা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিয়া টিকুয়ার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

৩

প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ভ্রমণ দৈনন্দিন কাজ। পথে প্রায় দুবেলাই বিমল ও রেণুর সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হইলেই কিছুদূর পর্য্যন্ত একসঙ্গে ভ্রমণ, গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা চলে। পরে কেহ বা ষ্টেশনের দিকে, কেহ বা 'নীলাবরণের' দিকে চলিয়া যায়। বিদায়ের সময়ে উভয় পক্ষই উভয়পক্ষকে সানন্দ ও সাদর ভাষায় বিদায় দেয়।

সেদিন সকালে অনিলেরা গেল ষ্টেশনের দিকে? ষ্টেশন পার হইয়া 'ব্রীজের' উপর দিয়া লাট্টু পাহাড়ে যাইবে, তথা হইতে ফিরিয়া কিছু বাজার করিয়া, পোষ্টাফিস্ হইতে খবরের কাগজ

লইয়া, ষ্টেশনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন হইয়া, রেলওয়ে ওভারব্রীজের উপর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া বাড়ী ফিরিবে, এইরূপ ইচ্ছা।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা লাটু পাহাড়ে পৌঁছিল। অলকা কহিল, এটাকে লাটু পাহাড় বলে কেন?

দেখতে যেন একটা লাটু উল্টা হয়ে আছে, তাই বোধ হয়।

পাহাড়ের উপর উঠিয়া নূতন সূর্য্যের আলোকে চতুর্দ্দিকের পাহাড়ের সারি, তাহার মধ্যে অবস্থিত উঁচু নীচু ভূমি বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত লালরংএর আঁকাবাঁকা পথ, সাপের মত লম্বমান রেল-পথ প্রভৃতি অতিশয় মনোরম দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ এই সকল সৌন্দর্য্যউপভোগ করিবার পর তাহারা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। অলকা কহিল, আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।

সর্ব্বদা ওখানে থাকলে আর অত লাগবে না।

অর্থাৎ তোমার মতে, কাউকে বেশীদিন ভাল লাগে না।

আমি বুঝি তাই বল্‌ছি? মানুষের সঙ্গে বুঝি অন্য জিনিষের তুলনা হয়?

আচ্ছা, এখন তাড়াতাড়ি চল, রোদ উঠে পড়ল।

ষ্টেশনের নিকট আসিয়া তাহারা দেখিল, টিকুয়া খুকীকে কোলে লইয়া এখানে আসিয়াছে। বাজার হইতে কিছু ঢেঁড়স্‌, একটা লাউ, সওয়া সের আলু, একসের কচু, আধসের কাটা কাতলা মাছ ও দুই পয়সার পান কিনিয়া দিয়া টিকুয়াকে এবং খুকীকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তারপর তাহারা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া, কোন্ বাড়ীর কাহারা বাজার করিতে আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যেই মন্তব্য করিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুজনেই ওজন হইয়া দেখিল, শিমুলতলার জল-বায়ুতে গত তিনদিনের মধ্যে কোনই উন্নতি হয় নাই। ইতিমধ্যে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণআসিয়া পড়িল। কয়েকজন যাত্রী নামিল। একজনের নিকট হইতে লাগেজ-বাবদ সাতটাকা ছয় আনা আদায় করিবার জন্য নীল পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে বিশেষ উদ্যোগী দেখা গেল। অলকা জিজ্ঞাসা করিল, ও কে?

একজন ক্রু'।

ক্রু কাকে বলে?

যে যাত্রীদের কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য 'ক্রু' করে আদায় করে, তাকে 'ক্রু' বলে।

ও, বুঝেছি।

ইতিমধ্যে ওভারব্রীজটি স্ত্রীলোকে ভরিয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ যেমন 'ম্যল', পুরীতে যেমন সমুদ্রতট, শিমুলতলায় তেমনি রেলওয়ে ষ্টেশন বিশেষতঃ ওভারব্রীজ। অলকা কহিল, চল, ব্রীজের ওপর যাই।

না, আমি ওখানে যাব না। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ পোষ্টঅফিস থেকে কাগজ খানা এনে প্ল্যাটফর্ম্মে একটু পায়চারি করি।

ব্রীজের উপর ছোট বড়, লম্বা বেঁটে, মোটা সরু, ফর্সা কাল, সুশ্রী কুশ্রী, সধবা, বিধবা, কুমারী, নানা প্রকারের প্রায় কুড়িটি মহিলা সমবেত হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইত যে ইঁহাদের মধ্যে দশ জনের নামই 'বীণা'। কেহ বা বীণাপাণি, কেহ বা শুধু বীণা। অপর দশজনের নাম অলকা, বিমলা, আরতি ইত্যাদি।

সম্মুখেই সমবয়স্ক একটী তরুণীকে দেখিয়া অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কতদিন এখানে এসেছেন?

আজ ছয় দিন হল।

কেমন লাগছে?

লাগছে ত ভালই। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট। কিছু পাওয়া যায় না।

কেন, যা দরকার প্রায় সবই ত পাওয়া যায়।

আমি ত বাজার যাইনে, কিন্তু উনি বল্‌ছিলেন যে এখানে, চাল, ডাল নুন, তেল, মাছ, পাঁটা, মুরগী, ডিম, দুধ, ঘি, আলু, কপি, পটল, ঝিঙে, লাউ, কুমড়ো, শাক, কচু, ওল, লেবু, লঙ্কা, বেগুন, আদা, পেঁয়াজ, পেঁপে, ঢেঁড়স্‌, মূলা আর পান সুপারি—এছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। খাবার কষ্টে ওঁর শরীর রোগা হয়ে গেছে। আর আমারও, এই দেখুন, সেমিজটা ঢল্ ঢল্ কচ্ছে। উনি বলছেন, শিগ্‌গিরই আমরা মধুপুর বা দেওঘর চলে যাব।

আর একটু অগ্রসর হইয়া অলকা দেখিল, একটি মহিলা কি যেন সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন। উৎসুক হইয়া অলকাও পাশে গিয়া বসিল। মহিলাটি বলিতেছেন, "কাল এক কাণ্ড হয়েছিল। দাদা আর বউদি, আমি আর উনি, বেড়াতে ত গেলাম নীলাবরণের দিকে। সেখানকার শুক্‌নো নদীটার মাঝে যেখানে সেই পাথরগুলো, সেখানে বসে খানিক গল্পগুজব ক'রে ফিরবার সময়ে দাদা বল্লেন, তোরা ঐ রেলপথ ধরে চলে যা—শীগ্‌গির হবে। আমরা ঐ মাঠের ভেতর দিয়েই ফিরে যাই। দেখি যদি ঐ বস্তিটার মধ্যে কিছু তরকারী টরকারী পাই ত নিয়ে যাব'খন। আমরা ত ফিরে এলাম। দাদা আর বউদির খোঁজ নেই। রাত আটটা বাজল, নটা বাজল, তবু খোঁজ নেই। কেউ বল্লে, ওদিকে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। মা ত কেঁদেই আকুল। লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন। মালীও বেরুল। আমাদের চাকরটাও বেরুল। কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। মাঠের মধ্যে ভীষণ অন্ধকার, চারিদিকে কোথাও কিছু দেখা যায় না। ডাক দিয়েও

সাড়া মেলে না। শেষে পাশের বাড়ীর একটা ছেলে তাদের পুরাণো গ্রামোফোনের চোঙাটা নিয়ে মাঠের মাঝে গিয়ে চীৎকার করতে করতে তবে সাড়া পাওয়া গেল। রাত্রি এগারটার সময়ে তারা বাড়ী ফিরল। জিজ্ঞাসা করতে বললে, আমরা পথ হারিয়ে মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

একটি সুবেশা তরুণী হাসিয়া বলিলেন, কল্‌কাতায় ত গড়ের মাঠ আর লেক ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখানে এসে আপনার দাদা ও বউদি সন্ধ্যার অন্ধকারে নিরালা মাঠে একটু না হয় পথই হারিয়েছেন, তাতে আপনারা অত ব্যস্ত হলেন কেন?

একটা হাসির রোল উঠল। আরো নানাপ্রকার সুখদুঃখের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অলকা লক্ষ্য করিল একটি যুবতী বধূ কোনই কথা বলিতেছে না, কাহারো কথার জবাব দিতেছে না। শুধু যখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছিল, তখন ঠোঁটের বামকোণ দিয়া ঈষৎ মুচকি হাসিয়াই পুনরায় গম্ভীর হইয়া বসিতেছিল। তাহার পার্শ্বস্থ একটা কিশোরীকে অলকা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এঁকে চেন?

হ্যাঁ, উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন।

তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না কেন?

উনি মস্ত বড় ঘরের মেয়ে কি না, তাই বোধ হয়।

তাই নাকি?

বেলা হইয়া গিয়াছে। ব্রীজের নীচে হইতে অনিল ইঙ্গিত করিতেই অলকা অপর পারে গিয়া নামিল। অনিল নীচে দিয়াই রেললাইন পার হইয়া অলকার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের গেট পার হইল। অন্যান্য রমণীরা অলকার স্বামীটি কে তাহা একবার দেখিয়া লইল।

পথে আসিতে বিমলের সঙ্গে দেখা।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আজ আপনারা বেড়াতে বেরোন নি?

বিমল উত্তর দিল, না।

কেন?

ওঁর পায়ে ব্যথা হয়েছে, হাঁটতে পারছেন না।

তাই তো! ভাবছিলাম, আপনাদের আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চা খেতে বলব। তা নিতান্ত যদি উনি না আসতে পারেন, তবে আপনিই আসবেন। কেমন, আসবেন তো?

নিশ্চয়ই যাব। আপনার নিমন্ত্রণ কি আমি উপেক্ষা করতে পারি?

আচ্ছা, আসবেন কিন্তু।

৪

কয়দিন হইল, একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া অনিল কলিকাতা গিয়াছে। অলকাও সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বিমল আশ্বাস দিল, তাহাদের একা থাকিতে কোন অসুবিধা হইবে না। সে সর্বদা দেখাশুনা করিবে। মালী রোজ রাত্রে বাড়ী যাইত, তাহাকে বলা হইল, অনিল না ফেরা পর্যন্ত সে বাসাতেই থাকিবে। যাইবার সময়ে অনিল অলকাকে ভরসা দিয়া গেল, বিমল রয়েছে, তোমার ভয় কি?

বিকালে বিমল ও অলকা চা খাইতেছে। টিকুয়া খোকাকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে। বিমলের স্ত্রী পাড়ার আর এক বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে।

দিনটি চমৎকার। পরিচ্ছন্ন আকাশের নীল আভা মিশিয়াছে নীচের দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল মাঠের সঙ্গে। পশ্চিম গগনের ঈষৎ রক্তিম আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে উঠানে, বারান্দায়, চায়ের টেবিলে আর অলকার মুখে। উঠানে দেওয়ালের পাশে এবং উঠানের মধ্যস্থিত পথের দুই পাশে ফুল গাছের সারি। সেগুলির উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে প্রজাপতি আর মৌমাছি। সমস্ত আকাশ বাতাস শরৎ ও হেমন্তের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যেন হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

অলকা ও বিমল চা খাইতেছে এবং গল্প করিতেছে। বিমল একটা বড় কোম্পানীর ক্যানভাসার। কার্যোপলক্ষে তাহাকে সারা বৎসর নানা স্থানে ঘুরিতে হয়। ভারতের বহু স্থানে সে ঘুরিয়াছে। সেই সকল স্থানের কত বিবরণ একের পর এক বলিয়া যাইতেছে আর অলকা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। তাহার সহিত নিজের জীবনযাত্রার কত প্রভেদ। আজ তিন বৎসর ধরিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া, কত অসুবিধা সহিয়া, কত আত্মীয়স্বজনের মুখ-ভার সহিয়া তবে এবার অলকা একটু বাহির হইতে পারিয়াছে, তাও অনিলের স্বাস্থ্যের জন্যই, নিতান্ত সখ করিয়া পয়সা খরচ করিবার জন্য নয়।

বিমলের কথার ফাঁকে অলকা একবার বলিয়া ফেলিল, আপনি কি ভাগ্যবান্, বিমলবাবু।

বিমল একটু যেন গম্ভীর হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু—

কিন্তু কি? আপনি সর্বদা একা একাই ঘোরেন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে পারেন না। তাই দুঃখ করছেন? সত্যি, আপনার এটা কিন্তু অন্যায়। সম্ভব হলেই ওঁকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।

হ্যাঁ—উচিত বই কি—নিশ্চয়ই উচিত।

আপনার স্ত্রীটি সত্যি কি চমৎকার। সেদিক দিয়েও আপনার মত ভাগ্যবান্ কয়জন? পাড়ার লোকে আপনার স্ত্রীকে কি বলে জানেন?

কি বলে?

বলে, কুইন অব্ শিমুলতলা। এই কয়দিনেই পাড়ার মেয়েরা বউরা ওঁকে একেবারে আপন করে ফেলেছে।

বিমল একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে অলকাও যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। একটু পরে বিমল বলিল, আমার কুইন কিন্তু আপনি।

তড়িতাহতের মত অলকা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং "আমার শরীরটা ভাল নেই, আমায় মাপ করবেন" বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। একটু বসিয়া থাকিয়া বিমলও উঠিল।

৫

পরদিন অনিলের বাসার সামনে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া থামিল। অনিল সবিস্ময়ে দেখিল, অলকা খুকীর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিতেছে। গাড়ীর মাথায়, পিছনে, সামনে, ভিতরে জিনিষপত্রের পাহাড়।

অনিলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, ব্যাপার- কি? হঠাৎ আজই? জ্যাঠামশায় তো একটু ভালই আছেন। আমি তো দু' এক দিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছিলুম।

অলকা চুপে চুপে বলিল, বিরহ সহ্য হ'ল না।

কি যে বল! এত খরচপত্র করে এত ঝঞ্ঝাট সয়ে একটু চেঞ্জের ব্যবস্থা করলুম, তা দিলে সব গোলমাল করে।

বেশ করলুম। নাও এখন জিনিষপত্রগুলো নামাও।

কি করে এলে একা-একা এত সব জিনিষপত্র নিয়ে?

দেখতেই তো পাচ্ছ, এসেছি। মেয়েদের তোমরা যতটা সরলা আর অবলা ভাব, আমরা তা নই।

খরচপত্রের কি করলে? তোমার কাছেতো বেশি কিছু ছিল না।

দুগাছা চুড়ি ষ্টেশন মাষ্টার মশায়ের কাছে রেখে, ওখানকার সব খরচপত্র মিটিয়ে এসেছি—মায় মালীর বখশিস্ পর্যন্ত।

ষ্টেশনমাষ্টার দিলেন?

বললুম, আমার স্বামীর ভয়ানক বিপদ, একটু উপকার করতেই হবে। তাছাড়া, চুড়ি দুগাছাও তো খাঁটি গিনি সোনার।

আমার ভয়ানক বিপদ? আমার আবার কি বিপদ হ'লো?

আমাকে কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেলে তোমার আর কি বিপদ?

তার মানে?

মানে পরে শুনো। এখন দেখো, জিনিষপত্রগুলো সব নামলো কিনা।

আন্তর্জাতিক (*)

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

ভাইরে!
একতরীতেই সবার মোদের ঠাঁইরে!
দুঃখ-সুখের এক বাঁধনে বাঁধা যে সবাইরে!
ছিদ্র হ'লে দূর Luzonএ
জল ঢুকে যায় ওয়াশিংটনে,
বাংলাদেশের ভাঙ্‌লে পাঁজর
রক্ষা কারো নাইরে!
একতরীতেই সবার মোদের ঠাঁইরে,
ভাইরে!

কালো-ধলো বাই না বলো,
সবার আঁখিই ছলছলো,
আঁখির তারা নীল বা কালো
কী আসে যায় তাই রে!
একতরীতেই সবার মোদের ঠাঁইরে,
ভাইরে!

ঝড় আসে ঐ, তুফান ছোটে,
বৃষ্টি যেন গায়ে ফোটে,—
সবাই মিলে রাখলে তরী
তবেই রেহাই পাইরে!
একতরীতেই সবার মোদের ঠাঁইরে,
ভাইরে!

---

* Sanfransisco Conferenceএ "We are in the Same Boat, Brother" শীর্ষক যে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটি গীত হয় তাহার ভাবালম্বনে।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রাত বাড়িতেছে—তেমনি ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়া পড়িতেছে কালো আকাশ। পৃথিবীর অশ্রান্ত কান্না। চর ইসমাইল ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হইয়া। অবিরাম ঝিঁঝিঁর একতান—ব্যাঙের আনন্দ-মুখর কলধ্বনি।

অন্ধকারের মধ্য দিয়া পর পর তিনখানা নৌকা চলিয়াছে। গাজীতলার পাশ দিয়া, হাটখোলার মধ্য দিয়া, জেলে আর চাষীদের বস্তিকে পাশে ফেলিয়া খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—ভাদ্রের ভরা উজানের স্রোত তাহারি মধ্যে বহিতেছে প্রচণ্ড কল্লোল তুলিয়া—কুটা ফেলিলে উড়াইয়া নিয়া যায়।

ভরা খালের তীক্ষ্ণ জোয়ারে তীরের মতো ছুটিয়াছে নৌকা। একটানা জলের শব্দ—মাঝে মাঝে আকস্মিক এক একটা বিরাম-যতির মতো কাদার মধ্যে লগি ঝপাস ঝপাস করিয়া পড়িতেছে—নৌকার ছইকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াই আবার একটা বিশ্রী ছর্ ছর্ ধ্বনিতে পেছনে ছিটকাইয়া পড়িতেছে বেতকাঁটা, নলখুরি ফুলের লতা। সুপারীর কাঠ ফেলা ছোট ছোট গ্রাম্য ঘাটে ঘূর্ণি বাজিতেছে।

দিগন্তে দিগন্তে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া চলিয়াছে। আকাশটা যে অমন সহস্র ভাবে ফুটিফাটা হইয়া আছে—বজ্রের আলোয় সেটা যেন স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িতেছে। রাত্রে আবার প্রবল খানিক বর্ষণ নামিবে বলিয়া মনে হয়। এই দেশটা আশ্চর্য। বৈশাখ বলো, জ্যৈষ্ঠ বলো, যে মাসই হোক একবার বৃষ্টি নামিলেই হইল। তারপর আর কথাবার্তা নাই—হয়তো পর পর সাতদিন ধরিয়াই এতটুকু আলো ফুটিল না—রাশি রাশি মেঘ আর অসংলগ্ন বৃষ্টি চলিতে লাগিল সময় ও সীমানাহীন ছন্দে!

মণিমোহন ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বাহিরের জল কল্লোলে আর রাত্রির এই অনন্ত সজল তমসায় সে যেন হঠাৎ দশ বছর আগে ফিরিয়া গেছে। সেই যেদিন নদীতে অতিকায় জেলে ডিঙির মতো বড়ো বড়ো বালির চড়া ঠেলিয়া ওঠে নাই, যেদিন তেঁতুলিয়ার রোলিংকে সমুদ্রের তাণ্ডব বলিয়া মনে হইত; যেদিন মনে হইত পৃথিবীটা এখানে এখনো বিশ্বকর্মার কর্মশালার খানিকটা অবিন্যস্ত উপচার—সবটা মিলিয়া কিছুই গড়িয়া ওঠে নাই—আদিম জগতের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে সামান্য এতটুকু আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। তারপর নদীতে চড়া পড়িল—চর ইসমাইল আগাইয়া আসিল মানুষের কাছাকাছি—সভ্যতার নিকট সান্নিধ্যে। কী ঘটিল এবং কী যে ঘটিল না। এই অন্ধকার রাত্রে বিশাল নদী বাহিয়া এমনিই একটা যাত্রা মনে পড়িতেছে—সেই যেদিন—। সীমাহীন চিহ্নহীন আকাশ-বাতাসে আজকের চর-ইসমাইল দশ বছর আগেই আবার ফিরিয়া গেল নাকি!

চোখ দুইটা ঝিমাইয়া আসিতেছে—মনে হইতেছে ডাক-বাংলোর পাতলা একখানা লেপ মুড়ি দিয়া রাণী এখন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে অচেতন স্বপ্নছায়ার মতো থাকিয়া থাকিয়া দুইটা রাইফেলের নল চক চক করিয়া উঠিতেছে। নাঃ—সেদিন আর এদিনের পৃথিবী এক নয়।

ঘস্ সৃ করিয়া নৌকা ভিড়িয়া গেল হঠাৎ। একটা টর্চের আলো মণিমোহনের মুখের ওপর ঝলসাইয়া উঠিল—নিদ্রার আমেজটা ভাঙিয়া গেছে।

চাপা গলায় দারোগা ডাকিতেছেন: স্যার?

—কী খবর?

—এসে পড়েছি—উত্তেজনায় দারোগার গলা কাঁপিতেছে।

অনিচ্ছুক শরীরটাকে নাড়াচাড়া দিয়া মণিমোহন উঠিয়া বসিল।

—নামতে হবে?

—আপনি একটু ওয়েট্ করুন স্যার। ওদিকের ব্যবস্থা করে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা—মণিমোহন আবার গা এলাইয়া দিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজিল। কাদার উপর আট দশ জোড়া বুটের ছপাছপ শব্দ এবং তিন চারটি টর্চের জোরালো আলো সুপারী বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রাত বোধ হয় দেড়টার কাছাকাছি। চোখ হইতে ঘুমের জড়তাটা কিছুতেই কাটিতেছে না। বোটের মাঝিরা ফিসফাস করিয়া কী বলিতেছে—কথাগুলা ভালো করিয়া শোনাও যায় না—বোঝাও যায় না। নৌকার তলা দিয়া জলের সুতীব্র শব্দ। এতক্ষণ যার অস্তিত্ব কিছু আছে বলিয়াই মনে হয় নাই, সুযোগ পাইয়া সেই মশার ঝাঁক আসিয়া চারদিক হইতে গুঞ্জন তুলিয়াছে। কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত চেতনা যেন একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের পাখায় ভাসিয়া চলিয়াছে, ঝিন্টু; রাণী—কলিকাতার চৌরঙ্গী—সাউদার্ণ অ্যাভিনিউর কৃত্রিম চন্দ্রালোক; হা হা করিয়া

বিশ্রী চেহারার একটা রোগা হাড় জিরজিরে লোক প্রবল ভাবে হাসিয়া উঠল: কে, সেই পাগলা পোষ্ট মাষ্টারটা? এখনো বাঁচিয়া আছে নাকি—এই দশ বৎসর পরেও?

আবার চমক ভাঙল। পোষ্ট মাষ্টার নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। যামঘোষ। প্রহর ঘোষণা করিতেছে তারস্বরে। জলের শব্দ, ব্যাঙের ডাক—মাঝিরা তামাক খাইতেছে।

পকেট হইতে সিগারেটের টিনটা বাহির করিতে গিয়া মণিমোহন আবার ঝিমাইয়া পড়িল। স্বপ্নের মধ্য দিয়া একটা ঝড়ের রাত বাহিয়া চলিয়াছে। অন্তরে ঝড়, বাহিরে ঝড়। আরণ্য আর উদ্দাম ভালোবাসা। মশার গুঞ্জন নয়—গুন্ গুন্ করিয়া কে যেন কাঁদিতেছে—কাঁদিতেছেই—নৌকার ছইয়ের উপর টপ টপ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে—রাণী?

—স্যার?

এবার আর ডাক নয়—কাণের কাছে ব্যাকুল আর্তনাদের মতো স্বরটা ঝনাৎ করিয়া হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়া সেতারের তারের মতো বাজিয়া উঠল। ছন্দোপতন।

—স্যার ঘুমুচ্ছেন?

ইহার পর আর ঘুমানো চলে না। বিস্ফারিত বিহ্বল চোখ দুইটাকে মণিমোহন এক সঙ্গেই মেলিয়া দিল: কী হয়েছে—অমন হাঁক ডাক কেন?

—সর্বনাশ হয়েছে স্যার।

—সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ? ডাকাত পড়েছে নাকি?

—ডাকাত পড়লেও তো ভালো হত স্যার—মণিমোহনের মনে হইল দারোগা যেন বুক ফাটিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠলেন: সব মাটি স্যার—কিচ্ছু হল না। পাখী পালিয়েছে। একেবারে ফুড়ুৎ।

যাক—আপদ গিয়াছে। বড় করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল মণিমোহন, কিন্তু দারোগার ব্যাকুল চোখ মুখের দিকে তাকাইয়া মায়া হইল অত্যন্ত।

—তাইত! পালালো কী করে?

—আর বলবেন না। যোগ সাজস ছিল ভেতরে ভেতরে—আমাদেরই কোনো এক ব্যাটা ইনফর্মার কিংবা চৌকীদার ফাঁস করে দিয়েছে নিশ্চয়। গিয়ে দেখি শূন্যপুরী খাঁ খাঁ করছে—কারো কোনো পাত্তা নেই।

—তারপর?

—তারপর আর কী। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—গাঁয়ের তিন চার জায়গায় হানা দিয়ে এলাম—উঁহু। কোথায় কে! তারা এতক্ষণে বে-অব-বেঙ্গল ছাড়িয়ে প্রায় জাভা সুমাত্রার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে বোধ হয়। তারপরে সিঙ্গাপুর কিংবা সাংহাই।

—কিছুই হল না তা হলে?

—হল না কি স্যার, হওয়াতে হবে।—ক্ষিপ্ত দারোগার দাঁতের ভেতর কড়মড় করিয়া একটা হিংস্র শব্দ উঠল: যেটা আশ্রয় দিয়েছিল—তাকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে এসেছি। এই মাগীই সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে—যা কতক কষে লাগালেই মুখ দিয়ে আপনা থেকে কথা বেরিয়ে আসবে।

—মাগী! মেয়েমানুষ!

—মেয়েমানুষ বই কি। হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। আর সাধারণ মেয়েমানুষ তো নয় স্যার—বাঘিনীর জাত একেবারে। দেখুন না শ্রীমতীর চেহারাখানা—

টর্চের আলো দারোগার পেছনে বন্দিনীর মুখের উপরে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল।

মুহূর্তে পাথর হইয়া গেল মণিমোহন। দশবছর পরেও সে মেয়েটাকে চিনিতে পারিয়াছে। নীলার মতো চোখ, আগুনের মতো রঙ। বর্মার বুদ্ধমূর্তির মতো চিত্র করা দৃষ্টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দশবছর আগে যেমন করিয়া প্রথম আসিয়াছিল, আজো ঠিক তেমনি ভাবেই তাহার দরবারে বিচার প্রার্থী।

টর্চের আলোটা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তির মর্মরশুভ্র পাংশু মুখের উপর জ্বলিতে লাগিল, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিতে লাগিল নীলার মতো দুটি আশ্চর্য চোখ। বহুদিন পরে মণিমোহন আবার সম্মোহিত হইয়া যাইতেছে।

আট

ঠিক সেই সময়েই আর একটি বিচিত্র নাটকের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিলেন বলরাম ভিষকরত্ন।

বাইরে বৃষ্টি পড়িতেছে—ঘরের মধ্যে মিটমিটে একটা লণ্ঠন, লাল তেল বলিয়া আলোর চাইতে ধূম্রজালই বিকীর্ণ করিতেছে বেশি। সামনে একখানা 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' খুলিয়া লইয়া বলরাম হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছেন এবং টাকের উপরে মশার হুল ব্যর্থ চেষ্টায় শুধুমাত্র সুড়সুড়ি দিয়া চলিয়াছে।

সামনে গড়গড়ায় কল্কেটা অনাদরে আপনিই পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইতেছে। তামাকের তীব্র গন্ধে আমন্ত্রিত হইয়া রাধানাথ দরজার ফাঁকে মুখ বাহির করিল। অমন ভালো তামাকের এমন অপচয়টা তাহার পছন্দ হইল না। ইঁদুরের মতো হুঁশিয়ার পা ফেলিয়া রাধানাথ ঘরে ঢুকিল, তারপরেই গড়গড়ার মাথা হইতে কল্কেটা তুলিয়া লইয়া আবার নেপথ্যে তিরোহিত হইল।

—কবিরাজ মশাই, কবিরাজ মশাই!

—ডি ক্রুজার আকুল কণ্ঠ।

—কী রে, এমন অসময়ে কী ব্যাপার?

—শীগ্গির আসুন।

—কী হয়েছে?

—বাবার অবস্থা ভারী খারাপ।

—ভারী খারাপ? কেন—কী হয়েছে? বিকেলে দেখে এলাম, দিব্যি আছে, জ্বর নেই—এর মধ্যে আবার কী হল?

—আমি জানি না, আপনি আসুন।

—আঃ—এই রাত্তিরে জলকাদার মধ্যে হাড় জ্বালিয়ে মারলি! আচ্ছা, চল। কিন্তু ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমিও না।—ক্রুজা কাঁদিয়া ফেলিল: আপনি চলুন। শীগ্গির চলুন।

চটি পরিয়া এবং মসীম্লান লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। এমন রাত্রে ঘর হইতে বাহির হইয়া রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা করে! অন্ধকার বনবীথিকে আলোড়িত করিয়া এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। টিপ টিপ করিয়া বর্ষাধারার ক্ষণ বর্ষণ। পায়ের নীচে জল আর কাদা ছপ ছপ করিতেছে, ঘাসে ঘাসে জোঁক নড়িতেছে। চর ইসমাইল নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে, বলরামও নিঃসংশয় হইয়াই ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা আসিয়া দেখা দিল!

মনে মনে বলরাম সমস্ত পৃথিবীটাকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আরো বেশি করিয়া রাগ হইতেছে বুড়ো ডি সিল্ভার উপরে। সুস্থ থাকিয়া লোকটা পৃথিবী শুদ্ধ লোককে জ্বালাইয়া বেড়ায়, অসুস্থ অবস্থাতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। মরিতে হয় তো সোজাসুজিই চোখ দুইটা উল্টাইয়া বসিয়া থাক বাপু, এমন ভাবে মানুষকে উদ্বাস্ত করা কেন! এই পর্তুগীজগুলাই দুনিয়ার অনাসৃষ্টি জীব—যেমন নাম, তেমনি আকার প্রকার, আর তেমনিই ব্যবহার। মরিয়া মরিয়া তো প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দু চার ঘর যা আছে সেগুলি গেলেও আপদের শান্তি হয়। নিজের মনেই গজ্রাইতে গজ্রাইতে বলরাম ডি-সিলভার বাড়িতে আসিয়া পা দিলেন। আর আসিয়া যে কাণ্ডটা চোখে পড়িল তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—এ কী রে! কেমন করে হল?

—আমিও জানি না। বাড়ীতে এসেই দেখি—

—এত রাত কোথায় ছিলি?

ক্রুজা নিরুত্তর। কোথায় বদমায়েসী করিতে গিয়াছিল নিশ্চয়—একেবারে পুরাপুরি বখিয়া গিয়াছে হতভাগা ছেলে। কিন্তু এ কী ব্যাপার।

মেজেতে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে ডি সিলভা। চারদিকে রাশি রাশি ভাঙা শিশি-বোতল, ঘরময় কাঁচের টুকরা। কতগুলা বাক্স প্যাঁটরা খোলা—এলোমেলো আর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আছে সমস্ত। সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া, মেঝে একাকার করিয়া ডি-সিলভা বমির বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। সে বমি রোগীর নয়—মাতালের। মদের এবং ক্লেদের একটা দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উলটাইয়া আসিবার উপক্রম করে। বড় বড় হিক্কা উঠিয়া ডি সিল্ভার আপাদ মস্তক ঝাঁকিয়া দিতেছে—মনে হইতেছে আর দেরী নাই, বড় জোর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঝামেলা বেমালুম মিটিয়া যাইবে।

ঘৃণা কুঞ্চিত বলরাম ঝুঁকিয়া পড়িলেন রোগীর উপরে। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। পিছনে আশঙ্কা-পাণ্ডুর মুখে ক্রুজা নীরব আর নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া।

—কিছু হয়নি। খালি পেটে একরাশ কড়া মদ টেনে এই অবস্থা হয়েছে।

—মদ!

—নিশ্চয় মদ। কেন মদ দিলি এনে?—বলরাম ফাটিয়া পড়িলেন: এই রোগা মানুষকে মদ খাওয়ালি কোন্ আক্কেলে? এখন যে বাপ মেরীর পাদপদ্মের দিকে রওনা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছিস হতভাগা বেকুব কোথাকারের!

—আমি—আমি তো মদ আনিনি।

—তবে? মদ এলো কোত্থেকে? আশমান থেকে পাখা মেলে উড়ে আসতে পারে না তো।

—বোধ হয় মামা।

—মামা!—বলরাম সবিস্ময়ে বলিলেন, তোর আবার মামা কে?

—তা তো জানি না। আজই এসেছে—

—চুলোয় যাক। যেমন হতভাগা ভাগনে, তেমনি হতভাগা তার মামা। যা এখন জল আন্—দৌড়ো, দৌড়ো। মাথায় জল দে—

তারপর আধঘণ্টা ধরিয়া পরিচর্যা চলিল। মাথায় জল, পাখার বাতাস। আস্তে আস্তে ডি সিলভার নিশ্বাস সহজ আর স্বাভাবিক হইয়া আসিল—মনে হইল এইবারে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

—নে, এইবারে বুড়োকে খাটের ওপরে তুলে ফেল। এর পরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ধরাধরি করিয়া দুজনে ডি-সিলভাকে খাটে তুলিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে একটা বড়ি বাহির করিয়া বলরাম বলিলেন, জ্ঞান হলে এটা খাইয়ে দিস। আর ভালো কথা, আর তোর মামা ধুরন্ধরটি গেলেন কোথায়?

—জানি না তো।

—বেশ মামাটি বটে। বোনাইকে এক পেট মদ গিলিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু ঘরের এমন অবস্থা কেন রে? বাক্স প্যাটরা ভাঙা—জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌—

—অ্যাঁঃ!

ক্রুজা এতক্ষণে চমকিয়া উঠিল: তাই তো। চোর এসেছিল নাকি? মামাই বা গেল কোথায়?

বলরাম বলিলেন, হুঁ। চোর যে কে সে তো বোঝ'ই যাচ্ছে। বেশ মামাটি জুটিয়েছিলে বাবাজীবন। বাপটিকে মারবার মতলব করে জিনিস-পত্তর হাতিয়ে সে নিরাপদে একদম পলায়মানঃ!

ক্রুজা আবার বলিল, অ্যাঁঃ!

—হ্যাঁ। কোনো সন্দেহ নেই। পারিস তো পুলিশে খবর দে—আমি আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব। যত সব—হুঁঃ!

ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। আর আমাকে সাক্ষী-টাক্ষী মানিস্‌নি বাপু, পুলিশের হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

বলরাম লণ্ঠন হাতে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেলেন।

মড়ার মতো মুখ লইয়া ক্রুজা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। উঃ মামা—মামার পেটে পেটে এই মতলবই ছিল তাহা হইলে—অত করিয়া একটা টাকার ঘুষ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিল তবে এই জন্মই! আর ওদিকে ডি-সিলভা অঘোরে ঘুমাইতেছে। যেন কিছুই হয় নাই—ঠিক এই ভাবেই তাহার নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত বড় বড় শ্বাস বহিতেছে।

অকারণ একটা হিংসায় ক্রুজার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল এখনি সে ঝাঁপ দিয়া ডি সিল্‌ভার ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়ে—কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া খামচাইয়া তাহার একাকার করিয়া দেয়। ক্রুজার পায়ের গুঁতা লাগিয়া একটা মদের শূন্য বোতল ঘরময় গড়াইয়া গেল।

কিন্তু গঞ্জালেস তো ঠিকই করিয়াছে। কালো অন্ধকারে—বৃষ্টির অশ্রান্ত কান্নার ভিতর দিয়া তাহার নৌকা নদীতে পাড়ি ধরিয়াছে। তীব্র নেশায় উদার এবং উদাস হইয়া হেঁড়ে গলায় গান জুড়িয়াছে গঞ্জালেস। আশ্চর্য—সে তো গান নয়, প্রার্থনা। মাতা মেরীর পবিত্র নাম কীর্তনে নদীর বুক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে পুলকে এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের প্রেরণায়।

নেশার ঝোঁকে সে চর ইসমাইলে আসিয়াছিল এবং নেশার ঝোঁকেই আবার নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ডেভিড্‌ গঞ্জালেস্‌ জাগিয়াছে তাহার রক্তে। কী হইবে একটা মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করিয়া, নিজের সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া? পৃথিবী অনেক বড়ো—পৃথিবীতে অনেক মেয়ে। একজনকে যদি নাই পাও, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আরো দশজনকে আয়ত্ত করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনা এমন কিছু কঠিন কথা নয়। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে—নির্মম ভাবে ভোগ করিয়া যাও—নিষ্ঠুর ভাবে আদায় করিয়া লও। এই অত্যন্ত সার কথাটা তাহার বাবাই খুব ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। সে কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে নাই—ইনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করে নাই—একটি নারীর জন্যে কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মাতালের মতো দিকে দিগন্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় নাই। অক্লেশে ডাকাতি করিয়াছে, বন্য যৌবনকে চরিতার্থ করিয়াছে—খুন করিয়াছে, বীরের মতো বাঁচিয়াছে এবং বীরের মতো মরিয়াছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের আদর্শ সন্তান।

তবে সেই বা পিছাইয়া থাকিবে কেন? পর্তুগীজ চিরদিনই পর্তুগীজ—চিরকালই সে যুদ্ধ করিয়াছে এবং জয় করিয়াছে। পেরিরা নয়—অনুগৃহীত সেই বাঙালি মেয়েটা নয়—ঘুমন্ত শান্ত কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির মৃদু-মর্মরও নয়। অন্তহীন নীল সমুদ্র। ড্রাগন আর মড়ার মাথা আঁকা কৃষ্ণ পতাকা। কামানের অগ্নিপিণ্ড দেয়া বাণিজ্য জাহাজকে অভ্যর্থনা। জ্বলন্ত সপ্তগ্রাম—দ্বীপময় দুর্গ। যোগ্যতমের উদ্বর্তন।

পরস্বাপহরণে এই হাতে খড়ি। নতুন করিয়া জীবন সুরু হইল গঞ্জালেসের। কোনোখানে বাঁধা পড়িয়া নয়—পৃথিবীময় ছড়াইয়া। নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা উল্লাস তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কালো রাত্রির কালো স্রোত দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর মহা-আবর্তে তাহাকে লীন করিয়া দিল—আরো অনেক বিদ্রোহী শিশুর মতোই চর ইস্‌মাইল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না কোনোদিন। (ক্রমশঃ)



দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

৮

৪টায় শেষ ক্লাসটাও হইয়া গেল। অমল বাহির হইয়া দেখে অপর্ণা পথে অপেক্ষা করিতেছে, অমল নিকটবর্ত্তী হইতেই বলিল—চলুন, আর দেরী না।

অমল বলিল—এখানে প্রাথমিক গলা-ভেজানো সেরে গেলে হ'ত না?

—না, আধঘণ্টা চা না খেলে মানুষ মরে না—চলুন।

অমল অপর্ণার এই আগ্রহকে উপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ট্রামে উঠিয়া অপর্ণা একটা সিটে বসিয়া বলিল—বসুন—

ট্রামের যাত্রী যাহারা তাহারা মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিল—এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? তাহাদিগের মুখের উপরে একটা করুণার দৃষ্টি হানিয়া অমল বসিয়া পড়িল। অপর্ণা কণ্ডাক্টরকে ডাকিয়া দুইখানি টিকিট করিয়া ফেলিল। অমল হাসিয়া বলিল—টিকিট কেনার এত গরজ কেন?

—আপনি আমার অতিথি. পাছে আপনি টিকিট করেন এই ভয়ে।

অমল পুনরায় হাসিয়া বলিল—যাক্, আমার মাঝে এতখানি উদারতা যে থাকতে পারে ভেবেছেন, এতেই আমি ধন্য হ'য়েছি। অমল জানিত উভয়ের টিকিট করিলে ফিরিবার সময় চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত ট্রামে ফিরিয়া বাকীটুকু হাটিয়া ফিরিতে হইত।

অপর্ণা হাসিয়া টিকা করিল—ভুলও বুঝ্‌তে পারি।

অমল বলিল—ভুল বোঝাই আপনাদের—অর্থাৎ মেয়েদের ধর্ম্ম।

অপর্ণা জবাব দিল না।—পাশের পেভমেণ্টের পথচারীদিগের প্রতি একটা অনৈচ্ছিক দৃষ্টি রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অমল মনে মনে ভাবিল,—অপর্ণার পরাজয়ের কথা। কথায় সে এমন বার বার কখনও পরাজিত হয় নাই,—এমন ভাবে দল ছাড়িয়া আসিয়া সে কখনও আলাপ করে নাই, আগ্রহভরে তাহাকে বাড়ীতেও লইয়া যায় নাই। অপর্ণার কি যেন একটা হইয়াছে—সে ভাল করিয়া অপর্ণাকে লক্ষ্য করিল। অন্যান্য দিন তাহার বেশে মুখে একটা সযত্ন প্রসাধনের রেশ পাওয়া যায়, আজ চুলগুলি তাহার অযত্নবদ্ধ, মুখে কোনরূপ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হয় নাই। অমল বুঝিল অপর্ণার একটা কিছু হইয়াছে এবং তাহাকে এমনি করিয়া লইয়া যাইবার পিছনেও একটা উদ্দেশ্য আছে। সে তাই প্রশ্ন করিল,—আপনার কি হ'য়েছে বলুন ত?

অপর্ণা অমলের মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তার মানে? এ প্রশ্ন আপনার মনে হয় কেন?

—নাচার, হ'লে কি ক'রবো?

—সংযম শিক্ষা ক'রতে হবে—

—তাই হবে, চুপ ক'রে ভব্য ভদ্রলোকের মত বসে থাকি?

—হ্যাঁ। চুপ ক'রে বসে থাকুন।

অমল গেট-দরজা ঠেলিয়া আগেই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। কে যেন দ্বিতলের ঝুলবারান্দা হইতে বলিল—অমলবাবু, নমস্কার।

অমল চাহিয়া দেখে করুণা। স্মিত হাস্যে উচ্চকণ্ঠে সে কহিল,—নমস্কার।

বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতেই করুণা আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর্ণা বলিল,—আপনি বসুন অমলবাবু, একজন সাথী ত দিয়ে গেলাম।

করুণা প্রশ্ন করিল,—আপনার মার অসুখ সেরেছে?

অমল আশ্চর্য্য হইল,—অপর্ণাদের বাড়ীতে অমলকে লইয়া নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহা না হইলে করুণার পক্ষে তাহার মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। সে করুণাকে পাশের চেয়ারে আদর করিয়া বসাইয়া বলিল,—হ্যাঁ, অসুখ সেরেছে। তুমি জানলে কি ক'রে?

করুণা বিজ্ঞের মত বলিল,—ও সব খবর জানি।

—কেমন ক'রে?

—আপনার চিঠি আমি পড়েছি যে! মা পড়েছে, বাবা পড়েছে—মা আপনাকে নিয়ে আস্‌তে বলেছে, জানেন।

—কেন?

করুণা প্রশ্নে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়াই বলিল,—এমনি।

অপর্ণা এই সময়ের মাঝেই কাপড় ছাড়িয়া খাবার ও চা লইয়া ফিরিল। অমলের সামনে খাবার ও চা রাখিয়া বলিল,—নিন, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—কিন্তু আমি একটি রাঘব বোয়াল—এ অনুমান ক'রে আমাকে

অসম্মান করা হ'ল না কি ? পক্ষান্তরে এতে আমার ক্ষীণ স্বাস্থ্যের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে না কি ?

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল,—হোক্, না খাওয়ার মধ্যেও কোন পৌরুষ নেই।

—না, না, কিছু তুলে রাখুন, খাম্‌কা নষ্ট করে কি হবে ?

—ও খেতেই হবে—না খেলে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হ'বে।

—কিন্তু আপনার ?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—খাবারটা এখানে আপনার সামনে না হয় নাই খেলাম,—চা খেলেই ভদ্রতা রক্ষা হবে।

আহারান্তে অপর্ণার মা আসিয়া অমল ও তাহার মাতার কুশল প্রশ্ন করিলেন। তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—তাঁকে, অমন গ্রামে ফেলে রেখেছ কেন বাবা ? এখানে আনলে তোমারও সুবিধে হয়—মেসে খাওয়া দাওয়ার ত কত কষ্ট হয় !

অমল একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল,—মা এখানে কিছুতেই আসতে চান না। গ্রাম ছাড়তে মা একেবারেই নারাজ।

—সেখানে তোমাদের আর কে আছেন ?

—আমাদের ব'লতে শরিকরা আছেন, তা ছাড়া আমি মায়ের একই ছেলে।

—তোমাদের জমিদারীর যা পাওনা তা ক'লকাতা থেকে মাসে মাসেও ত আনাতে পারো—সেখানে পড়ে থাকবার কি প্রয়োজন !

অমল মিথ্যা কথা বলিল,—মিথ্যা বলা তাহার স্বভাব নহে কিন্তু আজ সত্য বলিতেও যেন তাহার বড় দ্বিধা হইতেছিল। সে বলিল,—মা'কে সারাজীবন ধ'রে এই কথাটাই আমি বুঝিয়ে উঠতে পারি নি।

অপর্ণার মা একটু থামিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ তা হয়, তিনি যে কেন সেখানেই পড়ে থাকেন তা বোঝার বয়স তোমার হয়নি অমল. কিন্তু আমরা ত বুঝি—ঐ ভিটাই ত তার জীবন।

অমল তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া গেল। অমল সন্দেহ করিল, অপর্ণার মা সকলের কুশল প্রশ্নের ফাঁকে পরোক্ষে তাহার বাড়ীর অবস্থা জানিতে চাহিয়াছেন। অমল সে প্রশ্নকে বার বার কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছে তাই মনের মাঝে কাঁটার মত একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল—তাহার মনে হইল, এ মিথ্যা ভাষণে বা সত্য গোপনে, তাহার অপরাধ হইয়াছে।

সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট চিত্তে বলা যায় না অপর্ণার মা চলিয়া গেলেন, অমল কি যেন একটু চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার বাবা কোথায় ?

—আফিসে, রাত্রি ৮টার আগে আসার কোন সম্ভাবনাই নাই।

—অতএব ?

—আমি আর করুণা ছাড়া কথা ব'লবার কেউ নেই।

—শুভ খবর। প্রসঙ্গান্তরে সে প্রশ্ন করিল,—আমাদের সমিতির খবর কি ?

—সংবাদ শুভ,—বেথুন পর্য্যন্ত আমাদের প্রচারকার্য্য গেছে, দুই একজন নতুন সভ্যা হ'য়েছেন।

—তারপর ?

—পরশু একটি সোসাল হবে, ডলি মিত্রের বাড়ীতে—নং অম্বিকা ঘোষ লেন। আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে, কাল কলেজে নোটিশ পাবেন।

অস্থিরচিত্ত করুণা এতক্ষণ যেন কোথায় গিয়াছিল, অকস্মাৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—অমলবাবু জানেন ? দিদির বিয়ে—

অমল সহসা কিছু বলিতে পারিল না,—এত দিনের স্বপ্ন তাহার মাত্র দুইটি প্রগল্‌ভ শব্দে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মনের সংগোপনে যে চিন্তাধারা তাহার জীবনরসে সঞ্জীবিত হইয়াছিল সহসা বিদ্যুৎ প্রবাহের স্পর্শে যেন তাহা মুহূর্ত্তে মরিয়া গিয়াছে—যাতনার একটু ছটফট্ করিতে, আর্ত্তকণ্ঠে একটু কাতরোক্তি করিতে যেন তাহার সময় হয় নাই। অমল নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—শুভ সংবাদ, নেমন্তন্নটা কবে ? কোথায় বিয়ে হবে—

করুণা কহিল,—ওই ত, অজিতবাবুর সঙ্গে,—বিলেত ফেরৎ।

অমল ম্লান হাসিয়া বলিল,—বল ত এতক্ষণ এমনি খবর গোপন রাখতে হয় ? কবে ? তোমার দিদির কি অন্যায়। ইতর ব্যক্তি যারা তারাত মিষ্টান্নের আশা অন্তত: করতে পারে—

অমল অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল। সে অবনত মুখে, লজ্জিত দৃষ্টিতে টেবিলের উপরে কি যেন দেখিতেছে। কর্ণমূল পর্য্যন্ত তাহার আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে,তাহাতে বোঝা যায় এই অপরিসীম লজ্জাকে সে গোপন করিতে পারে নাই। ক্ষণিক বাদে সে চোখ তুলিয়া চাহিল। অমল দেখিল, এমনি আর্দ্র, এমনি করুণ, এমনি দীন নেত্রে যে অপর্ণা তাহার পানে চাহিতে পারে তাহা সে কোনদিন ভাবিতেও পারে নাই। ধরা-পড়া চোরের মত নির্ব্বাকভাবে সে কেবল লাঞ্ছনার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইতেছে।

অমল হাসিয়া বলিল,—এ শুভ সংবাদটা দেওয়ার জন্য এতদূর নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল ? এটা ত কলেজেই জানাতে পারতেন।

অপর্ণা তবুও কিছু বলিল না। অমলের মুখের পানে চাহি

থাকিল মাত্র। অমল করুণাকে ডাকিয়া বলিল—অজিতবাবুর বাড়ী কোথায়?

করুণা বলিল—তা ও জানেন না—শ্যামবাজারে, তাঁকে চেনেন না?

—না। চিন্‌বো কি ক'রে!

—তিনি ত প্রায়ই আসেন।

অমল করুণার নির্ব্বুদ্ধিতায় হাসিয়া বলিল,—বিয়ে কবে? নেমন্তন্ন ক'রবে ত?

—শীগ্‌গিরই—

অপর্ণা করুণাকে একটা ধমক দিয়া বলিল,—যা মিথ্যা কথা বলিস্ না। যা এখান থেকে—

করুণা যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল তেমনি ছুটিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু যাহা বলিবার তাহা নিঃশেষেই বলিয়া গেল। অমল বলিল—সত্য কথা বলায় ওর ত কোন অপরাধ হয় নি, আর শুভ সংবাদ যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল হয়—

অপর্ণা এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল,—কথাটা সত্য নয়। বেশী বললে আংশিক সত্য বলা যায়।

—যথা?

—অজিতবাবু বিলেত ফেরত বড় লোকের ছেলে। টাকা বাড়ী গাড়ী কিছুরই অভাব নেই—বিলেত গিয়ে তিনি কোন ডিগ্রিও আন্‌তে পারেন নি, এমন কি একটি মেম-সাহেবও আন্‌তে পারেন নি। মা বাবার ধারণা এমন সৎপাত্র আর ভূ-ভারতে নেই—

—আপনার?

—লেখাপড়া শিখি আর যাই করি, বিবাহের ব্যাপারে আমাদের মতামত আজও অবাস্তর হ'য়েই আছে।

—আপনারও ত মত হওয়াই উচিত। বাড়ী গাড়ী এসব কিছুরই ত অপ্রাচুর্য্য নেই—আর অধিক কি চাই? এর চেয়ে বেশী মানুষে কি আশা ক'রতে পারে!

অপর্ণা ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলিল—ও আর কিছু আশা ক'রবার নেই, তা হ'লে?

—নাঃ, আপনাদের আর আবার কি চাই?

অপর্ণা কোন জবাব দিল না। অমল বারবার আঘাত করিয়াও কোন জবাব না পাইয়া বিষণ্ন হইল। অনুশোচনা হইল, এমন করিয়া আঘাত না করিলেই হয়ত ভাল হইত। তাহার চাহনির মাঝে যে বেদনা ক্ষরিয়া পড়িতেছে তাহা উপেক্ষা করা ভাল হয় নাই—এই বিবাহের মাঝে নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা দুঃখময় প্রসঙ্গ আছে। হয়ত এমনও হইতে পারে অপর্ণা মনে মনে হয়ত তাহারই মত স্বপ্নরচনা করিয়াছিল তাহা আজ ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। অমল তাই বলিল,—বলা হয়ত আমার অন্যায়, উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার নেই জানি, তবুও যে ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে তার দাবীতে এবং আমার অন্তরের থেকে আপনাকে যত খানি আপনার ক'রে ভেবেছি তার দাবীতে—

অমলের স্বর অশ্রুভারে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সে সহসা থামিয়া গেল। অপর্ণা তাহার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে একবার চাহিল। অমল পুনরায় ধীর কণ্ঠে কহিল—যদি বিয়ে করেনই তবে মানুষকে ক'রবেন, গাড়ী বাড়ী আর ব্যাঙ্ককে ক'রবেন না। তোমার যে অন্তরের পরিচয় পেয়েছি সে গাড়ী আর বাড়ীতে শান্তি পাবে না।

অকস্মাৎ "তোমার" বলিয়া ফেলিয়া এবং নিজের অসংযত অশান্ত কণ্ঠস্বরের জন্য লজ্জিত হইয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কোন কিছু চিন্তা না করিয়া, এমন কি একটা বিদায় নমস্কার না জানাইয়াই সে চলিয়া আসিল। গেটের নিকট হইতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল অপর্ণা ঘরের মাঝে তেমনি করিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে বসিয়াই আছে। বাহিরের কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দৃশ্যের মাঝে তাহার দৃষ্টি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ট্রামে বসিয়া অমল ভাবিতেছিল—

অপর্ণা তাহার বিবাহের সংবাদটা ইচ্ছা করিলে কলেজেও দিতে পারিত, বাড়ীতে যাইয়া তৃতীয়পক্ষ মারফতে জানাইবার কি প্রয়োজন? হয়ত এ সংবাদ জানাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, করুণা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অপর্ণার মাঝে আজ সে যে সংযম এবং প্রতিঘাত করিবার অনিচ্ছা দেখিয়াছে তাহা স্বাভাবিক নয়—হয়ত তাহার মন এ বিবাহে অনুমতি দেয় নাই, তবুও তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া না জানাইলে ক্ষতি ছিল না।

আরও কিছু বয়স হইলে সে হয়ত অন্যরূপ ভাবিতে পারিত, কিন্তু যৌবনের উদার ও মহৎ অন্তর লইয়া সে বার বার অপর্ণার উপরে অভিমানে ক্রোধে নিজেকে নিজে দংশন করিতেছিল। বড় লোকের মেয়ের সহিত আর একজন বড় লোকের ছেলের বিবাহ হইতেছে—এমন কতই নিত্য হয় তাহাতে অমলের মনে করিবার কি আছে। তবুও সে কিছুতেই অপর্ণাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। নিষ্ফল ক্রোধে বার বার তাহার চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছিল—

ট্রাম যখন মধ্যপথ অতিক্রম করিয়াছে তখন অমল স্থির করিল—সে দরিদ্র, এই অসম্ভব আশা পোষণ করা তাহার পক্ষে

যাহাকে বলে বাতুলতা তাহাই মাত্র। তাহার কর্তব্য অন্যরূপ—সে এই পথেই রমলাদের বাড়ীতে পড়াইতে যাইবে স্থির করিল এবং কাল হইতে মনের সমস্ত স্বপ্ন-বিলাসের মোহ ছাড়িয়া দিয়া, সমস্ত অতীত পরিচয়কে অস্বীকার করিয়া সে পড়াশুনা সুরু করিবে। যেমন করিয়াই হোক্‌, সে অপর্ণার অবিরাম দুর্নিবার আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবে। কেহ ভাল বাসিল না বলিয়া দুঃখ করা চলে, দুঃখময় জীবনকে ধ্বংস করা চলে, কিন্তু অভিযোগ করা চলে না—

অমল রমলাদের বাড়ীর সদর দরজায় কড়া ঘনঘন নাড়িয়া দিল। খোকা দরজা খুলিয়া একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—আপনি ?

অমল কথা বলিল না,—পড়িবার ঘরে বসিয়া খোকার উদ্দেশ্যে কহিল—বই নিয়ে এস—

বই একতলা হইতে দ্বিতলে স্থান পাইয়াছিল, খোকা আনিতে গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিল না। রমলা আসিয়া বলিল,—কবে এলেন ? আপনার মায়ের শরীর ভাল ?

অমল সংক্ষেপে জবাব দিল,—হ্যাঁ।

রমলা একটা চেয়ারে বসিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল,—পথ্য ক'রেছেন ?

—হ্যাঁ।

—এত শিগ্‌গির চলে এলেন, আর একটু সুস্থ ক'রে এলেই ত পারতেন।

অমল এই সামান্য সহানুভূতিতে অনেকটা আনন্দ বোধ করিল—অশান্ত অভিমান পীড়িত অন্তরে যেন একটা ঠাণ্ডা প্রলেপের কোমলতা অনুভব করিল। অমল হাসিয়া বলিল,—খোকার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, আর আমি থেকে বিশেষ কিছুই ত ক'রতে পারবো না।

—কি অসুখ ?

—জ্বর, তার সঙ্গে অন্যান্য একটু বুকের দোষও ছিল।

—বাড়ীতে শুশ্রূষা ক'রবার কে আছেন ?

—মা বলেন ভগবান আছেন, আর আমি বলি সহৃদয়া প্রতিবেশিনীরা আছেন।

রমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—যা হোক্‌ খুব ভরসা ব'লতে হবে।

—হ্যাঁ, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান ব'য় একটা কথা আছে।

রমলা প্রবেশোন্মুখ খোকাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—চায়ের ব্যবস্থা ক'রে এসেছিস ? যা নিয়ে আয়—এতদিন পরে উনি এলেন, একটু ভদ্রতাও ত ক'রতে হয় !

অমল বলিল,—আপনি থাক্‌তে তার ভাবনা নেই বলেই মনে হয় !

চা আসিল। অমল দুই এক চুমুক খাইয়া বলিল,—আপনার খবর কি,—এতদিনে নতুন কিছু—

রমলা বলিল,—একটা সুখবর আছে, আমাদের একটা Cultural society হ'য়েছে, আমি মেম্বার হ'য়েছি। পরে আপনাকেও মেম্বার ক'রবো।

অমল ভীত কণ্ঠে বলিল,—সেখানে কি হবে ?

—সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

অমল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমি যে কাপালিক !

রমলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—কাপালিককে এবার কালিদাস ক'রে দেব আমরা সকলে মিলে। আপনার অঙ্কশাস্ত্র বড়ই নিরস,—ভরসা আপনার মাঝে এখনও যেন একটু সাহিত্যপ্রীতি জীবিত আছে—

—সেটা যে জীবিত আছে এটা বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রলে মনে হয় যেন কিছু কিছু বুঝি—

—যাক্‌, যদি ভাল লাগে, আপনাকেও সভ্য হ'তে হবে কিন্তু।

—অবশ্যই, সাহিত্যক্ষেত্রে আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, দেখি ও সব ব্যাপার কিছু কিছু বুঝি কিনা।

রমলা আঁখি ভঙ্গি করিয়া কহিল,—ও সব একেবারেই না বোঝেন এমন ত নয়, তবে স্বীকার করার সৎসাহস আপনার থাকা উচিত।

—তার চেয়েও বড় প্রয়োজন আপনাকে—

কথাটা দ্ব্যর্থক, রমলা তাহা বুঝিয়াই আত্মপ্রসাদের সঙ্গে কহিল, —আমাকে ?

রমলা অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে হাসিয়া প্রস্থান করিল। অমল এতগুলি মিথ্যাকথার পুনরুক্তি করিয়া মনে মনে কেন যেন খুশী হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)



কর্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

(পূর্বানুবৃত্তি)

ধর্মবিশ্বাস মেডিঈভ্যাল্ (মধ্যযুগের); ধর্মমত মানুষের মনকে ভেদাভেদ সংস্কারের দ্বারা সঙ্কীর্ণ, তার বুদ্ধিকে গোঁড়ামি দ্বারা বিকৃত করে, অতএব রাষ্ট্রতন্ত্র ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি থেকে ধর্মকে বার ক'রে দিয়ে মন্দিরে মস্‌জিদে অথবা চার্চে তাকে চাবিবন্ধ ক'রে রেখে দাও, তবেই উন্নতি—অনেকে আজকাল এইরকম কথা বলছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে আমাদের দেশের অনুষ্ঠানগুলিকে যা কলুষিত করছে সে ধর্ম নয়, ধর্মের বিকার। যে তথাকথিত ধর্মবুদ্ধি মানুষকে তার বিবেক এবং বিচার-বুদ্ধির উল্টাপথে প্ররোচিত করে সেটা ধর্মবুদ্ধি নয়, অধর্মবুদ্ধি। যা বিবেক বর্জ্জিত, তাকে ধর্মের ছাপ দিলেই তা ধর্ম হয় না। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যা বিবেকের পরিপন্থী। কোন্ ধর্মে বলে চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করো, মানুষকে ঘৃণা করো? গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা, নীচতাকে ধর্মের মুখোস পরিয়ে নিয়ে এলে তাকে ধর্ম বলে না বলে ধর্ম-বেশী। ধর্মবেশীর ওপর রাগ ক'রে যদি বলো ধর্মকেই বহিষ্কৃত করে দাও—তাহলে মানুষের শিক্ষা সভ্যতা লব্ধ আর সমস্ত বৃত্তিগুলোকেও বহিষ্কৃত ক'রে দিতে হয়, কেননা যে মানুষ হীন, সে তার নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে সব রকম বড়ো বড়ো মুখোষ পরিয়ে আনবে, যথা নীতির মুখোষ, সৌভ্রাতৃত্বের মুখোষ, বিশ্বপ্রেমের মুখোষ, বিশ্বহিতের মুখোষ, নিঃস্বার্থ পরমঙ্গলের মুখোষ ইত্যাদি। ছদ্মবেশীদের দৌরাত্ম্যে তুমি যদি আসলগুলিকেও গলাধাক্কা দাও, তাহলে শুধু রাষ্ট্র কেন, কোনো অনুষ্ঠানই চলবে না। ছদ্মবেশীদের ছলনা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যদি আসল নলরাজাটিকেও সভা হতে বহিষ্কৃত করা হত, দময়ন্তীর তাহলে স্বয়ম্বরা হওয়াই হত না। ধর্মকে দিয়ে মানুষ দেশে দেশে, কালে কালে অনেক উঞ্ছবৃত্তি করিয়েছে, করছে এবং সুযোগ পেলেই করবে,—অসুররা যেমন দেবতাদের বন্দী ক'রে এনে পা টিপিয়েছিল। আর তুমি যদি ধর্মের নাম সইতে না পারো, নীচ তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তুমি যার নাম সইতে পারো তারি মুখোষ প'রে আসবে। তখন তুমি কি করবে? এর একমাত্র উপায় হল, অকল্যাণকে দূর করতে হলে আসল থেকে নকলের প্রভেদটাকে খুব ভাল ক'রে চিনতে হবে। দময়ন্তী জানতেন দেবতারা ছায়া ফেলেন না, তাঁদের অনিমেষ নয়ন, স্বেদাম্বুহীন কায়া। তাতেই তিনি আসল নলকে চিনতে পেরেছিলেন। ধর্মবেশীর মুখোষের ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলতে হলে ধর্মের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় থাকা চাই; সুতরাং ধর্মকে দূর ক'রে দেওয়া নয়, তাকে আরো ভাল ক'রে জানতে হবে।

স্বদেশের ও বিদেশের সমস্ত আদর্শ-কর্মীর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁদের প্রত্যেক লক্ষণটি গীতার কর্মযোগের মধ্যে রয়েছে, কোনোটি বাদ যায় নি। এমন কি তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বর মানতেন না, তাঁরা নিজেকে মানতেন। এই নিজেকেই গীতা বলেছেন আত্মা, আর তত্ত্বজ্ঞানীমাত্রেই জানেন—আত্মা আর পরমাত্মা একই। তাঁরা সকলেই যে হিন্দু তাও নয়,—কেউ কেউ কোনো ধর্মমতই মানতেন না। সকলেই যে গীতা পড়েছিলেন তাও নয়, কেউ কেউ ভাল লেখাপড়াই জানতেন না। তবু তাঁদের সংকার্যগুলি গীতোক্ত কর্মযোগের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলে মিলে যায়। এব্রাহাম্ লিংকন, সানইয়াট্ সেন্, কামাল আতাতুর্ক, লেনিন,—মাত্র এই ক'টি উদাহরণই যথেষ্ট—এঁরা বিভিন্ন মহাদেশের মানুষ হলেও, আদর্শ কর্মযোগী এঁদের বলতে কোনো হিন্দুরই বিবেকে বাধবে না। এই সব বিভিন্ন মানুষের কাজের সঙ্গে গীতোক্ত কর্মযোগের এত মিল কেন? তার কারণ, গীতোক্ত কর্মযোগ মানুষের সহজাত ধীশক্তি ও প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত—কোনো সঙ্কীর্ণ ধর্মমত বা আবেষ্টনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়,—প্রতিভার এমন উন্নততম বিকাশ,—যে আমরা, যারা বহু শতাব্দীর চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট, মানুষের বহুতপস্যায় লব্ধ জ্ঞানের দান যারা পেয়েছি, তারা যদি কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আধুনিক তত্ত্ব গীতায় আছে কিনা খুঁজে দেখতে চাই, আমাদের পিছন ফিরে তাকাতে হবে না, দেখতে পাবো গীতা আমাদের অনেক আগেই এগিয়ে চলে গেছেন, আমরাই বরং পিছনে পড়ে আছি। গীতা নিয়ে যাঁরাই একটু নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই একথা স্বীকার না ক'রে পারবেন না। বিদেশী পণ্ডিতের সার্টিফিকেট্ জাহির করব না, কেননা তা অপ্রীতিকর। শুধু William Humboldt-এর উক্তিটিই উল্লেখ করব, কারণ এটি তাঁর করুণ হৃদয়ের সার্টিফিকেট্ নয়, কৃতজ্ঞচিত্তের নমস্কারে নত বন্দনা,—"It (the Geeta) is the most beautiful, perhaps the only true philosophical song existing in any known tongue."

একটিমাত্র শ্লোকে কর্মযোগের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়টিকে গীতায় বহন ক'রে আনা হয়েছে। সংক্ষিপ্ততার দিক দিয়ে এমন শ্লোক অতুলনীয়। সে শ্লোকটি আমরা বহুবার শুনেছি, কিন্তু ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম করেছি কি ?—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

এই শ্লোকে চারটি কথা বলা হয়েছে,—(১) কর্মেই তোমার অধিকার (২) ফলে কদাচ তোমার অধিকার নেই (৩) তুমি কর্মফলহেতু হ'য়ো না, মানে, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কাজে প্রবৃত্ত হবার হেতু না হয় ; এবং (৪) কর্মত্যাগে যেন তোমার আসক্তি না হয়।

আমাদের বুঝতে হবে 'কর্ম' বলতে কি রকমের কাজ বোঝায়, 'অধিকার' বলা হয়েছে কেন, এবং কর্মফল মানে কি ? আর কিছু লেখার আগে পূজ্যপাদ পূর্ববর্তীদের মনে মনে স্মরণ করি. প্রণাম করি, তাঁদের ঋণ অন্তরের কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করি। আমার মতো নগণ্য লেখকের সঙ্কোচ সহজেই অনুমেয়। বিনয়ের ভণিতা করাও অশোভন, কেননা এক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশ অহঙ্কার প্রকাশেরই নামান্তর। আমি আর কীই বা বলতে পারি, এক শুধু ভূমিকা-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের এইটুকু প্রতিধ্বনি করা ছাড়া ?—"আমি এমন বলিতেছি না যে আমি ইহা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি, বা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব।...যতটুকু পারি বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধহয় ক্ষতি নাই।" "ক্ষতি নাই"—এইটুকুই আমার সান্ত্বনা, এইটুকুই আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির মার্জনার পথ পরিষ্কার করে যেন।

করণীয় কাজের কথা উঠলে প্রথমেই দুটি বিরুদ্ধ মতের সম্মুখীন হতে হবে—সনাতনী এবং প্রগতিশীল। সনাতনী মত, হল পূজা-অর্চন, ঈশ্বরারাধনাই হল একমাত্র কাজ, আর সব বাজে কাজ। হিন্দু শুধু নয়, সকল ধর্মের সনাতনীদের এই মত,। আর প্রগতিশীলদের মত, হল, পূজার্চন, মন্দির-মসজিদ-চার্চ গমন—এ সবের প্রয়োজন নেই, সমাজসংস্কার, জাতিগঠন, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতিসাধন, এই সবই হল আসল কাজ। সনাতনীদের স্মরণ করিয়ে দিই পুণ্যফলপ্রাপ্স, হ'য়ে যাঁরা পূজার্চন সাধনভজন নিয়েই আছেন, পরের দিকে একবার দৃকপাতও করেন না, গীতা তাঁদের নিন্দা ক'রে বলেছেন তাঁরা 'অবিপশ্চিত'—অল্পবুদ্ধি, তাঁরা কামাত্মা, তাঁরা স্বার্থপর, স্বর্গপর। এ রকম লোক সংসারাবদ্ধ মনুষ্য কীটের মতোই ঘোর স্বার্থপর। এই দুই স্বার্থপরতার বাইরের চেহারাটা আলাদা—একটা আধ্যাত্মিক, অপরটা সাংসারিক—কিন্তু ভেতরটা এক।

কিন্তু তাই বলে আবার এমন ভুলও যেন না করি যে পূজার্চন-সাধন-ভজন ব্রত নিয়ম সব নিষিদ্ধ হয়েছে। গীতা বলেছেন পুণ্য-ফলের লোভে নয়, নিষ্কামভাবে করতে হবে এ সব। পূজার্চনা, সাধন ভজন কিসের জন্যে ?—চিত্তশুদ্ধির জন্যে। কামনা, বাসনা, শোক, হিংসা প্রভৃতি হ'তে চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে, তবেই মঙ্গল। আগে শান্তং, তারপরে শিবং। নইলে চিত্তশুদ্ধি নিজেই নিজের একমাত্র লক্ষ্য,—an end in itself—হতে পারে না। আমরা সচরাচর যেসব জিনিষ দিয়ে কাজ করি. যেমন ছুরি, কাঁচি, কোদাল, কুড়ুল, থালা, ঘটি, বাসন,—এদের শান দিয়ে বা ধুয়ে মুছে পালিশ ক'রে রাখতে হয়, যাতে এরা আরো ভালো ক'রে, আরো অনেকদিন ধরে কাজে আসে। তেমনি পূজার্চনব্রতনিয়মাদির দ্বারা মনকে শান্ত করতে হবে. চিত্তশুদ্ধি করতে হবে, এগুলি হল মনকে প্রস্তুত করার তপস্যা। কিসের জন্যে প্রস্তুত করবার ?—মানুষের মঙ্গল করবার।

মঙ্গল কাকে বলে ? নিজের সুখ যে কি তা সকলেই জানি। প্রত্যেকে নিজের সুখের জন্যে লালায়িত। ভোগের সমস্ত আয়োজন, উপকরণ নিজের দিকে আকর্ষণ করি. কারণ তা করতেই ভাল লাগে, পরকে বঞ্চিত করতেও দ্বিধা করি না, কারণ পরের ভাল ভাল লাগে না। নিজের ভোগকে বাড়াব কেমন ক'রে যদি পরের ভোগকে খর্ব না করি ?—তাই আমার সুখ পরের দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনি আবার পরের সুখ নিজের দুঃখের কারণ হয়। কর্তব্য বলে. পরের সুখে উদাসীন হ'য়ো না, আমরা বলি, কর্তব্য ভারি অপ্রিয়, কঠোর। প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থ নিয়ে লড়ছি ব'লে এ জগতে বিরোধের পর বিরোধ জমা হয়ে উঠেছে। নিজের স্বার্থ নিয়ে লড়াই কেন ?—নিজেকেই ভালবাসি, অপরকে ভালবাসি না ব'লে। কিন্তু এই এক আশ্চর্য জিনিষ আবা'র এক শুধু মানুষের মধ্যেই দেখতে পাই, জন্তুজানোয়ারের মধ্যে পাই না—যে মানুষের ভালবাসা যতই গভীর হ'তে গভীরতর হয় ততই সে ভালবাসা আপনাকে অতিক্রম ক'রে পরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 'প্রেমে নর আপনি হারায়. প্রেমে পর আপন হয়।' শিশু খেলনা আঁকড়ে ধরে, তাতেই তার সুখ তাতেই তার আনন্দ। খেলনা কেড়ে নাও. তার দুঃখের আর শেষ থাকবে না। সেই শিশু বড় হ'য়ে নিজে যখন বাপ হয়. তখন খেলনা নিজে নিয়ে আর সুখ নেই, খেলনা তার শিশুসন্তানের হাতে তুলে দিতে পারলেই সুখ। মানুষ এর চেয়ে বড় সচরাচর আর হয় না, তার ভালবাসা নিজেকে অতিক্রম ক'রে কেবল তার পারিবারিক গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

"আরো বড়ো হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে ?"

যখন সে আরো বড় হয়, তখন সকল মানুষকে নিজের মতো, নিজের

ছেলের মতো, নিজের আত্মীয়ের মতো দেখে। একেই বলে সর্বভূতে আত্মদর্শন। তখন আত্মপ্রীতি সর্বজীবে ভালবাসা রূপে দেখা দেয়। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি,—যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলেছিলেন মৈত্রেয়ীকে—

আমার ভালবাসা আছে
সবার ভালবাসা হ'য়ে,
আমার প্রীতিকামনাতেই
প্রেমের ধারা যায় রে ব'য়ে।

ভালবাসা যখন এম্‌নি ক'রে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তখন পরকে বঞ্চিত রেখে নিজের ভালতে আর সুখ নেই, তখন পরের ভালতেই আনন্দ। পর তখন আর পর নয়, একেবারে বুকের মধ্যে এসে আপন হ'য়ে যায়। তখন সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ ঘুচে যায়, স্বার্থকে অতিক্রম ক'রে তখন সমস্ত কাজ পরার্থে উৎসারিত হয়, তখন কর্ত্তব্য আনন্দময়, ত্যাগ আনন্দময়। মানুষের প্রেম যখন এম্‌নি ক'রে জাগে, তখন তার মনের সমস্ত তমঃ ঘুচে যায়। তখন তার দিবাও নয় রাত্রিও নয়—তখন তার মনের আলো আর রাত্রি দিবায় খণ্ডিত নয়, মনে তখন চিরন্তন জ্যোতিঃ, তখন আর সৎও নয়,অসৎও নয়, ভালও নয়, মন্দও নয়, তখন শিব এব কেবলঃ—তখন কেবলি শিব, তখন অবারিত মঙ্গল,—

যদা অতমঃ তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ। (শ্বেতাশ্বতর)

কর্মযোগের কর্ম হ'ল মানুষের এই মঙ্গলকর্ম। একবার নয়, দুবার নয়, বারংবার ক'রে গীতা এ কথা বলেছেন। প্রথমেই মনে করিয়ে দিই তাঁদের, যাঁরা ভেবে রেখেছেন সাধনভজন উপাসনা সংযম নিয়মই হচ্ছে একমাত্র পরমার্থ; তা নয়—

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্‌।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ।

—কিন্তু যাঁরা সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে ইন্দ্রিয়গুলি সম্যক্‌ সংযত ক'রে অব্যক্ত অনির্দেশ্য সর্বত্রগ অচিন্ত্য কূটস্থ অচল ধ্রুব নির্বিশেষ অক্ষরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা যদি সর্বপ্রাণীর মঙ্গলকার্যে রত থাকেন তাহলে আমাকে (ঈশ্বরকে) পান।　　ক্রমশঃ

বন্ধু

শ্রীরণজিৎরঞ্জন দত্ত

বহুদিন পর রমেশের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন চৌরঙ্গীতে দেখা হয়ে গেল। ছোটবেলাকার বন্ধু! দেখে খুবই আনন্দ হ'ল! তাই ডেকে বাড়ীতে নিয়ে এলুম।

অনেক কথাই হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম: কি করছ আজকাল?

বললে: আজকালকার দিনে যা সবচেয়ে লাভজনক তাই অর্থাৎ ব্যবসা।

ব্যবসায় যে খুব লাভ হচ্ছে তা তার জামাকাপড়,সোনার বোতাম, ঘড়ি এবং ফাউন্টেন পেন দেখেই বেশ বোঝা যায়।

ঠিক করে ফেললুম, রমেশ এবং আমি একত্রে ব্যবসা করব। ব্যবসা আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না। তবে রমেশের ন্যায় বন্ধু যখন আছে, তখন আর ভাবনা কি?

ঠিক হ'ল, প্রথম যা টাকা লাগবে, তা আমিই দেব।

* * * *

রমেশ কয়েকদিন আমার বাসায় খুব ঘোরাফেরা করতে লাগল। একদিন ওর সঙ্গে সমস্তই ঠিক করে ফেললুম। পূর্বের কথানুযায়ী, ও কে একটা হাজার টাকার চেক কেটে দিলুম।

টাকা পেয়ে ও আর আমার সঙ্গে দেখাই করে না। ব্যাপারটা কি? টাকাটা মেরেই দিল কিনা কে জানে?

না; একদিন ওর একটা চিঠি পেলাম। টাকা তা হলে মারা যায় নি! আর রমেশ কি টাকা মারতে পারে? নিশ্চয় এতদিন কোন কাজে ব্যস্ত ছিল বলে আসতে পারে নি—তাই চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

লিখেছে:

বন্ধু!

আর বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। শেষ পর্য্যন্ত, তোমাকেই 'ভুয়ো' ব্যবসার লোভ দেখিয়ে ঠকাতে হোল। যাক্‌, দুঃখ করো না। লোককে ঠকানই আমার ব্যবসা। কি ব্যবসা করছি তা সেদিন তোমায় জানাতে পারি নি। আজ নিশ্চয় সেটা জানতে পেরেছো। প্রীতি নিও। ইতি—

হতভাগ্য রমেশ।

শুনে প্রাণটা শিউরে গেল।—"এতো খোঁজ কেনো, ব্যাপারটা কি, একটু বলে' দাও ভাই।"

কামিজপরা ক্লার্ক কিশোরী, হাসি মুখে বললে—ভাবেবন না, ব্যাপার কিছুই নয়। জানেনই তো বড় লোকদের কাণ্ড—সবই প্রকাণ্ড। সাহেব তায় খাস আমেরিকান—মর্ত্তের দৌলতাবাদের লোক। লাইম্ যুস্ ঢেলে, দু' ডিশ্ (meat) মাংস খেয়েছিলেন। রাতে গলা খুস্ খুস্ করে' থাকবে, দু'বার ক্যাম্প কাঁপিয়ে কেসেও ছিলেন। সেই দুর্ভাবনায় মন-মরা হয়ে বসে আছেন। বন্ধুদের কাছে ওঁদের শোনা ধারণা পাকা করা আছে।—ইণ্ডিয়ার সব কিছুই বিষাক্ত।—একবার একটা কাট-পিঁপড়ে কামড়ায়, তাতে রক্ত পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি! এ আমার দেখা।

ওরা নিজের দেশের বাঘের কামড় সয়, ইণ্ডিয়ায় একটা মশা কামড়ালে ডাক্তারের ডাক পড়ে,—ভিয়েনাতেও ছোটে।—গুরু-ভক্তির পরিচয়।—(চঞ্চল ভাবে)—"না—আর নয়, আমি খবরটা দি"।

(ক্লার্ক কিশোরী খবর দিতে চলে গেলেন)

শুনে আমি বাঁচলুম, পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম যন্তরটা (ষ্টেথিসকোপটা) আছে। ভাগ্যে দিয়েছিলে মাণিক! আমি ষ্টেথিসকোপে' ওস্তাদ, sound—শব্দ আমার হাত-ধরা। অনাহতও আমাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না।—আনন্দে—কামানো গোঁফেই তা দিয়ে ফেললুম!

কিশোরী বেরিয়ে এসে ডাক দিলে—"আসুন ডাক্তার সাহেব।"

আমি কোটটা টেনে—তার কোঁচমেরে, যতটা পারি সোজা হয়ে, গটগট্ করে' হাজির হয়েই—রগে চারটে আঙুল চিত্ করে' ঠেকিয়ে, সাহেবকে সামরিক সেলাম করলুম।

—O/C খুসি হয়ে, চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বিনীতভাবে বললুম—"ক্ষমা করবেন, আমাদের সেটা নিয়ম নয় Sir, আগে আপনার আদেশ শুনি—আজ্ঞা করুন"।

সাহেব খুসির হাসি হেসে, নিজের কাসির কথা কইলেন ও চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে X' Rayর ব্যবস্থা আছে কি?"

শুনে আমি অবাক! বললুম—X' Ray কেনো, কি হবে Sir! Chest বা lungsএ (বুকে কি গলনালিতে) কিছু হলে', তার soundএই defect (শব্দেই তার দোষ) ধরা পড়ে? পরে অন্য ব্যবস্থা। আপনি ভাবেবন না—your humble Doctor is an expert in detection by sound—আমি ও সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—

"আপনার সঙ্গে কোনো যন্ত্রাদি আছে?"

নিশ্চয়ই আছে Sir—I believe you mean থর্মামিটার—Thermometer. It is an inseperable appendage of our body Sir—সেটা যে আমাদের অঙ্গের অংশ বিশেষ, বলেই সেটা বার করে ফেললুম।

Very good, come in please. বলেই উঠে—পাশের একটা পর্দ্দাফেলা ঘরে ঢুকে পড়লেন—সঙ্গে আমি। গায়ের কাপড় (পোষাক) খুলতেই যেন আকাশ থেকে শিবের দক্ষযজ্ঞ বিনাশন বীরভদ্র উপস্থিত। কী বিরাট মূর্ত্তি, যেন marble rock-কোঁদা কাঠামো। ভাবলুম—এ বুকের sound—houndএর ডাকই শোনাবে।

বললেন—"am ready Doctor" (আমি প্রস্তুত।)—আমিও অপ্রস্তুত ছিলুম না। T. C. ষ্টেথিসকোপ আমার হাতের খেলনা—কাণের বন্ধু। মনেও বিশ্বাস ভোরপুর—আমি specialist, তাই দুর্গানাম নিতেও ভুলে গেলুম। পরীক্ষা আরম্ভ করে' দিলুম।

প্রভুর কাঠ-প্রমাণ বুক—এ পিঠ ও পিট চষে' ফেললুম। কোথাও ভালমন্দ কোনো সাড়াই প্লাই না! Not even natural sound—ব্যাপার কি! দেহটি মেদমাংসের মৈনাক, শব্দভেদী যন্ত্র মূক মেরে গেল নাকি! সামনে সাক্ষাৎ ভীম, আমার অঙ্গ ক্রমে হিম। কেবলি তাঁর বুকে পিঠে থাবলাচ্ছি কিছুই পাচ্ছিনা!—বিরক্ত হবেন যে! তখন দুর্গা নাম আপনিই এলো। সাহসে ভর করে' বললুম—"আপনি আমাকে বুক পরীক্ষা করতে ডেকেছেন Sir?"

O/C বললেন "Why—what you mean? তুমি কি বলতে চাও?"

বললুম——You have got a chest, as best as Rock! No defect anywhere কোথাও কোনো খুঁৎ নেই, ওটা আপনার সাধারণ সহজ কাসি simply superficial আহারের সঙ্গে কোনো টক্ জিনিস ব্যবহার করেছিলেন কি?

বললেন—Yes Doctor, you have guessed aright. Now I remember I took about quarter of a pint of Lime-juice with my evening meal ঠিকই ধরেছ। আমি খানিকটে লেবুর রস (আরক্) খেয়েছিলুম বটে।

বললুম—It clarifies every thing বাক্, ও কাসির জন্যে আর দুর্ভাবনা রাখবেন না। 'লাইম যুস' আপনার উপকারই করবে।

তাড়াতাড়ি 'ষ্টেথিসকোপটা' পকেটে পুরে বললুম—আর কোনো

চিন্তার কারণ নেই sir, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার তুষ্টির জন্তে, আমি না হয় তিন দিন পরে বৈকালে আর একবার এসে পরীক্ষা করে' যাব।

ও-সি (O/C) খুসি হয়ে বললেন—Many thanks—very much obliged Doctor—you are always welcome বহু ধন্তবাদ, বড় উপকার করলে ডাক্তার। তোমার কোনো বাধা নেই, সর্ব্বদাই আমার দ্বার তোমার জন্তে খোলা থাকবে, যখন ইচ্ছা এসো।

—বুঝলে মাণিক, আমার মন কিন্তু তখন ওই ষ্টেথিস্কোপের মধ্যে পড়ে। সরে' পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। বলো কি, একটুও আওয়াজ দিলেনা! তা কি করে' হয়! এমন তো কখনো হয়নি—হ'তেও পারে না। সকালে ওটা বেশ করে দেখতে হবে। না দেখে আমার স্বস্তি নেই। যাক্—

পরে ড্রয়িংরুমে এসে বললেন—take your chair please, এখন তো তোমার চেয়ারে বসতে আর আপত্তি নেই? আর ইতস্তত করতেও দিলেন না। চাঙ্গা হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—how is my house boy-that-that, I always forget his name Something like venola or vinolia—সে ছোকরা কেমন আছে, তার নাম আমার মনে থাকে না—

বললুম—"আপনি কি বিনোদীলালের কথা"…yes, yes. thanks. How is he? সে কেমন আছে?

Progressing well sir—very fine figure, may God help him.—The only son of an un-fortunate blind mother—ক্রমে ভালই দেখছি, অন্ধ মায়ের একমাত্র ছেলে—

Is he? any how save his life Doctor. Dont mind cost—তাই নাকি? মা অন্ধ?—যেমন করে হোক তাকে বাঁচাও ডাক্তার। খরচের জন্তে ভেবনা।

বললুম—আবশ্যক মত সবই করা হবে sir। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ তো আমার নিজের কর্ত্তব্য।

তার পরও সাহেব ছাড়তে চান না—এ কথা সে কথা, যেন আমাদেরি একজন। এ আবার কোন্ দেশী সাহেব!—চা বিস্কুট হাজির হ'ল—খেতেও হ'ল। শেষ হাতঘড়িটা দেখলুম। শোনাছিল ওটা নাকি বিদায় নেবার ইঙ্গিৎ, কখনো তা করতে হয়নি, করলে নিশ্চয়ই রক্ষা থাকত না।

ইনি কিন্তু বললেন—"কাজ আছে নাকি?" বললুম—একটা রোগীকে না দেখে ফিরতে পারব না,—caseটা বাঁকা। বড় সব গরীব, মনে পড়লেই চঞ্চল করে sir—

তবে আর তোমাকে detain করবনা (দেরি করাব না) এক মিনিট সময় দাও—বলেই উঠে গেলেন। তখুনি ফিরে এসে একখানা ১০ টাকার নোট—"এটা গরীবদের জন্তে" বলে' আমার হাতে দিলেন। "দরকার মত ব্যবহার কোরো।"

পরে দু ছড়া কাবলে কলার মত আঙুল, আমার সামনে ছড়িয়ে ধরে—"যেটা ইচ্ছে খুলে নাও"—অর্থাৎ আংটী।

সবিনয়ে বললুম—এখন থাক sir, ও সব আপনার সখের জিনিস, এ দেশে দুষ্প্রাপ্য। বিনোদী ভাল হয়ে উঠুক—

O/C বললেন—"না, একটা তোমায় নিতেই হবে as sovenir" ছাড়লেন না। তাঁর কড়ে আঙুলেরটি নিতেই হল'। আমার পায়ের বুড়ো আঙুলেও কিন্তু চলকো হবে।

বললেন—"তা হলে আমি তোমাকে 4th day afternoon expect করবো—(চতুর্থ বৈকালে)"—

আমি "Certainly sir—নিশ্চয়ই" বলেই Good night জানালুম।—তাই এত দেরি হয়ে গেল। কী বিপদেই পড়েছিলুম মাণিক! নিরক্ত অবস্থায়—মা দুর্গা আর মধুসূদনকে বিরক্ত করে' মেরেছি—

মাণিক। বিপদ কি মশাই, এ তো সম্পদের বিপদ—

ডাক্তার। তুমি বুঝছনা আমার মনের অবস্থা। ওই T. C. (ষ্টেথিসকোপ) আমাকে আজ মশানের শেষ সোপান পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়েছে—কেবল 'কোপটি এখনো ঝাড়েনি। সেটা ষ্টেথিস্কোপের মধ্যেই অপেক্ষা করছে। অন্তরটা কি বেইমান—একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলেনা হে! মুখের জোরেই ফিরে এসেছি—রোগ যদি থাকে তো তাঁর বুকেই রয়ে গেছে।—"নাহংকারাৎ পরো রিপু"। দয়াময়ী আমার দর্প চূর্ণ করে' শেষ বাঁচিয়ে ফিরিয়েছেন। এখন যা হয় করো। যন্তরটা ভাল করে' দেখতে হবে মাণিক! না হয় হেড্কোয়াটার থেকে একটা নূতন যন্তর আনিয়ে নিতে হবে। কারণ চতুর্থ দিনে আবার দেখব' বলে' এসেছি।

মাণিক। আপনি ভাববেন না, রাত্রেই আমি দেখে রাখব। তার পর আংটীটা দেখে "এ যে আসল হীরে মশাই!"

ডাক্তার। ওরা মরবার মুখে থাকে—তাই সব সাধ মিটিয়ে রাখে। বীরের হীরে শেষ ম্যাথরে পায়। সাহেবটি ভালো, তাই বোধহয় ব্রাহ্মণকে দান করে' রাখলেন। ভগবান ভালই করবেন।

উদাস ভাবে—বেদান্তই ঠিক্ কথা কয় হে—জগৎটা একদম মিথ্যে দিয়ে গড়া। যুধিষ্ঠিরকে দেখছ না, কিছুই তার আটকায় না—আবার মিছরি ঢুকিয়ে তাকে মিষ্টি করেও দিলে!

মাণিক। এতো খবরের কাগজ পড়েন, আবার ও কথা কেনো! তাতে এখন তো বহুং order made যুধিষ্ঠিরেরও দেখা পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই দরকার হয়ে থাকবে। ভেবে কাজ কি—মহাজনদের অনুসরণ করাই তো বিধি—

ডাক্তার। তা বটে, তবে থাক। বড়দের নজিরই তো—সাফাই। তবু পুর্ব্বসংস্কারগুলো মনে পড়ে' কষ্ট দেয়।

মাণিক। যতদিন কাজে থাকা, ততদিন ওসব না ভাবাই ভালো।

ডাক্তার দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাণিকলালের জ্ঞানের কথা শুনে একটু হাসি টেনে বললেন—"তবে কিছু খেতে দাও—শুয়ে পড়ি। আর পারছি না মাণিক।"

"এই যে নিন না"—মাণিক প্রস্তুতই ছিল। ডাক্তার আহারান্তে শুয়ে পড়লেন। নিদ্রাদেবীর দয়াও সহজেই এসে গেল। মাণিক কাজকর্ম্ম না সেরে শোয়না।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস

(১৭)

শোক প্রকাশ (ইংলণ্ডে)

উমেশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর ইংলণ্ডের নানাস্থানে শোকসভা আহূত হয়। একটি সভায়

অ্যাল্যান অক্টেভিয়াস হিউম বলেন :—

দীর্ঘকাল যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগান্তে আমাদের ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের অন্যতম একনিষ্ঠ ও শক্তিশালী পক্ষসমর্থক ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী তাঁহার ক্রয়ডনের বেডফোর্ড পার্কে অবস্থিত বাসভবনে শান্তিতে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং প্রথমাবধি অবিচলিত চিত্তে উহা দ্বারা প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট



অ্যাল্যান হিউম

ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার শোকাবহ মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত বিজড়িত ছিলেন এবং উহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, সাফল্য ও নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁহার পদগৌরবের ও মহান চরিত্রের, অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা ও বিস্তৃত প্রভাবের শক্তি উহাতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আধুনিক কালে আর কোনও ভারতবাসী তাঁহার দেশবাসীর উপর—কেবল বাঙ্গালা প্রদেশে নহে সমগ্র ভারতবর্ষে—উমেশচন্দ্রের ন্যায় প্রভাব বিস্তারিত করেন নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে, যেদিন হইতে তিনি শাসন সংস্কারের আন্দোলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে—তিনি তাঁহার সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিতে কার্পণ্য করেন নাই—যখনই তিনি তদ্দারা ভারত-বাসীর কোনও রূপ সাহায্য বা উন্নতি হইবে দেখিয়াছেন বা দেখিতে পাইয়াছেন মনে করিয়াছেন। যদিও এই দারুণ দুর্ঘটনা (কেবল তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী আমাদের নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণের ক্ষতি) অদূরবর্ত্তী গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অনেক দিন হইতে, প্রতীয়মান হইতেছিল, আমার সন্দেহ হয়, এখন এই শোচনীয় ঘটনায় আমাদের কতদূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি কি না। অবশ্য কয়েকমাস হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি বর্ত্তমান সঙ্কটময় কালে তাঁহাকে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিতে অক্ষম করিয়াছিল, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত, তাঁহার স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও, তাঁহার উপদেশ ও অভিজ্ঞতা আমাদের সুপ্রাপ্য ছিল। আমার বিবেচনায় আমার সময়ের আর কোন ভারতবাসী তাঁহার দেশের নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞতার পাত্র নহেন। কোনও জীবিত ভারতবাসী তাঁহার শূন্য আসন পূর্ণ করিতে সমর্থ নহেন, কিম্বা তিনি অতীতে শাসন সংস্কারের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কারের আন্দোলন পরিচালিত করিতে তাঁহার ন্যায় যোগ্যতা কেহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন ; এবং যদি তাঁহার তিরোধানে ভারতবর্ষ আজি রোদন করে, রোদন তাহাকে করিতেই হইবে, তাহা হইলে সে যথার্থ-ই রোদন করিবে একজনের জন্য—যিনি তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাহাকে ভক্তি করিয়াছেন—এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অসঙ্কোচে পরিহার পূর্ব্বক গত বিংশতিবর্ষকাল ব্যাপিয়া তাহার অধিবাসিগণের উন্নতি সাধনের ও মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমরা—ভারতীয় ও ব্রিটন—যাঁহারা এই বিংশতিবর্ষকাল তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—তাঁহার মৃত্যুতে যে কি ভাবে ব্যথা পাইয়াছি ও বহুদিন পাইব, তাহা সমুচিতভাবে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে আমি নিজে আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত বন্ধুকে হারাইয়াছি। এমন কোন কল্পনাতীত ভীষণ বিপদ ছিল না যাহাতে পতিত হইলে আমি তাঁহার নিকট অসঙ্কোচে যাইতাম না, এবং আমি নিশ্চিত জানিতাম তাঁহার নিকট প্রার্থিত যে কোন উপদেশ, সাহায্য, আন্তরিক ও সক্রিয় সহানুভূতি হইতে আমি বঞ্চিত হইব না। এখন তিনি পরপারে গিয়াছেন এবং আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে দিন গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না।

রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন :

ভারতবর্ষের একজন প্রধান দেশনায়ক অপসৃত হইলেন। প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক, শাসনসংস্কারপ্রার্থী ধীর রাজনীতিক, বিজ্ঞ ব্যবহারাজীব ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী তাঁহার আত্মীয় ও অসংখ্য বন্ধুকে শোকসাগরে নিমজ্জিত

করিয়া তাঁহার ক্রয়ডনস্থিত বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার তিরোধানে শোকাকুল। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতির পদে ভারতবর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বরণ করিয়াছিল। বিংশতি বর্ষের অধিককাল ব্যাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অদম্য শক্তি, আন্তরিক স্বদেশভক্তি, সমীচীন পরামর্শ এবং প্রভূত অর্থ দ্বারা তাঁহার দেশের কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ওয়ালথ্যামষ্টো হইতে পার্লিয়ামেন্টের সদস্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু দুশ্চিকিৎস্য রোগের তাড়না তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করে এবং সেই রোগ আজ অকালে মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে



রমেশচন্দ্র দত্ত

মৃত্যুমুখে পাতিত করিল। দীর্ঘকাল রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বদা ধীরভাবে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য ও আদর্শ নব্য ভারতীয়গণকে স্বদেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শিত করুক, তাঁহারা যেন অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত দেশের কাজ করেন—কিন্তু ধীরতা ও বিবেচনার সহিত। যদি আমরা খাঁটি হই তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি আমাদেরই নিজের হাতে।

লণ্ডনের স্মৃতি-সভায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন :

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার তিরোধানে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে যে কোনও যুগে মানবজাতি দরিদ্র হয়। ভারতবর্ষে, তাহার বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তনকালে, যখন চতুর্দ্দিকে নানা কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, তাঁহার তিরোভাব একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দুর্ঘটনা এবং যদি আমরা বলি যে আমাদের ক্ষতি অপূরণীয় তাহা হইলে অতিরঞ্জিত বাক্য বলা হইবে না। আমরা সকলেই জানি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের দেশের একজন অতি উৎকৃষ্ট ও খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব ছিলেন। যদি তিনি আর কিছু না হইয়া শুধু তাহাই হইতেন তাহা হইলেও তাঁহার উদ্দেশে প্রকাশ্যভাবে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় জীবন পরিপূর্ণ হইতে গেলে তাহা বহুমুখী হওয়া আবশ্যক এবং যিনি, যে কোনও ক্ষেত্রেই হউক না কেন, ভারতীয়ের নাম গৌরবান্বিত করেন তিনি আমাদের জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত করেন এবং তাঁহার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন অপেক্ষা মহত্তর কার্য্যের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। তিনি একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী দেশনায়ক, অক্লান্ত দেশসেবক ছিলেন—যাঁহার মনের উদারতা ও আত্মার মহত্ত্ব তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, তাঁহার উচ্চারিত প্রত্যেক বাক্যে প্রকটিত হইত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তীক্ষ্ণ, সবল ও ব্যাপক বুদ্ধির, আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তির, অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ শক্তির, হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতায়, অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতার এবং কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার গুণে যে কোনও ক্ষেত্রেই তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন তাহাতে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন; মানব জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁহার সুদূরপ্রসারিণী, তাঁহার গভীর ও একাগ্র অনুভূতি এবং বিরাট প্রতিভা দেশের সেবায় নিয়োজিত করিতে তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সৌম্য আকৃতি, অপূর্ব্ব সৌজন্য ও মধুর ব্যবহার, তেজঃ ও সংযমের অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহাকে দর্শনমাত্র একজন মানুষের মধ্যে মানুষ বলিয়া তাঁহাকে পরিচিত করিত। এরূপ ব্যক্তি যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর দেখা যাইবে। যে দেশে স্বায়ত্তশাসন আছে সে দেশে জন্মিলে তিনি প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিতেন। ভারতবর্ষে আমরা তাঁহাকে দুইবার জাতীয় রাষ্ট্রসভার সভাপতির পদে বরণ করিয়াছিলাম এবং আরও উল্লেখযোগ্য এই যে যখন এই প্রতিষ্ঠান ২১ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ একমত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেই নেতৃত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিয়াছিল। সেই সময় হইতে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আর দুই তিন জন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহার সময় এবং অনেকে হয়ত জানেন না, প্রভূত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। উহার জন্য যাহা কিছু উদ্বেগ তিনি সানন্দে সহ্য করিয়াছেন, উহার সাফল্যের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কংগ্রেস সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা করিত। তাঁহার অকুতোভয়তা ছিল অপূর্ব্ব এবং বিপদের সঙ্গে সঙ্গে উহা বৃদ্ধি পাইত। তাঁহার সাহস এবং সুন্দর বিচারশক্তি সতত তাঁহার দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হাল ধরিয়া থাকিলে সকলেই নিরাপদ জ্ঞান করিত। তাঁহার বাগ্মিতা হৃদয়কে কম্পিত, উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিত। পক্ষান্তরে তাঁহার সেই ব্যবহারিক বুদ্ধি ছিল যদ্দ্বারা তিনি যাহা লভ্য এবং যাহা অলভ্য তাহার

পার্থক্য বুঝিতে পারিতেন এবং যখন প্রয়োজন হইত তখন সংযমের রাশ তাঁহার অপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে কেহ টানিয়া রাখিতে পারিতেন না। যেখানে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হয় সেই বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে, আমার স্মরণ হয়, একাধিকবার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দূরদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব উদ্দাম-প্রকৃতির সভ্যগণের বিচার বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছিল এবং যেখানে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল তথায় শান্তি স্থাপিত করিয়াছিল। এরূপ নেতার বিয়োগে যে ক্ষতি হইল তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা আমার নাই এবং তিনি এমন সময়ে চলিয়া গেলেন যখন তাঁহার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক, যখন কংগ্রেসের তরী তরঙ্গসঙ্কুল বারিধিতে দিশাহারা হইবার চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আজ ভবনদীর ওপারে, কিন্তু তিনি একেবারে আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যান নাই। একটি মহৎ আদর্শের অমূল্য ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবার জন্য, তাঁহার স্মৃতি পূজা করিবার জন্য। সর্ব্বোপরি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন সেই প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানটি তাঁহার এত প্রিয় ছিল এবং যাহার তিনি এত সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজি আমাদের এই শোক আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্ত্তব্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং আমরা আমাদের ক্ষমতা অনুসারে এবং দেশের প্রয়োজন অনুসারে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব এই সংকল্প গ্রহণ করাই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের একমাত্র উপায়।



উমেশচন্দ্র (সপরিবারে)

দাদাভাই নৌরোজী বলেন :—

"উমেশচন্দ্রের উক্তিগুলি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় যুক্তিযুক্ত এবং দূরদর্শী যেহেতু উক্ত উক্তিগুলি অনেক গবেষণার ফল। তিনি অযথা গর্ব্ব বা উল্লাস প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি ও তাঁহার সহযোগীরা যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার স্থায়িত্ব দেখিয়া এবং তাঁহার আশা সফল হইতেছে দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষা কেহ এত বেশী আহ্লাদিত হন নাই। কংগ্রেসের জন্ম হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত কংগ্রেসের জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।



দাদাভাই নৌরোজী

কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি যথোচিত পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখাইতেন। তাঁহার উপদেশ এবং নেতৃত্ব তাহাদের মন্ত্রণা সভায় সর্বদাই মূল্যবান বিবেচিত হইত ও গুরুত্ব আরোপিত করিত। তিনি ব্যবসায়ে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। তাহা অপেক্ষা তাঁহার নির্ভীকতা ও স্বদেশানুরাগ তাঁহাকে বিখ্যাত করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ কর্মী পাওয়া দুর্লভ এবং সকলে তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সান্ত্বনা পাইবে। তাঁহাকে হারানো অতি দুঃখের বিষয়—যদিও যাঁহারা তাঁহাকে হারাইয়াছে তাহারা কখনও তাঁহাকে কিম্বা তিনি ভারতবর্ষের যে মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার কথা কখনও বিস্মৃত হইবে না।" (ক্রমশঃ)

"চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের নাট্য-কাহিনী ও ইতিহাসের মর্য্যাদা

অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ,কাব্যতীর্থ

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তদস্তদেবেতরো জনঃ—এই কারণেই শ্রেষ্ঠদের আচরণ বিষয়ে বিশেষ সংযম ও সতর্কতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যাহা প্রমাণ করেন, সাধারণ লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে বলিয়া তাঁহাদের অসতর্কতা, অসংযম এবং ভ্রান্তির সহিত অনেক অসত্য ব্যাপক বিস্তারলাভ করিয়া বসে, আবার অনেক সত্য প্রাপ্য মর্য্যাদা লাভে বঞ্চিত হইয়া কোণঠাসা হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রেষ্ঠদের অসতর্কতা এবং ভ্রান্তি (মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটে) বিশেষভাবে সংক্রামক এবং সাংঘাতিক। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি শুধু যে তাঁহার নিজের পক্ষেই সত্য তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য।

সাহিত্য সমালোচনাক্ষেত্রে যাহারা ইতর অর্থাৎ অতি সাধারণ, তাহাদের সৌখীন মন্তব্য ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াই শব্দ-তরঙ্গে মিলাইয়া যায় বা অন্য কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিলেও নগণ্য বলিয়া মনে স্থান পায় না। ফলে ইতরের অসতর্ক ও যদৃচ্ছ মন্তব্য, সত্য মিথ্যার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া জগতের মঙ্গল বা ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা প্রখ্যাতধী সমালোচক, সমালোচনা-কালে যাহাদের মন্তব্য সকলেই আশা করেন তাহাদের একটী হাঁ বা একটী "না" কাহাকেও ভাসাইয়া বা তলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে—তাহাদের সমালোচনা, অনেক সময় জনপ্রিয়তার মস্তক একেবারে চর্ব্বণ করিতে না পারিলেও, পাঠকের বিচার-বুদ্ধিকে ঘোলাটে করিয়া, বিচারের সাবলীল গতি যে ব্যাহত করিতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাঠ্য-পুস্তকের সমালোচনা আরো গুরুতররূপে বিবেচ্য এই কারণে যে, ছাত্র ও অধ্যাপক উভয়ের মস্তিষ্কই ঐ সমালোচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়; ছাত্ররা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে এবং অধ্যাপকগণ ব্যাপ্তি ও গভীরতা মন্থন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের অনুবর্ত্তন করেন। এই সকল ক্ষেত্রে সমালোচকদের ভ্রান্তি যার পর নাই মারাত্মক, কারণ গুরু ও ছাত্রপরম্পরা এই ভ্রান্তির মায়ায় সত্যের স্বরূপ দেখিতে পারে না।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানি বি-এ ও এম-এ উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় নাটকখানির প্রামাণিক সমালোচনা, ছাত্র-অধ্যাপক উভয়ের নিকটই অতি-কাম্য এবং বহুমূল্য। বিখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে অধ্যাপকরা কৃতকৃত্য এবং তৃপ্ত হন এবং ছাত্রগণ তাহা পরম সমাদরে টুকিয়া রাখে—উত্তরপত্রে হুবহু লিখিয়া দিয়া বেশী সংখ্যা পাওয়ার আশায়। অধ্যাপক বলিয়া এবং চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানির অধ্যাপনার ভার আমার উপর ন্যস্ত বলিয়া নাটকখানি সম্বন্ধে বিবিধ সমালোচনা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং স্বকীয় মন্তব্যও স্থির করিতে হইয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা-কালে—অর্কে চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ—ন্যায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাংলা সাহিত্যের কথা' নামক গ্রন্থখানি উলটাইয়া দেখি।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভা সম্বন্ধে আমার ধারণা—নাট্যকারের অনুকরণে বলি—'প্রথম বাধা পেল সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায়, সেখানে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানি সম্বন্ধে এক কথায় রায় দিয়া ফেলিয়াছেন—"অভিনয়ে ভাল উতরাইলেও নাটক হিসাবে প্রাণহীন" শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে শুধু যে উদাসীনই নহেন, বেশ বিরূপও—এমন একটা সন্দেহ সেইদিন কেন যেন মনে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই সন্দেহ যে সত্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) প্রকাশে প্রমাণিত হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

এই প্রবন্ধে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমি সবিনয়ে এবং যুক্তি-সহকারে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক উক্ত গ্রন্থে চার-পাঁচ-পংক্তির মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের সমালোচনা শেষ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সংলাপের অসঙ্গতি চরমে উঠিয়াছে, অত্যধিক নাটকীয় ঘটনার স্রোতে পড়িয়া কোন চরিত্রই বিকশিত হইতে পারে নাই। সংলাপের বাহুল্যে ও বৈষম্যে নায়ক চাণক্যের ভূমিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাট্য-কাহিনীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে।" অধ্যাপক সেন মহাশয়ের বক্তব্য নিশ্চয়ই এই যে, চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যে কাহিনী নাট্যকার রচনা করিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সমর্থিত নহে; ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত-কাহিনী যে-ভাবে পাওয়া গিয়াছে, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা গ্রহণ না করিয়া স্বকপোলকল্পিত কাহিনী জুড়িয়া দিয়াছেন এবং উল্লিখিত

ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ইতিহাসে যতখানি দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য লইয়া আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা রক্ষা করেন নাই, তথা চরিত্রগুলি নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রতিপাদ্য এই যে—দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে একটু-আধটু উপেক্ষা করেন নাই, ইতিহাসের মর্য্যাদাকে নাট্যকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন।

এখন আমরা যদি দেখি যে নাট্যকার ইতিহাসকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই নাট্য-কাহিনী বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং মুখ্য ঘটনা ও চরিত্র চিত্র ইতিহাসানু-মোদিতই হইয়াছে, তাহা হইলে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্যকে অযথার্থ বলিয়া ঘোষণা না করিয়া উপায় নাই।

এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণায় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় (ক) যে মৌর্য্য (মুরার পুত্র ?) চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে নন্দকে পরাভূত করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন, তাহার অতুলনীয় শৌর্য্য বীর্য্যের কাছে গ্রীক সেনাপতি সেলুকসকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং কন্যা-বিনিময়ে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হয়। অনেকে বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; দেখা যাইতেছে যে চাণক্যের সাহায্যে হৃতরাজ্য উদ্ধার করা—নন্দবংশের অবসান ঘটানো, পরাজিত গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের কন্যার সহিত পরিণয় বন্ধন, বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—চন্দ্রগুপ্তের জীবনের এই সকল বৃত্তান্ত ইতিহাস স্বীকৃত।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তির উপরেই নাটকখানির বহু-প্রকোষ্ঠযুক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার চন্দ্রগুপ্ত, কৌটিল্য-রাজ চাণক্যের সাহায্যে নন্দকে পরাভূত করিয়া সম্রাট হইয়াছেন, বাহুবলে গ্রীক সেনাপতি সেলুকসকে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাহার কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের প্রথম দৃশ্যে, দিগ্বিজয়ী সেকান্দারের সম্মুখে চন্দ্রগুপ্তের মুখপাত্রে হিন্দুবীরের অসীম শৌর্য্যের নিদর্শন উপস্থিত করিয়া, নাট্য-কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রগুপ্তকে বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিগ্বিজয়ী বীর রূপে অঙ্কিত করিয়া ইতিহাসেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। এক কথায় বলা চলে, ইতিহাসের চন্দ্রগুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে পড়িয়া কোথাও বিবর্ণ হইয়া পড়েন নাই। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত- কাহিনীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা উপেক্ষিত হইয়াছে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে তিনটী জাতির কাহিনী-ধারা সম্মিলিত করা হইয়াছে। প্রথম ধারায় আর্য্য (নন্দবংশ ও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত এবং ব্রাহ্মণ চাণক্য কাত্যায়ন প্রভৃতি), দ্বিতীয় ধারায় গ্রীক সেলুকস হেলেন এ্যাণ্টিগোনাস প্রভৃতি এবং তৃতীয় ধারায় পার্ব্বত্য রাজবংশীয় চন্দ্রকেতু ও ছায়া। প্রথমতঃ এই তিন ধারার সম্মিলনের ঐতিহাসিকতা এবং দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ধারান্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিলে নাটকখানির ঐতিহাসিকত্বের সম্পূর্ণ আলোচনা করা হইবে।

এখন প্রথম ধারার ঐতিহাসিকতা পূর্ব্বেই আলোচিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ধারার ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের লেখা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়; তাহারা লিখিয়াছেন—"তিনি (সেলুকস) পঞ্জাব জয়ের আশায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে তাহার উদ্যম ব্যর্থ হইল। কেবল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন না, বর্ত্তমান আফগানিস্থান ও বালুচিস্থানের কয়েকটি প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে হইল। দুই রাজবংশের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রগুপ্ত-কাহিনীতে যে গ্রীক অধ্যায় যোজিত হইয়াছে তাহা ইতিহাস-সমর্থিত। তৃতীয় ধারায় উপন্যস্ত পার্ব্বত্য জাতির সাহায্য গ্রহণের বৃত্তান্ত, পুরাণে বা গ্রীক ইতিহাসে উল্লিখিত না থাকিলেও প্রাচীন ঐতিহাসিক কাব্য "মুদ্রারাক্ষস" রচনার পরবর্ত্তী কাল হইতে প্রায় ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে এই বৃত্তান্তকে সমর্থন না করিলেও সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া সমস্বরে ধিক্কৃত করেন নাই; চন্দ্রগুপ্তের জীবনী আলোচনা-কালে তাহারা মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত নাট্যকাব্যের উল্লেখ করিয়াও থাকেন। সুতরাং পার্ব্বত্য ধারার মিলনকে মর্য্যাদানাশক ইতিহাস-প্রতিকূল যোজনা বলিবার কারণ নাই। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মুখ্য রেখাঙ্কনে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা কোনদিক দিয়াই উপেক্ষিত হয় নাই।

প্রতি ধারার বিশেষ বিশেষ চরিত্র আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখি—চন্দ্রগুপ্তে ইতিহাসের রেখা ও বর্ণ প্রধানতঃ অক্ষুন্ন। চন্দ্রকেতুর সহিত বন্ধুত্বস্থাপন, পার্ব্বত্য জাতির সাহায্য গ্রহণের বৃত্তান্ত সংরক্ষণে এবং ছায়ার সহিত সম্বন্ধ নাটকীয় প্রয়োজনে। নন্দ সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব থাকায় কবি তাহাকে প্রয়োজনানুরূপ রূপ দিতে পারেন বা কোন কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়াও তাহার চরিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। তাই, নন্দের ঐতিহাসিকতা প্রশ্নের বাহিরে। বাচাল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য কল্পিত, লঘু চরিত্র। মুরা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য এই—"কেহ কেহ বলেন যে তাহার মায়ের বা পিতামহীর নাম ছিল মুরা। অনেকের মতে এই নাম হইতে মৌর্য্য নামের উৎপত্তি। তাহারা বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেরই শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান (ভাঃ ইঃ—সেন ও রায়চৌধুরী)। যেখানে মতদ্বৈধ

(ক)—(১) The oxford History of India—Smith page 72-74

(২) Ancient India. Its invasion of Alexander the great by Mc. Grindle (page 404-410)

(৩) Political History of Ancient India—Ray-Chaudhuri—(page—214-222)

(খ) ভারতবর্ষের ইতিহাস (সেন ও রায়চৌধুরী প্রণীত) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ৪৭ পৃষ্ঠা।

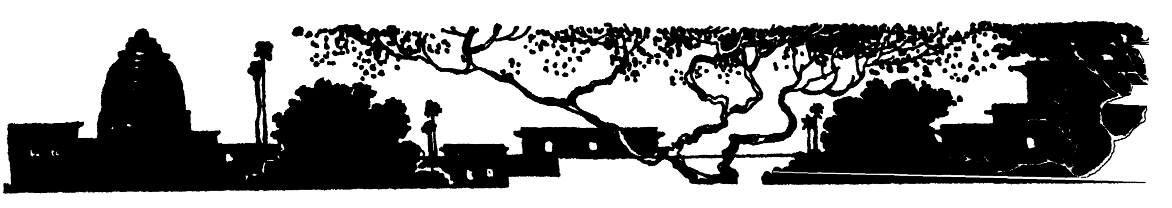
বর্ত্তমান সেখানে কোন একপক্ষ অবলম্বন করিলে ইতিহাস প্রতিকূলতা দেখান হয় না। সুতরাং মুরা যে ষোল-আনা ঐতিহাসিক এ বিষয়ে ইতিহাস প্রমাণ এবং যিনি মুরাকে শূদ্রা এবং চন্দ্রগুপ্তের জননীরূপে অঙ্কিত করিবেন তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবেন না।

প্রধান চরিত্র চাণক্য—বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কূট—ইতিহাসের বুদ্ধিসর্ব্বস্ব কৌটিল্য, হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বন্দ্বে বিক্ষিপ্ত অপূর্ব্ব চাণক্য মূর্ত্তিতে পরিবর্দ্ধিত। চাণক্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বার্ত্তা এই—কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে—(ভারতবর্ষের ইতিহাস, সেন ও রায়চৌধুরী)। চাণক্যের জীবনে অন্যান্য যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা "মুদ্রারাক্ষস" নাটক হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বীভৎসের উপাসক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংস্র কৌটিল্যের পাশাপাশি সুন্দরের প্রসাদ-বুভুক্ষু, স্নেহার্দ্র চাণক্য, ব্রাহ্মণের আদর্শে ফিরিয়া যাইবার জন্য যাহার ব্যাকুল হৃদয় অনুতাপের বন্যায় দুকূল প্লাবিত করিতেছে, এ চাণক্যের সবটুকু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি। অনেকে চাণক্য চরিত্রটীর অন্তর্নিহিত নানা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সংলাপে শুধু "বাহুল্য" এবং উক্তিতে শুধু 'বৈষম্য' দেখেন; তাঁহাদের সমালোচনায় চাণক্য একটী নষ্ট ভূমিকা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সেন মহাশয় সমালোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"সংলাপের বাহুল্যে ও বৈষম্যে নায়ক চাণক্যের ভূমিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে"। চাণক্যের চরিত্রের নানা ব্যক্তিত্বময় অন্তঃস্থলে যাহারা প্রবেশ করিতে না পারিবেন তাহারা চাণক্যের সংলাপে বাহুল্য ও বৈষম্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে বাধ্য এবং ইতিহাসের কৌটিল্য চাণক্যের নানা ব্যক্তিত্বের একটী মাত্র। সুতরাং বলা যাইতে পারে কৌটিল্যের অভাব উপলব্ধ না হওয়ায় চাণক্য চরিত্রটীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা উপেক্ষিত হয় নাই। চন্দ্রকেতুকে ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিলে যে অন্যায় করা হয় না, তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'ছায়া'র ঐতিহাসিক কায়া না থাকিলেও ইতিহাসকে কলুষিত করে না; তাহার নীরব এবং উদার প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রেমের মাধুর্য্যকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। ঐতিহাসিক কাব্যে ইতিহাসের প্রতিবন্ধক না হইলে ছায়ার ন্যায় কায়াহীন চরিত্র সৃষ্টি করা চলে এবং তাহা কবির পক্ষে শ্লাঘার কথা, তেমনি ইতিহাসের মর্য্যাদার পক্ষেও দুশ্চিন্তাজনক নহে। গ্রীক ধারার সেকেন্দার সেলুকস এ্যান্টিগোনাস নামতঃ এবং অনেকাংশে কার্য্যতঃও ঐতিহাসিক। হেলেন হিসাবে অনৈতিহাসিক হইলেও "সেলুকস কন্যা"রূপে ঐতিহাসিকতা দাবী করিতে পারে। হেলেনকে বিদুষী ও আদর্শবাদিনী করিবার স্বাধীনতা কবির ন্যায্য অধিকার, ইতিহাসের মর্য্যাদার ইহাতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

আশা করি, এতক্ষণে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তিসহকারে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমি ঐতিহাসিকত্বের মাত্রা নিরূপণ করিয়াছি এবং এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও পোষণ করি যে নাট্য-কাহিনীতে এবং চরিত্র-চিত্রণে ইতিহাসের মর্য্যাদা কোনভাবেই উপেক্ষিত হয় নাই। অথচ আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-এর মত একখানি বহু-পঠিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক রূপে অধ্যাপক মহাশয়ের খ্যাতি ব্যাপক এবং ব্যাপক বলিয়াই তাহার মন্তব্য, আমার মতে, ব্যাপক ক্ষতি করিতে থাকিবে।

যে কথা ভূমিকায় লিখিয়াছি তাহা স্মরণ করিয়াই, সাহিত্য-সমালোচকদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়কে, তাহার সমালোচনা সংহরণ করিতে অনুরোধ না করিয়া পারিতেছি না। এ ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য—নাট্য-কাহিনীতে কি ভাবে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা, নতুবা সমালোচনা প্রত্যাহার করা। যখন দেখি—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন এবং সাজাহানের (দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সাজাহান শ্রেষ্ঠ—৩৮৯ পৃঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস) মধ্যে "ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা" খুঁজিয়া পান না এবং চন্দ্রগুপ্তের নাট্য কাহিনীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে দেখেন—তখনই তাঁহার "ইতিহাসের মর্য্যাদা" আমাদের স্থা[illegible] দ্রষ্টার কাছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়ের মত ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। "ঐতিহাসিক মর্য্যাদা" কথাটা তিনি কি অসাধারণ তাৎপর্য্যে ব্যবহার করিয়াছেন, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত না হইলে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও এবং মর্য্যাদার সমস্ত পারি[illegible]ভাষিক অর্থ জানিয়াও সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকিবে বলিয়াই আমার ধারণা।

উপসংহারে আমি এই আশা করি যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশ[illegible] লোকহিতার্থে তাহার সমালোচনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে বা তাহা[illegible] সমালোচনার অযথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া মত প্রত্যাহার করিতে কুণ্ঠাবো[illegible] করিবেন না এবং ইহাও আশা করি কলেজের অধ্যাপকগণ এ বিষ[illegible] একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিবেন ও ছাত্রদের ভ্রান্ত মতে[illegible] আবর্ত্ত হইতে যথাসাধ্য উদ্ধার করিবেন।



সংস্কৃত উপাধি মহামহোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

্রো-প্রচলিত পরীক্ষা রীতির সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ও নে পাণ্ডিত্যের জন্য উপাধি প্রদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান রের "ডিগ্রী" এবং "টাইটল্" সংস্কৃতের এক "উপাধি" কথা দ্বারাই াশ করা হয়। কিন্তু 'ডিগ্রী' শ্রেণীর উপাধিগুলি যেমন কোনও এক র্দিষ্ট বিদ্যাশিক্ষার পরিচায়ক হইয়া থাকে, তেমনই কাব্যতীর্থ, ্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি উপাধিও পরীক্ষা-বিশেষ উত্তীর্ণ হওয়ার পর দেওয়া । এই সকল উপাধির জন্য যে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহা পরীক্ষা-সদ বা বোর্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে বিদ্যাভূষণ, ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি উপাধি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ্ত্রবর্গকে নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা সমাপ্তির সাক্ষ্যস্বরূপ প্রদান করিতেন। বহুদিন ্তেই এই সকল উপাধি পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যক্তিবিশেষকে সম্মান স্বরূপ প্রদান ্রিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোনও বিশেষ নিয়মের দ্বারা সন্নিবদ্ধ না ওয়াতে এই সকল উপাধি শিক্ষিত সমাজে উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতেছে । বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ "বিদ্যাদিগ্‌গজ" ভৃতি উপাধি বিদ্রূপাত্মক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুরাজার ামলে উপাধিধারী পণ্ডিতগণ যোগ্যতা অনুসারে বিশেষ "বিদায়" বা ্ক্ষিণা পাইতেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে বিদ্যাসাগর, বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পাধির তুলনাত্মক শ্রেষ্ঠতা বিবেচিত হইত।

বিদেশী হইলেও ইংরাজরাজ সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতা এবং ্বমুখী উৎকর্ষ দেখিয়া ভারতবাসীর বিদ্যা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ীকার করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। মোক্ষমূলার প্রভৃতি ংস্কৃতের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বস্তুতঃ বিদ্যার সাগর ছিলেন। তাঁহাদের ্লান্ত-পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে সাত আট শত বৎসর ব্যাপী ্রাসলেম রাজত্বের সময় প্রাচীন ভারতের যে সম্পদগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত ইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধার ও বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে। পাশ্চাত্য াজনীতি কখনও প্রাচীন বিদ্যা ও সংস্কৃতির ধ্বংস-সাধনের পক্ষপাতী ইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব রক্ষা ইংরাজ-াজের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্ব ্রচলিত অর্থশূন্য উপাধি প্রদানে বাধা না দিয়াও সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ্যুৎপত্তির পরিচায়ক—"শাস্ত্রী," "আচার্য্য," "তীর্থ" প্রভৃতি উপাধি পরীক্ষার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সকল উপাধি নামের পশ্চাতে যোগ করিতে পারেন।

রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, স্যর্ প্রভৃতির ন্যায় মহামহোপাধ্যায়ও একটি প্রকৃত উপাধি বা টাইটল্। ইহা কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্যস্বরূপ "ডিগ্রী" নয় এবং উপাধিরূপে নামের পূর্ব্বেই যোগ করা হয়। পরীক্ষা-বিশেষের সাহায্যে শত শত শাস্ত্রী, তীর্থ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রচারের জন্য যে ভাবে নির্ব্বাচিত করা হয়, সেইরূপে শত শত আই-সি-এস্ সাধারণ রাজকর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি "ভাইসরয়" ও গভর্ণর প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। সম্ভবতঃ সেইরূপ কোনও কারণ-বশতঃই পরীক্ষা দ্বারা মহামহোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত হয় না। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহাদের শিষ্যের শিষ্যগণ বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়া থাকেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন অধিরোহণের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ হইলে যখন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হয়, সেই সময় তদানীন্তন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রচলিত করেন এবং ইহাই স্থির হয় যে প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতি ও প্রসারকল্পে যে সকল হিন্দু পণ্ডিত আত্মনিয়োগ করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবেন, তাঁহারাই এই উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইবেন। এই সঙ্গে ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি নামের পূর্ব্বে বসিবে এবং উপাধিধারী পণ্ডিতগণ দরবার উৎসবে রাজা উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পরেই স্থান পাইবেন। অন্যান্য রাজসম্মান প্রধানতঃ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করে; মহামহোপাধ্যায় উপাধি মূলতঃ গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। উদাহরণ-স্বরূপ একজন মহামহোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবৎসর যাঁহারা রাজকীয় উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। বীণাপাণির মন্দিরে দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর তপশ্চরণের জন্য বহুদিন হইতেই তিনি পণ্ডিত সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া সরকার নিজের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। এস্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রায় তের বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক মহাশয় এই সম্মানের যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় তিনি নিজের চরিত্রগত বিনয়বশতঃ ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদিন পরে কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাকে সংস্কৃত বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজসম্মান প্রদান করিয়া সরকার ভারতের প্রাচীন কৃষ্টির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থান কালে অধ্যাপক প্রসন্নকুমারের অক্ষয় কীর্ত্তি "মানসার" গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপনা হয়। ইংলণ্ডে ডিগ্রী লাভ করিয়া তাঁহার অনু-সন্ধিৎসা ও জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্ত অধ্যবসায়ের প্রভাবে প্রাচীন ভারতের স্থপতি শিল্প বিষয়ক যে সুবৃহৎ গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন, তাহা চিরকালই পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করিয়া এই সুদীর্ঘকাল অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে প্রাচীন স্থপতি শিল্পের মত একটি দুর্ব্বোধ্য ও অচর্চ্চিত বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি মৌলিক গবেষণার যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতের শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডল কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। 'মানসার' বাস্তু শাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। আচার্য্য মহাশয় সাত খণ্ডে এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রায় ৬০০০ বড় মাপের পৃষ্ঠা আছে। প্রথম খণ্ডে শিল্প শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে শিল্পের ত্রিসহস্র পরিমিত পারিভাষিক শব্দসমূহের শব্দকল্পদ্রুমের মত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক রীতিতে মানসার গ্রন্থের সংস্কৃত মূল সম্পাদিত। চতুর্থ খণ্ডে মূলের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। পঞ্চম খণ্ডে মানসার নিয়ম অনুসারে রচিত গৃহাদি ও স্থাপত্যের উদাহরণসমূহ অঙ্কন করা হইয়াছে। ষষ্ঠ খণ্ডে ভারত ও ভারতের বাহিরে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার যে সকল স্থানে ভারতের বাস্তু শিল্প দেখা গিয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম খণ্ড, যাহা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নামে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সহস্রাধিক নক্‌সা সহ গৃহাদির স্থাপত্যের আমূল ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপের নানা দেশের এবং আমেরিকার নানা স্থানের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ একবাক্যে আচার্য্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য, অমানুষিক পরিশ্রম ও সফলতার প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কেবল বিশেষজ্ঞ নহে, প্রায় সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আচার্য্য মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য কেবল প্রশংসা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, আমাদের প্রাচীন শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছেন।

পুরাকালে বেদবেদাঙ্গের উপদেষ্টা উপাধ্যায় নামে পরিচিত হইতেন। পরে মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতে, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, অধ্যয়ন, তপঃ ও দান, এই নবগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে উপাধ্যায় বলা হইত। আর যিনি এত দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন যে নিজের শিষ্যকে ও অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করা হইত। অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্য, ইউরোপ ও ভারতের নানা স্থানে অধ্যাপনা ব্রত অবলম্বন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তিনি বিলাত-ফেরৎ অধ্যাপক হইয়াও সদাচারী যশস্বী হইয়াও নিষ্ঠাবান, আর সুপণ্ডিত হইয়াও নিরভিমান। সুতরাং তাঁহার উপাধির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে ভাবেই করা যাক না কেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে যোগ্যপাত্রেই যোগ্য উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

শেষের দিন

৺কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে ধু ধু করে লেলিহান দারিদ্র্য কঠোর
একা আমি বসে দেখি জনহীন গ্রাম মরুময়—
কল্পনার মায়ামৃগ আজ ভাবি কোথা গেল মোর ?
শৈশবের যাত্রাক্ষণে যার সাথে ছিল পরিচয়।
জীবনের কোলাহল গ্রামে গ্রামে আনন্দ প্রচুর
কে কোথায় গেল চলি ছাড়ি নিজ সাধের ভিটায়—
আনন্দের বেণুবনে সুর কোথা তন্দ্রালু মধুর
বিরহের স্বপ্নলোকে ভরে প্রাণ স্মৃতির জ্বালায়।
জননীর শেষ দিন আজো মাখা গ্রামের কুটীরে
অশোক শেফালী কাঁদে যে ঘরের গুচ্ছ আঙিনায়
তাহার স্মরণে প্রাণ দূরে আজ ভাসে আঁখিনীরে
স্বদেশ জননী মোর প্রবাসীর আনন্দ কোথায় ?
যেথায় যে ভাবে রহি হে জননী তোমা ভুলিব না
প্রবাস বিরহী মন নিত্য রবে তোমার ধুলায়—
অশ্রুর উৎসব মাঝে কুড়াইব স্মরণের কণা
আমার শেষের দিন তব সাথে লইব বিদায়।

চারণ

শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

মুক্তি-পথের আমরা পথিক,
　　দুঃখ-জয়ী চারণ-বীর !
হস্তে মোদের শক্তি-ধনু
　　যুক্ত তাহে প্রেমের তীর।
মায়ের চোখে অশ্রু দেখে
বেরিয়ে এলাম কুটীর থেকে,
জীবন দিয়ে মুছিয়ে দোবো
　　আমরা মায়ের চোখের নীর !!
অত্যাচারীর কৃপাণ দেখে
　　ক'রবো নাকো আমরা ভয় ;
মায়ের পায়ে শিকল বাঁধা,—
　　বাঁধন মোরা করব ক্ষয় !
সত্য-বলে আমরা বলী,
সুমুখ-পথে এগিয়ে চলি,
দুঃশাসনের ভয়ে কভু
　　নুইবে নাকো মোদের শির !!

শরৎচন্দ্রের নববিধান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নববিধান একটি বড় গল্প। ইহা শরৎসাহিত্যে একটি দলছাড়া রচনা। ইহার বিষয়বস্তু ইঙ্গবঙ্গ সমাজের। যদিও ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যথাযথ আবেষ্টনী ইহাতে নাই। শরৎচন্দ্র বিভার মধ্য দিয়া ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মনোবৃত্তিটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ সমাজের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। সাধারণ হিন্দু আদর্শের সহিত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আদর্শের একটা সংঘর্ষ ইহাতে দেখানো হইয়াছে।

শৈলেশ আটশত টাকা মাহিনার (মাহিনাটা বয়স হিসাবে একটু বেশীই) বিলাত-ফেরত অধ্যাপক। গ্রহদোষে বিলাত যাওয়ার আগে তাহার সঙ্গে উমেশ তর্কালঙ্কারের কন্যা উষার বিবাহ হইয়াছিল। শৈলেশের পিতা নব্যবঙ্গের মার্জ্জিত (Refined) হিন্দু, ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়াছিল, মেয়েকে ইংরাজিশিক্ষা দিয়াছিল এবং ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বৈবাহিকের বনিতে পারে না— তাহার বাড়ীতে পণ্ডিত-কন্যার আচরণও প্রীতিকর হইবার কথা নয়। এরূপ বিবাহ ঘটিল কি করিয়া তাহাই বিস্ময়ের বস্তু। ইহাকেই বলে আসল অসবর্ণ বিবাহ।

শৈলেশের পিতা অশিক্ষিতা-গ্রাম্য বালিকা বলিয়া বধূকে ত্যাগই করিল। শৈলেশ বিলাত হইতে ফিরিল—পিতা বধূকে আনাইলেন না। শৈলেশও পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীর জন্য ব্যস্ত হইল না। ইঙ্গবঙ্গসমাজেই তাহার আবার বিবাহ হইল। নির্লজ্জ ও সহসা পিতৃভক্ত হইয়া সে হিন্দু আইনের ও সমাজের সুবিধাটুকু গ্রহণ করিল। একটি পুত্র রাখিয়া সে বধূ দেহত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে সে অন্যত্র বিদুষী কন্যার সহিত বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। শৈলেশ বিলাতী সভ্যতার দোষগুলি পাইয়াছিল, গুণগুলি পায় নাই। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি যে তাহার কর্ত্তব্য আছে তাহা সে ভুলিয়াছিল। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কাছে নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলা মাত্রই 'পাগল'। কাজেই পাগলীকে লইয়া কি করিয়া ঘরকন্না করা যাইতে পারে, ইহাই তাহার মস্ত বড় সমস্যা হইয়াছিল।

যাহাই হউক সে কতকটা লোকলজ্জাভয়ে, কতকটা নিজের প্রয়োজনে, উষাকে আনাইল। অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও দ্বিধা লইয়াই সে পত্নীর নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু দেখিল সে রূপবতী-ত বটেই, তাহা ছাড়া খুবই গুণবতী। তাহার ছন্নছাড়া ভৃত্যশাসিত সংসারে এইরূপ গৃহিণীর খুবই প্রয়োজন ছিল। উষার গভীর প্রেমও তাহার অন্তরস্পর্শ করিল —সেও ভালবাসিয়া ফেলিল। কিন্তু সর্ব্বনাশ করিল তাহার ভগিনী বিভা। সে ইঙ্গবঙ্গসমাজের কন্যা ও বধূ। নিষ্ঠাবতী নারীর প্রতি তাহার ঘৃণা মজ্জাগত—উষাকে সে তাহাদের সমাজে অপাংক্তেয় মনে করিতে লাগিল। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের পুরুষদের একটা culture থাকে বলিয়া তাহারা নিজেদের সমাজের গলদ কোথায় তাহা বুঝে এবং হিন্দুর আচার নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতার মধ্যে কতটুকু সৎ ও মহৎ তাহাও বুঝে। তাই বিভার স্বামী ক্ষেত্রমোহন এই নিষ্ঠাবতী বধূর মহিমা উপলব্ধি করিল। বিভা কিন্তু করিল না। কারণ, বিভা পাইয়াছে ঐ সমাজের বাহিরের আবরণটুকু, কিন্তু কোন culture তাহার নাই।

শরৎচন্দ্র ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যে সব দোষ আছে তাহা লইয়া বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই। কেবল এ সমাজের জীবনযাত্রা যে অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও ঋণাভিমুখী এবং নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলাই যে আদর্শ গৃহিনীপনার দ্বারা এই সমাজের লক্ষ্মীছাড়া পুরুষগুলোকে ঋণজাল হইতে বাঁচাইতে পারে তাহাই জোর দিয়া বলিয়াছেন। শৈলেশের স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই শৈলেশের ভৃত্যতন্ত্রশাসনের সংসারে শৃঙ্খলা ও শ্রী ফিরাইয়া আনিল। এই শৃঙ্খলা ও শ্রীর যে কোন মূল্য আছে, বিভা তাহা বুঝিত না—যদিও শৈলেশ বেশ বুঝিয়াছিল। বিভার আক্রমণে তাহার এই সুবুদ্ধি স্থায়ী হইল না। শৈলেশ দেখিল—ইহা লইয়া তাহার একমাত্র ভগিনীর সহিত মনোমালিন্য ঘটিয়া যায় এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজে স্ত্রীর জন্য সে অপাংক্তেয় হইয়া পড়ে। শৈলেশের স্ত্রী তেজস্বী পিতার কন্যা—তেজস্বিনী। সে স্বামীর মানসিক শান্তির জন্য আত্মসৌভাগ্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। শৈলেশের অন্তরের ইচ্ছা ছিল না যে সে ফিরিয়া যায়। কিন্তু নিজের সমাজে মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এবং ভগিনীর প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমানবশে সে বাধা দিল না। তারপর হইতে শৈলেশের অন্তরে দারুণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। শরৎচন্দ্র এই মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। কেবল শৈলেশের পরবর্ত্তী আচরণে তাহার অপরাধের অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়াছেন।

পত্নীকে পতির সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে—ইহাই প্রচলিত সংস্কার। ইঙ্গবঙ্গ সমাজও ইহা অস্বীকার করে না। কিন্তু পতিকে পত্নীর সহধর্ম্মী হইতে হইবে ইহা আজিও যেন সংস্কারের বাহিরে। যে প্রেম পত্নীকে পতির সহধর্ম্মিণী হইবার প্রেরণা দেয়, সেই প্রেমই যে পতিকে পত্নীর সহধর্ম্মী হইবার প্রেরণা দিবে তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে? কলিকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের ও বিভার কড়া শাসনের বাহিরে গিয়া শৈলেশ যেমনই মুক্তির স্বাদ পাইল তেমনি তাহার চিত্তে অপমানিত লাঞ্ছিত প্রেম তাহাকে দুর্দ্দম বিক্রমের সহিত আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইল। শৈলেশের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়া গেল। যে-আত্মীয়সমাজের ভ্রূকুটিতে সে প্রেমের অপমান করিয়াছিল—শৈলেশ সে-আত্মীয়সমাজ হইতে বহু দূরে সরিয়া গেল। নিজ পত্নীর নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য নহে— বিভাদের কাছ হইতে বহুদূরে পলাইবার জন্যই সে হিন্দুত্বের চরম

গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিল। এতদূর গোঁড়ামি উষার পক্ষেও অসহ্য। শৈলেশ হিন্দুয়ানির চরম গোঁড়ামি আশ্রয় করিয়াও ভগিনীর নিকট বর্জ্জনীয় নয় কেন? হৃদয়ের বন্ধনের জন্য। তাহাই যদি হয় তবে নিষ্ঠাবতী হওয়ার জন্য পত্নী কেন বর্জ্জনীয় হইবে? হৃদয়ের বন্ধন তো সেখানে নিবিড়তর। বিভাকে শৈলেশ তাহার আচরণের দ্বারা কি এই শিক্ষাই দিল?

শৈলেশ গোঁড়া হিন্দু হইয়া গুরু, গোস্বামী ও ভাগবতের ভক্ত হইল। বিভা মনে করিল—পল্লীগ্রামের মেয়েমানুষ হয়ত কোন মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন তুক্‌তাক্ করিয়া গিয়াছে। তুক্‌তাকের শক্তিকে ইঙ্গবঙ্গসমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে না, কিন্তু সাহেব-শৈলেশের এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন বিভাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাই তাহার মনে এইরূপ একটা অবৈজ্ঞানিক সন্দেহ হইল। ক্ষত্রমোহন শিক্ষিত ব্যক্তি—তিনি ঠিক্ ধরিয়াছিলেন—"উষাকে তোমার দাদা সত্যই ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমেনের মাকে কোনদিন বাসে নি। এসব হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া।" কিন্তু শৈলেশের পক্ষ হইতে ইহা নিজের জীবনব্যাপী অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত—সহধর্ম্মিণীকে পাইবার জন্যই যেন ইহা তপস্যা। বিনা তপস্যায় উষার মত আদর্শ গৃহিণী বা গৃহলক্ষ্মীকে পাওয়া যায় না।

শৈলেশ বিলাত হইতে আসার পর উষা নিজে জোর করিয়া আসে নাই। সে বুঝিয়াছিল স্বামীর আশ্রয়ে তাহার স্থান হইবে না—দাসী হইয়া সে থাকিতে পারে, জীবনসঙ্গিনী সে হইতে পারিবে না। নিজের নারীত্বের মর্য্যাদার সহিত পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সে তপস্যা করিতেছিল। শৈলেশের স্ত্রীবিয়োগের পর তাহার আসিবার কথা—কিন্তু নারীত্বের মর্য্যাদাহানি করিয়া সাধিয়া সে স্বামীগৃহে আসে নাই। সেখানে যে তাহার সগৌরব স্থান হইবে—তাহার কোন লক্ষণ সে পায় নাই। কিন্তু যখন তাহাকে আনিতে পাঠানো হইল তখন সে আগ্রহের সহিতই আসিল। ইহাই তেজস্বিনী উষার পক্ষে স্বাভাবিক। আসিয়াই সে গৃহকর্ত্রীর আসনটি দখল করিয়া বসিল। ক্রমে সে নিজের আচারনিষ্ঠা ও স্বামীর অনাচারী স্বভাবের মধ্যে একটা সন্ধিসামঞ্জস্য ঘটাইয়া লইতেই চেষ্টা করিয়াছিল। প্রেমই ইহার বন্ধন-সূত্র। শৈলেশও ক্রমে স্ত্রীর আদর যত্নে বশীভূত হইয়া পড়িতেছিল। মাঝখান হইতে বিভা আসিয়া উষার নারীত্বের মর্য্যাদা বুঝিল না—প্রেমের মূল্যমর্য্যাদাও উপলব্ধি করিল না—শৈলেশকে বুঝাইল যে সে স্ত্রৈণ হইয়া ইঙ্গবঙ্গসমাজের সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। দুর্ব্বলচিত্ত শৈলেশের মন তখনও প্রস্তুত হয় নাই—সেও উষার প্রেম ও নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না। উষা দেখিল এখনও সময় হয় নাই। সে নিজের নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সময় থাকিতেই সসম্মানে বিদায় লইয়া গেল। কিন্তু সে শৈলেশের চিত্তে যে প্রভাব সঞ্চার করিয়া গেল—ক্রমে তাহার ক্রিয়ার আরম্ভ হইল। এলাহাবাদ যাইবার সময় শৈলেশ তাহার ভগিনীর কাছে সোমেনকে না রাখিয়া যখন সঙ্গেই লইয়া গিয়াছিল তখনই বিভার বুঝা উচিত ছিল—শৈলেশের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়াছে। তারপর বিভা ও তাহার সমাজের সবচেয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে জীবনযাত্রায়, শৈলেশ অন্তর্গূঢ় অভিমানবশে সেই জীবনযাত্রার চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌঁছিল।

উষা স্বামীর সংবাদ নিশ্চয়ই রাখিত, সে বুঝিল যে এইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে গোঁড়া হিন্দু হইয়াছে বলিয়া নয়, সে ভগিনীর ভ্রূকুটির ভয়কে জয় করিয়াছে বলিয়াই সে বুঝিল, এইবার সে আপন সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ধর্ম্মোন্মাদনা হইতেও স্বামীকে বাঁচাইবার প্রয়োজন। স্বামী গোঁড়া হিন্দু হইয়া মালা জপ করুক ইহা সে কোনদিনই চাহে নাই। হিন্দুর শান্ত সংযত জীবনযাত্রার সহিত বিজাতীয় জীবনযাত্রার একটা সন্ধি সামঞ্জস্য করিতে সে চাহিয়াছিল। এইবার তাহা সম্ভব হইল। ইঙ্গবঙ্গীয় জীবনযাত্রা যেমন অকল্যাণকর, ধর্ম্মোন্মত্ত জীবনযাত্রাও তেমনি সংসারের পক্ষে অকল্যাণকর। দুইএর সামঞ্জস্যেই গৃহ সংসারের কল্যাণ। এই সত্যটি উষা বুঝিয়াছিল স্বভাবতঃ, অন্যের তাহা বুঝিতে দেরী হইয়াছিল বলিয়াই গল্পটির সৃষ্টি হইয়াছে।

উষা নিজের ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া প্রেমের গৌরব রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল—এজন্য নিজের আজন্মলালিত সংস্কার ও নিষ্ঠার অনেকটুকুই সে ত্যাগ করিতে রাজী ছিল। কিন্তু সে নিজের নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর হাতে ভোগের পুতুল হইতে চাহে নাই। সতী-ধর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিলে নিষ্ঠাবতী উষার উচিত ছিল আবদুলের রান্না নিষিদ্ধ মাংস স্বামীর সঙ্গে একটেবিলে বসিয়া ভক্ষণ করা এবং মেম-সাহেব সাজিয়া তাহার সঙ্গে বিজাতীয় সমাজে অবাধ মেলামেশা করা। কারণ, স্বামীর যে ধর্ম্ম তাহাই পালন করা সতীধর্ম্ম। কিন্তু প্রেমধর্ম্ম তাহা নয়—প্রেমধর্ম্মের সার্থকতা একজনের স্বাতন্ত্র্য অন্যের মধ্যে বিলোপ সাধনে নয়—নারীত্বের সমস্ত মর্য্যাদা স্বামীর মধ্যে বিসর্জ্জনে নয়—দুইজনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দুইএর জীবনের সন্ধি-সামঞ্জস্যে। যে পতি পত্নীর নারীত্ব ও তাহার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না—সে পত্নীকে মনুষ্যত্বের গৌরব হইতে বঞ্চিত করে। বুঝিতে হইবে প্রভুত্বকেই সে পতিত্ব বলিয়া মনে করে এবং পত্নীর প্রতি প্রেম তাহার নাই, সে দাস্য চায়, প্রেম চায় না। উষা প্রচলিত আদর্শের সতীর চেয়ে ঢের বেশী মহীয়সী। বঙ্গসাহিত্যে শরৎচন্দ্র সতীত্বের অভিনব আদর্শ দান করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরে এইরূপ আদর্শের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রমর চরিত্রের নারীত্ব কেবল হৃদয়বৃত্তিরই উপর প্রতিষ্ঠিত। উষার নারীত্ব কেবল হৃদয়বৃত্তি নয়, প্রখর ধী-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনে রাখিতে হইবে ভ্রমর একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের কন্যা, আর উষা শাণিতবুদ্ধি তর্কালঙ্কারের কন্যা। ঠিক্ সুসময়ে নারীমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অচঞ্চল তেজস্বিতার সহিত স্বামীকে সে যদি ত্যাগ করিয়া না যাইত, তাহা হইলে বিভার অত্যাচারে সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইত না, অশান্তিময় সংসারে দাসীত্ব স্বীকার করিয়া নিজের নারীত্বের অবমাননা করিত—পতিকেও সুখী করিতে পারিত না।

ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি এক প্রকারের বস্তু, বৈষ্ণবতার গোঁড়ামি আর এক প্রকারের বস্তু—কোন কোন বিষয়ে মিল থাকিলেও দুইটি পৃথক বস্তু। শরৎচন্দ্র দুই শ্রেণীর গোঁড়ামি এক সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে একটু বেশিমাত্রায় Emphasis দিয়াছেন। অবশ্য আর্টের জন্য শৈলেশকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বহু দূরে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু তাহার একটা কলাসঙ্গত সীমা আছে। শরৎচন্দ্র শৈলেশকে নিজের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার Rationality পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছেন। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে ভারসাম্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মিসরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

(২)

২৮শে সেপ্টেম্বর—৪৪

ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেশ অন্ধকার। পশ্চাতের বারান্দায় বিগ্‌নোনিয়া লতার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট আলোক দিনের আগমনের বার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছিল। আমি একটু প্রার্থনা করে নিলাম। আলো জ্বেলে দেখি ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। তবু বেশ গাঢ় অন্ধকার। বেয়ারা এলে, বললাম গরম জল। বেচারা রাত্রির অভুক্ত সাহেবকে গরম জল ও স্নানের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিল। স্নান শেষ করে এসে দেখি, খানিকটা রুটি, মাখন, চা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে। সকাল বেলার চা পান শেষ করে হোটেলের অফিসে গিয়ে B. O. A. C-কে ফোন করলাম—আমার যাত্রার সময় জানাতে। তারা উত্তর দিলে—নাইট কার্ডে লিখে যাত্রার ছয় ঘণ্টা আগে জানান হবে। তবে সী প্লেনে যে যাওয়া হবে না, এটা ঠিক। Ensigne অর্থাৎ ল্যাণ্ড প্লেনে যাওয়া হবে—বসরা, বাগদাদ, প্যালেষ্টাইন ঘুরে। বসরাতে এক রাত্রি থাকতে হবে, তারপর বাগদাদ। বেশ ভালই, ইরাকটা দেখা যাবে।

বেলা নয়টার সময় বেয়ারা এসে বল্লে, ব্রেক্-ফাষ্ট। অভুক্ত সাহেবকে বেচারা যত্ন করবার জন্য অত্যন্ত সজাগ। হোটেলের সকলেই ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারী ও শ্বেতাঙ্গিনী—একচারিণী অথবা সহচারিণী। আমি একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ। পাশে বিরাট প্রকোষ্ঠের এক অনাড়ম্বর কোনে অতি সংযত হস্তে অনভ্যস্ত ছুরি কাঁটা ব্যবহার করে উপবাসব্রত ভঙ্গ করা গেল। প্রায় দশটার সময় ফিরে এসে ভাগলপুরে একখানা চিঠি লিখলাম। তখন মিঃ ক্ষিতীশ সেন এসে উপস্থিত হলেন। প্রবাসে আত্মীয়বান্ধবহীন স্থানে অপ্রত্যাশিত পরিচিতের সাক্ষাৎলাভে খুব আনন্দ হলো। এরোপ্লেন, সী-প্লেন, সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি যাত্রীবাহী আকাশ-যানের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সংবাদ নিলাম। অনেক নূতন বিষয় জানলাম। কবে কোথায় কখন কোন দুর্ঘটনা এরোপ্লেনে হয়েছে, তার সংবাদও নিলাম। তাঁর সঙ্গে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত গল্প করলাম, মাঝখানে একটার' সময় লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। প্রায় চারটার সময় আবার চা খেয়ে মিঃ সেনের গাড়ীতে সহর ঘুরবার জন্য বেরুলাম। করাচী কি চমৎকার সহর! মরুভুমির মধ্যে কাঁকর ভেঙ্গে এমন সহর তৈরী করা একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। সহর তো ভারতের মধ্যে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বরোদা, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, জব্বলপুর, কলিকাতা—কতই দেখলাম। সব সহরেই স্থানবিশেষ অংশবিশেষ সুন্দর ও পরিস্কার। কিন্তু করাচীর মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পরিস্কার, সুবিশাল পথ, অত্যুচ্চ অট্টালিকা, অদৃশ্য-নিঃসারণী ধূলিকণা-শূন্য পটখণ্ড আর চোখে পড়ে না। সারাদিন মৃদুমন্দ মলয় কচ্ছ উপসাগর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। পরিশ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য করাচীর সিন্ধু-শীকর-সিক্ত বায়ু-হিল্লোল ঢেউ অতি আরামপ্রদ। একটি দিন করাচীতে বিশ্রাম করায় শরীর বেশ সুস্থ ও সবল বোধ করলাম। আর চক্ষু ত সার্থক হলোই।

অনেকক্ষণ সহর ঘুরে মিঃ সেন আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও দু'জন বাঙ্গালী যুবক আছেন—B. O. A. Cর অফিসার। একজন ভাগলপুরের বিভু মুখার্জ্জী, আমার প্রাক্তন ছাত্র। মিঃ সেন আমাকে বল্লেন, কায়রোতে বড্ড শীত, আমার গায়ের গরম সোয়েটার যথেষ্ট নয়। তিনটি 'পুল-ওভার' আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, যেটি পছন্দ হয় নিন। আমাকে কিন্তু-ভাবাপন্ন দেখে হেসে বল্লেন, এই তিনটিই আমার স্ত্রীর হাতের তৈরী। আপনার লৌকিকতা নিষ্প্রয়োজন। জোর ক'রে সব চেয়ে ভাল 'পুলওভার' আমায় দিলেন। বিদেশে এই বন্ধুটির সহায়তা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। জানি তিনি ধন্যবাদপ্রত্যাশী নন, তবু তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজে তৃপ্ত হ'লাম। তারপর B. O. A. Cর প্রধান কার্য্যালয়ে এলাম—বিভু মুখার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করতে। সে এরোপ্লেনের distribution ও weight officer—কে কোথায় বসবে, কোন্ ভার কোন্ অংশে নির্দ্দিষ্ট হবে তাই ঠিক করা তার কাজ—অত্যন্ত দায়িত্বপূণ। বিভুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে—"মাষ্টার মশায়, আপনার ওজন ১৫২ পাউণ্ড। আপনার জন্য খুব ভাল জায়গা প্লেনের ভিতর নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছি।" আপনার এয়ার সিক্‌নেস্ হবে না। কালকে আমরা আপনাকে ভোর বেলা প্লেনে তুলে দেব। আপনার নাইট কার্ড আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় আনন্দ হ'লো, যাত্রার সুবিধার জন্য নয়। প্রবাসে পরম আত্মীয়তার দাবী অনুভব ক'রে।

তার পর হোটেলে ফিরে এসে রাত্রি ১০টার সময় নাইট কার্ড পেলাম। যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা confidential মোহরাঙ্কিত একখানি চিঠি। তাতে লেখা আছে—

Airport of KARACH।

Local Time is 6 hours 3 mins Fast on Greenwich

Currency Coupons (Value 5) may be cashed at Rs 3/5 each.

Enquiries of any kind will gladly be dealt with by the Company's representative :—

Arrangements For Tomorrow. 30. 9. 44. (Date)

(1) You will be called at 5-00 A. M. (Local Time)

(2) Your baggage will be collected at 5-36. A. M. (Local Time)

(3) The Car will leave THE HOTEL at 5-45. A. M. (Local Time)

(4) The air liner is to leave at 7-30. A. M. (Local Time)

MEALS will be Served as follows :—

Breakfast Lunch Tea Dinner	ON BOARD, AT BASARAH,	(3) Prof. Raychowdhury

২৯শে সেপ্টেম্বর ৪৪

ঠিক নাইট কার্ড অনুসারে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো। আমরা ছয়টায় B. O. A. C.র আফিসে এসে উপস্থিত হ'লাম। বিভিন্ন হোটেলের যাত্রী সমবেত হয়েছে। নূতন কয়েকজন যাত্রীও আমাদের সঙ্গী হ'লো। তার মধ্যে একজন মস্কো যাত্রী—জাতিতে পার্শী, বাগদাদে নেমে তেহ্‌রান হয়ে মস্কো যাবেন। আর একজন মাদ্রাজী, ত্রিবাঙ্কুর নিবাসী Silviraj পুণা থেকে চলেছেন মধ্যপ্রাচ্যের Y. M. C. A.এর সেক্রেটারীর কাজ নিয়ে। অন্যান্য বারো জন যাত্রী। আমরা প্রায় ৮ মাইল মোটরে এসে মারী এয়ার ষ্টেশনে পৌছলাম। আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র Censure করা হ'লো, ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেখলো। বেশ কৌতূহলের ব্যাপার। এই কাজটা শেষ হ'তে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগল। এর জন্য রয়েছে ছ'জন ডাক্তার, পাঁচজন কাষ্টম্‌স্ অফিসার, তিনজন ছাড়পত্র-পরীক্ষক, দশজন পুলিশ। বিরাট যজ্ঞ, অথচ কি সামান্য আহুতি।

মারী বিমান-ঘাঁটি অতি বৃহৎ। বহির্ভারতের সমস্ত বিমান এই ঘাঁটিতে অবতরণ করে। অবারিত মাঠ, চারপাশে জনমানব, বৃক্ষলতা কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই; শুধু একখানি বিমানপোত দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রী নিয়ে পশ্চিমের পথে চ'লবে। বিরাট দৈত্য, অতিকায়। অন্ধকার জয় করে আলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করছিল। আমরা প্লেনে উঠামাত্রই এক মিনিটের মধ্যে সে বিমান-দৈত্যের কি বিরাট গর্জ্জন। পাঁচ মিনিট কাল পাঁয়তারা কসে উঠল আকাশের পথে। অন্ধকার তখনও আলোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করছিল। তার রাজত্ব পৃথিবীর বুকে আর কতক্ষণ। একটু পরেই দেখি চলেছে জলের উপর দিয়ে—গাঢ় কালো জল, অন্ধকারে আরো কালো হ'য়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে সাদা পাঁজা তুলার মত মেঘখণ্ডের সংস্পর্শে এসে অন্ধকার আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। অন্ধকারের কোলে সাদা মেঘশিশুগুলির লুকোচুরি খেলা—আলোর অন্তরালে আরো সুন্দর দেখায়। দার্জ্জিলিংয়ের পথেও এই মেঘশিশুর খেলা দেখেছি পাহাড়ের কোলে; কিন্তু সেখানে সবুজ বনস্পতির অন্তরালে; তাই সে সৌন্দর্য্য অন্যরূপ। যাক্ আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্বে আলোরই জয় হ'লো। আমরা পশ্চিম-যাত্রী পুবের আকাশ দেখতে দেখতে চ'ললাম। কিন্তু অরুণ দেবের দেখা আর পেলাম না; মেঘ সূর্য্যের সারথিকে ঢেকে দিয়েছে। আমরা আকাশের বহু উপরে উঠলাম।—আরো উপরে ক্রমশঃ দেখলাম—আমাদের চারিদিকে মেঘ ছুটে আসছে, মেঘের পরে মেঘ, তার উপরে মেঘ। তারা যেন মানুষের হাতে-গড়া বিমান-দৈত্যের আকাশ-অভিযানের বিরুদ্ধে তাদের মৌন প্রতিরোধ জানাচ্ছে। আমাদের বিমান মেঘপুঞ্জকে খণ্ড-বিখণ্ডিত ক'রে বিজয়ী সেনানীর মত জয় গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে চারিদিকে বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করে চলেছে। মানুষ আর প্রকৃতির এই দ্বন্দ্বের শেষ ফল এখনো অনিশ্চিত।

স্থলপথচারী বিমান জলপথচারী বিমান থেকে বোধ হয় বেশী আরামপ্রদ, যদিও করাচীর লোকেরা বলছিল সীপ্লেন বেশী আরামদায়ক। যাক্, আরাম জিনিষটা ব্যক্তিগত। আমাদের বিমান Agrica; মাত্র বারজন যাত্রী নিয়ে চলেছে। একজন বড় সাহেব সস্ত্রীক চ'লেছেন লণ্ডনে। একজন রাশিয়ান মস্কোযাত্রী। আমার পাশে একটি শিখযুবক মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে যাচ্ছেন ছুটি শেষ ক'রে। পশ্চাতে সিলভিরাজ। অন্যান্য সব সৈন্য।

ব্রেকফাষ্ট বক্স ভেঙে আমরা খেলাম—সেই মাংস, ফল, ডিম, মাখন, রুটি—সেই কাঠের কাঁটা চামচে। ফ্লাস্কে রয়েছে জল, বরফ, কফি, চা, লেমনজুস। এবার আমরা প্রায় ১০ হাজার ফিট উপরে উঠেছি। নীল জল, নীল আকাশ, নীল আবেষ্টনে আমাদের এলুমিনিয়ামের তৈরী শ্বেতকায় বিমান চারিদিকের নীলের স্পর্শে নীলাভ হয়ে উঠেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়ায় প্রকৃতি এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। কলিকাতা—করাচীর পথে আমার ঘুম পেয়েছিল। এবার অচেনা পথ যেন আমায় বেশী আকর্ষণ করলে। জল স্থির, বিমান স্থিরগতি, আমি স্থির, চারিদিক নিস্তব্ধ। অসীম শূন্যের মধ্যে একমাত্র বিমানগতির শব্দ, সেটাও আর শব্দ ব'লে মনে হচ্ছে না, কারণ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, মহাকবি কালিদাসের উত্তররামচরিতে রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের যে বিমানযাত্রার বর্ণনা রয়েছে, তার স্মৃতি জেগে উঠল। কালিদাসের বর্ণনার মধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কাহিনী প্রচুর। কিন্তু এখানে প্রকৃতির শূন্যতা ব্যতিরেকে আর কিছুই অনুভব করা যায়না। উর্দ্ধে সীমাহীন আকাশ, নিম্নে দিগন্তব্যাপী লবণাম্বুরাশি, পার্শ্বে বিরাট শূন্যতা—সে শূন্যতা স্পর্শ করা যায়।

সমুদ্র আমার কাছে নূতন নয়, নোয়াখালিতে জন্ম। শিশুকাল থেকে সমুদ্র দেখেছি। চট্টগ্রামে পোতাশ্রয়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগর দেখেছি, অবিশ্রান্ত উর্ম্মিমালার কি বিরাট আলোড়ন। বম্বেতে India Gateএর সামনে দাঁড়িয়ে আরব-সাগর দেখেছি—কি শান্তি, বিরাট প্রশান্তি! মাদ্রাজের সাগর সৈকতে দাঁড়িয়ে ভারত মহাসাগরের উন্মত্ত নর্ত্তন দেখেছি। লবণাক্ত জলধারায় অবগাহন করেছি। সমুদ্র আমার কাছে অতি পরিচিত। কিন্তু আজকের মত আকাশ থেকে এমন কাল, নিস্তব্ধ, স্থির জলরাশি—যা পারস্য উপসাগরে দেখলাম—তেমন আর দেখিনি। মানুষ এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনায়াসে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে।

আমাদের বিমান সাড়ে দশটার সময় জীবানি বিমান কেন্দ্রে (Jiwani Airport) নামল। বেলুচিস্থানের মধ্যেই কোয়েটার ৫০ মাইল দূরে জনবিরল বৃক্ষলতাহীন মরুপ্রান্তর, খিলাতের খান সাহেবের নিকট থেকে ব্রিটীশ এইস্থান বন্দোবস্ত নিয়ে নূতন বিমানকেন্দ্র স্থাপন করেছে, রসিদ আলির বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই। (ক্রমশঃ)

বাসর-শয্যা

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

ব্যাপারটা সাংঘাতিক সন্দেহ নাই, কিন্তু বুঝিতে একটু দেরী হইয়া গেল! বিবাহের হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে, বাসর ঘরেই প্রথম আবিষ্কৃত হইল যে বর একেবারে বদ্ধ কালা!

বদ্ধ কালা হইলে যে লোকে বোবা হইবেই সেকথা কাহারও অজানা নাই। বিবাহ বাড়ীতে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! "কপাল" ফাটিল কনের! নাপিত ছাড়া বরপক্ষের সকলেই চলিয়া গিয়াছে।

বিয়ে বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত বরকে কথা বলিতে কেহ দেখে নাই, বলানর কোন প্রয়োজনও হয় নাই; কিন্তু বাসর ঘরে বর কোন কথা না বলায় এমন কি কোন ভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত না দেখানয়, মেয়েদের কেমন সন্দেহ হয়—বর বোবা নয় তো?

নাপিতকে জিজ্ঞাসা করায় সে একগাল হাসিয়া বলে—"বাবু কানে শুন্‌তেই পান না, তা কথা কেম্‌নে বলবেন!"

নাপিতের কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া সকলের গাপিত্তি জ্বলিয়া যায়, কিন্তু নাপিতের উপর রা'গয়া কোন লাভ নাই।

বর কালা-হাবা শুনিয়াও লোকে যেন বুঝিতে সময় নিল—অবিশ্বাস্য মনে হয় যেন!···উপায় কি হইবে!

কিছুই নয়, খানিকটা সোরগোল হইল প্রথমে। অনেকে ব্যাপারটা ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করিল! বিমর্ষ মুখে নানা রকম মন্তব্য ক'রিতে ক'রিতে অনেকেই বাসরঘর ছাড়িয়া গেল।

কনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা চোখের জল চাপিয়া অন্য ঘরে তাহা ফেলিতে গেলেন। রহিল কেবল কনের দু'একজন অতি-প্রিয় বান্ধবী!···

বর মুখ নীচু ক'রিয়া চুপ্‌টি ক'রিয়া বসিয়া আছে। এই মারাত্মক ব্যাপারের জন্য সে যেন অত্যন্ত লজ্জিত, কিন্তু তাহার যেন কোন হাত ছিল না এই সব বিয়ের ব্যাপারে। কনে বরের দিকে পিছন ফি'রিয়া অঝোরঝরে অশ্রু ফেলিতেছে। বান্ধবীরা সান্ত্বনা দিতেছে!

একজন বলিতেছে—এই জন্যই আগের কালে বর দেখার প্রথা ছিল। কনে দেখা যখন আছে—তা'কে কথা বলান পায়ে হাঁটান, গান গাওয়ান সবই যখন হয়, বিয়ের আগে ছেলেই বা আজকাল দেখা হয় না কেন?

আর একজন ব'লল—কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এরকমের জুয়াচুরি তো কখনও শুনিনি। এ তো দিনে ডাকাতির চেয়ে সাংঘাতিক! সতীর যে এরকম বর জুটবে কল্পনাও করতে পারিনি!

আর একজন বলিল—মুখরা সতী এইবার যে কি করবে ভেবেই পাই না। বাসূনে তুই শ্বশুরবাড়ী। বর হয়েছে হোক্, এখানেই থাকিস্ তুই। যেমন ছিলি তেমনি থাকবি এখানে। কনে যে কি করিবে তাহার কোন কিছুরই কূলকিনারা পাইল না সে! "আমি একটু একেলা থাকতে পারলে যেন বেঁচে যেতাম"—এই কথাটি ব'লি ব'লি ক'রিয়াও সে বলিতে পারিল না। অনেক রকম মন্তব্য শুনিয়া শেষে সে ব'লিয়া ফেলিল—"কিছু মনে করিস্ না ভাই তোরা, আমায় যদি একটু একেলা থাকতে দিতে পারতিস্······" কথাটা কান্নার জন্য শেষ করিতে পারিল না সে!

ঠাট্টা করিবার মত মনোভাব কাহারও ছিল না। কোন রকম মন্তব্য না করিয়া একজন বলিল—একেলা মানে এই ঘরেই তো?

বুকফাটা কান্না সতীকে কোন উত্তর দিতে দিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল সে।

বান্ধবীরা আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সাহস সঞ্চয় করিয়া একজন কেবল বলিল—পারিস তো একটু ঘুমিয়ে পড়, অমন করে দুঃখ করে কি হবে!···

রাত্রি শেষ হইতে দেরী নাই। বর চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে—হয়ত ঘুমাইতেছে। সতী কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া বাসর জাগিতেছে! অনুচ্চ স্বরে সে একবার বলিল—"ভগবান এই আমার কপালে ছিল? কেন, কি অন্যায় করেছিলাম আমি।···সব পূজাই তো ভক্তি ভরে করে এসেছি আমি।···কত শিবপূজা কত ব্রতই না করলাম আমি—এসব কি তবে কিছুই না!"······ তাহার যেন মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়া গিয়াছে! আপন মনে কত কথাই না সে বলিয়া চলিয়াছে!

···আচ্ছা যারা কালা তারা কি কখনও শুনতে পায় না?···বোবাদের মুখে কি কখনও ভাষা ফুটতে পারে না?···কেমন করে আমি জীবন কাটাব?···ওঃ এত কষ্টের এত দৈন্যের এত দুঃখের কুমারী জীবন ভেঙ্গে শেষে এই অবলম্বন পেলাম!···কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছে···

···আমার জীবন দিয়ে সার্থক করে তুলবো আমাদের স্ত্রীজীবন।···এই যদি ইঙ্গিত হয়, হে ভগবান, ওঁর জীবনের আমিই হব কাণ্ডারী, আমিই হব ওঁর ভাষা। গভীর দুঃখে দুঃখী

হয়ে আমিই করবো ওঁকে সুখী; বিদ্রোহ করবো সকলকার বিদ্রূপের ওপর।

সতী স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল—সুন্দর সুপুরুষ ঘুমাইতেছে। পায়ে হাত দিতেই তাহার স্বামী চোখ চাহিল। "আমার এই সব কথা তুমি শুনতেও পাচ্ছ না? আমার মনের কথা কিছু বুঝলে কি? আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। আমার জীবন তোমার পায়ে উৎসর্গ করলাম। কথাটা বুঝলে না বোধ হয়?"

স্বামী তাহার উঠিয়া ব'সল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"বেশ তো, এ আর নতুন কথা কি? বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বোঝাপড়া তো হয়ে গেছে। এতে এত আবোল-তাবোল বকারই বা কি সার্থকতা আছে, এত কান্নাকাটিরই বা কি দরকার ছিল?"

"ধরণী দ্বিধা হও" বলিয়াই সতী লজ্জায় মুখ লুকাইল। ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু তাহার আগেই স্বামী তাহার হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়াছে।

"বোসো। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পেট ফুলে উঠেছে। এইবার আমি বলি, তুমি শোন।"

"ছিঃ! ছিঃ! তুমি কি গো! আমি এখন লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে! তুমি যে কালা হাবা নও, তাই বা বলবো কেমন করে?—রসিকতার একটা সীমা থাকা দরকার…!"

"আমার সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই। আমি ওই রকম! পুরুষ জাতটাই এই রকম…।"

নাপিতটাকে আর বিয়ে বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না!

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

কায়রোর রাজকীয় গ্রন্থাগারের বোস্তাঁ পুঁথির অন্তর্গত ক্ষুদ্রক চিত্র-সমূহের কোন বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ পাওয়া যায় নাই এবং মূলচিত্রগুলির কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কায়রোর পুঁথির মোট ছয়খানি চিত্রের মধ্যে অন্ততঃ একখানি চিত্রে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে বায়জাদের নাম লিখিত আছে, কিন্তু চেষ্টার-বিয়েটি সংগ্রহের বোস্তাঁ পুঁথির কোন চিত্রেই বায়জাদের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয় না। কেবল পুঁথির একস্থানে লিখিত আছে যে এ চিত্রগুলি শিল্পী (১) দাস বায়জাদের (de—'abdal mudhuib Bihzad') তুলিকায় অঙ্কিত। এই হৃদয়গ্রাহী চিত্রগুলিতে বর্ণযোজনার অপূর্ব্ব সাফল্য দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু যে সুকুমার আদর্শ, যে সূক্ষ্ম রেখাপাত, বায়জাদের পরবর্ত্তীকালের চিত্রগুলির অঙ্গস্বরূপ, এগুলিতে তাহার বিশেষ কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, তাই জনৈক লেখক অনুমান করিয়াছেন যে এগুলি বায়জাদের হাতের চিত্র হইলে তাঁহার চিত্রী জীবনের প্রথমাংশেই অঙ্কিত (২)। চিত্রে নীল বর্ণের কিছু প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বায়জাদ নাকি এ রঙটির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

বায়জাদের শিল্প পদ্ধতিতে প্রভাবিত হইয়া বোখারা শিল্পকেন্দ্রে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও বোস্তাঁ গ্রন্থের দুইখানি চিত্রের উল্লেখ দেখা যায়। একখানি চিত্রে এক মূর্খ ব্যক্তি বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়া আছে, সেই শাখাটিই কর্ত্তন করিতেছে। (১নং চিত্র) ইহা মহাকবি কালিদাস বিষয়ক এক জন-প্রবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপর চিত্রটিতে বিখ্যাত সারাসেন্ (Saracan) বীর সুলতান সালাদিনের (৩) পুত্র মালিক সালে আয়ুব দরবেশদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত। পারস্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন-রূপে পরিগণিত কোনও কোনও চিত্র বহুবার নকল করা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্ব্ববর্ণিত চিত্র দুইখানি



১নং চিত্র

(১) মুধুইব, মুধেহিব বা মুজেহিব শব্দ সোনালী হল্‌কর (gilder) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনে হয় প্রাচ্যদেশসুলভ বিনয়বশে এই সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী আপনাকে "কারুশিল্পী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) J. V. S. Wilkinson in Indian Art and Letters, N. S. XVI, Vol. I, p—5.

(৩) সালাদিন সারওয়াল্‌টার স্কট রচিত 'টালিসমান' গ্রন্থের অন্যতম প্রধান নায়ক।

১৫৫৫ খৃঃ অব্দে, বায়জাদের মৃত্যুর প্রায় ২১।২২ বৎসর পরে অঙ্কিত, সুতরাং ইহা বায়জাদ রচিত চিত্রের নকল হওয়াও অসম্ভব নয়। ১৫৬৭ খৃঃ অব্দের পর বায়জাদের প্রভাব বোখারা হইতে বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে উহা বলবৎ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মার্কিণ দেশে যে সকল চিত্রিত পারসীক পুঁথি স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইখানি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম নামক সংগ্রহাগারে রক্ষিত "হফ্ত্ পাইকার" পুঁথির চিত্রগুলি বায়জাদের প্রথম বয়সের চিত্রকর্ম্মের নমুনা বলিয়া পরিগণিত। পুঁথিখানি দিল্লীশ্বর আকবরকে পঞ্জাবের একজন শাসন-কর্ত্তা ১৫৮০ খৃঃ অব্দে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। বষ্টন (Boston) মিউজিয়মে সারফুদ্দিন আলি ইয়েজ্দি রচিত 'জাফরনামা' নামক তৈমুরলঙ্গের যে ইতিহাস গ্রন্থ রক্ষিত আছে তাহা বিখ্যাত লিপিকার (কাতিব) শির আলি কর্ত্তৃক লিখিত। পুঁথিখানি ১৪৬৭ খৃঃ অব্দের, সুতরাং বায়জাদের জীবিতকালেই উহা লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থের পাতাগুলি হাতে হাতে জীর্ণ হওয়ায় কাগজ আঁটিয়া লইতে হইয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর (খৃঃ অঃ ১৬০৫-১৬২৭) দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন বায়জাদের মৃত্যুর প্রায় ত্রিসপ্ততি বৎসর পরে। ঐতিহাসিকের চক্ষে এ যে খুব বেশীদিনের কথা তা নয়। জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকারসূত্রে পুঁথিখানি পাইয়া নিজ হাতে উহাতে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি তাঁহার পিতৃদেব সম্রাট আকবরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে এ গ্রন্থের চিত্রগুলির সব কয়খানিই বায়জাদের তুলিকাসম্ভাত। পুঁথিখানিতে



২নং চিত্র

মোট দ্বাদশখানি চিত্র আছে তাহার মধ্যে অন্ততঃ চারিখানি বায়জাদের শিল্পের খাঁটি নিদর্শন। ফ্রাসিয়ার শিল্প-সমালোচক ম'সিয়ে গ্যাস্ত' মিজিয় এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন (৪)। অপর একজন বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সম্রাট জাহাঙ্গীরের উক্তি পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (৫)।

মিজিয়' কথিত চিত্র চারিখানির বিষয়বস্তু নিম্নে বর্ণিত হইল—

(১) তৈমুর কর্ত্তৃক উদ্যান সম্মেলনের অনুষ্ঠান।

(২) সমরকন্দে মসজিদ নির্ম্মাণ।

(৩) কোনও শত্রুদুর্গ অবরোধ।

(৪) সাদী সৈন্যের যুদ্ধ।

সম্ভবতঃ এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয় ১৫০৫ খৃঃ অব্দে সুলতান হোসেন বাইকারার দেহান্তের পূর্ব্বেই। যে সময় জাফর-নামার চিত্রণকার্য্য আরব্ধ হয় বায়জাদের অঙ্কন-ধারা তখন পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বায়জাদ নাকি যুদ্ধের চিত্র আঁকিতে ভালবাসিতেন। গতিপ্রাণ পরিকল্পনা ও শক্তিমত্তার বিকাশেই ছিল তাঁহার আনন্দ—ইহাতেই তাঁহার চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তৈমুরের অভিযানের চিত্রনিচয়ে যুদ্ধের ও যুদ্ধোদ্যমের অভাব নাই। দুর্গ আক্রমণের চিত্রে, সাদী সৈন্যদলের যুদ্ধের চিত্রে গতি ও চলচ্চাঞ্চল্য সুপরিস্ফুট। এ ছাঁদের চিত্রের সহিত প্রথমোক্ত নিজামী পুঁথিখানির চিত্রণ পদ্ধতির বিশেষ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

জনতাবহুল চিত্রপটে মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন স্তরে সাজাইবার যে প্রথাটি পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল তাহা বায়জাদ যে অনুসরণ করেন নাই তাহা নয়। কোন কোনও স্থলে, যেমন সমরকন্দে মসজিদ নির্ম্মাণের চিত্রে, এ ধারা খাপ খাইয়াছে ভাল। ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে লিখিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের খাম্সা পুঁথিতে কাশিম আলি অঙ্কিত (৬) সৌধনির্ম্মাণের যে চিত্রখানি (চিত্র নং২) সন্নিবিষ্ট আছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত বিন্যাসপদ্ধতি যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে। -কতক গাঁথা প্রাচীরের চারিদিকে "ভারা" বাঁধা, সেই ভারায় উঠিয়া বিভিন্ন স্তরে শ্রমিকের দল আপন আপন কর্ম্মে নিরত। ভূ-পৃষ্ঠেও ব্যস্ত কর্ম্মিগণ চারিদিকে ইমারত গঠনের উপকরণাদি বহন করিতেছে। কোন কোনও চিত্রে দেখিতে পাই, কতক লোক পাহাড়ের উপর, কতক লোক বা গিরি দুর্গের বুরুজে। এইরূপ সুকৌশল সন্নিবেশ হেতু চিত্রের অন্তর্নিহিত ঐক্যের যে ব্যত্যয় হয় বায়জাদ যে তাহা না বুঝিতেন তাহা নয়। পরবর্ত্তীকালের ছবিগুলিতে তিনি এই দোষ দূরীকরণের জন্য স্থানে স্থানে বস্ত্রাবাসের রজ্জুর ন্যায় শ্বেত রজ্জু বিন্যাস করিয়া পটভূমির বিভিন্নাংশ জ্ঞাপন ও সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। শ্বেত বর্ণে অঙ্কিত হওয়ায় রজ্জুগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এ কৌশল অপর চিত্রীগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী সাফাবীয় যুগেও অবলম্বিত হইয়াছিল। সেন্টপিটার্স বর্গে (৭)

---

(৪) Manuel d'art Masulman গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৫) V. Goloubew in Ars Asiatica, Vol. XIII, p. 7.

(৬) দেখা গিয়াছে যে কোন কোনও স্থলে বায়জাদ ও কাশিম আলি উভয়ে মিলিয়া একই পুঁথির চিত্রণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, ভ্রমক্রমে অনেক সময় কাশিম আলির রচিত চিত্র বায়জাদের বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। উভয়ের অঙ্কন রীতিতে এইরূপই সৌসাদৃশ্য ছিল।

(৭) Les Calligraphes et les Miniateristes Mussalman, P. 326 et seq.

রক্ষিত আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ অব্দের একখানি পুঁথির চিত্রগুলিও বায়জাদের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৫২২ খৃঃ অব্দেও যে বায়জাদ জীবিত ছিলেন তাহার লিখিত প্রমাণ আছে সুতরাং সেণ্টপিটার্স বর্গের পুঁথিখানি বায়জাদ কর্ত্তৃক চিত্রিত হওয়া অঙ্কনকালের দিক দিয়া কোন মতেই আটকায় না।

মঁশিয়ে শার্ল উয়ার্ট (M. Ch'arles Huort) তাঁহার "মুসলমান লিপিকার ও ক্ষুদ্রক চিত্রকর" বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ভিয়েনার রাজকীয় গ্রন্থশালায় বায়জাদের সাত খানি চিত্র রক্ষিত ছিল, তাহার মধ্যে একখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট কোন নরপতির প্রতিকৃতি। রাজনৈতিক বিপর্য্যয় হেতু সেণ্টপিটার্স বর্গের পুঁথিখানি ও ভিয়েনার সেই চিত্রগুলি এখন যে কোথায় গিয়াছে তাহা কে বলিবে? সেণ্টপিটার্স বর্গ অধুনা লেনিনগ্রাড নামে পরিচিত।

সুলতান হোসেন বাইকারার অধীনে বায়জাদের কার্য্যকাল ১৪৬৮ হইতে, মতান্তরে ১৪৮৭ হইতে ১৫০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। তাতার আক্রমণ হেতু তৈমুরীয় বংশের শেষ নরপতি, বাইকারার পুত্র বদিউজ্জমান, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং আত্মরক্ষার্থ তাঁহার ভগিনীপতি প্রথম সাহ ইস্‌মাইলের (Shah Ismail I) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এইরূপে হিরাটের শূন্য সিংহাসন তাতার নেতা মহম্মদ খাঁ সাইবানি কর্ত্তৃক অল্পায়াসেই অধিকৃত হয়। মহম্মদ খাঁ সাইবানির অধীনে বায়জাদ ১৫০৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র চারি বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন। বোধ হয় সাইবানির নিজ ফরমাইস মতই তাঁহার চিত্রকররূপে পরিকল্পিত একখানি প্রতিকৃতি বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল। এই তাতার যোদ্ধার সাধ জন্মিয়াছিল চিত্রকর ও লিপিকাররূপে যশোলাভ করিবার। তিনি নাকি বায়জাদের অঙ্কন সংশোধন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে "কলম" ধরিতেন। ইহাকেই বলে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"।

বায়জাদ রাজসভার চিত্রাদি যে না আঁকিয়াছেন তা নয়। মনে হয় রাজসভার জাঁকজমক শিল্পী হিসাবে তাঁহাকে একটু যেন বেশী করিয়াই আকৃষ্ট করিত। তাঁহার এজাতীয় চিত্রের মধ্যে রহিয়াছে বহুবর্ণে সমুজ্জ্বল অশ্বারোহীবৃন্দের সংযান, রাজপ্রাসাদের উৎসব ও নিমন্ত্রণ পর্ব্ব এবং নানা সমারোহ মধ্যে রাজ সন্দর্শনার্থ লোক সমাগম (চিত্র নং ৩)। আবার কোথাও বা তাঁহার পরিকল্পিত চিত্রে শত্রুনগরী আক্রান্ত ও অধিকৃত হইতেছে, কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদল রণোন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া কাতারে কাতারে বিপক্ষপক্ষের সম্মুখীন হইতেছে, আবার কোথাও বা খণ্ডযুদ্ধের সুতীক্ষ্ণ সংঘর্ষ বিদ্যমান। সেনানীদিগের পরিধানে স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত মূল্যবান বিচিত্র সাঁজোয়া, কাহারও অঙ্গে কিংখাপের নয়নমনোহর আঙ্গরাখা, কাহারও বা অঙ্গচ্ছদ কোমল পশুলোমের ধূসর ও পিঙ্গল বর্ণাভায় পরিশোভিত। এই প্রসঙ্গে জাফর-নামার অন্তর্গত তৈমুর কর্ত্তৃক রাজোদ্যানে সভাসদগণের আমন্ত্রণের চিত্র এবং সুলতান হোসেন বাইকারার সভায় রাজসম্ভাষণের চিত্র—এই দুইখানি চিত্রের কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে বায়জাদ আমির খসরু রচিত খামসা কাব্যের চিত্রণকার্য্য সমাধা করেন। এ পুঁথিখানিও এক্ষণে "চেষ্টার বিয়েটী" সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ক্ষুদ্রক চিত্রের মোটসংখ্যা ত্রয়োদশের অধিক নয়; তাহার মধ্যে যে কয়খানি বায়জাদের নিজ কলমের তাহার বিবরণ পুঁথির পুষ্পিকাংশে (Colophon-এ) প্রদত্ত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানিতে হস্তাক্ষরের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, সুতরাং পুঁথিটী যে একই লিপিকার কর্ত্তৃক লিখিত সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পুঁথির মানব মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা ছাঁদের এবং উহাদের ভঙ্গিমাও কিছু উগ্র ও বিকট রকমের, তাই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এগুলি আসলে বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত নয়। সন্নিবেশ কৌশল, বর্ণবৈভব, সূক্ষ্মাংশগুলির অঙ্কনৈপুণ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে বিশেষজ্ঞদিগের এ সন্দেহ অমূলক বলিয়াই মনে হয়। ডাঃ এফ্, আর মার্টিন (Dr. F. R. Martin) একটু বড় ছাঁদের মূর্ত্তিগুলি ভিত্তিচিত্রণ রীতির প্রভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার এ মতবাদ বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। দেওয়াল চিত্রণ-রীতির সহিত বায়জাদের যে ভালরূপই পরিচয় ছিল তাহা বুঝা যায়—



৩নং চিত্র

সম্রাট আকবরের জন্য নকলকরা একখানি পুঁথির চিত্র হইতে। এই গ্রন্থে হিরাটের কয়েকটি দেওয়াল চিত্রের নমুনা যত্ন সহকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহরুখ যে হিরাটে একটি উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যস্থ গৃহের ভিত্তিগাত্রে চিত্র সন্নিবেশ করাইয়াছিলেন একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়াছি।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ৯০০ হিজিরাব্দে (খৃঃ ১৪৯৪ অব্দে) সুলতান মহম্মদ নূর কর্ত্তৃক লিখিত হাফিজের দেওয়ান গ্রন্থের একখানি

পুঁথিতে, প্রত্যেক গজলের উপরিভাগে যে দুই দুইটি করিয়া পক্ষীচিত্র অঙ্কিত আছে তাহার প্রত্যেকটিতেই বায়জাদের তুলিকাসম্পাত অনুভূত



৪নং চিত্র

হয়। অঙ্কন-ধারার ললিত মাধুর্য্যে ও মেদুর রঞ্জন কৌশলে এ চিত্রগুলি এখনও দর্শকমাত্রেরই প্রশংসা অর্জ্জন করে।

গভীর ভাবোন্মেষ ও মধুর মনোহারিত্ব গুণের সমাবেশহেতু জনৈক দরবেশের একখানি সুবিখ্যাত প্রতিকৃতিও বায়জাদের কলানৈপুণ্যের নিদর্শন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এ চিত্রখানি প্রাচ্যশিল্পে মানব প্রতিকৃতি (তস্‌বির) অঙ্কনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। ইহাতে যে বিপুল হৃদয়গ্রাহিত্ব (monumentality), মধুর লালিত্য (grace), ও প্রোজ্জ্বল প্রাখর্য্য একাধারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ভাবুক সমাজ তাহার উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। একদিকে স্থৈর্য্য ও অপরদিকে ভাবাবেগের তীক্ষ্ণতাই এ শ্রেণীর অন্যান্য চিত্র হইতে এ চিত্রটির পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া পরিকল্পনার মৌলিকতায় ইহাকে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে (৮)। বায়জাদ প্রায়ই আঁকিয়াছেন যোদ্ধৃবর্গের নানাভঙ্গীর নানাবিধ চিত্র, তাই তাঁহার দ্বারা দরবেশের চিত্র অঙ্কিত হওয়া সম্ভব কিনা তাহা লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে। মঁসিয়ে সাকিসিয়ান বায়জাদ কর্ত্তৃক এ প্রকার চিত্রাঙ্কন সম্ভব বলিয়া মনে করেন না (৯)। বায়জাদ যে দৃশ্য চিত্রের শান্তিময় প্রতিবেশে দরবেশ (চিত্র নং৪) ও ধর্ম্মোপদেশকদিগের আকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ নহে (১০)। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র এখনও এ উক্তির সমর্থন কল্পে সাক্ষ্য দিতেছে। (ক্রমশঃ)

(৮) A. U. Pope, Introduction to Persian Art, p. 110.

(৯) Sakisian, Op. cit., p. 110.

(১০) Thomas Sutton in Rupam, Nos 19-20, p. 113.

সিনান

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

ওগো ও কা'দের বিরহ-আসার
বরিষে বরিখা-ধারায় মিশি,
খঞ্জন-আঁখি অঞ্জন ধুয়ে
কালো হ'ল বুঝি তিমিরে দিশি।
মেঘে মেঘে বাজে মন্দ্র গভীর
বিমরি বিমরি অকহা কথা
ব্রজ-জন হৃদি-বল্লভে স্মরি
আজ' উথলিছে অসহ ব্যথা।
ওই কারা দেয় নীপ-অঞ্জলি
বকুল কামিনী বিছায়ে পথে,
কেতকী-বুকের পরাগ নিছায়
শিহরে ভাবিয়া বিদায়-রথে!
সিনান করায় কা'রা সে প্রিয়েরে
নয়নের নীরে ধেয়ানে ধরি,
বৃকভাণু-রাজ-নন্দিনী আজ
চির-মরমীর মরমে মরি।
প্রাণে মনে জাগে স্নান-অভিষেক
তা'রি উৎসব-হরষ শুনি,
স্নান-যাত্রায় বর-সজ্জায়
কবে বার হবে দিবস গুণি।
হৃদয়ের লোহে রাঙা ব্রজরজে
আর কি সে রথ আসিবে ফিরি,
আভীর কিশোরী কিশোরের প্রেমে
নিকষিত হেম বাঁধনে ঘিরি
কোথা বন্ধুর সন্ধানে ফিরি
অজানা অচিন্ বন্ধুর পথে,
এ মণি-কোঠায় অধরারে ধরি
সারথি করিব এ দেহ-রথে।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

৪

প্রগাঢ় নিদ্রার পর বেলা সাড়ে ন'টার সময় উঠলেন তিনি। মুহূর্ত্তেই সব মনে পড়ে গেল। বিছানায় উঠে বসলেন। অপর্ণার মৃত্যুর কথাই মনে হতে লাগল। কাল রাত্রে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা সমস্ত ওলট-পালট করে দিয়েছে, অতিশয় বেদনাময় অনুভূতি রেখে গেছে একটা সারা বুক জুড়ে। যুগল পালিত যতক্ষণ ছিল বেদনাটা ঢাকা ছিল। এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, ন'বছর আগে যা যা ঘটেছিল মানস-পটে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সব।

এই মহিলাটিকে, যুগল পালিতের স্ত্রী এই অপর্ণা পালিতকে, তিনি একদিন ভালবেসেছিলেন। যতদিন বর্দ্ধমানে ছিলেন ততদিন তার প্রণয়ী ছিলেন তিনি। বর্দ্ধমানে তিনি গিয়েছিলেন নিজের কাজে—সে-ও এক মকোর্দ্দমার ব্যাপার। কিন্তু সেজন্য পুরো একবছর বাড়ি ভাড়া করে' সেখানে না থাকলেও চলত। প্রণয়-ব্যাপারের জন্যেই অতদিন থেকে গিয়েছিলেন। সত্যিই বড্ড জড়িয়ে পড়েছিলেন। অপর্ণা তাঁকে যেন যাদু করেছিল। যেন ভর করেছিল তাঁর উপর। এই মেয়েটার সামান্য খেয়াল মেটাবার জন্যে না করতে পারতেন হেন কাজ ছিল না।

বস্তুত তার পূর্ব্বে এ রকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি তাঁর। তীব্র উন্মাদনার আস্বাদ সেই তাঁর জীবনে প্রথম। এক বৎসর পরে বিচ্ছেদ যখন আসন্ন হয়ে এল, (যদিও সে বিচ্ছেদ দীর্ঘ হবে না এই আশা তিনি তখন করেছিলেন)—সত্যিই যাবার সময় ঘনিয়ে এল যখন, তখন এমন অধীর হয়ে পড়েছিলেন যে অপর্ণাকে হরণ করবার কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। তাকে সে কথা বলেও ছিলেন—স্বামীকে ছেড়ে, ঘর সংসার ছেড়ে, সমাজকে তুচ্ছ করে' তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার কথাও পেড়েছিলেন—হ্যাঁ, সানির্ব্বন্ধ অনুরোধই করেছিলেন—বেশ মনে পড়ছে। যদিও অপর্ণা প্রথমটা নিমরাজি হয়েছিল (হয় তো সংসারের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে, হয় তো অভিনবত্বের আশায়) কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে বেঁকে দাঁড়াল। সে আপত্তি করল বলেই পুরন্দরবাবুকে একা বর্দ্ধমান ত্যাগ করতে হল। তা না হলে পুরন্দরবাবু তাকে নিয়েই আসতেন। কেউ তাঁর গতিরোধ করতে পারত না। অপর্ণাই তাঁকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেছিল।

কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই তাঁর মনে হত, বারবার মনে হত—সত্যিই কি অপর্ণাকে ভালবেসেছিলেন তিনি? এ প্রশ্নের কিন্তু কোন সদুত্তর মিলত না। ভালবাসা? না, মোহ? ঠিক করতে পারেন নি কিছু। আজও পারেন নি। কোলকাতায় ফিরে নূতন কোন প্রেমের প্রভাবে পড়ে' যে একথা মনে হত তা নয়। যদিও ফিরে এসেই তিনি দলে মিশে রামবাগান সোনাগাছি চষে' বেড়িয়েছিলেন রীতিমত—কিন্তু সেই প্রথম দু'মাস তাঁর সমস্ত মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কোন মেয়েমানুষই চোখে লাগে নি, কেউ মনে দাগ কাটতে পারে নি। অপর্ণার প্রতি তাঁর মনোভাব ভালবাসা না মোহ, এ প্রশ্ন মনে বারম্বার জাগলেও এটা তিনি ঠিক জানতেন যে আবার কোনক্রমে যদি বর্দ্ধমানে গিয়ে পড়েন তাহলে অপর্ণারই মায়াপাশে আবার গিয়ে ধরা দেবেন অসঙ্কোচে, কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। পাঁচ বৎসর পরেও তাঁর এ বিশ্বাস বদলায় নি। পাঁচ বৎসর পরে একথা স্বীকার করতে কিন্তু লজ্জা হত তাঁর—সমস্ত অন্তর আত্ম-ধিক্কারে ভরে উঠত, অপর্ণার উপরও ঘৃণা হত, সত্যটা কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারতেন না। বর্দ্ধমানের ব্যাপারটা ভেবে মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যও লাগত খুব। তিনি—পুরন্দর রায়চৌধুরী—কি করে' এমন একটা খপ্পরে পড়লেন! প্রেম? অসম্ভব। লজ্জায় দুঃখে আত্মগ্লানিতে চোখে জলও এসে পড়েছে। হ্যাঁ জল! আরও কিছুদিন পরে অনেকটা শান্ত হয়েছিলেন অবশ্য। প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন, মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে' মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটাকে—সফলকামও যে হন নি, তা নয়। কিন্তু আজ হঠাৎ ন'বছর পরে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শুনে সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে আবার। সমস্ত।

একটা বিষয়ে বিস্ময় লাগছে কিন্তু। এখন, বিছানায় বসে বসে' নানাবিধ এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট অনুভব করছেন তিনি—যদিও সংবাদটা পেয়ে চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা, কিন্তু অপর্ণার মৃত্যু সত্যি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে নি। সত্যি কোন দুঃখ হচ্ছে না! সত্যিই এতটা হৃদয়হীন আমি নাকি?—নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন। এখন অবশ্য আর ঘৃণা করেন না তাকে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে তার প্রতি সুবিচার করবার ক্ষমতা হয়েছে এখন। ন'বছরের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মধ্যে অপর্ণার একটা স্বরূপ খাড়া করেছিলেন তিনি মনে মনে। মফঃস্বলের শহরে হাবভাবময়ী কলাকুশলা একধরণের ভদ্রমহিলা দেখা যায়—যারা সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ করে, পার্টিতে যায়, সব কথায় বুকনি দেয়, অপর্ণাও সেই জাতের মেয়ে—তার বেশী কিছু নয়—তিনিই হয় তো তাকে স্বপ্নলোকে দেবী বানিয়েছিলেন। হয় তো! এটাও মনে হত হয় তো তাঁর বিচার নির্ভুল নয়। বিশেষ করে' এই কথাটাই মনে হচ্ছে এখন। হয় তো···কিন্তু না—বিরুদ্ধ সাক্ষী অনেক বর্ত্তমান। এই পূর্ণ গাঙ্গুলী লোকটা পাঁচ বছর সংশ্লিষ্ট ছিল ওই পরিবারের সঙ্গে এবং তাঁর মতো সে-ও হয়তো ফেঁসে ছিল। পূর্ণ গাঙ্গুলী কোলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে, কোলকাতায় থাকলে তার হিল্লে হ'ত কিছু একটা, কারণ তার মস্তিষ্কে বা চরিত্রে এমন কিছুই ছিল না (পুরন্দরবাবুর তাই ধারণা অন্তত) যার জোরে চেনা-শোনা সমাজের বাইরে গিয়ে সে

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু কোলকাতা ত্যাগ করে' অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে বর্দ্ধমানে গিয়ে আড্ডা গাড়লে—কেবল ওই অপর্ণার জন্যে। শেষ পর্য্যন্ত কোলকাতায় এল—অপর্ণা তাকে ছেঁড়া জুতোর মতো পরিত্যাগ করেছিল বলে' সম্ভবত। ওই মেয়েটার সত্যিই আকর্ষণ করবার, বশ করবার, শাসন করবার অদ্ভুত কুহকিনী শক্তি ছিল একটা।

কিন্তু যে সব গুণের জোরে মেয়েরা পুরুষদের সাধারণত আকর্ষণ করে, বশ করে, অপর্ণার সে সব গুণ ছিল না। সুন্দরী ছিল না মোটেই। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। পুরন্দরবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তার বয়সও আটাশ বছর—অর্থাৎ যৌবনও উত্তীর্ণ প্রায়। সুন্দরী না হলেও তার সারা মুখে অপূর্ব্ব কমনীয়তা ছিল একটা, চোখ খুব বড় ছিল না, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ছিল অদ্ভুত শক্তির ব্যঞ্জনা। রোগা ছিল খুব। খুব বেশী লেখাপড়া শেখে নি, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। কেমন যেন জেদি গোছের ছিল। নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে জানত। মতান্তর শোনবার ধৈর্য্য ছিল না। কখনও কোন ব্যাপারে আপোষ করে নি। চালচলনে শহুরে ভাব খুব বেশী না থাকলেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। নিপুণ বৈশিষ্ট্য। মার্জ্জিত রুচিও ছিল, যদিও তার পরিচয় প্রধানত পাওয়া যেন প্রসাধনে আর সাজসজ্জায়। চরিত্রে ছিল সে সম্রাজ্ঞী—আধিপত্য করবার লোভ এবং শক্তি দুইই ছিল তার। যাকে ভালবাসত তাকে পদানত করে' রাখত একেবারে। আসন্ন বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়ত না কখনও। বিপদের সময় তার মনের জোর দেখে অবাক লাগত সত্যি। অদ্ভুত চরিত্র। উদারতা এবং নীচতার এমন সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল একরকম। যুক্তির ধার ধারত না, প্রয়োজন হলে 'দু' দুগুণে চার' এ সত্যকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে বাধত না তার। নিজের দোষ বা নিজের ভুল দেখতেই পেত না কখনও। স্বামীকে আজীবন বঞ্চনা করে এসেছে, অসংখ্য চাতুরী খেলেছে তার সঙ্গে—কিন্তু সে জন্য কখনও দুঃখিত বা অনুতপ্ত হয় নি। তাকে দেখে পুরন্দরবাবুর মনে পড়ত উর্ব্বশী কবিতার প্রথম লাইনটা—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী। ও যেন সকলের। চিরন্তনী কামিনী! নিজেও বোধহয় সে তাই অকপটে বিশ্বাস করত। পুরুষের মনোহরণ করাই তো তার কাজ। তাতে আর পাপ পুণ্য কি! যাকে যতক্ষণ ভালবাসত ততক্ষণ তার সঙ্গে প্রতারণা করত না। কিন্তু ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যেই সুরু হত অভ্যাসের দাসত্ব, অমনি শিকল কাটার সুযোগ খুঁজে বেড়াত সে। প্রণয়ীকে পীড়নও যেমন করত, সোহাগও করত তেমনি। উদগ্র কামনার নিষ্ঠুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল যেন। অথচ নীতি নিয়ে লম্বা বক্তৃতা—হ্যাঁ বক্তৃতাই দিত—ভ্রষ্ট চরিত্র লোককে নিদারুণ ভাষায় গালাগালি দিতে শতমুখ হ'য়ে উঠত, অথচ নিজে ছিল ভ্রষ্টা। কিন্তু সে যে ভ্রষ্টা তা কিছুতেই, হাজার প্রমাণ প্রয়োগ করেও, বোঝান যেত না তাকে। প্রণয়ী পুরন্দরবাবু মাঝে মাঝে ভাবতেন—"ভণ্ডামি নয় সত্যিই হয়তো ও ওইরকম। হয়তো ভ্রষ্টা হয়েই জন্মেছে—ওই ওর প্রকৃতি। এ জাতীয় মেয়েরা কখনও বুড়ো হয় না, কখনও কারও গৃহিণী হয় না, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একটার পর আর একটাকে বরণ করে যায় কেবল। ওই ওদের ধর্ম্ম। বিবাহিত স্বামীই বোধহয় ওদের প্রথম প্রণয়ী। কিন্তু সে প্রণয়টা আরম্ভ হয় বিবাহের পরে। এরা খুব সহজে স্বামী পাকড়াতেও পারে। যখন দ্বিতীয় প্রণয়ী বরণ করে তখন স্বামীকেই দোষ দেয়, যেন স্বামীর কাছে সুখের আস্বাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে পর-পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিয়েছে। পর-পুরুষের বাহুপাশে যখন ধরা দেয় তখন প্রাণ ঢেলেই দেয়, তাতে কোন ভণ্ডামি থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত ওরা মনে করে—যা করছি ঠিকই করছি, দোষের কিছু নেই এতে…। আমরা সতীই—"

এ ধরণের মেয়ে থাকা যে সম্ভব পুরন্দরবাবুর এ বিশ্বাস সত্যিই হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাঁর হয়েছিল যে এই মেয়েদের অনুরূপ এক জাতীয় স্বামীও আছেন যাঁরা ঠিক এদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন। অর্থাৎ যাঁরা চিরকাল স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে যান্ আর কিছু করেন না, আর কিছু করবার ক্ষমতাই নেই। এঁরা কেবল বিয়ে করবার জন্যই জন্মান যেন। নিজেদের চরিত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এরা বিয়ের পর অবিলম্বে স্ত্রীর পরিপূরক হয়ে পড়েন ঠিক। এঁদের কতকগুলো চারিত্রিক লক্ষণও থাকে। কেমন যেন মেয়েলি ভাবাপন্ন হন এঁরা। এঁদের চলন বলন হাবভাব সব কিছুই পেলব পেলব। দেখলেই চিনতে পারা যায়। পুরন্দরবাবুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যুগল পালিত এই জাতীয় লোক। কিন্তু গতরাত্রে যে যুগল পালিতকে দেখা গেল সে তো একেবারে অন্যলোক, বর্দ্ধমানে যার সঙ্গে আলাপ ছিল এ তো সে নয়। অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেল লোকটা। বদলাবার কথাও—পুরন্দরবাবুর মনে হল—এ অবস্থায় বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীর জীবিতকালে সে স্ত্রীর পরিপূরক ছিল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আর তা থাকবে কি করে'—সে তো এখন একটা ভগ্নাংশ মাত্র…দু'জনে মিলে সমগ্র ছিল। সমগ্র জীবনের একটা অংশ হঠাৎ কেটে বেরিয়ে এসেছে যেন…বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত।

অতীতের যুগল পালিত সম্বন্ধে পুরন্দরবাবুর মনে নানা কথা জাগছিল। অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি…

"বর্দ্ধমানে লোকটা স্বামী ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাকরি করত, একজন পদস্থ কর্ম্মচারীই ছিল, কিন্তু তাও যেন স্ত্রীর জন্যই! স্ত্রীর গয়না কাপড় কেনবার জন্য, তার সামাজিক সম্ভ্রম বাড়াবার জন্য দশটা পাঁচটা আপিস করে মরত লোকটা। আর খুব নিষ্ঠাভরেই করত। একটু ফাঁকি দিত না কাজে। অথচ আপিসে খুব যে একটা সুনাম ছিল তাও নয়। দুর্ণামও ছিল না। বাপের বিষয় আশয় ছিল কিছু। ভালভাবেই চলে যেত। দামী সোফা সেটি, কার্পেট, দামী দামী বাসন বোঝাই ঘর।—চতুর্দ্দিক ঝকঝকে, তকতকে টিপটপ রাখতেই হত। কারণ ভয়ানক বড় লোক-ঘেঁসা ছিল। বড় বড় অফিসার তো বটেই, নাম-জাদা যে কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ করতে পেলে বর্ত্তে যেত যেন

লোকটা। বাড়িতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিত। বহু বড়লোকের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল। অপর্ণারও বেশ খাতির ছিল বড়লোক মহলে। অপর্ণা অবশ্য খাতির পেয়ে গলে' পড়ত না কখনও। নিজের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবেই নিত সে এসব। কিন্তু নিজের বাড়ীতে বড় বড় লোকদের সে নিমন্ত্রণ করত যখন, তখন সত্যিই উপভোগ্য হ'ত ব্যাপারটা। অতিথি-সৎকার করতে জানত সে। যুগলকেও এমন তালিম দিয়ে' ছিল যে নামজাদা অভিজাতবংশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করতেও তার তাল কাটত না কখনও। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে যুগল পালিতেরও নিজস্ব বুদ্ধি আছে কিছু—ইচ্ছে করলে নিজের শক্তিতেই হয়তো আলাপ করতে পারে সে—কিন্তু পাছে বেশী বকবক করে এই ভয়ে অপর্ণা তাকে ওজন-করা ভদ্রতা-সম্মত কথা ছাড়া অন্য কথা কইতেই দিত না। ভদ্রসমাজে যুগল পালিতের স্বকীয়তা পরিস্ফুটই হতে পায় নি কখনও। ভালমন্দ মিশিয়ে তার নিজস্ব চরিত্র ছিল নিশ্চয়ই একটা। কিন্তু তা কেউ জানবার সুযোগ পায় নি। মৃদু হেসে আলতো আলতো ভদ্রতা করেই কালক্ষেপ করতে হত তাকে। তার সদগুণগুলো চাপা পড়ে যেত অপর্ণার জ্যোতিতে, আর বদগুণগুলো বিলুপ্ত হত তার শাসনে। পুরন্দরবাবুর মনে পড়ল যুগল পালিতের পরচর্চ্চা করার দিকে একটু ঝোঁক ছিল, প্রতিবেশীদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ভালই বাসত সে—কিন্তু অপর্ণার ভয়ে সে মুখ খুলতে পারত না। নানারকম গালগল্প করার দক্ষতা ছিল যুগলের, কিন্তু করতে পেত না। যা সংক্ষেপে সারা যায় এবং যা কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয় এ রকম প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতে দিত না তাকে অপর্ণা। যুগল মদ খেত, সুযোগ পেলে বেশ টানতে পারত, কিন্তু উপায় ছিল না। অপর্ণা ভারী কড়া ছিল সে বিষয়ে। স্ত্রীর ভয়ে যুগল মদ ছুঁত না। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে স্ত্রৈণ বলে' সন্দেহ করবার উপায় ছিল না—বরং মনে হত অপর্ণাই পতিভক্তিপরায়ণা বাধ্য স্ত্রী, ভুলেও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না। শুধু মনে হত নয়, অপর্ণা তা নিজেও বিশ্বাস করত সম্ভবত। যুগল হয় তো অপর্ণাকে ভালবাসত—হয় তো খুব গভীর ভাবেই ভালবাসত, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় ছিল না। অপর্ণার কড়া শাসনের জন্যই হয় তো ছিল না। বর্দ্ধমানে থাকবার সময় পুরন্দরবাবুর প্রায়ই মনে হ'ত তাঁর সঙ্গে অপর্ণার যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তা যুগল জানে কি না। কোন সন্দেহই কি হয় না তার মনে? অপর্ণাকে প্রশ্নও করেছেন অনেকবার—কিন্তু প্রতিবারই এক উত্তর পেয়েছেন। অপর্ণা বিরক্তি ভরে প্রতিবারই বলেছে—উনি কিছু জানেন না, জানতে পারেন না—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অপর্ণার আর একটা বিশেষত্ব ছিল—স্বামীকে কখনও খেলো করবার চেষ্টা করত না সে। অপর কেউ করলে বরং চটে যেত। স্বামীর পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে তর্ক করত তার সঙ্গে। ছেলেপিলে ছিল না, সুতরাং একটু বার ফটকা হতেই হয়েছিল তাকে। কোন নিমন্ত্রণ কোন পার্টি বাদ যেত না। কিন্তু তাই বলে' যে ঘরের দিকে টান ছিল না, তা নয়। মনে হত বাইরের সামাজিক আনন্দে তার মন ভরত না। ঘর-সাজানো, সেলাই-করা, রান্নার ব্যবস্থা করা এই সব গৃহস্থালী কাজেও অনেক সময় কাটাত সে। কাল রাত্রে যুগল যে কথাটা বললে—অনেক সময় সন্ধ্যাবেলায় পড়াশোনার চর্চ্চাও হত। কখনও যুগল পালিত কোন বই পড়ত তাঁরা শুনতেন। তিনিও পড়তেন কখনও কখনও। যুগল চমৎকার পড়তে পারত, মাঝে মাঝে তাক লেগে যেত পুরন্দরবাবুর। অপর্ণা সেলাই করতে করতে গম্ভীরভাবে শুনত। রবিবাবুর গল্প কবিতা পড়া হত বেশী···কিন্তু মাঝে মাঝে গম্ভীর জিনিসও হত—হীরেন দত্তর 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' পড়া হয়েছিল একদিন। পুরন্দরবাবুর রুচি ও বিদ্যার প্রতি অপর্ণার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু নীরবে শ্রদ্ধা করত সে। কখনও উচ্ছ্বসিত হয় নি। ভাবটা যেন পুরন্দরবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব এমনই অবিসংবাদিত যে তা' নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ে সে প্রায় চুপ করেই থাকত—পুরন্দরবাবুর মনে হত এ সব বিষয়ে খুব যেন উৎসাহ নেই তার। সমাজে থাকতে গেলে এ সবের সংস্রবে বাধ্য হয়ে আসতে হয়—হয় তো এদের উপযোগিতাও আছে কিছু—তাই যেন সে এসব সহ্য করে। যুগলের কিন্তু খুব উৎসাহ ছিল এ সব বিষয়ে।

পুরন্দরবাবুর দিক থেকে ব্যাপারটা যখন চরমে উঠেছিল—অর্থাৎ যখন তিনি প্রায় উন্মত্ততার শেষ সীমায় উপস্থিত হব হব করছিলেন—ঠিক সেই সময়ে প্রণয়-পর্ব্বে ছেদ পড়ল হঠাৎ একদিন। হঠাৎ অপর্ণাই সব চুকিয়ে দিল একদিন। তাঁকে ছেঁড়া চটির পাটির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে—একথা কিন্তু বুঝতে পারেন নি তিনি তখন।

এর মাস দুই আগে এক বিলেত-ফেরত ছোকরা পুলিশ বিভাগে বড় চাকরি নিয়ে বর্দ্ধমানে এসেছিল। যুগলদের বাড়িতে যাতায়াতও সুরু করেছিল সে। আগে তাঁরা তিন জন ছিলেন—ইনি আসাতে চার জন হলেন। অপর্ণা এই 'ছেলেমানুষ' অফিসারটিকে বেশ সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলে—ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তাকে 'ছেলেমানুষ' বলেই গণ্য করেছে সে। পুরন্দরবাবুর মনে তাই কোন সন্দেহই হয় নি। এ সব কথা ভাববার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তাঁর—কারণ অপর্ণা তখন তাঁকে 'নোটিশ' দিয়েছে। বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। বহু কারণ অপর্ণা দেখিয়েছিল—তার মধ্যে প্রধানতম—সে সন্তানসম্ভবা। সুতরাং অবিলম্বে অন্তত চার পাঁচ মাসের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হবে···এ নিয়ে কোন কেলেঙ্কারী যদি হয় তাহলে তার স্বামীর মনে কোন সন্দেহ জাগবে না অন্তত। পুরন্দরবাবুর মনে হল যুক্তিটা বড্ড বেশী প্যাঁচালো। তিনি সোজা বললেন—চল আমার সঙ্গে। বম্বে, মাদ্রাজ, কাশী, কাশ্মীর যেখানে হোক। কিন্তু কিছু হল না, তাঁকে একাই ফিরতে হল শেষ পর্য্যন্ত। অবশ্য মাত্র তিন চার মাসের জন্য—এ আশ্বাস না পেলে কোন যুক্তিই নিরস্ত করতে পারত না তাঁকে, অপর্ণাকে নিয়েই আসতেন তিনি। ঠিক দু'মাস পরে অপর্ণার এক চিঠি পেলেন—আপনার ফেরবার দরকার নেই আর। যা মরে' গেছে, কি হবে তাকে আবার বাঁচিয়ে? চেষ্টা করলেও তা কি আর বাঁচে কখনও? সুখবর আছে, একটা আমার যে "ভয়" হয়েছিল তা অলীক। পুরন্দরবাবু খবর পেলেন

"ছেলেমানুষ" পুলিশ অফিসারটি বেশ জমিয়েছেন সেখানে। পুরন্দরবাবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন। মোহের সমস্ত কুয়াসা কেটে গেল নিমেষে। আরও কিছুদিন পরে, মানে কয়েক বৎসর পরে, এ খবরও তিনি পেয়েছিলেন যে পূর্ণ গাঙুলীও গিয়ে জুটেছিল সেখানে এবং এক আধ দিন নয় পুরো পাঁচটি বছর ছিল। পূর্ণ গাঙুলীর এত সুদীর্ঘ সৌভাগ্যের কারণ বোধ হয় অপর্ণা বুড়ো হয়ে আসছিল ক্রমশ, চেখে বেড়াবার প্রবৃত্তি ছিল না, সুযোগও জোটে নি হয় তো।

বিছানায় পুরো এক ঘণ্টা বসে' রইলেন তিনি। তারপর উঠে স্নান করলেন, চা খেলেন। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি, যুগল পালিতের খোঁজে। তার সঙ্গে কাল রাত্রে যে অভদ্র ব্যবহারটা করেছিলেন তার স্মৃতিটা মুছে ফেলতে হবে যেমন করে হোক। ছি, ছি, বড় দুর্ব্যবহার করে ফেলেছেন…।

গত রাত্রে যুগল পালিতের রহস্যময় আবির্ভাবটার নানা ব্যাখ্যা নিজেই বার করছিলেন তিনি মনে মনে…হয়তো আকস্মিক খেয়াল লোকটার…কিম্বা হয় তো মদ খেয়েছিল…কিম্বা আরও কিছু হবে হয় তো। কিন্তু যার সঙ্গে সব চুকে বুকে গেছে তার স্বামীর সঙ্গে আবার কেন যে তিনি নূতন ক'রে পরিচয় ঝালাতে যাচ্ছেন তার কোন ব্যাখ্যা তাঁর মাথায় এল না। কি যেন একটা আকর্ষণ করছিল তাঁকে। প্রাণে একটা অদ্ভুত সাড়া তুলেছে লোকটা! (ক্রমশঃ)

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রতুল চৌধুরীর বাড়ী। বসবার ঘর থেকে সব যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতুল মল্লিকা-বসুর ওয়েল-পেন্টিংএর ফিনিশিং টচ দিচ্ছে। নিরঞ্জন গুপ্তের প্রবেশ।)

নিরঞ্জন। প্রতুল, যে সার্জেনের কথা বলেছিলে তাঁর সঙ্গে কথা কইলুম। তিনি রাজী হলেন না।

প্রতুল। কেন?

নিরঞ্জন। আমি তাঁকে বললুম—তুমি আমার পেশেন্ট এবং যতখানি তাকে বলা চলতে পারে জানালুম কিন্তু…

প্রতুল। সে আরও বেশী জানতে চাইলে বোধহয়?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। এমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন করতে লাগল—যার উত্তর তাকে দেওয়া সম্ভবও নয় উচিতও নয়। আর কোনও লোক আছে?

প্রতুল। না। আর কোন ভাল সার্জেনের নাম তো মনে পড়ছে না।

নিরঞ্জন। তবে এখন কি করবে?

প্রতুল। বম্বে যাব মনে করছি।

নিরঞ্জন। এখনও মনে করছ! মন স্থির করে ফেল। আর বেশী সময় নেই। কাল তোমার ব্লডপ্রেসার নিয়েছিলুম মনে আছে?

প্রতুল। হ্যাঁ। সময় যে আর নেই তা বুঝতে পারছি। কিন্তু এখনও গিরীন পাত্রের ব্যাপারটা ঠিক হয় নি। আচ্ছা বম্বের ডাক্তারকে তুমি জান?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। সে আমার সঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছে। এখানকার ডাক্তারদের মত এত কৌতূহল, চুলচেরা বিচার সে প্রয়োজন মনে করবে না।

প্রতুল। ছাট্‌স গুড। কিন্তু গিরীনের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না করে তো যেতে পারছি না।

নিরঞ্জন। কেন? টাকার জন্য?

প্রতুল। হ্যাঁ। শীঘ্রই আমার টাকার দরকার হবে।

নিরঞ্জন। কত চাই? আমি দিতে পারি।

প্রতুল। থ্যাঙ্ক ইউ। এখনও প্রায় এক মাস সময় হাতে আছে। আমার মনে হয় এরই মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারব।

প্রতুল। কে? (বাহিরে খট খট ধ্বনি)

রেজা। (নেপথ্যে) আমি হুজুর

প্রতুল। ভেতরে এস। (রেজার প্রবেশ)

রেজা। খগেনবাবু এসেছেন—

প্রতুল। ইন্সপেক্টর খগেন দত্ত?

রেজা। হ্যাঁ হুজুর। সঙ্গে আরও একজন লোক আছেন—

প্রতুল। আচ্ছা, তাঁদের পাঠিয়ে দাও। (রেজার প্রস্থান)

নিরঞ্জন। এই দ্বিতীয়বার তারা এল—

প্রতুল। তাতে কি হয়েছে?

নিরঞ্জন। পুলিশের লোক, বিনা কাজে আসে না। এবার প্রতুল তোমার কাজে অনেক বাধা পড়ছে। পদে পদে—

প্রতুল। তুমি এইখানেই থাক। ওরা কি বলে এবং করে একটু লক্ষ্য কোরো। (খগেন দত্ত ও লোকেন চাটুজ্জের প্রবেশ)

খগেন। নমস্কার। আপনাকে আবার বিরক্ত করতে আসতে হল, সে জন্ত আমি দুঃখিত—

প্রতুল। না, না, তাতে কি হয়েছে।

খগেন। ইনি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লোকেন চট্টোপাধ্যায়।

প্রতুল। বেশ, বেশ।

লোকেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সুখী হলুম। আপনি যে দয়া করে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে—

প্রতুল। নট অ্যাট অল।

খগেন। (লোকেনের প্রতি) ইনি ডাক্তার গুপ্ত

নিরঞ্জন। নমস্কার।

লোকেন। নমস্কার স্তর। সো গ্ল্যাড টু সী ইউ।

প্রতুল। আপনারা কি আবার রেজার সন্ধানে এসেছেন ?

খগেন। না, একেবারে অন্ত ব্যাপারে।

লোকেন। আমরা একটু ধাঁধায় পড়েছি, তাই আপনার সাহায্য নিতে এসেছি।

প্রতুল। কিন্তু আমি তো পুলিশের লোকও নই, ক্রিমিন্তাল ল-ইয়ারও নই—

লোকেন। তা জানি, কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারবেন না—

খগেন। সেই জন্তই আপনাদের আবার বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি।

লোকেন। (হঠাৎ ছবির দিকে দেখে) মিস বসুর ছবি ! (উঠে কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে দেখতে) চমৎকার হয়েছে। (একটু পেছিয়ে গিয়ে) বিউটিফুল। আপনি যে এত বড় আর্টিষ্ট তা জানতুম না।

প্রতুল। ধন্তবাদ।

লোকেন। আপনার রঙের কাজ অপূর্ব্ব— অদ্বিতীয় বললেও অন্তায় হবে না।

প্রতুল। আপনাদের ভাল লেগেছে।

লোকেন। নিশ্চয়ই। আজকাল কোন আর্টিষ্ট এই রকম রঙ ব্যবহার করতে জানেন না। আচ্ছা এইবার কাজের কথা বলি। আপনারা বিজি লোক, সময় নষ্ট করব না। খগেনবাবু একদিন আপনাকে একটা ছবি দেখিয়েছিল মনে আছে ?

প্রতুল। হ্যাঁ, আছে।

লোকেন। সেই ছবিতে আপনার আঙ্গুলের ছাপ পড়েছিল এবং তাই নিয়ে আপনি একটু রসিকতাও করেছিলেন—

প্রতুল। ওঃ, সেটা রসিকতা ছিল বুঝি ? আমি তা ঠিক বুঝতে পারি নি।

লোকেন। কিন্তু সেই রসিকতার ফল ভয়ানক সীরিয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে ;

প্রতুল। তাই নাকি !

লোকেন। নতুন একজন লোককে কি ভাবে আঙ্গুলের ছাপ রেকর্ড করতে হয় শেখাচ্ছিলুম। আপনার ছাপটা হাতের কাছে ছিল। পাউডার দিয়ে ডেভালপ করে তার একটা এনলার্জ্জড ছবি তুলি—

প্রতুল। কিন্তু উনি যে বললেন ছাপ মুছে দিচ্ছি।

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ দিয়েছিলুম—কিন্তু উল্টো পিঠে—

লোকেন। রেকর্ডে আপনার আঙ্গুলের তো ছাপ নেই তাই, ভাবলুম এতে আর এমন ক্ষতিকর কি হবে—

প্রতুল। তা তো বটেই—

লোকেন। কিন্তু কি করে আঙ্গুলের ছাপ কমপেয়ার করতে হয় তাই শেখাতে গিয়ে কয়েকটা রেকর্ডের ছাপ বার করলুম, আর—

প্রতুল। আর কি ?

লোকেন। রেকর্ডের একটা ছাপের সঙ্গে আপনার আঙ্গুলের ছাপ মিলে গেল।

প্রতুল। ভারী আশ্চর্য্য তো।

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। কারণ সে ছাপ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার। আচ্ছা, মিষ্টার চৌধুরী, আপনার বয়স কত হবে ?

প্রতুল। আপনিই অনুমান করুন।

লোকেন। আমার তো মনে হয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী নয়।

প্রতুল। পঁয়ত্রিশ।

লোকেন। তাইতেই তো গোল বেঁধেছে।

প্রতুল। কেন ? কোন লোকের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হওয়াতে আপনাদের আপত্তি আছে ?

লোকেন। না তা নয়। আপনার বয়স পঁয়ত্রিশ, কিন্তু যে লোকটার আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে আপনার আঙ্গুলের ছাপ মিলেগেছে তার বয়স আপনার চেয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর বেশী।

প্রতুল। তার আমি কি করতে পারি বলুন ? তবে শুনেছিলুম কোন দু'জন লোকের ছাপ এক হতে পারে না।

লোকেন। আজ্ঞে না, হতে পারে না।

খগেন। সেই জন্তই আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে সব কাজ, কারণ তা নির্ভুল। এই প্রথম ভুল প্রমাণিত হ'ল—

লোকেন। অথচ ভুল হওয়া অসম্ভব।

প্রতুল। একটু যে গোলমালে পড়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই লোকটা কে ?

লোকেন। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা জানি না। আমার মনে হয় কোথাও ভুল হয়েছে। খগেনবাবু যে ছাপ ছবিতে পেয়েছেন তা বোধহয় আপনার নয়।

প্রতুল। তা হতে পারে—

লোকেন। আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন,তা হলে এই গোলযোগের মীমাংসা হয়ে যায়।

প্রতুল। কি রকম ?

খগেন। আপনি যদি আমাদের সকলের সামনে আপনার আঙ্গুলের ছাপ দেন—মানে বুঝতে পারছেন, তা হলে আমরা কমপেয়ার করে—

প্রতুল। আপনি কি বলতে চান ?

লোকেন। আমাদের ভুল সম্বন্ধে সিওর হতে পারি। খগেনবাবু, ছাপের জন্ত যা কিছু দরকার, সব সঙ্গে করেই এনেছেন।

খগেন। (পকেট থেকে একটা কৌটা বার করে) এক মিনিটও লাগবে না।

লোকেন। এই দেখুন সেই লোকটার আঙুলের ছাপের ছবি। (পকেট থেকে ছবি বার করলে) আপনাদের সামনেই মিলিয়ে দেখব, তাহলেই ভুল ধরা পড়ে যাবে।

প্রতুল। তা ঠিক। কিন্তু সাধারণতঃ লোকেরা আঙুলের ছাপ দিতে চায় না।

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু এটা অফিশিয়াল নয়

প্রতুল। অফিশিয়াল না হলেও আন-ইউজুয়াল। আপনি কি বলেন ডক্টর গুপ্ত?

নিরঞ্জন। বটেই তো। তবে ওরা যখন এত করে বলছেন—

লোকেন। আজ্ঞে হাঁ। একটা রিকোয়েষ্ট। বুঝতে পারছেন তো দু'জনের একরকম আঙুলের ছাপ হলে কি রকম গণ্ডগোল হবে। পুলিশ, ব্যাঙ্ক, অফিস—সকলের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আপনার সাহায্য চাইছি।

প্রতুল। (হেসে) যদি আমি আপত্তি করি?

লোকেন। (হেসে) তা হলে আপনাকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের লিষ্টে ফেলতে হবে। বুড়ো আঙুল থেকে আরম্ভ করা যাক, কি বলেন? খগেনবাবু, কালীটা নিয়ে আসুন। (খগেন কালীর কৌটা আনলে)

প্রতুল। কিসের সন্দেহ?

লোকেন। সে একটা কিছু ঠিক করে নিলেই হবে। চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, খুনী, টেররিষ্ট—হাতটা লুজ করে রাখুন স্যর—

(প্রতুলের বুড়ো আঙুল কালীতে ডুবিয়ে একটা কাগজে ছাপ নিল)

লোকেন। দেখুন কি পরিষ্কার ছাপ উঠেছে। এইবার তর্জ্জনী—

প্রতুল। খুব ভাল ছাপ উঠেছে তো—

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। (তর্জ্জনীর ছাপ নিয়ে) এই দেখুন। এই-বার মধ্যমা—আমি অনেক দিন থেকে এই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করছি কিনা। অভ্যাস হয়ে গেছে। কত ছাপ যে নিয়েছি, চোর ছ্যাঁচড় থেকে আরম্ভ করে (মধ্যমার ছাপ নিয়ে) সাত সাতটা খুন করেছে এমন লোকের পর্য্যন্ত!

প্রতুল। (অবিচলিত স্বরে) সত্যি!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। এইবার এর পরের আঙুলটা—

খগেন। একদিন থানায় যাবেন স্যর আপনাকে সব দেখিয়ে দেব। খুব ইণ্টারেষ্টিং—

প্রতুল। তাই নাকি! বেশ যাওয়া যাবে।

লোকেন। (আঙুলের ছাপ নিয়ে) আপনি এর আগে নৈনিতালে ছিলেন না?

প্রতুল। হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

লোকেন। এমনি জিজ্ঞেস করলুম। মিষ্টার বসুর সঙ্গে সেইখানেই আপনার আলাপ হয়েছে না? এইবার স্যর কড়ে আঙুলটা—(ছাপ নিয়ে) ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট দিলুম।

খগেন। দিন স্যর, আঙুলগুলো মুছে দিই।

(একটা নেকড়া দিয়ে আঙুল মুছে দিল)

লোকেন। চমৎকার প্রিণ্ট উঠেছে। (ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও একটা ছবি বার করে) এইবার মিলিয়ে দেখা যাক—খগেনবাবু, এ যে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

খগেন। (ছাপের সরঞ্জাম পকেটে রেখে) তাই তো আমি বলেছিলুম।

লোকেন। (প্রতুলকে) এই দেখুন সার। প্রত্যেক আঙুলটা মিলে যাচ্ছে—ষব, দ্বীপ, রেখা—কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়! যখন এই ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছিল তখন আপনি জন্মান নি। অথচ এ যেন আপনারই আঙুলের ছাপের ছবি!

খগেন। তা হলে কি দাঁড়ায়?

লোকেন। বলা শক্ত। মিষ্টার চৌধুরী, আপনি যদি কিছু মনে না করেন. এই প্রিণ্টগুলো আমি নিয়ে যাব।

প্রতুল। যদি নিয়ে যান, আমার অমতে নিয়ে যেতে হবে।

লোকেন। ব্যাপারটা গুরুতর।

প্রতুল। পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে কেউই ভালবাসে না।

লোকেন। তা জানি স্যর। আচ্ছা, এক কাজ করুন না। একবার আমাদের আপিসে আসতে পারেন—

প্রতুল। আজ তা সম্ভব হবে না। আমাদের সমস্ত এনগেজ্‌মেণ্ট আপ্‌সেট হয়ে যাবে।

লোকেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে লোকে এন্‌গেজমেণ্ট অনেক সময় আপসেট করতে বাধ্য হয়—

প্রতুল। আপনি ইচ্ছা করলে জোর করে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। পুলিশের চোখে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাম কতটুকু।

লোকেন। তা আমি করতে চাই না। তবে আপনাদের শান্তি এবং স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তই আমাদের অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন করতে হয়।

খগেন। আচ্ছা, আজ না পারেন তো কাল একবার—

লোকেন। হ্যাঁ, তাতেও চলবে। পারবেন?

প্রতুল। কাল হতে পারে। কখন?

লোকেন। দশটা নাগাদ—

প্রতুল। দশটায় একটু অসুবিধা হবে। ধরুন খেয়ে দেয়ে যদি তিনটে নাগাদ যাই।

লোকেন। তাতেই হবে। ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট দিলুম স্যর, কিছু মনে করবেন না।

প্রতুল। না, না, কষ্ট কিসের।

লোকেন। (খগেনকে আড়াল করে) কাল এলে আমাদের ব্ল্যাক্ মিউজিয়াম আপনাকে দেখাব। সব বড় বড় খুনী, ডাকাতদের ছবির রেকর্ড—ভারী ইণ্টারেষ্টিং—(লোকেন কথা কইছে, সেই ফাঁকে একটা

রুমাল দিয়ে খগেন প্রতুলের তুলি তুলে নিয়ে পকেটে রাখলে—তারপর অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে এল)

খগেন। তাহলে আজ আমরা চলি।

লোকেন। আমাদের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করলেন তার জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার ডক্টর গুপ্তা—

নিরঞ্জন। নমস্কার।

খগেন। নমস্কার স্যর। কাল বিকেলে তবে—

প্রতুল। সেখানে গেলে কি করবেন?

লোকেন। আপনার আঙুলের ছাপ নিয়ে ম্যাগনিফাই করে ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব পার্থক্যটা কোথায়।

খগেন। আমি তো পার্থক্য খুঁজে পাই নি।

লোকেন। নিশ্চয়ই আছে। খুব বড় করে এনলার্জ করলে ধরা পড়বেই। (প্রতুলের) আপনাকেও দেখতে চাই। তবে যদি কোন পার্থক্য না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে আপনি সেই লোক, আপনার বয়স পঁচাশীর কাছাকাছি, অ্যাণ্ড ছাট ইজ ইম্‌পসিবল। সমস্ত ব্যাপারটা ভৌতিক কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে, আচ্ছা স্যর—নমস্কার।

খগেন ও লোকেনের প্রস্থান

(প্রতুল কিছুক্ষণ দরজায় কান পেতে কি শোনবার চেষ্টা করল। তারপর দরজাটা হঠাৎ খুলে বাহিরে দেখে এসে আবার বন্ধ করলে)

প্রতুল। দেখছিলুম ওরা আড়ি পেতে শুনছে কিনা?

নিরঞ্জন। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে ঠেকছে। ওদের মনে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ হয়েছে।

প্রতুল। প্রিন্টগুলো পরিষ্কার উঠেছিল, তাই নিয়ে যেতে দিলুম না—

(কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ঘরে কি যেন খুঁজতে লাগল)

নিরঞ্জন। কি খুঁজছ?

প্রতুল। আমার তুলিটা?

নিরঞ্জন। ছবির কাছেই টুলের ওপর ছিল তো।

প্রতুল। এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই ওরা নিয়ে গেছে।

নিরঞ্জন। তাতে তোমার আঙুলের ছাপ আছে। কাগজটা দিলেনা দেখে—

প্রতুল। এরা ভয়ানক চালাক—

নিরঞ্জন। শুধু চালাক নয়, ডেঞ্জারাস।

প্রতুল। হ্যাঁ। (একটু পরে) আঙুলের ছাপ কোত্থেকে পেলে?

নিরঞ্জন। আগেকার কোন কেসের—

প্রতুল। কিন্তু আমি তো প্রত্যেক বারই খুব সাবধানে কাজ করেছি।

নিরঞ্জন। ওরা আরও বেশী সাবধানে সন্ধান করেছে। খুঁত একটু না একটু মানুষ মাত্রেরই থাকে। এখন তোমার একটীমাত্র কর্তব্য—

প্রতুল। এখান থেকে সরে পড়া।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এবং অবিলম্বে। এখনই—

প্রতুল। এখনই— (এগিয়ে গিয়ে ছবির দিকে চেয়ে রইল)

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এখনই। আমার কি রকম মনে হচ্ছে যে দেরী করলে— (বাহিরে খট খট ধ্বনি)

প্রতুল। কে?

জনার্দ্দন। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস। (জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—নাম গিরীন পাত্র—বললেন?

প্রতুল। গিরীন! আচ্ছা, ওঁকে পাঠিয়ে দাও। (জনার্দ্দনের প্রস্থান)

নিরঞ্জন। ওর সঙ্গে তোমার যা বন্দোবস্ত হয়েছে, সব ক্যান্সেল করে দাও।

প্রতুল। তা সম্ভব নয়।

নিরঞ্জন। কিন্তু এখানে থেকে তোমার এ রকম কাজের মধ্যে জড়িত হওয়া ভয়ানক রিস্কি।

প্রতুল। তা জানি। কিন্তু নিরুপায়। আর একজন লোকের জোগাড় করে তাকে আবার এই রকম কাজে রাজী করাতে অনেক দিন লাগবে। অথচ আমার হাতে খুব অল্প সময়।

নিরঞ্জন। কিন্তু এখন একাজ করা তোমার উচিত হবে না। এখনই তোমার কলিকাতা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। (গিরীন পাত্রের প্রবেশ)

গিরীন। প্রতুলবাবু, আমি— (নিরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে চুপ করল)

প্রতুল। আজ আপনি আসবেন তা তো আশা করি নি—

গিরীন। না, কিন্তু বিশেষ দরকারে পড়ে এসেছি। পিছন দিকের গলি দিয়ে এসেছি, কেউ দেখতে পায়নি।

প্রতুল। বার বার আমার কাছে আসাটা উচিত নয়—

নিরঞ্জন। গিরীনবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?

গিরীন। ভাল স্যার। নমস্কার। (প্রতুলের প্রতি চাপা গলায়) আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ছিল—

নিরঞ্জন। কিছু মনে করবেন না গিরীনবাবু। প্রতুল, আমার কয়েকটা জিনিষ ওঘরে গোছাবার আছে··· (নিরঞ্জনের প্রস্থান)

প্রতুল। বসুন, কি বলবার আছে—

গিরীন। আমায় এখনই চলে যেতে হবে। (প্রতুলের কাছে সরে এসে) কাল টাকা যাবে—

প্রতুল। কাল! কখন?

গিরীন। কাল সকালে। ঠিক ব্যাঙ্ক খুলতেই, দশটা নাগাদ। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। সব নোট।

প্রতুল। কাল সকালে?

গিরীন। হ্যাঁ। (একটু থেমে) তবে আপনার যদি ইচ্ছা না থাকে বা মত বদলায়—

প্রতুল। মত বদলাবে কেন? হাওড়া পুলে পৌঁছবে সাড়ে দশটা নাগাদ, কি বল?

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হলে কাজে লাগবেন?

প্রতুল। নিশ্চয়ই। কেন, আপনার ভয় করছে?

গিরীন। আমার ভয় করছিল আপনার জন্য। যদি শেষ অবধি পেছিয়ে যান।

প্রতুল। সে ভয়ের কোন কারণ নেই। খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবেন।

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। কি কি করতে হবে সব মুখস্থ আছে। কিছু ভাববেন না।

প্রতুল। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী অপেক্ষা করবে—

গিরীন। গাড়ীর মধ্যেই পোষাক বদলে নেব—

প্রতুল। হ্যাঁ, পোষাক গাড়ীতেই থাকবে। আপনার পোষাক আর ব্যাগ গাড়ীতে ফেলে রেখে, নতুন ব্যাগে টাকাগুলো নিয়ে নেবেন—

গিরীন। তারপর উইলিংডন ব্রীজের কাছে গিয়ে গাড়ী বদল করে একটা ট্যাক্সিতে চড়ব—

প্রতুল। হ্যাঁ। ব্রীজ পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরের রাস্তা দিয়ে বাগবাজার হয়ে আমার বাড়ীতে আসবেন। তা হলে কেউ আপনাকে ফলো করতে পারবে না।

গিরীন। এত সাবধান হলে কি করে ফলো করবে! আমার জিনিষ-পত্তর সব এখানে রেডী থাকবে তো?

প্রতুল। নিশ্চয়ই। তারপর আপনি এমন দূর দেশে পাড়ি দেবেন যে কেউ আর আপনাকে খুঁজে পাবে না।

গিরীন। আমি এ কাজে হয়ত' হাত দিতুম না, কিন্তু এই ব্যাঙ্কের লোকেরা আমার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করেছে—জানেন, ফণীবাবু আমার পরে জয়েন করে আমাকে সুপারসীড করে গেল। এতে কার না রাগ হয়?

প্রতুল। বটেই তো! মাত্র কালকের দিনটা বই ত নয়!

গিরীন। আমি সেই এক কাজে আজ বারো বছরের ওপর রগড়াচ্ছি। নো-প্রোমোশন! একটা বন্ধ ঘরে বসে খালি টাকা গুণছি! এতদিনে আমার অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে যাবার কথা। অন্ধকার ঘর, দিনে আলো জেলে রাখতে হয়—

প্রতুল। আজ শেষ। কাল থেকে আপনাকে আর ত' সেখানে যেতে হবে না।

গিরীন। না। এ কি কম শাস্তি। জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

প্রতুল। এইবার আপনি চির-শান্তি পাবেন। আর কারো চাকরী করতে হবে না।

গিরীন। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজ উঠি। এখনই আবার আপিসে যেতে হবে। আজ রাত্রে এক্সট্রা ডিউটা দিতে হবে বলে এক ঘণ্টা ছুটী পেয়েছিলুম।

প্রতুল। মনে রাখবেন, খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

গিরীন। নিশ্চয়ই। আচ্ছা নমস্কার।

প্রতুল। নমস্কার।

গিরীন। (দরজার কাছে গিয়ে) সকাল সাড়ে দশটায়—

প্রতুল। হ্যাঁ—ঠিক সাড়ে দশটায়— (গিরীনের প্রস্থান)

প্রতুল। (ল্যাবরেটরীর দরজা খুলে) নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। (নেপথ্যে) এই যে— (নিরঞ্জনের প্রবেশ)

প্রতুল। টাকার বন্দোবস্ত কালই হবে।

নিরঞ্জন। কালই?

প্রতুল। হ্যাঁ। খুব বরাত ভাল যে ঠিক সময়—

নিরঞ্জন। প্রতুল—তুমি এ কাজ এখনও করতে যাচ্ছ। জান, পুলিশ তোমায় সন্দেহের চোখে দেখছে—

প্রতুল। জানি। কিন্তু তারা তো গিরীনকে চেনে না।

নিরঞ্জন। চিনে নিতে কতক্ষণ!

প্রতুল। সেই কতক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। নিরঞ্জন তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ। এতে কোন রিস্‌ক্ নেই। কাল তিনটে অবধি আমি সন্দেহের বাইরে। হাতে অনেক সময় আছে।

নিরঞ্জন। তাহলে একান্তই তুমি একাজ করবে।

প্রতুল। হ্যাঁ। করতেই হবে।

নিরঞ্জন। (ল্যাবরেটরীর দিকে দেখিয়ে) ও ঘরের বাথ-টবের ব্যাপার—

প্রতুল। হ্যাঁ, তাও। টাকার আমার প্রয়োজন, আর গিরীনকে সরানোও আমার প্রয়োজন। বম্বেতে গিয়ে আমার অনেক টাকার দরকার পড়বে।

নিরঞ্জন। কিন্তু আমার মতে এ সময় ও কাজে তুমি হাত দিও না।

প্রতুল। অসম্ভব। এতটা এগিয়ে এখন আর থামা যায় না। গিরীন ভ্যানের মধ্যে টাকার ব্যাগ বদল করবে। আমি সাহায্য না করলে ধরা পড়ে যাবে। তারপর জেরায় সে আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেবে—

নিরঞ্জন। তার আগে তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবে।

প্রতুল। না, তাতে আরও বেশী গণ্ডগোল হবে। আমি টাকা নিয়ে কাল দুপুরের গাড়ীতে যাব। তুমি আজই চলে যাও। বম্বেতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে দেখা কোরো।

নিরঞ্জন। কিন্তু আমার আজ যাওয়া হতে পারে না। কাল সকালে যাব।

প্রতুল। আমি চাই না যে তুমি কাল এখানে থাক।

নিরঞ্জন। কেন? গিরীন পাত্রের জন্য!

প্রতুল। (একটু থেমে) হ্যাঁ।

নিরঞ্জন। প্রতুল, ও কাজ কোরো না।

প্রতুল। করতেই হবে।

নিরঞ্জন। আমি এ জিনিষ সাপোর্ট করতে পারি না—

প্রতুল। কিন্তু আমার এ ছাড়া অন্য কোন নিরাপদ পথ নেই।

নিরঞ্জন। আমার মনে হয় এই সব ব্যাপারের সন্ধানই পুলিশ পেয়েছে।

প্রতুল। হতে পারে না। কোন বার এই রকম হিণ্ট কাগজে দেয় নি।

নিরঞ্জন। সন্দেহের কথা পুলিশ সব সময় ব্যক্ত করে না, পাছে আসামী সাবধান হয়ে যায়। বন্ধু, এবার তোমার ভাগ্য খারাপ যাচ্ছে। রেজাকে দিয়ে কাজ হ'ল না, সুবোধবাবু রাজী হলেন না, পুলিশ একবার এল, অন্য ডাক্তার রাজী হ'ল না, আবার পুলিশ এল—এখন আবার যখন পালাবার বিলক্ষণ সময় হাতে রয়েছে, এখন টাকার জন্য দ্বিধা করছ—কে জানে, এই দ্বিধার জন্যই হয় ত'—

প্রতুল।—তুমি বৃথা আমার জন্য ভয় পাচ্ছ নিরঞ্জন!

নিরঞ্জন। বিলক্ষণ ভয়ের কারণ রয়েছে।

প্রতুল। চিন্তিত হবার মত নয়। (বাহিরে খট খট ধ্বনি)

নিরঞ্জন। তোমার চলে যাওয়া উচিত।

প্রতুল। যাব—কাল।

নিরঞ্জন। না, কাল নয় আজ, এখনই, এই মুহূর্ত্তে—

প্রতুল। কে? (আবার খটখটধ্বনি)

রেজা। (নেপথ্যে) আমি হুজুর।

প্রতুল। ভেতরে এস। (জনার্দ্দনের প্রবেশ)

রেজা। স্যর, সেইদিন যে মেয়েটী এসেছিলেন, মিস বসু—

প্রতুল। ওঃ! তিনি এসেছেন? আচ্ছা নিয়ে এস।

(জনার্দ্দনের প্রস্থান)

নিরঞ্জন। মিস বসু! এই আর একটী কারণ যে জন্য আমি তোমাকে এত করে যেতে বলছি। (ক্রমশঃ)

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক
পঞ্চম প্রকরণ—মন্ত্রি-পুরোহিতোৎপত্তি

নবম অধ্যায়

মূল :—জানপদ, অভিজাত, স্বৰ্গ্রহ অবগ্রহ-বিশিষ্ট, শিল্প-শিক্ষা-যুক্ত, দূরদৃষ্টি, প্রাজ্ঞ, ধারণাশক্তিমান্, দক্ষ, বাগ্মী, প্রগল্ভ, প্রতিপাত্তমান্, উৎসাহ প্রভাব-যুক্ত, ক্লেশসহ, শুচি, মিত্রভাবাপন্ন, দৃঢ়ভক্তি, শীল বল-আরোগ্য সত্ত্ব সম্পন্ন, স্তব্ধভাব ও চাপল্যবর্জ্জিত, সম্প্রিয়, অবৈরকারী—এইগুলি অমাত্য-সম্পৎ। ইহার এক পাদ ও অর্দ্ধগুণহীন (যথাক্রমে) মধ্যম ও নিকৃষ্ট।

সঙ্কেত :—মন্ত্রী—প্রধানামাত্য—অপরাপর অমাত্যবর্গ তাঁহার অধীন। মন্ত্রীর নিম্নলিখিত পঞ্চাবংশতি গুণ থাকা প্রয়োজন। জানপদ—জনপদে জাত; বিজিগীষু-রাষ্ট্রে উৎপন্ন (গঃ শাঃ)—অর্থাৎ দেশী লোক হওয়া চাই, বিদেশী বা domiciled হইলে হইবে না; native (S H)। অভিজাত—বিশুদ্ধ উচ্চবংশজাত। স্ববগ্রহ : (মূল)—শোভনবন্ধু এইরূপ সাম্প্রদায়িক অর্থ (গঃ শাঃ); influential (S H)। গণপতি শাস্ত্রী আর একটি অর্থ দিয়াছেন—যাঁহাকে প্রমাদ বা অকার্য্য হইতে অনায়াসে নিবৃত্ত করা যায়—easily accessible or amenable. শিল্প গজ-অশ্ব-রথারোহণ-যুদ্ধ-গান্ধর্ব্ববিদ্যা ইত্যাদি। চক্ষুষ্মান্ (মূল)—নীতি-শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রই চক্ষুঃ (গঃ শাঃ); অর্থশাস্ত্রাভিজ্ঞ; possessed of foresight (S H) প্রাজ্ঞ—প্রজ্ঞা—স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি—তদ্বিশিষ্ট, wise. মেধাবী—of strong memory (S H)। দক্ষ—ক্ষিপ্রকারী (গঃ শাঃ); কর্ম্মে কুশল; bold (S H)—expert বা skilful বলা উচিত। বাগ্মী—মধুর ও যুক্তিপূর্ণ বচনের বক্তা (গঃ শাঃ), eloquent (S H)—orator, finished speaker বলা ভাল। প্রগল্ভ—প্রৌঢ় (গঃ শাঃ); skilful (S H), forward বা full of enthusiasm বলা উচিত। প্রতিপত্তিমান্—প্রতিকারে বা প্রতিবচনে সমর্থ; অথবা ইতিকর্ত্তব্যতা-নিশ্চয় যাঁহাদের আছে। (গঃ শাঃ); intelligent (S H). শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদটি ভাল। প্রতিপত্তি—বোধ—বোধ শক্তি-বিশিষ্ট এইরূপ অর্থ ই সঙ্গত। উৎসাহপ্রভাবযুক্ত—পুরুষকার-যুক্ত ও শক্তিমান্, অথবা উৎসাহ-শক্তি ও প্রভুশক্তি-বিশিষ্ট; possessed of enthusiasm and dignity (S H)। উৎসাহশক্তি—the power of energy বলা ভাল। প্রভুশক্তি—কোশ-দণ্ডজনিত তেজঃ (অমরকোশ) —majesty or pre-eminent position of the king himself—এইরূপ অনুবাদ আপ্তে করিয়াছেন। ক্লেশসহ—শ্রমজয়ী (গঃ শাঃ); possessed of endurance (S H), শুচি—চতুর্ব্বিধ উপধা-দ্বারা শুদ্ধ (গঃ শাঃ); pure in character (S H)। মৈত্র—সর্ব্বত্র স্নিগ্ধভাবে ব্যবহারকর্ত্তা (গঃ শাঃ); affable (S H)—friendly. দৃঢ়ভক্তি—অবিচলিত-রাজানুরাগ-বিশিষ্ট (গঃ শাঃ); firm in loyal devotion (S H)—শীল। সদ্বৃত্ত (গঃ শাঃ); excellent conduct (S H)। বল —দেহশক্তি (গঃ শাঃ); strength (S H)। আরোগ্য ব্যাধিহীনতা; health (S H)। সত্ত্ব ধৈর্য্য (গঃ শাঃ); আর; bravery (SH) —stamina বলা ভাল। স্তম্ভ—স্তব্ধভাব, উদ্ধত গর্ব্বিত ভাব; procastination (S H)—অনুবাদ ঠিক নহে—haughteur বলিলে ভাল হয়। চাপল্য—অস্থিরস্বভাব fioklemindedness (S H); সম্প্রিয়—

সৌম্যদর্শন (গঃ শাঃ)—সম্যগ্‌রূপে জনপ্রিয় বলা উচিত ; affectionate (S H) ; popular বলাই সঙ্গত। বৈরাণামকর্ত্তা (মূল)—স্ত্রী-ভূমি-প্রভৃতি নিমিত্ত বৈরোৎপাদন যিনি না করেন—অথবা উক্ত-নিমিত্তক বৈরভাবের প্রশমন-কর্ত্তা (গঃ শাঃ) ; free from such qualities as excite hatred and enmity.—এই পঞ্চবিংশতি গুণ অমাত্যের পরিপূর্ণ সম্পৎ। এই পঞ্চবিংশতিটি গুণই যাঁহাতে বর্ত্তমান—তিনিই উত্তম অমাত্য বা প্রধান মন্ত্রী হইবার যোগ্য। ইহাদিগের একপাদ (অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ) যাঁহার নাই, তিনি মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য হইবার উপযোগী। আর ইঁহাদিগের অর্দ্ধেক গুণ যাঁহার নাই—তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণীর অমাত্য হইতে পারেন। পাদার্দ্ধগুণহীনৌ—শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ ভ্রান্তিকর—possessed of one half or one quarter of the above qualifications—devoid of one fourth or one half of these qualifications—বলা উচিত।

মূল :—তাহাদিগের মধ্যে জনপদ (ও) অবগ্রহ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকটে পরীক্ষা করিবেন ; সমান বিদ্যাবিশিষ্টগণের নিকট শিল্প ও শাস্ত্রচক্ষুষ্মত্তার (পরীক্ষা করিবেন) ; কর্ম্মারম্ভে প্রজ্ঞা, ধারয়িষ্ণুতা ও দক্ষতার (পরীক্ষা করিবেন) ; কথাপ্রসঙ্গে বাগ্মিতা, প্রগল্‌ভতা ও প্রতিভার (পরীক্ষা করিবেন) ; আপদে উৎসাহ ও প্রভাব-শক্তির ও ক্লেশসহিষ্ণুতার (পরীক্ষা করিবেন) ; সম্যগ্‌রূপ ব্যবহার হইতে শুচিতা, মৈত্রী ও দৃঢ়ভক্তির (পরীক্ষা করিবেন) ; সহবাসিগণের নিকটে শীল বল-আরোগ্য-সত্ত্ব-যোগ-অস্তব্ধভাব ও অচাপল্যের (পরীক্ষা করিবেন) ; প্রত্যক্ষতঃ সম্প্রিয়ত্ব ও অবৈরিতার (পরীক্ষা করিবেন)।

সঙ্কেত :—তাহাদিগের—উত্তম-মধ্যম-অধম-এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ; অথবা—জানপদত্বাদির মধ্যে। আপ্ততঃ (মূল)—আপ্তিযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে ; আপ্তি—বিশ্বাস, আপ্য—বিশ্বাস্য। আপ্ত, বিশ্বস্ত—প্রামাণিক পুরুষ—যথাদৃষ্টার্থবাদী (গঃ শাঃ) ; from reliable persons. পরীক্ষা করিবেন—পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন। সমানবিদ্য—তুল্য-বিদ্যাবিদ্‌। শাস্ত্রচক্ষুষ্মত্তা—শাস্ত্ররূপ চক্ষু ; তত্ত্বতা—শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত প্রজ্ঞা ; শ্যামশাস্ত্রী ইহার অনুবাদ করেন নাই—পক্ষান্তরে শিল্পের ইংরাজি দিয়াছেন—educational qualifications. ইহা সম্ভবতঃ ছাপার ভুল। বরং scriptural lore বলা উচিত। কর্ম্মারম্ভ—কার্য্যানুষ্ঠান (গঃ শাঃ) আরম্ভ অর্থে সুরু করা নহে ;—'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী'—গীতা ১২। ; application in works (S H) ; undertakings বলা ভাল। কথাযোগ—কথাপ্রসঙ্গ (গঃ শাঃ) power shown in narrating stories, in conversation (S H)। প্রতিভানবত্ত্ব—নব নব উন্মেষ-শালিনী প্রজ্ঞাপ্রতিভা ; flashing intelligence (S H) ; geniusবলা উচিত। ক্লেশসহত্ব-bravery in troubles (S H)—মূলানুগ নহে—capability of enduring troubles বলা উচিত। সংব্যবহার (মূল)—সমাচরণ (গঃ শাঃ) ; সংব্যবহার ও ব্যবহার একই অর্থ ; frequent association (S H) ; dealing বলা ভাল। সংবাসী (মূল)—সহবাসী (গঃ শাঃ) ; intimate friends (S H). অস্তব্ধ-ভাব—দম্ভের অভাব।

মূল :—রাজবৃত্তি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অনুমেয়। স্বয়ংদৃষ্ট প্রত্যক্ষ, পরোপদিষ্ট পরোক্ষ। কৃত (কর্ম্মাংশ-দ্বারা) অকৃত (কর্ম্মাংশের) উৎপ্রেক্ষণ অনুমেয়।

সঙ্কেত :—জানপদত্বাদি গুণ-জ্ঞানে প্রত্যক্ষ, আপ্তবাক্য ও অনুমান এই তিন প্রমাণই আশ্রয়ণীয় কেন তাহার কারণ এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে (গঃ শাঃ)। রাজবৃত্তি—রাজবৃত্ত, রাজচরিত্র, রাজব্যবহার (গঃ শাঃ) ; works of a king (S H) পরোক্ষ—আপ্তবাক্য হইতে অবগত (গঃ শাঃ) ; taught by another, invisible (S H)। কৃত (অনুষ্ঠিত) কর্ম্মাংশ-দ্বারা অকৃত (ক্রিয়মাণ) কর্ম্মাংশের পরিণাম-সম্বন্ধে আন্দাজ করার নাম—অনুমেয়। Inference of what is not accomplished from what is accomplished is inferential (S H)। Inference না বলিয়া speculation বলিলে ভাল হইত।

মূল :—কর্ম্মসমূহের যৌগপদ্যহেতু ও অনেকত্ব ও অনেক (স্থান) স্থিতত্ব-নিবন্ধন—'দেশকালাত্যয় না হউক'—এই (অভিপ্রায়ে) পরোক্ষভাবে অমাত্যগণ কর্ত্তৃক (কর্ম্ম সম্পাদন) করাইবেন—ইহাই অমাত্য কর্ম্ম।

সঙ্কেত :—শ্যামশাস্ত্রীর পাঠ—"অযৌগপদ্যাত্‌ কর্ম্মণাম্"। গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—"যৌগপদ্যাত্‌ কর্ম্মণাম্"। শেষোক্ত পাঠটিই ভাল লাগিয়াছে। কর্ম্মগুলি যদি যুগপৎ-সম্পাদ্য না হয়, তাহা হইলে বরং রাজার পক্ষে স্বয়ং ঐগুলি সম্পাদন করার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু যুগপৎ-সম্পাদ্য হইলে একাকী রাজার পক্ষে এককালে বিভিন্ন দেশে বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মোটেই সম্ভব হয় না—অগত্যা অমাত্যগণের দ্বারা ঐ সকলের অনুষ্ঠান করাইতে হয়। গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—রাজকীয় কর্ম্ম সংখ্যায় বহু, বহুপ্রকার ও নানা প্রদেশে উহাদের যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ সকল কর্ম্মের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান রাজা স্বয়ং করিতে পারেন না। অতএব, যথাযোগ্য দেশ-কাল-বিভাগানুযায়ী তাহাদের অনুষ্ঠানার্থ অমাত্য-নিয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই সকল কর্ম্ম যাহাতে সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে গুণবান্‌ অমাত্য নিযুক্ত করা উচিত। এই কারণে অমাত্যগণের গুণ-পরীক্ষার বিধান। শ্যামশাস্ত্রীর ইংরাজী- As works do not happen to be simultaneous—ইহা তদীয় পাঠের অনুরূপ। অনেকস্থত্বাৎ (মূল)—অনেক দেশে অবস্থিত বলিয়া ; 'pertain to distant and different localities' (S H) ; distant—মূলে নাই। 'দেশকালাত্যয়ো মা ভূৎ'—দেশ ও কালের অত্যয় (অতিক্রম) না হউক ; 'in view of being abreast of time and place' (S H)—মূলানুগ নহে—with the intention—'let there be no lapse of time and place'—বলা চলিত।

মূল :—উদিতোদিত কুলশীল-সম্পন্ন ষড়ঙ্গ বেদ-দৈব-নিমিত্ত ও দণ্ডনীতিতে উত্তমরূপে শিক্ষিত—ও দৈব মানুষ আপৎসমূহের অথর্ব্ব-মন্ত্র ও উপায় দ্বারা প্রতিকারকর্ত্তাকে পুরোহিত করিবে। আচার্য্যকে যেরূপ শিষ্য, পিতাকে (যেমন) পুত্র, স্বামীকে যেরূপ ভৃত্য (অনুবর্ত্তন করে), সেইরূপ তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবেন।

সঙ্কেত :—উদিতোদিতকুলশীলং (মূল)—'উদিতৈঃ শাস্ত্রোক্তৈর্বিদ্যা-ভিজনাদিভিঃ উদিতাঃ সমৃদ্ধঃ উদিতোদিতাং তেষাং কুলং বৃত্তং চ যস্য তং তথাভূতম্, উদিতোদিতকুলজাতম্ উদিতোদিতাচারযুক্তম্ চ' (গঃ শাঃ)। উদিত—উক্ত—শাস্ত্রোক্ত গুণ বিদ্যা-উচ্চবংশে জন্ম ইত্যাদি ; তাহাদিগের দ্বারা উদিত অর্থাৎ সমৃদ্ধ। উদিতোদিত—শাস্ত্রোক্তগুণ-সমৃদ্ধ। উদিতোদিত কুল ও শীল যাহার। যাঁহার বংশে পূর্ব্বপুরুষগণ শাস্ত্রোক্তগুণ-সমৃদ্ধ, আর যিনি স্বয়ং শাস্ত্রীয়গুণসম্পৎ?সম্পন্ন।—ইহাই গণপতি শাস্ত্রীর অভিমত অর্থ। শ্যামশাস্ত্রী উদিতোদিত—বীপ্সায় দ্বিত্ব ধরিয়া 'বিশেষরূপে প্রশংসিত'—এই অর্থ করিয়াছেন—'whose family and character are highly spoken of.' দৈব—জ্যোতিষ—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের পরিণাম 'দৈব' নামে অভিহিত হয়—ইহা যে শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হয়, তাহাই দৈব (গঃ শাঃ) ; নিমিত্ত—শকুনশাস্ত্র, হাঁচি-টিক্‌টিকি ইত্যাদি ; কামসূত্রে চতুঃষষ্টি ললিত-কলার মধ্যে 'নিমিত্তজ্ঞান' অন্যতম কলারূপে নিরূপিত হইয়াছে। শ্যামশাস্ত্রী একত্রে অনুবাদ করিয়াছেন—'portents, providential or accidental.' অভিবিনীত—সুশিক্ষিত, well versed. শ্যামশাস্ত্রী ইহার অর্থ করিয়া অত্যন্ত বিনীত—obedient ('S H)। দৈব-মানুষ সম্পৎ—দেবকৃত ও মানুষকৃত সম্পৎ। অথর্ব্বভিঃ—অথর্ব্ববেদোক্ত শান্তি-মন্ত্রাদি প্রয়োগে দৈবকৃত আপদের প্রতিকার করা যায়। আর মানুষকৃত আপদের প্রতিকার করিতে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—এই চার উপায়ের প্রয়োজন। অনুবর্ত্তন—অনুসরণ।

মূল :—ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত মন্ত্রি-মন্ত্রণা-দ্বারা অভিমন্ত্রিত শাস্ত্রানুগামী ক্ষত্র অশস্ত্রযুক্ত (হইয়াও) একান্তভাবে অজিতকে জয় করিয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—ব্রাহ্মণ—পূর্ব্বোক্ত-গুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণজাতীয় পুরোহিত। এধিত (মূল)—বর্দ্ধিত ; সম্পৎসমূহের বিবরণ-দ্বারা বৃদ্ধি (পুষ্টি) প্রাপ্ত। মন্ত্রী—যথোক্তগুণ-বিশিষ্ট অমাত্য ; তাঁহাদিগের মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রণা—কর্ত্তব্য-বিষয়-নিশ্চয় ; তাহার দ্বারা অভিমন্ত্রিত—সংস্কৃত। অভিমন্ত্রিত স্থলে 'অভিরক্ষিত' পাঠও পাওয়া যায়। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—charmed ; well advised বলা চলিত। শাস্ত্রানুগম্—শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে তৎপর (গঃ শাঃ) ; faithfully follows the precepts of the shastras (S H) ; faithfully—না বলিলেও চলে। অশস্ত্রিতম্—শস্ত্রযুক্ত না হইয়াও—অর্থাৎ বিনা যুদ্ধেও (গঃ শাঃ) ; though unaided with weapons (S H) ; Jolly—'There is a pun here....faithful to the dictates of the shastra though unaided with weapons.' পাঠান্তর—শাস্ত্রানুগতশাস্ত্রিতম্—শাস্ত্রানুমোদিত-শাস্ত্র-ব্যবহারী—যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে এরূপ শাস্ত্র ব্যবহার করিবেন না—ইহাই বক্তব্য—'provided with arms handled according to science'(Jolly). অত্যন্ত অজিতং জয়তি (মূল)—গণপতিশাস্ত্রীর মতে—অজিত (অর্থাৎ অলব্ধকে) জয় (লাভ) করেন। কিন্তু শ্যামশাস্ত্রীর অর্থ—অজিত হইয়া থাকেন ও অত্যন্ত জয় করেন (অর্থাৎ সফলতা লাভ করেন)—becomes invincible and attains success. গণপতি শাস্ত্রীর মতে—ইহা অলব্ধ-লাভ-রূপ ফল সূচিত করিতেছে ! অন্যথায়, অজিত হয় ও জয়লাভ করে—এ দুইটি বাক্যের পুনরুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে মন্ত্রিপুরোহিতোৎপত্তি-নামক পঞ্চম প্রকরণে নবম অধ্যায়।

আমি চাই প্রেম

শ্রীবীণা দেবী

আমি চাই প্রেম নিকষিত হেম
সোনার আখরে লিখা
যে প্রেম পরশে অনল বরষে
জ্বলি' উঠে প্রাণ-শিখা।
বঁধু সেই প্রেম মোর ভালো—
দুখ পাই আমি তাহে ক্ষতি নাই
দহনের জ্বালা স'ব বঁধু তাই ;
শুধু অন্ধকার দূরি'
মণিকোঠা ভরি'
জ্বেলে নিতে চাই আলো।
যে আলোকে সদা তোমারে হেরিয়া
বাসিব সবারে ভালো।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি

১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের পর সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বাংলা সরকার তথা ভারত সরকারকে অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে দেশের অন্নসমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সরকার বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে গোপনে গোপনে কিরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু অবস্থা দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও আশানুরূপ সজাগ নন। বাংলায় এখনই খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়িবার মত অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। রেশনহীন অঞ্চলে চাউলের দাম ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে এবং সময়ে সময়ে কালনার ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু সহরেও খোলা বাজারে চাউল পাওয়া না যাইবার সংবাদ আসিতেছে। বিগত মন্বন্তরের আগেও যেমন সরকার দেশবাসীকে অন্নস্বচ্ছলতা সম্বন্ধে আশান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবারও তাঁহাদের দিক হইতে সেই চেষ্টার ত্রুটি দেখা যাইতেছে না। গত ৪ঠা জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতায় বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসি পর্য্যন্ত সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাংলা এখন উদ্বৃত্ত প্রদেশ এবং এখান হইতে ঘাটতি অঞ্চলসমূহে খাদ্যশস্য প্রেরণ করিলে কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু সরকারী মতে উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইলেও বাংলার অন্নস্বাচ্ছল্যের কোন প্রমাণই যে এখন পাওয়া যাইতেছে না, তাহা দেশবাসী মাত্রেই জানেন। এখনই কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে বহিরাগত নিরন্নের দল অন্নের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে সুরু করিয়াছে। শুধু বাংলার লোকই এই আসন্ন সঙ্কট-সম্বন্ধে আশঙ্কাগ্রস্ত হয় নাই, বিখ্যাত বিলাতী পত্রিকা 'অবজারভার' পর্য্যন্ত গত ৭ই অক্টোবর 'বাংলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের ভীতি' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বড় বড় হরফে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এবার পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টি ও পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য বাংলায় প্রভূত শস্যহানি হইয়াছে এবং সরকারই স্বীকার করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের হিসাব ছাড়িয়া দিলেও এবার গত বৎসরের শতকরা ৯৪ ভাগের বেশী ফসল পাওয়া যাইবে না। আমাদের মনে হয় সরকারী হিসাব অপেক্ষা ফসলের অবস্থা আরও খারাপ। আউশ ফসল এবারে অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমনও এবার তিন চতুর্থাংশ ভাগের বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয় না। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ অবস্থায় আগামী বৎসর বাংলায় খাদ্যাদির জোগান ও চাহিদার সমতা রক্ষা করিতে হইলে বাংলার প্রতি কণা চাউল সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া বাহির হইতে যথাসাধ্য চাউল আমদানী করা উচিত। কিন্তু চাউল সংরক্ষণ দূরে থাক, বাংলা সরকার বদান্যতা করিয়া বাংলা হইতে চাউল রপ্তানীর যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে দেশবাসীর আতঙ্কিত না হইয়া উপায় নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদের জাতীয় দলের নেতা ও ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জি সম্প্রতি এক পত্রে ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সকে জানাইয়াছেন যে, বাংলাকে আসন্ন দুর্গতি হইতে বাঁচাইতে হইলে অবিলম্বে এই প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে। গত ১২ই অক্টোবর রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা সরকারের খাদ্যবিভাগের পরামর্শদাতা মিঃ এ উইলিয়ামস্ বলেন যে, মজুতের সুবিধার জন্য বাংলা হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন চাউল রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, তবে ইহার পরিবর্ত্তে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চাউল বাহির হইতে বাংলায় আমদানীর বন্দোবস্ত হইয়াছে। তা ছাড়া, মিঃ উইলিয়াস্ আরও বলিয়াছেন, ভারত সরকার নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, দরকার হইলে তাঁহারা ১৯৪৫-৪৬ সালে কলিকাতার বার্ষিক চাহিদার অনুরূপ ৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাংলাকে সাহায্য করিবেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হাচিংস ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনার জন্য ব্রহ্মে গিয়াছিলেন। দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনিও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের শেষ নাগাদ ব্রহ্ম হইতে বাংলায় কিছু পরিমাণ চাউল আমদানী আশা করা যায়। মিঃ হাচিংসের বিবৃতিতে আরও জানা গিয়াছে যে, শ্যামদেশ হইতে এখন জাহাজাদি জোগাড় হইলে ৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করা যাইতে পারে।

মিঃ উইলিয়ামস্ বা মিঃ হাচিংসের উপরিউক্ত বিবৃতি পড়িলে মনে হয়, সরকার বাংলার খাদ্যসমস্যা সমাধানে আগ্রহশীল এবং আমদানী করিয়া এদেশের খাদ্যশস্য মজুত করিতেও তাঁহারা সচেষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রপ্তানীর ব্যাপারে প্রমাণ যেমন পাওয়া গিয়াছে, আমদানীর সেরূপ হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই বলিয়া এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অস্বস্তিকর নানাবিধ খবর আসিতেছে বলিয়া ঘরপোড়া গরুর মত বঙ্গবাসী তাঁহাদের আশ্বাসে ভরসা লাভ করিতে পারিতেছে না। মিঃ হাচিংসই স্বীকার করিয়াছেন যে, আগামী বৎসর বাংলায় ১০ লক্ষ টন চাউল কম পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং এখন শ্যামদেশে চাউল উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও যদি শুধু জাহাজের অভাবে সে চাউল দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাংলায় আসিয়া পৌঁছাইতে না পারে, তাহা হইলে ব্যাপারটা সত্যই নিতান্ত দুঃখের হইবে। এবার কম ফসল উৎপাদন অনিবার্য্য বলিয়া বাংলা সরকারের উচিত আর চাউল ইত্যাদি রপ্তানী না করিয়া ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি মত খাদ্যশস্য বাহির হইতে আনান এবং ব্রহ্মের চাউল যথাসম্ভব আমদানী করা। এইভাবে চেষ্টা করিলে হয়তো মজুত শস্যের জন্য ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলা সরকার কোন রকমে জোগান ও চাহিদার সমতারক্ষা করিয়া দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে পারিবেন।

তবে যে বাংলা সরকারের পরিচয় আমরা বিগত দুর্ভিক্ষের সময় হইতে পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে দেশবাসীর স্বার্থসংরক্ষণে এই আগ্রহ অবশ্যই আশা করা যায় না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য কংগ্রেসকে নির্বাচনে জয়ী হইতে হইবে। আমরাও শ্রীযুক্ত ঘোষের এই অভিমত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বাস্তবিক আসন্ন নির্বাচনে যদি বা কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী প্রার্থীগণ জয়ী হন এবং তাঁহাদের দ্বারা গঠিত সচিবসঙ্ঘ এই সব দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই বিপন্ন দেশবাসী আসন্ন সঙ্কট হইতে রেহাই পাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে। দেশজোড়া অভাব আর অধঃপতনের বন্যা প্রতিরোধ করিতে হইলে বাংলা সরকারকে অপরিসীম নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ দেখাইতে হইবে। কাজেই দেশকে ভালবাসিয়া যাঁহারা দুঃখবরণের নিজস্ব ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দুঃসময়ে তাঁহাদের সহায়তাই নিঃসন্দেহে সর্বাধিক কাম্য।

ভারতের আর্থিক জীবন ও ভারতসরকার

ভারতবাসী অতি দরিদ্র জীবন যাপন করে। ভারতের লোকের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় অনূর্দ্ধ ৭৫ টাকা। অসহ দারিদ্র্যের জন্য ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর করুণার পাত্র হইয়া আছে। সার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ীর মত সরকারী মুখপাত্র পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের শতকরা ৩০ জন অধিবাসী প্রাণধারণের উপযোগী দৈনিক আহারও সংগ্রহ করিতে পারে না। কৃষিজীবনের ক্রমবর্দ্ধমান অস্বচ্ছলতা ও পরিবারবৃদ্ধির চাপে ভারতবাসী আজ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত এদেশের জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ যাহোক জোড়াতালি দিয়া চলিয়াছিল, যুদ্ধের প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে এখন তাহার শেষ শৃঙ্খলাটুকুও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ শুধু সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব নয়, ঋণভারেও আকণ্ঠ জর্জ্জরিত। সহজদৃষ্টিতে এখন তাহার চারিপাশে এমন কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট হইতে ভারতবর্ষ মুক্তি পাইতে পারে।

অথচ দুঃখের হইলেও ব্যাপারটা সত্য যে, ভারতবর্ষের এই দারুণ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইবার কথা ছিল না। একদা ধর্ম্মজীবনের অনস্বীকার্য্য প্রভাবে আড়ম্বরহীন জীবনযাপনপ্রণালীর প্রতি ভারতবাসীর ছিল অনুরাগ, সেদিন নিত্যনূতন অভাবসৃষ্টি ও সেই অভাব পরিপূরণের বহু বিচিত্র পথ আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা না থাকায় ভারতবাসী স্বেচ্ছায় কৃষিজীবন বরণ করিয়া লইয়াছিল। তারপর যখন ভারতবাসীকে নিতান্ত বাধ্য হইয়া কঠোর বাস্তবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল এবং পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অধিবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আসিল তাহার কাছে, তখন নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ এমন এক স্বার্থপর বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায়ের খর্পরে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইল না। কৃষিজীবনের ক্রমোন্নতি সাধনের সহিত যুগোপযোগী শিল্পপ্রগতি সৃষ্টি করা ভারতবাসীর পক্ষে কঠিন ছিল, এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। শিল্পসংগঠনের জন্য প্রধানতঃ কাঁচামাল ও শ্রমসম্ভার এই দুইটি জিনিষেরই প্রয়োজন এবং উভয় বস্তুই ভারতবর্ষ শুধু সুলভে নয় প্রচুর পরিমাণে যোগাইতে পারে। এই বিরাট সুযোগ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যে দরিদ্র জীবন যাপনে বাধ্য হইতেছে ইহা সত্যই গভীর পরিতাপের বিষয়।

আগে যাহাই হউক, পৃথিবীব্যাপী বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের প্রভূত সুযোগ ছিল। বলিতে গেলে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সার্থক সুযোগেই অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ সব দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তথা ভারত সরকারের ধাপ্পাবাজিতে ভারতের এই দুই মহাযুদ্ধকালীন আর্থিক স্বাচ্ছল্যসৃষ্টির সুবর্ণ সুযোগ ব্যর্থ হইয়া গেল। যুদ্ধের চরম প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া ভারতে কিছু কিছু যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হইলেও যুদ্ধের পরেও বিমান, মোটরগাড়ী, রেলইঞ্জিন প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের দ্বারা ভারতবর্ষের কল্যাণ হইতে পারিত, সেই অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি শত প্রয়োজন সত্ত্বেও যুদ্ধের মধ্যে এদেশে নির্ম্মিত হইবার ব্যবস্থা হইল না। যুদ্ধের পূর্ব্বেই বিমান তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে একটি কারখানা বাঙ্গালোরে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই কারখানা কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুধু বিমান মেরামতই করিয়াছে, একখানিও বিমান তৈয়ারী করে নাই। ভারতে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী সম্বন্ধে ভারত সরকারের রেলওয়ে মেম্বার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই সকল প্রতিশ্রুতি আজও কার্য্যকরী হয় নাই। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যুদ্ধের মধ্যে জগৎ সমক্ষে বহু প্রচারকার্য্য চালান হয়, কিন্তু আসলে যুদ্ধের কল্যাণে ভারতীয় শিল্প সমৃদ্ধ না হইয়া কতকটা পঙ্গু হইয়াছে, ইহা আপাতদৃষ্টিতে ভ্রান্ত ধারণা মনে হইলেও কঠোর সত্য। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের চাপে এবং মুনাফার লোভে কাপড়ের কল, কাগজের কল প্রভৃতিতে প্রচুর কাজ হইয়াছে, ইহার জন্য যন্ত্রপাতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যুদ্ধের পরে এখনই সেই সব যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়; কাজেই যুদ্ধকালীন বাড়তি উৎপাদনকে শিল্প সমৃদ্ধি মনে করা ঠিক হইবে না। বিদেশ হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ হওয়ায় অতিরিক্ত প্রয়োজনের চাপে ভারত সরকার হয়তো এদেশে কিছু কিছু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু শুধু পরিমাণে নগণ্য বলিয়া নয়, এই সব শিল্পের উৎপন্ন পণ্য সরকার এমনভাবে গ্রাস করিয়াছেন যে, দেশবাসীর সহিত ইহাদের পরিচয় ঘটিতে পারে নাই। ফলে যুদ্ধের পরে এখন যখন বিদেশী পণ্য আমদানীর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখন দেশবাসী অবশ্যই বহুপরিচিত বিদেশী পণ্য ছাড়িয়া সেই সব অচেনা দেশী মাল ব্যবহারে উৎসাহ পাইবে না। যুদ্ধের সময় অর্থের অন্তর্দ্দেশীয় প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া এদেশের অনেকের হাতে ভাল টাকা আসিয়াছিল, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অঙ্ক অনেক দেশবাসীকে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার বা পুরাতন শিল্পপ্রসারে আর্থিক সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিতও

করিয়াছিল। কিন্তু কণ্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যু মারফৎ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ে বিচিত্র বাধার সৃষ্টি করিয়া এবং শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক কাঁচামাল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সেই উৎসাহ ভারত সরকার অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, দেশের ব্যাঙ্কগুলি কাঁপাই টাকার বোঝাই হইয়া যাইতেছে, এই টাকা খাটাইবার জন্ত উপযুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদি না থাকায় ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য হইয়া সুদের হার খুবই কমাইয়া দিতে হইয়াছে। ১৯৩৩।৩৪ সালে যেখানে বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা সুদ দিয়াও ব্যাঙ্ক আমানত সংগ্রহ করিতে পারিত না, এখন সেইস্থানে প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কে চলতি আমানতের সুদ বার্ষিক শতকরা ।০ আনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে টাকা খাটাইবার সুবিধামত স্থান খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়া যুদ্ধের মধ্যে অর্থবান জনসাধারণ শেয়ার-মার্কেটে টাকা খাটানো লাভজনক মনে করিয়াছে এবং তাহাদের চাহিদার চাপে শেয়ারগুলির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন যুদ্ধের পরে বাজারে শেয়ারের দর ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতের যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখনও পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকায় সেই মূল্য হ্রাস সম্ভব হয় নাই।

অথচ এদিকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ভয়াবহ বেকার-সমস্যা দেখা দিতেছে। ভারত সরকারের রেলবিভাগ হইতেই নাকি ২ লক্ষ ৬২ হাজার লোকের কর্ম্মচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। যদিও গত ৯ই আগষ্ট রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট এ্যাণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের কাজ শেষ হওয়ায় ভারতে ২৭ লক্ষ ৯৯ হাজারের মত লোক বেকার হইবে, আমাদের মনে হয় তাঁহার সংখ্যা অত্যন্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে আসন্ন বেকারের সংখ্যা অন্ততঃ ৫০ লক্ষ হইবেই। যৌথ পারিবারিক জীবন ও স্ত্রীলোকদের পুরুষের উপর নির্ভরশীলতার জন্ত ভারতের স্থায় দেশে এই ৫০ লক্ষ লোক বেকার হওয়ার অর্থ অন্ততঃ ২ কোটি দেশবাসীর জীবনযাপন অনিশ্চিত হইয়া পড়া। দেশে যথেষ্ট শিল্প প্রসার হইলে এবং সামরিক শিল্পসমূহকে যথাযথভাবে এবং অবিলম্বে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করিলে এই সমস্যার কতকটা সমাধান হইত, কিন্তু বাস্তবিক সরকার যে এই দারুণ সমস্যা লইয়া শেষ পর্য্যন্ত কি করিবেন, সে সম্বন্ধে এখনো তাঁহাদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেন যুদ্ধের কাজ হইতে মুক্ত লোকেদের অন্তভাবে কাজ দিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইভাবে একসঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ পাইলে কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পক্ষে বেকার জীবনের দিনগুলি কাটান বা সেই অর্থে কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া এই দুই দেশের সরকার কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্ত কোন শিল্প শিক্ষা করিতে এবং ছোট আকারে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পর্য্যন্ত আর্থিক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন ব্যবসা পর্য্যন্ত করিয়াছেন যে, কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গৃহনির্ম্মাণ বা ব্যবসা সুরু করিবার জন্ত অর্জসুদে এবং দীর্ঘ-মেয়াদে রাষ্ট্রের নিকট হইতে ৫ শত পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ভারতবর্ষের এই বেকার সমস্যা অবশ্যই আরও অনেক বেশী জটিল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের লজ্জাকর ঔদাসীন্ত আমাদের সত্যই হতাশ করিয়াছে।

যুদ্ধের সময় ভারত সরকার ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দপ্তর নামে একটি নূতন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দপ্তরের ভার পান স্যার আর্দ্দেশির দালাল। বলা বাহুল্য দপ্তরটি নিতান্তই লোক দেখানো, কাজেই এই দপ্তর মারফৎ আমরা ভারতের উজ্জল ভবিষ্যত সম্বন্ধে কথা যত বেশী শুনিয়াছি, কাজ সে তুলনায় কিছুই দেখি নাই। অবশ্য স্যার আর্দ্দেশির তাঁহার সুনাম রক্ষা করিতে যত্রতত্র এই দপ্তরের কর্ম্মপ্রবণতার অনেক সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। গত ৮ই অক্টোবর জেনারেল পলিসি কমিটির এক সভাতেও তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তাঁহার দপ্তর মারফৎ কাজ অনেক হইয়াছে এবং সেই সকল কাজে সুফলও নিতান্ত কম ফলে নাই। অবশ্য তাঁহার দপ্তরের নির্দ্দেশে উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ বাদে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে পরিকল্পনা রচনা করা ও সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা কি এক কথা? যে পর্য্যন্ত এই সকল পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা না হয়, সে পর্য্যন্ত স্যার আর্দ্দেশিরের এই বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। জাপান কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বাজার ভারতবর্ষ গ্রাস করিতে পারে—এমন কথা সম্প্রতি আমরা অনেকের মুখে শুনিতেছি। উক্ত ৮ই অক্টোবরের সভায় স্যার আর্দ্দেশিরও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য বটে জাপান বর্ত্তমানে যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে শীঘ্র এশিয়ার হৃত বাণিজ্যবাজার ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জাপানের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া ভারতবর্ষ সেই বাজার গ্রাস করিতে পরিবে—এমন হাস্যকর কল্পনা ভারত সরকারের সদস্য স্যার আর্দ্দেশির পর্য্যন্ত কেমন করিয়া করিতেছেন। ভারত সরকারের অসীম অনুগ্রহে এদেশে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাতে এই অতি-দরিদ্র দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোককে পণ্য জোগান যায় না। ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজন কবে মিটাইবে তাহারই ঠিক নাই, সে আবার জাপানের পরিত্যক্ত বাজার অধিকার করিবে কিরূপে?

ভারতের জাহাজ শিল্প

আধুনিক জগতে শিল্পবাণিজ্যে যে জাতি বড় তাহার প্রাধান্তই স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের মূলে জাতীয় জাহাজ শিল্পের যে বিশিষ্ট স্থানে আছে, সে কথা অনেক সময় উল্লিখিত হয় না। ভারতবর্ষ অবশ্য শিল্পের দিক হইতে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ। কিন্তু ভারতের বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ব্রিটেন, জার্ম্মানী প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে এত বেশী চালান যায় যে, প্রায় সর্ব্বপ্রকার শিল্পজাত পণ্য ভারতে আমদানী হইলেও প্রতিবৎসরই এদেশের

অনুকূলে বাণিজ্যিক গতি থাকে। এই বিপুল পরিমাণ বহির্বাণিজ্য কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতকে চালাইতে হয় বিদেশী জাহাজের সাহায্যে। যে ভারতসরকারের লজ্জাকর নিশ্চেষ্টতার জন্য ভারতে অজস্র সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই, সেই ভারতসরকারই কার্য্যতঃ শ্বেতস্বার্থসংরক্ষণের মোহে ভারতের জাহাজীশিল্প সংগঠনের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখান নাই। ভারতে এপর্য্যন্ত একখানিও সমুদ্রগামী বড় গোছের জাহাজ নির্ম্মিত হয় নাই। ১৯৪১ সালে ভিজাগাপটমে যে জাহাজ কারখানা স্থাপিত হয় তাহা বাঙ্গালোরের বিমান কারখানার মত কেবল জাহাজ সারাইয়াই চলিয়াছে। কোন শিল্প ব্যাপক আকারে গড়িয়া তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে সেই শিল্পজাত পণ্য লইয়া বাহিরের দেশের সহিত বাণিজ্য চালান। কিন্তু ভারতে জাহাজের প্রয়োজন এত বেশী যে, এদেশে যত ব্যাপক ভাবেই জাহাজ শিল্প গড়িয়া উঠুক না কেন, সেই শিল্প আগামী কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত যত জাহাজই উৎপন্ন করিবে সমস্ত জাহাজ ভারতের কাজেই লাগিয়া যাইবে। যুদ্ধের মধ্যে এই পরম প্রয়োজনীয় জাতীয় আত্ম-রক্ষামূলক শিল্পটি ভারতসরকারের সহযোগিতায় এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়াও ভারতসরকার এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কিছুতেই ভারতে প্রসারিত হইতে দেন নাই। অথচ যুদ্ধের সময় ভারতের বহু জাহাজ নষ্ট হইয়াছে, কাজেকাজেই অবিলম্বে নূতন জাহাজ সংগ্রহ করিয়া ভারতের জাহাজ সমস্যার অবশ্যই সমাধান করিতে হইবে। ব্রিটেনের মুখ চাহিয়াই প্রধানতঃ ভারতসরকার এদেশে শিল্পপ্রসারে ঔদাসীন্য দেখান, কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রিটেনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাহার পক্ষেও নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতে দরকারমত জাহাজ পাঠান কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্ত্তমানে ভারতে যে ধরণের সুবিধা আছে, তাহাতে এখানে ৫৯৫ ফুট চওড়া এবং ৮০ ফুট লম্বা জাহাজ তৈয়ারী করা চলিতে পারে। এই ধরণের জাহাজে ১৪ হইতে ১৫ হাজার টন মাল বহন করা চলিবে। এইরূপ প্রতিটি জাহাজের খোলের জন্য প্রয়োজন হয় ২ হাজার ৮ শত টন ইস্পাতের, কিন্তু ভারতীয় স্বার্থসম্বন্ধে চিরউদাসীন ভারতসরকার এই ইস্পাত সরবরাহে একরূপ অনিচ্ছা দেখাইয়া এখনও ভারতবর্ষের দারুণ ক্ষতিসাধন করিতেছেন।

দেশরক্ষার ব্যাপারে জাহাজ কিরূপ অত্যাবশ্যক তাহা দুইটি মহাযুদ্ধের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার পর আজ আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাছাড়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে সুবিধামত বাণিজ্য প্রসার করিতে হইলে নিজস্ব জাহাজ না থাকিলে সত্যই চলে না। বিদেশযাত্রী জাহাজের কথা দূরে থাক, ভারতের উপকূলভাগে যে বাণিজ্য চলে, তাহারও শতকরা মাত্র ২০।৩০ ভাগ জাহাজ ভারতীয়দের হাতে আছে। এই দৈন্য হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ভারতসরকার সম্প্রতি ভারতের জাহাজশিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। মনে হয় যুদ্ধের অসুবিধা ভোগ করিয়া ভারতসরকার কতকটা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, জাহাজ শিল্পের ন্যায় অত্যাবশ্যক শিল্পকে বিপন্ন করিয়া রাখিলে বিপদের দিনে টিকিয়া থাকা এদেশের পক্ষে একান্ত কঠিন। এমনও হইতে পারে যে, ব্রিটেনের অকর্ম্মণ্যতার সুযোগে বাহিরের কোন জাতি পাছে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য তথা বহির্বাণিজ্যের জাহাজ যোগাইবার ভার গ্রহণ করে এইভয়ে ভারতসরকার ভারতে জাহাজ শিল্প সংগঠন সম্বন্ধে একটু বেশ আগ্রহশীল হইয়াছেন। সার আর্দ্দেশির দালালের পরিচালনাধীনে ভারতসরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিভাগ নামে যে নূতন দপ্তর খোলা হইয়াছে তাহার অধীনে স্থাপিত হইয়াছে কয়েকটি কমিটি। এই কমিটিগুলির কাজ—ভারতের বিভিন্ন শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি করিয়া মন্তব্য পেশ করা। এই কমিটিগুলির মধ্যে 'সিপিং পলিসি কমিটি' নামে একটি জাহাজ শিল্প পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতসরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার মহম্মদ আজিজুল হক এই পলিসি কমিটির অধিবেশনে ভারতের জন্য পৃথিবীর জাহাজী ব্যবসায়ের অংশ দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের একচতুর্থাংশ জাহাজও যে ভারতের হাতে নাই ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় এবং ভারতসরকার এই দারুণ দীনতা হইতে এখন দেশকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ভারতীয় বণিক সভায় (Indian chamber of commerce) বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক সভার প্রেসিডেন্ট মিঃ এম এ মাষ্টার ভারতে জাহাজ-শিল্প প্রসারের প্রয়োজন ও সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় জাহাজ শিল্পের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও অদূর ভবিষ্যতে ইহার প্রসারের এক প্রবল অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শীঘ্রই আন্তর্জ্জাতিক জাহাজ বৈঠকের অধিবেশন হইবে। যুদ্ধের নানা ওলট পালটের পর এই বৈঠকের অসাধারণ গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু প্রকাশ, এই বৈঠকে নাকি প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইবে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশের জাহাজ যে পরিমাণ মাল বহন করিত, এখনও সেই হার বজায় রাখা হউক। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারত পশ্চাৎপদ দেশ হিসাবে এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত কম মাল বহনের অধিকার পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় জাহাজের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন মালবহনের অধিকার ছিল। কিন্তু বাস্তবিক এত কম মাল বহনের অধিকার পাইলে তাহার চলে না। কাজেই তাহার অধিকার সম্প্রসারণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। উপরোক্ত বণিক সভার বক্তৃতায় মিঃ মাষ্টারও বলিয়াছেন, যে ভারতের গুরুতর ক্ষতির ফল বিবেচনা করিয়া যাহাতে সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। আগেই আলোচনা করা হইয়াছে, ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার আজিজুল হক ভারতের জাহাজ ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল মনোভাবই দেখাইয়াছেন। আমরা আশা করি বিলম্বে হইলেও এইবার অন্ততঃ সরকারী এবং বেসরকারী উৎসাহে ভারতের জাহাজশিল্প কতকটা প্রসারের সুবিধা পাইবে।

হিন্দুধর্ম্ম ও সংগঠন

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ্-ডি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দুধর্ম্ম, জাতির মধ্যে কোন বীরোচিত বিকাশের প্রেরণা না দিলেও, ইহা সাধারণ সমাজ-জীবনের ভক্তি, ।বিনয়, নিজ অবস্থায় সন্তোষ, পুরাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, একটা উচ্চ অঙ্গের নীতিজ্ঞান ও গভীর আস্তিক্যবুদ্ধির সঞ্চার করিয়াছে। রাজশক্তির বিরোধিতা ও পরিমণ্ডলের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সমাজ-জীবনে এরূপ উচ্চস্তরের ধর্ম্মভাব ও আদর্শবাদ বজায় রাখা যে কত দুরূহ তাহা একটু ভাবিলেই বোধগম্য হইবে। এইরূপ অবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে যে নেতৃত্বশক্তি ও জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার প্রয়োজন তাহার তুলনা অন্য কোনও দেশের সমাজ নিয়ন্ত্রণের ইতিহাসে বিরল। জনশিক্ষা বিষয়ে এই অদ্ভুত নৈপুণ্যের ফলেই ভারতবাসীর প্রাত্যহিক জীবনে একপ্রকারের শান্ত, নিরুত্তাপ ধর্ম্মভাব একেবারে অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানের প্রতি ভক্তিপূর্ণ নির্ভর, দেবদেবীর প্রসঙ্গের প্রতি করুণ লোলুপতা, আকাশ-বাতাসের মত তাহার সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে বেষ্টন করিয়া আছে। চাষী প্রথম হলকর্ষণের পূর্ব্বে, ব্যবসায়ী তাহার দৈনিক কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে, দৈবানুগ্রহের উপর তাহাদের একান্ত নির্ভরের চিহ্নস্বরূপ মাঙ্গল্য বিধির অনুষ্ঠান করে। প্রতি উৎসবে, ঋতুচক্রের প্রত্যেক আবর্ত্তনে এই সদা-জাগ্রত ধর্ম্মপ্রভাবে প্রাকৃত আনন্দের ও প্রাথমিক প্রয়োজনের মধ্যে এক উচ্চতর পরিতৃপ্তি ও আদর্শ-ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে। এই বদ্ধমূল ধর্ম্ম-প্রাণতা আমাদের জীবনে আতিশয্যজনিত নানা বিকৃতি আনিয়াছে; তথাপি ইহাই আমাদের সত্য পরিচয় ও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ইহাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়া আবার জীবনের নূতন ভিত্তিরচনার চেষ্টা করিলে তাহার উপর কোন পাকা, স্থায়ী ইমারত নির্ম্মাণ করা চলিবে কি না সন্দেহ।

৪

এখন আসল প্রশ্ন হইতেছে যে হিন্দুর এই সনাতন ধর্ম্মবোধকে, সমস্ত ক্ষয়জীর্ণতা ও অস্বাস্থ্য বিকার হইতে রক্ষা করিয়া নূতন বাস্তবজ্ঞানে অনুপ্রাণিত ও যুগোপযোগী করিয়া, আধুনিক যুগের বৃহত্তর কর্ম্মপরিধির কেন্দ্রস্থলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে কি না! রাজনীতি ও ধনোৎপাদনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্ত্তমানের প্রধান প্রচেষ্টা—ইহাদের সহিত ধর্ম্মের আত্মীয়তা স্থাপন চলিবে কি না? তাহা যদি সম্ভব না হয়, জীবনের প্রধান প্রবাহের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ যদি চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ধর্ম্ম ইহার সামাজিক কল্যাণশক্তি হারাইয়া ব্যক্তিগত সাধনার বিষয় হইবে। তাহা হইলে বেদ উপনিষদ, গীতা,রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যে জীবন দর্শন ব্যাখ্যাত ও উদাহৃত হইয়াছে, যে আদর্শ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আধুনিক হিন্দুর জীবনে তাহাদের আর কোন সার্থক প্রয়োগ থাকিবে না। তাহা হইলে সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও বক্তৃতা-মঞ্চে হিন্দুর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিষয় ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে স্ফীত না হইয়া সোজাসুজি আমাদের পূর্ব্বতন ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। মুখে ধর্ম্মের বুলি না আওড়াইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী, অন্ধ ঘূর্ণীবেগে ঝাঁপাইয়া পড়াই সহজ ও দ্বিধাহীন কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া আমরা না পারি আমাদের পুরাতন মনোবৃত্তি পুনরুদ্ধার করিতে, না পারি আধুনিক যুগের প্রগতির সঙ্গে সমান মাত্রায় পা ফেলিতে। ধর্ম্ম আমাদের ঊর্দ্ধগতির প্রেরণা না যোগাইয়া অগ্রগতির পায়ে শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। আমাদের ঐতিহ্য আমাদের জীবনসংগ্রামে সহায়তা না করিয়া দুর্ব্বিবহ বোঝার চাপে আমাদিগকে প্রপীড়িত করিতেছে, আমাদের লঘুহস্তে অস্ত্রসঞ্চালনের বাধা জন্মাইতেছে। কাজেই মনে হয় আধুনিক জগতে হিন্দুধর্ম্মের স্থান সম্বন্ধে একটা পাকা-পাকি রকমের বোঝাপড়ার সময় আসিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ধর্ম্ম যে নিতান্ত অবান্তর প্রক্ষেপ নহে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ সুপরিস্ফুট হইতেছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্ম্মনীতি ও অহিংসার আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ভারত জনমনের উপর মহাত্মার অসাধারণ প্রভাব তাঁহার এই ধর্ম্মনীতিপরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণ তাঁহাকে কোন রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই শ্রদ্ধা করে না—তাঁহাকে ঈশ্বর-জানিত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য ধর্ম্মমিশ্র রাজনীতির যে বিপদ আছে' ইহার মধ্যে যে বিচার বিভ্রমের যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্ত্তমান তাহা মহাত্মাজীর নেতৃত্বে বারংবার উদঘাটিত হইয়াছে। তথাপি রাজনীতিজ্ঞানবর্জ্জিত অশিক্ষিতের দেশে ইহা যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইবার একটা প্রকৃষ্ট উপায়—একটা অভিনব পরীক্ষামূলক পন্থা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীঅরবিন্দও যোগবলে দেশের কল্যাণসাধন করা সম্ভব—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। নবীন পাশ্চাত্য আবির্ভাবের সহিত সনাতন প্রাচ্য ধর্ম্মনীতির এই সামঞ্জস্য প্রয়াস দেশ-প্রেমের নূতন জোয়ারের উচ্ছ্বাসকে পুরুষ-পরম্পরা খনিত গভীর হৃদয়া-বেগের প্রণালীতে পরিচালিত করার এই প্রচেষ্টা সফল হইবে কি না তাহা বিচারের সময় এখনও আসে নাই। এই মতবাদের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত গঠন ভবিষ্যৎ পরিণতির অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।

ইতিমধ্যে ইউরোপেও রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে উচ্চতর আদর্শ-বাদের প্রয়োজনীয়তা আবার নূতন করিয়া অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমান

মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ইউরোপ বুঝিয়াছে যে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই অবিমিশ্র, অসংস্কৃত পাশবনীতির নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন প্রয়োজন। v1, v2 ও জার্ম্মানীর অস্ত্রাগারে আর যে সমস্ত ভয়াবহ মারণাস্ত্র শান দেওয়া হইতেছিল তাহাদের রহস্যোদঘাটনে ইউরোপের লুপ্ত ধর্ম্মবোধ আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইতেছে। সত্য ও ধর্ম্মানুমোদিত প্রণালীতে যুদ্ধ চালাইবার পরিকল্পনা ইউরোপের রণ-নীতি বিশারদদের অনুধ্যানের বিষয় হইয়া উঠিতেছে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের ধর্ম্মযুদ্ধের আদর্শ বোধ হয় ইউরোপকে নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ রাজনীতি ও ধনোৎপাদনের ব্যাপারেও নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে উদারতর, অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ নীতির অবলম্বন অপরিহার্য্য। এই বাঁচিবার তাগিদই Atlantic Charter ও World Security Conference (পৃথিবীর নিরাপত্তারক্ষার জন্য সম্মিলন) এর আসল জন্মদাতা। হয়ত ইহার মধ্যে এখন যেটুকু ভণ্ডামি ও আত্মপ্রতারণা আছে উপায়ান্তরহীন, নির্ম্মম প্রয়োজনের পেষণে তাহা ক্রমশঃ ও সংস্কৃত হইয়া উন্নততর আদর্শবাদে রূপান্তরিত হইবে। আদিম মানবের বাধ্যতা-মূলক সঙ্ঘবদ্ধতা হইতে উচ্চতর সামাজিক ও নৈতিক গুণের বিকাশের সুপরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে সেই একই কারণে—যে আইনের ছাপমারা দস্যুবৃত্তি এখন ইউরোপের পররাষ্ট্রনীতির আসল ভিত্তি তাহারও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত লক্ষণ হইতে মনে হয় যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে ধর্ম্ম ও সমাজ কল্যাণ-বুদ্ধির প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

৫

কিন্তু তথাপি ধর্ম্মের রাষ্ট্র ও সমাজনিয়ন্ত্রণের প্রকৃত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে যে বাধা আছে তাহা দুরতিক্রমণীয়। আধুনিক যুগে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়াছে—ধর্ম্মের স্থানে দেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি কতকগুলি নূতন আদর্শ লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে দেশপ্রীতির যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ বলি দিয়াছে ও অশ্রুতপূর্ব্ব দুঃখ-ক্লেশ ও স্বার্থত্যাগ সহ্য করিয়াছে। ধর্ম্ম এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের শতাংশের একাংশও দাবী করিতে পারিত না। সুতরাং পাশ্চাত্য মহাদেশে পুরাতন ধর্ম্মের আদর্শ যে এক অভিনব প্রেরণার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতবর্ষেও এই নূতন ধর্ম্মনীতি ধীরে-ধীরে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অন্যান্য দেশে ধর্ম্মের এই ক্ষীয়মান প্রভাবের জন্য বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি হইবে না, কেননা এই প্রক্রিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে ও সেই সমস্ত দেশের মুখ্য প্রচেষ্টাসমূহ ধর্ম্মের গৌণত্ব, এমন কি ইহার অবান্তরত্বও স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লইয়াছে। তাই সাধারণ ইউরোপীয় রবিবারে গীর্জ্জায় পাদরির বক্তৃতা শোনা ও সপ্তাহের অন্য কয়দিন যীশুখৃষ্টের অনুশাসন উল্লঙ্ঘনের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা—ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন অসামঞ্জস্য অনুভব করে না। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আদর্শ অনেক উচ্চতর—সমগ্র জীবন-পরিধির উপর ইহার সর্ব্বগ্রাসী একাধিপত্য। যুদ্ধ বিগ্রহের নির্ম্মম বাস্তব প্রয়োজনে এই ধর্ম্মনীতির কচিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে, কিন্তু সেই ব্যভিচারকে সমর্থন করার প্রাণান্ত প্রয়াস হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে ইহা জাতির বিবেক বুদ্ধিকে কত মর্ম্মান্তিকভাবে পীড়িত করিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণ, শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মের নিপাতসাধন, সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যুর বধ প্রভৃতি নীতি বিচ্যুতির দৃষ্টান্তগুলি মহাভারতকারের অনেক ওকালতী, তর্ক ও কূটকৌশল জাল বিস্তারের হেতু হইয়াছে। আধুনিক যুগের অসংখ্য নূতন কার্য্যক্রমের মধ্যে নীতিজ্ঞানের প্রাধান্য বিস্তার খুব দুরূহ সমস্যা। রাজনৈতিক নির্ব্বাচন, ব্যবসায় পরিচালনা, যান্ত্রিক উপায়ে শিল্পোৎপাদন প্রণালীর বিরাট ব্যবস্থা—এ সমস্তের মধ্যে ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদা কতখানি রক্ষিত হইবে অনুমান করা কঠিন। তথাপি ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে ইহাদের মধ্যেই ধর্ম্মের কেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অন্যথায় আমাদের গৌরব করিবার কিছু থাকিবে না; পৃথিবীর কাছে কোন নূতন অবদানের অর্ঘ্য আমরা ধরিতে পারিব না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রসারে, রণনীতিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা ইউরোপের সহিত তুলনায় এত পশ্চাৎপদ, যে এই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতেই বহু শতাব্দীর সাধনা প্রয়োজন হইবে। তার পর তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় বলিয়াই মনে হয়। কাজেই পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে আমাদের যদি বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করিতে হয়, সভ্যতার শরনৈবেদ্য-সম্ভারসজ্জিত স্বর্ণথালে যদি আমাদের কোন পূজোপহার স্থান পায়, তবে তাহা হইবে নূতন ঐশ্বর্য্য সৃষ্টিতে নহে, ঐশ্বর্য্য ভোগ ও প্রয়োগের অভিনব মনোবৃত্তিতে। বাহিরের উপকরণবৃদ্ধিতে নহে, নূতন জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠায়, শক্তির অদম্য আস্ফালনে নহে, তাহার আত্মসমাহিত, বিক্ষোভ-হীন স্থৈর্য্যে। ভবিষ্যৎ কাল ভারতবর্ষের নিকট ইহারই প্রত্যাশী, এই প্রত্যাশিত উপহার নিবেদন করিতে না পারিলে ভাবী জগৎ ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে স্বীকার করিবে না।

আজ স্বাধীনতা লাভই ভারতের কাম্যতম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু স্বাধীনতা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে, একটা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মোটেই সুস্পষ্ট নহে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, ভদ্র ও শোভন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ, আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মর্য্যাদাবোধ, অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সমকক্ষতা—ইত্যাদি সুবিধা স্বাধীনতা লাভের খুব প্রত্যক্ষ ফল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকের ভাষায় 'এহো বাহ্য'। স্বাধীনতার সত্যকার ব্যবহার—জাতির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ। জাতি যাহা হইতে পারিত, কিন্তু প্রতিকূল বহির্ঘটনা ও আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার জন্য যাহা ঘটিয়া উঠে নাই—স্বাধীনতা সম্ভাবিত ইতিহাসের সেই অলিখিত অধ্যায়গুলিকে নূতন করিয়া রচনা করিবে; জাতির স্রষ্টা ও নেতাদের মনে যে আদর্শ পরিকল্পনা অর্দ্ধস্ফুট ছিল তাহাকে বাস্তব রূপ দিবে। অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যে জাতির প্রতিভাকে পূর্ণ স্ফুরণের সুযোগ দিবে। সাতশত বৎসর পূর্ব্বের

পরিত্যক্ত সূত্র পুনরায় কুড়াইয়া লইয়া ও তাহাতে পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত গ্রন্থি যোজনা হইয়াছে তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া, এ সমস্ত বিবর্ত্তন ধারার প্রভাবে যে নূতন লক্ষ্য উদ্ভূত হইয়াছে, ভাবী যুগের যাত্রা পথে তাহারই নিগূঢ় ইঙ্গিতটী অনুসরণ করিতে হইবে। অতীত যুগে প্রত্যাবর্ত্তনের অসম্ভাব্যতা স্বীকার করি; কালের স্রোতকে বিপরীত দিকে ফিরান যায় না। গীতা-উপনিষদ যুগের মহান সাধনা ও আদর্শকে যতই শ্রদ্ধা করি না কেন, সে যুগের আবেষ্টন আর নূতন করিয়া গড়া চলিবে না। তথাপি অতীতের সমস্তটাই মৃত বা বরখাস্ত নহে; ইহার কিয়দংশ বর্ত্তমানের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে সজীব ও সক্রিয়। ভবিষ্যতের অনির্দ্ধারণের সময় এই সজীব অতীত প্রভাবকে পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে হইবে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সংগঠনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে অতীতের মৃত ও জীবিত অংশের নির্দ্ধারণ ও পৃথকীকরণ। প্রাণহীন, গতানুগতিক আচার-অনুষ্ঠানের নাগপাশে ধর্ম্মের যে মৌলিক প্রেরণা বন্দী হইয়া আছে, তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া যুগোপযোগী নূতন বহিরবয়বের মধ্যে রূপায়িত করিতে হইবে। পুরাতন উৎসবের মধ্যে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে; উৎসবের সহিত আনন্দের যে নিত্য সম্বন্ধ কৃত্রিম অনুশাসনের চাপে ক্ষুণ্ণ ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। যাত্রা, কবি, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার ও জনসাধারণের মনোরঞ্জন এই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হইত তাহারা এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যে ও গ্রাম সমাজের উৎসাহহীনতায় মলিন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের ভিতর দিয়া সাধারণের চিত্তকে আবার স্পর্শ করিতে হইবে ও হিন্দুধর্ম্মের নূতন আদর্শ প্রচার করিতে হইবে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চাষী-গৃহস্থ ও গ্রাম-শিল্পীদের গৃহে বহুদিন পরে আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকালের অব্যবহার জন্য তাহাদের আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অসাড় হইয়াছে মনে হয়। এই আকস্মিক সৌভাগ্যের অনুকূল অবসরে সরল আমোদ-প্রমোদ ও ধর্ম্মপ্রেরণা হইতে উদ্ভূত আনন্দকে পল্লীসমাজে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। উচ্চতর ধর্ম্ম, দর্শন-আলোচনা ও অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী আব-হাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের প্রাণ এই সমস্ত আবেদনে সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে; নেতারাই এ বিষয়ে পশ্চাদপদ ও সংশয়াচ্ছন্ন। গত চূড়ামণি যোগে যে লক্ষ লক্ষ নর-নারী, পথক্লেশ, অনশন, দারিদ্র্য প্রভৃতি বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া, গবর্ণমেন্টের সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া, এক আত্মহারা ভাবোন্মাদের প্রেরণায় ভাগীরথীতীরে সমবেত হইয়াছিল, তাহারাই প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী—তাহাদের মধ্যে ভারতের সনাতন আত্মা অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তিতে বিদ্যমান। আধুনিক নেতারা যদি এই অক্ষয় দুর্ব্বার প্রাণ-সম্পদকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন, ক্ষণস্থায়ী আবেগের জোয়ারকে সুসংবদ্ধ প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অপব্যয়হীন নিয়মিত প্রবাহে পরিণত করিতে পারেন, তবে কি না অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইতে পারে? অশিক্ষিত জন-সাধারণের এই যুক্তি তর্কাতীত, বদ্ধমূল সহজ সংস্কার, অসংখ্য হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকৃত নির্ম্মল জীবন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তিবাদ ও কর্ম্মবাদ, ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের জনসেবাব্রত ও সংগঠনের কল্যাণময় প্রচেষ্টা, লোকলোচনের অন্তরালস্থিত অনেক সাধকের আত্মসমাহিত তপশ্চর্য্যা—এই সবগুণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সম্মিলিতভাবে এক নীরব আবেদন জানাইতেছে—"অতীতের শিক্ষা আমরা ভুলি নাই; বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তুমি আমাদের কর্ণে যে মন্ত্র দিয়াছ তাহা অবিচল নিষ্ঠার সহিত আমরা সাধনা করিয়া যাইতেছি। এখন আমরা নূতন পথনির্দ্দেশ, নূতন ব্রতগ্রহণ ও উদযাপনের জন্য প্রতীক্ষমান। আমাদের এই ভক্তি-বিশ্বাস, এই যুগযুগান্তর সঞ্চিত অধ্যাত্মসম্পদ যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে নিয়োগ কর। অস্ত্র প্রস্তুত; ইহার সাহায্যে সংশয়ের জটিল গ্রন্থি ছেদন কর, জড়বাদের দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর মধ্য দিয়া নব বিজয়-অভিযানের রাজপথ নির্ম্মাণ কর।" জননায়কের কর্ণে এই আবেদন ধ্বনিত হইবে। যিনি এই স্বপ্ন-সুষমাকে কর্ম্ম জগতে সার্থক রূপ দিতে পারিবেন, তিনিই গীতার অমর ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ভ্যানিটি ব্যাগ

শ্রীকানাই বসু

পুণ্যগেহে পুরাতনী যে লক্ষ্মীর ঝাঁপি
গৃহলক্ষ্মীকরস্পর্শে দশদিক ছাপি
উথলিয়া ধন ধান্য কল্যাণ বিতরে,
আজি আশীর্ব্বাদসহ আধুনিকা করে
তাই দিনু নবরূপে, এ ভ্যানিটি ব্যাগ।
বস্তুমাত্র নিও, কোরো ভ্যানিটিরে ত্যাগ।

ভক্তির কবিতা

অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র এম-এ

বাংলা সাহিত্যে ভক্তিরসাত্মক কাব্যের অভাব নেই। বৈষ্ণব কাব্য, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ইত্যাদি রচনা কাব্যানুরাগী বাঙালী মাত্রেরই সুপরিচিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই সব রচনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' অপরিপক্ব কিশোরবৃত্তি যতোই না কেন প্রকাশিত হয়ে থাক, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি রচনা পরিণত কবিচিত্তের ভক্তিবোধের সুনিশ্চিত প্রমাণরূপেই গ্রাহ্য।

একজন বিদেশী সমালোচক লিখেছিলেন যে ভক্তিরসাত্মক কাব্য "like the height of tragedy is beyond the reach of oratory।" তাঁর অভিমত হ'লো এই যে, কবির মনে যদি ভক্তিভাবের ঐকান্তিক স্ফুরণ-ই ঘটে, তাহ'লে তার আবার অলংকৃত উদ্‌ঘাটন কেন? ভক্তির আস্বাদনেই তো ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া উচিত। তার পরিবর্তে অলংকার-ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রের শাসন মেনে সাজিয়ে-গুছিয়ে যদি কোনো ভক্ত কথা রচনা করতে বসেন, তা'হলে তাঁর ভক্তির ফাঁকিটাই কি ধরা পড়ে না? অর্থাৎ যে ভক্ত কবিতা লিখবেন, তিনি আগে ভক্ত, না আগে কবি?

সাধারণ বুদ্ধিতে এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, কবির স্বভাব হলো কবিতা লেখা, আর ভক্তের লক্ষণ হ'লো ভক্তিভাবে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া। শেষের ব্যাপারটি যেখানে আত্মসিদ্ধ সেখানে ভক্ত কেবল ভক্তই থেকে যান। আর যদি তাঁর স্বভাবই হয় কথার সংগে কথা মেলানো, তাহলে ভক্তির প্রকাশ ঘটে কাব্যের চমৎকারিত্বে। আর কবিদের কাজই যেহেতু সাদৃশ্যের সন্ধান রাখা, সেজন্য ঈশ্বরের কথা থেকে অবলীলাক্রমে তাঁরা সামান্য মানুষের সংসারে নেমে আসতে পারেন। সেখানকার সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা তখন তাঁদের রচনায় মূর্তি লাভ করে, যদিও তলে-তলে একটা প্রবল ফল্গুস্রোত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে যায়। এই স্রোত হ'লো ভক্তিভাবের স্রোত।

সংস্কৃতে অলংকারশাস্ত্রের একখানি বই-এ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসংগে পানক বা সরবৎ-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সরবতে যেমন মরিচ, লবণ ইত্যাদি বিচিত্র স্বাদ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শর্করার স্বাদটাই প্রাধান্য লাভ করে, কাব্যবিশেষের আস্বাদনেও তেমনি বিভিন্ন রসের সহযোগিতা চোখে পড়ে। এই সব পৃথক স্বাদের মধ্যে অন্যগুলির প্রাধান্য প্রারম্ভিক, আর মূল রসটির প্রাধান্য পার্যন্তিক অর্থাৎ শেষ অবধি।

ভক্তিরসাত্মক কবিতার স্বাদ সম্বন্ধে এই পানকের দৃষ্টান্তটি সুপ্রযোজ্য। পানকের পার্যন্তিক স্বাদ যেমন শর্করার স্বাদ, ভক্তিরসাত্মক কবিতার পার্যন্তিক স্বাদ তেমনি ভক্তির স্বাদ। সংসারের সুখদুঃখের কথা, শাস্ত্রের কথা, পাণ্ডিত্যের কথা, ইন্দ্রিয়সুখের কথা,—এই সব থেকেও কাব্যে ভক্তির কথাই যখন প্রবলতম প্রকাশ লাভ করে, তখনই সে কাব্য হয় ভক্তির কাব্য।

সাধারণতঃ আলংকারিকদের রচনায় ভক্তিরস বলে পৃথক কোনো রসের উল্লেখ দেখা যায় না। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বে ভক্তিপর্বের যে পাঁচটি স্তরবিভাগ সূচিত হয়েছে, সেগুলি হলো যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে ভক্তির প্রথম অবস্থাটাই হলো শমভাব। রসশাস্ত্রে এই শমভাবজাত 'শান্ত'রসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে অনেকে আবার এই বস্তুটিকে পৃথক একটি রসের মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হন নি। ভরতের পরবর্তী আলংকারিক অভিনব গুপ্ত বলেছেন, প্রয়োগত্ব যেখানে নেই, কাব্যে রসাস্বাদ ব্যাপারও সেখানে অসম্ভব। এই 'প্রয়োগত্ব' শব্দটির মানে হলো 'repnesentableness'। শমভাব যেহেতু চিৎপ্রবৃত্তির বিশ্রামসূচক, সেই কারণে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই ভাব প্রয়োগসাধ্য নয়। এর কোনো নাটকীয় অভিব্যক্তি নেই। অভিনব গুপ্ত তাই শান্তরসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

'দশরূপকের' লেখক ধনঞ্জয় বলেছেন,

> রত্যুৎসাহজুগুপ্সাঃ ক্রোধাহাসঃস্ময়োভয়ং শোকঃ।
> শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য॥—দশরূপক, ৪।৩৫

অর্থাৎ রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা, ক্রোধ, হাস, বিস্ময়, ভয় এবং শোক ব্যতীত শমভাবকেও কোনো কোনো আলংকারিক স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু নাট্যে এর পুষ্টি নেই।

ধনঞ্জয়ের এই উক্তির ব্যাখ্যাপ্রসংগে টীকাকার ধনিক বলেছেন,

আচার্য যেহেতু অন্যান্য ভাবের বিভাবাদি আলোচনা করলেও শান্তরসের অনুরূপ কোনও আলোচনা করেন নি এবং অনাদিকালপ্রবাহে যে রাগ-দ্বেষের তাড়নায় অন্যান্য ভাবের প্রকাশ, সেই রাগদ্বেষই যখন শমভাবে অস্বীকৃত, তখন শমভাবের অস্তিত্ব রসশাস্ত্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবে কি ভাবে?

সুতরাং দেখা গেলো, অভিনবগুপ্ত কার্যোল্লেখে যা বলেছিলেন, ধনিক কারণোল্লেখে তাই বললেন। অভিনব গুপ্ত প্রয়োগত্বক্ষমতাকে রসত্বের নির্ণায়ক বলে স্বীকার করেছিলেন; আর ধনিক বললেন, শান্তরসের মূলে তেমন কোনো ভাব নেই, তেমন কোনো কারণ নেই—যা অনাদিকালপ্রবাহে মানবচিত্তে নেতিবাচক ভাবে নয়, স্পষ্ট প্রেরণায় কর্মের তাগিদ জানিয়েছে।

'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ বলেছেন,

> রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
> জুগুপ্সাবিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপিচ॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭৯

এখানেও দেখা যাচ্ছে প্রথমে আটটি ভাবের উল্লেখ করে শেষে শমের উল্লেখ করা হয়েছে। এই শমভাবের বর্ণনায় বিশ্বনাথ বলেছেন,

শমো নিরীহাবস্থায়াং স্বাত্মবিশ্রামজং সুখং

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৮০

পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য আলোচনায় যে কথাটি অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিলো মাত্র, বিশ্বনাথের এই একটি উক্তিতে সেটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলো। নিরীহাবস্থায় আত্মার বিশ্রামে যে সুখবোধ, তাই হলো শমভাব। যতো নিরীহ, স্তিমিত এবং অনুচ্চারিতই হোক না কেন, এই বোধ যে সুখের বোধ সেকথা বিশ্বনাথের প্রসাদে আমরা জানতে পারছি। সুতরাং ভক্তির কবিতার মূলে সুখের প্রেরণা যে কোথা থেকে আসে, তা বোঝা গেলো। শমভাবগ্রস্ত ভক্ত পরম সুখময়তায় আচ্ছন্ন হন, তারপর সেই চিত্ত যদি আবার কবির অধিকারভুক্ত হয়, তাহলে এই সুখবোধ কাব্যে আত্মপ্রকাশ ঘটায়।

'কাব্যপ্রদীপের' লেখক গোবিন্দ ঠকুর শমভাবের মধ্যস্থতা না মেনে সরাসরি ভক্তিরস বলে একটি স্বতন্ত্র রসের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কা'রও মতে রস বলতে একমাত্র শৃংগার বা আদি রসই ধর্তব্য, আবার অন্যান্যদের মতে রস বারো রকম,—"কেচিচ্চ দ্বাদশ" ইত্যাদি। এই দ্বাদশ রসের উল্লেখকালে বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় বলেছেন,

"ভক্তিবাৎসল্যশ্রদ্ধাখ্যৈস্ত্রিভিঃ সহিতাঃ
শৃঙ্গারাদয়ো নবেত্যর্থঃ।"

ভক্তি, বাৎসল্য এবং শ্রদ্ধার সংগে শৃংগার প্রভৃতি নব রসের যোগে সর্বসমেত রস দ্বাদশসংখ্যক। দেখা যাচ্ছে, এখানে শান্ত রসকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়ে ভক্তি, বাৎসল্য এবং শ্রদ্ধাকে রসপর্যায়ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। মম্মট ভট্ট বলেছেন,

নির্বেদস্থায়িভাবাখ্যঃ শান্তোঽপি নবমোরসঃ।
রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ ভাব প্রোক্তঃ॥

—কাব্যপ্রকাশ, ৪।১২

অর্থাৎ নবম রসের নাম শান্তি রস ; নির্বেদ এর স্থায়ী ভাব—ইত্যাদি।

এই অংশের টীকায় অবশ্য টীকাকার গোবিন্দ ঠকুর একথা মানেন নি। তিনি বলেছেন, শান্ত রসের স্থায়ী ভাব হলো সর্ববৃত্তির বিরাম। নির্বেদ এর ব্যভিচারী ভাব।

সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ছাত্র এই রকম আলোচনার প্রাচুর্যে নিমজ্জিত হতে পারেন। এজাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির যেন অন্ত নেই। সেই বিতর্ক-জালের জটিলতায় অধিকতর পর্যটনের অবশ্য পুরস্কার আছে। কিন্তু আপাততঃ যে আলোচনা এখানে উদ্ধৃত হলো, তা থেকে এই কথাটি নিঃসংশয়ে বোধগম্য হয় যে ভক্তির প্রভাবে মানুষের মনে সর্বপ্রকার চিৎপ্রবৃত্তির বিরামজাত এক অপরিসীম আনন্দের বোধ সঞ্চারিত হয়। সেই আনন্দ থেকেই কবিতার প্রেরণা জাগে। বৈষ্ণব পদকর্তা লিখেছেন,

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে বিসরি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥

এখানে আদি-অন্তহীন এক পরম আনন্দের আশ্রয় কবিচিত্তে প্রেরণা জাগিয়েছে। পারাবারে যেমন কোটি কোটি তরংগের উত্থান-পতন নিত্যই ঘটে চলেছে, সেই পরম আনন্দস্বরূপের চেতনায় তেমনি এই জীবলীলায় প্রবাহ। আর একটি গানে ভক্ত বলেছেন,

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিনু
দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়॥

মাধবের অভিমুখে ভক্তের কাতর মিনতি কাব্যের বাহনে এইভাবে ধ্বনিত হয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় ভক্তিরসাত্মক কবিতার মূল ভাবটাই হলো এই—এই বিশ্বাস এবং সমর্পণ। নীলকণ্ঠ অধিকারীর গানে আছে,

আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল চরণ-ভিখারী
যে পদ বই ভব, জানে না বৈভব, ভবার্ণব তরণ তরী।

বিদেশী কবি Christopher Harvey প্রায় একই কথা বলেছেন ভিন্ন ভাষায়,—বাংলা অনুবাদে যেটা দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম :—

ব্যাকুল মনের ভাবনা কোথায় পরম রতন আছে
বিশ্বে কোথায় মিলবে গো তা'

সেই তো আদি, কেন্দ্রও তা'
যা' কিছু সব তারই আলোয় বাঁচে।

যে কথা Solomonএর গানে, অথবা David-এর স্তোত্রে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে, সেই কথাই বাংলা দেশে বলেছেন চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বিহারে বিদ্যাপতি, বৃন্দাবনে মীরাবাঈ। জীবলোক এবং জড়পদার্থের আশ্রয় সেই পরমা শক্তির উপলব্ধিতে যে আনন্দ এবং আত্মসমর্পণের প্রেরণা জাগে, তারই ফলে কবির কণ্ঠে ভক্তির কবিতা আসে। ভারতবর্ষের ভক্ত কবীর এই আনন্দেই বলেছিলেন,

'ইস্ ঘট, অন্তর বাগ বাগীচা'

—এই মাটির পাত্রটার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা কতো কাননের আনন্দ লুকিয়ে রেখেছেন—কতো সমুদ্রের নীলিমা, আকাশের জ্যোতিষ্ক!

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয়ের পর যুদ্ধ শেষ হয় নাই—নূতনভাবে ও নূতন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই যুদ্ধ বিমান ও ট্যাঙ্কের সংঘর্ষ নয়, ইহা প্রধানতঃ কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব। অবশ্য প্রয়োজনমত দুই চারিটি গুলীগোলাও চলিতেছে।

মিত্রপক্ষের প্রধান পাঁচটি শক্তির মধ্যে তিনটি সাম্রাজ্যবাদী, একটি আধা-ঔপনিবেশিক শক্তি এবং একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক শক্তি। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের অবসানের পর এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধের পূর্ব্বের স্বার্থ ও অধিকার ষোল আনা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। অথচ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের সময় বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গণ জাগরণ ঘটিয়াছে; গণশক্তি এখন পূর্ব্বের সকল বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই, ইউরোপে এবং মধ্যও সুদূর প্রাচ্যে এই মুক্তিকামী জাগ্রত গণশক্তির সহিত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল বিরোধ দেখা দিয়াছে।

প্রাচ্য অঞ্চলে

যুদ্ধ শেষ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বৃটিশ রাজনীতিকরা পশ্চিম ইউরোপের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত মিলিত হইয়া দল গঠনের পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পর সোভিয়েট রুশিয়া যে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের কষ্ট হয় নাই। পূর্ব্ব-ইউরোপ হইতে বলশেভিক্ ভাবধারার পশ্চিমমুখী প্লাবন রোধ করিবার জন্য বৃটিশ রাজনীতিকরা এই দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধের পর প্রবল শক্তিশালী হইয়া সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ক্ষেত্রে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে ইহাও বোঝা গিয়াছিল। এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিবার শক্তি অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজনীতিকরা ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সহিত মিলিত হইয়া দল গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত বৃটেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার এই পরিকল্পনা স্মরণ করিলে প্রাচ্য অঞ্চলে আজ আমরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য ফরাসী, ওলন্দাজ ও বৃটিশের মধ্যে যে সহযোগিতা দেখিতেছি, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ দৃঢ়সূত্রে সংযুক্ত; ইহাকে সম্মিলিতভাবে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বোঝে। যুদ্ধের সময় বৃটেন্ যেমন ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে স্বায়ত্ত শাসনের আশ্বাস দিয়াছিল, ওলন্দাজ ও ফরাসীরাও তেমনি তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীকে বৃটিশ-মার্কা প্রতিশ্রুতি শুনাইয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যুদ্ধোত্তর কালে এই সব অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের আপত্তি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী! ইহা বরদাস্ত করা যায় কেমন করিয়া? ইন্দো-চীন বা ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারকে সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না। এই সব অঞ্চল বন্ধনমুক্ত হইলে প্রাচ্যের সমগ্র পরাধীন দেশে উহার প্রবল প্রতিক্রিয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সাম্রাজ্যবাদীরা বোঝে। এই জন্যই ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশ বুলেট্ অবাধে চলিতেছে এবং "লেবেলবিহীন" মার্কিণ অস্ত্রও ব্যবহৃত হইতেছে।

আনন্দের কথা এই—প্রাচ্যের স্বাধীনতাকামীরা এখন আর পৃথক্ পৃথক্ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চালাইবার কথা ভাবেন না; তাঁহারা তাঁহাদের সংগ্রামের একটা সমন্বয় সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার নেতা ডাঃ সুকর্ণের তৎপরতা এবং বর্ম্মী-নেতা জেনারল আউং সান্ ও ভারতবর্ষের নেতা পণ্ডিত জওহরলালের সাম্প্রতিক বিবৃতি আশাপ্রদ।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বহুবিধ পরস্পর-বিরোধী সংবাদের মধ্য দিয়া এই কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি দেশের স্বাধীনতাকামীরা ফরাসী ও ওলন্দাজের কবল হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এই প্রচেষ্টা দমনের জন্য বৃটিশ সৈন্য ও বৃটিশ অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং জাপানীদিগকে নিয়োগ করা হইতেছে। এ কথায় কিছু সত্য আছে যে, এই সব দেশের কোনও কোনও দল প্রথমে জাপানীদের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই প্রাচ্যের এই সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কে তাহাদের ভুল ভাঙ্গে; তখন সমগ্র দেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টই এখন বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি লাভের পণ করিয়াছে। ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা বলিয়া থাকে যে, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের বর্ত্তমান নেতারা জাপানের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে; কাজেই তাহাদের সঙ্গে মীমাংসা চলিতে পারে না। এই অভিযোগ ইচ্ছাকৃত সত্যের বিকৃতি। আর, এই দুইটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানীরা সাহায্য করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বরং স্বাধীনতা-কামীদিগকে দমন করিবার জন্যই মিত্রপক্ষ জাপানীদের সাহায্য লইতেছে।

ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যবাণী করা দুষ্কর। তবে, এইটুকু নিশ্চিত বলা চলে

যে, এই দুইটি অঞ্চলের জাগ্রত গণশক্তিকে দাবাইয়া রাখা আর সম্ভব হইবে না।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতাকামীরা সামরিক ব্যাপারে একটা বড় অধিকার আদায় করিয়াছিল; কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদিগকে দাবাইবার চেষ্টা হইতেছে।

ব্রহ্মদেশে যে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে, তাহার একটি অংশ প্রথমে ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটিশ সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। পরে, জাপানীদের সাম্রাজ্যবাদী মুখোস খুলিয়া যাওয়া মাত্রই ব্রহ্ম নেতা জেনারল আউং সানের নেতৃত্বে সমগ্র ব্রহ্মদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। গত ১৯৪৩ সালে এই দলের পক্ষ হইতে জেনারল আউং সান ভারতবর্ষের মিত্রপক্ষের প্রধানকেন্দ্রে গোপনে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত। এই প্রতিরোধ বাহিনী ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিবার কাজে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে জেনারল আউং সানের সহিত লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের এই মর্ম্মে এক চুক্তি হয় যে, প্রতিরোধ বাহিনী তাহাদের কর্ম্মচারীদের অধীনে থাকিয়াই ব্রহ্মদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন যোদ্ধাদিগকে এইভাবে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলিতে ভাড়াটিয়া সৈন্য দিয়া কাজ চালানোই রীতি; রাজনীতি ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ শাস্ত্র। ঔপনিবেশিক দেশে কোন্ শ্রেণীকে লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হয়, তাহা ভারতবাসী আমরা ভালভাবেই জানি।

ব্রহ্মদেশের প্রতিরোধবাহিনী যে অধিকার লাভ করিয়াছে, বেল্‌জিয়ামের প্রতিরোধ-বাহিনী সেই অধিকার দাবী করায় গত বৎসর সেখানে প্রায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; সেই সময় প্রতিরোধ বাহিনীকে দমন করিবার জন্য বৈদেশিক শক্তির সঙ্গীন সেখানে উদ্যত হইয়াছিল। গ্রীসে প্রতিরোধ বাহিনীর দাবী না মানার জন্য এক মাস ধরিয়া সেখানে গৃহযুদ্ধ চলে। একমাত্র ফ্রান্সে জেনারল দ্য গল্ প্রতিরোধ বাহিনীকে নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে সম্মত হন।

ব্রহ্মের গভর্ণর স্যর রেজিন্যাণ্ড ডরম্যান্ স্মিথ, এখন রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রহ্মের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লীগের প্রভাব রোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি প্রধান প্রধান দপ্তরগুলিতে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে চান; কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিকে তিনি শাসন পরিষদে গ্রহণ করিতে অসম্মত। এই অন্যায় জিদের জন্য আউং সানের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লীগ্ ডরম্যান্ স্মিথের শাসন পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম. সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লীগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লীগের মনোনীত ব্যক্তিরা শাসন-পরিষদের কার্য্যকলাপ লীগের সর্ব্বোচ্চ পরিষদকে জানাইবেন এবং সেই পরিষদের আদেশ অনুসারে কাজ করিবেন। ইহাকেই ইংরাজিতে "দুর্নাম দিয়া ফাঁসী দেওয়া" বলে। বৃটেনে গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে রক্ষণশীল দল শ্রমিক দলের মনোনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অপবাদ রটাইয়াছিল। প্রতিক্রিয়া পন্থীদের অপকৌশল সর্ব্বত্রই একরূপ।

সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে গণশক্তির দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া আর নিজের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করা এক কথা। "মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করিতে" দ্বিধা স্বাভাবিক। কিন্তু গণশক্তি জাগ্রত ও একতাবদ্ধ হইলেই সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসে। শোষিত ও নিষ্পেষিত জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব ও অনৈক্যই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। ব্রহ্মদেশে এই ভিত্তি চিরদিনের মত ধ্বসিয়া গিয়াছে। শত ডরম্যান স্মিথের কূটবুদ্ধি এই ভিত্তি আর গাঁথিয়া তুলিতে পারিবে না।

চীনে গৃহ-যুদ্ধ

মাসাধিক কাল ধরিয়া চুংকিংএ কম্যুনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং ও মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই আলোচনা অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অবশ্য, মীমাংসার সকল আশা এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

চুংকিংএ আলোচনা চলিবার সময় উত্তর চীনে সরকারপক্ষের সৈন্য অকস্মাৎ কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন যায়গায় ছোট ছোট সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শক্তিশালী; কারণ যে সব জাপানী সেনা তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কম্যুনিষ্টদের হাতে গিয়াছে। সরকারপক্ষ জাপানের তাঁবেদার সেনাবাহিনীকে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে কম্যুনিষ্টরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

চীনস্থিত মার্কিণ সেনাপতি জেনারল ওয়েডমীয়ার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমেরিকা চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সঙ্ঘর্ষে আমেরিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নাই। মার্কিণ বিমানবাহিনী ও জলযান চীনা সৈন্যকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। চীনের মত বিশাল দেশে এই সাহায্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বিশেষতঃ চীনের সাধারণ সংযোগসূত্র এখন বিচ্ছিন্ন।

চীন-সোভিয়েট চুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সর্ত্ত এই যে, সোভিয়েট রুশিয়া চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। বস্তুতঃ চীনের বর্ত্তমান সঙ্ঘর্ষে সোভিয়েট রুশিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ; কম্যুনিষ্টদের নিকট কোথাও একটি সোভিয়েট অস্ত্র দেখা যায় নাই। চীন-সোভিয়েট চুক্তির এই সর্ত্তে পরোক্ষে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে সরিয়া থাকিতে বলা হইয়াছে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ উত্তমরূপেই জানেন যে, বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে চীনের সরকারপক্ষ কখনও কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিতে পারিবে না। আজ অন্য কোনও শক্তি যদি কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষকে সমর্থন করিতে থাকে, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া নীরব থাকিবে না। চীনে কম্যুনিষ্টদিগকে দাবাইয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সমর্থনে সেখানে অর্দ্ধ-ফ্যাসিস্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা সে নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিবে না।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় "আরবের লরেন্স" নামে পরিচিত এক ব্যক্তি মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদিগকে তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিল এবং মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে তাহাদিগকে স্বাধীনতার আশ্বাস শুনাইয়াছিল। প্যালেষ্টাইন্‌বাসী এইরূপ একটি মুসলমান সম্প্রদায় তখন স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় খলিফার বিরুদ্ধে গিয়াছিল।

এদিকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য টাকারও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইহুদীদের নিকট হাত পাতিবার সময় মিত্রপক্ষ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতিদিয়াছিলেন যে,যুদ্ধের পর তাহারা একটি নিজস্ব রাষ্ট্রলাভ করিবে।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর প্যালেষ্টাইনবাসী স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে পাইল বৃটিশের ম্যাণ্ডেট; আর ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র হইল এই প্যালেষ্টাইন। ম্যাণ্ডেটরী অধিকারের সূত্রে ধরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সকল ঐশ্বর্য্য ক্রমে প্যালেষ্টাইনে পৌঁছায়। আর দলে দলে ইহুদীরা যাইয়া প্যালেষ্টাইনে ভীড় জমায়। রাজনীতিক্ষেত্রে প্যালেষ্টাইনবাসীর লাভ হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ; আর অর্থনীতিক্ষেত্রে ইহুদীরা আরবদের নিকট হইতে জমিদারী কিনিয়া আরব কৃষকদিগকে উচ্ছেদ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিক ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবরা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। আরবদের সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে একটা সাময়িক মীমাংসার ব্যবস্থা তখন হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থায় প্যালেষ্টাইনে নূতন ইহুদীদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া ঐ দেশটি ইহুদী অঞ্চল ও আরব অঞ্চলে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হয়। প্যালেষ্টাইনবাসী আরবরা তাহাদের মাতৃভূমিকে এইভাবে বিভক্ত করায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কাজেই সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্যালেষ্টাইন কতকটা শান্ত ছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পরই প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এই বিষয়ে বৃটেন্ আমেরিকার সামান্য মতদ্বৈধ ছিল; এখন তাহাও দূর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্যালেষ্টাইনের আরবদের প্রতি মধ্য-প্রাচ্যের সকল মুসলমান রাষ্ট্রই সহানুভূতিসম্পন্ন। কাজেই, বৃটেন মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাজ্যগুলিকে সন্তুষ্ট করিবার আশায় প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা আর বৃদ্ধি করিতে চাহে নাই। কিন্তু আমেরিকার পক্ষ হইতে জিদ্ করা হয় যে, প্যালেষ্টাইনে আরও এক লক্ষ ইহুদীর জায়গা করিয়া দিতে হইবে।

নাৎসী-ফ্যাসিস্তদের প্রভুত্বের আমলে ইহুদীরা অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগতের সকলেই তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনের আরবদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। কোন্ পুরাকালে প্যালেষ্টাইন্ ইহুদীদের বাসভূমি ছিল, সে নজীর দেখানো অর্থহীন।

প্রকৃত কথা এই,সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মধ্য-প্রাচ্যে—বিশেষতঃ প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ঢুকাইয়া একটা বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের উপর বৃটেনের নেকনজরের প্রধান কারণ—উহা সুয়েজখালের ঠিক পার্শ্বে অবস্থিত এবং এংলো-ইরানিয়ান্ তৈল কোম্পানীর পাইপ লাইন প্যালেষ্টাইনের হাইফা পর্য্যন্ত আসিয়াছে; সেখান হইতে এ তৈল জাহাজে ওঠে। সম্প্রতি আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তৈল আহরণের নূতন নূতন অধিকার লাভ করিয়াছে। এই তৈল বহনের জন্যও হাইফা পর্য্যন্ত পাইপ লাইন নির্ম্মিত হইতেছে। কাজেই, প্যালেষ্টাইন্ সম্পর্কে ট্রুম্যান-বার্ণস্ কোম্পানীর অত্যধিক আগ্রহ স্বাভাবিক। বৃটেন অপেক্ষা আমেরিকা আরও বেশী সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছে। ইহার কারণ—প্যালেষ্টাইনের পার্শ্ববর্ত্তী ইরাক, ট্রান্স জর্ডান প্রভৃতি দেশে এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বহু পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার এখন নূতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করা দরকার। এই জন্যই ইহুদীদের সম্পর্কে বৃটেন অপেক্ষা আমেরিকার অন্যায় জিদ্ বেশী।

বল্‌কান্ সমস্যা

পূর্ব্ব ইউরোপে হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও বুল্‌গেরিয়ায় যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বৃটেন ও আমেরিকা তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে। ঐ সব অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নির্ব্বাচনের ফলে যে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, তাহাকেও উহারা মানিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। ইহা ছাড়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার অর্থনৈতিক চুক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকা প্রবল আপত্তি জানাইয়াছে।

বল্‌কান অঞ্চলে যে সব গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ফ্যাসিস্ত শক্তির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহযোগী কোনও ব্যক্তি স্থান পায় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সব দেশের অর্থনৈতিকক্ষেত্রে যাহারা প্রধান পাণ্ডা ছিল, তাহারা অনেকেই পরে ফ্যাসিস্ত শক্তির সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। কাজেই, ফ্যাসিস্তদের সহযোগী লোকদিগকে তাড়াইবার ফলে বৃটিশ ও মার্কিণ ধনিকদের বহু পুরাতন মিত্র ও সহযোগী ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে। ইহাই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টগুলির উপর বৃটেন ও আমেরিকার বিরূপ হইবার প্রধান কারণ।

রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির সহিত রুশিয়ার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এইভাবে অঞ্চলগত ভিত্তিতে যদি অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে শান্তি আসিবে না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বৃটেনের শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন্ বলিয়াছেন—Regional economic and commercial pacts should give way to world pacts. ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েট রুশিয়া ইরাণে তৈল আহরণের অধিকার পায় নাই। হয়ত বলা হইবে—ইরাণ গভর্ণমেণ্ট রুশিয়াকে তৈল আহরণের অধিকার না দিলে অন্যে কি করিবে? ইহার উত্তর—রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক চুক্তি করিলে অন্যের তাহাতে বলিবার কি আছে?

এই world pactএর আদর্শ যদি রুশিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রয়োগ করিতে চায়, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ কি বলিবেন?



আজাদ-হিন্দ-ফৌজ—

৫ই নভেম্বর দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় বৃটীশ বাহিনীর ৭ জন অফিসার লইয়া সামরিক আদালত গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ জন ইউরোপীয় ও ৩ জন ভারতীয়—তাহাদের নাম (১) মেজর জেনারেল ব্ল্যাক-ল্যাণ্ড (২) ব্রিগেডিয়ার হার্ক (৩) লেঃ কঃ স্কট (৪) লেঃ কঃ ট্রিভেলন (৫) লেঃ কঃ নাসির আলি খাঁ (৬) মেজর প্রীতম্ সিং (৭) মেজর বনোয়ারীলাল। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থনের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক যে পক্ষসমর্থনকারী কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, লাহোর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার দিলীপ সিং, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মিঃ আসফ আলি, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, পাটনা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন শরণ আছেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালন করিতেছেন—এড্‌ভোকেট জেনারেল সার এন-পি-এঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়ালস্। আসামী ক্যাপ্টেন গুরুবক্স সিং ধিলন, ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ ও ক্যাপ্টেন সাইগলের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সীট দাখিল করা হইয়াছে।

১৯১৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে ক্যাপ্টেন সা নওয়াজের জন্ম হয়। আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি ১১ তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন। তাঁহার পরিবারের ৬২ জন বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করে। দেরাদুনে মিলিটারী ট্রেনিং একাডেমীতে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯৩৬ সালে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতভূমিতে মণিপুরে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন। ক্যাপ্টেন পি-কে সাইগল ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯৪০ সালে সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন। তিনি লাহোর হাইকোর্টের জজ মিঃ অচ্ছুরামের পুত্র। আজাদ-হিন্দ-ফৌজে তিনি কর্ণেল পদে উন্নত হইয়াছিলেন ও উহার অফিসারদের শিক্ষাদান করিতেন। লেঃ ধীলন ১৯১৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল লাহোর জেলার আলগনে জন্মগ্রহণ করেন ও দেরাদুনে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে রেগুলার কমিশন প্রাপ্ত হন। তিনি বিবাহিত, কিন্তু কোন সন্তানাদি নাই। তাঁহার পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী পশু চিকিৎসক। তাহার দুইভাই সরকারী সেনা বিভাগে ও অপর আর এক ভাই ডেপুটী ফরেষ্ট রেঞ্জারের চাকরী করে। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর পতনের পর ১৯৪৫ সালের ১৭ই মে পেগুতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময়ে তিনি মেজর মোহন সিং কর্তৃক গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে কাজ করিয়াছেন।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠনের ইতিহাস ও তাহাদের কার্য্যকলাপ একটি অবিস্মরণীয় জাতীয় বাহিনী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আজাদ হিন্দ-ফৌজের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগের যুদ্ধের অবস্থার কথা মনে আসে। সে সময়ে বৃটিশ শক্তি জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া হইতে সরিয়া আসে। পশ্চাতে রাখিয়া আসে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয়কে—তাহাদের জাপানের হাতে পড়িতে হয়। এতদিন তাহাদের প্রভু ছিল বৃটীশ, তাহার পর হইল জাপানী। ভারতে চলিয়া আসার সময় বৃটীশ সেনা বাহিনীর জাতিগত বৈষম্য-মূলক আচরণ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা দানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অসম্মতির ফলে ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বৃটিশ ও জাপানী সাম্রাজ্য-বাদের কবল হইতে মুক্তির বার্ত্তা লইয়া তাহাদের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জাপান তাহার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অসহায় ভারতীয়দিগকে ব্যবহার করিবে, সুভাষচন্দ্র ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি যে গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট বলিলে অন্যায় হইবে। ইঙ্গমার্কিণ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী ৯টি স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট এই আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লয়। জাপান আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে পরাধীন বাহিনীতে এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ-গভর্ণমেণ্টকে তাঁবেদার গভর্ণমেণ্টে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। সুভাষচন্দ্র কর্তৃক গঠিত স্বাধীনতা সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ভারতীয়দের দ্বারা ও ভারতীয়দের অর্থে দেশকে বিদেশীর কবল

হইতে মুক্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—মালয়, ব্রহ্ম ও দক্ষিণপূর্ব্ব-এসিয়ার ভারতীয়দের রক্ষা করা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল—(১) সুভাষচন্দ্র বসু রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধমন্ত্রী (২) ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী—নারী সংগঠন (৩) মিঃ এস এ আয়েঙ্গার—প্রচার (৪) লেঃ কঃ এ-সি চ্যাটার্জ্জি—অর্থ। (৫) লেঃ কঃ আজিজ আমেদ (৬) লেঃ কঃ এস-এন-ভগৎ (৭) লেঃ কঃ জে কে ভোঁসলে (৮) লেঃ কঃ গুলজারা সিং (৯) লেঃ কঃ এ পি লোকনাথম্ (১০) লেঃ কেঃ এম্ জেড কিয়ানী (১১) লেঃ কঃ ঈশান কাদ্রি (১২) লে কঃ সা নওয়াজ—সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি (১৩) মিঃ এ এম সহায়—সম্পাদক (১৪) রাসবিহারী বসু—সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা (১৫) মঃ করিম গ.ণ (১৬) শ্রীদেবনাথ দাস (১৭) মঃ ডি এম খান (১৮) মিঃ এ ইয়েলাপ্পা (১৯) মিঃ আই থিবি (২০) সর্দ্দার ঈশ্বর সিং—পরামর্শদাতা (২১) মিঃ এ এন-সরকার—আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা।

এই প্রসঙ্গে বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর গত অধিবেশনে আজাদ হিন্দ-ফৌজ সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। তাহাতে বলা হয়—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এই কথা জানিতে পারিয়া উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন যে, ১৯৪২ সালে মালয়ে এবং ব্রহ্ম দেশে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল, সেই বাহিনীর বহু সংখ্যক অফিসার ও নরনারী এবং পশ্চিম রণাঙ্গণের কিছু ভারতীয় সৈন্য বিচার অথবা কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ও বিদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রহিয়াছেন। যে সময়ে এই ফৌজ গঠিত হয় সে সময়ে ও তাহার পরে ভারতবর্ষ, মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং অন্যান্য স্থানে যেরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহার কথা ও তাহার ঘোষিত উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত অফিসার ও নরনারীর প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকের ও যুদ্ধ বন্দীদের ন্যায় আচরণ করা ও যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আরও বহু সুদূরপ্রসারী কারণের কথা এবং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এই কথা বিবেচনা করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবার অপরাধে (যেরূপ ভ্রান্তপথেই হউক না কেন) যদি এই সমস্ত অফিসার ও নরনারীকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে একটি শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে। এই প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন ও নূতন ভারতবর্ষ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রকৃত পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। ইতিমধ্যে তাঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, যদি তাঁহাদিগকে আরও শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা শুধু অযৌক্তিক হইবে না, ইহার ফলে সংখ্যাতীত দুঃখ ও সমপ্রভাবে ভারতীয়গণের চিত্তেও বেদনার সঞ্চার হইবে এবং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যবধান আরও বিস্তৃত হইবে। সুতরাং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী একান্তভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, এই বাহিনীর অফিসার ও নরনারীগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী আরও আশা করেন যে, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানের যে সমস্ত অসামরিক ভারতবাসী ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কোনরূপ উৎপীড়ন বা দণ্ডদান করা হইবে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী আরও আশা করেন যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন কার্য্যকলাপের জন্য কোন ভারতীয় সৈনিক বা কোন অসামরিক ভারতবাসীকে ইতিপূর্ব্বে যদি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা হইবে না।



ক্যাপ্টেন সা নওয়াজ

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হইলে তথায় সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী জাপানী হেড কোয়ার্টারের মেজর ফুজিয়ারা পরামর্শ দেন—ভারতীয়গণ যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। ৯ই ও ১০ই মার্চ্চ মালয়ের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরে এক সভা করে ও স্থির হয় যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জাপানী তাঁবেদার হিসাবে গণ্য হইবে না। ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে এক সম্মিলন হয়। তাহাতে সিঙ্গাপুর হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিদল ছাড়াও

হংকং, সাংহাই, ও জাপানের প্রবাসী ভারতীয়গণ যোগদান করেন। সেখানে স্থির হয়—পূর্ব্ব এশিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। তথায় আজাদ হিন্দ, বাহিনী গঠিত হয় ও তাহার কর্ম্মপরিষদ স্থির হয়। তাহার পর ১৫ই হইতে ২৩শে জুন (১৯৪২) ব্যাংককে এক প্রতিনিধি সম্মিলন হয়। জাপান, মাঞ্চুকুও, হংকং, বার্মা, বোর্ণিও, জাভা, মালয় ও শ্যাম হইতে ১০০ প্রতিনিধি তথায় সমবেত হন। তথায় আজাদ-হিন্দ, আন্দোলনের নিম্নলিখিত মূলনীতি নির্দ্ধারিত হয়—

(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব্ব এসিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণকে লইয়া একটি আজাদ-হিন্দ,-সংঘ গঠন করা হইবে (২) আজাদ-হিন্দ,-সংঘের আদর্শ, কার্য্যক্রম ও সকল প্রকার



ক্যাপ্টেন ধিলন

পরিকল্পনা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, কার্য্যক্রম ও উহার পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসৃত হইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে। কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র সাধন করিতে হইবে। (৩) পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় বাহিনী হইতে এবং ভারতীয় বেসামরিক জনসাধারণের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি আজাদ-হিন্দ,-ফৌজ গঠন করিতে হইবে (৪) ভারতবর্ষের প্রতি ও এই নবগঠিত আজাদ হিন্দ সংঘের প্রতি জাপানীদের নীতি কি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাইতে হইবে।

সংঘের সভাপতি হইলেন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ও সংঘের প্রধান কর্মস্থল হইল সিঙ্গাপুর। একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয় ও পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেক দেশে ইহার শাখা সংঘ স্থাপিত হয়। তাহার পর জাপ কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সংঘকে তাঁবেদার করিবার চেষ্টা করে—কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে সফল হয় নাই। ১৯৪৩এর এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে আর একটি প্রতিনিধি সম্মিলনে স্থির হয়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তথায় যাইলে তাঁহার উপর নেতৃত্ব দেওয়া হইবে। ১৯৪৩এর ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌছিলে ৪ঠা জুলাই তাঁহাকে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সভাপতি করা হয়। সুভাষচন্দ্র ঐ সময়ে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, আজাদ হিন্দ, ফৌজই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় বাহিনী। জাপানীদের সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব থাকিলে ইহা বিভীষণ বাহিনী বলিয়া কুখ্যাত হইবে। ইহার নীতি, কার্য্যকলাপ, নেতৃত্ব—ভারতীয় দেশপ্রেমিকগণ কর্ত্তৃকই চালিত হইবে। জাপানীদের ভারত আক্রমণের অধিকার নাই। কোনরূপ বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব বা একজনও বৈদেশিক সৈন্যকে ভারত ভূমিতে স্বীকার করা হইবে না। জাপানীগণ যদি বলেন যে, তাঁহারা ভারতকে বৃটিশ শক্তির কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করিতে যাইতেছেন, তথাপি আজাদ-হিন্দ,-ফৌজ তাঁহাদের অন্যায় আক্রমণকারী হিসাবেই গণ্য করিবে। ভারতবর্ষকে যদি বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত করিতে হয়, তবে ভারতের একমাত্র নিজস্ব বাহিনীই তাহা করিতে পারে। জাপানীদের সামরিক কৌশল ও নীতির দ্বারা এই ভারতীয় বাহিনী কখনই চালিত হইতে পারিবে না। জাপানীদের নীতির সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব থাকিলে ইহা পঞ্চম বাহিনী বলিয়া ইতিহাসের কলঙ্কভাগী হইবে। ঐ সময়ে মালয়ে একটি সামরিকশিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় ও এক এক দলে ৭ হাজার লোককে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐরূপ বহু দল শিক্ষালাভ করে। ঐ সময়ে অর্থ ভাণ্ডার, সৈন্যবাহিনী, নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্য প্রভৃতি ব্যাপক হওয়ায় সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারত-অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট নাম দিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন ও ২৩শে অক্টোবর ঐ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে সকল দেশ সে সময়ে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা সকলেই ঐ গভর্ণমেণ্ট মানিয়া লয়। ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী ঐ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ সময়ে আজাদ হিন্দ,-সংঘের মালয়ে ৭০টি শাখা, ব্রহ্মদেশে ১০০টি শাখা ও শ্যামে ২৪টি শাখা গঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, ফিলিপাইন, চীন, মাঞ্চুকুও, জাপান প্রভৃতি স্থানে ও শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীরা ঐ গভর্ণমেণ্টের জন্য ৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে মালয় এই সংঘকে ৪০ লক্ষ টাকা উপহার দেয়। কুয়ালালামপুরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়। তথায় মাসিক ৭৫ হাজার ডলার ব্যয় করা হইত। মালয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ২ হাজার একর জমী বাসোপযোগী করা হয়। ব্রহ্মদেশে এই সংঘের অধীনে ৬৫টি জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ আক্রমণাত্মক কার্য্য আরম্ভ করে ও ১৮ই মার্চ্চ তাহাদের বাহিনী ভারত ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে পদার্পণ করে। ঐ বাহিনীতে ৩টি দল ছিল—(১) সুভাষ দল—৩২০০ সৈন্য—অধ্যক্ষ কর্ণেল সা নওয়াজ (২) গান্ধী দল—২৮০০ সৈন্য—অধ্যক্ষ কর্ণেল ইয়ানৎ কয়ানি (৩) আজাদ দল—২৮০০ সৈন্য—অধ্যক্ষ কর্ণেল মোহন



ক্যাপ্টেন সাইগল

সিং। তাহা ছাড়া সঙ্গে ৩০০ বাহাদুর দলের সৈন্য ও ৭০০ বেসামরিক সাহায্যকারী ছিল। ৩০০০ সৈন্য লইয়া গঠিত নেহরু দল লইয়া অধ্যক্ষ কর্ণেল গুরুবকস্ সিং ধীলন তাহাদের পিছনে ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে—সুভাষচন্দ্র পরদিন ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। তথায় মেজর জেনারেল লোকনাথনের নেতৃত্বে ৬ হাজার সৈন্য ও সংঘের সহ সভাপতি শ্রীযুত জে এন ভাদুড়ীর উপর অন্যান্য দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়। জাপানীদের পশ্চাদপসরণ ও বৃটিশ কর্ত্তৃক পুনরধিকারের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে রেঙ্গুণে কোনরূপ রাহাজানি বা অরাজকতা ছিল না। আজাদ হিন্দ্ সংঘ রেঙ্গুণকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়াছিল। ২৮শে মে তারিখে ভাদুড়ী মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ সংঘ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও সংঘের বহু কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাঁহারা এখন কে কোথায় আছেন, তাহা জানা দুষ্কর হইয়াছে।

১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র ফৌজকে শেষ নির্দ্দেশ দেন—তাহাতে তিনি বলেন—আমি চির আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মানিয়া লইব না। শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকিবে।

বিচার—

গত ৫ই নভেম্বর সকালে দিল্লীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সদস্যদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বেলা সওয়া ১০টায় আদালত বসিলে সামরিক আদালতের সভাপতি ও সদস্যগণ শপথগ্রহণ করেন ও আসামী সা নওয়াজ সাইগল ও ধীলনকে আদালতে হাজির করা হয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নরহত্যা ও তাহাতে সহায়তা করা—আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত এই সকল অভিযোগ আদালতে আসামীদের নিকট পঠিত হয় ও আসামীগণ প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে নিজেদের নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন। আদালতে এক মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা যায়—দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর আসামীরা তাহাদের আত্মীয় পরিজনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই মামলার সকল বিষয় আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিন সপ্তাহ সময় চাহিলে তাহাতে আপত্তি করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয়—সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার সার এন পি এঞ্জিনিয়ারের উদ্বোধন বক্তৃতা ও প্রধান সরকারী সাক্ষী লেঃ ডি সি নাগের জবানবন্দীর পর সময় দেওয়া হইবে। তদনুসারে সার এন পি এঞ্জিনিয়ার উদ্বোধন বক্তৃতা করেন ও জলযোগের পর লেঃ নাগের জবানবন্দী আরম্ভ হয়।

ঐ দিন আদালতে উপস্থিত ৩ জন আসামী ছাড়া ও অপর তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়—(১) ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদ (২) সুবেদার সিঙ্গারা সিং (৩) জমাদার ফতে খাঁ। তাহাদের যুদ্ধ করা ছাড়া ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৭ ও ৩২৯ ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

সে দিন ২২ বৎসর পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রথম ব্যারিষ্টারের পোষাক পরিয়া আদালতে উপস্থিত হন। সার দলীপ সিং, পণ্ডিত নেহরু, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, আসফ আলি ও ডাঃ কে-এন-কাটজু প্রথম শ্রেণীতে ও ডাক্তার

প্রশান্তকুমার সেন প্রভৃতি পশ্চাতের শ্রেণীতে বসিয়াছিলেন। সকলের ফটো গ্রহণের জন্ত সেদিন কিছু সময় দেওয়া হইয়াছিল। সেদিন লেঃ নাগের জবানবন্দী শেষ না হওয়ায় পর দিন ৬ই নভেম্বর ও বিচার চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দিন কতকগুলি প্রশ্নের বৈধতা লইয়া সরকার পক্ষে সার এন পি এঞ্জিনিয়ারের সহিত আসামী পক্ষের শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইএর বাগবিতণ্ডা হইয়াছিল। ঐদিন তৃতীয় দফায় আসামী ক্যাপ্টেন বারহান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে। ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে। আসামী পক্ষে ১২৫ জন সাক্ষী আছেন—তন্মধ্যে ঝাঁসীর রাণী সৈন্যদলের অধিনায়িকা ডাঃ মিস লক্ষ্মী অন্যতম।

মিস লক্ষ্মী স্বামীনাথমের বয়স ৩২ বৎসর। তাঁহার পিতা মাদ্রাজে ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৮৪০ সালে তিনি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা ব্যবসা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি জাপানের হাতে বন্দী হন ও পরে স্বাধীনভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অধীনে সৈন্ত বাহিনীর অধিনায়ক হন। এখন তিনি কোথায় তাহা জানা যায় না। কেহ বলেন, তিনি রেঙ্গুনে থাকিয়া ডাক্তারী করিতেছেন। আবার কেহ বলেন, তিনি গ্রেপ্তার হইয়া দিল্লীর লাল কেল্লার মধ্যেই আছেন।

দেশবাসীর বিক্ষোভ—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নির্দেশ মত ৫ই নভেম্বর ভারতের সর্ব্বত্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সদস্যদের মুক্তির দাবী করিয়া সভা ও বিক্ষোভ করা হইয়াছে। ঐ দিন কলিকাতায় যে দৃশ্য দেখা গিয়াছে তাহা সাধারণত দেখা যায় না। ভারতের প্রায় সকল সহরে সেদিন সভা হইয়াছে ও লোক কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়াছে। মাদ্রাজ-মাদুরায় ঐদিন পুলিস জনতার উপর গুলীবর্ষণ করায় ২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। আরও বহু স্থান হইতে ঐ দিন কর্ত্তৃপক্ষের সভা ও মিছিলে বাধা দানের সংবাদ আসিয়াছে।

৫ই নভেম্বর ভারতের প্রায় সকল দৈনিক সংবাদপত্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর গঠনের ইতিহাস ও বিবরণ প্রকাশ করায় উহা পাঠ করিয়া দেশবাসীমাত্রই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। সকল সভায় ঐ সকল বিবরণ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। এই সকল দেশপ্রেমিক বীরকে রক্ষা করিবার জন্ত সর্ব্বত্র অর্থ সংগৃহীত হইতেছে ও তাহাদের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা চলিতেছে। উক্ত বাহিনীর সদস্য কাপ্তেন রসিদ আলি, জেম্স খাঁ ও সুবেদার সিঙ্গার সিং লাল কেল্লায় আটক আছেন। তাঁহাদের বিচারের সময় যাহাতে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা হয়, সে জন্ত তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছেন তাহা মিঃ আসফ আলির নিকট পৌঁছিয়াছে; শ্রীযুত কেশরাম নাইডু প্রমুখ ৫ জন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সদস্যকে নাগপুরের নিকট কাম্‌টীতে আটক রাখা হইয়াছে—শ্রীযুত নাইডু সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন।

বোম্বাইয়ের বেলগাঁও সহরে একটি বড় পার্কের—জাতীয় বাহিনীর নেতা লেঃ কঃ জগন্নাথ রাও ভোঁসলার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ১৯০৬ সালে ছত্রপতি শিবাজীর বংশে শ্রীযুত ভোঁসলা জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯২৮ সালে সৈন্ত বিভাগে যোগদান করেন ও ১৯৩৭ সালে ক্যাপ্টেন হইয়া সম্রাটের মুকুটোৎসবে যোগদান করেন। সিঙ্গাপুরের দুরবস্থার সময় তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করেন ও সর্ব্বোচ্চ সৈন্তাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহাকে ব্যাঙ্ককে গ্রেপ্তার করা হয় ও বর্ত্তমানে দিল্লী লাল কিল্লায় রাখা হইয়াছে। তিনি গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার বর্ত্তমান শাসকের আত্মীয়। তাঁহার স্ত্রী ও তিন কন্যা বর্ত্তমানে বরোদায় বাস করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রথম সভাপতি রাসবিহারী বসুর নাম শুনা গিয়াছে। তিনি পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম ও প্রধান ছিলেন। ১৯১২ সালে দিল্লীতে যে দল লর্ড হার্ডিংএর প্রতি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনি সেই দলে ছিলেন। তাঁহার সহকর্মী অবোধবিহারী লাল ও মাষ্টার আমীর চাঁদ ১৯১৪-১৫ সালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাসবিহারীর গ্রেপ্তারের জন্য সে সময় ১২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ও সর্ব্বত্র তাঁহার ছবি প্রচার করা হয়। কয় বৎসর গোপনে থাকিয়া ১৯১৫ সালে তিনি জাপানে যান। ৮ বৎসর তিনি গোপনে ছিলেন। পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানী ভাষায় ৫ খানা গ্রন্থ লিখেন ও ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়া-ইন-বণ্ডেজ' পুস্তক জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। টোকিওতে তিনি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া তিনি ভারতে আসেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ও বিজয়লক্ষ্মী—

বহুদিন আমেরিকায় বাস করার পর গত ২রা নভেম্বর ওয়াসিংটনে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। ২০ মিনিট উভয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। মিঃ ট্রুম্যান পণ্ডিত জহরলাল

নেহরুর লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারতবাসীদের যে নির্য্যাতন চালাইতেছে, সেই কার্য্যে আমেরিকা ঐ সকল সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করায় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় রাজনীতিক নেতার সহিত কোন মার্কিণ রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ হয় নাই। কাজেই এই ঘটনার উপর রাজনীতিক গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে।

গভর্ণরের পদত্যাগ—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ আর-জি কেসী পদত্যাগ করিয়াছেন ও মিঃ এফ-জে-বারোজ তাঁহার স্থলে নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনে আমাদের কিছু যায় আসে না—কারণ যিনিই গভর্ণর হউন না কেন, সাম্রাজ্যবাদীদের শাসননীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মিঃ কেসী প্রথম এদেশে আসিয়া আমাদের অনেক বড় বড় কথা শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। সে জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না, কারণ তিনি যে ইস্পাতের কাঠামোর অংশ, তাহা কিছুতেই নরম করা যায় না।

কলিকাতায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট—

গত ২ মাস যাবৎ কলিকাতা ও সহরতলীতে এত অধিকসংখ্যক কারখানায় এত অধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে, এরূপ ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। যুদ্ধের সময় কারখানার মালিকগণ প্রচুর লাভ করিয়াছে ও ধনী হইয়াছে। সে সময়ে শ্রমিকদিগকে কোনপ্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ায় কারখানার কাজ কমিয়া যাইতেছে। কাজেই ধনীরাও বহু লোককে বিদায় দিতেছে ও লোকের মজুরীর হার কমাইয়া দিতেছে। কিন্তু অন্যপক্ষে খাদ্যদ্রব্যের দাম যুদ্ধান্তে না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যাইতেছে। এ অবস্থায় দরিদ্র শ্রমিকগণের পক্ষে ধর্ম্মঘট করা ছাড়া অন্য গতি নাই। বিদেশী সরকার ধনীদের পক্ষে, কাজেই সে দিক দিয়াও শ্রমিকদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। এ অবস্থায় দেশে ক্রমে অশান্তি ও অরাজকতা যে বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য সকল সভ্য দেশে সরকার পুনর্গঠন ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া বেকার লোকদিগের অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিতেছে। এদেশে পুনর্গঠনের বড় বড় পরিকল্পনার কথাই শুধু শুনা গিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু হইতে দেখা যায় না। ডাক্তার মেঘনাদ সাহার মত বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া সফল হইতে পারেন নাই। যুদ্ধের সময় যাহারা সে কাজে কোটি কোটি টাকা অর্থ ব্যয় করিতে পারিয়াছে, যুদ্ধান্তে প্রজারক্ষার জন্য তাহাদের টাকার অভাব হইয়াছে—একথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল—

গত ৩১শে অক্টোবর ভারতের সর্বত্র খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের ৭১তম জন্মবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর ১৯১৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত কংগ্রেসে যোগদান করেন, ১৯২১ সালে তিনি গুজরাট কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯৩১ সালে তিনি করাচী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। গত ২৫ বৎসর তিনি সর্ব্বত্যাগী ও অনন্তকর্ম্মা হইয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালন করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান কর্ম্মী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।



শান্তিপুরে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা উৎসবে সমবেত সুধীগণ

প্রতিমা নিরঞ্জনে বাধা প্রদান—

এবার একদল মুসলমান বাঙ্গালা দেশে দেবী প্রতিমা বিসর্জ্জন মিছিলে বাধা দান করিয়া নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে। বরাহনগর আলমবাজার ও বারাকপুরের বৃহ

কলিকাতার অতি নিকটস্থ স্থানে ও বর্দ্ধমানের মত হিন্দুপ্রধান সহরেও সে চেষ্টা হইয়াছে। ঢাকা প্রভৃতি স্থানের কথা ত স্বতন্ত্র। পুলিস প্রহরী ও পুলিসের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও কি করিয়া মুসলমান দাঙ্গাকারীরা ঐ সময় বাধা সৃষ্টি করিতে সাহস পায়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কাহাদের চেষ্টায় এই সকল দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত হইলে বহু সত্য প্রকাশ পায়। কিন্তু বর্ত্তমানের বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে দেখা যায় না। কাজেই হিন্দু জনগণের পক্ষে এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের প্রতি আস্থা হারানোই স্বাভাবিক।

খড়দহে উৎসব—

গত ১৩ই আশ্বিন রবিবার ২৪ পরগণা খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-জির মন্দিরে দক্ষিণেশ্বরবাসী শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য বাসরের এক অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও বাঙ্গালার নানাস্থানে যে সকল দেবমন্দির ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় আছে, সেগুলিকে সংস্কার ও রক্ষা করার কথাও আলোচিত হইয়াছিল। আহ্বানকারী মৃণালবাবুর চেষ্টায় খড়দহের মন্দিরের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধান হওয়ায় তাঁহাকে সাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়। সভা শেষে কীর্ত্তনাদির পর শ্যামসুন্দরের প্রসাদে সকলকে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।



খড়দহ শ্রীমন্দিরে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

কর্পোরেশনে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী সমিতির পক্ষ হইতে গত ২৬শে অক্টোবর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে ৪০টি অভিযোগ সম্বলিত এক আবেদন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। ঐ আবেদনে বলা হইয়াছে, অভিযোগগুলি দূর করার ব্যবস্থা না হইলে সকল কর্ম্মচারী একযোগে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থায় যে যে সকল ত্রুটি দেখা যাইতেছে, সেগুলি দূর করিতে হইলে কর্ম্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। এই ৪০ দফা অভিযোগ বিষয়ে ভাল করিয়া তদন্তের পর সেগুলি মিটাইবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ সত্যই যদি একদিন ধর্ম্মঘট হয়, তবে কলিকাতা সহরবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। সেজন্য কে দায়ী হইবে?

ব্রহ্মবাসীদের চরম দুরবস্থা—

শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশে ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট পদে কাজ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি বিমানযোগে ব্রহ্মে যাইয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন —ব্রহ্মদেশে এখন কোন জিনিষ পাওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া কাপড়ের অভাব খুব বেশী। একটা জামার দাম ৮০।৯০ টাকা। একটা লুঙ্গির দাম যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩ টাকা ছিল, এখন তাহা ৪০ টাকা মানুষের দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। তবে সেখানে এখনও প্রচুর চাল আছে। সেখানে লোকের দারুণ অর্থাভাব, কারণ নোট বা টাকা আর চলে না। গত আড়াই বৎসর জাপানীদের অধীনে থাকিয়া ব্রহ্মের লোক যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, বৃটিশ তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ঐ ভাবে বাটা নষ্ট করায় জনসাধারণ বৃটিশ-বিরোধী হইয়াছে। মোটের উপর ব্রহ্মদেশে বর্ত্তমানে বাস করা খুবই কষ্টকর হইয়াছে।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতির ভুয়া কথা—

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর মার্কিণ রাষ্ট্রপতি উইলসন পৃথিবীর সকল পরাধীন ও নির্য্যাতীত দেশকে স্বাধীনতা দিবার কথা ঘোষণা করিয়া এক ১৪ দফা বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। এবার গত ২৭শে অক্টোবর মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ ট্রুম্যান আবার ১২ দফা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সেইরূপ বড় বড় কথা বলিয়াছেন।

তাহাতে পৃথিবীর সকল পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে—অথচ কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে যে ইন্দোনেসিয়া ও ইন্দোচীনে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে মার্কিণ টাকা ও লোক দিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করিতেছে—চীনে কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বৃটীশ পৃষ্ঠপোষিত চিয়াং কাইসেককে মার্কিণ সাহায্য করিতেছে। সর্ব্বত্র এই ভাব দৃষ্টি হওয়ায় কেহ আর মিঃ ট্রুমানের এই সকল বড় বড় কথায় বিশ্বাস করিবে না। যদি কখনও সত্য সত্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়, তখন সেই চেষ্টার উদ্যোগকারীদের পৃথিবীর নির্য্যাতীত জাতিসমূহ অবশ্যই অভিনন্দিত করিবে।

রাওলপিণ্ডিতে দুর্গোৎসব—

রাওলপিণ্ডির প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সমারোহ সহকারে এ বৎসর দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালী কালীবাড়ীর সম্পাদক শ্রীযুত শৈলেন আচার্য্য ও সহ সম্পাদক শ্রীযুত অনিল ঘোষের তত্ত্বাবধানে সমগ্র উৎসবটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। এতৎব্যতীত শ্রীযুত হেম দত্তগুপ্ত, নীলু ঘোষ, চঞ্চল নন্দী ও অরুণ বসুর কার্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মালয়ে ভারতীয়দের দুরবস্থা—

মালয়ের কুয়ালালামপুর হইতে স্বামী আত্মারাম শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে তার যোগে জানাইয়াছেন—"সমগ্র মালয়ে ভারতবাসীদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বিশিষ্ট আইনজীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মপ্রচারকদের মাসাধিক কাল ধরিয়া নির্জ্জন কক্ষে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহাদের পক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রচলিত মুদ্রা অচল হওয়ার কিছু করা যাইতেছে না। বন্দীদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করুন, দুর্গতদের সাহায্য দান করুন ও বর্ত্তমান অভাব অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করুন।" শরৎবাবু ঐ সংবাদ বড়লাটকে, বৃটিশ উপনিবেশ সচিবকে ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সদস্য মিঃ খারেকে জানাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুকে ইন্দোনেসিয়ায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কোন ভারতীয়কে কি এ সময়ে তথায় যাইতে দেওয়া হইবে?

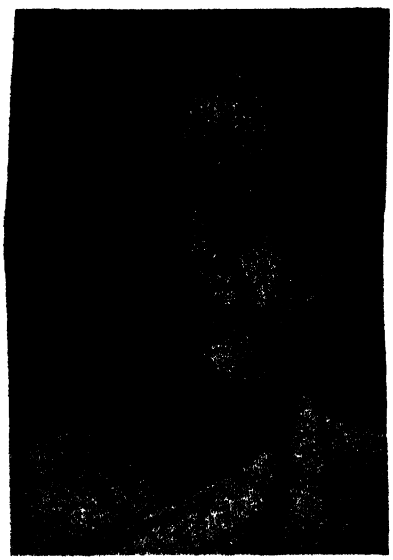
কোয়েটায় দুর্গোৎসব—

কোয়েটা প্রবাসী বাঙ্গালীরা এ বৎসরও মহামায়ার পূজা যথাবিহিত সম্পাদন করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত কম। উপরন্তু কাপড়, চাউল প্রভৃতি পূজার দ্রব্য সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় অনেকেই পূজা সম্বন্ধে এ বৎসর নিরুৎসাহ হন। যাহা হউক কয়েকজন যুবকের উৎসাহ ও চেষ্টায় পূজার সমস্ত অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। হিন্দুস্থান কন্‌ষ্ট্রাকশান কোম্পানীর একাউন্টেণ্ট শ্রীযুক্ত এস, এন, বসু পূজাকার্য্যের সংগঠন ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য ও শ্রীযুক্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পূজা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ও সাহায্য করেন।



রাওলপিণ্ডিতে দুর্গোৎসবে সমবেত বাঙ্গালীরা (১৯৪৫)

হইবে। এ সময়ে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সকল দল মিলিত হইয়া কাজ করিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিংকমিটীর সদস্য ও গঠনমূলক কার্য্যে আত্মদান শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবার নির্ব্বাচন ব্যাপারে শরৎবাবুর সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন—ইহা দেশের পক্ষে সুসংবাদ সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশের জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হইয়া যে দল গঠন করিয়াছেন তাহা মৌলবী এ কে



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

ফজলল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে। সুখের কথা সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমানই এই দলে যোগদান করিয়াছেন ও কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিতেছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মৌলবী নৌসের আলি সাহেব এ সময়ে কংগ্রেস পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে অগ্রসর হওয়ায় বাঙ্গালায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলের শক্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। একদিকে যেমন দেশে কংগ্রেসের প্রবল প্রতিপত্তি দেখিয়া অকংগ্রেসী দল ভয় পাইতেছে, অন্যদিকে তেমনই প্রায় সকল মুসলমান মুসলেম লীগ দলের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়ায় লীগদলও ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ, সকলেই এখন তাহা মনে করিতেছেন।

পরলোকে চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা টালীগঞ্জ নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে কার্ত্তিক সোমবার ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন



চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হইয়া তিনি ১১৩২ সাল হইতে জমীর উন্নতি বিধানের কাজে প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন ও যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

পরলোকে কিরণচন্দ্র রায়—

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরিচালক সমিতির সম্পাদক খ্যাতনামা ব্যবসায়ী কিরণচন্দ্র রা গত ১৯শে অক্টোবর মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যাদবপুর কলেজ ও আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া শিল্প ব্যবসায়ে যেমন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে ছিলেন, তেমনি জনগণের সেবায় বহু সময় অতিবাহিত করিতেন তাঁহার অগ্রজ মিঃ এস-কে-রায় যাদবপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার শোকসভায় প্রায় ১৫ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, শ্রীসারদামণি দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই আদর্শে জীবন গঠন করা এবং মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ও সেবার আদর্শপ্রচার করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্রহ্মচারিণী কলিকাতা ১৯নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে একটি মহিলা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকদের দ্বারাই উহা পরিচালিত হইতেছে। ইহার কার্য্যাবলী—আশ্রম ও ছাত্রীনিবাস এই দুই বিভাগে পরিচালিত আমরা এই নবপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটে উৎসব—

গত ১৮ই অক্টোবর বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রামে শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের জন্মস্থানে এবার সমারোহের সহিত তাঁহার স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় জমীদার ও স্বর্গত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। কলিকাতা হইতে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কিশোর ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস প্রভৃতি ঐ উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। যাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর পাট সুরক্ষিত হয়, সেজন্য একটি স্থানীয় কমিটী ও একটি নিখিলবঙ্গ কমিটী গঠন করা হইয়াছে। কমিটী অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঝামটপুরে প্রতিষ্ঠিত মন্দির রক্ষা ও বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করিবেন।



ঝামটপুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মৃতি-মন্দিরে উৎসব

স্বপ্নরাত্রি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

বহুদিন পরে
ফিরিলাম স্বপ্ন'পরে প্রেয়সীর ঘরে
বিহ্বল আবেশে সুখে যেথা শুক্লারাতি
মাধবীর তৃপ্ত হাসি রাখিয়াছে পাতি'
নির্ম্মল শয্যার পরে, সুষুপ্তা যামিনী,
তার কেন্দ্রে সুপ্তা মোর স্থির সৌদামিনী।
বহুদিন শেষে
হেরিনু বধূরে পুন পরম নিমেষে।
এ মুহূর্ত্তটারে
চঞ্চল জীবনমাঝে শ্রেষ্ঠ সাধে ঘিরে
কেমনে অক্ষয় রাখি পরিবর্ত্তনের
স্রোত হ'তে দূরে? মোর প্রথম ক্ষণের
ব্যাকুল হৃদয়বার্ত্তা মধুরে গুঞ্জরি,
অনুরাগে হর্ষে লাজে দিব তারে ভরি;
শুধু দুটী কথা—
বাণীতে ধরিবে রূপ রাত্রি নীরবতা।
সেই ত মোদের
চঞ্চলের মাঝে তবু অনন্তবোধের
পরিণত ক্ষণটুকু, আশা-ভরা হিয়া
গীতচ্ছন্দে মধুগন্ধে হাতে হাত দিয়া
নীরবে বসিয়া থাকা গভীর রাত্রিতে
পাশাপাশি দুটী প্রাণ থাকিবে ধ্বনিতে—
নিদ্রা অবসানে
বধূ মোর সাড়া দিবে অনন্তের কানে।
হয়ত সাধ্বসে
সন্তর্পণে স্পর্শ রাখি খেয়ালের বশে
সহসা চলিয়া যাব, অর্দ্ধ জাগরণে
নিমীলিত শুকতারা উন্মীলন ক্ষণে,
স্পন্দিত শ্রীঅঙ্গখানি সুধীরে বিথারি'
কমল পল্লব সম রহিবে নেহারি
যাত্রা পথটারে,
রবে মোর স্পর্শরস পুলকেতে ঘিরে।

জীবনে নিবিড়
অনুভবরাশি হেথা করিয়াছে নীড়
জাগিছে নীরব রাত্রি, অতন্দ্র আকাশ
তিলোত্তম এতটুকু পূর্ণের প্রকাশ
টলমল করে যেন নয়নের নীর;
নাহি স্পর্শি তারে মোর পরম রাত্রির

রাখিনু সন্মান
শুধু দৃষ্টিটুকু রেখে গেনু দান।

স্বাধীনতার নবজন্ম—ইন্দোনেশিয়া

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ঘুমন্ত সিংহ গা নাড়া দিয়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে এই সিংহের গর্জ্জনে বিদেশী বণিক জাতির বুক দুরু দুরু করে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাদের আর একবার এমি অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হয়েছিল। তখন নিরস্ত্র জনগণের উপর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে কোনরূপে সে ধাক্কা সামলে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, আজ অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতীচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র এশিয়ায় গণদেবতার রুদ্ররোষ জ্বলে' উঠেছে। এই দাবানলকে প্রশমিত করবার মত শক্তি আজ আর কারো হাতে নেই। ইন্দোনেশিয়ার এই স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একই যোগসূত্রে বাধা। ভারতও ইহার সহিত জড়িত এবং এই আন্দোলনের স্রষ্টা ও নেতা। প্রত্যেক ভারতবাসী আজ ইন্দোনেশিয়ার এই গণ-আন্দোলনের গতি অতি আগ্রহ ভরেই লক্ষ্য করছে। তবে এই দ্বীপময় দেশগুলির সব কথা ভারতের সকলের জানা নেই। তারা জানে যে দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলি অপরিহার্য্য বস্তু এই দেশগুলি থেকে আসে—চিনি, সাগু, কুইনাইন ও নানা মসলার ডালি আমাদের দ্বারে তারা পৌঁছে দেয়। আরো হয়ত জানে যে এই সকল দেশে একদা ভারতীয় সভ্যতার আলো জ্বলে উঠেছিল। তার বহু নিদর্শন আজও সেখানে অবশিষ্ট আছে। ধর্ম্মে, সাহিত্যে, আচারে, ব্যবহারে এখনও তার ছাপ সুস্পষ্ট।

ওলন্দাজ সামরিক শক্তি যে ইন্দোনেশিয়ার উপর প্রভুত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে. আসলে বৃটীশ ও বৃটীশের বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যেরাই সেখানে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ডাচ-সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব বৃটেন স্বেচ্ছায় আপনার কাঁধে তুলে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেই সহানুভূতি যে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে রূপান্তরিত হ'তে পারে তা অনেককেই বিস্মিত করবে। তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়ার বিপুল কৃষি, খনিজ, বনজ ও তৈল সম্পদ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কি ভাবে ভাগাভাগি করে উপভোগ করে তৎসম্পর্কে ওয়াকেব-হাল হলেই বৃটেনের মাথা ব্যথা ও অন্যান্য শক্তিগুলির পরোক্ষ সমর্থনের হদিস পাওয়া যাবে। অবশ্য একথা খুব সত্য যে, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের শিল্প-স্বার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার বিপুল তৈল সম্পদ, রবার, চা ও আরণ্য-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হ'লে হল্যাণ্ডকে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির সমপর্য্যায়ে নেমে আসতে হবে। কিন্তু এখানে অন্যান্য জাতির স্বার্থও কম নয়। দেশের শতকরা ৪০ ভাগ প্রাকৃতিক সম্পদ ডাচদের হাতে। এখানে বৃটেনের আর্থিক স্বার্থ প্রায় ডাচদের সমতুল্য ; কারণ এখানের বহু চা-বাগানের মালিক ইংরাজ, সুমাত্রার তৈল ও রবার সম্পদের ৪০ ভাগের মালিকও ইংরাজ (ডাচদের সমান)। যুদ্ধের পূর্ব্বে সুমাত্রার অবশিষ্ট ২০ ভাগ তৈল ও রবার সম্পদ ভোগ করত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মানী ও জাপান।

সুমাত্রা ও যবদ্বীপের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে আমেরিকার বিপুল স্বার্থ জড়িত। এখানকার অরণ্যজাত কাপক কাষ্ঠ আসবাব নির্ম্মাণে বিশেষ উপযোগী। মার্কিণ আসবাব ব্যবসায়ীরা আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য এই কাষ্ঠ ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার রাখে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ মোটর, ছায়াচিত্র ও বেতারযন্ত্র, ইলেকট্রিকের সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যবসায়ীরাও এখানে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা পেত। কাজেই ইন্দোনেশিয়রা যদি শেতাঙ্গদের শোষণ উচ্ছেদে সমর্থ হয় তা হ'লে ডাচদের তুলনায় বৃটেন বা আমেরিকার কম ক্ষতি হবে না।

এই পটভূমিকায় ইন্দোনেশিয়ার গণজাগরণ ও পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রতিরোধের বিচার করতে হবে। তার আগে প্রথমে ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ইন্দোনেশিয়া বা ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যবদ্বীপ, সুমাত্রা সেলিবিস, মাদুরা, বালি, লম্বক, ফ্লোরেস, মলুকাস, এবং বোর্ণিও নিউগিনি ও টিমোর দ্বীপের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এদের মোট আয়তন প্রায় ৭৩৫২৬৭৯ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা সাত কোটী (হল্যাণ্ডের মোট ভূমির পরিমাণ ১২৭১২ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৯০ লক্ষ)। এই ইন্দোনেশিয়া নামটার পেছনেও এক ইতিহাস আছে। ডাচরা এই সকল দ্বীপের সরকারী নাম দিয়েছে 'নেডারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডি'—ইংরাজিতে অনূদিত হয়ে এই নাম হয়েছে 'ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিজ'। ডাচরাও এই সকল দ্বীপের কথা উল্লেখ করবার সময় বিশেষত যখন তারা যবদ্বীপের কথা উল্লেখ করে তখন সংক্ষেপে বলে 'ইণ্ডি' বা 'ইণ্ডিয়া'। ভারতবর্ষকে তারা বলে 'বুর-ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ 'ফোর-ইণ্ডিয়া'। তার অর্থ হ'ল 'প্রথম ভারত'। তাতে ভয়ানক অসুবিধা হত। সেইজন্য গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ডাচ লেখক ডাউয়েস ডেকা এর নাম দেন 'ইনসুল-ইণ্ডিয়া' বা দ্বীপময় ভারত। তারপর শতাব্দী শেষ ভাগে জার্ম্মাণ পণ্ডিত এ-বাষ্টিনএর গ্রীক অনুবাদ করে না

রাখলেন 'ইণ্ডোনেশিয়া'। এর পর থেকে ডাচ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, বৃটীশ মার্কিণ প্রভৃতি লেখক ও পণ্ডিতগণ এই দ্বীপময় দেশের এই সংক্ষিপ্ত নামটী ব্যবহার করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে এই নামটাই চলিত হয়ে গেল।

ইণ্ডোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে সুমাত্রার য়্যাকিনীজ, যবদ্বীপে সুন্দানীজ, লম্বকে সাসাক, সেলিবিসে মেনাডোনিস, বোর্ণিওতে দয়াক এবং নিউগিনিতে পাপুয়ান জাতির বসবাস। এদের তিন দলে ভাগ করা যায়—ইউরোপীয়ান, আদিম ও বিদেশী প্রাচ্যবাসী। জাতিগত ভাবে তাদের মালয়ী বলা যেতে পারে। বিভিন্ন দ্বীপের কথা ভাষায় বিভিন্নতা সত্বেও সকল দ্বীপেই মালয় ভাষায় কথা বলা চলে। ভারতবর্ষে হিন্দুস্থানী ভাষার মত বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা মালয় ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। ইণ্ডোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকলেরই নয়নানন্দকর। প্রকৃতি এখানে যেন তার রূপের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল দেশের লোকই ইণ্ডোনেশিয়ার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়েছে। এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র এবং উর্ব্বরতার গুণে এখানকার মাটিতে সোনা ফলে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতাত্বিক ঐশ্বর্য্যও এর এক পরম আকর্ষণ। বালি ও যবদ্বীপে রমণীয় মন্দির সমূহ দর্শকদের বিস্মিত করে।

ইন্দোনেশিয়ার কৃষি সম্পদও অতুলনীয়। যবদ্বীপ পৃথিবীর ইক্ষু-উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, কিউবা দ্বীপই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইক্ষু-উৎপাদনকারী দেশ। তবে কুইনাইন উৎপাদনে যবদ্বীপেরই স্থান প্রথম। এর সঙ্গে রবার, পেট্রল, তামাক, চা ও কফি তো আছেই। চালই এ দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

এই অপরিমেয় সম্পদের ভাণ্ডার হওয়ায় ইন্দোনেশিয়া খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ থেকেই বিদেশী শক্তিগুলির নিকট পরম লোভনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতীয়গণ ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। সেখানে বিভিন্ন দ্বীপে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীবিজয়, সুমাত্রার পালেম্বাঙে রাজধানী স্থাপন করে সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপাবলী ও মালয় উপদ্বীপের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। যবদ্বীপেও বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ বংশের রাজন্যগণ রাজত্ব করেন। যবদ্বীপের নৌবাহিনী একাধিকবার কাম্বোডিয়ার উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই যবদ্বীপের কোন এক রাজা এক শক্তিশালী নৌবাহিনী পাঠিয়ে চীনের অমিতপরাক্রম রাজার নিকট কর আদায় করেন।

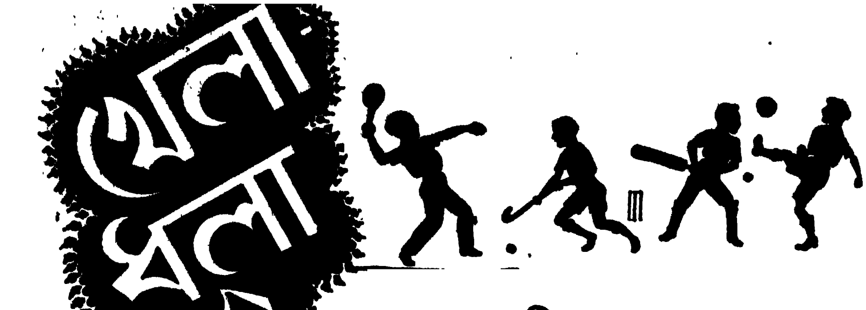
পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধদের শক্তি হ্রাস পায় এবং মুসলমান বিজেতারা রাজ্য স্থাপন করে বালি ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্বীপের অধিবাসীকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। কেবল বালি দ্বীপের অধিবাসীরাই হিন্দুত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আজও ইন্দোনেশিয়ানগণ তাই ধর্ম্মে-মুসলমান হলেও কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে তারা হিন্দু। তাদের নাম-করণেও মুসলমান ও সংস্কৃতের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি করেই আজও তাদের সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটক রচিত হয়। বর্ত্তমান ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্রের পরিচালক তাঁর সুকর্ণ হিন্দু নাম ধারণ করলেও ধর্ম্মে তিনি মুসলমান। ষোড়শ শতাব্দীতে আবার মুসলমানদের আধিপত্য নষ্ট হয়। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা মসলার অন্বেষণে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করতে আসে। তাদের সঙ্গে আসে খৃষ্টীয় পাদরীর দল। এই সকল পাদরী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিস্তারে বিফল হলেও বণিকগণ অল্পকালের মধ্যে মুসলমানদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে বসে। তবে তাদের এই প্রাধান্যও বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর পরে ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরা এসে তাদের স্থান গ্রহণ করে। অবশেষে ওলন্দাজরা ইংরাজদেরও টেক্কা দেয়। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা ভারতে ইংরাজদের ধরণে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। এই কোম্পানী প্রায় দুই শতাব্দীকাল দেশের শাসন পরিচালনা করে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ সরকার স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

স্মৃতির

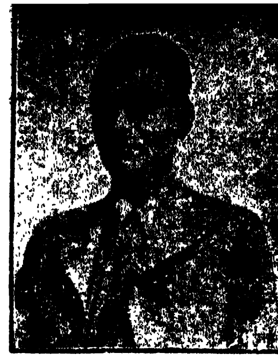
কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল

যেদিন যায় ফেরে না সেদিন
শুধু আঁখি ঝরে স্মৃতির পরে।
শূন্য দেউলে কাঁদিয়া পূজারী
সাজায় অর্ঘ্য—জীবন ভরে'!
হায় রে অবুঝ স্মৃতির পূজারী
কার তরে দীপ জ্বাল সারি সারি,
কার তরে গাঁথ ব্যথার মালিকা,
হারান দিনের দেউল 'পরে!

ধূপ জ্বালি' কাঁদ—ধোঁয়ারি ছলে
গন্ধ শুকায়—একলা কাঁদি',
কার তরে রচ বাসক শয়ন
পথ চেয়ে থাক কবরী বাঁধি'!
বাদলের দিন নিভে নিভে আসে,
তমালের তল কাঁদে যে হুতাশে,
স্মৃতির পূজায় মৌন বেদনা
বকুল ও কেয়ার বুকেতে ঝরে।



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রোভার্স কাপ ঃ

বোম্বাইয়ের রোভার্স ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় সৈনিক দলের প্রাধান্য এ বছরও বজায় রইল। ১৮৯১ সালে এই প্রতিযোগিতার আরম্ভ। পূর্ব্বে কেবলমাত্র মিলিটারী দলেরই যোগদানের অধিকার ছিল। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব নিমন্ত্রিত হয়ে রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম 'রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়েছিল ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গালোর মুসলীম। ১৯৪০ সালে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভারতীয় দলের মধ্যে দ্বিতীয়বার রোভার্স কাপ পায়। ১৯৪২ সালে বাটা (কলকাতা) রোভার্স কাপ বিজয়ী হওয়ার পর গত দু'বছর আবার মিলিটারী দলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে।

বর্ত্তমান বছরের ফাইনালে কলকাতার এলবার্ট ডেভিড একাদশ মিলিটারী দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ৩—০ গোলে হেরে যায়। খেলা হিসাবে মিলিটারী দলের খেলাই ভাল হয়েছিল এবং এ সাফল্য সম্বন্ধে কারও মনে কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনি। এলবার্ট ডেভিড দলের আক্রমণ ভাগ একবার অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে তাছাড়া তাদের খেলায় আর কোন প্রশংসা করা যায় না। ফাইনাল খেলায় এক অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল, এলাবার্ট ডেভিড দলের ফাউল খেলার ফলে মাঠের মধ্যে কয়েকজন মিলিটারী নেমে পড়ে মারধর করে। পুলিস এসে পড়ায় আর বেশী দূর না এগিয়ে এইখানেই শেষ হয়। তবে এলবার্ট ডেভিড দলের কোন কোন খেলোয়াড় ধীর বুদ্ধিতে আর খেলতে না পেরে গায়ের জোর দেখিয়ে কেবল নিজেদের খেলাই নষ্ট করেনি ফুটবল খেলায় বাঙ্গলা দেশের ভদ্রতার যে সুনাম ছিল তা হারিয়ে এসেছে।

বেঙ্গল ক্রিকেট ক্লাব ঃ

কলকাতার ক্রিকেট মহলে বেঙ্গল ক্রিকেট ক্লাব তার গত তিন বছরের কাজ দিয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বর্ত্তমান বছরে কলকাতার ময়দানে এই ক্লাবের ক্রিকেট খেলার জন্য নতুন মাঠ তৈরী হয়েছে এবং অন্যান্য বছরের মত এ বছরও যে সব বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এই ক্লাবের খেলায় যোগদান করবেন তাঁদের মধ্যে কার্ত্তিক বসু, গণেশ বসু, বাপি বসু, খাবু বসু, নির্ম্মল চ্যাটার্জি, মণ্টু ব্যানার্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কার্ত্তিক বসু এবং সি এ বি'য়ের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল এতদিনে তার অবসান হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা দেখা দিয়েছে।

সন্তোষ ট্রফি ঃ

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গলা দল ২—০ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে তার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ১৯৪১ সালে এই প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে বাঙ্গলা দেশ প্রথম সন্তোষ ট্রফি বিজয়ের গৌরব লাভ করে। ১৯৪২ ৪৩ সাল এই দু'বছর প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ১৯৪৪ সালে দিল্লী দল ফাইনালে বাঙ্গলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় রাজপুতনাকে ৭—০ গোলে, বিহার দলের সঙ্গে 'ওয়াক ওভার' পেয়ে এবং হায়দ্রাবাদকে ৫—০ গোলে হারিয়ে বাঙ্গলা দল ফাইনালে উঠে। প্রতিযোগিতার অন্যদিক থেকে বোম্বাই দল ৪—০ গোলে পাঞ্জাবকে, ৩—১ গোলে ঢাকাকে এবং ৩—২ গোলে দিল্লীকে হারিয়ে ফাইনালে বাঙ্গলা দলের সঙ্গে মিলিত হয়।

দলগত বা ব্যক্তিগত কোন দিক থেকেই বোম্বাই দল বাঙ্গলা দলের সঙ্গে পেরে উঠেনি। বাঙ্গলার দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ এবং সুদৃঢ় রক্ষণ-ভাগের খেলার কাছে বোম্বাই দলের খেলা দর্শকদের চোখে পড়েনি ;

বাঙ্গলা দল : ইসমাইল ; এস দাস এবং তাজ মহম্মদ ; ডি চন্দ্র, টি আও এবং মহাবীর ; আর দাস, আপ্পারাও, পাগসলি, এস ঘোষ এবং এস নন্দী।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

বোম্বাইয়ে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় বাছাই দলের মধ্যে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। উভয় পক্ষে একটি করে গোল হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করে। ভারতীয় দলের পক্ষে আর দাস গোলটি দেন। নিম্নলিখিত খেলোয়াড় ভারতীয় দলে খেলেছিলেন—ওসমান; ফলস এবং পাপেন; সমুঘম, টি আও এবং মহাবীর; এস নন্দী, আপ্পারাও, আর দাস, রহমন এবং চাকুরাম।

ভারতে এফ এ টীম ঃ

এরূপ প্রকাশ যে, আগামী জুলাই মাসে ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশনের একটি শক্তিশালী ফুটবল টীম ভারতে নিমন্ত্রিত হয়ে খেলতে আসবে। এই টীমের খরচ আনুমানিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মতন হবে। বিলাতের ফুটবল খেলার পদ্ধতি এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় হয়েছে। সত্যিই যদি ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশনের শক্তিশালী দলের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হয় তাহলে আমাদের খেলোয়াড়দের এখন থেকেই তৈরী হতে হবে। তা নাহলে সে লড়াইয়ে দর্শকদের আগ্রহের একান্ত অভাব দেখা দিবে।

ফ্রেড পেরী ঃ

ফ্রেড পেরী আমেরিকার টেনিস জগতে একটি উজ্জ্বল তারকা। তিনি নাকি আর টেনিস খেলায় যোগ দেবেন না বলেই স্থির করেছেন। ১৯৪১ সালে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে টেনিস খেলার সময় তাঁর ডানহাতের শিরা আঘাত পান। বর্ত্তমানে পেরী ইউনাইটেড ষ্টেটস আর্মির একজন ষ্টাফ সার্জ্জেন্ট।

পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

মস্কোতে Titiana Sevryukova ৪৮ ফিট ১০ ইঞ্চি দূরে লোহার বল নিক্ষেপ করে মেয়েদের মধ্যে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বে জার্ম্মান মহিলা Gisela Manetmoyerএর ৪৭ ফিট ২ ইঞ্চির রেকর্ডই পৃথিবীর রেকর্ড ছিল।

ওয়াটার পোলো ঃ

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আমেরিকান সৈনিকদের স্নানাগারে একটি ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতা হয়েছিল। হাটখোলা দল এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। লীগের দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কলেজ স্কোয়ার এস সি। এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকান এবং বৃটিশ সার্ভিস টীমও যোগদান করেছিল। ইউ এস আর্মির উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার শেষে খেলায় হাটখোলা ১০—৫ গোলে কলেজ স্কোয়ার এস সিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়।

ডন্ ব্র্যাডম্যান ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে প্রকাশ যে, পৃথিবীর বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যান এরপর আর কোন টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় যোগদান করবেন না বলে স্থির করেছেন।

আই এফ সি শীল্ড ঃ

লক্ষ্ণৌয়ের আই এফ সি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়দিনের ফাইনাল খেলায় অমৃতবাজার পত্রিকা ২-০ গোলে লক্ষ্ণৌ সিটি ক্লাবকে হারিয়ে উক্ত শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় কোন পক্ষেই গোল হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের খেলায় অমৃতবাজার পত্রিকা ক্লাবের খেলা সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্যলাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিজিতদল স্থানীয় ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং লক্ষ্ণৌয়ের একটি শক্তিশালী দল হিসাবে পরিচিত। অমৃতবাজার পত্রিকা দলে কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল দলের কয়েকজন খেলোয়াড় যোগদান করেছিল। পত্রিকাক্লাব ক্যানিং কলেজের সঙ্গে 'ওয়াক ওভার' পেয়ে, ব্রিটিশ মিলিটারী হস্পিট্যালকে ৫-১ গোলে, ল্যাঙ্কাসায়ার ফুসিলিয়ার্সকে ৫-০ গোলে এবং লক্ষ্ণৌ আর দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।

অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল ঃ

অষ্ট্রেলিয়া থেকে অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে বে-সরকারীভাবে খেলতে এসেছে। এই দলে মোট ১৯ জন সদস্য আছেন। পনেরজন খেলোয়াড় এবং বাকি চার জন সদস্য দলের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এই দলটি ভারতবর্ষে মোট ৯টি খেলায় যোগদান করবে। খেলার তালিকাটি এইরূপ—(১) অক্টোবর ২৮, ২৯ এবং ৩০ তারিখে নর্থ জোনের সঙ্গে। (২) নভেম্বর ১, ২ এবং ৩ তারিখে প্রিন্সেস একাদশের সঙ্গে। (৩) ৬, ৭, এবং ৮ ওয়েষ্ট জোনের সঙ্গে। (৪) ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখে ভারতীয় একাদশের সঙ্গে। (৫) ১৫ এবং ১৬ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সম্মেলিত দলের সঙ্গে (৬) কলকাতা—২১, ২২ এবং ২৩ ইষ্টজোনের সঙ্গে। (৭) ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ ভারতীয় একাদশের সঙ্গে। (৮) মাদ্রাজ—ডিসেম্বর ৩, ৪ এবং ৫ সাউথজোনের সঙ্গে। (৯) ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ভারতীয় একাদশ দলের সঙ্গে। এই দলে আছেন—

—এ এল হাসেট (ক্যাপটেন), কে আর মিলার (ভাইস ক্যাপটেন), ডি কে কারমোদী, সি জি পিপার, জে পেট্টিফোর্ড, আর এম ষ্ট্যানফোর্ড, আর এস হুইটিংটন, সি ডি ব্রেমনার, এ ডবলউ রোপার, জে এ ওয়ার্কম্যান, আর এস ইলিস, এস জি সিসমে, সি এফ প্রাইস, ডি আর ক্রিষ্টোফানী এবং ই এ উইলিয়মস।

অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে দুটি খেলায় যোগদান ক'রে খেলা ড্র করেছে।

[illegible]—

নর্থ জোন—৪১০ ও ১০৩ (৭ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়ান—৩৫১

লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে অষ্ট্রেলিয়ান দল উত্তরাঞ্চলের সম্মেলিত দলের সঙ্গে তাদের প্রথম খেলাটি ড্র করেছে। একদিকে ভ্রমণের পরিশ্রম এবং অন্যদিকে মিলার এবং ক্রিষ্টোফানির অসুস্থতার জন্য তাঁরা খেলায় ভাল করে যোগদান করতে পারলেন না। এই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে খুব বেশী আশা করা যায় না। নর্থজোনের ব্যাটিংয়ে সাফল্য দেখালেন আবদুল হাফিজ [illegible] ইফতিকার ১৩৮ রান ক'রে নট আউট থেকে। ক্রিষ্টোফানি ৫৮ রানে ৪টে উইকেট পান।

অষ্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংসে ৩৫১ রান উঠল। রান হিসাবে হ্যাসেটের ৭৩ এবং পেপারের রান উল্লেখযোগ্য। আবদুল হাফিজ ১১৫ রানে ৫টা উইকেট পেলেন।

প্রথম ইনিংসের ৫৯ রানে অগ্রগামী থেকে নর্থ জোন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো এবং চায়ের পূর্ব্বে একঘণ্টার মধ্যেই ৬১ রানে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নর্থজোনের ৭ উইকেটে ১০৩ রান উঠলে খেলাটি ড্র হ'ল। পেপার ৪৫ রান দিয়ে ৫টা উইকেট পেলেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নতুন বউ"—২৸০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "স্বপ্ন হলো সত্যি"—১৲

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বন্দী"—২৲

শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মীরা"—৷৵০

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত উপন্যাস "পরকীয়া"—২৸০, "বিপ্লবী তরুণী"—৩৲

অন্নপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "এবার অবগুণ্ঠন খোল"—২৸০

শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "কিশোর রামায়ণ"—১৸০

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রক্ত-রাখী"—৩৲

কমলাকান্ত প্রণীত উপন্যাস "জনকজননীজননী"—২৸০

নরেন্দ্র দেব প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সুহাসিনী"—২৲

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার প্রণীত উপন্যাস "প্রত্যাখ্যান"—২৸০

শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ধূসর পথের ধুলা"—২৲

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কাশবনের কন্যা"—২৸০

প্রভাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "জাগেনি যে-নীতি"—৩৲

স্বামী বেদানন্দ প্রণীত "প্রতিজ্ঞা"—৷০

রমেশচন্দ্র সেন প্রণীত উপন্যাস "শতাব্দী"—৩৷০

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "পার্শ্ববাক"—৷৵০

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গল্প-সংগ্রহ "শরতের ফুল"—২৸০

ষাণ্মাষিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৷০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩৸৵০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫২

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচী



রমা



শিল্পী—শ্রীপান্না সেন

শাদা ও কালো